প্রেমচন্দ
নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

প্রেমচন্দ গল্পসংগ্রহ

প্রেমচন্দ গল্পসংগ্রহ

প্রেমচন্দ

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

B C S C Public Library
Lib Fin. Com No. 8405
Lib Fin. Com. M.R No. 31016

উপদেষ্টামণ্ডলী
শ্রীঅমৃত রায়, ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহা, ড. প্রভাকর মাচওয়ে, অধ্যাপক কল্যাণমল লোধা, শ্রীসুধী প্রধান, শ্রীগোলাম কুদ্দুস, অধীর চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. পবিত্র সরকার, ইজরাইল, শ্রীমতী সরলা মহেশ্বরী, ড. চন্দ্রা পান্ডে, শ্রী সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, শ্রী অমল রায়

প্রথম প্রকাশ
২০ মে ১৯৫৮

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

প্রচ্ছদ
রবীন দত্ত

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
টাইপোগ্রাফিক্স
১১৫ কারনানি মেনসনস
২৫এ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০১৬

মূল্য ১৫০ টাকা

ISBN 81-7751-067-3

নিবেদন

বাঙালি পাঠকের কাছে প্রেমচন্দ শুধু পরিচিত নয়, পরম আদরণীয় একটি নাম। প্রেমচন্দ নিজেও বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যস্রষ্টাদের বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য পোষণ করতেন। লেখকের জীবৎকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের প্রতি বাঙালি পাঠকের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা মনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রেমচন্দের জন্মশতবর্ষে তাঁর গল্প বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত সাহিত্য উপদেষ্টা পর্ষদ এই কাজের জন্য একটি উপদেষ্টামণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছিলেন। এর পর প্রেমচন্দের অন্যতম পুত্র শ্রীঅমৃত রায়ের সহযোগিতায় ৮০টির মতো গল্প নির্বাচন করে অনুবাদ করানো হয়েছিল। সম্পাদকমণ্ডলী প্রতিটি গল্পের ভাষান্তর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন, যাতে গল্পের স্বাদ অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ অনুবাদ মূল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় সেইদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিল।

প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ বেশ কিছুকাল হল নিঃশেষিত হয়েছে। বহু পাঠক গ্রন্থটির খোঁজ করেছেন, এখনও করেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গল্প সংকলনটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লেখকের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'দুনিয়া কা সবসে আনমোল রতন' (যা লেখকের মূল [illegible] ধনপত রায়ের নামেই প্রকাশিত হয়) থেকে শুরু করে প্রেমচন্দ ছদ্মনামে প্রকাশিত প্রথম গল্প 'বড়ে ঘর কী বেটী' হয়ে তাঁর জীবনের সমাপন প্রান্তে প্রকাশিত গল্পগুলির প্রতিনিধিস্থানীয়দের অনুবাদ এখানে সংকলিত হয়েছে। ফলে পাঠক তাঁর গল্প-লেখালিখির বিবর্তন-ধারা বিষয়েও একটি ধারণা গড়ে নিতে পারবেন। উত্তর ও মধ্য ভারতের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের জনজীবনের লেখমালা প্রেমচন্দের গল্প। সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তর থেকে উঠে-আসা মানুষজন, তাদের মানসভঙ্গিমার সর্ববিধ অনুভূতি সংরাগ সংক্ষোভ সমেত যেন গড়ে তোলে এক মহত্তর মানবযাত্রা। এই মানবযাত্রী দলের কথাকার প্রেমচন্দ বিশ্বাস করতেন জীবনের নানা সংগ্রামের মধ্যে এক পরমসৌন্দর্য বিরাজ করে। সেই সৌন্দর্যে প্রাণিত তাঁর গল্পের দুনিয়া। কোনো সমালোচক যথার্থভাবেই তাঁকে ভারতীয় সাহিত্যের ম্যাক্সিম গোর্কি বলে অভিহিত করেছেন। উত্তরজীবনে তিনি তাঁর জীবনাদর্শের কেন্দ্রে সমাজবাদকে সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বহু গল্প এবং উপন্যাস সেই সাক্ষ্য বহন করছে।

সেই দুনিয়ার দিগন্ত বাঙালি পাঠকের সম্মুখে ক্রমশ উন্মোচিত হোক, এই অভীপ্সা নিয়ে এই গল্পসংগ্রহের পুনঃপ্রকাশের আয়োজন। বর্তমান আকাদেমি সংস্করণে এবং পূর্বতন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন ছয়টি গল্পের শিরোনামও পরিবর্তিত হয়েছে। আরও তিনটি গল্প সংযোজিত হয়েছে। প্রকাশনার সামগ্রিক বিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হওয়ার আয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে প্রেমচন্দের পুত্রদ্বয়, উপদেষ্টামণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ও অনুবাদকরা যেভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধনের বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছেন শ্রীঅমল রায়। প্রকাশনার অন্য কয়েকটি বিষয়েও তাঁর পরামর্শ আমাদের বিশেষ কাজে লেগেছে। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীপবিত্র সরকার আকাদেমি সংস্করণের জন্য নতুন করে এবং পরিবর্ধিত আকারে ভূমিকা লিখেছেন। প্রকাশনার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আশা করি বর্তমান সংস্করণ ব্যাপকভাবে পাঠকপৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হবে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

গজানন মাধব মুক্তিবোধের লেখায় একটি ফোটোগ্রাফের কথা পড়েছিলাম। প্রেমচন্দ আর প্রবীণতর জয়শংকর প্রসাদের ছবি। 'প্রসাদ গম্ভীর সস্মিত।' আর 'প্রেমচন্দ কা হোঁঠোঁ পর অস্ফুট হাস্য।' কিন্তু মুক্তিবোধ সেসব লক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ করেছেন যে, প্রেমচন্দের পায়ে ক্যানভাসের জুতো, সামনে আঙুলের কাছটা ফাটা। মুক্তিবোধের কথায়, জুতোর জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রেমচন্দের আঙুলগুলি মহাফূর্তিতে ময়দানে হাওয়া খাচ্ছিল। প্রেমচন্দের এসব দিকে কোনো নজরই ছিল না।

এইরকমই ছিলেন প্রেমচন্দ। মুখটা একটু মঙ্গোলীয় ধরনের, তাতে বাদামি রঙের গোঁফ— যা প্রথমে বেশ পাখনামেলা ধরনের ছিল, পরে ছোটো হয়ে এসেছে, ধুতি-পাঞ্জাবি খুব পরিষ্কার নয়। বেশভূষা-পারিপাট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন অতিশয় সাদাসিধে এক মানুষ ভারতের এই শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। জৈনেন্দ্রর 'স্মৃতিকথা' থেকে তাঁর এই ছবিটি বাংলা অনুবাদেই এর মধ্যে পেয়ে গেছি আমরা— 'সিঁড়ির ওপর থেকে যে মানুষটি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁকে দেখে আমি রীতিমতো মর্মাহত হলাম। পুষ্ট একজোড়া গোঁফ তাঁর মুখে, গায়ে একটা পাঁচ টাকা দামের পুরোনো, ময়লা, তেলচিটে লালইম্‌লির চাদর, হাঁটু-সমান ধুতি পরনে, বিশৃঙ্খল চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে, মাথাটা একটু বেমানান রকমের ছোটো, চোখদুটো ঘুমের আবেশে ভারী। বুঝলাম, ইনিই প্রেমচন্দ; কিন্তু এই উপলব্ধিতে মন খুশি হল না। কত দূর থেকে, কত কল্পনা নিয়ে এসেছি প্রেমচন্দকে দেখতে,—আর এই চেহারা তাঁর! একবার ভাবলাম, ফিরে যাই! আমার মনের মণিকোঠায় প্রেমচন্দের যে উজ্জ্বল মূর্তি আঁকা হয়ে আছে তার স্মৃতিই অক্ষয় হয়ে থাকুক। কী তুচ্ছ, কী গেঁয়ো চেহারা এই লোকটির, যে প্রেমচন্দ নাম নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।'

বাঙালি পাঠকদের মনে পড়বে বিদ্যাসাগরকে অনেক দূর থেকে হেঁটে দেখতে এসেছিল এক গ্রাম্য বৃদ্ধা; দেখে বিলক্ষণ হতাশ হয়ে বলেছিল, 'দূর ছাই, এই উড়ে বামুনকে দেখার জন্যে অ্যাদ্দুর থেকে এলুম! এই নাকি বিদ্যেসাগর!'

প্রেমচন্দ আর বিদ্যাসাগরে সময়ের স্বভাবের ভাবনা ও কর্মের অনেক তফাত, ফলে দুয়ের তুলনার প্রসঙ্গ আসে না। কিন্তু একটা কোথাও মিল আছে হয়তো ব্যক্তিত্বের কোনো একটা

অংশে। দুজনেই যে-মানুষদের কথা ভেবেছেন, যাদের জন্য কাজ করেছেন বা বেশির ভাগ যাদের কথা লিখেছেন, পোশাকে চেহারায় তাদের থেকে এমন দূরবর্তী থাকার চেষ্টা করেননি যাতে তাঁদের চেনা না যায় তাদের নিজেদের লোক বলে। দরিদ্র ভারতের সঙ্গে তাঁদের প্রতিমূর্তি বেশ খাপ খেয়ে যায়। গান্ধিজি রাজনৈতিক নেতা হিসেবে, আমার মতে বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে, নিজের এই মূর্তিটি পরে নির্মাণ করেছিলেন, ব্যারিস্টারের পোশাক বর্জন করে। আর খুব কম প্রতিষ্ঠিত লেখক বা রাজনৈতিক নেতা সম্বন্ধেই এ-কথা বলা যায়। গৌণ রাজনৈতিক স্তরে অবশ্য জনগণের কাছাকাছি মানুষ অনেক ছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে 'ভদ্রলোক' বা 'বুদ্ধিজীবী' চেহারা অনেক বেশি ব্যাপক। প্রেমচন্দ কিন্তু দরিদ্র স্কুলশিক্ষকের ছবিটি সারা জীবন বহন করে গেছেন।

অথচ তাঁর মতো করে ভারতের জনজীবনের কথা আর কেউ লেখেননি। এই 'আর কেউ' কথাটা আমাদের সচেতন প্রয়োগ, তার মধ্যে আমাদের এবং ভারতের পাঠক-পাঠিকাদের অতি প্রিয় এবং উচ্চারণমাত্রে অভিভূত হওয়ার মতো নাম কিছু আছে, সেগুলির উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

ভারতীয় জনজীবনকে যাঁরা কথারূপ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মহত্তম পর্যায়ের লেখকরাও যে-মানুষটির সামনে এসে সসম্ভ্রম অভিবাদন জ্ঞাপন করবেন সে-মানুষটি প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬)। কাশী নগর থেকে চার মাইল দূরবর্তী লম্‌হি গ্রামে পিতা মুন্‌শি অজায়ব লাল শ্রীবাস্তব আর মাতা আনন্দীর সংসারে যে-শিশুর জন্ম হয়েছিল, জন্মকালে তাঁর বাবার দেওয়া নাম ধনপত রায় বা খুল্লতাতের দেওয়া নাম নবাব রায়—কোনোটিই তাঁর সংসারের তৎকালীন ছবি তুলে ধরে না; বরং নিম্নমধ্যবিত্ত অভিভাবকদের পুত্রসন্তানকে ঘিরে স্বপ্ন ও প্রত্যাশার করুণ স্মারক হয়ে থাকে। তাই কি প্রদত্ত নাম বর্জন করে শেষপর্যন্ত প্রেমচন্দ হলেন তিনি? ইতিহাসের ব্যাখ্যা অবশ্য অন্যরকম। হামিরপুর জেলায় শিক্ষাবিভাগের সাব্‌-ডেপুটি ইন্‌স্পেকটার হিসেবে সরকারি চাকরি করছিলেন, এমন সময় নবাব রায় ছদ্মনামে উর্দুভাষায় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় *সোজ-এ-ওঅতন* (দেশমাতার বিষাদসংগীত)। ব্রিটিশ সরকারের হুকুমে বইটি বাজেয়াপ্ত হল, ফলে 'নবাব রায়' নামটিও বর্জন করলেন লেখক। কানপুরের *জমানা* পত্রিকার সম্পাদক দয়ানারায়ণ নিগমের সুপারিশে ধনপত রায় নবাব রায় হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রেমচন্দ-এ এসে থিতু হলেন।

নাম একটি স্থায়ী হল বটে, কিন্তু স্বল্পায়ু ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে এবং পঁয়ত্রিশ বছরের লেখকজীবনে প্রেমচন্দ-এর দিনযাপনের অধিকাংশই ছিল অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল উপাদানে তৈরি।

যে-পরিবারে প্রেমচন্দ জন্মান তা নিম্নমধ্যবিত্ততা আর দারিদ্র্যের মাঝামাঝি অবস্থিত ছিল, কেরানি বাবার মাইনে পঁচিশ টাকা, জমির পরিমাণ ছ-বিঘে। উত্তরপ্রদেশ (তখন সংযুক্ত প্রদেশ বা যুক্তপ্রদেশ) আর পূর্ব পাঞ্জাবে তখন উর্দু অধিকাংশ হিন্দুরও মুখের এবং লেখার ভাষা, কাজেই প্রেমচন্দের প্রাথমিক শিক্ষা উর্দুতে, আর উর্দুর ভিত শক্ত করার জন্য ফারসিও

শিখেছিলেন গ্রামের মউলবির কাছে। অমৃত রায়ের সাক্ষ্য থেকে জানি, ছেলেবেলায় প্রেমচন্দ মোটেই শান্তশিষ্ট সুবোধ বালক ছিলেন না, ঘুড়ি উড়িয়ে, ডাংগুলি খেলে, লোকের বাগানের ফলমূল চুরি করে সবাইকে শশব্যস্ত রাখতেন।

মা আনন্দীকে পেয়েছিলেন মাত্র সাত বছর বয়স পর্যন্ত, তার পরেই তাঁর মৃত্যু হল, বাবা আবার বিয়ে করলেন। আনন্দী ছিলেন সার্থক নাম্নী, ছেলের বেদনাময় স্মৃতিতে তিনি বেঁচে ছিলেন, ছেলের সৃষ্টিতেও নানা জায়গায় তাঁর থাকা ও না-থাকার ছায়া পড়েছে।

পাঠশালা থেকে উর্দু-ফারসির গণ্ডি পার হয়ে কাশীর কুইন্‌স কলেজিয়েট স্কুলে এলেন ইংরেজি শিক্ষা নিতে। ১৮৯৭-এ তাঁর এনট্রান্‌স পরীক্ষা দেওয়ার কথা, কিন্তু সে-বছর তাঁর পোস্টমাস্টার পিতা অজায়ব লালের মৃত্যু হল। এর মধ্যে (১৮৯৬) প্রেমচন্দের বিয়ে হয়েছে, তখন তাঁর পনেরো বছর বয়স। সে-বিয়ে সুখের হয়নি, অল্প দিনের মধ্যেই স্ত্রীকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। আর তাঁকে ফেরানোর চেষ্টা করেননি।

সংসারের দায় কাঁধে নিয়ে প্রেমচন্দ ১৮৯৮-এ এনট্রান্‌সে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। কাশীতে পাঁচ টাকা মাসমাইনেতে ছাত্র পড়িয়ে, দু-টাকায় নিজের খরচ চালানো আর তিন টাকা বাড়িতে পাঠানোর কঠিন রুটিনে নিজেকে বেঁধেছিলেন তিনি। অঙ্কে দুর্বল থাকার জন্য কলেজে ভরতি হতে পারেননি, কিন্তু অঙ্কচর্চা করার ছুতোয় সারাদিন লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রচুর গল্প-উপন্যাস পড়ে ফেলেছিলেন এ সময়। আগে গোরখপুরে বুদ্ধিলালের বইয়ের দোকানেও বসে বসে এরকম প্রচুর বই পড়েছিলেন।

১৮৯৯-এই তাঁর দারিদ্র্যদশার রীতিমতো রোমাঞ্চকর পরিবর্তন ঘটল, চুনারের এক মিশনারি স্কুলে আঠারো টাকা মাইনেতে শিক্ষক হলেন তিনি। সেখান থেকে পঁচিশ টাকায় বহ্‌রাইচ সরকারি জেলাস্কুলে। বদলি ও ট্রেনিং ইত্যাদির পর একেবারে প্রধান শিক্ষক হয়ে এলেন এলাহাবাদ মডেল স্কুলে, সেখান থেকে কানপুর গভর্নমেন্ট স্কুলে। এখানে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। উর্দু পত্রিকা *জমানা*-র সম্পাদক দয়ানারায়ণ নিগমের সঙ্গে এখানে তাঁর পরিচয় হল। এই পরিচয় প্রেমচন্দের পক্ষে নানাভাবে শুভদায়ক হয়েছিল। এর পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রেমচন্দের গল্প ও উপন্যাস লিখিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময়ে নবাব রায় ছদ্মনামেই লিখতেন। কানপুরে ছিলেন চার-পাঁচ বছরের মতো (১৯০৫-১৯০৯)। এই সময়েই প্রেমচন্দ বিয়ে করেন বালবিধবা শ্রীমতী শিবরানি দেবীকে (১৯০৬)। ফতেপুরের এক জমিদারের মেয়ে ছিলেন শিবরানি, তা সত্ত্বেও সে সময়ের পক্ষে এ-বিবাহ একটা রীতিমতো বৈপ্লবিক কাজ। ১৯০৭-এ প্রকাশিত হল প্রেমচন্দের প্রথম ছোটোগল্প—আমাদের এ-সংকলনের প্রথম গল্প—'দুনিয়া কা সব্‌সে আন্‌মোল রতন'। তাঁর প্রথম গল্পসংকলন *সোজ-এ-ওঅতন* (১৯০৮)-এর গল্পগুলির পাঁচটিই উর্দুতে লেখা। ১৯০৬-এ স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেকটার হয়েছিলেন, রাজসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে। কিন্তু দু-বছর পরে যখন *সোজ-এ-ওঅতন* বেরোল, সরকারি কর্মচারী হওয়ার দরুন সরকারের কানে কেউ পৌঁছে দিয়েছিল যে, শিক্ষক ধনপত রায়ই আসলে ছদ্মনামী লেখক নবাব রায়। কানপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এত্তে

লা পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন প্রেমচন্দ, এবং (সাহেবের মতে) ব্রিটিশবিরোধী, সরকারের প্রতি এক পেশে বিদ্বেষ-ছড়ানো গল্প লেখার জন্য বিস্তর বকুনি খেলেন সাহেবের কাছে। এবং শেষপর্যন্ত বন্ধু দয়ানারায়ণের পরামর্শে আর-একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন, যে-নামে এখন তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন—প্রেমচন্দ। তাঁর 'বড়ে ঘর কী বেটী' প্রেমচন্দ নামে প্রকাশিত প্রথম গল্প।

১৯০৬-এ ডেপুটি স্কুল ইন্‌স্পেকটার হয়ে মাহোবায়, মাহোবা থেকে বস্তি। এর মধ্যে পিতৃদত্ত ব্যাধি আমাশয় তাঁকে ভোগাচ্ছে। ১৯১৬-তে গোরখপুরে নর্মাল স্কুলের সহকারী শিক্ষক, ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ। এই বছরই এফ এ পাস করলেন, প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে। এখানে এসে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত উদ্‌বেগ একটু কমে, উর্দু থেকে হিন্দিতে আস্তে আস্তে কলমবদল করেন তিনি। এখানে থাকতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাস করেন প্রেমচন্দ (১৯১৯)।

এই সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন প্রেমচন্দকে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করে, আর সমাপতনের মতো জেলায় কালেকটারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও নীতিগত এক বিরোধ প্রেমচন্দকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়, যা তিনি দশ-বারো বছর ধরেই নেওয়ার চেষ্টা করে পারেননি, সংসারের দায়দায়িত্বের কথা ভেবে। সে-সিদ্ধান্ত সরকারি চাকরি ত্যাগের। ১৯২১-এ পদত্যাগ করলেন প্রেমচন্দ, স্ত্রী শিবরানি তাঁকে নৈতিক সমর্থন দিলেন। এবার ফিরে এলেন তাঁর প্রিয় শহর কানপুরে, মাড়োয়ারি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। কিন্তু এ-চাকরিও তাঁর সইল না। ফিরে এলেন কাশীতে। পত্রপত্রিকায় লিখে, কাশী বিদ্যাপীঠের বিদ্যালয় বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করে, একটি অপচয়মুখী ছাপাখানা (সরস্বতী প্রেস) বসিয়ে তাঁর সাহিত্যস্রষ্টার জীবনকে নানা দিক থেকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা খুব সফল হয়নি, তবু এরই মধ্যে আলোয়ারের মহারাজার মোটরগাড়ির কর্তৃত্বসহ চারশো টাকার চাকরির প্রস্তাবে অসম্মতি জানান।

১৯৩১ থেকে *জাগরণ* নামে পাক্ষিক পত্রিকার সাপ্তাহিক রূপ দেন তিনি, *হংস* নামে আর-একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। দুটিই তাঁকে আর্থিক ক্ষতি উপহার দেয়। এর কারণে তখনকার বোম্বাইয়ের অজন্তা সিনেটোন কোম্পানির সঙ্গো বার্ষিক আট হাজার টাকার চুক্তি করে চলচ্চিত্রের সংলাপলেখক হিসেবে তিনি বোম্বাই যান। তবে তাঁর গমন আর প্রত্যাগমনের মধ্যে ব্যবধান ছিল কয়েক মাসের, ১৯৩৪-এর মে মাসের শেষে পৌঁছে ফিরে আসেন ১৯৩৫-এর ৪ এপ্রিল। বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রজগৎ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ইতিবাচক বা লাভজনক কিছুই হয়নি। বঞ্চনা ও শোষণের নানা চেহারা তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ভারতের ওই মহানগরীর জীবনযাপনে।

এই সময় থেকেই খ্যাতি ও সম্মানের কারণে স্বভাবত গৃহকোণ-স্বচ্ছন্দ প্রেমচন্দের ব্যাপক টানাপোড়েন শুরু হয় দেশের নানা প্রান্তে। তাঁর শরীর এই ধকল সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। পেটের অসুখ গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়ে তাঁকে দুর্বলতর করে ফেলে, রক্তবমন ও রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয়। ১৯৩৬-এর জুনের শেষে সদ্যপ্রয়াত ম্যাক্সিম গোর্কির স্মরণসভায় যোগ দেওয়ার পর আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষে ৮ অক্টোবর সকাল সাতটায় সংজ্ঞাহীনতার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু এসে পৌঁছায়।

সংসার, জীবিকা, সাহিত্যকর্ম ও সম্পাদনা, রাজনীতি—তাঁর জীবনের এইসব বৃহৎ ভূমিগুলি থেকে তিনি বারবার বিচলিত হয়েছেন, তা তাঁর জীবনীর পাঠকমাত্রেই জানেন। তবু এর মধ্যে লেখা হয়ে যায় প্রায় এগারোটি উপন্যাস—*বরদান* (১৯০৪), *প্রেমা* (১৯০৭, পরে *প্রতিজ্ঞা* নামে এর সংশোধিত রূপ প্রকাশিত হয় ১৯২৯-এ), *সেবাসদন* (১৯১৮), *প্রেমাশ্রম* (১৯২২), *রঙ্গভূমি* (১৯২৫), *কায়াকল্প* (১৯২৬), *নির্মলা* (১৯২৮), *গবন* (১৯৩১), *কর্মভূমি* (১৯৩২), *গোদান* (১৯৩৬) এবং অসমাপ্ত *মঙ্গলসূত্র*। প্রকাশ করেন প্রায় তিনশো গল্প, যেগুলি গ্রন্থিত হয় *সোজ-এ-ওঅতন* থেকে আরম্ভ করে হিন্দি *সপ্ত-সরোজ* (১৯১৭) , *নও-নিধি* (১৯১৮), *বড়ে ঘর কী বেটী* (১৯২১), *প্রেম-পচীশী* (১৯২৩), *প্রেম-দ্বাদশী* (১৯২৪), *প্রেম-প্রসূন* (১৯২৫), *প্রেম-তীর্থ* (১৯২৯), *প্রেম-চতুর্থী* (১৯২৯), *পঞ্চ-ফুল* (১৯২৯), *অগ্নি-সমাধি* (১৯২৯), *সপ্ত-সুমন* (১৯৩০), *প্রেম-পঞ্চমী* (১৯৩০) ইত্যাদি অজস্র বইয়ে। প্রেমচন্দের মৃত্যুর পরে একই গল্প একাধিক সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। কখনও সংকলিত হয়েছে গ্রাম্য জীবনের গল্প, কখনও *জঙ্গল কী কহানিয়াঁ*, কখনও *নারী জীবন কী কহানিয়াঁ*। এখন *মান-সরোবর* নামে আট খণ্ডের বিপুল আধারে, দু-খণ্ড *গুপ্তধন*-এ, আর *কফন*-এ তাঁর প্রায় সমস্ত গল্প মুদ্রিত আকারে লভ্য। প্রবন্ধ, আলোচনা, অভিভাষণের সংখ্যাও প্রায় পাঁচশো। তার উপরে সরল ভাষায় রামায়ণের কাহিনি বলেছেন 'রামচর্চা' নাম দিয়ে। শেষে আমরা তাঁর রচনাবলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছি, তা দ্রষ্টব্য।

রচনাপ্রকাশের এই তালিকা থেকে প্রেমচন্দের মহত্ত্ব বোঝানো সম্ভব নয়। যে-কথা আমরা বরং খুব স্পষ্টতা আর জোরের সঙ্গে বলতে চাই তা হল, ভারতের জীবনের এত বৃহৎ ও এত গভীর ছবি আর কোনো লেখকের লেখায় নেই, তেমনই এই জীবনের শ্রেণি-অবস্থান, বঞ্চনা, শোষণ আর অত্যাচারের স্বরূপ, কারা কোন্ পক্ষে দাঁড়িয়ে অথচ কারা ভণ্ডামি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ ও পক্ষপাতকে আড়াল করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে— এসব প্রেমচন্দের প্রখর দৃষ্টি ও কলমে তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে। একেবারে প্রথম কয়েকটি গল্পে খানিকটা রোমান্সের আবেশ আছে, কিন্তু *সপ্ত-সরোজ* (১৯১৭)-এর গল্পগুলি, আর *সেবাসদন* উপন্যাসটি (১৯১৮) তাঁকে ভারতীয় বাস্তবের নির্মম ভূমিতে এনে দাঁড় করায়, এবং তারপর থেকেই চূড়ান্ত অনাসক্তিতে, কিন্তু বঞ্চিতের জন্য গভীর মানবিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি এই বাস্তবকে সকলের সামনে নিক্ষেপ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। কোথাও তাঁর দৃষ্টি বিচলিত হয় না, মধ্যবিত্ত, আত্মবৃত্তবদ্ধ পাঠকদের রেয়াত করার কথা তাঁর আদৌ মনে হয় না, উচ্চবিত্ত বঞ্চনাহীন এক ভারতের অলীক ছবি খাড়া করে পাঠককে স্বপ্নপ্রবঞ্চনা উপহার দিতে চান না তিনি। মনে হয় ভারতীয় জীবনের ধন ও দারিদ্র্য, ধর্ম ও অনৈতিকতা, পুরুষ ও নারী, উচ্চবর্ণ ও অচ্ছুতদের অধিকার ও জীবনপটের চূড়ান্ত বিরোধ তাঁর ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড এক ক্রোধের জন্ম দেয়, যে-ক্রোধ তাঁর রচনায় মৃদু ডিকেন্সীয় হাস্যের আড়াল থেকেও আগুনের আঁচের মতো আমাদের গায়ে এসে না লেগেই পারে না।

প্রথম থেকেই লক্ষ করি, প্রেমচন্দের অতি তীক্ষ্ণ এবং গভীর মানবিক দৃষ্টি একেবারে ঠিক ঠিক বুঝে নিয়েছে এই দেশে কারা সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ পীড়িত, বঞ্চিত, নিগৃহীত, আর

কারা সেই পীড়ন, বঞ্চনা আর নিগ্রহ সম্পাদন করে নিজেদের দৈহিক ও মানসিক বিলাসকে অব্যাহত রেখেছে। আর কাদের সচেতন ভণ্ডামি আর অজ্ঞতা, অচেতনতা বা বিভ্রান্তি এই ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে ও রাখতে সাহায্য করেছে। তাঁর অভিযোগের তির উঁচিয়ে থাকে সমাজের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের দিকে, যারা তথাকথিত নিম্নবর্ণ আর অচ্ছুতদের জন্তুজানোয়ারের বেশি সম্মান দেয় না। 'সদ্‌গতি'-র দুখি চামারের মৃতদেহকে যেভাবে পণ্ডিত ঘাসিরাম পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গ্রামের বাইরে আস্তাকুঁড়ে ফেলেছে তা বড়ো বেশি করে পশুর মৃতদেহ সম্বন্ধে আমাদের ব্যবস্থা-অবলম্বনের কথা মনে করায়। তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগের তির সংসারে পুরুষের দিকে, যে-পুরুষ নারীকে—সে মা হোক, স্ত্রী হোক, বোন হোক—সংসারের একটি বস্তুদায় এবং শিশুর জন্মদান ও পালন, ঘর-গোছানো আর খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের যন্ত্রমাত্র মনে করে। নারী কোথাও 'ব্যক্তি' নয়, তার কোনো আবেগ বা মতামতের মূল্য পুরুষের কাছে নেই, ফলে পুরুষের স্বার্থের জন্য তার উৎপীড়ন, ক্ষয় ও মৃত্যু যেন স্বাভাবিক এক ব্যবস্থা। *সেবা সদন*, *নির্মলা* বা *গোদান* উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে গল্পমালা 'বড়ো ঘরের মেয়ে', 'ভগবানের সং', 'বোঝাপড়া', 'মা', 'বলিদান', 'বুড়ি কাকি', 'শূদ্রা', 'জাতাবুড়ির কুয়ো', 'নতুন বিয়ে', 'মিস্ পদ্মা', 'পুত্রবতী বিধবা', 'তেঁতর', 'শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ'— কত নাম করব। শুধু মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের নয়, নারীর এই প্রথাগত অপমানিত অস্তিত্ব নিম্নবর্গ আর দারিদ্র্যের রসায়নে আরও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। সবাই অবশ্য মেনে নেয় না, আত্মহত্যার পথ বাছে না। কেউ কেউ বুখে দাঁড়ায় কুসুমের মতো, প্রেমচন্দ তাও দেখিয়েছেন।

উপরে আমরা প্রেমচন্দের রচনার বিষয়কে কয়েকটি প্রধান বিরোধের সূত্রে দেখবার চেষ্টা করেছি। এই বিরোধগুলি তাঁর চোখে পড়েছে ভারতের জনজীবনে, এবং বিরোধে তিনি মূলত যারা দুর্বলতর তাদেরই পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই পক্ষপাত কখনোই উদ্‌ঘোষণমূলক বা চিৎকারধর্মী নয়। কখনও শেষে একটি তির্যক মন্তব্যে তিনি বঞ্চনার মুখোশ খুলে দেন, আবার হয়তো কখনও সে-'মন্তব্য' একটু অতিরিক্ত মনে হয়, যেমন 'সদ্‌গতি'-র শেষে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমচন্দ কোনো মন্তব্য করেন না, কেবল ঘটনার পরম্পরা ধরে আখ্যান কোন্ অমোঘ অবস্থানে পৌঁছাল তা দেখিয়ে দেন। কিন্তু তা-ই যেন পাঠকের স্বস্তি ও বিশ্বাসভিত্তি হঠাৎ টলিয়ে দেয়।

প্রেমচন্দের রচনার তৃতীয় বিরোধ যা আমাদের চোখে পড়েছে তা ধর্মের ভিতর আর বাহির, লক্ষ্য আর আচরণের মধ্যে। ধর্মের ভড়ং আর আনুষ্ঠানিকতা কীভাবে শোষণের যন্ত্র হয়ে দরিদ্র জনজীবনকে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেয় তা প্রেমচন্দ লক্ষ করেন—'সদ্‌গতি' আর 'কফন' তারও মর্মান্তিক সূত্র তুলে ধরে। ধর্মের খাত বয়েই তৈরি হয় ব্রাহ্মণতন্ত্রের গগনচুম্বী মহিমা আর জল্লাদের পক্ষে যা লজ্জাকর সেই পৈশাচিক শক্তি। নারীর উপর অত্যাচারের বহু তত্ত্বও তৈরি হয় ধর্মের অধীনে। এই ধর্মই সৃষ্টি করে সমাজের পরগাছা গুরু-পুরুত বা মোটেরাম শাস্ত্রীদের (নিমন্ত্রণ) মতো জঞ্জাল।

অর্থাৎ এখানেই আমরা লক্ষ করি যে, এই 'বিরোধ'-গুলিকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখালেও সেগুলি একে অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, প্রত্যেকে অন্যকে প্রভাবিত করে। পুরো ভারতের ছবিতে তারা পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছন্দে মিশে থাকে।

১৮ ধন আর নিঃস্বতা প্রেমচন্দের বিশ্বে চতুর্থ বিরোধ হিসেবে আমরা আনছি, কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে এ একেবারে প্রথমে। তাই এ-বিরোধকেই আমাদের প্রথমে আনা উচিত ছিল। এই বিরোধের চিত্রণেই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে থাকেন ভারতবর্ষের দরিদ্র-জীবনের তন্নিষ্ঠ কথক প্রেমচন্দ। এক সমধর্মী লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুর বছরে তাঁরও মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুর এই আপতিক যোগ ছাড়াও দু-এর জীবনবীক্ষার মধ্যে যে গভীর নৈকট্য ছিল, তা অনেকেই লক্ষ করেছেন, এ নিয়ে একটি গ্রন্থও রচিত হয়েছে। গোর্কির ক্ষেত্রে একাধিক বিবর্তন লক্ষ করি আমরা। প্রেমচন্দের বিবর্তনও পরম্পরাযুক্ত এবং স্পষ্ট। একাধিক গল্পে গান্ধিবাদী ধরনের হৃদয়ের পরিবর্তনজনিত উপসংহার দেখান প্রেমচন্দ, 'সুভাগী'-তে যেমন, কিন্তু এইসব ইচ্ছাপূরক আখ্যানগুলি শোষণ, অত্যাচার আর দারুণ নিশ্চৈতন্যের ভারতীয় বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো মায়াজাল তৈরি করতে পারে না। 'সদ্গতি' বা 'কফন'-এর মতো গল্পে তা একেবারে বীভৎস নগ্নতায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। বোঝাই যায় যে 'কফন'-এর ঘিসু আর মাধব আর বুধিয়া সব একই অদৃশ্য বন্ধনের অংশীদার। বুধিয়া যে-কারণে মর্মান্তিক অবহেলায় মরে, ঘিসু আর মাধবকেও সমাজের মর্মান্তিক অবজ্ঞা আর অবহেলা ওই অর্ধমানবিক করে তৈরি করেছে। বাংলা সাহিত্যে প্রেমচন্দের পূর্ববর্তী বা সমকালীন বিখ্যাত লেখকদের লেখাতেও বঞ্চিত ও সর্বহারাদের ছবি আছে। কিন্তু আমার কাছে তা কিছুটা সরল ও আবেগসিক্ত বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ'-এর সঙ্গে তুলনা সহজেই এসে পড়ে। তা জীবনচিত্র হিসেবে অবশ্যই মর্মস্পর্শী। কিন্তু গফুর বা অভাগী চরিত্রের মধ্যে প্রেমচন্দের বহু চরিত্রের মতো জটিলতা নেই, শক্তিও নেই। বিশেষ করে ঘিসু আর মাধোর কথা মনে হয়। তাদের অসম্ভব বঞ্চনা যেন তাদের মধ্যে নিজেদের ধ্বংস করবারই এক আসুরিক শক্তি জাগিয়ে তোলে। শরৎচন্দ্রের গফুর তবু ফুলবেড়ের চটকলে যায়, অভাগী স্বপ্ন নিয়ে মরে। দুখি চামার, মাধো আর ঘিসুর পরিণাম এত স্বচ্ছন্দ নয়, তা লেখকের সহানুভূতিসিক্ত আবেগকে এত সহজে উচ্ছ্বসিত করে না। বরং প্রেমচন্দের ভিতরকার একটা চাপা ক্রোধ যেন গনগনে আঁচ ছড়াতে থাকে, তাঁর কলম কঠোর ও নির্মম হয়ে সত্যের নগ্ন চেহারাটা দেখিয়ে দিতে থাকে। সেখানে ঈশ্বরের বা পরলোকের কোনো ভূমিকা নেই, কোনো আশ্বাস নেই। শরৎচন্দ্র সমাজের কুশ্রীতা দেখাতে গিয়ে ব্যক্তিকে একটু সরল করে ফেলেন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রেমচন্দের দুটি দিকেই সমান নজর, ব্যক্তিও তাঁর হাতে বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। এই সব গল্প যখন পড়ি তখন আমাদের সাজিয়ে-দেওয়া ওই বিরোধগুলি সব একাকার হয়ে গিয়ে ভারতের দরিদ্র পৃথিবীর সবচেয়ে স্থায়ী, কুৎসিত ও মর্মান্তিক বাস্তবকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। এ-বাস্তব আজও কি আমূল বদলানো সম্ভব হয়েছে? 'বিমারু' রাজ্যগুলির অর্থাৎ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের বা অন্য অনেক প্রদেশের গ্রামের খবর তো এখন সবরকম মিডিয়াই আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট করে মেলে ধরে; আমরা কি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি যে হয়েছে? পারি না।

তাই অদৃষ্টবাদ আর গান্ধিবাদ-শাসিত অর্ধশতাব্দীর স্বাধীন ভারতের প্রায় অপরিবর্তিত শ্রেণি-বৈষম্যের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি গান্ধিবাদের ভিত্তি থেকে যাত্রা আরম্ভ হয় তাঁর, কিন্তু গান্ধিবাদ তাঁর সবটুকু অধিকার করতে পারে না। গান্ধি-আরউইন চুক্তি তাঁকে ক্ষুব্ধ

করে তোলে। এ ছাড়াও তিরিশের বছরগুলিতে বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের উপলক্ষ্যে যখন গান্ধিজি বলেন যে, তা হল ওখানকার মানুষের পাপের ফল, তখন সেই যুক্তিহীন কথার বিরুধে ক্ষুব্ধ প্রেমচন্দ প্রশ্ন তোলেন, ওখানকার সব লোকই কি পাপী ছিল? অন্য জায়গায় কি পাপী লোক নেই? সেখানে কেন ভূমিকম্প হয় না? তাঁর মৃত্যুর বছরে যেসব কথা বলেন তিনি, বিশেষত, মহাজনি সভ্যতা-র মতো প্রবন্ধে, তখন বুঝি তিনি মার্কসবাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মারাঠি লেখক টিকেকর-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে শুনি—'ম্যায় কম্যুনিস্ট হুঁ। কিন্তু, মেরা কম্যুনিজম কেবল য়হী হ্যায় কি হমারে দেশ মে জমীদার, সেঠ, আদি জো কৃষকোঁ কে শোষক হ্যায়, ন রহেঁ।' অসমাপ্ত *মঙ্গলসূত্র* উপন্যাসে প্রেমচন্দ তাঁর ওই উদারতন্ত্রী সাম্যবাদেরই পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলেন, কেন 'এক আদমী জিন্দগী ভর কড়ী সে কড়ী মিহনৎ করনে পর ভী ভুখোঁ মরতা হ্যায়, ঔর দুসরা আদমী হাথ পাঁও ন হিলানে পর ভী ফুলোঁ কী সেজ পর সোতা হ্যায়।'

এই প্রশ্ন যখন তুলছেন প্রেমচন্দ, তখনই, মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে, তাঁকে চলে যেতে হল। দীর্ঘায়ু পেলে ভারতবর্ষের সাহিত্যসংসার তিনি কীভাবে কতটা সমৃধ করতেন—দরিদ্র ভারতবর্ষ তাঁর সৃষ্টিতে আরও কতটা ব্যাপ্তি পেত—সে-প্রসঙ্গ এখন অবান্তর। আমরা যা পেয়েছি তা-ই কি সামান্য? প্রেমচন্দের গল্পে সামন্ততন্ত্র থেকে মহাজনি ভারতবর্ষ, গান্ধিবাদ থেকে বামপন্থার মধ্যে পরিবর্তমান মধ্যবিত্ত চেতনা যেমন ধরা দেয়, তেমনই গ্রামের জমিদার, জোতদার ও চাষি-গেরস্থ, খেতমজুর, দোকানি, ব্যবসায়ী, শহরের শিল্পপতি, ম্যানেজার, কারখানার শ্রমিক, ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ী আর দোকানদার, পেশাজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, দেশপ্রেমিক, বিশ্বাসঘাতক, পণ্ডিত, বৈদ্য ও হাকিমের দল—বিশেষ করে অচ্ছুত সমাজবর্জিত সর্বরিক্ত মানুষেরা অভাবনীয়রূপে জীবন্ত হয়ে বিরাজ করে। গ্রাম ও শহরে তাঁর যাতায়াত ঘটে, তবু গ্রামের ছবিটিই যেন একটু বেশি মমতা পায় তাঁর কাছে। তাঁর গল্পে বাণী, বক্তৃতা, উপদেশ যা আছে তা জীবনের ওই প্রত্যক্ষ স্পষ্ট তীব্র রূপকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। আর আছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল ডিকেন্সীয় বর্ণনাভঙ্গি, যার অভিঘাতে দুঃখের ছবি আরও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে।

এই সংকলনের গল্পগুলির অনুবাদ ও সম্পাদনার পধতিটি ছিল এইরকম : প্রথমে প্রেমচন্দের গল্পকার-জীবনের প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় আশিটির মতো গল্প নির্বাচন করলেন সম্পাদকেরা। এই নির্বাচনের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি যেমন আছে, তেমনই আছে প্রতি পর্বে তার সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পগুলি। অর্থাৎ গল্পকার প্রেমচন্দের ধারাবাহিক বিবর্তনের ছবিটি যাতে এই গল্পগুলিতে ফুটে ওঠে, সেই দিকে সম্পাদকদের লক্ষ্য ছিল, সেই সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার বিপুল বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির নানা ভাঁজ-বিভঙ্গও তুলে ধরার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। গল্পগুলি নির্বাচনের পর সেগুলি অনুবাদকদের হাতে দেওয়া হয়। অনুবাদকদের ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞানমাত্র যথেষ্ট ছিল না, তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে একই গল্পের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ নিয়ে। এমন দেখা গেছে যে, *মান-সরোবর* নামক বৃহৎ সংকলন—যাতে আপাতত প্রেমচন্দের প্রায় সমস্ত গল্পই সংকলিত, তার পাঠের সঙ্গে পৃথক গ্রন্থের পাঠে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। উর্দু-হিন্দির পাঠের অসংগতি তো আছেই—

অন্তত প্রথম দিককার বেশ কিছু গল্পের ক্ষেত্রে। সম্পাদকেরা প্রেমচন্দ-তনয় প্রখ্যাত লেখক অমৃত রায়ের পরামর্শে *মান-সরোবর* গ্রন্থমালাকেই মূলত অবলম্বন করেছেন অনুবাদের প্রাথমিক উৎস হিসাবে।

অনুবাদ জমা পড়বার পর একজন হিন্দিভাষী, একজন উর্দুভাষী এবং অন্তত একজন বঙ্গভাষী সম্পাদক প্রতিটি অনুবাদ পরীক্ষা করেছেন নিয়মিত বৈঠক করে। এখানেও মূলের ভাষাশৈলীর প্রতি আক্ষরিক আনুগত্য এবং বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ভঙ্গিমার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হয়েছে। সম্পাদকেরা দুয়ের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—প্রেমচন্দের নিজস্ব ভাষিক বিশিষ্টতা এবং বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ইডিয়ম। অনুবাদের সম্পাদনায় এ-দুয়ের সামঞ্জস্য বিধানে তাঁরা এবং অনুবাদকগোষ্ঠী কতটা সফল হয়েছেন তা সুধী পাঠকরা বিচার করবেন। সম্পাদকেরা একসঙ্গে প্রেমচন্দের এতগুলি গল্প বাঙালি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন বলে আনন্দিত ও কৃতার্থ। অন্য কোথাও এক খণ্ডে এতগুলি গল্প পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা আরও তিনটি গল্প যোগ করেছি।

আমরা এ-গল্পগুলিকে প্রকাশকালের ক্রম অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টা করেছি। তবে কয়েকটি গল্পের প্রকাশকাল অজ্ঞাত থাকায় কোথাও কোথাও এই ক্রম ভাঙতে হয়েছে।

প্রেমচন্দের মতো একজন লেখক সব দেশেই, সব সময়েই বিরল। বাঙালি পাঠকদের কাছে তাঁর রচনার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় তুলে ধরবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে-উদ্যোগ নিয়েছিল তার প্রথম পর্যায় হিসেবে এই গল্পসম্ভার বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হল। তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ আরও আনন্দের উপলক্ষ্য। এবারেও আশা করি, এই সংকলন বাঙালির ঘরে মহত্তম গ্রন্থগুলির পাশে তার স্বাভাবিক স্থান গ্রহণ করবে।

পবিত্র সরকার

সূচি

দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন

দিলফিগার এক কাঁটাভরা গাছের নীচে বসে তার জামার প্রান্ত ছিঁড়ে ঘোর কষ্টে চোখের জল ফেলছিল। সে হল সৌন্দর্যের দেবী সম্রাজ্ঞী দিলফরেবের সাচ্চা ও জীবনপণ-রাখা প্রেমিক। যারা সুগন্ধ মেখে ও জমকালো পোশাকে সেজে প্রেমিক হওয়ার দম্ভ দেখায়, সে সেরকম প্রেমিকদের একজন নয়। সাদাসিধে ভালোমানুষ সে—সেই প্রেমিকের মতো যারা বনেজঙ্গলে ও পাহাড়ে-পর্বতে মাথা খোঁড়ে ও ফরিয়াদ করে বেড়ায়। দিলফরেব তাকে বলেছিল, তুমি যদি সাচ্চা প্রেমিক হও, তাহলে যাও আমার জন্যে নিয়ে এসো দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু, নিয়ে দরবারে হাজির হও। তখন আমি তোমায় আমার গোলামের দলে ভর্তি করে নেব। যদি তুমি সেই বস্তু না পাও, তাহলে খবরদার আর এমুখো হোয়ো না, হলে তোমায় শূলে চড়াব। দিলফিগারকে এতটুকুও অবসর দেওয়া হল না তার মনের কথা বলার, অনুযোগ করার, প্রেমিকার সৌন্দর্য দর্শন করার। দিলফরেবের এই ফয়সালা শোনামাত্র তার চোপদাররা গরিব দিলফিগারকে ধাক্কা মেরে বের করে দিল। তাই আজ তিন দিন ধরে এই বিপন্ন লোকটি সেই ভয়ংকর মাঠে কাঁটাভরা গাছের নীচে বসে ভাবছে কী করা যায়। দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য জিনিস কি আমি পাব? অসম্ভব। আর এই জিনিসটিই বা কী? কারও রত্নভান্ডার? অমৃত? খুসরৌর রাজমুকুট? জামেজম? তখতে তাউস? পরভেজের সম্পত্তি? না এগুলো কিছুতেই নয়। দুনিয়াতে অবশ্যই এগুলোর চেয়ে দামি, এগুলোর চেয়ে অমূল্য জিনিস আছে। কিন্তু সে বস্তুটি কী? কোথায়, কী করে পাওয়া যাবে? হে খোদা, আমার মুশকিল কী করে আসান হবে?

দিলফিগারের মাথায় এই এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

মুনির পেয়েছিলেন শামি হাতিমের মতো সাহায্যকারী। হায়! আমিও যদি কারও সহায়তা পেতাম! হায়! আমায় যদি কেউ বলে দিত দুনিয়ার অমূল্য বস্তুর নামটা কী। সেই বস্তু হাতে না পেলেও যদি জানতে পারতাম সেই বস্তুটি কী। আমি কলসির মতো বড়ো মুক্তোর সন্ধানে যেতে পারি। আমি সমুদ্রের গান, পাথরের হৃদয়, মৃত্যুর শব্দ এবং এগুলোর চেয়েও বেনিশার বস্তুর সন্ধানে কোমর বেঁধে লাগতে পারি। কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন। এ বস্তু আমার কল্পনার বহু ঊর্ধ্বে।

আসমানে একটি-দুটি তারা দেখা দিচ্ছে। দিলফিগার হঠাৎ খোদার নাম করে উঠে দাঁড়াল, একটা দিক লক্ষ করে পা চালিয়ে দিল। অভুক্ত, পিপাসার্ত, নগ্নগাত্র, ক্লান্ত দেহে সে বছরের পর

বছর বনে-জঙ্গলে ও শহরে-গ্রামে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াল। পায়ের পাতা কাঁটায় ঝাঁঝরা হয়ে গেল। শরীর কংকালসার হয়ে গেল। কিন্তু দুনিয়ার সেই যে সবচেয়ে অমূল্য জিনিস, তার কোনো হদিস কোথাও পেল না সে।

একদিন সে পথ হারিয়ে এক মাঠে গিয়ে পড়ল। সেখানে হাজার হাজার লোক দল বেঁধে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। মাঝখানে কয়েকজন পাগড়ি ও চোগাচাপকান-পরা দাড়িওয়ালা কাজি অফিসারদের রোয়াকে বসে নিজেদের মধ্যে কিছু শলাপরামর্শ করছে। এই ভিড় থেকে কিছু দূরে একটা শূল খাড়া করা রয়েছে। দিলফিগার খানিকটা দুর্বলতার জন্য ও খানিকটা কৌতূহলবশত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখল, উন্মুক্ত তরবারি হাতে কয়েকজন হাতেপায়ে শেকল বাঁধা একজন কয়েদিকে ধরে আনছে। শূলের কাছে পৌঁছে সেপাইরা থামল, কয়েদির হাতকড়া ও পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হল। এই অমানুষটার হাত শত শত নিরপরাধের রক্তে রঞ্জিত। উপকার ও দয়া কাকে বলে তার হৃদয় আদৌ শেখেনি। লোকটার নাম কালা চোর। সেপাইরা তাকে শূলের তক্তায় দাঁড় করিয়ে দিল। তার গলায় মৃত্যুর ফাঁস পরিয়ে জল্লাদেরা যেই তক্তা টেনে নিতে যাবে সেই মুহূর্তে হতভাগা অপরাধীটা চিৎকার করে বলল, খোদার দোহাই, আমাকে এক লহমার জন্য ফাঁসিকাঠ থেকে নামিয়ে দাও, আমি আমার মনের শেষ সাধ মিটিয়ে নিতে চাই। একথা শুনে চারিদিকে স্তব্ধতা নেমে এল। লোকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। কাজি ভাবল, ফাঁসির আসামির শেষভিক্ষা অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। হতভাগ্য কালা চোরকে কিছুক্ষণের জন্য ফাঁসিকাঠ থেকে নামিয়ে দেওয়া হল।

এই ভিড়ের মধ্যে একটি ভদ্র ও সুন্দর মুখশ্রীর শিশু ছড়িতে চেপে লাফিয়ে লাফিয়ে তার ঘোড়া ছুটিয়ে চলছিল। তার জগতে সে এতই মগ্ন ছিল যে, ভাবছিল যেন এই মুহূর্তে সে কোনো আরবি ঘোড়ায় চেপে চলেছে। তার চেহারা সেই নির্মল আনন্দে পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। সে আনন্দ অল্প ক-দিনের জন্য শৈশবে মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তার স্মৃতি আমরা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারি না। তার হৃদয়কে এখন পর্যন্ত স্পর্শ করেনি পাপের কালিমা। সে যেন প্রশান্তির কোলে ক্রীড়ারত এক শিশু।

হতভাগ্য কালা চোর ফাঁসিকাঠ থেকে নামল। হাজার হাজার চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। সে ছেলেটির কাছে এল, কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল তাকে। কবে সে নিজে এই রকম শান্তশিষ্ট হাসিখুশি ছিল, ছিল দুনিয়ার কদর্যতার স্পর্শ থেকে মুক্ত, সেই সব দিনের কথা তার মনে পড়ল। মা তাকে কোলে করে খাওয়াতেন, পিতার বুক আনন্দে ভরে উঠত তার মুখ চেয়ে। সারা পরিবার তার জন্য যে কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত ছিল। আঃ! অতীতের দিনগুলির স্মৃতিতে ছেয়ে গেল কালা চোরের মন, তার চোখ থেকে— যে চোখ মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাতর ছটফটানিতেও একবার পলক ফেলত না— এক বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল।

দিলফিগার এগিয়ে গিয়ে সেই অমূল্য অশ্রুর মুক্তোকে নিজের হাতে তুলে নিল। তার হৃদয় বলে উঠল—নিঃসন্দেহে এই হল দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন যার জন্য ময়ূর সিংহাসন, জামেজম, আব-এ-হায়াত ও পরভেজের ধনদৌলত বিসর্জন দেওয়া সম্ভব।

এই ভেবে খুশিমনে সাফল্যের আশায় মত্ত দিলফিগার প্রেমিকা দিলফরেবের শহর মনোসবাদ-এর দিকে রওনা হল। কিন্তু যতই সে লক্ষ্যস্থলের কাছে যায়, ততই তার মনে হতাশা জাগে। জাগে

এই ভেবে যে, যে বস্তুকে আমি দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রতন মনে করেছি দিলফরেব যদি তার কদর না বোঝে, তাহলে নির্ঘাত আমার ফাঁসি হবে। আমার আশার জলাঞ্জলি হবে। তা যা হওয়ার হোক। এই আমার ভাগ্যপরীক্ষা। পাহাড় ও সমুদ্র পার হয়ে শেষে সে মনোসবাদ শহরে এসে পৌঁছাল, প্রেমিকার দেউড়িতে গিয়ে জানাল যে, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দিলফিগার খোদার ফজলে দিলফরেবের হুকুম তামিল করে ফিরে এসেছে। সে তার পদযুগল চুম্বন করতে চায়। দিলফরেব তৎক্ষণাৎ তাকে সামনে ডেকে পাঠাল। সোনালি পরদার আড়াল থেকে ফরমাশ করল, সেই অমূল্য রতন হাজির কর দেখি। দিলফিগার আশা ও ভয়ের এক বিচিত্র দ্বিধার মধ্যে অশ্রুবিন্দু তার সামনে ধরল। বেশ বলিষ্ঠ ভাষায় বলে গেল তার পূর্ণ বৃত্তান্ত।

দিলফরেব কাহিনির সমস্তটা মন দিয়ে শুনল। আর সেই উপহার হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ মন দিয়ে দেখার পর বলল—দিলফিগার, নিঃসন্দেহে তুমি দুনিয়ার এক অতি মূল্যবান জিনিস খুঁজে বের করেছ। তোমার হিম্মত ও বুদ্ধির তারিফ করি। কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু এ নয়। তুমি আবার বেরিয়ে পড়ো, আবার চেষ্টায় লাগো। হয়তো এবার তুমি ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাবে। তখন তোমার ভাগ্যে আমার গোলামি জুটবে। আমি আগে বলেছিলাম, আমি তোমায় শূলে চড়াব, কিন্তু এখন তোমার প্রাণভিক্ষা দিচ্ছি। দিচ্ছি এই জন্য যে, আমি আমার প্রেমিকের মধ্যে যে গুণ দেখতে চাই তোমার মধ্যে সেই গুণ লক্ষ করছি। আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয়ই কোনো না কোনোদিন সফল হবে।

ব্যর্থ ও ভগ্নমনোরথ দিলফিগার প্রেমিকার এই মেহেরবানিতে একটু সাহস পেয়ে বলল—হে হৃদয়েশ্বরী, বহুদিন পরে তোমার দেউড়িতে সিজদা করার সৌভাগ্য হল। খোদা জানেন আবার কবে এমন দিন আসবে। তোমার জন্য প্রাণপাত করছে যে প্রেমিক, তার দুর্দশা দেখে তুমি কি দয়া করবে না? নিজের রূপের এক ঝলক দেখিয়ে এই পুড়ে-মরতে-থাকা দিলফিগারকে ভবিষ্যতের কষ্ট সহ্য করার শক্তি জোগাবে না? তোমার একটি মদির দৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে যে কাজ আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি সেই কাজ আমি নিশ্চয়ই করতে পারব।

দিলফরেব প্রেমিকের এই বাসনা-ভরা কথা শুনে রেগে উঠল। হুকুম দিল, এই দিওয়ানাটাকে এখুনি দরবার থেকে বার করে দাও। চৌকিদার তক্ষুনি বেচারা দিলফিগারকে ধাক্কা দিয়ে প্রেমিকার গলি থেকে বার করে দিল।

দিলফিগার তার প্রেমিকার হৃদয়হীন অকরুণ ব্যবহারে কিছুক্ষণ অশ্রুপাত করল। তারপর ভাবতে লাগল কোথায় যাওয়া যায়। বহুকাল এদিক-সেদিক, বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর পর অশ্রুর সেই বিন্দু সে পেয়েছিল। এখন কী এমন মূল্যবান জিনিস সে পাবে যার দাম এর চেয়েও বেশি? হজরত খিজির। তুমি সেকেন্দারকে আব-এ-হায়াত কূপের পথ দেখিয়েছিলে, আমার উপর তোমর করুণা হবে না? সেকেন্দার ছিল সারা দুনিয়ার অধিপতি। আর আমি তো ঘর-হারানো মুসাফির। তুমি অনেক ডুবন্ত তরিকে কিনারায় এনে তুলেছ, এই গরিবকে পার করো, হে মহামহিম জিবরাইল। তুমিই এই মৃতপ্রায়, দুখি প্রেমিকের ওপর সদয় হও। তুমি খোদার বিশেষ অনুচর, আমার মুশকিল আসান করবে না তুমি? এভাবে দিলফিগার অনেক কাকুতিমিনতি করল। তবে মোদ্দা কথা এই দাঁড়াল যে, তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। শেষে হতাশ হয়ে পাগলের মতো আবার একদিকে বেরিয়ে পড়ল সে।

দিলফিগার পুব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত কত কত বনজঙ্গল ও জনবসতিহীন জায়গায় ঘুরল। কখনও ঘুমিয়ে পড়েছে ঢাকা পাহাড়চুড়ায়, কখনও ঘুরে বেরিয়েছে উপত্যকায়। কিন্তু যে জিনিসের জন্য সে পাগল তার সন্ধান কোথায়? তার শরীর গেল অস্থিচর্মসার হয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে এক নদীর তীরে দুঃখিত চিত্তে পড়ে ছিল। চেতনা ফিরে আসার পর চমকে উঠে দেখল, চন্দনের এক চিতা তৈরি করা রয়েছে আর এক যুবতি বিয়ের জোড় পরে সেজেগুজে তার উপর বসে আছে। তার হাঁটুর উপর তার প্রিয় স্বামীর মাথা শোয়ানো। হাজার হাজার লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, তার উপর পুষ্প বর্ষণ করছে। হঠাৎ চিতায় জ্বলে উঠল স্বতঃস্ফূর্ত এক শিখা, সতীর চেহারা মুহূর্তে এক পবিত্র ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চিতাগ্নির পবিত্র শিখাগুলি তার গলা জড়িয়ে ধরল ও পলকে সেই ফুলের মতো কোমল শরীর অঙ্গারস্তূপে পরিণত হল। প্রেমিকা প্রেমিকের জন্য আত্মোৎসর্গ করল, দুটি মানব-মানবীর সত্য, পবিত্র, অমর প্রেমের শেষ লীলা তার দৃষ্টিথেকে মুছে গেল। সকলে বাড়ি ফিরে গেল। দিলফিগার নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, তার ছেঁড়া জামার আঁচলে তুলে নিল সেই ছাই। ভাবল, এই একমুঠো ভস্মই তো দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য রত্ন। সাফল্যের নেশায় বুঁদ হয়ে আবার রওনা হল প্রেমিকার উদ্দেশে। এবার গন্তব্যস্থল যতই কাছে এগিয়ে আসে, তার সাহস ততই বেড়ে চলে। তার অন্তরাত্মা বলে—এবার তোমার জিত হবে। তার এই সময়কার মনের অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শেষে সে এসে পৌঁছাল মনোসবাদ শহরে। দিলফরেবের উঁচু দেউড়িতে এসে খবর দিল, দিলফিগার সফল হয়ে ফিরে এসেছে। সে গৃহকর্ত্রীর সামনে উপস্থিত হতে চায়। দিলফরেব দুঃসাহসী প্রেমিককে দরবারে ডেকে পাঠাল তৎক্ষণাৎ। দুনিয়ার সেই অমূল্য রতনের জন্য হাত পাতল সে। তখন দিলফিগার সাহস করে তার রজতশুভ্র মণিবন্ধ চুম্বন করল এবং একমুঠো ভস্ম তার হাতে ঢেলে দিল। তারপর সে সমগ্র কাহিনি হৃদয়দ্রাবক ভাষায় বলে গেল। এবার সুন্দরী প্রেমিকার মুখে আপন ভাগ্যে অনুকূল রায় শোনার অপেক্ষা মাত্র। দিলফরেব সেই একমুঠো ছাই তার চোখে ছোঁয়াল। কিছুক্ষণ চিন্তার সাগরে ডুবে রইল সে। তারপর বলল—হে আমার প্রাণতুচ্ছকরা প্রেমিক দিলফিগার, তুমি যে ভস্ম এনেছ তা স্পর্শমণির চেয়ে কম মূল্যবান নয়। এ দুনিয়ার খুবই অমূল্য জিনিস। এ অমূল্য উপহারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। কিন্তু দুনিয়ায় এর চেয়েও অমূল্য কোনো বস্তু কি নেই? যাও, তার খোঁজ করো, তারপর আমার কাছে এসো, আমি অন্তর দিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি খোদা যেন তোমার সন্ধান সফল করেন। এই কথা বলে সে সোনালি পরদার বাইরে এসে প্রেমিকার রমণীয় ভঙ্গিমায় তার রূপের ছবি দেখিয়ে আবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। দিলফিগারের মাথা তখনও ঘুরছে, এমন সময় চোপদার আলতোভাবে তার হাত ধরে তাকে প্রেমিকার গৃহ থেকে বার করে দিল। এই তৃতীয়বার প্রেমের সেই পূজারি নিরাশার অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকল। দিলফিগার আর তার সাহস খুঁজে পায় না। তার বিশ্বাস জন্মাল, সে পৃথিবীতে জন্মেছে এই নিষ্ফল হতাশ্বাস মৃত্যুর জন্যেই। এখন কি তাহলে পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়বে? প্রেমিকার অসহ্য জুলুমের বিষয়ে অভিযোগ করার জন্য আমার একটি হাড়ও যেন আস্ত না থাকে। দিওয়ানার মতো উঠে দাঁড়াল সে, পড়িমরি করে এক গগনচুম্বী পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছাল। অন্য কোনো সময় এমন উঁচু পাহাড়ে ওঠার সাহস তার হতই না। কিন্তু এখন প্রাণ দেওয়ার উৎসাহে পাহাড় তার কাছে এক সাধারণ

টিলার মতোই ছোট্ট মনে হল। যেই সে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে যাবে এমন সময় সবুজ পোশাক-পরা সবুজ পাগড়ি-বাঁধা এক বৃদ্ধ—তাঁর এক হাতে জপমালা, অন্য হাতে লাঠি—হঠাৎ আবির্ভূত হলেন। হাত তুলে থামালেন তাকে। তারপর সাহস দেওয়ার স্বরে বললেন—দিলফিগার,ওরে নির্বোধ,কাপুরুষের মতো এ কী করতে চলেছিস? তুই নিজেকে প্রেমিক বলে দাবি করিস, অথচ জানিস না যে প্রেমের পথের প্রথম ধাপ হল প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। মরদ হ তো বাছা, এভাবে সাহস হারাস না। পুবে একটা দেশ আছে, যার নাম হিন্দুস্তান, সেখানে যা। তোর বাসনা পূরণ হবে।

এই কথা বলে হজরত খিজির মিলিয়ে গেলেন। দিলফিগার এবার শুকরিয়ার (ধন্যবাদের) নমাজ পড়তে বসল। আবার সে নতুন উৎসাহে টাটকা প্রেরণায়— সেই সঙ্গে অলৌকিক সাহায্যের ভরসা পেয়ে—খুশিমনে পাহাড় থেকে নেমে এসে হিন্দুস্তানের দিকে রওনা হল।

কতদিন ধরে কাঁটা-ভরা জঙ্গলে, আগুন-ঝরা মরুভূমিতে হেঁটেছে সে। কঠিন উপত্যকা ও অলঙ্ঘ্য পর্বত হয়ে শেষে সে ভারতের পবিত্র জমিতে এসে হাজির হল। শীতল জলের ঝরনায় যাত্রার দুঃখকষ্ট মুছে গেল তার। তারপর ক্লান্তিতে নদীর তীরে শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যার দিকে সে এক তৃণবৃক্ষহীন ময়দানে গিয়ে পৌঁছাল। দেখল অসংখ্য আধমরা ও প্রাণহীন মানুষের দেহ বিনা কবরে পড়ে আছে। মরে পড়ে আছে কত চিল, কাক ও নানা হিংস্র পশু। সারা মাঠ রক্তেলাল। দিলফিগারের হৃদয় কেঁপে উঠল এই ভয়ংকর দৃশ্যে। হায় খোদা, কী বিপদেই না পড়লাম।

মৃত্যুপথযাত্রীদের কাতরানি, কান্না ও ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, হিংস্র পশুগুলির ভাঙা হাড়গোড় ও মাংসপিণ্ড নিয়ে পালানো, এমন বীভৎস হৃদয়বিদারক দৃশ্য দিলফিগার এর আগে কখনো দেখেনি। হঠাৎ সে বুঝতে পারল, এ নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্র। আর এই মৃতদেহ সব বীর সৈনিকদের। এই সময় কাছেই কাতরানি শুনতে পেল সে। দিলফিগার সেদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, এক দীর্ঘদেহী মানুষ যার বীরত্বপূর্ণ চেহারায় আসন্ন মৃত্যুর বিবর্ণতা স্পর্শ করেছে, মাটিতে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন। বক্ষঃস্থল থেকে ধারাস্রোতে রক্ত পড়ছে কিন্তু ধারালো তরবারিখানি তার মুষ্টি থেকে চ্যুত হয়নি।

দিলফিগার একখানি ন্যাকড়া দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল, যাতে রক্ত পড়া থামে। জিজ্ঞেস করল—হে সৈনিক, আপনি কে? শুনে মানুষটি চোখ খুললেন ও বীরের মতো বললেন—তুমি কি জান না আমি কে, তুমি কি আজ এই তরবারি চালনা দেখনি? আমি আমার মায়ের সন্তান ও ভারতের সুপুত্র। এই কথা বলতে বলতে তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল, বিবর্ণ মুখ ক্রোধে লাল হয়ে গেল। তাঁর শাণিত তরবারি যেন শত্রু নিধনের আশায় জ্বলজ্বল করে উঠল। দিলফিগার বুঝতে পারল, মানুষটি এই মুহূর্তে তাকে তাঁর শত্রু মনে করছে। সে মৃদু কণ্ঠে বলল—হে বীর, আমি আপনার শত্রু নই। আমি এক দরিদ্র মুসাফির, নিজের দেশ ছেড়ে এসেছি। পথভুলে এদিকে চলে এসেছি। মেহেরবানি করে এখানকার কথা একটু বুঝিয়ে বলুন।

একথা শুনে সেই আহত সৈনিক খুব মধুর কণ্ঠে বললেন—যদি তুমি মুসাফির হও, তাহলে এসে বসো, আমার রক্তে ভেজা পাঁজরাই তোমার আসন হোক। এই দুই আঙুল জমি আমার জন্যে বাকি থেকে গিয়েছে। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কেউ এ জমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। আপশোশের কথা কি জানো? তুমি এখানে এমন সময়ে এসেছ যখন তোমার আদর-যত্ন করার অবস্থা আমাদের নেই আর। আমাদের পিতৃপুরুষের দেশ আজ হারালাম আমরা। এখন দেশ

বলতে কিছু নেই আমাদের। কিন্তু (পাশ ফিরে বলতে লাগলেন) আমরা আক্রমণকারী শত্রুকে দেখিয়ে দিয়েছি রাজপুতরা কেমন বীর, কেমন অনায়াসে তারা নিজের দেশের জন্য বীরত্বের সঙ্গে প্রাণ দিতে পারে। এই আশেপাশে তুমি যে লাশগুলি দেখছ এগুলি হল যাদের এই তরবারি দিয়ে যমলোকে পাঠিয়েছি (স্মিত হেসে) তাদের। আমার দেশ শত্রুর হাতে এখন, কিন্তু আমার আনন্দ এই যে আমি শত্রুর জমিতে প্রাণত্যাগ করছি। (বুকের আঘাতস্থল থেকে ন্যাকড়া বের করে) তুমি কি ন্যাকড়াতে মলম লাগিয়ে দিয়েছ? কেন? রক্ত বার হতে দাও, থামিয়ে কী লাভ? আমি কি নিজের দেশেই গোলামি করার জন্য বেঁচে থাকব? না, এমন জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। এর চেয়ে ভালো মৃত্যু কী আছে বলতে পার মুসাফির?

বীরপুরুষের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল, শরীর শিথিল হয়ে পড়ল। এত বেশি রক্ত পড়ল যে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে একটি বিন্দু ঝরে পড়ছে। শেষে দেহে আর কোনো সাড় রইল না, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল, বীর সৈনিকের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। দিলফিগার ভাবল, বীরপুরুষের দেহে আর প্রাণ নেই। এমন সময় সেই মৃত্যুপথযাত্রী মৃদু স্বরে বলে উঠলেন— ভারতমাতার জয় হোক। এর সঙ্গে তার বুক থেকে রক্তের শেষ বিন্দু ঝরে পড়ল। এক সাচ্চা দেশপ্রেমী ও দেশভক্ত দেশভক্তির কাজ সম্পূর্ণ করল। এই দৃশ্যে অভিভূত হয়ে গেল দিলফিগার। তার প্রাণ বলে উঠল, অসম্ভব। এই রক্তবিন্দুর চেয়ে দামি জগতে অন্য কোনো বস্তুই হতে পারে না। সে তক্ষুনি রক্তের সেই বিন্দু হাতে তুলে নিল এবং সেই রাজপুতের বীরত্বে মুগ্ধ অবস্থায় নিজ দেশের উদ্দেশে রওনা হল। পথে কত কষ্ট স্বীকার করল সে, শেষকালে সে সমৃদ্ধ ও সফল হয়ে ফিরে এসেছে। সে দরবারে হাজির হতে চায়। দিলফরেবও তাকে সেই মুহূর্তে হাজির হওয়ার হুকুম দিল। যথারীতি পরদার আড়াল থেকে বলল— দিলফিগার, এবার তুমি অনেক দিন পরে ফিরে এসেছ। দাও, দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু কী এনেছ।

দিলফিগার মেহেদি-রাঙা হাতের চেটোয় চুম্বন করে রক্তের সেই বিন্দু তার ওপর রেখে দিয়ে পুরো কাহিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বলে শোনাল। যখন বলা শেষ হল তখুনি হঠাৎ সরে গেল সোনালি পরদা। দিলফিগারের সামনে সৌন্দর্যের সাজানো দরবার আবির্ভূত হল। সেখানে প্রত্যেকটি সুন্দরী জুলেখার চেয়েও সুন্দর। তার মধ্যে সেনালি মসনদের সৌন্দর্য ম্লান করে তার উপর বসে আছে দিলফরেব। যৌবনের এই মায়াপুরী দেখে দিলফিগার চমৎকৃত ও স্তব্ধ হয়ে ছবির মতো নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। দিলফরেব মসনদ থেকে উঠে দাঁড়াল, কয়েক পা এগিয়ে তাকে দু হাতে আলিঙ্গন করল। গায়িকারা গান ধরল আনন্দে। দরবারিরা দিলফিগারকে প্রণতি জানাল। চাঁদ-সূর্যের চেয়ে মহত্তর সম্মান দেখিয়ে তাকে মসনদে বসিয়ে দিল। গানের মোহনধ্বনি স্তব্ধ হলে দিলফরেব উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে দিলফিগারকে বলল— হে জাঁনিসাব প্রেমিক দিলফিগার, আমার অনুরাগ গ্রহণ করো। খোদা আমার প্রার্থনা শুনেছেন। তিনি তোমায় সফল ও ঐশ্বর্যবান করেছেন। আজ থেকে তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার অধীনা সেবিকা।

এই বলে একটি রত্নখচিত মঞ্জুষা আনিয়ে তার থেকে একটি ফলক বার করল। তাতে লেখা ছিল—'রক্তের যে শেষ বিন্দু দেশরক্ষার জন্য ক্ষয়িত হয় সেই হল দুনিয়ার সবচেয়ে অমূল্য বস্তু।'

(দুনিয়া কা সবসে অনমোল রতন/১৯০৭) অনুবাদ মহাদেবপ্রসাদ সাহা

বড়ো ঘরের মেয়ে

বেণীমাধব সিংহ গৌরীপুর গ্রামের জমিদার। তাঁর পিতামহ কোনো এককালে বেশ বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামের ঘাট বাঁধানো সব দিঘি আর মন্দির, যেগুলি এখন মেরামত করাও দুঃসাধ্য, সেসব তাঁরই কীর্তি। লোকে বলে তাঁর দরজায় নাকি হাতি বাঁধা থাকত। আজ সে জায়গায় একটি বুড়ো মোষ বাঁধা, শরীরে যার ক-খানা হাড়-পাঁজর ছাড়া কিছুই বাকি নেই। তবে দুধটা বোধ হয় খুব দেয়, কারণ কেউ না কেউ একটা পাত্র নিয়ে চৌপর দিন ওর সঙ্গে লেগে থাকে। বেণীমাধব সিংহ তাঁর অর্ধেকের উপর সম্পত্তি উকিলদের চরণে উৎসর্গ করে বসে আছেন। বর্তমানে তাঁর বার্ষিক আয় এক হাজারের বেশি নয়। জমিদার মশাইয়ের দুই ছেলে। বড়োটির নাম শ্রীকণ্ঠ সিংহ। অনেকদিনের পরিশ্রম আর চেষ্টাচরিত্রের পর সে বিএ ডিগ্রি লাভ করেছে। একটি অফিসে এখন চাকরি করে। ছোটো ছেলে লালবিহারী সিংহ—দোহারা চেহারার শৌখিন যুবক। ভরাট মুখ, চওড়া বুক। মোষের টাটকা দুধ দুসেরটাক সে সকালে ঘুম থেকে উঠে খেয়ে থাকে। দাদা শ্রীকণ্ঠ সিংহের অবস্থাটা ঠিক একেবারে উলটো। এসব চোখে লাগার মতো গুণাবলিকে সে বিএ—এ দুটি অক্ষরের পায়ে উৎসর্গ করে দিয়েছে। এই অক্ষর দুটি তার দেহটিকে দুর্বল, মুখমণ্ডলকে শ্রীহীন করে দিয়েছে। কবিরাজি শাস্ত্রে তাই তার বিশেষ রুচি। আয়ুর্বেদিক ওষুধে তার বেশি আস্থা। সকাল সন্ধেয় তার ঘর থেকে খলনুড়ির সুরেলা ও মধুর শব্দ প্রায়ই শোনা যায়। লাহোর আর কলকাতার বৈদ্যদের সঙ্গে তার খুব চিঠি লেখালেখি চলে।

ইংরেজি ডিগ্রিটির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজদের সামাজিক প্রথাগুলোর প্রতি শ্রীকণ্ঠ সিংহ মোটেই অনুরক্ত নয়। বরং প্রায়ই সে খুব জোরগলায় সেসবের নিন্দা করে ও ধিক্কার দিয়ে থাকে। এজন্যই গাঁয়ে তার খুব সম্মান। দশহরার সময় সে খুব উৎসাহ নিয়ে রামলীলায় অংশগ্রহণ করে, নিজে কোনো না কোনো চরিত্রে পার্ট নিয়ে থাকে। সেই ছিল গৌরীপুরের রামলীলার জন্মদাতা। সনাতন হিন্দু সভ্যতার গুণগান করা তার ধর্মনিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ। একান্নবর্তী পরিবারের তো সে ছিল একমাত্র উপাসক। আজকাল যৌথ পরিবারে মিলেমিশে থাকতে মেয়েদের যে অরুচি তাকে সে জাতি এবং দেশ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর বলে মনে করত। এজন্যই গ্রাম্যললনারা তার সমালোচনা করত। কেউ কেউ তো তাকে তাদের শত্রু বলে ভাবতেও সংকোচ বোধ করত না। তার নিজেরই পত্নীর সঙ্গে এ ব্যাপারে তার মতান্তর ছিল। তার কারণ এ নয় যে, মেয়েটি তার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর কিংবা ভাসুরকে ঘৃণা করত; বরং তার সিদ্ধান্ত হল অনেক কিছু সহ্য করার, অনেক কিছু গায়ে না মাখবার পরেও যদি সংসারে আর সবার সঙ্গে বনিবনা না হয়, তাহলে রোজকার খিটিমিটিতে জীবনটাকে নষ্ট করার চাইতে নিজের হাঁড়ি আলাদা করে নেওয়াই ভালো।

আনন্দী বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তার বাবা ছিলেন ছোটোখাটো এক তালুকদার। বিরাট বাড়ি, একটি হাতি, তিনটি কুকুর, বাজপাখি, শিকরে পাখি, ঝাড়লণ্ঠন, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ আর ধারদেনা ইত্যাদি যা কিছু একজন প্রতিষ্ঠাবান তালুকদারের ভোগ করার কথা তা সবই তাঁর ছিল। নাম ভূপ সিংহ। বড়ো উদারহৃদয়, প্রতিভাশালী পুরুষ। তবে দুর্ভাগ্যবশত ছেলে নেই একটিও। সাত-সাতটি মেয়ে হয়েছিল আর ভগবৎকৃপায় সব কটিই বেঁচেবর্তে রয়েছে। প্রথমে উৎসাহের বশে তো তিনি প্রাণ খুলে তিনটির বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন পনেরো-বিশ হাজার টাকা দেনা ঘাড়ে চাপল, তখন হুঁশ হল, হাত গুটিয়ে নিলেন। আনন্দী তাঁর চতুর্থ কন্যা। রূপে, গুণে বোনেদের সকলের সেরা ছিল সে। তাই তালুকদার ভূপ সিংহ তাকে খুব ভালোবাসতেন। প্রায়ই এমন ঘটে যে, সুন্দর সন্তানই তার মা-বাবার ভালোবাসা বেশি পায়। আনন্দীর বিয়ে কোথায় দেবেন এই ছিল তালুকদার মশাইয়ের প্রধান দুশ্চিন্তা। ঋণের বোঝা আরও বাড়ুক এ যেমন চাইতেন না, আবার এও চাইতেন না যে মেয়েটা নিজেকে হতভাগিনী ভাবুক। একদিন কী একটা ব্যাপারে চাঁদার টাকা চাইতে শ্রীকণ্ঠের আচার-ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, ধুমধাম্ করে তারই সঙ্গো আনন্দীর বিয়ে দিয়ে দেন।

আনন্দী তার নতুন সংসারে এসে দেখল এখানকার হালচাল বেশ অন্যরকম। যে রকম জাঁকজমকে ছেলেবেলা থেকে সে অভ্যস্ত এখানে তার লেশমাত্রও নেই। হাতিঘোড়া দূরে থাক, একটা সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা সুন্দর গোরুর গাড়ি পর্যন্ত নেই। রেশমি চটিজোড়া এনেছিল সঙ্গো করে, কিন্তু এখানে তা পরে হাঁটবার মতো বাগান কই। ঘরে জানালা পর্যন্ত নেই; মেঝেতে নেই ফরাশ, দেওয়ালে নেই ছবি। এ একেবারে সাদাসিধে গেঁয়ো গেরস্থ বাড়ি। আনন্দী কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন অবস্থার সঙ্গো নিজেকে এতটাই মানিয়ে নিল যেন বিলাসিতার জিনিস সে জীবনে চোখেই দেখেনি।

দুই

একদিন দুপুরবেলা লালবিহারী সিংহ দুটি পাখি নিয়ে এসে বউদিকে বলল—চটপট মাংস রেঁধে দাও তো, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আনন্দী ইতিমধ্যেই রান্নাবান্না সেরে তার পথ চেয়ে বসেছিল। এখন আবার নতুন পদ রাঁধতে বসল। পাত্রে দেখে ঘি পো-টাকের বেশি নেই। বড়ো লোকের ঝি, হিসেব করে খরচটরচ করা স্বভাবে নেই। সে সব ঘি টুকুই মাংসে ঢেলে দিল। লালবিহারী খেতে বসে দেখল ডালে ঘি পড়েনি। জিজ্ঞেস করল, ডালে ঘি দাওনি যে?

আনন্দী বলল—ঘি সবটা মাংসে দিয়ে ফেলেছি।

লালবিহারী চড়াগলায় বলে উঠল—এই তো পরশু মাত্র ঘি এল, এর মধ্যে সব ফুরিয়ে গেছে?

আনন্দী উত্তর দিল—আজকে তো শুধু পোয়াটাক ঘি বাকি ছিল। ওর সবটাই আমি মাংসে দিয়ে দিয়েছি।

শুকনো কাঠে আগুন যেমন খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে, ক্ষুধায় কাতর মানুষও ঠিক তেমনি তুচ্ছ কথায় দপ করে জ্বলে ওঠে।

বউদির এই ধৃষ্টতা লালবিহারীর সহ্য হল না। খেঁকিয়ে বলে উঠল—ইস্, বাপের বাড়িতে যেন ঘির নদী বয়ে যাচ্ছে।

মেয়েরা গালাগালি সয়ে যায়, মারধোরও ভুলে যায়। কিন্তু বাপের বাড়ির নিন্দে তারা কিছুতেই সইতে পারে না। আনন্দী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল— হাতি মরলেও লাখ টাকা! ও বাড়িতে রোজ এইটুকু ঘি নাপিত-বেহারাদের ভোগেই যায়।

লালবিহারী রেগে আগুন হয়ে উঠল, থালাটাকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলল, তারপর বলল— ইচ্ছে করছে জিভটা টেনে উপড়ে নিই।

আনন্দীরও রাগ হল। মুখ লাল হয়ে উঠল তার, বলল—উনি থাকলে আজ মজাটা টের পাইয়ে দিতেন।

অশিক্ষিত, উদ্ধত রাজপুত নন্দন আর থাকতে পারল না। তার নিজের বউটি ছিল সাধারণ এক জমিদার ঘরের মেয়ে। যখনই মন চাইত, তাকে দু-চার ঘা মেরে বসত সে। খড়ম তুলে সে আনন্দীর দিকে জোরে ছুঁড়ে মারল, বলল—যার দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, তাকেও দেখে নেব, তোমাকেও।

আনন্দী হাত দিয়ে খড়ম ঠেকায়। মাথাটা বেঁচে গেল, কিন্তু আঙুলে বেশ চোট লাগল। রাগে পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে সে তার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েদের যা কিছু শক্তি আর সাহস, মান ও মর্যাদা সব স্বামীকে ঘিরে। স্বামীর শক্তি ও পৌরুষেরই অহংকার তাদের। প্রচণ্ড রাগকে কোনোমতে বুকে চেপে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল আনন্দী।

তিন

শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রতি শনিবার বাড়ি আসত। ঘটনাটা ঘটল বৃহস্পতিবার। দু দিন ধরে আনন্দী গোঁসা ঘরে রইল, কিচ্ছু খায়নি, ছোঁয়নি, স্বামীর আসার পথ চেয়ে রইল। শেষে শনিবার দিন যথারীতি সন্ধের সময় শ্রীকণ্ঠ বাড়ি এল। বাইরে বসে কিছু এককথা-সেকথা, দেশ, কাল, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু খবরাখবর এবং কিছু মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এসব কথাবার্তা রাত দশটা অবধি চলল। গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা এসব আলোচনায় এতই মজা পান যে তাঁরা খাওয়াদাওয়াই ভুলে যান। ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া শ্রীকণ্ঠের পক্ষে মুশকিল হয়। এ দু-তিন ঘন্টা আনন্দী খুব ছটফট করে কাটায়! শেষে কোনোমতে খাওয়ার সময় হয়। আড্ডা ভাঙে। শ্রীকণ্ঠকে একা পেয়ে লালবিহারী বলল, দাদা, আপনি বউদিকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেবেন যেন মুখ সামলে কথাটথা বলে, নইলে একদিন অনর্থ ঘটে যাবে।

বেণীমাধব সিংহ ছোটো ছেলের পক্ষ নিয়ে বলেন—হ্যাঁ, ব্যাটাছেলেদের মুখে মুখে কথা বলার স্বভাব বউ-ঝিদের মোটেই ভালো নয়।

লালবিহারী—সে বড়োলোকের মেয়ে হতে পারে, তা বলে আমরাও কিছু একটা চাষাভুষো নই।

শ্রীকণ্ঠ উদ্‌বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল—তা, হয়েছে কী?

লালবিহারী বলল—কিছু না, এমনি শুধু শুধু গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছে। বাপের বাড়ির গুমোরে তো আমাদের মনিষ্যি বলে গেরাহ্যি করে না।

শ্রীকণ্ঠ খাওয়াদাওয়া সেরে আনন্দীর কাছে এল। আনন্দী গুম হয়ে বসেছিল। এ মহাশয়টিও একটু কড়া মেজাজের। আনন্দী জিজ্ঞেস করে—মন ভালো তো?

শ্রীকণ্ঠ উত্তর দেয়—হ্যাঁ, খুব ভালো, কিন্তু তুমি আজ সংসারে এসব কী উৎপাত বাধিয়ে বসে আছ?

আনন্দীর ভুরু কুঁচকে ওঠে, রাগে সর্বশরীরে আগুন জ্বলে ওঠে তার। বলে—তোমার কাছে এসব ঘর-জ্বালানি কথা যে লাগিয়েছে তাকে পেলে মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতাম।

শ্রীকণ্ঠ—মেজাজ এত গরম করছ কেন? কী হয়েছে বলো না।

আনন্দী—কী আর বলব। এ আমার কপালের ফের। তা নইলে একটা গোঁয়ার ছোঁড়া, যার চাপরাশিগিরি করারও এলেম নেই, সে কিনা আমাকে খড়ম দিয়ে মেরে এভাবে বুক ফুলিয়ে চলে।

শ্রীকণ্ঠ—সব কিছু খুলে বলো তবে তো বুঝি। আমি তো এসব কিছুই জানি না।

আনন্দী—পরশু তোমার আদুরে ভাইটি আমাকে মাংস রাঁধতে বলেছিল। ঘির ভাণ্ডে পো-খানেকের বেশি ঘি ছিল না। যেটুকু ছিল আমি সবটা মাংসে দিয়ে ফেলেছিলাম। খেতে বসে আমাকে বলে—ডালে ঘি দাওনি কেন? ব্যস, এনিয়ে আমার বাপের বাড়ি তুলে যা তা বলতে লাগল। আমি আর থাকতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম, ও বাড়িতে এটুকুন ঘি তো নাপিত-বেহারারা খেয়ে থাকে, কারও চোখেই পড়ে না। ব্যস, একথাটা শোনামাত্র বদমাশটা আমাকে খড়ম ছুঁড়ে মেরেছে। হাত দিয়ে যদি না ঠেকাতাম, তাহলে মাথাটাই ফেটে যেত। ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি যা বললাম তা সত্যি কি মিথ্যে।

শ্রীকণ্ঠের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। বলল—এতদূর গড়িয়েছে! ছোঁড়াটার এত সাহস!

আনন্দী মেয়েদের স্বভাবমতো কাঁদতে শুরু করল, কারণ চোখের জল তো ওদের চোখের পাতায়। শ্রীকণ্ঠ এমনিতে খুবই ধৈর্যশীল, শান্ত পুরুষ। সহজে সে রাগত না। তবে মেয়েদের চোখের জল জল হলেও তা পুরুষের ক্রোধাগ্নিকে জ্বালিয়ে তুলতে তেলের কাজ করে। সারাটা রাত সে এপাশ ওপাশ করে কাটাল। দুশ্চিন্তায় দু চোখের পাতা এক করতে পারল না। সকালে বাবার কাছে গিয়ে বলল—বাবা, এ বাড়িতে তো আর আমার থাকা চলে না।

এ ধরনের বিপ্লবাত্মক কথা বলার জন্য শ্রীকণ্ঠ কতবার তার বন্ধুদের একহাত নিয়েছে, আজ স্বয়ং তাকেই নিজমুখে এ কথাগুলি বলতে হল, এ ভারী দুর্ভাগ্যের কথা। সত্যি, অপরকে উপদেশ দেওয়া কত সহজ।

বেণীমাধব সিংহ হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—কেন? কেন?

শ্রীকণ্ঠ—নিজের মানসম্মান নিয়েও একটু ভাবনাচিন্তা করতে হয় আমাকে, সেইজন্যই। আপনার সংসারে এখন অন্যায় আর জেদাজেদির বেশ প্রকোপ চলছে দেখতে পাই। যাদের উচিত গুরুজনদের সম্মান করা, তারা তাদের মাথায় চড়ে বসছে। আমাকে অন্যের চাকরি করতে হয়, বাড়িতে থাকি না। এখানে আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ির মেয়েদের ওপর খড়ম আর জুতো বৃষ্টি হয়। কড়া কথা শোনাক, সে ঠিক আছে। চাই-কি কেউ এক কথার জায়গায় দু-কথা বলুক তাও আমি সহ্য করতে পারি। কিন্তু আমার উপর লাথি ঘুঁষি চলবে আর আমি রা-টি কাড়ব না—এ কেমন করে চলে, বলুন?

বেণীমাধব সিংহ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। শ্রীকণ্ঠ চিরকাল তাঁকে মান্য করে এসেছে। তার এই রুদ্রমূর্তি দেখে বৃদ্ধ জমিদার মশায় অবাক হয়ে গেলেন। তিনি শুধু বললেন—বাবা, তুমি

বুদ্ধিমান হয়ে এসব কথা বলছ? স্ত্রীজাতি এভাবেই ঘরে সর্বনাশ ডেকে আনে। ওদের খুব বেশি লাই দেওয়া ঠিক নয়।

শ্রীকণ্ঠ—সেটা আমি জানি। আপনাদের আশীর্বাদে অতটা মূর্খ আমি নই। আপনি নিজেই তো জানেন আমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ গাঁয়ের কয়েকটি সংসারকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যে মহিলার মান-সম্ভ্রমের জন্য আমি ঈশ্বরের দরবারে দায়ি, তার প্রতি এমন ঘোর অবিচার ও পশুর মতো ব্যবহার আমি সয়ে যাব কেমন করে? আপনি বিশ্বাস করুন, আমি যে লালবিহারীকে এর জন্য কোনো শাস্তি দিচ্ছি না সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

এবার বেণীমাধব সিংহও গরম হয়ে উঠলেন। এ ধরনের কথা আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। বললেন—লালবিহারী তোমার ভাই। ও যদি কোনো ভুলচুক করে, কানটা ধরে শাসন করবে, তাই বলে—

শ্রীকণ্ঠ—লালবিহারীকে আমি ভাই মনে করি না।

বেণীমাধব সিংহ—বউ বলেছে বলে?

শ্রীকণ্ঠ—আজ্ঞে না, ওর ক্রূরতা আর অবিবেচনার জন্য।

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ। জমিদার মশাই ছেলের ক্রোধ শান্ত করতে চাইলেন বটে, কিন্তু মানতে চাইছিলেন না যে লালবিহারী অনুচিত কিছু করেছে। এরই মধ্যে পাড়ার আরও ক-জন ভদ্রলোক হুঁকো-কলকে টানার ছুতোয় এসে হাজির। বউয়ের কথায় শ্রীকণ্ঠ বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে চলেছে শুনে কয়েকজন মহিলার তো খুবই উল্লাস হল। উভয় পক্ষের মধুর বাণী শোনার জন্যে ওদের মন ছটফট করতে লাগল। আর এই পরিবারের নীতিসংগত চালচলন দেখে মনে মনে জ্বলেপুড়ে মরত এমন কিছু কুচক্কুরে মানুষও গাঁয়ে ছিল। তারা বলাবলি করত, শ্রীকণ্ঠ বাপের সামনে মাথা তোলে না, তো ওটা আবার পুরুষ কীসের। সে এত এত লেখাপড়া করেছে, বইয়ের পোকা হয়েছে। বেণীমাধব সিংহ যে শ্রীকণ্ঠের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করেন না, সেটা তাঁর মূর্খামি। এই সব মহানুভবদের শুভকামনা আজ পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সব গুটিগুটি এসে বসতে লাগল—কেউ হুঁকো খাওয়ার অছিলায়, কেউবা খাজনার রসিদ দেখানোর অজুহাতে। বেণীমাধব সিংহ প্রবীণ ব্যক্তি। এসব মনোভাব টের পেতে তাঁর দেরি হল না। তিনি ঠিক করলেন, যাই হোক না কেন, এই পাজি লোকগুলো খুশিতে হাততালি দেবে, তা তিনি হতে দেবেন না। তাড়াতাড়ি গলা নরম করে বলেন—বাবা, আমি তো আর তোমার থেকে আলাদা নই। তোমার যা মন চায় করো, ছেলেটা সত্যিই এবার অন্যায় করে ফেলেছে।

এলাহাবাদের অনভিজ্ঞ ক্রুদ্ধ গ্র্যাজুয়েট কিন্তু ব্যাপারটা ধরতে পারল না। ডিবেটিং ক্লাবে আপন যুক্তিতে গোঁ ধরে থাকা তার স্বভাব। এসব ঘোরপ্যাঁচ সে কী করে বুঝবে? বাবা যে উদ্দেশ্যে কথার-মোড় ঘোরালেন সেটা সে আন্দাজ করতে পারল না, বলল—লালবিহারীর সঙ্গে এ বাড়িতে আমি আর বাস করতে পারব না।

বেণীমাধব—বাব, যারা বুদ্ধিমান, তারা মূর্খের কথায় কান দেবে কেন? লালবিহারী গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে। ওর যা কিছু ভুলচুক হয়েছে, তুমি বড়ো, ওকে ক্ষমা করে দাও।

শ্রীকণ্ঠ—ওর এই শয়তানি আমার সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। হয় সে থাকবে এই বাড়িতে, না হয় আমি। ও যদি আপনার বেশি প্রিয়পাত্র হয়, তাহলে আমাকে বিদায় দিন। আমি নিজের দায়

নিজের ঘাড়ে নেব। যদি আমাকে আটকাতে চান, তাহলে ওকে বলে দিন, ও যেখানে খুশি চলে যাক। ব্যস, এই আমার শেষকথা।

লালবিহারী সিংহ দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাদার কথাগুলি শুনছিল। দাদাকে সে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। শ্রীকণ্ঠের সামনে খাটিয়ায় বসে হুঁকো টানে, কিংবা পান খায় এমন সাহস তার কখনো হত না। এতটা সম্মান সে বাপকেও দেখাত না। শ্রীকণ্ঠও তাঁকে কম ভালোবাসত না। জ্ঞানত কোনোদিন সে লালবিহারীকে একটা ধমক পর্যন্ত দেয়নি। এলাহাবাদ থেকে যখনই বাড়ি এসেছে, ওর জন্য কোনো না কোনো জিনিস নিয়ে এসেছে সে। সেবার একজোড়া মুগুর বানিয়ে দিয়েছিল তাকে। গত বছর নাগপঞ্চমীর দিনে লালবিহারী যখন তার থেকে দেড়গুণ তাগড়াই এক জোয়ানকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়, তখন আখড়ার মধ্যিখানেই ছুটে গিয়ে সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। খুচরো পয়সার হরিলুট দিয়েছিল পাঁচ টাকার। অমন দাদার মুখ থেকে এমন মর্মান্তিক কথাগুলো শুনে লালবিহারীর বড়ো কষ্টহল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। সে তার কাজের জন্য মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দাদা আসার একদিন আগে থেকে ওর বুক কাঁপছিল না জানি দাদা কী বলবেন ভেবে। ভাবছিল, আমি ওঁর সামনে যাব কী করে, ওঁর সঙ্গে কথা বলব কী করে, ওঁর দিকে চোখ তুলে তাকাব কী করে। ভেবেছিল দাদা তাকে ডেকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেবেন। সে আশার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটল, দাদাকে আজ সে দেখল যেন নির্দয়তার প্রতিমূর্তি। সে মূর্খ, কিন্তু তার মন বলছে, দাদা তার প্রতি সুবিচার করছেন না। যদি শ্রীকণ্ঠ তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে দু-চারটে কড়া কথা বলত, কিংবা, তাই-বা-কেন, দু-চারটে চড়চাপড়ও মারত; তাহলেও বোধ হয় ওর এতটা কষ্ট হত না। দাদা যে বলল আমি আর ওর মুখ দেখতে চাই না, সেটা লালবিহারীর মন ভেঙে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভেতর এল সে। নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় বদলাল, চোখ মুছে ফেলল যাতে কেউ টের না পায় যে সে কেঁদেছে। তারপর আনন্দীর ঘরের দরজার সামনে এসে বলল—বউদি। দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন উনি আর আমার সঙ্গে এ বাড়িতে থাকবেন না। উনি আর আমার মুখ দেখতে চান না। বউদি, আমি চললাম। দাদাকে আর এমুখ দেখাব না। তোমার পায়ে যা কিছু অপরাধ করেছি মাপ করে দিয়ো, বউদি।

বলতে বলতে লালবিহারীর গলা ধরে এল।

চার

লালবিহারী যখন মাথা হেঁট করে আনন্দীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, তক্ষুনি শ্রীকণ্ঠ সিংহও চোখমুখ লাল করে বাইরে থেকে এল। ভাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। যেন তার ছায়াও এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

লালবিহারীর নামে ঝোঁকের মাথায় নালিশ করে বসে আনন্দী তখন মনে মনে আপশোশ করছিল। এমনিতে তার মনে যথেষ্ট মায়াদয়া আছে। সে মোটেই ভাবতে পারেনি ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। মনে মনে স্বামীর উপর তার রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে এতে সে কেন এতটা গরম হয়ে উঠল। এ ভয়টাও তাকে পেয়ে বসেছিল যে, তাকে এখন যদি এলাহাবাদে গিয়ে থাকতে বলে তাহলে সে কী করে কী করবে। এরই মধ্যে যখন লালবিহারীকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে শোনে যে আমি চলে যাচ্ছি, আমার যা কিছু অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ো, তখন তার রাগ যেটুকু বা

বাকি ছিল তাও জল হয়ে গেল। সে কাঁদতে শুরু করে। মনের ময়লা ধুয়ে সাফ করে ফেলতে চোখের জলের চাইতে ভালো আর কী আছে?

শ্রীকণ্ঠকে দেখে আনন্দী বলে উঠল—ঠাকুরপো বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছে।

শ্রীকণ্ঠ—তা আমি কী করব?

আনন্দী—যাও, ওকে ভেতরে ডেকে আনো। আমার জিভে আগুন লাগুক। এ আমি কোন ঝামেলা বাধিয়ে বসলাম।

শ্রীকণ্ঠ—আমি পারব না।

আনন্দী—পরে আপশোশ করবে। ওর মনে খুব কষ্ট হয়েছে, আবার কোথাও চলেটলে না যায়।

শ্রীকণ্ঠ ওঠে না। ইতিমধ্যে লালবিহারী আবার বলে—বউদি, দাদাকে আমি এখান থেকে প্রণাম জানাচ্ছি। উনি আমার মুখ দেখতে চান না, তাই আমিও আমার মুখ ওঁকে দেখাব না।

বলেই লালবিহারী ফিরে চলে। দ্রুতপায়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আনন্দী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে। লালবিহারী ফিরে তাকায়, চোখে জল নিয়ে বলে—যেতে দাও আমাকে।

আনন্দী—যাচ্ছ কোথায়?

লালবিহারী—এমন জায়গায় যেখানে কেউ আমরা মুখ দেখতে পাবে না।

আনন্দী—আমি তোমাকে যেতে দেব না।

লালবিহারী—আমি তোমাদের সঙ্গো থাকবার যোগ্য নই।

আনন্দী—আর এক পা এগোও তো আমার মাথা খাও।

লালবিহারী—যদি জানি আমার সম্বন্ধে দাদার মনে আর কোনো নালিশ নেই, তবেই আমি ফিরব, নইলে আমি এ বাড়িতে কিছুতেই থাকব না।

আনন্দী—ঈশ্বর সাক্ষী, তোমার উপর আমার মনে একটুও রাগ নেই।

এবার শ্রীকণ্ঠেরও হৃদয় গলে যায়। বাইরে এসে লালবিহারীকে বুকে টেনে নেয় সে। দু-ভাই খুব কাঁদে। ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে লালবিহারী বলে—দাদা, আর কখনো যেন বলবেন না যে আমি তোর মুখ দেখব না। এছাড়া আর যে সাজা আপনি দেবেন তাই আমি মাথা পেতে নেব।

কাঁপা গলায় শ্রীকণ্ঠ বলে—লল্লু, ও সব কথা একেবারে ভুলে যা। সব চুকেবুকে গেছে। ভগবান করুন, এমন দিন যেন আর না আসে।

বেণীমাধব সিংহ বাইরে থেকে আসছিলেন। দু-ভাইকে আলিঙ্গানাবদ্ধ দেখে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠেন—বড়ো ঘরের বেটিরা তো এমনিই হয়ে থাকে, যদি কিছু বিগড়ে যায়, তো তারা ঠিক সামলে নেবে।

গাঁয়ে এ বৃত্তান্ত যারই কানে যায় সে আনন্দীর উদারতার প্রশংসা করে বলে—হবে না, বড়ো ঘরের মেয়ে কি শুধু মুখের কথা!

(বড়ে ঘর কী বেটী / ১৯১০) অনুবাদ ননী শূর

অভিশাপ

মুনশি রামসেবক ভুরু কুঁচকে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন—এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাও ভালো। সচরাচর এরকম যত নিমন্ত্রণ মৃত্যুকে পাঠানো হয় মৃত্যু যদি সে সবই গ্রহণ করত তাহলে সংসার বোধ হয় এতদিনে উজার হয়ে যেত।

চাঁদপুর গ্রামের এক অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন মুনশি রামসেবক। বড়োলোকদের সবরকম গুণই তার মধ্যে ছিল। মানবচরিত্রের দুর্বলতাগুলোই ছিল তার জীবনের অবলম্বন। প্রতিদিন মুনসেফ কোর্টের হাতায় একটা নিমগাছের নীচে একটা ভাঙা চৌকির উপর বস্তাখানেক কাগজ নিয়ে তাকে বসে থাকতে দেখা যেত। কেউ কোনো দিন তাকে কোনো এজলাশে দাঁড়িয়ে সওয়াল কিংবা কোনো মামলার তদারকি করতে দেখে নি। তবু সবাই তাকে মোক্তার সাহেব বলে ডাকত। ঝড় হোক, বাদল হোক, শিলাবৃষ্টি হোক, ওই জায়গা থেকে মোক্তার সাহেব নড়ে বসতেন না। যখন তিনি কাছারির দিকে রওনা দিতেন তখন গ্রামের লোক দলে দলে তার পিছু নিত। চারদিক থেকে যেন তার উপর বিশ্বাস ও ভালোবাসা বর্ষিত হত। সবাই জানত—তার জিহ্বায় সরস্বতীর অধিষ্ঠান। একে ওকালতি বা মোক্তারি যাই বলা যাক না কেন, আসলে এসবই ছিল কুলমর্যদার ব্যাপার। আয় খুব একটা হত না। রুপোর টাকার কথা কী আর বলব, সময় সময় তামার মুদ্রাও নির্ভয়ে তার কাছে আসতে তিন বার হোঁচট খেত। মুনশিজির আইনের জ্ঞান সম্পর্কে কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে কোনো ডিগ্রি না থাকায় তার অসুবিধা ছিল।

তা যাই হোক, তার এই পেশা ছিল কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। আসলে তার জীবিকার মুখ্য অবলম্বন ছিলেন আশপাশের বিধবারা, যাদের খাওয়াপড়ার কোনো অভাব না থাকলেও দেখাশোনার লোকের অভাব ছিল। আর ছিলেন সোজা-সরল ধনী বৃদ্ধরা যারা তাকে বিশ্বাস করতেন। বিধবারা তাদের টাকা তার কাছে জমা রাখতেন। বৃদ্ধরা কর্তব্যহীন সন্তানদের ভয়ে তাদের ধন তার হাতে সঁপে দিতেন। তবে টাকা একবার তার হাতে গেলে আবার বেরিয়ে আসার কথা ভুলে যেত। প্রয়োজনে মুনশিজি সময় সময় টাকা ধার করতেন। তা, ধার না করে কেই বা আর চালাতে পারে? সন্ধ্যায় শোধ করে দেবেন বলে টাকা নিতেন, কিন্তু সেই সন্ধ্যা আর ফিরে আসত না। মোট কথা, ধার করে শোধ দেওয়া মুনশিজি শেখেননি। এরকমটাই ছিল তার কুলপ্রথা। এইসব ঝামেলা প্রায়শ মুনশিজির সুখশান্তিতে বিঘ্ন ঘটাত। আইন কিংবা আদালতের ভয় তিনি করতেন না। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তার মোকাবিলা করা আর জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা ছিল একই ব্যাপার। তবু যদি কোনো দুষ্ট লোক তার সঙ্গে লাগতে চাইত, তার সততায় সন্দেহ প্রকাশ করত কিংবা তার মুখের উপর দুটো কথা শুনিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হত, তাহলে মুনশিজির প্রাণে

বড়োই আঘাত লাগত। তবে এ জাতীয় দুর্ঘটনা প্রায় লেগেই থাকত। সব জায়গাতেই এমন লোক দেখা যায় যারা অন্যকে ছোটো করতে পারলে নিজেরা আনন্দ পায়। এরকম লোকের উসকানিতেই কখনও কখনও ছোটোলোকও মুনশিজির সঙ্গে ঝগড়ায় লেগে পড়ত। নয়তো এক আনাজওয়ালির এত সাহস কী করে হবে যে সে বাড়ি এসে মুনশিজির মুখের উপর কথা শুনিয়ে যায়! মুনশিজি ছিলেন তার পুরনো খদ্দের। বছরের পর বছর তার কাছ থেকে তিনি তরিতরকারি কিনেছেন। দাম না দিলেও আনাজওয়ালিকে খুশি রাখতেই হত আর দেরিতে হোক কিংবা তাড়াতাড়ি হোক, দাম সে পেত। তবু ওই মুখ-আলগা আনাজওয়ালি দু বছরেই ঘাবড়ে গেল। কটা মাত্র পয়সার জন্য কিনা প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোককে অপমান করে বসল। বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুনশিজি যদি মৃত্যুকে আহ্বান জানাতে বদ্ধপরিকর হন তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

দুই

এই গ্রামেই মুঙ্গা নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী বাস করত। তার স্বামী বর্মা মুলুকে পলটনে হাবিলদারের কাজ করত আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তার ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসাবে সরকারের তরফে মুঙ্গাকে পাঁচশো টাকা দেওয়া হয়। বিধবা মানুষ, তারপর আবার দিনকাল খারাপ। বেচারি সব টাকাটাই মুনশি রামসেবকের কাছে গচ্ছিত রেখে দিল। মাসে মাসে কিছু কিছু চেয়ে নিয়ে খরচ চালাত।

মুনশিজি এই কর্তব্য বেশ কয়েক বছর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন, কিন্তু বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যখন মুঙ্গা মরল না তখন মুনশিজির এই চিন্তা হল—তাহলে কি স্বর্গযাত্রার জন্য এই টাকার অন্তত আধেকটাও মুঙ্গা রেখে যাবে না? একদিন তাই তিনি মুঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুঙ্গা, তুমি কি মরবে না? সোজাসুজি বলে দাও তাহলে আমিই আমার মরার ফিকির করি। সেই দিনই মুঙ্গার চোখ খুলল। তার ঘুম ছুটে গেল। সে বলল—আমার হিসাব বুঝিয়ে দাও। হিসাবের চিঠা তৈরি করাই ছিল। জমার ঘর একেবারে শূন্য। মুঙ্গা খুব শক্ত করে মুনশিজির হাত ধরে বলল—আমার আড়াইশো টাকা এখনও তোমার কাছে রয়েছে। এক পয়সাও আমি ছা' ব না।

কিন্তু অসহায়ের ক্রোধ হল পটকার আওয়াজের মতো। বাচ্চারা ভয় পায় বটে তবে আসলে কিছু হয় না। আদালতে যাবার মতো জোর তার ছিল না, কারণ না ছিল কিছু লেখাপড়া, না ছিল হিসাবকিতাব! হ্যাঁ, তবে পঞ্চায়েতের কাছ থেকে কিছুটা আশা ছিল। পঞ্চায়েত বসল। কয়েকটা গ্রামের লোক একত্রিত হল। মুনশিজি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। সভায় দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েতকে উদ্দেশ্য করে বললেন—ভাইসব, আপনারা সকলেই সত্যপরায়ণ, সম্মানিত মানুষ। আমি আপনাদের সকলের দাসানুদাস। আমি আপনাদের সকলের উদারতা, কৃপা, দয়া ও ভালোবাসায় সর্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। আপনারা কি এটা মনে করেন যে, আমি অনাথা বিধবা মহিলার টাকা খেয়ে ফেলেছি?

পঞ্চায়েত একস্বরে উত্তর দিল—না, না। আপনারা দ্বারা একাজ সম্ভব নয়।

রামসেবক—যদি আপনাদের সকলের এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আমি টাকা খেয়ে ফেলেছি তাহলে আমার ডুবে মরা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। আমি ধনবান নই কিংবা উদারতা দেখাবার মতো

ঔদ্ধত্যও আমার নেই। তবে নিজের কলমের জোরে, আপনাদের সকলের দয়ায়, আমি কারও মুখাপেক্ষী নই। তা আমি কি এমনই অপদার্থ হয়ে গেলাম যে, এক অনাথার টাকা গায়েব করে দেব?

পঞ্চায়েত একস্বরে আবার বলল—না, না। আপনার দ্বারা একাজ সম্ভব না। মুখ দেখে লোক চেনা যায়।

পঞ্চায়েত মুনশিজিকে ছেড়ে দিয়ে সভা শেষ করে দিয়ে উঠে গেল। মুঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল—আচ্ছা! এখানে কিছু হল না, ঠিক আছে। ওখানে কোথায় যাবে।

তিন

এখন আর মুঙ্গার দুঃখের কথা শোনার বা সাহায্য করার কেউ রইল না। দারিদ্র্যের জন্য যেসব কস্ট সইতে হয় তার সবই তাকে সইতে হল। তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল, চাইলে পরিশ্রমও করতে পারত। কিন্তু যেদিন পঞ্চায়েতের সভা হয়ে গেল সেদিন থেকেই সে কোনো কাজ না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল। এখন থেকে সে দিনরাত শুধু টাকা-টাকাই করতে থাকল। উঠতে, বসতে, ঘুমিয়ে, জেগে থেকে তার একটাই কাজ হল—মুনশি রামসেবকের মঙ্গলকামনা! তার কুঁড়ে ঘরের দরজায় বসে থেকে দিনরাত শুধু অন্তরে সে তাকে আশীর্বাদ করতে থাকত। প্রায়শই তার আশীর্বাদে এমন কাব্যময়তার পরিচয় পাওয়া যেত, সে এমন উপমা ব্যবহার করত যে তা শুনে লোক আশ্চর্য হয়ে যেত। ধীরে ধীরে মুঙ্গা পাগল হয়ে গেল। খালি মাথা, খালি গা, হাতে একটা কুড়ুল নিয়ে নির্জন স্থানে গিয়ে সে বসে থাকত। কুঁড়ে ঘরের জায়গায় এখন তাকে শ্মশানে, নদীর ধারে, পোড়ো বাড়িতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। বিস্রস্ত চুল, লাল চোখ, উন্মাদের মতো চেহারা, হাত-পা—তার এই রূপ দেখে লোক ভয় পেয়ে যেত। কেউ আর এখন তাকে হেসে উত্ত্যক্ত করত না। কখনও সে যদি গ্রামে এসে হাজির হত তাহলে মেয়েরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিত। পুরুষরা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেত আর বাচ্চারা চিৎকার করে পালাত। ছেলেছোকরাদের মধ্যে একমাত্র যে পালাত না সে হল মুনশি রামসেবকের সুপুত্র রামগুলাম। পিতার চরিত্রের সমস্ত অপূর্ণতা পুত্রে এসে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এর মারের চোটে গ্রামের ছেলেদের নাকালের একশেষ হত। গ্রামের অন্ধ, খোঁড়া মানুষ-এর চেহারা দেখলে বিরক্ত হত। গালিগালাজ শুনে এর এত আনন্দ হত যে, শ্বশুরগৃহাভিমুখী জামাইয়েরও তা হয় না। সে মুঙ্গার পিছন পিছন তালি বাজাতে যেত কুকুর সঙ্গে নিয়ে। যতক্ষণ সে বেচারি বিরক্ত হয়ে গ্রামের বাইরে চলে না যেত ততক্ষণ সে তাকে তাড়া করে বেড়াত। টাকাপয়সা, জ্ঞানবুদ্ধি সব হারিয়ে মুঙ্গার উপাধি জুটল 'পাগল' আর সত্যিই সে এখন উন্মাদ। একা বসে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা নিজে নিজে সে কথা বলত আর তাতে মুনশি রামসেবকের মাংস, হাড়, চামড়া, চোখ, কলিজা ইত্যাদি খাবার, পিষবার, কুটিকুটি করবার ও ছিঁড়ে ফেলবার উৎকট বাসনা প্রকট হত আর যখন সব ইচ্ছা প্রকাশের শেষ সীমায় পৌঁছাত তখন সে রামসেবকের বাড়ির দিকে মুখ করে বুকের রক্ত জমানোর মতো করে হাঁক পাড়ত—তোর রক্ত খাব।

প্রায় প্রতি রাত্রে অন্ধকারে এই চিৎকার শুনে মেয়েরা আঁতকে উঠত। তবে এই চিৎকার থেকে আরও মারাত্মক ছিল তার অট্টহাসি। মুনশিজির রক্তপান করার কল্পিত আনন্দে সে অট্টহাসি হাসত। এই অট্টহাসিতে এমন একটা আসুরিক উদ্দামতা, এমন একটা পাশবিক উগ্রতা থাকত যে তা শুনে

রাত্রে লোকের রক্ত হিম হয়ে যেত। মনে হত যেন অসংখ্য পেঁচা একসঙ্গে হাসছে। মুনশি রামসেবক ছিলেন খুব সাহসী ও বুকের পাটাওয়ালা মানুষ। দেওয়ানি ফৌজদারি কিছুরই ভয় তার ছিল না। তবে মুঙ্গার এই পিলে-চমকানো চিৎকার শুনে তিনিও ভয় পেতেন। মনুষ্যরচিত আইনকে আমরা ভয় নাও করতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরীয় কানুনের প্রতি সকলের মনেই আপনা থেকে একটা ভয় থাকে। মুঙ্গার ভয়ংকর নৈশবিহার রামসেবকের মনেও সময় সময় ওই রকম ভয় উৎপন্ন করত এবং তার চেয়েও বেশি করত তার স্ত্রীর মনে। তার স্ত্রী ছিল খুব চতুর। সে মুনশিজিকে এসমস্ত ব্যাপারে সর্বদাই পরামর্শ দিত। যারা বলতেন, মুনশিজির জিহ্বাগ্রে সরস্বতীর অধিষ্ঠান, তারা ভুল করতেন। আসলে এই গুণের অধিকারিণী ছিল তার স্ত্রী। মুনশিজি লেখায় যেমন দড় ছিলেন তেমনি তার স্ত্রী ছিল কথায়। আর এই দুই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রায়শ তাদের অসহায়তা নিয়ে কী করা কর্তব্য তার আলোচনা হত।

গভীর রাত। প্রতিদিনের নিয়মানুসারে মুনশিজি নিজের চিন্তা দূর করবার জন্য কয়েক ঢোক মদ গলাধঃকরণ করে শুয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ মুঙ্গা একেবারে তার দরজায় এসে হাঁক দিয়ে 'তোর রক্ত খাব' বলে অট্টহাসি হেসে উঠল।

মুনশিজি এই ভয়ংকর হাসির লহর শুনে আঁতকে উঠলেন। ভয়ে তার পা থরথর করে কাঁপতে লাগল, বুক টিপ টিপ করতে লাগল। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে দরজা খুলে স্ত্রী নাগিনকে ঘুম থেকে তুললেন। নাগিন বিরক্ত হয়ে বললেন—কী বলছ? মুনশিজি রুদ্ধ গলায় বললেন—পাগলি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

নাগিন উঠে বসে বলল—কী বলছ?

— তোমার মাথা।

— কী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে?

— আওয়াজ শুনছ না?

নাগিন মুঙ্গাকে ভয় পেত না, ভয় পেত তার আত্মকথনকে। তবু তার এই বিশ্বাস ছিল যে, সে কথা বলে মুঙ্গাকে অবশ্যই চুপ করাতে পারবে। সে সামলে নিয়ে বলল—তুমি রাজি হলে আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা বল নিই। মুনশিজি কিন্তু আপত্তি করলেন।

দুজনেই পা টিপে টিপে দেউড়িতে গিয়ে দরজা ফাঁক করে দেখলেন। মুঙ্গার ধূলিধূসরিত দেহ মাটির উপর পড়ে ছিল, তার প্রবল নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল। রামসেবকের রক্ত ও মাংসের ক্ষুধায় সে তার নিজের রক্ত ও মাংস শুকিয়ে ফেলেছিল। একটা শিশুও বোধ হয় তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারত। তবুও এই মুঙ্গার ভয়ে সমস্ত গ্রাম থরথর করে কাঁপত। আমর জীবন্ত মানুষকে ভয় পাই না, ভয় পাই মৃত মানুষকে। রাত কাটল। দরজা বন্ধ ছিল। তবে মুনশিজি আর নাগিন বসে বসেই রাত কাটিয়ে দিলেন। মুঙ্গা বাড়ির ভিতর ঢুকতে পারত না ঠিকই কিন্তু তার আওয়াজকে ঠেকাবে কে। মুঙ্গার চেয়ে অনেক ভীতিপ্রদ ছিল তার আওয়াজ।

ভোরে মুনশিজি বাইরে এসে মুঙ্গাকে বললেন— এখানে পড়ে কেন?

মুঙ্গা বলল—তোর রক্ত খাব।

নাগিন সাহস সঞ্চয় করে বলল—তোর মুখ ঝলসে দেব।

কিন্তু মুঙ্গার উপর নাগিনের বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সে আবার সেই অট্টহাসি হেসে উঠলে নাগিন কিছুটা সংকুচিত হয়ে গেল। হাসির সামনে মুখ বন্ধ হয়ে যায়। মুনশিজি আবার বললেন—এখান থেকে উঠে যা।

—উঠব না।

—কতক্ষণ এভাবে পড়ে থাকবি?

—আগে তোর রক্ত খাব, তবে যাব।

মুনশিজির শক্তিশালী লেখনী এখানে কোনো কাজে লাগল না আর নাগিনের অগ্নিবর্ষী বাণীও যেন কেমন শীতল। দুজনে ঘরে গিয়ে পরামর্শ চলল কী করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া যায়, কী করে এই আপদের হাত থেকে পার পাওয়া যায়।

দেবী যখন আসেন, পাঁঠার রক্ত খেয়ে চলে যান, কিন্তু এই ডাইনি তো এসেছে মানুষের রক্ত খাবার জন্য। অথচ এই রক্তের একটা ফোঁটাও যদি কলম কাটতে গিয়ে পড়ত তাহলে সমস্ত পরিবারে সপ্তাহ কিংবা মাসাধিককাল তার জন্য শোক চলত এবং এই ঘটনা সারা গাঁয় ঘরে ঘরে ছড়িয়ে যেত। তা, এই রক্ত পান করেই কি মুঙ্গার বিশুষ্ক শরীর সতেজ হয়ে উঠবে?

চার

গ্রামে এই আলোচনা চলল যে, মুঙ্গা মুনশিজির বাড়ির দরজায় ধরনা দিয়ে বসে আছে। মুনশিজির অপমান হলে গ্রামের লোকের খুব আনন্দ হত। দেখতে দেখতে শতাধিক লোকের ভিড় জমে গেল। তবে এই বাড়ির দরজায় সময় সময় এমন ভিড় লেগেই থাকত। রামগুলামের এই ভিড় পছন্দ ছিল না। মুঙ্গার উপর তার এত রাগ হল যে, যদি সে তার ইচ্ছামতো কাজ করতে পারত তাহলে সে তাকে কুয়োয় ফেলে দিত। এই চিন্তা মাথায় আসতেই রামগুলামের মনে কেমন একটা সুড়সুড়ির উদয় হল আর অনেক কষ্টে সে তার হাসি চেপে রাখল। আহা! ওই কুয়োয় ফেলে দিতে পারলে কী মজাই না হত। তবে এই পেতনি তো এখান থেকে নড়ছেও না। কী করা যায়? মুনশিজির বাড়িতে একটা গোরু ছিল। খোল, কলাই, ভুসি ওটাকে খাওয়ানো হত ঠিকই, কিন্তু সবই যেন ওই গোরুর হাড়ে মিলিয়ে যেত। ওর শরীরই শুধু পুষ্ট হত। রামগুলাম ওই গোরুরই গোবর একটা হাঁড়িতে নিয়ে সবটাই বেচারা মুঙ্গার মাথায় দিল ঢেলে আর সেই গোবরের ছিটে দিয়ে দিল দর্শকদের উপর। বেচারা মুঙ্গা একেবারে নেয়ে উঠল আর দর্শকরাও পালাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা বলতে লাগল—এটা মুনশি রামগুলামের বাড়ির দরজা। এখানে এরকম শিষ্টাচারই প্রাপ্য। তাড়াতাড়ি পালাও নয়তো পরে এর থেকেও বেশি আদর যত্ন হতে পারে। ভিড় পাতলা হলে রামগুলাম ঘরে গিয়ে হাততালি দিয়ে খুব একচোট হাসল। এরকম ফালতু ভিড় এত সহজে ও এমন সুচারুরূপে হটিয়ে দেওয়াতে মুনশিজি নিজের সুশীল পুত্রের পিঠ চাপড়ে দিলেন। সবাই চলে গেলেও বেচারি মুঙ্গা কিন্তু যেমন ছিল তেমনি বসে থাকল।

দুপুর হয়ে গেল, মুঙ্গা কিন্তু খেল না। সন্ধ্যা হল। অনেক বলাকওয়া সত্ত্বেও সে খেল না। গ্রামের প্রধান অনেক খোশামোদ করলেন, এমন কী, মুনশিজি হাতজোড় পর্যন্ত করলেন, কিন্তু দেবী প্রসন্ন হলেন না। শেষে মুনশিজি না পেরে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। বলে গেলেন, গোঁসা করে যারা

না-খেয়ে থাকে তারা আবার নিজেরাই খায়। রাতটাও মুঙ্গা কোনো কিছু না খেয়ে পার করে দিল। মুনশিজি ও তার স্ত্রী এই রাতটাও না-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন। আজ মুঙ্গার হাসি ও গর্জন দুইই অনেক কম শোনা গেল। ঘর থেকে ওরা ভাবলেন, আপদ দূর হয়েছে। ভোর হতেই দরজা খুলে দেখলেন, মুঙ্গা নিঃসাড় পড়ে আছে। তার মুখে মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। তার প্রাণপাখি উড়ে গেছে। সে এই বাড়িটার দরজাতেই মরবে বলে এসেছিল। যে তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় আত্মসাৎ করে নিয়েছে তারই হাতে সে তার জীবনও সঁপে দিল। নিজের শরীরটা পর্যন্ত সে তাকে দিয়ে গেল। সম্পদকে মানুষ কী ভালোই না বাসে! সম্পদ তার নিজের প্রাণ থেকেও প্রিয়, বিশেষ করে বার্ধক্যে। সমস্ত ঋণ চুকিয়ে দেবার দিন যত কাছে আসতে থাকে ততই যেন তার সুদও বেড়ে উঠতে থাকে।

এ ঘটনা গ্রামে কী নিদারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল আর মুনশিজিকেই বা কীভাবে অপমানিত হতে হল, সে সব কথা বলতে যাওয়া নিরর্থক। একটা ছোটো গ্রামে এরকম একটা অসাধারণ ঘটনায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার থেকে বেশিই হয়েছিল। মুনশিজির অপমান যতটুকু হবার কথা ছিল তার চেয়ে এক চুলও কম হল না। এই ঘটনার পর থেকে তিনি একঘরেই হয়ে গেলেন। গ্রামের চামারও এখন তার হাত থেকে জল খেতে বা তাকে ছুঁতে রাজি নয়। যদি কারও বাড়িতে খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় কোনো গোরু মারা যায় তাহলে সেই ব্যক্তিকে মাসাবধি দরজায় দরজায় ভিক্ষা মেগে ফিরতে হয়। নাপিত তাকে কামায় না, কাহার তাকে জল তুলে দেয় না, কেউ তাকে ছোঁয় না পর্যন্ত। এই হল গো-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত! ব্রহ্মহত্যার শাস্তি তো এর থেকেও ঢের কঠিন আর অপমানও অনেক বেশি। মুঙ্গা তা জানত আর তাই সে এই বাড়ির দরজায় এসে মরেছিল। সে এটা বুঝেছিল—আমি বেঁচে থেকে যা করতে পারিনি মরে তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারব। গোবরের ঘুঁটে যখন পুড়ে ছাই হয় তখনই সাধুসন্ত সেই ছাই মাথায় মাখেন। পাথরের ঢেলা আগুনে পুড়ে আগুনের চেয়ে বেশি তেজি ও মারাত্মক হয়ে যায়।

পাঁচ

মুনশি রামসেবক ছিলেন আইনবাজ লোক। আইনের চোখে তো তার কোনো অন্যায় ছিল না। আইনের কোনো ধারা মোতাবেক তো মুঙ্গার মৃত্যু হয়নি। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এর কোনো নজির পাওয়া যাবে না। কাজেই এই জন্য যারা তাকে প্রায়শ্চিত্ত করাতে চেয়েছিল তারা খুবই ভুল করেছিল। কারণ, কাহার যদি জল না দেয়, না দেবে—তিনি নিজেই জল ভরে নেবেন। নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে লজ্জা কোথায়! নাপিত চুল কাটবে না? ভালো। নাপিত দিয়ে কামানোর দরকারই বা কীসের? দাড়ি খুব সুন্দর জিনিস। দাড়ি পুরুষের শোভা ও সৌন্দর্যবর্ধক। আর, সত্যি দাড়ির প্রতি যদি কারও ঘৃণা থেকেও থাকে তবে বাজারে তো এক আনা করে ব্লেডও পাওয়া যায়। ধোপা যদি কাপড় না ধোয় তাতেও পরোয়া নেই, কারণ সর্বত্র এক পয়সা দামে সাবান কিনতে পাওয়া যায়। এক গুলি সাবানে ডজনের উপর কাপড় হাঁসের পালকের মতো সাদা করে কাচা যায়। ধোপা কী খায় যে এত পরিষ্কার করে কাপড় কাচবে? পাথরে আছড়ে আছড়ে তো কাপড়ের বারোটা বাজিয়ে দেয়। নিজেরা পরবে, পয়সা নিয়ে অন্যদের পরতে দেবে, ভাঁটিতে চড়াবে, সোডার জলে ডোবাবে—কাপড়ের দুর্গতির একশেষ করে ছাড়ে। এই জন্যই তো দু-তিন বছরের বেশি একটা

জামা পরা যায় না। তা নইলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দুটো আচকান আর দুটো জামা বানালেই চলত। মুনশি রামসেবক আর তার স্ত্রী সারা দিন তো এসব কথা আলোচনা করে নিজেদের প্রবোধ দিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের তর্কজাল শিথিল হতে লাগল।

এবার তাদের মনে ভয় এসে দানা বাঁধল। রাত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাইরের দরজাটা ভুল করে খোলা পড়েছিল, কিন্তু সেটা বন্ধ করার সাহস আর কারও হল না। শেষ পর্যন্ত নাগিন নিল হাতে প্রদীপ, মুনশিজি নিলেন কুড়ুল আর রামগুলাম নিল দা। তিন জন এই ভাবে সজ্জিতহয়ে কোনো রকমে দরজা পর্যন্ত গেল। তবে মুনশিজি খুব বাহাদুরির পরিচয় দিলেন। কোনো কিছু ঠিক না করেই তিনি দরজার বাইরে যাবার চেষ্টা করলেন। কম্পিত কলেবর হয়েও অত্যন্ত জোরে নাগিনকে বললেন, তুমি খামোখা ভয় পাচ্ছ। সে কি এখানে বসে আছে? কিন্তু তার প্রিয় নাগিন তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে বিরক্তিভরে বলল, তোমার এই ছেলেমানুষি তো ভালো নয়। এইভাবে সমস্যার সমাধান করে তিন জনই রান্নাঘরে এসে খাবার খেতে লেগে গেল।

তবে মুঙ্গা তাদের চোখে ঠাঁই করে নিয়েছিল, তাই নিজেদের ছায়া দেখেও তারা মুঙ্গাকে ভয় পাচ্ছিল। অন্ধকার ঘরের কোণ দেখে তাদের মনে হতে লাগল—মুঙ্গা বসে আছে। সেই হাড্ডিসার শরীর, সেই উশকোখুশকো চুল, সেই পাগলামি, সেই ভীতিপ্রদ চোখ— পা থেকে মাথা পর্যন্ত সেই মুঙ্গা। এই ঘরেই আটা, ডাল ইত্যাদি রাখার কয়েকটা মটকি ছিল, ওখানে কিছু ছেঁড়া কাপড়ও পড়ে ছিল। একটা ইঁদুর ক্ষুধায় কাতর হয়ে (মটকিতে শস্যের চেহারাও দেখা যেত না, তবু সারা গ্রামে একথা চাউড় ছিল যে, এবাড়ি ইঁদুরের স্বর্গরাজ্য) আটা, ডাল ইত্যাদির খোঁজে—যদিও সেসব কোনো দিন মাটিতে পড়ত না— ঘুরতে ঘুরতে ওই ছেঁড়া কাপড়ের নীচে এসে হাজির হয়েছিল। কাপড়ের মধ্যে কী একটা নড়ছে মনে হল। প্রসারিত ছিন্নবস্ত্র মুঙ্গার শীর্ণ পা বলে প্রতিভাত হল। তা দেখে নাগিন আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। মুনশিজি বিমূঢ় হয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন। রামগুলাম ছুটতে গিয়ে পায়ে কী বেধে পড়ে গেল। ইঁদুর বাইরে বেরিয়ে এলে দেখে ওদের চেতনা হল। মুনশিজি সাহস করে মটকির দিকে এগিয়ে গেলে নাগিন বলল, রেখে দাও, তোমার পুরুষালি দেখা গেছে।

মুনশিজি নিজের প্রিয়তমা পত্নীর এই টিটকারিতে খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন—কী, তুমি ভেবেছ আমি ভয় পেয়েছি? আরে, ভয়ের আবার কী হল? মুঙ্গা মরে গেছে। সে কি এখানে এসে বসে আছে? কেন, কাল আমি দরজার বাইরে যাইনি? তুমি আমাকে যেতে দিচ্ছিলে না, তা আমি তো তোমার কথা শুনিনি।

মুনশিজির এই যুক্তিতে নাগিন নিরুত্তর হয়ে গেল। দরজার বাইরে যাওয়া কিংবা তার চেষ্টা করা গতকাল খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। যার সাহসের এমন প্রমাণ পাওয়া যায় তাকে ভিতু বলবে কে? এটা নাগিনের বাড়াবাড়ি।

খাওয়া শেষ করে তিন জনই শোবার ঘরে এল, কিন্তু এখানেও মুঙ্গা পেছন ছাড়ল না। কথা বলা চলল, মনকে প্রবোধ দেওয়া হল, নাগিন রাজা হরদৌল ও রানি সারন্ধার কাহিনি বলল, মুনশিজি কয়েকটা ফৌজদারি মামলার কথা শোনালেন, তবু এসব সত্ত্বেও মুঙ্গার মূর্তি তাদের চোখের সামনে থেকে সরছিল না। একটু খটখট হতেই তিন জন চমকে উঠতে লাগলেন। পাতার

8405

শনশন শব্দ হতেই তিন জনের রোম খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। থেকে থেকে একটা মৃদু আওয়াজ মাটির নীচ থেকে তাদের কানে আসতে লাগল—'তোর রক্ত খাব।'

মধ্যরাতে নাগিনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ছিল অন্তঃসত্ত্বা। তার মনে হল রক্তবর্ণ চোখে, সবল ও ধারালো দন্তপাটি নিয়ে মুঙ্গা তার বুকে চেপে বসে আছে। নাগিন চিৎকার করে উঠল। পাগলের মতো ছুটে উঠানে গিয়ে সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে একাকার। মুনশিজিও আর চিৎকার শুনে চমকে জেগে উঠেছিলেন, কিন্তু ভয়ে চোখ খুলতে পারছিলেন না। অন্ধের মতো দরজা হাতড়াতে লাগলেন। অনেকক্ষণ বাদে দরজা খুঁজে পেয়ে উঠানে এলেন। নাগিন উঠানে পড়ে হাত-পা খিঁচছিল। তিনি তাকে তুলে ভিতরে নিয়ে গেলেন, তবে সারারাত সে আর চোখ খুলল না। ভোরের দিকে সে প্রলাপ বকতে শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যে জ্বর এসে গেল। মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল। সন্ধ্যার সঙ্গো সঙ্গো ঘোর বিকার দেখা দিল আর মধ্যরাতে যখন পৃথিবী আঁধারে নিমগ্ন তখন নাগিন এই সংসার থেকে বিদায় নিল। মুঙ্গার ভয় তার প্রাণ হরণ করল। যতদিন মুঙ্গা বেঁচে ছিল ততদিন সে নাগিনের ফোঁসফোঁসানিকে সর্বদা ভয় পেত। পাগল হয়ে গিয়েও সে কখনও নাগিনের সামনে পড়ত না। তবে আজ সে নিজের প্রাণ দিয়ে নাগিনের প্রাণ নিয়ে নিল। ভয়ের দারুণ ক্ষমতা। সুতো ছাড়া মানুষ হওয়ায় একটা গিটিও দিতে পারে না আর এ হাওয়ায় একটা আস্ত জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছিল।

রাত কেটে গিয়ে দিন বাড়তে লাগল। তবু গ্রামের কাউকে নাগিনের লাশ তুলে নেবার জন্য আসতে দেখা গেল না। মুনশিজি বাড়ি বাড়ি গেলেন, কিন্তু কেউ বেরোল না। খুনির বাড়িতে আসবেই বা কেন? খুনির বাড়ির লাশ কে উঠাবে? এসময়ে মুনশিজির দাপট, তার প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন লেখনীর ভয় কিংবা তার আইনজ্ঞান কোনোটাই কাজে এল না। চারদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে মুনশিজি আবার নিজের বাড়িতেই ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরে শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার। দরজা পর্যন্ত এসে ঘরের ভিতরে আর পা রাখতে পারছিলেন না। বাইরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। বাইরে মুঙ্গা, ভিতরে নাগিন। মন শক্ত করে হনুমান-স্তোত্র জপতে জপতে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তখন তার মনের যা অবস্থা হয়েছিল তা তিনিই জানেন। তা অনুমান করাও কঠিন। ঘরে স্ত্রীর লাশ, আগে পিছে সাহায্য করার কেউ নেই। দ্বিতীয় বার বিবাহ হতে পারে, কারণ এই ফাল্গুনেই তো মাত্র পঞ্চাশে পা দিয়েছেন। তবে এমন সুযোগ্যা মধুরভাষিণী স্ত্রী কোথায় পাওয়া যাবে? বড়ো আপশোশের কথা! তাগাদাকারীদের সঙ্গো এখন কে আর তর্ক করবে? কেই বা তাদের নিরুত্তর করবে? লেনদেনের হিসাব এত ভালোভাবে কে আর করবে? কার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ আর ঋণগ্রহীতাদের বক্ষচুম্বন করবে? এত ক্ষতি আর পূরণ হবার নয়। পরের দিন লাশ ঠেলা গাড়িতে চাপিয়ে মুনশিজি গঙ্গার দিকে নিয়ে চললেন।

ছয়

মৃতদেহের সঙ্গো যাবার মতো কেউ আর ছিল না। এক, স্বয়ং মুনশিজি আর দুই, তার পুত্ররত্ন রামগুলামজি। এতটা অসম্মান কিন্তু মুঙ্গার মৃতদেহের বেলাতেও হয় নি।

মুঙ্গা নাগিনের প্রাণ নিয়েও কিন্তু মুনশিজিকে ছাড়ল না। তার মনে সব সময় মুঙ্গার মূর্তি বিরাজমান থাকত। যেখানেই থাকুন না কেন তার চিন্তা এতেই আবদ্ধ থাকত। যদি চিত্তবিনোদনের

কোনো উপায় থাকত তাহলে হয়তো মুনশিজি এতটা অস্থির হয়ে পড়তেন না। গ্রামের কেউই তার দরজায় উঁকি দিয়েও দেখত না। বেচারা নিজ হাতেই জল ভরতেন, নিজেই বাসন মাজতেন। অনুশোচনা ও ক্রোধ, চিন্তা ও ভয়—এই সব শত্রুর সামনে একটা মাথা কত দিন আর ঠিক থাকতে পারে, বিশেষ করে সে মাথা যদি রোজ আইনের কচকচানিতে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে!

একা বন্দীর মতো কোনো প্রকারে দশ-বারো দিন তো কাটল। চোদ্দো দিনের দিন মুনশিজি কাপড় পালটে দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে কাছারির দিকে গেলেন। তাকে দেখে কিছুটা প্রফুল্ল মনে হল—'আমি যেতেই মক্কেলরা আমাকে ঘিরে ধরবে, তাদের শোক জানাবে, আর আমিও দুফোঁটা চোখের জল ফেলব। তারপর আবার বেনাম দলিল, বন্ধকি দলিল ও আদেশনামার ভিড় লেগে যাবে। হাতে টাকা আসবে, সন্ধ্যায় একটু নেশাটেশা করা যাবে। এই নেশা জমছে না বলেই তো মন একেবারে উচাটন হয়ে পড়েছে।' — এই সব ভাবতে ভাবতে মুনশিজি কাছারি পৌঁছুলেন।

কিন্তু কোথায় সেখানে বন্ধকি দলিলের রমরমা, কোথায়ই বা বেনাম দলিলের বন্যা কিংবা মক্কেলের ভিড়! তার বদলে দেখা গেল নিরাশার বালুকাভূমি। বান্ডিল খুলে কাগজপত্র নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা সত্ত্বেও কেউ একবার কাছে এল না। একথাটা পর্যন্ত কেউ জিজ্ঞাসা করল না যে, আপনি কেমন আছেন। নতুন মক্কেলের কথা বাদই দিলাম, বড়ো বড়ো পুরনো মক্কেল যাদের সঙ্গে মুনশিজির কাজের সম্পর্ক ছিল, তারাও আজ মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে লাগল। সেই অপদার্থ, আনাড়ি রমজান যাকে দেখে মুনশিজি ঠাট্টা করতেন, যে ঠিক করে কিছু লিখতেও পারতে, আজ তার গোপিনীদের দলে কৃষ্ণের অবস্থা। হায় রে ভাগ্য! মক্কেলরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে, যেন কারও সঙ্গে কোনো চেনাজানাই নেই। সারাদিন কাছারির মাটি ছেনে নিরাশা আর চিন্তায় ডুব দিয়ে মুনশিজি বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। তিনি বাড়ির দিকে এগোচ্ছেন আর মুঙ্গার ছবি তার সামনে দিয়ে আনাগোনা শুরু করল। অবস্থা এমন হল যে, দরজা খুলে তিনি যেই ঘরে ঢুকতে যাবেন অমনি রামগুলামের দুই কুকুর, যে দুটোকে সে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল, সে-দুটো ছুটে বেরিয়ে গেল আর মুনশিজিও ভয় পেয়ে চিৎকার করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লেন।

মানুষের মনে ও মস্তিষ্কে ভয়ের যত প্রভাব তত আর কোন কিছুরই নয়। প্রেম, চিন্তা, নিরাশা, ক্ষতি — এসব মনকে বিচলিত করে ঠিকই, তবে এসব হল হাওয়ার হালকা ঝাপটা। আর ভয় হল প্রচণ্ড আঁধি। এরপর মুনশিজির কী হল জানা যায় না। কয়েকদিন অবশ্য লোকে তাকে কাছারি যেতে এবং সেখান থেকে বিপর্যস্ত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখেছে। কাছারি যাওয়াটা তার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ত, কারণ সেখানে মক্কেলের আকাল থাকলেও পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিংবা তাদের বুঝিয়ে মানাবার জন্য ওই একটাই উপায় ছিল। এরপর কয়েকমাস আর মুনশিজির দেখা পাওয়া গেল না। তিনি বদ্রীনাথ চলে গিয়েছিলেন। একদিন গ্রামে এক সাধু এলেন। তাঁর শরীরময় বিভূতি, মাথায় লম্বা জটা, হাতে কমণ্ডলু। তাঁর চেহারার সঙ্গে মুনশি রামসেবকের চেহারার অনেক সাদৃশ্য ছিল। কথাবার্তাতেও খুব একটা পার্থক্য ছিল না। তিনি একটা গাছের নীচে ধুনি জ্বালিয়ে বসে গেলেন। সেই রাত্রেই মুনশি রামসেবকের বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। আগুনের শিখাও দেখা গেল আর সে আগুন বেড়েও উঠল। গ্রামের কয়েকশো লোক ছুটে গেল। তারা আগুন নেভাতে গেল না, গেল তামাশা দেখতে। গরিবের অভিশাপের কী ক্ষমতা! মুনশিজি

বেপাত্তা হয়ে যাবার পর রামগুলাম তার মামার বাড়ির চলে গিয়েছিল। সেখানে সে কিছুদিন ছিল। তবে সেখানে তার চালচলন কারও পছন্দ হয়নি।

একদিন সে কোনো একজনের খেত থেকে চুরি করে মুলো তুলেছিল বলে তাকে উত্তমমধ্যম দেওয়া হয়েছিল। এতে সে এত বিগড়ে গেল যে, সেই লোকের ফসল মরাইয়ে এলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। সমস্ত ফসল পুড়ে খাক হয়ে গেল। হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হল। অনুসন্ধান করে পুলিশ রামগুলামকে ধরল। এই অপরাধে সে এখনও চুনারের 'রিফর্মেটরি' স্কুলে রয়েছে।

(গরীব কী হায় / ১৯১১)

অনুবাদ অমলকুমার রায়

নিমকের দারোগা

নিমকের নতুন দপ্তরটি যখন খোলা হল এবং ঈশ্বরদত্ত এই বস্তুটির ব্যবসা নিষিদ্ধ হয়ে গেল তখন লোকে লুকিয়ে চুরিয়ে এর ব্যাবসা করতে লাগল। অনেক রকমের ছল চাতুরীর সূত্রপাত হল। কেউ ঘুষঘাষ দিয়ে কাজ হাসিল করত, কেউ বা চালাকি করে। অফিসারদের পোয়াবারো। পাটোয়ারিগিরির সর্ব-সম্মানিত পদ ছেড়েছুড়ে দিয়ে লোকে এই দপ্তরের বরকন্দাজগিরি করত। এখানকার দারেগাদের জন্য তো উকিলদের জিভেও জল আসত। যুগটা ছিল এমন যখন ইংরেজি শিক্ষা আর খ্রিস্ট ধর্মকে লোকে ভাবত একই জিনিস। ফারসির প্রাবল্য ছিল। প্রেমের উপাখ্যান আর শৃঙ্গার রসের কাব্য পড়ে ফারসি-জানা মানুষেরা সর্বোচ্চ পদগুলোয় বহাল হয়ে যেতেন। মুনশি বংশীধরও জুলেখার বিরহগাথা শেষ করে মজনু ও ফরহাদের প্রেম-বৃত্তান্তকে নল ও নীলের লড়াই এবং আমেরিকা আবিষ্কারের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিয়ে রোজগারের খোঁজে বেরোলেন। তবে তাঁর পিতা ছিলেন একজন অভিজ্ঞ পুরুষ। ছেলেকে বোঝালেন—বাবা! সংসারের দুর্দশা তো দেখতে পাচ্ছ, ধারদেনার বোঝার নীচে চাপা পড়ে আছি। মেয়েগুলো রয়েছে, ওরা তো দূর্বাঘাসের মত বেড়ে উঠছে। আমি হচ্ছি নদীর ধারের গাছ, জানি না কবে পড়ে যাব এখন তুমিই কার্যত বাড়ির কর্তা। চাকরির বেলায় পদটার দিকে তাকিয়ো না, ও তো পিরের দরগা। লক্ষ্য রাখবে ঢাকা-দেওয়া চাদরটার ওপর কে কী ফেলছে। এমন চাকরি খুঁজবে যেখানে কিছু উপরি আয় আছে। মাসকাবারি মাইনে তো পূর্ণিমার চাঁদ, যা একটি দিন দেখা দিয়ে তারপর ক্ষইতে ক্ষইতে শেষে উবে যায়। উপরি আয় বহমান স্রোত, যা দিয়ে সব সময় তেষ্টা মেটে। বেতন দেয় মানুষে, তাই তাতে বৃদ্ধি নেই। উপরি রোজগার দেন ভগবান, তাই তার ক্ষয় নেই। তুমি নিজে বিদ্বান, তোমাকে আর কী বলব? এ ব্যাপারে বুদ্ধি-বিবেচনার বড়ো দরকার। মানুষকে দেখবে, তার প্রয়োজনটাকে দেখবে আর সুযোগ দেখবে, তারপর যা ভালো মনে হয় করবে। গরজওয়ালা লোকের সঙ্গে কড়াকড়ি করলেই লাভ। তবে বেগরজি লোককে নিজের কবজাতে পাওয়াটা একটু কঠিন। আমার কথাগুলোকে মনে গেঁথে নাও। এ আমার সারাজীবনের উপার্জন।

এভাবে উপদেশ দিয়ে পিতা আশীর্বাদ করলেন। বংশীধর আজ্ঞাবহ পুত্র। কথাগুলো মন দিয়ে শুনে বাড়ি থেকে রওনা হলেন। বিরাট এই সংসার-ক্ষেত্রে শুধু ধৈর্য তাঁর বন্ধু, বুদ্ধি তাঁর পথপ্রদর্শক এবং স্বাবলম্বন তাঁর সহায়। তবে শুভক্ষণে যাত্রা করেছিলেন, যেতেই নিমক-দপ্তরের দারোগাপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। বেতন ভালো, আর উপরি আয়ের তো ঠিকঠিকানাই নেই। শুভ সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ মুনশিজির আনন্দের আর সীমা রইল না, মহাজনেরা খানিকটা নরম হল, আশালতা দুলে উঠল। পাড়াপড়শিদের হৃদয়ে শূল বিঁধতে লাগল।

দুই

শীতকাল, রাতের বেলা। নিমকের সেপাই, চৌকিদারগুলো সব নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। মুনশি বংশীধর এ জায়গায় এসেছেন এখনও ছমাসের বেশি হয়নি, কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর কর্মদক্ষতা এবং উত্তম আচরণে অফিসারদের মোহিত করে ফেলেছেন। অফিসাররা তাঁকে খুব বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

নিমকের দপ্তর থেকে মাইল খানেক পূর্ব দিক দিয়ে যমুনা নদী বয়ে চলেছে, ওর উপরে নৌকা দিয়ে একটি পুল বানানো। দারোগা সাহেব দরজা বন্ধ করে সুখনিদ্রায় নিদ্রিত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে নদীর জলকল্লোলের জায়গায় গাড়িঘোড়ার গড়গড়ানি এবং মাল্লাদের কোলাহল শুনতে পেলেন। উঠে বসলেন তিনি। এত রাতে গাড়ি নদী পেরোচ্ছে কেন? নির্ঘাত কিছু না কিছু গোলমাল আছে। যুক্তিতর্ক সন্দেহটাকে বাড়িয়ে তোলে। ইউনিফর্ম পরে, পিস্তলটাকে পকেটে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে নিমেষের মধ্যে তিনি পুলে এসে পৌঁছলেন। দেখলেন গাড়ির একটা লম্বা সারি পুল পেরিয়ে যাচ্ছে। ধমক দিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—এসব গাড়ি কার?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। লোকগুলোর মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস শুরু হল। তারপর সামনের লোকটি বললে—পণ্ডিত অলোপিদিনের।

— কে পণ্ডিত অলোপিদিন?

— দাতাগঞ্জের।

মুনশি বংশীধর চমকে উঠলেন। পণ্ডিত অলোপিদিন এ এলাকার সবচেয়ে মানী জমিদার। লাখ লাখ টাকার তাঁর লেনদেন, এ অঞ্চলে কী ছোটো কী বড়ো কে এমন আছে যে তাঁর কাছে ঋণী নয়। ব্যাবসাটাও বেশ বড়োসড়ো। বড়ো ধড়িবাজ লোক। ইংরেজ অফিসাররা তাঁর এলাকায় শিকার করতে এসে তাঁরই অতিথি হন। বারোটি মাস তাঁর সদাব্রত চলে।

মুনশিজি জিজ্ঞেস করেন, গাড়ি যাবে কোথায়? উত্তর আসে, কানপুর। গাড়িতে কী আছে, এ প্রশ্নে আবার নীরবতা ছেয়ে যায়। দারোগাসাহেবের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। কিছুক্ষণ উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে চেঁচিয়ে বলেন—তোমরা কি সব বোবা নাকি? আমি জিজ্ঞেস করছি, এ গাড়িগুলোতে কী চাপানো আছে?

এবারেও কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি ঘোড়াটাকে একটি গাড়ির গা ঘেঁসে দাঁড় করিয়ে বস্তা হাতড়ে দেখেন। সন্দেহ দূর হয়ে যায়। সবই নুনের ডেলা বোঝাই।

তিন

পণ্ডিত অলোপিদিন তাঁর সুসজ্জিত শকটটিতে চড়ে খানিকটা ঘুমুতে ঘুমুতে খানিকটা জাগতে জাগতে আসছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন গাড়োয়ান ঘাবড়ে গিয়ে এসে তাঁকে জাগিয়ে বলে—মহারাজ! দারোগা গাড়ি আটকে দিয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে আপনাকে ডাকছেন।

লক্ষ্মীঠাকরুনের উপরে পণ্ডিত অলোপিদিনের অগাধ আস্থা। তিনি বলতেন, ইহসংসারের কথা তো ছার, স্বর্গেও লক্ষ্মীরই রাজত্ব। তাঁর কথাটা যথার্থও বটে। ন্যায়-নীতি সবই তো লক্ষ্মীর হাতের পুতুল, ওদের তিনি যেমন খুশি নাচান। অলোপিদিন শুয়ে শুয়েই গর্বভরে বললেন, চলো,

আমি যাচ্ছি। একথা বলে পণ্ডিতজি খুবই নিশ্চিন্ত মনে ধীরে সুস্থে পানের খিলি সেজে খেলেন। তারপর গায়ে বালাপোশ জড়িয়ে দারোগার কাছে এসে বললেন—বাবুজি, আশীর্বাদ। বলুন, কী এমন অপরাধ করলাম যে গাড়িগুলো সব আটক করা হয়েছে? আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের উপরে তো আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকা উচিত।

বংশীধর রুক্ষস্বরে বললেন—সরকারি হুকুম।

পণ্ডিত অলোপিদিন হেসে বললেন—আমি সরকারি হুকুম জানিনা, সরকারকেও চিনি না। আমার সরকার তো আপনিই। এ তো আমার আপনার ঘরোয়া ব্যাপার। আমি কি আপনার পর হতে পারি? আপনি মিছিমিছি কষ্ট করলেন। এখান দিয়ে যাব আর এ ঘাটের দেবতাকে পূজা দেব না, এ কি একটা কথা নাকি? আমি নিজেই তো আপনার সেবায় আসছিলাম।

বংশীধরের মনে ঐশ্বর্যের মোহন বাঁশি কোনো দোলা দেয় না। সততার নবীন উচ্ছ্বাস। গর্জে উঠে বলেন—যারা কানাকড়ির দামে ধর্ম বেচে দেয় সে নিমকহারামদের দলে আমি নেই। আপনাকে আটক করা হল। আইন অনুসারে আপনাকে চালান করা হবে। ব্যস, বেশি কথা বলার সময় নেই আমার। জমাদার বদলু সিংহ! এঁকে হাজতে নিয়ে চলো, আমি হুকুম দিচ্ছি।

পণ্ডিত অলোপিদিন স্তম্ভিত হয়ে যান। গাড়োয়ানদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম পণ্ডিতজিকে এতটা কড়া কথা শুনতে হল। বদলু সিংহ এগিয়ে যায় বটে কিন্তু পণ্ডিতজির প্রতিপত্তির কথা ভেবে তাঁর হাত ধরতে সাহস করে না। ধর্মের হাতে অর্থের এমন অনাদর পণ্ডিতজি জীবনে দেখেননি। ভাবেন, ও এখনও একগুঁয়ে যুবক। মায়ামোহের জালে এখনো জড়ায়নি। ছেলেমানুষ, তাই সংকোচ করছে। বড়ো করুণভাবে বলেন—বাবুসাহেব! অমন করবেন না, আমি শেষ হয়ে যাব। ইজ্জত সব ধুলোয় মিশে যাবে। আমাকে অপমান করে আপনার কী লাভ হবে? আমাকে পর ভাববেন না।

বংশীধর কঠোর স্বরে কলেন—আমি এসব কথা শুনতে চাই না।

অলোপির্দিন যে অবলম্বনটিকে কঠিন শিলাখণ্ড বলে ভেবেছিলেন, সেটি পায়ের নীচ থেকে সরে গেছে বলে মনে হল। তাঁর আত্মাভিমান এবং ধন-ঐশ্বর্য প্রচণ্ড আঘাত পায়। তবে এখনো মুদ্রার সংখ্যাগত শক্তিতে তাঁর পুরো ভরসা রয়েছে। গোমস্তাকে বলেন—লালাজি, হাজারটি টাকার নোট বাবুসাহেবকে নজরানা দাও, উনি এখন ক্ষুধার্ত সিংহ হয়ে আছেন।

বংশীধর গরম হয়ে বললেন—এক হাজার কেন, এক লাখও আমাকে ন্যায়ের পথ থেকে টলাতে পারবে না।

ধর্মের নির্বোধ দৃঢ়তা এবং দেবদুর্লভ ত্যাগ দেখে অর্থ খুবই ক্ষুব্ধ হয়। তারপর উভয় শক্তির মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়। অর্থ লাফিয়ে লাফিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে। এক থেকে পাঁচ, পাঁচ থেকে দশ, দশ থেকে পনেরো তারপর শেষে পনেরো থেকে বিশহাজার পর্যন্ত পৌঁছায়, কিন্তু ধর্ম অলৌকিক বীরত্বের সঙ্গে এই বহুসংখ্যক সেনাদলের সম্মুখে একাকী একটি পর্বতের মত অটল, অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অলোপিদিন হতাশ হয়ে বলেন—এর চাইতে বেশি আর আমার সাহস নেই। এরপর আপনার বিচার।

বংশীধর জমাদারকে হাঁক দেন। বদলু সিংহ মনে মনে দারোগা সাহেবের মুণ্ডুপাত করতে করতে পণ্ডিত অলোপিদিনের দিকে এগিয়ে যায়। পণ্ডিতজি ভয় পেয়ে দু-তিন পা পিছিয়ে যান। একান্ত কাতর মিনতি করে বলেন—বাবুসাহেব, ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন, পঁচিশ হাজারে রফা করতে আমি রাজি আছি।

— সে অসম্ভব।

— তিরিশ হাজারে?

— কোনো মতেই সম্ভব নয়।

— চল্লিশ হাজারেও কি নয়?

-- চল্লিশ হাজার কেন, চল্লিশ লাখেও অসম্ভব। বদলু সিংহ, এই লোকটাকে এক্ষুনি গ্রেপ্তার কর। আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না।

ধর্ম অর্থকে পায়ের তলায় পিষে ফেলে। অলোপিদিন একজন হৃষ্টপুষ্ট মানুষকে হাতকড়া নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখেন। চারদিকে হতাশ ও কাতর নয়নে তাকান। তারপর হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান।

চার

জগৎসংসার সে সময় ঘুমোচ্ছিল বটে, কিন্তু তার জিভটা জেগে ছিল। সকাল হতেই দেখা গেল বালক বৃধ্ব সবার মুখেই খবরটা শোনা যাচ্ছে। যাকেই দেখুন সেই পণ্ডিতজির এই কাণ্ড নিয়ে টিপ্পনী কাটছে। নিন্দার বৃষ্টি হচ্ছে যেন পৃথিবী থেকে এখন পাপীর পাপতাপ শেষ হয়ে গেছে। জলকে দুধ বলে চালায় যে গয়লা, ভুয়া রোজনামচা লিখে খাতা ভর্তি করে যে সব অফিসার, রেলে বিনা টিকিটে সফর করে যেসব বাবু, জাল দলিল দস্তাবেজ তৈরি করে যেসব শেঠ সাহুকার—তারা সবাই ঘাড় নেড়ে নেড়ে কথাটা বলছে যেন তারা নিজেরা সব এক একটি দেবতা।

পরদিন পণ্ডিত অলোপিদিন যখন অভিযুক্ত হয়ে কনেস্টেবলদের সঙ্গে হাতে হাতকড়ি, মনে গ্লানি ও ক্ষোভ নিয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করে আদালতের দিকে যান, তখন সারা শহরে হুলুস্থুল পড়ে যায়। মেলাতেও বোধহয় সবার চোখ এতটা ব্যাকুল থাকে না। ভিড়ের চোটে ছাদে আর দেওয়ালে কোনো তফাত ছিল না।

তবে আদালতে পৌঁছুতেই যেটুকু দেরি। পণ্ডিত অলোপিদিন এই বিশাল বনের সিংহ। অফিসাররা তাঁর ভক্ত, আমলারা তাঁর সেবক, উকিল-মোক্তাররা তাঁর আজ্ঞাবহ আর আরদালি, চাপরাশি ও চৌকিদাররা তো তাঁর বিনা মাইনের গোলাম। তাঁকে দেখেই লোকেরা চারদিক থেকে ছুটে আসে। সবাই অবাক, অবাক একথা ভেবে নয় যে অলোপিদিন কেন একাজ করলেন, বরং একথা ভেবে যে আইনের হাতে উনি ধরা পড়লেন কী করে। অসাধ্য সাধন করে এমন সম্পদ এবং অনন্য বাক্‌পটুতা যার করায়ত্ত, এমন একজন মানুষ কেন আইনের হাতে ধরা পড়বে? প্রতিটি লোক তাঁকে সহানুভূতি দেখাচ্ছে। এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য খুবই তৎপরতার সঙ্গে উকিলদের একটি বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়। ন্যায়বিচারের রণাঙ্গনে ধর্ম ও অর্থের সংগ্রাম শুরু হয়।

বংশীধর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে সত্য ছাড়া না আছে কোনো শক্তি, স্পষ্ট ভাষণ ছাড়া না আছে কোনো হাতিয়ার। সাক্ষীরা রয়েছে বটে, তবে তারাও লোভে টলোমলো।

এমনকী, মুনশিজিরও মনে হল ন্যায়ও তাঁর প্রতি কিছুটা রুষ্ট। এটি ন্যায়বিচারের দরবার হলেও এখানকার কর্মচারীদের উপরে পক্ষপাতিত্বের নেশা চেপেছে। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব আর ন্যায়বিচারের মধ্যে মিল কোথায়? যেখানে পক্ষপাতিত্ব, সেখানে ন্যায়বিচারের কল্পনাও করা যায় না। মোকদ্দমা শিগগিরই মিটে যায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে লেখেন—পণ্ডিত অলোপিদিনের বিরুদ্ধে পেশ করা সমস্ত প্রমাণ ভিত্তিহীন এবং ভ্রমাত্মক। তিনি একজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক। সামান্য লাভের জন্য এমন দুঃসাহস করবেন এটা কল্পনাতীত। যদিও নিমকের দারোগা মুনশি বংশীধরের দোষ বেশি নেই তবু এটা বড়ো দুঃখের বিষয় যে, তাঁর একগুঁয়েমি এবং অবিচারের ফলে একজন ভালোমানুষকে হয়রানি সহ্য করতে হল। আমরা সন্তুষ্ট এজন্য যে, তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন, তবে নিমক দপ্তরের দিনে দিনে বেড়ে চলা নিমকহালালি তাঁর বিবেক ও বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁর হুঁশিয়ার হয়ে চলা উচিত।

উকিলরা এই রায় শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। পণ্ডিত অলোপিদিন হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। স্বজন বান্ধবেরা টাকার হরির লুট দিলেন। উদারতার সাগর উথলে উঠল। তার ঢেউগুলো আদালতের ভিতটাকেও নাড়িয়ে দেয়। বংশীধর যখন বাইরে এলেন তখন চারদিক থেকে তাঁর উপরে ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হতে থাকে। চাপরাশিরা খুব ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম করতে থাকে। এই সময়ের একটি কটুবাক্য, এক একটি ইঙ্গিত বংশীধরের অহংকারের আগুনকে জ্বালিয়ে দিতে থাকে। এই মোকদ্দমায় জিতলেও বোধ হয় তিনি এতটা মাথা উঁচু করে চলতেন না। আজ সংসারে একটা দুঃখজনক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল তাঁর। দেখলেন ন্যায়নিষ্ঠা এবং বিদ্যাবত্তা, লম্বা চওড়া উপাধি, বড়ো বড়ো দাড়ি আর ঢোলা আচকান কোনোটিই সত্যিকারের সম্মানের পাত্র নয়।

বংশীধর অর্থের সঙ্গে শত্রুতা যেচে নিয়েছেন। তার মূল্য তাকে পরিশোধ করতেই হবে। বড়োজোর একটি সপ্তাহ কেটেছে কি কাটেনি, সাময়িক বরখাস্তের পরোয়ানা এসে পৌঁছায়। কর্তব্যপরায়ণতার দণ্ড মেলে। বেচারা ভগ্নহৃদয়ে, শোকে দুঃখে ব্যথিত মনে বাড়ি ফিরে যান। বুড়ো মুনশিজি তো আগে থেকেই গজর গজর করছিলেন যে, যাবার সময় ছেলেটাকে পইপই করে বোঝালাম কিন্তু ছেলেটা একটা কথাও শুনল না। সবই নিজের খেয়াল খুশিমতো করছে। আমি এদিকে মহাজন আর সুদখোর বেনের তাগাদার ঝক্কি পোয়াব, বুড়ো বয়সে ভক্ত সেজে বসব আর ওখানে শুধু ওই শুকনো বেতন। আমরাও তো চাকরি করেছি, কোনো উঁচু পদেও ছিলাম না, কিন্তু রোজগার যা করেছি, চুটিয়ে করেছি। আর উনি ইমানদার হতে চলেছেন। নিজের ঘর অন্ধকার, মসজিদে বাবুর বাতি চাই। ধিক্ অমন বুদ্ধিকে। লেখাপড়া সবই ভস্মে ঘি ঢালা।

এর অল্প কদিন পরেই মুনশি বংশীধর এই দুরবস্থা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। বুড়ো বাবা তখন সব খবর শুনে নিজের কপাল চাপড়াতে থাকেন। বলেন—ইচ্ছে করছে তোমার আমার দুজনেরই মাথায় বাড়ি মারি। অনেকক্ষণ ধরে ক্ষোভে-দুঃখে হাত কামড়াতে থাকেন। রেগেমেগে কিছু কড়া কথাও বলে ফেলেন। বংশীধর যদি ওখান থেকে চলে না যেতেন তাহলে নিশ্চয়ই ক্রোধটা বিকট রূপ ধারণ করত। বৃদ্ধা মায়েরও দুঃখ হয়। তাঁর জগন্নাথধাম আর রামেশ্বর যাত্রার সাধ ধুলোয় মিশে যায়। গিন্নি তো কদিন ভালো করে কথাই বলেন না।

এভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা, বুড়ো মুনশিজি বসে বসে রামনামের মালা জপছেন। এমন সময় তাঁদের দরজায় একটি সাজানো রথ এসে দাঁড়াল। সবুজ আর গোলাপি পর্দা। একজোড়া পশ্চিমা বলদ, তাদের গলায় নীল সুতো, শিংগুলো পেতল দিয়ে মোড়া। লাঠি-কাঁধে কয়েকজন চাকর সঙ্গে। মুনশিজি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করতে ছুটলেন। দেখেন পণ্ডিত অলোপিদিন। নত হয়ে দণ্ডবৎ করে খোশামুদি করে কথা বলতে শুরু করেন— কী ভাগ্য আমাদের! তাই আপনার শ্রীচরণের ধুলো আমাদের দুয়ারে পড়েছে। আপনি আমাদের পূজনীয় দেবতা, আপনাকে কী করে মুখ দেখাব, আমাদের মুখে তো চুনকালি পড়েছে। কিন্তু কী করব, কুসন্তান হতভাগা ছেলে আমার, না হলে আপনার কাছে কেন আমার মুখ লুকোতে হবে? হায়! এমন পুত্র না দিয়ে ঈশ্বর যদি আমায় নিঃসন্তান রাখতেন।

অলোপিদিন বললেন—না দাদা, ও কথা বলবেন না।

মুনশিজি অবাক হয়ে বললেন—এমন সন্তানকে কী আর বলব?

অলোপিদিন বাৎসল্য-মাখা স্বরে বললেন—কুলতিলক ও বংশের কীর্তি উজ্জ্বল করে এমন ন্যায়পরায়ণ মানুষ কজন পৃথিবীতে হয়, যাঁরা ধর্মের জন্য নিজেদের সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন?

পণ্ডিত অলোপিদিন বংশীধরকে বললেন—দারোগা সাহেব, খোশামুদি করছি ভাববেন না। খোশামুদি করার জন্য আমার এতটা কষ্ট করার দরকার ছিল না। সেদিন রাতে আপনি আপনার ক্ষমতাবলে আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, আর আজ আমি স্বেচ্ছায় আপনার কাছে গ্রেপ্তার হতে এসেছি। আমি হাজার হাজার ধনী মানী দেখেছি, হাজার হাজার উঁচু পদাধিকারীর সঙ্গে কাজ করেছি, কিন্তু আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন শুধু আপনি। আমি সবাইকে আমার আর আমার অর্থের ক্রীতদাস বানিয়ে ছেড়েছি। আমাকে অনুমতি দিন আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা করি।

বংশীধর অলোপিদিনকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন বটে, তবে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে। ভেবেছেন এই মহাশয়টি তাঁকে লজ্জা দিতে আর জ্বালাতন করতে এসেছেন। ক্ষমাপ্রার্থনার চেষ্টা করেন নি, উলটে তাঁর বাবার ওই তেলমাখানো কথাগুলো তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। এখন পণ্ডিতজির কথা শুনে মনের ময়লা দূর হয়ে যায়। ভাসা ভাসা চোখে পণ্ডিতজির দিকে তাকান। সদ্ভাবের আভাস চোখে পড়ে। আত্মাভিমান এবার লজ্জার কাছে নতি স্বীকার করে। লজ্জা পেয়ে বলেন— আপনি মহৎ তাই একথা বলছেন। আমি যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছি, তার জন্য ক্ষমা করুন। আমি ধর্মের শৃঙ্খলে বন্দী ছিলাম, তা নইলে তো আপনার সেবক। যা আদেশ করবেন, তাই আমার শিরোধার্য।

অলোপিদিন বিনীতভাবে বলেন—নদীর ধারে সেদিন আপনি আমার প্রার্থনা স্বীকার করেন নি, কিন্তু আজ স্বীকার করতেই হবে।

বংশীধর বলেন—আমি কীসের যোগ্য, তবু আমার দ্বারা যেটুকু সেবা সম্ভব, তাতে ত্রুটি হবে না।

অলোপিদিন একখানি স্ট্যাম্প লাগানো কাগজ বের করে বংশীধরের সামনে রেখে বলেন— এই পদটি আপনি গ্রহণ করুন আর এতে আপনার স্বাক্ষর করে দিন। আমি ব্রাহ্মণ, যতক্ষণ না আপনার সম্মতি পাই, আমি দরজা ছেড়ে নড়ব না।

কাগজখানা পড়ে কৃতজ্ঞতায় মুনশি বংশীধরের দু-চোখ জলে ভরে ওঠে। পণ্ডিত অলোপিদিন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির স্থায়ী ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন তাঁকে। ছয় হাজার টাকা বার্ষিক বেতন ছাড়াও দৈনন্দিন খরচ আলাদা — চড়বার জন্য ঘোড়া, থাকবার জন্য বাংলো, চাকরবাকর মুফতে। কম্পিত স্বরে বলেন—পণ্ডিতজি, আপনার উদারতার প্রশংসা করতে পারি আমার এমন ভাষা নেই। কিন্তু আমি যে এই উচ্চপদের যোগ্য নই।

অলোপিদিন হেসে বলেন—এখন আমার একজন অযোগ্য মানুষই দরকার।

বংশীধর গম্ভীরভাবে বলেন—এমনিতেই আমি আপনার সেবক। আপনার মতো কীর্তিমান, সজ্জন পুরুষের সেবা করা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমার না আছে বিদ্যা, না বুদ্ধি, না তেমন চরিত্রগুণ যা এসব অভাবগুলোকে পূরণ করে দেয়। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য একজন বড়ো অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ মানুষের প্রয়োজন।

অলোপিদিন কলমদান থেকে কলম বের করে সেটিকে বংশীধরের হাতে দিয়ে বলেন—আমার পাণ্ডিত্যের দরকারে নেই, নেই অভিজ্ঞতা, দক্ষতা বা কার্যকুশলতার চাহিদা। এসব গুণের মাহাত্ম্যের পরিচয় আমার পাওয়া হয়ে গেছে। এবার সৌভাগ্য এবং শুভ যোগাযোগ আমাকে এমন একটি রত্নের সন্ধান দিয়েছে যার কাছে যোগ্যতা এবং বিদ্যাবত্তার উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়। এই নিন কলম, বেশি চিন্তা ভাবনা করবেন না। দস্তখতটি করে দিন। পরমেশ্বরের কাছে শুধু এটাই প্রার্থনা — তিনি আপনাকে যেন চিরকাল নদীতীরের সেই স্পষ্টভাষী, উদ্ধত, কঠোর অথচ ধর্মনিষ্ঠ দারোগা করে রাখেন। বংশীধরের চোখ ছলছল করে ওঠে। কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয়ের ক্ষুদ্র পাত্রখানি ছাপিয়ে পড়ে। আর একবার পণ্ডিতজির পানে ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান, তারপর কাঁপা হাতে ম্যানেজারির কাগজখানিতে হস্তাক্ষর দিয়ে দেন।

আলোপিদিন আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

(নমক কা দারোগা) — অনুবাদ ননী শূর

শঙ্খনাদ

ভানু চৌধুরি গাঁয়ের মোড়ল। গাঁয়ে তাঁর খুব মানসম্মান। দারোগাসাহেব আসন ছাড়া ওঁকে মাটিতে বসতে দেন না। মোড়লমশাইর এত দাপট যে ওঁর ইচ্ছে ছাড়া গাঁয়ের একটা পাতাও নড়তে পায় না। যে কোনো ঘটনা তা সে শাশুড়ি-বউয়ের কলহই হোক আর জমি বা জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়াই হোক, চৌধুরিমশাইর কর্তৃত্ব পূর্ণরূপে প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট। উনি অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন, তদন্ত শুরু হয়, সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই কোনো অভিযোগকে সফলভাবে বিচার করতে যেসব বিষয়ের দরকার, সে সব নিয়ে ভেবে দেখা হয় আর চৌধুরিমশাইয়ের দরবার থেকে ফয়সালা হয়ে যায়। কারোই আদালতে যাবার দরকার পড়ে না। হ্যাঁ, এই কষ্ট স্বীকারের জন্য চৌধুরিমশাই কিছু ফি অবশ্যই নিয়ে থাকেন। যদি কখনও ফি পাবার অসুবিধায় ওঁকে ধৈর্যসহকারে কাজ করতে হয় তাহলে গাঁয়ে অনর্থ ঘটে, কেননা চৌধুরিমশাইয়ের ধৈর্য আর দারোগাসাহেবের ক্রোধের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মোটমাট কথা এই যে, চৌধুরিমশাইয়ের শত্রুমিত্র সবাই চৌধুরিমশাই সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে চলেন।

দুই

চৌধুরিমশাইয়ের তিনটি উপযুক্ত ছেলে। বড়ো ছেলে বিতান একজন সুশিক্ষিত মানুষ। ডাকপিয়োনের রেজিস্টারে সই করা পর্যন্তই তার বিদ্যে। বড়ো অভিজ্ঞ, বড়ো অনুভূতিপ্রবণ, সাংসারিক বুদ্ধিতে সুদক্ষ। ফতুয়ার বদলে শার্ট গায়ে দেয়, মাঝেমধ্যে সিগারেটও টানে, যার ফলে ওর মানটা বাড়ে। যদিও বিতানের এসব বাবুগিরি বুড়ো চৌধুরিমশাইয়ের আদৌ পছন্দ নয়, তবু বেচারা নিরুপায়, কেননা আদালত আর আইনকানুনের মামলা মোকদ্দমাগুলো বিতানের হাতে। সে নিজেই এক মূর্তিমান অইনকানুন। আইনের সবগুলো ধারা বিতানের জিভের ডগায়। মিথ্যা সাক্ষী বানাতে পুরোপুরি ওস্তাদ। মেজো ছেলে শান চৌধুরি কৃষি বিভাগের একজন কর্মকর্তা। বুদ্ধিতে মোটা, তবে শারীরিক দিক থেকে বেশ পরিশ্রমী। যেখানে ঘাসও জন্মায় না সেখানেও সে সোনা ফলিয়ে ছাড়ে। তৃতীয় ছেলেটির নাম গুমান। ছেলেটি যেমন রসিক, ঠিক তেমনই গোঁয়ারগোবিন্দ। মহরমের সময় এত জোরে জোরে ঢোল বাজায় যে কানের পর্দা ফেটে যাবার জো। মাছ ধরবার বড়ো শখ। খুব আমুদে যুবক। খঞ্জনি বাজিয়ে যখন সে মিষ্টিগলায় খেয়াল গায় তখন আসর জমে ওঠে। ওর কুস্তি লড়ার এমন বাতিক যে মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়াতে

পারে। কিন্তু বাড়ির লোকগুলো এমনই কাঠখোট্টা যে, গুমানের এসব শখের ওপর ওদের তিলমাত্র সহানুভূতিও নেই। বাপ আর ভাইয়েরা তো ওকে এখন বন্ধ্যা জমি বলেই ধরে রেখেছে। ধমক-ধামক, শিক্ষা, উপদেশ, স্নেহ-ভালোবাসা, কাকুতিমিনতি কোনো কিছুতেই তার মনে কোনো দাগ কাটে না। তবে হ্যাঁ, বউদিরা এখনও ওর ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেয়নি। ওরা এখনও ওকে তেতো ওষুধ গিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কুঁড়েমি এমনি এক রাজসিক ব্যাধি যার হাত থেকে রোগী কখনও নিজেকে বাঁচাতে পারে না। এমন একটা দিন খুব কমই যায় যে দিন বউদিদের কটুকথা গুমানকে শুনতে না হয়। সেসব বিষাক্ত তীর মাঝে মাঝে ওর কঠিন হৃদয়কে বিদ্ধ করলেও, সে ব্যথা এক রাতের বেশি কখনও স্থায়ী হয় না। ভোর হওয়া মাত্রই ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে এই পীড়ারও উপশম হয়ে যায়। ভোর হয়, গুমান হাত মুখ ধোয়, তারপর ছিপ হাতে করে পুকুরের দিকে রওনা হয়। বউদিরা পুষ্পবৃষ্টিকরে, বুড়ো চৌধুরিমশাই পাঁয়তারা কষতে থাকেন, আর দাদারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু আপন খেয়ালে মশগুল গুমানবাবু ওদের মাঝখান দিয়ে এমনভাবে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যায়, দেখে মনে হয় যেন একটি মস্ত হাতি একপাল কুকুরের মাঝখান দিয়ে চলে বেরাচ্ছে। ওকে সঠিক পথে আনবার জন্য কত কী চেষ্টাই না করা হয়েছে। বাপ বুঝিয়ে বলেন—বাবা, এমনভাবে চলো যাতে তুমিও দুটো পয়সা রোজগার করতে পার আর সংসারেরও কিছু সুরাহা হয়। দাদাদের ভরসায় কতদিন থাকবে? আমি তো পাকা আম—আজ না হয় কাল টুপ করে খসে পড়ব। তারপর তোমার চলবে কী করে? দাদারা পুছবেও না, বউদিদের রকমসকম তো দেখতেই পাচ্ছ। তোমরাও বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে, ওদের খাওয়াবে পরাবে কী করে? চাষবাসে মন না লাগে তো বলো পুলিশের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিই? শৌখিন গুমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা শোনে, কিন্তু পাথরের দেবতা, কখনও গলে না। বাবুমশাইয়ের অত্যাচারের দণ্ড ভুগতে হয় ওর স্ত্রী বেচারিকে। সংসারে মেহনতের যতগুলো কাজ সবগুলো ওরই ঘাড়ে চাপানো হয়। সে ঘুঁটে দেয়, কুয়ো থেকে জল তুলে আনে, আটা পেষে, আর এত সব করা সত্ত্বেও জায়েরা ভালো মুখে কথা বলে না, বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। একবার যখন একনাগাড়ে কয়েকদিন সে স্বামীর উপর রাগ করে থাকে তখন গুমানবাবু কিছুটা নরম হয়। বাপকে গিয়ে বলে—আমাকে একটা দোকান খুলে দিন। চৌধুরিমশাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। আনন্দের সীমা থাকে না। কয়েকশো টাকা খরচ করে কাপড়ের একটা দোকান খুলে দেন। গুমানের বরাত খোলে। মলমলের গিলেকরা পাঞ্জাবি বানায়। মলমলের পাগড়িটাকে হালকা সবুজ রঙে ছোপায়। সওদা বিকোক বা না বিকোক, ওর পোয়াবারো! দোকান খোলে, পাঁচ-দশটি প্রাণের বন্ধু এসে আড্ডা জমায়, গাঁজার দম আর খেয়ালের তান চলে—

চল ঝটপট রী, যমুনা তটরী, খড়ো নটখটরী।

এমনি করে তিন মাস সুখে-শান্তিতে কাটে। ফুলবাবু গুমান প্রাণখুলে মনের সাধ মেটায়, শেষ পর্যন্ত পুঁজিপাটা সব উড়ে যায়। চটের টুকরো ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকে না। বুড়ো চৌধুরিমশাই কুয়োতে ঝাঁপ দিতে যান। বউদিরা ভুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেয়—হায়রে হায়! আমাদের ছেলেপুলে আর আমরা একটুকরো কাপড়ের জন্য হা-হুতাশ করে মরছি, মোটা খদ্দরের একটা জামাও জুটছে না, আর এদিকে এতবড়ো একখানা দোকান এই অকর্মার ধাড়ির কফন হয়ে গেল। এখন কী করে কালো মুখ দেখাবে? অনামুখো, কোন মুখে বাড়ি আসবে? ফুলবাবু গুমানের মুখ

কিন্তু একটুও মলিন হয় না। ওই মুখ নিয়েই আবার বাড়ি আসে এবং আবার সেই পুরনো ঢঙেই চলতে থাকে। আইনজ্ঞ বিতান ওর অমন সাজগোজ দেখে জ্বলতে থাকে। সারাদিন আমি গায়ের ঘাম ঝরাব, একটা নয়নসুখের পাঞ্জাবিও আমার জুটবে না, আর এই অপদার্থটা সারাটা দিন বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমুবে আর এভাবে ফুলবাবুটি সেজে বেরোবে? এমন জামাকাপড় তো বোধহয় আমি আমার বিয়েতেও পাইনি। শান্ত সরল শানের মনের ভাবটাও অনেকটা এমনিতর। শেষ পর্যন্ত এই জ্বালা আর সহ্য হয় না, আগুন জ্বলে ওঠে। আইনবিশারদ বিতানের বউ গুমানের সব জামাকাপড় তুলে এনে তাতে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে ওঠে, দেখতে না দেখতে সব কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গুমান কেঁদে ফেলে, দুই দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। বুড়ো চৌধুরি এই দৃশ্য দেখে কপাল চাপড়ান। এ যে বিদ্বেষের আগুন। সংসারটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে তবে নিভবে।

তিন

কাপড়ের আগুনটা তো কিছুক্ষণের মধ্যে নিভে যায়, কিন্তু মনের আগুন আগের মতোই ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। শেষে একদিন বুড়ো চৌধুরিমশাই বাড়ির সব মেম্বারদের জড়ো করে এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বসেন যে, কী করে এ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বিতানকে বলেন—বাবা, তুমি তো দেখলে, দেখতে না দেখতে কয়েকশো টাকা কীভাবে জলে গেল। এভাবে আর তো চলা অসম্ভব। তুমি বুদ্ধিমান, মামলা মোকদ্দমা কর, এমন একটা কিছু রাস্তা বের করো যাতে সংসারটা ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচে। আমি তো চাইছিলাম যে, যে-কটা দিন বাঁচব, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকব, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা দেখছি অন্যরকম।

বিতানের সাংসারিক বুদ্ধি তার চতুরা সহধর্মিণীর সামনে লোপ পেয়ে যায়। সে কী বলবে না বলেবে ভাবছে ততক্ষণে তার গৃহিণী বলে ওঠে—বাবা! বুঝিয়ে সুঝিয়ে আর কাজ হবে না। সইতে সইতে আমাদের বুকটা পাথর হয়ে গেছে। ছেলের জন্য যতখানি টান বাবার মনে থাকবে, ভাইদের তত কেন, তার অর্ধেকও থাকতে পারে না। আমি তো পষ্টাপষ্টি বলছি—আপনার রোজগারে গুমানের হক আছে, ওকে সোনার গ্রাসই খাওয়ান আর রুপোর দোলনাতেই দোলান, আমাদের অত বুকের পাটাও নেই, ক্ষমতাও নেই। আমাদের কুঁড়ে আমরা আলাদা তুলে নেব। হ্যাঁ, আমাদের যা কিছু পাওনা তা আমাদের পাওয়া চাই। ভাগবাঁটোয়ারা করে দিন। একটু লোক হাসাহাসি হবে তো হোক গে, আর কতদিন দুনিয়ার সামনে মান বাঁচিয়ে চলব?

নীতিবিশারদ বিতান যে এই জোরালো বক্তৃতায় বেশ অভিভূত হয়েছে তা তার খুশি খুশি চেহারাতেই প্রকাশ পায়। ওর নিজের এতখানি সাহস ছিল না যে এই প্রস্তাবটাকে এতটা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করতে পারে। নীতিজ্ঞ মহাশয় গম্ভীরভাবে বলেন—স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আপনি বেঁচে থাকতে থাকতেই ভাগবাঁটোয়ারা করে যেতে পারেন, এর নজির রয়েছে। স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো ক্ষমতা জমিদারের নেই।

এরপর মোটাবুদ্ধি শানের পালা আসে। তবে ও বেচারা চাষাভুষো, বলদের পিছনে পিছনে চোখ বুজে চলার লোক,এমন গুরুতর বিষয়ে কী করে মুখ খোলে। দোটানায় পড়ে যায়। তখন ওর

স্পষ্টবাদিনী ধর্মপত্নী বড়ো জায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই কঠিন কার্যটি সম্পন্ন করে। বলে—বড়দি যা বলেছেন, এছাড়া আর কোনো পথ নেই। একজন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রোজগার করবে অথচ একটা পয়সাও নিজে ভোগ করতে পারবে না, গায়ের কাপড়টুকুনও জুটবে না, ওদিকে আরেকজন আরাম করে শুয়ে থাকবে, হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে গিলবে, এমন অরাজক সংসারে আর আমাদের পোষাবে না।

শান চৌধুরিও এই প্রস্তাবে মুক্তকণ্ঠে সায় দেয়। এবারে বুড়ো চৌধুরিমশাই গুমানকে জিজ্ঞেস করেন—কী বাবা, তুমিও কি এতে রাজি? এখনও কিছু বিগড়ায়নি। এ আগুন এখনও নিভতে পারে। মুখ দেখতে কেউ চায় না, সবাই কাজ চায়। বলো, কী বলবে? কাজকর্ম কিছু করবে, না এখনও চোখ খোলেনি?

গুমানের মধ্যে ধৈর্যের অভাব নেই। এক কানে কথা শুনে আরেক কানে তা উড়িয়ে দেওয়া তার নিত্য কর্ম। কিন্তু দাদাদেরকে বউদের এমন আঁচলধরা হতে দেখে ওর মাথাটা গরম হয়ে যায়, বলে—দাদাদের যা ইচ্ছা আমার মনেও তাই। আমিও এই জঞ্জাল থেকে মুক্তি চাইছি। খাটাখাটুনি আমার দ্বারা হয়নি আর হবেও না। যার ভাগ্যে জাঁতাপেষা লেখা আছে, সে পিষুক গে। আমার ভাগ্যে আরাম করা লেখা আছে, আমি কেন ঝঞ্ঝাটে যাব? আমি তো কাউকে কাজ করতে বলি না। আপনারা কেন আমার পেছনে লেগে রয়েছেন? নিজেদের চরকায় তেল দিন না। আধ সের আটার অভাব আমার হবে না।

এমনতর সভা যে কতবার হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সভাগুলোর মতো এতেও কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। দু-তিন দিন গুমান বাড়িতে খেতে আসে না। জতনসিং ঠাকুর শৌখিন লোক, ওঁরই বৈঠকখানায় পড়ে থাকে। শেষে বুড়ো চৌধুরিমশাই গিয়ে সেধে-সুধে নিয়ে আসেন। তারপর আবার সেই পুরানো গাড়ি ঢিমে তেতালায় হেলেদুলে চলতে থাকে।

চার

বামুনের বাড়ির ইঁদুরগুলো যেমন চতুর, চৌধুরিবাড়ির ছেলেপিলেগুলোও তেমনি। ওদের কাছে ঘোড়া বলতে মাটির ঘোড়া আর নৌকো বলতে কাগজের নৌকো। ফলের সম্বন্ধে ওদের অসীম জ্ঞান। ডুমুর আর বুনো কুল ছাড়া এমন কোনো ফলই নেই যাকে ওরা রোগের ডিপো মনে না করে। কিন্তু ফেরিওলা গুরদিনের খোমচায় এমন একটা প্রবল টান রয়েছে যে ওর হাঁক শুনলেই ওদের সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি ব্যর্থ হয়ে যায়। ওরা যদি ঘুমিয়েও থাকে তবু আর পাঁচটা ছেলের মতো চমকে উঠে বসে। গুরদিন ঐ গাঁয়ে হপ্তায় হপ্তায় ফেরি নিয়ে আসে। ওর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় আর আকাঙ্ক্ষায় কত ছেলের কিন্ডারগার্টেনের রঙচঙে গুলি ছাড়াই সবগুলো সংখ্যা আর দিনের নাম মুখস্থ হয়ে গেছে। বুড়ো গুরদিন মলিন ও অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু আশেপাশে ওর নামটা ডানপিটে ছেলেদের কাছে হনুমানমন্ত্রের চেয়ে কম নয়। ওর গলা শুনলেই ওর ঝাঁকার উপর ছেলেদের এমন হামলা হয় যে মাছির অসংখ্য সেনাকেও রণে ভঙ্গ দিতে হয়। গুরদিনের কাছে একদিকে যেমন বাচ্চাকাচ্চাদের জন্য থাকে মিঠাই অন্য দিকে বাচ্চাদের মায়েদের জন্য থাকে তার চেয়েও মিষ্টি মিষ্টি কথা। মায়েরা যতই না-না করুন না কেন, বারে বারে পয়সা না থাকার অজুহাত দেখান না,

কেন, গুরদিন চটপট মিষ্টির ঠোঙা বাচ্চাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে—গিন্নিমা, পয়সার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না, আবার তো দেখা হবে, পালিয়ে তো আর যাচ্ছে না। নারায়ণ তোমাদের কোলে ছেলে দিয়েছেন, তাই তো আমিও ওদের ছিটেফোঁটা অনুগ্রহ পেয়ে যাচ্ছি, ওদের জন্যে আমরা ছেলেপিলেগুলোও তো বেঁচে আছে। এখনই কী, ভগবান যদি বিয়ে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন, দেখবেন তখন কেমন রং ঢং করি। গুরদিনের এই আচরণ ব্যাবসার ক্ষেত্রে যতই প্রতিকূল হোক না কেন, তেরো টাকা ধারের চাইতে ন টাকা নগদে কেনা—কথাটা বাস্তব হলেও মিষ্টভাষী গুরদিনকে কখনও তার এই ব্যবহারের জন্য পস্তানোর বা তা সংশোধন করার দরকার পড়ে না।

আজ শুভ মঙ্গলবার। ছেলেরা খুবই অস্থির হয়ে নিজের নিজের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে গুরদিনের পথ চেয়ে আছে। কয়েকটি উৎসাহী ছেলে গাছে গিয়ে উঠছে আর কেউ কেউ অনুরাগে আকুল হয়ে গাঁয়ের বাইরে চলে গেছে। সূর্যঠাকুর তাঁর সোনালি থালাখানা নিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়েছেন। এমন সময় গুরদিনকে আসতে দেখা যায়। ছেলেরা ছুটে গিয়ে ওর কাপড় ধরে নিজেদের মধ্যে টানাটানি শুরু করে দেয়। এ বলে, আমাদের বাড়ি চলো, ও ওদের বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ জানায়। সবার আগে পড়ে ভানু চৌধুরির বাড়ি। গুরদিন তার খোমচাটি নামায়। মিষ্টি নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। ছেলেপুলেদের আর তাদের মায়েদের ভিড় জমে যায়। হর্ষ-বিষাদ, সন্তোষ-লোভ, ঈর্ষা-ক্ষোভ, হিংসা-দ্বেষের নাট্যশালা তৈরি হয়ে যায়। আইন বিশারদ বিতানের পত্নী তার ছেলে তিনটেকে নিয়ে বেরিয়ে অসে। শানের বউও তার ছেলে দুটিকে নিয়ে হাজির হয়। গুরদিন মিষ্টি কথা বলতে শুরু করে। পয়সা থলেতে রাখে, আধ পয়সার মিষ্টি দেয় আর আধপয়সার আশীর্বাদ। ঠোঙা হাতে নাচতে নাচতে ছেলেরা গিয়ে বাড়িতে ঢোকে। সারা গাঁয়ে যদি এমন কোনো শিশু থাকে যে গুরুদিনের এ উদারতা থেকে বঞ্চিত, তবে সে হল বিলাসী গুমানের ছেলে ধান।

ভাইবোনদের হেসে হেসে নেচে নেচে মিষ্টি খেতে দেখে আত্মসংবরণ করতে পারা ছোট্ট ছেলে ধানের পক্ষে খুব কঠিন। তার উপর আবার ওরা ওকে মিষ্টি দেখিয়ে দেখিয়ে লোভ দেখাচ্ছে আর রাগাচ্ছে। ধান বেচারা কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের আঁচল ধরে দরজার দিকে টানতে শুরু করে, কিন্তু ওই বেচারি কী করবে? ছেলেটার জন্য ওর বুকটা মোচড় দিয়ে দিয়ে ওঠে। হাতে ওর একটা কানাকড়িও নেই। নিজের পোড়া কপালের জন্য, জায়েদের নিষ্ঠুরতায় আর সবচেয়ে বেশি তার স্বামীর অকর্মণ্যতায় সে গুমরে গুমরে মরে। স্বামীটি তার এমন নিষ্কর্মার ঢেঁকি না হলে কেন অন্যের মুখ চেয়ে থাকতে হবে, কেন অন্যের খোঁটা সইতে হবে। ধানকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে সে তাকে বোঝায়—বাবা, কাঁদে না, এর পরের বার গুরদিন এলে আমি তোমাকে আরও বেশি মিষ্টি কিনে দেব। এর চেয়েও ভালো মিষ্টি আমি তোমাকে বাজার থেকে আনিয়ে দেব। কত মিষ্টি খাবে তুমি? বলতে বলতে ওর দুচোখ জলে ভরে ওঠে। আজ আবার সেই অলুক্ষনে মঙ্গলবার, আজ আবার এসব ছুতোই দেখাতে হবে। হায়, আমার কচি সোনা ছেলেটা আধ পয়সার মিষ্টির জন্য কান্নাকাটি করবে আর এ বাড়িতে একটি লোকেরও পাথরের মতো বুকটা একটুও গলবে না। বেচারি এদিকে এসব কথা ভাবছে আর ওদিকে ধান কোনো মতেই চুপ করছে না! কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না দেখে মায়ের কোল থেকে নেমে ধান মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করে। আর চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে দুনিয়া মাথায় করে তোলে। মা অনেক বোঝায়, ভোলাতে চায়, শেষ পর্যন্ত ছেলের এত জেদ দেখে প্রচণ্ড রাগ হয়। মানুষের মনের রহস্য বোঝা ভার। এই তো ছেলেকে আদর করে বুকে টেনে নিল, আর এখন এমন রেগে উঠল যে জোরসে দু-তিনটি থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল— চুপ! চুপ কর হতচ্ছাড়া। তুই আবার মিষ্টি খাবি? নিজের দিন চলে না মিষ্টি খাবেন।

ফুলবাবু গুমান তার ঘরের দরজায় বসে বসে এসব কৌতুক মন দিয়ে দেখছিল। ছেলেটাকে সে খুব ভালোবাসত। এখনকার এই থাপ্পড়টা গুমানের মর্মস্থলে একটা সুতীক্ষ্ণ বর্শার মতন গিয়ে বেঁধে। হয়তো থাপ্পড়টার উদ্দেশ্যটাও ছিল তাই। ধুনুরি তুলোকে ধুনবার জন্যই তো তাঁতে চোট লাগায়।

পাথরে আর জলে যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে, মানুষের মনেও তেমনি সুন্দর সুকুমার বৃত্তিগুলি লুকিয়ে থাকে, তা মানুষটি যতই ক্রূর এবং কঠোর হোক না কেন। গুমানের চোখদুটি জলে ভরে ওঠে। এই চোখের জল অনেক সময় আমাদের হৃদয়ের মলিনতাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়। গুমানের চৈতন্যোদয় হয়। ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে সে বুকে তুলে নেয়, নিয়ে স্ত্রীকে কাতরকণ্ঠে বলে—ছেলেটার উপর এত রাগ কেন করছ? আসল দোষী তো আমি, আমাকে যা খুশি সাজা দেবার দাও। ভগবান যদি মুখ তুলে চান তাহলে কাল থেকে এই সংসারে আমার আর আমার ছেলেপুলেদেরও আদরযত্ন হবে। তুমি আজ আমাকে চিরকালের জন্য এমনভাবে জাগিয়ে দিয়েছ যে, আমার কানে তা শাঁখের আওয়াজের মতো বেজে উঠে বলছে: 'এবার কাজে লাগো হে!'

(শঙ্খনাদ) অনুবাদ ননী শূর

পঞ্চ-পরমেশ্বর

জুম্মন শেখ আর অলগু চৌধুরির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ভাগে চাষবাস হয়। কিছু লেনদেনও চলে। একের উপর অপরের অটল বিশ্বাস। জুম্মান যেবার হজ করতে যায় সেবার তার বাড়িঘর অলগুর হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল, আর অলগু যখনই বাইরে যেত, জুম্মনের উপর তার ঘরবাড়ির ভার দিয়ে যেত। ওদের মধ্যে না আছে খাওয়াদাওয়ার সম্পর্ক, না আছে ধর্মের মিল, আছে শুধু চিন্তাভাবনার মিল। বন্ধুত্বের মূলমন্ত্রও তাই।

এই বন্ধুত্বের জন্ম সেই ছেলেবেলায়, যখন দুই বন্ধুই ছোটো ছিল আর জুম্মনের পূজনীয় পিতা জুমরাতি ওদের বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। অলগু গুরুমশাইয়ের অনেক সেবাযত্ন করেছিল—খুব রেকাবি মেজেছিল, খুব পেয়ালা ধুয়েছিল। গুরুমশায়ের হুঁকোটা এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নিতে পেত না, কেননা প্রতিটি ছিলিম অলগুকে আধঘন্টা ছুটি মিলিয়ে দিত। অলগুর বাবা ছিলেন পুরোনো চিন্তাধারার মানুষ। শিক্ষা অপেক্ষা গুরুর সেবা-শুশ্রূষার উপরে তাঁর বেশি বিশ্বাস। তিনি বলতেন—বিদ্যা পড়াশোনা করে হয়না, যেটুকু হয় গুরুর আশীর্বাদে হয়। এজন্য গুরুমশাইয়ের কৃপাদৃষ্টি চাই। অতএব জুমরাতি শেখের আশীর্বাদ কিংবা সৎসঙ্গের কোনো ফল যদি অলগুর উপরে না ফলে, তাহলে এই ভেবে মনকে তিনি সান্ত্বনা দেবেন যে, বিদ্যা উপার্জনে সাধ্যমতো কোনো ত্রুটি আমি রাখিনি। বিদ্যালাভ ওর ভাগ্যে নেই তো কী করে হবে?

স্বয়ং জুমরাতি শেখ কিন্তু আশীর্বাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজের বেতের উপরেই তাঁর বেশি আস্থা ছিল, আর এই বেতের প্রতাপেই আশপাশের সব গাঁয়ে জুম্মনের আজ খাতির। জুম্মনের মুসাবিদা করা বন্ধকিপত্র-স্বত্বপাট্টার উপর কাছারির মুহুরিও কলম চালাতে পারে না। এ এলাকার ডাকপিয়োন, কনস্টেবল আর তহশিলের চাপরাশি—সবাই জুম্মনের কৃপাকাঙ্ক্ষী। তাই অলগুর খাতির যেখানে তার পয়সাকড়ির জন্য, সেখানে জুম্মন শেখ তার অমূল্য বিদ্যার গুণেই সবার সমাদরের পাত্র।

দুই

এক বুড়ি মাসি ছিল জুম্মন শেখের। মাসির সামান্য কিছু জমিজমা ছিল। নিকট আত্মীয় বলতে মাসির কেউ ছিল না। লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেসমস্ত জমিজমা জুম্মন নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। যদ্দিন দানপত্র রেজিস্ট্রি হয়নি, তদ্দিন মাসির খুব যত্নআত্তি হয়েছে, খুব মুখরোচক জিনিস তাকে খাওয়ানো হয়েছে। হালুয়া-পোলাওর যেন বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু রেজিস্ট্রির সিলমোহর

এসব আদর-যত্নের উপরেও যেন সিলমোহর মেরে দিয়েছে। জুম্মনের স্ত্রী করিমন রুটির সঙ্গে কিছু তেতো কথার কড়া ঝাল-তরকারিও দিতে শুরু করেছে। জুম্মন শেখও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। বেচারি মাসিকে আজকাল প্রায় রোজই এমনতর শুনতে হয়।

বুড়িবেটি কে জানে কদ্দিন বাঁচবে? দু-তিন বিঘা নোনাজমি দিয়েছে কি না দিয়েছে যেন মাথা কিনে নিয়েছে। সম্বরা দেওয়া ডাল ছাড়া গলা দিয়ে রুটি নামে না। যে টাকা ওর পেটে গোঁজা হয়ে গেছে তা দিয়ে তো অ্যাদ্দিনে একখানা গাঁ কিনে ফেলতাম।

মাসি কিছুদিন সহ্য করে, কিন্তু আর যখন সহ্য হয় না তখন জুম্মনের কাছে গিয়ে নালিশ করে। কর্ত্রীর ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করাটা জুম্মন উচিত মনে করে না। আরও কিছুদিন এমনি করেই কেঁদেকেটে চলে যায়। অবশেষে একদিন মাসি এসে জুম্মনকে বলে—বাপু! তোমার সঙ্গে আমার বনবে না। তুমি আমাকে টাকা ধরে দিও, আমি আলাদা রেঁধে খাব।

জুম্মন নির্লজ্জভাবে জবাব দেয়—টাকা কি এখানে গাছে ধরে?

মাসি নরম গলায় বলে—আমারও দুটো রুখাশুখা চাই কিনা বল?

জুম্মন গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়—তা, কেউ কি ভেবেছিল যে তুমি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে এসেছ?

মাসি চটে যায়। পঞ্চায়েত করার হুমকি দেয়। জুম্মান হাসে. হরিণকে জালের দিকে এগোতে দেখলে শিকারি যেভাবে হাসে। বলে—হ্যাঁ, পঞ্চায়েত করবে বই কী। ফয়সালা হয়ে যাক। আমারও রাতদিনের এই খিটিমিটি ভালো লাগে না।

পঞ্চায়েতে কার জিত হবে এ বিষয়ে জুম্মনের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আশপাশের গাঁয়ে এমন কে আছে যে তার অনুগ্রহের ঋণী নয়? এমন কে আছে যে তাকে শত্রু করতে সাহস করবে? কার এতটা সাধ্যি আছে যে তার বিরুধাচারণ করবে? আসমান থেকে ফেরেশতা তো আর পঞ্চায়েত করতে আসবে না?

তিন

এরপর কদিন ধরে বুড়ি মাসি লাঠিতে ভর দিয়ে আশপাশের সব গাঁয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। কোমর বেঁকে যেন ধনুক, এক এক পা চলা মুশকিল। কিন্তু কথা যখন উঠেছে তখন একটা সমাধান হয়ে যাওয়া দরকার।

এমন ভদ্রলোক কমই আছে যার সামনে বুড়ি তার দুঃখের কাঁদুনি গায় না। কেউ তো এমনি হুঁ হাঁ করে এড়িয়ে যায়। কেউ এই অন্যায় দেখে দিনকালকে গালাগালি দিয়ে বলে—কবরে পা ঝুলছে, আজ মরুক বা কাল, কিন্তু খাঁই মিটছে না। তোমার এখন কী চাই? রুটি খাও, আল্লার নাম নাও। জমিজমা দিয়ে তোমার কী কাজ? কিছু এমন লোকও আছে যারা বেশ হাস্যরসের খোরাক পেয়ে যায়। নুয়ে পড়া কোমর, ফোকলা মুখ, শণের মতো চুল—এতগুলো সামগ্রী এক জায়গায় জুটলে হাসি পাবে না কেন? ন্যায়নিষ্ঠ, দয়ালু, দীনবৎসল এমন মানুষ খুবই কম যারা এই অবলার দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনবে কিংবা তাকে সান্ত্বনা দেবে। চারদিকে ঘুরে ফিরে বেচারি অলগু

চৌধুরির কাছে আসে। লাঠিগাছাকে ফেলে দম নিয়ে বলে—বাবা, তুমিও কিছুক্ষণের জন্য পঞ্চায়েতে এসো।

অলগু—আমাকে ডেকে কী করবে? অনেক গাঁয়ের মানুষজন তো আসবেই।

মাসি—বিপদের কথা তো সবার কাছেই বলে এসেছি, আসা না আসা ওদের হাতে।

অলগু—তা যেতে বলছ আমি যাব, তবে পঞ্চায়েতে কিন্তু মুখ খুলব না।

মাসি—কেন বাবা?

অলগু—এর আর কী জবাব দেব? আমার খুশি। জুম্মন আমার অনেক দিনের বন্ধু। ওর সঙ্গে মন কষাকষি করতে পারিনা।

মাসি—বাছা, মন কষাকষির ভয়ে কি ন্যায়ের কথা বলবে না?

আমাদের সুপ্ত ন্যায়-অন্যায় বোধ তার সমস্ত সম্পদ লুট হয়ে গেলেও টের পায় না। কিন্তু আহ্বান শুনলে সচেতন হয়ে ওঠে। তখন আর কেউ সেই ন্যায়-অন্যায় বোধকে পরাজিত করতে পারে না। বুড়ির এ প্রশ্নের কোনো জবাব অলগু দিতে পারে না। তবে হৃদয়ে এই কথাগুলো যেন গুঞ্জিত হয়ে চলে—মনকষাকষির ভয়ে কি ন্যায়ের কথা বলব না?

চার

সন্ধ্যার সময় একটা গাছের নীচে পঞ্চায়েত বসে। শেখ জুম্মন আগে থেকেই ফরাশ পেতে রেখেছে। পান, এলাচ, হুঁকো, তামাক ইত্যাদির ব্যবস্থাও করেছে। হ্যাঁ, নিজে অবশ্য সে অলগু চৌধুরির সঙ্গে একটু দূরে বসে আছে। কেউ পঞ্চায়েতে এলে চাপা গলায় সেলাম করে তাকে অভ্যর্থনা করে। সূর্য অস্ত গেলে গাছের উপর পাখপাখালির কলরবযুক্ত পঞ্চায়েত বসে যায়, গাছের নীচেও তখন পঞ্চায়েত আরম্ভ হয়। ফরাশের প্রতি আঙুল জায়গা ভরে ওঠে, তবে বেশির ভাগই দর্শক। নিমন্ত্রিত মহোদয়দের মধ্যে শুধু তাঁরাই পদার্পণ করেছেন, যাঁদের জুম্মনের প্রতি কিছু প্রতিশোধ স্পৃহা আছে। এক কোণে আগুন জ্বলছে। নাপিত চটপট কলকে সাজছে; এটা বোঝা অসম্ভব যে পোড়া ঘুঁটে দিয়ে বেশি ধোঁয়া বেরোচ্ছে না কলকের দম থেকে। ছেলেছোকরারা এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে। কেউ নিজেদের মধ্যে গালিগালাজ করছে, কেউ কাঁদছে, চারদিকে হই হই। গাঁয়ের কুকুরগুলো এই জমায়েতকে ভোজ ভেবে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জুটেছে।

পঞ্চের লোকজন বসে পড়লে বুড়ি মাসি ওদের কাছে মিনতি জানায়—পঞ্চের বাবুমশায়রা, আজ তিন সাল হল আমি আমার সমস্ত জমিজমা আমার বোনপোর নামে লিখে দিয়েছি। একথা হয়তো আপনারা জানেন। আমাকে সারাজীবন ভাতকাপড় দেবে বলে জুম্মন কবুল করেছে। এক বছর আমি ওরে সঙ্গে কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়েছি, কিন্তু এখন দিনরাত এই কান্নাকাটি আর সয় না। না পাই আমি পেট পুরে খেতে, না পাই একখানা কাপড় পরতে। অসহায় বিধবা আমি। কাছারি-আদালত করতে পারি না। আপনাদের কাছে ছাড়া আর কার কাছে আমার দুঃখের কথা বলব? আপনারা যে পথ বাতলে দেবেন, সে পথেই চলব। আমার যদি কোনো দোষ দেখেন, আমার মুখে থাপ্পড় মারুন। জুম্মনের মধ্যে যদি দোষ দেখেন তাহলে ওকে বোঝান। কেন এক অসহায় বুড়ির শাপ কুড়োচ্ছে? পঞ্চের হুকুম আমি মাথা পেতে নেব।

রামধন মিশ্র, যার কজন প্রজাকে জুম্মন নিজের গাঁয়ে এনে বসিয়েছে, বলে ওঠে—জুম্মন মিঞা, কাকে পঞ্চ মানছ? এখনই এর মীমাংসা করে নাও। তারপর পঞ্চ যা বলবে, তাই মানতে হবে।

সদস্যদের মধ্যে জুম্মনের এখন বিশেষ করে সেসব মানুষই চোখে পড়ে যাদের সঙ্গে কোনো না কোনো কারণে ওর শত্রুতা রয়েছে। জুম্মন বলে—পঞ্চের হুকুম আল্লার হুকুম। মাসি যাকে ইচ্ছে পঞ্চ মানুন, আমার কোনো আপত্তি নেই।

মাসি চেঁচিয়ে বলে ওঠে—ওরে আমার আল্লার বান্দা রে! পঞ্চের নাম কেন বলছিস না? আমিও তো একটু জানতে পারি।

জুম্মন রেগে বলে—এখন আর আমার মুখ খুলিয়ো না। তোমার এখন সময় পড়েছে, যাকে খুশি পঞ্চ মানো।

জুম্মনের আক্ষেপটা মাসি বুঝতে পারে। বলে—বাপু! খোদাকে ভয় করো। পঞ্চ কারুর দোস্তও নয়, দুশমনও নয়। এ কেমন কথা বলছিস? তোর যদি কারুর উপরই বিশ্বাস না হয় তো ঠিক আছে অলগু চৌধুরিকে তো মানবি? নে, আমি ওকেই সরপঞ্চ মানছি। জুম্মন শেখ আনন্দে উৎফুল্ল হয় উঠে, কিন্তু মনোভাব গোপন করে বলে—বেশ চৌধুরিই সই। আমার কাছে রামধন মিশ্র যা, অলগুও তাই।

অলগু এসব ঝামেলায় জড়াতে চাইছিল না। সে গাঁইগুঁই করে—মাসি, তুমি তো জানো জুম্মনের সঙ্গে আমার খুব দোস্তি।

মাসি গম্ভীর গলায় বলে—বাব! দোস্তির জন্য কেউ তার ইমান বেচে দেয় না। পঞ্চের অন্তরে খোদা বাস করে। পঞ্চের মুখ থেকে যে বাত বের হয় তা খোদার তরফ থেকে বের হয়।

অলগু চৌধুরি সরপঞ্চ হয়। রামধন মিশ্র এবং জুম্মনের আর সব বিরোধীরা বুড়িকে মনে মনে খুব গালাগালি দেয়।

অলগু চৌধুরি বলে—জুম্মন শেখ! তুমি আর আমি অনেক দিনের বন্ধু। যখন দরকার পড়েছে, তুমি আমাকে সাহায্য করেছ আর আমিও যতখানি পেরেছি তোমাকে সেবা করে এসেছি। কিন্তু এখন তুমি আর বুড়ি মাসি দুজনই আমার চোখে সমান। পঞ্চের কাছে তোমার যা কিছু আরজি আছে বল।

জুম্মনের পুরো বিশ্বাস এবার বাজি তার। অলগু এসব লোকদেখানো কথা বলছে, অতএব শান্ত মনে বলে—পঞ্চের মশাইরা! আজ তিন সাল হল, মাসি তাঁর সম্পত্তি আমার নামে দানপত্র করে দিয়েছেন। আমি ওঁকে আজীবন ভাতকাপড় দিতে কবুল করেছি। খোদা সাক্ষী আছেন, আজ পর্যন্ত আমি মাসিকে কোনো তকলিফ দিই নি। মাসিকে আমি নিজের মায়ের মতো মানি। ওঁর খিদমত করা আমার কর্তব্য, কিন্তু মেয়েছেলেদের মধ্যে কিছু না কিছু অবনিবনা লেগেই থাকে। এতে আমার কতটুকু হাত? মাসি আমার কাছে আলাদা করে মাসোহারা চাইছেন। জমিজমা যেটুকু আছে তা পঞ্চের কাছে গোপন নেই। তা থেকে এত আয় হয় না যে আমি মাসোহারা দিতে পারি। এছাড়া দানপত্রেও মাসোহারার কোনও উল্লেখ নেই, থাকলে ভুলেও আমি এই ঝামেলায় জড়াতাম না। ব্যস, শুধু এটুকুই আমার বলার আছে। এখন পঞ্চের ইচ্ছা, যেমন খুশি ফয়সালা করুন।

অলগু চৌধুরির প্রায়ই কাছারিতে কাজ পড়ে, অতএব পুরোপুরি কায়দাকানুন জানা মানুষ সে। জুম্মনকে জেরা করতে শুরু করে দেয়। একটার পর একটা প্রশ্ন জুম্মনের হৃদয়ে যেন হাতুড়ির আঘাতের মতো পড়ে। রামধন মিশ্র এসব প্রশ্ন শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। জুম্মন একথা ভেবে অবাক হয় যে অলগুর আজ হল কী। এই খানিক আগেও আমার সঙ্গে বসে কত রকমের কথা বলছিল। এরই মধ্যে এমন বদলে গেল যে আমার শেকড় ওপড়াতে উঠে পড়ে লেগেছে। কী জানি কবেকার কোন গায়ের জ্বালা মেটাচ্ছে? এতদিনের দোস্তি কি কোনো কাজে আসবে না?

এসব ভাবনাচিন্তায় জুম্মন শেখ মগ্ন, এরই মধ্যে অলগু ফয়সালা শোনায়—জুম্মন শেখ! পঞ্চায়েত এই মামলার বিচার করেছে। পঞ্চের কাছে এটাই ন্যায়সংগত বলে মনে হচ্ছে যে মাসিকে মাসোহারা দেওয়া হোক। আমাদের ধারণা হল মাসির জমিজমা থেকে এতটা আয় অবশ্যই হচ্ছে যে মাসোহারা দেওয়া যেতে পারে। ব্যস, এই আমাদের বিচার। মাসোহারা দিতে জুম্মন যদি রাজি না হয়, তাহলে দানপত্র রদ বলে ধরে নেওয়া হবে।

পাঁচ

বিচার শুনেই জুম্মন থ মেরে যায়। দোস্ত যদি দুশমনের মতো ব্যবহার করে, যদি গলায় ছুরির পোঁচ দেয় তাহলে তাকে সময়ের ফের ছাড়া আর কী বলব? যার উপর পুরো ভরসা ছিল, সে সময় বুঝে ধোঁকা দিল। এমন সময়েই তো আসল আর মেকি বন্ধুর যাচাই হয়। এই হল কলিকালের দোস্তি। মানুষ এমন কপট, ধোঁকাবাজ না হলে দেশে বিপদ আপদের প্রকোপ হবে কেন? কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি যত সব ব্যাধি তো এসব দুষ্কর্মেরই দণ্ড।

এদিকে রামধন মিশ্র আর পঞ্চায়েতের সবাই অলগু চৌধুরির এই নীতিপরায়ণতাকে মন খুলে প্রশংসা করছে। বলছে—একেই বলে পঞ্চায়েত। একেবারে দুধকে দুধ জলকে জল। দোস্তির জায়গায় দোস্তি, কিন্তু ধর্মপালন করা সবার আগে। এমন সত্যবাদীদের জন্যই জগৎটা টিকে আছে, নইলে কবেই সব রসাতলে চলে যেত।

এই বিচার অলগু আর জুম্মনের বন্ধুত্বের একেবারে শেকড় ধরে নাড়া দেয়। আজকাল ওদের একসঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় না। এতদিনের প্রাচীন বন্ধুত্বরূপী বৃক্ষটি সত্যের মৃদু আঘাতও সইতে পারল না। সত্যিসত্যিই সেটি বালির উপরে দাঁড়িয়েছিল।

ওদের মধ্যে আজকাল শিষ্টাচারেরই বেশি চলন হয়েছে। একজন আর একজনের আদর অভ্যর্থনা বেশি করে করতে শুরু করেছে। ওরা মেলামেশা করে বটে, তবে ঠিক তেমনি করে যেমনি করে ঢাল মেশে তলোয়ারের সঙ্গে। বন্ধুর কুটিলতা জুম্মনের মনকে অষ্টপ্রহর খোঁচা দিতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তার চিন্তা—কোনোমতে বদলা নেবার সুযোগ যদি পেতাম!

ছয়

সৎ কাজের অভীষ্টসিদ্ধিতে বড়ো দেরি হয়, কিন্তু অসৎ কাজে সিদ্ধি লাভে তা হয় না। জুম্মনেরও বদলা নেবার সুযোগ তাড়াতাড়ি মিলে যায়। গেল বছর অলগু চৌধুরি বটেসর থেকে একজোড়া খুব ভালো বলদ কিনে এনেছিল। বলদ দুটো পশ্চিমা জাতের — সুন্দর, বড়ো বড়ো শিংওয়ালা।

কয়েক মাস ধরে আশপাশের গাঁয়ের লোক ওদের দর্শন করতে থাকে। দৈবযোগে জুম্মনের পঞ্চায়েতের মাস খানেক বাদেই বলদ জোড়ার একটি বলদ মরে যায়। জুম্মন বন্ধুদের কাছে বলে—এ হল গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি। মানুষ সবুর করলেও খোদা ভালোমন্দ সবই দেখেন।

অলগুর সন্দেহ হয় জুম্মনই বলদটাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে। চৌধুরি-বউ জুম্মনের ঘাড়েই এই দুর্ঘটনার দোষারোপ করে। বলে—জুম্মন কিছু করিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে চৌধুরিগিন্নি আর করিমনের মধ্যে একদিন খুবই বচসা হয়। দুই দেবীই শব্দবাহুল্যের বন্যা বইয়ে দেয়। ব্যঙ্গ, বক্রোক্তি, অপশব্দ আর উপমা ইত্যাদি অলংকারের সাহায্যে কথা হয়। জুম্মন কোনো রকমে শান্ত করে। বিবিকে ধমকধামক দিয়ে বোঝায়। তাকে সে রণভূমি থেকে সরিয়েও নিয়ে যায়। ওদিকে অলগু চৌধুরি বোঝানো শোনানোর কাজটা সারে তার যুক্তিপূর্ণ বেতের সাহায্যে।

একটা বলদ এখন কোন কাজে লাগে? ওর জুড়ি অনেক খোঁজা হয়, কিন্তু মেলে না। শেষমেষ এটাই ঠিক হয় যে ওটাকে বেচে দেওয়াই ভালো। গাঁয়ে আছে এক সমঝু সাহু, এক্কা গাড়ি হাঁকায়। গাঁ থেকে গুড়, ঘি চাপিয়ে সে হাটে যায় আর হাট থেকে তেলনুন চাপিয়ে এনে গাঁয়ে বেচে। বলদটাকে দেখে তার মনটা দুলে উঠে। ভাবে, বলদটাকে পেলে সারাদিনে হয়তো তিন খেপ দেওয়া যাবে। আজকাল তো এক খেপ দেওয়াই ভার। বলদটাকে দেখে, গাড়িতে জুতে দৌড়োয়, লক্ষণ বিচার করায়, দরদাম করে, তারপর ওটাকে নিয়ে এসে বাড়ির দরজায় বেঁধেই দেয়। এক মাস বাদে দাম চুকানোর কথা দেয়। চৌধুরিরও গরজ তো আছেই, লোকসানের চিন্তা করে না।

সমঝু সাহু নতুন বলদ পেয়ে সেটাকে খুব ছোটাতে লাগল, দিনে তিন-তিন চার-চার খেপ দিতে শুরু করে। না খড়বিচালির চিন্তা, না জলের, কাজ শুধু খেপ নিয়ে। হাটে নিয়ে যায়, সেখানে কিছু শুকনো ভূষি সামনে ফেলে দেয়। জানোয়ার বেচারা একটু দম নিতে না নিতেই আবার এনে জুতে দেয়। অলগু চৌধুরির বাড়িতে যখন ছিল তখন মনের সুখে দিন কাটত। ছমাসে নমাসে কখনও গাড়িতে জোতা হলে খুব লাফঝাঁপ দিত আর ক্রোশের পর ক্রোশ দৌড়ে যেত। বলদ সেখানে খুব সুখে ছিল। সেখানে খড়বিচালি, পরিষ্কার জল, অড়হর ডালবাটা, ভূষির সঙ্গে খোল, শুধু তাই নয় মাঝেমাঝে ঘিয়ের স্বাদও চাখতে পেত। সকাল-সন্ধে একজন লোক দলাইমলাই করত, গা মুছে দিত আর হাত বুলিয়ে দিত। কোথায় সেই সুখ আর আরাম আর কোথায় এই অষ্ট প্রহরের খাটুনি। মাস খানেকের মধ্যেই বলদটি কাহিল হয়ে পড়ল। গাড়ির জোয়াল দেখলেই ওর প্রাণ শুকিয়ে যায়। হাড়গোড় সব বেরিয়ে পড়েছে, তবে বলদটি বড়ো তেজি, মার সয় না।

একদিন চতুর্থ খেপে সাহু দুনো বোঝা চাপায়। সারাদিনের শ্রান্তক্লান্ত জানোয়ার, পা আর চলে না। তার উপর সাহু হাঁকড়াতে শুরু করে। ব্যস, আর কি, বলদ বুক ফাটিয়ে ছোটে। খানিক দূর সে ছুটে যায় তারপর চায় যে একটু দম নিয়ে নেবে, কিন্তু সাহুর বাড়ি পৌঁছনোর তাড়া, তাই সে কয়েক ঘা চাবুক বড়ো নির্দয়ভাবে হাঁকড়ায়, বলদ আর একবার জোর লাগায়, কিন্তু এবারে তার দম ফুরিয়ে যায়। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে, আর এমনভাবে পড়ে যে আর ওঠে না। সাহু খুব পেটায়, পা ধরে টানে, নাকের ভেতর ছড়ি ঠুঁসে দেয়। কিন্তু মরা কি কখনও ওঠে? সাহুর তখন কিছুটা সন্দেহ হয়। বলদটাকে ভালো করে দেখে, জোয়াল খুলে আলাদা করে, তারপর ভাবতে থাকে গাড়ি কী করে বাড়ি পৌঁছবে। খুব চিৎকার-চেঁচামেচি করে, কিন্তু গাঁয়ের রাস্তা বাচ্চা ছেলেদের

চোখের মতো, সন্ধে হতে না হতেই বন্ধ হয়ে যায়, কাউকে দেখা যায় না। আশেপাশে কোনও গাঁও নেই। রাগের চোটে সে মরা বলদের উপর আরও চাবুক চালায় আর গালাগালি দিতে থাকে, হতভাগা। মরবিই যদি তো বাড়ি গিয়েই মরতিস। শালা মাঝ রাস্তাতেই মরলি! এখন গাড়ি কে টানে? এভাবে সাহু রেগে জ্বলে যায়। কয়েক বস্তা গুড় আর কয়েক পিপে ঘি সে বেচেছে, দুশো-আড়াইশো টাকা কোমরে বাঁধা। এছাড়া গাড়িতে বেশ কয়েক বস্তা নুন, কাজেই ফেলে রেখে যেতেও পারছে না। বাধ্য হয়ে বেচারা গাড়িতেই শুয়ে পড়ে। ওখানেই রাতটা জেগে কাটানো মনস্থ করে, কলকে টানে, গান গায়, তারপর হুঁকো টানে। এভাবে সাহু মাঝরাত অবধি ঘুমটাকে আটকে রাখে। আপন জ্ঞানমতো তো সে জেগেই থাকে, কিন্তু আলো ফুটে উঠলে ঘুম ভাঙতে কোমরে হাত দিয়ে দেখে থলে গায়েব। ভয় পেয়ে এদিকে ওদিকে তাকায়, দেখে কয়েক ক্যানেস্তারা তেলও উধাও। আপশোশ করতে করতে বেচারা মাথা চাপড়ায়, আছাড়ি পিছাড়ি খায়। সকাল বেলা বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যায়। সাহুগিন্নি এই দুঃসংবাদ শুনে প্রথমে তো কাঁদে, তারপর অলগু চৌধুরিকে গালাগালি দিতে থাকে, হতভাগা এমন অলক্ষুনে বলদ দিল যে সারাজীবনের রোজগার মাঠে মারা গেল।

এই ঘটনার পরে কয়েক বছর কেটে গেছে। যখনই অলগু বলদের দাম চায়, সাহু আর তার গিন্নি দুজনেই খ্যাপা কুকুরের মতো তেড়ে আসে আর আজেবাজে বকতে শুরু করে—বাঃ! এদিকে সারাজীবনের রোজগার লুট হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল, ওঁর দামের চিন্তা। মরা বলদ দিয়ে তার উপর দাম চাইতে আসছে। চোখে ধুলো দিয়েছে, সর্বনাশা বলদ গছিয়ে দিয়েছে, আমাদের একেবারে বুদ্ধু ঠাওরেছে। আমরাও বেনের বাচ্চা, বুদ্ধু নই। আগে কোনো ডোবায় গিয়ে মুখটা ধুয়ে এসো, তারপর দাম নিয়ো। মন যদি না মানে তবে আমাদের বলদটাকে খুলে নিয়ে যাও, এক মাসের জায়গায় দুমাস খাটিয়ে নাও। টাকা নেবে কী?

চৌধুরির অহিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই। এসব ক্ষেত্রে ওরাও একজোটে সাহুর বকবকানিকে সমর্থন করে। এভাবে ভর্ৎসনা শুনে চৌধুরি বেচারা হতাশ হয়ে ফিরে যায়, কিন্তু দেড়শো টাকা এভাবে ছেড়ে দেওয়াও সহজ কথা নয়। একবার সেও মাথা গরম করে উঠে। সাহু রেগেমেগে লাঠি খুঁজতে ঘরে ঢোকে। সাহুগিন্নি রণক্ষেত্রে নেমে পড়ে। কথা কাটাকাটি হতে হতে হাতাহাতির অবস্থা এসে পড়ে। সাহুগিন্নি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেয়। শোরগোল শুনে গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা জড়ো হয়ে যান। ওঁরা দুজনকেই বোঝান। সাহুকে আশ্বাস দিয়ে ঘর থেকে বের করেন। ওঁরা পরামর্শ দেন এভাবে মাথা ফাটাফাটি করে কাজ হবে না। পঞ্চায়েত করাও। যাই সাব্যস্ত হবে মেনে নাও। সাহু রাজি হয়ে যায়। অলগুও মেনে নেয়।

সাত

পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি চলতে থাকে। উভয় পক্ষ নিজের নিজের দল বানাতে শুরু করে। তৃতীয় দিনে সেই একই গাছের নীচে আবার পঞ্চায়েত বসে। সেই সন্ধ্যার সময়। খেতগুলোতে কাকেরা পঞ্চায়েত করছে। বিবাদের বিষয়টা হল এই—মটর শুঁটির উপর ওদের স্বত্ব আছে কি নেই আর যতদিন এই প্রশ্নটার মীমাংসা না হয়, ততদিন ওরা পাহারাদারের চিৎকারে নিজেদের অপ্রসন্নতা প্রকট করা

আবশ্যক মনে করে। গাছের ডালের উপরে বসে থাকা শুকমণ্ডলীতে এই প্রশ্ন উঠেছে যে, মানুষ নিজেই যখন আপন বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন কী আর আমাদের হৃদয়হীন বলার অধিকার থাকে?

পঞ্চায়েত বসলে রামধন মিশ্র বলে—আর দেরি কেন? পঞ্চের নির্বাচন হয়ে যাওয়া দরকার। বলো চৌধুরি কাকে কাকে পঞ্চ মানছ?

অলগু বিনীতভাবে বলে—সমঝু সাহুই বেছে নিক?

সমঝু উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে—আমার দিক থেকে জুম্মন শেখ।

জুম্মনের নাম শুনেই অলগু চৌধুরির বুকটা ধকধক করতে থাকে। যেন কেউ হঠাৎ থাপ্পড় মেরে বসেছে। রামধন অলগুর বন্ধু। ব্যাপারটা যেন অনুমান করে নেয়। জিজ্ঞেস করে, কী হে চৌধুরি, তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

চৌধুরি হতাশ হয়ে বলে—না, আমার আর কী আপত্তি হবে?

আমাদের দায়িত্ববোধ অনেক সময় আমাদের সংকীর্ণতা কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। পথ ভুলে আমরা যখন এদিক ওদিকে ঘুরতে থাকি, তখন এই দায়িত্ববোধই আমাদের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক হয়ে উঠে।

পত্রিকার সম্পাদক তার শান্ত কুটিরে বসে কতখানি ধৃষ্টতা এবং স্বাধীনতার সঙ্গে তার শক্তিশালী লেখনী দিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর আক্রমণ করেন, তারপর হয়তো এমন সময়ও আসে যেদিন সে স্বয়ং মন্ত্রিমণ্ডলীর শরিক হন। মন্ত্রিমণ্ডলের ভবনে পা রাখামাত্রই ওর লেখনী অনেকখানি মর্মজ্ঞ, অনেকখানি চিন্তাশীল, অনেকখানি ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠবে—এর কারণ হল সেই দায়িত্ববোধ। যুবক যৌবন বয়সে কত উদ্ধত থাকে। তাকে নিয়ে মা-বাবার কত দুশ্চিন্তা। তাঁরা তাকে কুলকলঙ্ক বলে মনে করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সংসারের বোঝা মাথায় চাপামাত্রই সেই অস্থিরচিত্ত, বাতুল যুবক কত ধৈর্যশীল, কত শান্তচিত্ত হয়ে উঠে। এও দায়িত্ববোধের ফল।

জুম্মন শেখের মনেও সরপঞ্চের উচ্চ পদে আসীন হওয়া মাত্রই আপন দায়িত্ববোধের ভয় জাগে। ভাবে, আমি এখন ন্যায় ও ধর্মের সর্বোচ্চ আসনে বসে আছি। আমার মুখ দিয়ে এখন যা কিছু বের হবে, তা দেববাণীর মতো—আর দেববাণীর মাঝে আমার মনোবিকারের প্রকাশ কদাপি হওয়া উচিত নয়। আমি যেন সত্য থেকে একচুলও বিচ্যুত না হই।

পঞ্চের লোকেরা উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শুরু করে। অনেকক্ষণ ধরে উভয় দল আপন আপন পক্ষ সমর্থন করতে থাকে। এ ব্যাপারে তো সবাই একমত যে বলদের দাম সমঝুর দেওয়া উচিত। কিন্তু বলদ মরে যাওয়ায় সমঝুর ক্ষতি হয়েছে বলে তাকে কিছুটা রেয়াত করার কথা দুই ভদ্রলোক বললেন। অপর পক্ষে আর দুজন সভ্য দাম দেওয়া ছাড়াও সমঝুকে কিছু দণ্ড দিতে চাইলেন যাতে পশুদের সঙ্গে এমন নির্দয় ব্যবহার করার সাহস আর কারুর না হয়। অবশেষে জম্মুন রায় দিল—অলগু চৌধুরি আর সমঝু সাহু! পঞ্চ তোমাদের মামলাটাকে ভালো করে বিচার বিবেচনা করে দেখেছে। সমঝুর উচিত বলদের পুরো দাম দেওয়া। যখন সে বলদ নিয়েছে, তখন বলদের কোনো রোগ ছিল না। যদি সে সময়ই দাম দেওয়া হত, তাহলে আজ সমঝু ওটা ফেরত নেওয়ার জন্য আগ্রহ করত না। বলদের মৃত্যু হয়েছে শুধু এজন্যই যে

ওকে নিয়ে বড্ড কঠিন পরিশ্রম করানো হয়েছে অথচ ওর খড়বিচালির কোনো ভালো ব্যবস্থা করা হয়নি।

রামধন মিশ্র বলে—সমঝু বলদটাকে জেনেশুনে মেরেছে, অতএব ওর শাস্তি হওয়া উচিত।

জুম্মন বলে—এটা অন্য প্রশ্ন। এর সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ নেই।

ঝগড়ু সাহু বলে—সমঝুকে কিছুটা রেয়াত করা উচিত।

জুম্মন বলে—এটা অলগু চৌধুরির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। উনি যদি রেয়াত করেন সেটা তাঁর ভালোমানুষি।

অলগু চৌধুরির আনন্দের সীমা থাকে না। উঠে দাঁড়িয়ে জোরে ধ্বনি দেয়—পঞ্চ-পরমেশ্বর কী জয়!

চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি ওঠে—পঞ্চ-পরমেশ্বর কী জয়!

প্রতিটি মানুষ জুম্মনের নীতির প্রশংসা করে—একেই বলে ন্যায়। মানুষের কর্ম নয় এটা; পঞ্চে পরমেশ্বর বাস করেন। এটা তাঁরই মহিমা। পঞ্চের সামনে খারাপকে কে ভালো বলতে পারে?

কিছুক্ষণ পরে জুম্মন অলগুর কাছে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—ভাই, যেদিন তুমি আমার পঞ্চায়েত করেছিলে সেই থেকে আমি তোমার প্রাণঘাতী শত্রু হয়ে উঠেছিলাম; কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারলাম যে, পঞ্চের আসনে বসে কেউ কারুর দোস্ত নয়, দুশমনও নয়। ন্যায় ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। আজ আমার বিশ্বাস হয়েছে যে পঞ্চের মুখ দিয়ে খোদা কথা বলেন।

অলগু কেঁদে ফেলে। চোখের জলে দুজনেরই হৃদয়ের গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। বন্ধুত্বের শুকিয়ে যাওয়া লতাটি আবার সজীব হয়ে উঠে।

(পঞ্চ পরমেশ্বর / ১৯১৬) অনুবাদ ননী শূর

মহাতীর্থ

মুনশি ইন্দ্রমণির আয় ছিল কম, খরচ বেশি। নিজের সন্তানের জন্য দাই রাখার খরচ যদিও তিনি কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না, তবু একদিকে বাচ্চার দেখাশোনার ঝামেলা ও অন্যদিকে তার সমকক্ষ লোকদের চোখে ছোটো হয়ে যাবার অপমান, এই দুয়ে মিলে তাকে এই খরচ বহন করতে বাধ্য করছিল। বাচ্চা দাইকে খুবই পছন্দ করত, সব সময় তার কাছেই থাকতে চাইত। এই জন্য দাইয়ের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভূত হত। তবে, সম্ভবত সব থেকে বড়ো কারণ ছিল এই যে, ইন্দ্রমণি চক্ষুলজ্জার খাতিরে দাইকে জবাব দেবার সাহস পাচ্ছিলেন না। বুড়ি দাই তার এখানে তিন বছর যাবৎ কাজ করে আসছে। সে তার একমাত্র পুত্রসন্তানের লালনপালন করেছে। তার কাজ সে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গেই করেছে। তাকে ছাড়িয়ে দেবার কোনো কারণই ছিল না এবং অনর্থক দোষ দেখে বেড়ানো ইন্দ্রমণির মতো ভালো লোকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তবে এই ব্যাপারে তার স্বামীর মতের সঙ্গে সুখদার মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল না। তার সন্দেহ ছিল, দাই দুহাতে লুট করছে। দাই যখন বাজার করে ফিরত সুখদা তখন দালানের কোনো জাগয়ায় লুকিয়ে থেকে দেখত দাই কোথাও আটা লুকিয়ে রাখছে কিনা, লাকড়ি লুকিয়ে রাখছে কিনা। তার কেনা জিনিস অনেকক্ষণ ধরে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করত। বারে বারে বলত, এত দাম কেন? ভাও কত? কী, এত দাম হয়ে গেছে? দাই কখনও কখনও এইসব সন্দেহাত্মক প্রশ্নের জবাব নম্রতার সঙ্গেই দিত, কিন্তু সুখদা যদি বেশি রেগে যেত তাহলে সেও রেগে উত্তর দিত। দিব্যি গালত। তার জবাবের পক্ষে প্রমাণ পেশ করত। বাদবিবাদে অনেক সময় চলে যেত। প্রায় প্রতিদিন এই অবস্থার সৃষ্টি হত এবং প্রতিদিন এই নাটক দাইয়ের অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হত। এত কষ্ট সহ্য করে দাইয়ের এখানে পড়ে থাকার ব্যাপারটা সুখদার সন্দেহকে আরও বেশি করে পুষ্ট করত। সে কখনও বিশ্বাস করত না যে, শুধুমাত্র বাচ্চার প্রতি ভালোবাসার জন্যই বুড়ি এখানে পড়ে আছে। সে বুড়িকে অতটা স্নেহবৎসল মনে করত না।

দুই

ঘটনাচক্রে একদিন বাজার থেকে ফিরতে দাইয়ের কিছু দেরি হয়ে গেল। বাজারে দুই তরকারিওয়ালির মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাদের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, তর্কবিতর্ক, ব্যঙ্গবিদ্রূপ সবই ছিল দেখার মতো। ওরা যেন দুই বিষের নদী কিংবা দুই আগ্নেয়গিরি, উভয়েই ফুঁসে উঠে মুখোমুখি সংঘর্ষে মেতেছে। কথার কী তোড়, কী বিচিত্র বিশ্লেষণ! তাদের বাগাড়ম্বর, তাদের

অন্তর্ভেদী বিচার বিবেচনা, অলংকৃত শব্দবিন্যাস এবং তাদের উপমার নতুনত্ব—এমন কোন কবি আছেন যিনি এসবে মুগ্ধ হবেন না? তাদের ধৈর্য ও প্রশান্তি ছিল বিস্ময়কর। দর্শকদের এক বড়ো ভিড়ও জমে গিয়েছিল। লজ্জাকে পর্যন্ত লজ্জিত করার মতো তাদের সেই অঙ্গভঙ্গি, সেই অশ্লীল শব্দব্যবহার যাতে মলিনতা পর্যন্ত রোমাঞ্চিত বোধ করে, তা সহস্র রসিকজনের পক্ষে মনোরঞ্জনের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল।

দাইও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল দেখতে যে, ব্যাপারটা কী। তামাশা এমনই জমে উঠেছিল যে, তার সময়ের আর কোনো খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ যখন নটা বাজার ঘন্টা কানে এল তখন সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ছুটে বাড়ির দিকে রওনা হল। সুখদা মুখ ভার করে বসেছিল। দাইকে দেখেই ভ্রুকুটি করে বলল—কী, বাজারে হারিয়ে গিয়েছিলে?

দাই বিনীতভাবে উত্তর দিল—এক চেনা দাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। [illegible] করল—।

সুখদা এই জবাবে আরও রেগে গিয়ে বলল—এদিকে অফিসে যাওয়ার বেলা হয়ে যাচ্ছে আর তুমি মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

দাই তখন চুপ করে যাওয়াই সমীচীন মনে করে ছেলেকে কোলে নিতে গেলে সুখদা ঝাঁঝিয়ে উঠল—রেখে দাও, তোমাকে না দেখে ও মরে যাচ্ছিল আর কী!

দাই, এই আদেশ পালন করা আবশ্যক মনে করল না। বউদির রাগ ঠান্ডা করার জন্য এর থেকে ভালো আর কোনো উপায় না পেয়ে সে রুদ্রমণিকে ইশারায় তার কাছে ডাকল। সে দুহাত বাড়িয়ে টলে টলে তার দিকে এগিয়ে গেলে দাই তাকে কোলে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোতেই সুখদা চিলের মতো ছোঁ মেরে রুদ্রকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল—তোমার এই চালাকি অনেক দিন থেকে লক্ষ করছি। এসব তামাশা অন্য কোথাও গিয়ে দেখিও। আমি ঢের দেখে নিয়েছি।

দাই রুদ্রর জন্য পারলে প্রাণ দিত। তার ধারণা ছিল, সুখদা সে কথা জানে। তার মনে হত সুখদা ও তার মধ্যে এমন একটা দৃঢ় বন্ধন ছিল যা সাধারণ একটা ঝটকায় নষ্ট হবার নয়। এই জন্যই সুখদার কটু বচন শুনেও তার এই বিশ্বাস হত না যে সুখদা তাকে তাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সুখদা এমন কঠোরভাবে কথাগুলো বলল এবং রুদ্রকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যে, দাই আর সহ্য করতে পারল না। বলল—বউদি, আমার তো তেমন কোনো অপরাধ হয়নি। বড়োজোর মিনিট পনেরো দেরি হয়ে থাকবে। এতেই আপনি এত রেগে গেলেন! সোজাসুজি বলে দিলেই তো পারেন যে, অন্য জায়গা দেখ। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। গতর খাটাতে পারলে কাজের আকাল হবে না।

সুখদা বলল—তা, এখানেই বা কে তোমার পরোয়া করছে? তোমার মতো মেয়েছেলে গলি গলি ভিক্ষে করে ফিরছে।

দাই উত্তর দিল—ঠিক আছে, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। ঝি-দাই আপনার অনেক জুটবে। আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। আমি চললাম।

সুখদা—যাও, গিয়ে বাবুর কাছ থেকে তোমার পাওনা মিটিয়ে নাও।

দাই—আমার হয়ে বুদ্রবাবুকে তা থেকে মিষ্টি কিনে দেবেন।

এরই মধ্যে ইন্দ্রমণিও বাইরে থেকে এসে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কী, হল কী?

দাই বলল—কিছু না। বউদি আমাকে জবাব দিয়ে দিয়েছেন, আমি চলে যাচ্ছি।

ইন্দ্রমণি সংসারের দৈনন্দিন ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। নগ্নপদ মানুষ যেমন কাঁটা থেকে দূরে থাকে তেমনি। তাই তাকে সারাদিন এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সেও সই, কিন্তু কাঁটায় পা রাখার সাহস তার ছিল না। দুঃখিত হয়ে বললেন—কী হয়েছিল?

সুখদা বলল—কিছু না। আমি চাই না, রাখব না। আমার খুশি। কারো কাছে তো মুচলেকা লিখে দিইনি।

ইন্দ্রমণি বিরক্তি ভরে বললেন—তুমি বসে বসে একটা না একটা খিটকেল বাধিয়েই চলেছ।

সুখদা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল—হ্যাঁ, আমার তো এই রোগ। কী করব, স্বভাবই এরকম। তোমার যদি এত প্রেম হয়ে থাকে তবে গলায় ঝুলিয়ে রাখো। আমার ওকে দিয়ে কাজ নেই।

তিন

দাই জলভরা চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুদ্রমণির জন্যে তার মন ছটফট করছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল, ছেলেকে একবার কোলে নিয়ে আদর করে, কিন্তু মনের ইচ্ছে মনে রেখে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হল।

বুদ্রমণি দাইয়ের পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত এল; কিন্তু দাই যখন বাইরে থেকে দরজা টেনে দিল তখন সে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে 'আন্না' 'আন্না' বলে কাঁদতে লাগল। সুখদা তাকে চুমু খেল, আদর করল, কোলে তুলে নিতে চাইল, মিষ্টি দেবে বলে লোভ দেখাল, মেলায় নিয়ে যাবে বলল। এতেও যখন কাজ হল না তখন বাঁদর, পুলিশ, ভূত ও জুজুবুড়ির ভয় দেখাল; কিন্তু বুদ্র সেই যে রৌদ্র ভাব ধারণ করেছিল তা আর কিছুতেই শান্ত হল না। শেষ পর্যন্ত সুখদা রাগ করে ছেলেকে ওখানেই ফেলে রেখে সংসারের কাজে মন দিল। কাঁদতে কাঁদতে বুদ্রর মুখচোখ লাল হয়ে গেল, চোখ ফুলে উঠল। তবু শেষ পর্যন্ত সে ওখানেই মাটির উপর শুয়ে ফোঁপাতে লাগল।

সুখদা ভেবেছিল, ছেলে কেঁদেকেটে কিছুক্ষণের মধ্যে শান্ত হয়ে যাবে। বুদ্র কিন্তু জেগে উঠেই 'আন্না' 'আন্না' করে চিৎকার শুরু করে দিল। তিনটের সময় ইন্দ্রমণি অফিস থেকে ফিরে ছেলের এই দশা দেখে স্ত্রীর প্রতি কুপিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বুদ্রর যখন এই বিশ্বাস হল যে দাই মিষ্টি আনতে গেছে, তখন সে আশ্বস্ত হল।

কিন্তু সন্ধ্যা হতেই সে আবার চিৎকার শুরু করে দিল—আন্না, মিষ্টি দে।

এভাবে দু-তিন দিন গেল। আন্নার জন্য চিৎকার করা ও কাঁদা ছাড়া বুদ্রর আর কোনো কাজ নেই। সেই অচঞ্চল কুকুর যা তার কোল থেকে মুহূর্তের জন্যও নামানো যেত না, সেই মৌনব্রতধারী বিড়াল যাকে সাজানো দেখে তার আনন্দ ধরত না, সেই পক্ষবিহীন পাখি যার জন্য সে প্রাণ দিতে পারত—এই সবই তার মন থেকে সরে গিয়েছিল। সে আর ওসবের দিকে চোখ তুলেও তাকাত

না। তার আন্না মতো জীবন্ত, জাগ্রত একজন মানুষ যে তাকে ভালোবসত, তাকে কোলে করে ঘুরে বেড়াত, ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াত, গান গেয়ে খুশি করত, তার অভাব ওই নির্জীব বস্তুগুলো আর কী করে পূরণ করবে! সে প্রায়ই ঘুমের মধ্যে থেকেও চমকে উঠত এবং 'আন্না' 'আন্না' করে চিৎকার করে হাত দিয়ে ইশারা করত, মনে হত তাকে ডাকছে। রুদ্র আন্নার ফাঁকা ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকত। তার মনে হত, আন্না হয়তো আসবে। এই ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনলেই 'আন্না' করে দৌড়ে যেত। ভাবত আন্না এসে গেছে। তার নাদুসনুদুস শরীর রোগা হয়ে গেল; গোলাপের মতো চেহারা শুকিয়ে গেল। তার মা-বাবা তার মোহন হাসির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকত। যদি বা অনেক কাতুকুতু ইত্যাদির পরে হাসত, মনে হত ভিতর থেকে হাসছে না, কেবল মন রক্ষার জন্য হাসছে।

এখন সে দুধ ভালোবাসে না, মিছরি ভালোবাসে না, কিসমিস ভালোবাসে না, মিষ্টি বিস্কুট ভালোবাসে না, টাটকা অমৃতি ভালোবাসে না। যখন আন্না হাতে করে তাকে এসব খাওয়াত তখন তার ভালো লাগত। এখন সে তার কোনো স্বাদ পায় না। দু-বছরের লকলকে সুন্দর গাছ শুকিয়ে গিয়েছে। সেই ছেলে যাকে কোলে নিলে তুলতুলে ও ভারী বোধ হত, সে আজ শুকিয়ে কাঠ। সুখদা নিজের ছেলের এই দশা দেখে মনে মনে কষ্ট পেত এবং নিজের মূর্খতার জন্য পস্তাত। শান্তিপ্রিয় ইন্দ্রমণি এখন আর ছেলেকে কোল থেকে নামান না, রোজ সঙ্গে করে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যান। রোজই নতুন নতুন খেলনা নিয়ে আসেন; কিন্তু সেই নিস্তেজ বৃক্ষ কিছুতেই আর বাড়ছিল না। দাই ছিল রুদ্রর জগতের সূর্য। তার স্বাভাবিক তাপ ও কিরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে তার শ্যামলিমা বিকশিত হবে কী করে? দাই ছাড়া তার চারদিক এখন শুধুই শূন্য। দ্বিতীয় আর একজন 'আন্না' তৃতীয় দিনই রাখা হয়েছিল; কিন্তু রুদ্র তাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিত যেন সে ডাইনি কিংবা পেতনি।

প্রত্যক্ষরূপে দাইকে সামনে না দেখে রুদ্র এখন তার কল্পনায় মগ্ন থাকত। কল্পনায় তার আন্নাকে সে চলাফেরা করতে দেখত। তার সেই কোল, সেই স্নেহ, সেই মিষ্টি কথা, সেই সুন্দর গান, সেই লোভনীয় মিঠাই, সেই মনোরম জগৎ, সেই আনন্দময় জীবন। একা একা বসে সেই কাল্পনিক আন্নার সঙ্গে কথা বলত :আন্না, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। আন্না, গাই দুধ দেয়। আন্না, ধবধবে ঘোড়া দৌড়ায়। সকাল হতেই ঘটি নিয়ে দাইয়ের ঘরে গিয়ে বলত—আন্না, জল। দুধের গ্লাস নিয়ে তার ঘরে রেখে আসত আর বলত—আন্না খাবে। আন্না এখন তার কাছে এক স্বর্গের বস্তু, যার ফিরে আসার কোনো আশাই আর ছিল না। রুদ্রের চরিত্রে ধীরে ধীরে শিশুর চাপল্যের পরিবর্তে এক নিরাশাজনিত ধৈর্য এবং একটা নিরানন্দ শিথিলতা দেখা দিতে লাগল। এইভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। বর্ষার সময় এল। কখনও কখনও মারাত্মক গরম আবার কখনও ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা। সর্দিজ্বর বেশ দেখা দিল। রুদ্রের দুর্বল শরীর এই ঋতু পরিবর্তনের ধাক্কা সইতে পারল না। সুখদা তাকে ফ্লানেলের জামা পরিয়ে রাখত; জলের কাছে যেতে দিত না; খালি পায়ে এক পাও হাঁটতে দিত না। তবু সর্দি লেগে গেল। রুদ্রর কাশি ও জ্বর হল।

চার

সকালবেলা। বুদ্র খাটিয়ায় চোখে বুঁজে শুয়ে ছিল। ডাক্তারের চিকিৎসা নিষ্ফল হল। সুখদা খাটিয়ায় বসে বুদ্রর বুকে তেল মালিশ করছিল আর ইন্দ্রমণি বিষাদের মূর্তির মতো করুণ চোখে ছেলের দিকে চেয়ে দেখছিলেন। আজকাল তিনি সুখদার সঙ্গে খুব কম কথা বলতেন। তার প্রতি তাঁর এক ধরনের ঘৃণার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাকেই তিনি বুদ্রর অসুখের একমাত্র কারণ বলে মনে করছিলেন। সে তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত নীচ স্বভাবের স্ত্রীলোক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। সুখদা ভয়ে ভয়ে বলল—আজ বড়ো হাকিম সাহেবকে ডাকলে হত। বোধ হয় তাঁর ওষুধে ভালো হয়ে যাবে।

ইন্দ্রমণি বাইরের কালো মেঘের দিকে দৃষ্টি আবধ্ধ রেখে রুক্ষস্বরে জবাব দিলেন—বড়ো হাকিম সাহেব কেন, স্বয়ং ধন্বন্তরী এলেও কোনো লাভ হবে না।

সুখদা বলল—তা হলে এখন কি আর কোনো ওষুধ খাওয়ানো হবে না?

ইন্দ্রমণি—ব্যস, এর একটাই ওষুধ, আর সে ওষুধ পাওয়া দুষ্কর।

সুখদা—তোমার তো সেই এক কথা। বুড়ি এসে কি অমৃত খাওয়াবে?

ইন্দ্রমণি—তোমার কাছে বিষ হলেও ছেলের তাই অমৃত।

সুখদা—ওর হাতেই যে ভগবানের ইচ্ছা সে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

ইন্দ্রমণি—যদি না বুঝতে পার কিংবা এখন পর্যন্ত না বুঝে থাক তাহলে কাঁদতে হবে। ছেলের আশা ছাড়তে হবে।

সুখদা—চুপ করো, কী অলক্ষুনে কথা মুখ দিয়ে বের করছ? যদি এরকম খারাপ কথাই শোনাবে তবে বাইরে চলে যাও।

ইন্দ্রমণি—তা আমি যাচ্ছি। তবে মনে রেখো ছেলের মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী হবে। যদি ছেলের মঙ্গল চাও তো সেই দাইয়ের কাছে যাও। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ক্ষমা চাও। তোমার ছেলের জীবন তারই দয়ার উপর নির্ভর করছে।

সুখদা কোনো উত্তর দিল না। তার চোখ থেকে জল ঝরছিল।

ইন্দ্রমণি জিজ্ঞাসা করল—কী ইচ্ছা তোমার? যাব, গিয়ে ডেকে আনব?

সুখদা—তুমি কেন যাবে? আমি নিজেই যাব।

ইন্দ্রমণি—না, মাপ করো। তোমার উপর আমার বিশ্বাস নেই। কে জানে তোমার মুখ থেকে আবার কী বেরিয়ে পড়বে? সে হয়তো তখন আসতে গিয়েও আসবে না।

সুখদা তার স্বামীর প্রতি আবার তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ, তাই বই কী। আমার তো আর নিজের ছেলের অসুখের কোনো চিন্তা নেই! আমি লজ্জায় তোমাকে বলতে পারিনি। তবে বারেবারেই একথা আমার মনে হয়েছে। আমি যদি দাইয়ের বাসা চিনতাম, তবে কবেই গিয়ে তাকে বুঝিয়ে নিয়ে আসতাম। সে আমার প্রতি যতই বিরক্ত হোক না কেন, বুদ্রকে তো সে ভালোবাসত। আমি আজই তার কাছে যাব। তুমি তাকে বুঝিয়ে বলতে বলছ, আমি তার পা ধরতে রাজি। তার পা আমি চোখের জলে ভিজিয়ে দেব, আর যে ভাবে পারি তাকে রাজি করাব।

সুখদা অনেক ধৈর্য ধরে এত কথা বললেও জোর করে আটকে রাখা অশ্রু আর চাপতে পারল না। ইন্দ্রমণি সহানুভূতির চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হয়ে বলল—তোমার যাওয়া আমি সঠিক মনে করছি না। আমি নিজেই যাচ্ছি।

পাঁচ

কৈলাসী ছিল সংসারে একা। এক সময় তার সংসারও ছিল গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত; কিন্তু একে একে সব পাপড়িই ঝরে পড়ল। তার সব সজীবতাই এখন নষ্ট প্রায়; তার শেষ চিহ্নটুকুই শুধু রয়ে গেছে।

তবে রুদ্রকে পেয়ে এই রিক্ততার মধ্যেও যেন প্রাণের স্পন্দন জেগেছিল। শুষ্ক বৃক্ষে যেন নতুন পাতার উদ্‌গম হয়েছিল। কৈলাসীর জীবন যা ছিল এতদিন নীরস ও শুষ্ক তা হয়ে উঠল সরস ও সজীব। অন্ধকার বনে ভ্রান্ত পথিক যেন আলোর নিশানা খুঁজে পেল। তার জীবন আর নিরর্থক নয়, সার্থক।

রুদ্রর আধো-আধো কথা শোনার জন্য কৈলাসী আকুল থাকত। তবে সে তার স্নেহ সুখদার কাছ থেকে গোপন রাখত, যাতে মার মনে ঈর্ষার সঞ্চার না হয়। সে সুখদাকে বুঝিয়ে রুদ্রর জন্য মিষ্টি কিনে আনত এবং তাকে খাইয়ে আনন্দ পেত। সে তাকে দিনে দু-তিন বার মালিশ করত যাতে বাচ্চা পুষ্ট হয়। পাছে নজর লেগে যায় এই ভয়ে অন্য লোকের সামনে তাকে কিছু খাওয়াতো না। সর্বদাই বলে বেড়াত যে বাচ্চা খুব কম খায়। কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য মালা ও তাবিজ পরিয়ে রাখত। এ ছিল তার পবিত্র ভালোবাসা, এর মধ্যে স্বার্থের লেশ ছিল না।

এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কৈলাসীর এখন সেই অবস্থা হল যা হয় থিয়েটার হলে দর্শকদের হঠাৎ আলো নিভে গেলে। তার দৃষ্টির সামনে সেই কায়া তখনও নেচে চলেছে, আধো-আধো সেই কথা তখনও শোনা যাচ্ছে। নিজের বাসা তার কষ্টকাবাস। সেই কালকুঠরিতে তার দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

রাতটা তো যেমন-তেমন কাটল। সকালে কৈলাসী ঘর ঝাঁট দিচ্ছে এমন সময় টাটকা হালুয়া বিক্রির হাঁক শুনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল আজ হালুয়া কে খাবে? কোলে বসে আজ কে বকর বকর করবে? হালুয়া খেতে খেতে রুদ্রর চোখে-মুখে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে ভাবান্তর হত তার মাধুরী পান করবার জন্য কৈলাসীর হৃদয় অধীর হয়ে উঠল। সে ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ভাবল রুদ্রকে দেখে আসবে; কিন্তু অর্ধেক রাস্তা গিয়ে ফিরে এল।

এক মুহূর্তের জন্যও কৈলাসী রুদ্রর চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। সে ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠত, দেখত রুদ্র যেন একটা লাঠিকে ঘোড়া করে ছুটে আসছে। প্রতিবেশীদের কাছে গেলেও সে রুদ্রর কথাই আলোচনা করত। রুদ্র ছিল তার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সুখদার নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহারের কথা তার মনে ঠাঁই পায়নি। সে রোজ ভাবত যে রুদ্রকে দেখতে যাবে। তার জন্য বাজার থেকে মিষ্টি ও খেলনা এনে রেখে দিত। ঘর থেকে বেরিয়েও আবার রাস্তায় গিয়ে ফিরে আসত।

কখনও দু-চার পা গিয়ে আর এগোতে পারত না। কোন মুখে যাবে? যে ভালোবাসাকে শঠতা মনে করে তার সামনে কী করে যাবে। কখনও ভাবত, বুদ্র যদি তাকে চিনতে না পারে। শিশুর ভালোবাসায় কী বিশ্বাস। নতুন দাইয়ের সঙ্গে হয়তো তার ভাব হয়ে গেছে। এই চিন্তা তার পায়ে শেকলের মতো কাজ করত।

এইভাবে দু-সপ্তাহ কেটে গেল। কৈলাসীর মন উতলা হয়ে থাকত, যেন সে কোনো দীর্ঘ যাত্রায় বেরোবে। ঘরের জিনিস যেমন খুশি পড়ে থাকত। খাওয়াপরার কথা খেয়ালই থাকত না। দিনরাত সে বুদ্রর চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে থাকত। যোগাযোগ ঘটে যাওয়ায় এরই মধ্যে তার বদ্রিনাথ যাবার সুযোগ এসে গেল। পাড়ার কিছু লোক যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। কৈলাসীর দশা তখন ছিল সেই পোষাপাখির মতো যে পাখি খাঁচা থেকে পালিয়ে অন্য কোনো জায়গার সন্ধান করছে। ভুলে থাকবার এই চমৎকার সুযোগ মিলে গেল। সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল।

ছয়

কালো মেঘে আকাশ ঢেকে আছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। দিল্লি স্টেশনে প্রচুর যাত্রীর ভিড়। কেউ গাড়িতে বসে; কেউ আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। চারদিকে হইচই চলছে। এখনও সবাই সংসারের মায়ায় আবদ্ধ! কেউ তার স্ত্রীকে বলছে যেন ধানকাটা হয়ে গেলে পুকুরপাড়ের খেতে মটর বুনে দেওয়া হয় আর বাগানের পাশের খেতে গম। আর কেউ তার যুবক ছেলেকে বুঝিয়ে বলছে যে, যারা টাকা শোধ করেনি তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে যেন দেরি করা না হয় আর শতকরা দু-টাকা সুদ যেন অবশ্যই কেটে নেওয়া হয়। এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী তার গোমস্তাকে বোঝাচ্ছিলেন যে, জিনিস পেতে দেরি হচ্ছে বুঝলে যেন সে নিজেই চলে যায় এবং বাজার-চালু জিনিস যেন নেয়, নয়তো টাকা ফেঁসে যেতে পারে। তবে কিছু কিছু ধর্মভীরু যাত্রীও ছিলেন। তারা হয় চুপচাপ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন কিংবা তন্ময় হয়ে মালা জপ করছিলেন। কৈলাসীও এক গাড়িতে বসে চিন্তা করছিল—এইসব লোক, এরা এখনও সংসারচিন্তা ছাড়তে পারছে না! সেই ব্যাবসার কথা, সেই লেনদেনের চর্চা! এখন যদি বুদ্র এখানে থাকত তাহলে খুব কাঁদত। আমার কোল থেকে কিছুতেই নামত না। ফিরে এসে ওকে অবশ্যই দেখতে যাব। হা ঈশ্বর! এখন গাড়ি কোনোরকমে ছাড়লে হয়; গরমের চোটে প্রাণ বেরোবার উপক্রম। এত ঘটা করে মেঘ জমেছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ার নাম নেই। জানি না, এই রেলওয়ালারা গাড়ি ছাড়তে কেন দেরি করছে। মিছামিছি এদিকওদিক ছুটছে অথচ তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়ছে না। গাড়ি ছাড়লে যাত্রীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

হঠাৎ কৈলাসী দেখল, ইন্দ্রমণি এক সাইকেল নিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে আসছেন। বিষণ্ণ চেহারা, জামা ঘামে জবজবে। তিনি এসে গাড়ির ভিতর উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। সেও যে যাচ্ছে কেবল এটা জানাবার জন্যই কৈলাসী গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল এবং ইন্দ্রমণি তাকে দেখেই দৌড়ে কাছে গিয়ে বলল—কী, কৈলাসী, তুমিও রওনা হলে?

কৈলাসী নম্রভাবে অথচ গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল—হ্যাঁ, এখানে কী করব? জীবনের ঠিকঠিকানা কী? কে জানে কবে চোখ বন্ধ হবে। বুদ্রবাবু ভালো আছে তো?

ইন্দ্রমণি—এখন তো চলেই যাচ্ছ। রুদ্রর কথা জিজ্ঞাসা করে কী করবে? তাকে আশীর্বাদ কর।

কৈলাসীর বুক ধক করে উঠল। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলল—তার শরীর কি ভালো নেই?

ইন্দ্রমণি—তুমি যেদিন থেকে চলে এসেছে সেই দিন থেকেই তো সে অসুস্থ। দু-সপ্তাহ পর্যন্ত তো সে 'আম্মা'-'আম্মা' করেছে। আজ এক সপ্তাহ হল কাশি আর জ্বরে পড়েছে। সমস্ত রকম ওষুধ হার মেনেছে, কোনো লাভ হল না। আমি ভেবেছিলাম, এসে তোমাকে অনুনয়-বিনয় করে নিয়ে যাব। কে জানে হয়তো তোমাকে দেখে সে সুস্থ হয়ে উঠবে; কিন্তু তোমার ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম তুমি তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছ। এখন আর কোন মুখে ফিরে যেতে বলব। তোমার সঙ্গে আর ব্যবহারটাই বা কী এমন করেছি যে এতটা সাহস করব! তার উপর আবর পুণ্য কাজে বিঘ্ন ঘটাবার ভয়ও রয়েছে। তুমি যাও, ঈশ্বরই সব। পরমায়ু থাকলে বেঁচে যাবেই, নয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছায় কে বাধা দেবে!

কৈলাসী চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। সামনের সবকিছু ঝাপসা বলে মনে হতে লাগল। ভারী অশুভ আশঙ্কায় তার মন ভেঙে পড়ল। তার মন থেকে বেরিয়ে এল—হা ঈশ্বর! আমার রুদ্রর যেন কোনো অনিষ্ট না হয়। আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, আমার হৃদয় কত কঠোর! এমন ছেলে কেঁদেকেঁদে শেষ হয়ে গেল, অথচ আমি তাকে দেখতে পর্যন্ত গেলাম না! সুখদার স্বভাব ভালো নয়, না হোক; কিন্তু রুদ্র আমার কী করেছিল যে আমি মার বদলা ছেলেকে দিয়ে নিলাম! ঈশ্বর আমার অপরাধ ক্ষমা করো। আমার আদরের রুদ্র আমার জন্যে হাপিত্যেশ করছে। (একথা মনে হতেই কৈলাসীর মন অস্থির হয়ে উঠল এবং চোখ জলে ভরে এল)। আমি কী করে জানব সে আমাকে এত ভালোবাসে! কে জানে ছেলে এখন কেমন। ভয়ে ভয়ে বলল—দুধ খাচ্ছে তো?

ইন্দ্রমণি—তুমি দুধ খাবার কথা বলছ, দুদিন হল সে চোখ পর্যন্ত খুলছে না।

কৈলাসী—হা, ভগবান! আরে, এই কুলি, কুলি! বাবা, এসে আমার মাল গাড়ি থেকে নামিয়ে দে। এখন আমি তীর্থযাত্রার কথা ভাবতে পারছি না। হ্যাঁ, বাবা, তাড়াতাড়ি কর্। বাবুজি, একটা এক্কা তো ঠিক করে ফেলো।

এক্কা রওনা হল। সামনে রাস্তায় গাড়ি ছিল বলে ঘোড়া আস্তে আস্তে চলছিল। কৈলাসী বিরক্ত হয়ে বারেবারে এক্কাওয়ালাকে বলছিল—বাবা, তাড়াতাড়ি কর্। আমি তোকে কিছু বেশি পয়সা দেব। রাস্তায় লোকের ভিড় দেখে তার রাগ হল। তার মন চাইছিল, ঘোড়ার যদি পাখনা থাকত। যাই হোক, ইন্দ্রমণির বাড়ি প্রায় এসে গেলে কৈলাসীর বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। বারে বারে মন থেকে রুদ্রর উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ বেরিয়ে আসছিল। ঈশ্বর করেন যেন সব কুশল হয়। এক্কা ইন্দ্রমণির গলির দিকে মোড় নিল। হঠাৎ কৈলাসীর কানে কান্নার আওয়াজ গেল। তার বুক ধড়ফড় করে উঠল। মাথা ঘুরতে লাগল। মনে হচ্ছিল, নদীতে ডুবে যাচ্ছে। মন চাইছিল, এক্কা থেকে লাফিয়ে পড়ে; কিন্তু একটু পড়েই বোঝা গেল, কোনো মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। মন আশ্বস্ত হল। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রমণির বাড়ি এসে গেল। কৈলাসী ভয়েভয়ে দরজার দিকে তাকাল, যেন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া কোনো অনাথ ছেলে সন্ধ্যাবেলায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত

হয়ে ফিরে এসেছে আর দরজার দিকে লজ্জিত চোখে তাকিয়ে দেখছে কেউ বসে আছে কিনা। অন্ধকারাচ্ছন্ন দরজায় বসে রাঁধুনি ঠাকুর খইনি পাকাচ্ছিল। কৈলাসীর কিছুটা সাহস হল। ঘরে ঢুকে দেখল, নতুন দাই পুলটিস বানাচ্ছে। তার মনে সাহস সঞ্চার হল। সুখদার ঘরে ঢুকতেই তার মন গ্রীষ্মের দুপুরের মতো কাঁপতে লাগল। সুখদা রুদ্রকে কোলে নিয়ে এক দৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। যেন শোক ও করুণার প্রতিমা।

কৈলাসী সুখদাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। রুদ্রকে তার কোল থেকে নিয়ে তার দিকে সজল চোখে তাকিয়ে বলল—বাবা রুদ্র! চোখ খোল।

রুদ্র চোখ মেলে কিছুক্ষণ দাইকে দেখল। তারপর হঠাৎ দাই-এর গলা জড়িয়ে ধরে বলল—আম্মা এসেছে! আম্মা এসেছে!

নিভন্ত প্রদীপে তেল পড়লে যেমন হয় তেমনি মুমূর্ষু রুদ্রর বিবর্ণ চেহারা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। মনে হল, যেন সে হঠাৎ কিছুটা বড়ো হয়ে গেছে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। সকালবেলা রুদ্র উঠোনে খেলা করছিল। ইন্দ্রমণি বাইরে থেকে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললেন—তোমার আম্মাকে মেরে তাড়িয়ে দিই?

রুদ্র মুখ গম্ভীর করে বলল—না, কাঁদবে।

কৈলাসী বলল—কেন, বাবা, তুমি তো আমাকে বদ্রিনাথ যেতে দিলে না। আমার তীর্থযাত্রার পুণ্যফল কে দেবে?

ইন্দ্রমণি হেসে বললেন—তার থেকে তোমার অনেক বেশি পুণ্য হয়ে গেছে। এই তীর্থই মহাতীর্থ।

(মহাতীর্থ / ১৯১৭) অনুবাদ অমলকুমার রায়

দুর্গামন্দির

ব্রজনাথবাবু আইনের বই পড়ায় ব্যস্ত, ওঁর বাচ্চা দুটো ঝগড়া করায়। শ্যামা চেঁচাচ্ছে, মুন্নু আমার পুতুলগুলো দিচ্ছে না। মুন্নু কাঁদছে, শ্যামা আমার মিষ্টি খেয়ে নিয়েছে।

ব্রজনাথবাবু রেগেমেগে ভামাকে বলেন—পাজি দুটোকে তুমি এখান থেকে নেবে কিনা বলো? নইলে আমি একটা একটা করে পেটাচ্ছি। ভামা উনুন ধরাচ্ছে, বলে—আরে, এখন এই সন্ধ্যার সময়ও পড়বে? একটুখানি জিরিয়ে নাও না।

ব্রজ—ওঠবার তো নাম নেই, ওখানে বসে বসেই উপদেশ দেবে। এখনই একটাকে তুলে যখন আছাড় মারব তখন ওখান থেকেই চেল্লাতে চেল্লাতে আসবে, হায় হায়! বাচ্চাটাকে মেরে ফেলল।

ভামা—তা আমি তো আর শুয়েবসে নেই। এক দণ্ড একটুখানি বাচ্চা দুটোর সঙ্গে খেললে কী হয়। আমি একা তো আর ওদের গোলামিতে নাম লেখাইনি।

ব্রজনাথের কোনো জবাব মুখে আসে না। রাগ যদি জলের মতো বয়ে যাবার রাস্তা না পায় তাহলে আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ব্রজনাথ যদিও কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে খুবই সচেতন, তবুও এখন সেসব পালনে তৎপরতা দেখান না। বাদী আর বিবাদী দুজনের প্রতিই সম ব্যবহার করে দুজনকেই কান্নাকাটির মধ্যে ফেলে রেখে আইনের বইখানাকে বগলদাবা করে কলেজ-পার্কের দিকে রওনা হন।

দুই

শ্রাবণ মাস। আজ কদিন বাদে মেঘ কেটেছে। সবুজ সবুজ গাছগুলো সোনালি চাদর পরে দাঁড়িয়ে। মৃদুমন্দ সমীর শ্রাবণের রাগিণী আলাপ করছে। বকগুলো গাছের ডালে ডালে বসে দোলনায় দোল খাচ্ছে। ব্রজনাথ একখানি বেঞ্চিতে এসে বসে বইখানা খোলেন। তবে এই গ্রন্থের চেয়ে প্রকৃতি-গ্রন্থকে অবলোকন করা বেশি চিত্তাকর্ষক। তিনি একবার আকাশকে পড়ছেন, একবার পাতাকে, কখনও ছবির মতো শ্যামলিমাকে, কখনও সামনের মাঠে খেলায় মেতে থাকা ছেলেগুলোকে।

হঠাৎ সামনে ঘাসের উপর কাগজের একটি মোড়ক ওঁর চোখে পড়ে। প্রলোভন বলে ওঠে—আড়ালে চলো তো, দেখি ওতে কী আছে? বুদ্ধি বলে—তোমার তাকে কী? থাক না পড়ে।

কিন্তু জিজ্ঞাসারূপী প্রলোভনের জয় হয়। ব্রজনাথ উঠে গিয়ে মোড়টাকে তুলে নেন। হয়তো কারো পয়সা মোড়কে জড়ানো পড়ে গেছে। খুলে দেখেন, গিনি। গুনে দেখেন, আটখানা। কৌতূহলের সীমা থাকে না।

ব্রজনাথের বুক ধড়ফড় করতে থাকে। গিনি আটখানা হাতে নিয়ে ভাবতে থাকেন, এগুলোকে নিয়ে কী করি? যদি এখানেই ফেলে রাখি, তাহলে না জানি কার নজরে পড়বে, না জানি কে তুলে নিয়ে যাবে। না, এখানে রাখা ঠিক নয়। যাই থানায় গিয়ে খবর দিই আর দারোগার হাতে গিনিগুলোকে সঁপে দিই। যার জিনিস সে নিয়ে যাবে কিংবা সে না পেলেও আমার কোনো দোষ থাকবে না, আমি তো আমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হব।

প্রলোভন পর্দার অন্তরাল থেকে মন্ত্রণা দিতে শুরু করে। ব্রজনাথ থানায় যান না। ভাবেন—ভামার সঙ্গে একটু মজা করি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার রান্নাবান্না শেষ। কাল ধীরেসুস্থে থানায় যাব।

গিনি দেখে ভামার হৃদয়ে রোমাঞ্চ জাগে। জিজ্ঞেস করে—এগুলো কার?

ব্রজ—আমার।

ভামা—যাও, বলো না গো!

ব্রজ—পড়ে ছিল, কুড়িয়ে পেয়েছি।

ভামা—মিথ্যে কথা। অতই যদি ভাগ্যবান হবে তাহলে সত্যি করে বলো তো কোথায় পেয়েছ? কার?

ব্রজ—সত্যি বলছি, পড়ে ছিল, কুড়িয়ে পেয়েছি।

ভামা—আমার দিব্যি?

ব্রজ—তোমার দিব্যি।

ভামা গিনিগুলোকে স্বামীর হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে।

ব্রজনাথ বলেন—কেড়ে নিচ্ছ যে?

ভামা—দাও, আমার কাছে রেখে দিই।

ব্রজ—থাক, এগুলোর খবর দিতে আমি থানায় যাচ্ছি।

ভামার মুখখানা অন্ধকার হয়ে যায়। বলে—পড়ে পাওয়া ধন, তার আবার কীসের খবর?

ব্রজ—হ্যাঁ, তা নয় তো কী? এই গিনি আটখানার জন্য ধর্মটাকে নষ্ট করব, তাই না?

ভামা—বেশ, তাহলে সকালে যেও। এখন গেলে ফিরতে রাত হবে।

ব্রজনাথও ভাবেন—সেই ভালো। থানার লোকেরা রাতে তো কোনো কাজ করবে না। আশরফিগুলো যখন পড়েই থাকবে তখন যেমন থানা, তেমনি আমার ঘর। গিনিগুলোকে সিন্ধুকে তুলে রাখেন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পরে ভামা হেসে বলে—ঘরে আসা ধন কেন ছাড়ছ? দাও, আমার একগাছি ফাঁসি হার বানিয়ে নিই, অনেক দিন ধরে মনে বড়ো সাধ।

প্রলোভন এবারে হাস্যের রূপ ধারণ করে।

ব্রজনাথ তিরস্কার করে বলেন—হারের লোভে গলায় ফাঁস লাগাতে চাও নাকি?

তিন

সকালে ব্রজনাথ থানায় যাবার জন্য তৈরি হন। আইনের ক্লাসের একটা লেকচার বাদ পড়বে, কোনো ক্ষতি নেই। উনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের অনুবাদক। চাকরিতে উন্নতির কোনো আশা নেই

দেখে বছর খানেক ধরে ওকালতি পড়তে ব্যস্ত। কাপড়চোপড় পরছেন এমন সময় ওঁর এক বন্ধু মুনশি গোরেলাল এসে হাজির। তারপর তাঁর পারিবারিক যত দুশ্চিন্তার বিস্তৃত দুঃখের কাহিনি শুনিয়ে খুবই বিনীতভাবে বললেন—দাদা, এখন আমি এসব ঝঞ্ঝাটে এমন ফেঁসে গেছি যে বুদ্ধি কোনো কাজ করছে না। তুমি বড়ো লোক। এসময় কিছু সাহায্য কর। বেশি না, তিরিশটা টাকা দাও। কোনো মতে কাজ চালিয়ে নেব, আজ মাসের তিরিশ তারিখ। কাল বিকেলে তুমি টাকাটা পেয়ে যাবে।

ব্রজনাথ বড়ো লোক নন, কিন্তু বড়োলোকি ভাব দেখান। এই লোকদেখানো ভাব ওঁর চরিত্রের একটি দুর্বলতা। শুধুমাত্র তাঁর ঐশ্বর্যের প্রভাব দেখানোর জন্যেই উনি প্রায় বন্ধুবান্ধবদের ছোটোখাটো প্রয়োজন মেটাতে নিজের সত্যিকারের প্রয়োজনগুলোকে বিসর্জন দিয়ে থাকেন। ভামার কিন্তু এ সব ব্যাপারে কোনো সহানুভূতি নেই। তাই যখন ব্রজনাথের উপরে এ ধরনের সঙ্কট এসে পড়ে, তখন কিছুক্ষণের জন্য পারিবারিক শান্তি অবশ্যই বিঘ্নিত হয়। অস্বীকার করবার বা এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা ব্রজনাথের নেই।

উনি সসংকোচে ভামার কাছে গিয়ে বলেন—তোমার কাছে তো তিরিশটা টাকা হবে, তাই না? মুনশি গোরেলাল চাইছেন।

ভামা রুক্ষভাবে বলে—আমার কাছে তো টাকা নেই।

ব্রজ—আছে তো ঠিকই, মিথ্যে কেন বলছ।

ভামা—বেশ, মিথ্যেই বলছি।

ব্রজ—আমি তাহলে ওঁকে গিয়ে কী বলি।

ভামা—বলে দাও যে ঘরে টাকা নেই, তুমি বলতে না পার, পর্দার আড়াল থেকে আমি বলে দিচ্ছি।

ব্রজ—বলবার সে তো আমি বলে দেব, তবে ওঁর বিশ্বাস হবে না। ভাববেন বানিয়ে বলছি।

ভামা—ভাববেন, তো ভাবুন গে।

ব্রজ—আমার দ্বারা এতটা অভদ্রতা হবে না। দিনরাত একসঙ্গে কাটাই, কী করে 'না' করব?

ভামা—বেশ, তাহলে যা মন চায় করো গে। আমি একবার বলে দিয়েছি, আমার কাছে টাকা নেই।

ব্রজনাথ মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ণ হন। তাঁর বিশ্বাস, ভামার কাছে টাকা আছে, তবু শুধু তাকে বিড়ম্বিত করার জন্য অস্বীকার করছে। জেদ সংকল্পকে দৃঢ় করে তোলে, সিন্দুক থেকে দুটো গিনি বের করে গোরেলালকে দিয়ে বলেন—ভাই, কাল বিকেলে অফিস থেকে ফিরেই টাকাটা দিয়ে যাবে। এগুলো একজন জমা রেখে গেছে, আমি এখনই বেরোচ্ছিলাম দিয়ে আসতে। কাল টাকা না পেলে আমাকে খুব লজ্জায় পড়তে হবে, মুখ দেখাতে পারব না।

গোরেলাল মনে মনে বলেন—জমা টাকা বউয়ের ছাড়া আবার কার হবে। গিনি দুটোকে পকেটে ফেলে উনি বাড়ির পথ ধরেন।

চার

আজ পয়লা তারিখের সন্ধ্যা। ব্রজনাথ দরজায় বসে গোরেলালের জন্য অপেক্ষা করছেন।

পাঁচটা বেজে গেছে, গোরেলাল এখনো আসেননি। ব্রজনাথের চোখ দুটো রাস্তার পানে চেয়ে আছে। হাতে একখানা চিঠি, কিন্তু পড়ায় মন বসছে না। তিন মিনিট বাদে বাদে রাস্তার দিকে তাকান আর মনে মনে ভাবেন—আজ মাইনের তারিখ তাই আসতে দেরি হচ্ছে। বোধ হয় আসছেন। ছটা বাজে, গোরেলালের পাত্তা নেই। অফিসের কর্মচারীরা এক একজন করে চলে আসছে। ব্রজনাথের কয়েকবার ভুল হয়। ওই যে আসছেন। নিশ্চয়ই উনি। সেই আচকান। সেই টুপি। হাঁটার ভঙ্গিও তেমনি, হ্যাঁ, উনিই। এদিকেই আসছেন। বুকের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে যাচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায় যে অন্য লোক। আশার কাল্পনিক মূর্তিখানি হতাশায় বদলে যায়। ব্রজনাথের মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠতে থাকে। উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। বারান্দার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দুধারে দৃষ্টি ফেলেন। কোথাও চিহ্ন নেই। দু-তিনবার দূর থেকে আসা এক্কাগুলোকে দেখে গোরেলাল বলে ভুল করেন। আকাঙ্ক্ষার প্রবলতাই তার কারণ।

সাতটা বাজে। ঘরে ঘরে সন্ধেবাতি জ্বলে ওঠে। রাস্তায় অন্ধকার ঘনাতে থাকে। ব্রজনাথ উদ্‌বিগ্নভাবে রাস্তায় পায়চারি করতে থাকেন। ইচ্ছে হয়, গোরেলালের বাড়িতে যান। ওদিকে পা বাড়ান, কিন্তু বুক কাঁপে পাছে রাস্তায় না ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ভাববেন যে কটা টাকার জন্য এত অস্থির হয়ে পড়েছে। খানিকটা যেতেই কাউকে আসতে দেখেন। ভুল হয় গোরেলাল বলে। ফিরে আসেন, এসে সোজা একেবারে বারান্দায় উঠে নিঃশ্বাস ফেলেন। কিন্তু এবারেও সেই ধোঁকা। আবার সেই ভুল। তারপর ভাবতে শুরু করেন, কেন এত দেরি হচ্ছে? এখনো কি অফিস থেকে আসেন নি? তা কিছুতেই হতে পারে না। ওঁর অফিসের লোকেরা অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। দুটোই শুধু কারণ হতে পারে — এক, উনি কাল আসবেন বলে ঠিক করেছেন, হয়তো মনে করেছেন রাতে আর কে যায় কিংবা জেনেশুনে ইচ্ছে করে বসে রয়েছেন। দেবার ইচ্ছে নেই বোধ হয়। কাল ওঁর গরজ ছিল, আজ আমার গরজ। আমিই বরং কাউকে কেন পাঠিয়ে দিই না? কিন্তু পাঠাই কাকে? মুন্নাটা যেতে পারে। রাস্তার উপরই বাড়ি। একথা মনে আসতে ঘরে গিয়ে ঢোকেন, ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিয়ে চিঠি লিখতে বসেন, তবে চোখ দুটো দরজার দিকেই চেয়ে থাকে। অকস্মাৎ কারো পায়ের শব্দ শোনা যায়। তাড়াতাড়ি করে চিঠিটাকে একখানি বইয়ের নীচে চাপা দিয়ে বারান্দায় চলে অসেন। দেখেন পাশের এক সবজিওয়ালা টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁকে দিয়ে পড়াতে এসেছে। তাকে বলেন, ভাই এখন ফুরসত নেই, একটু বাদে এসো। সে মিনতি করে—বাবুমশাই, বাড়িসুদ্ধ সবাই ভয় পেয়ে গেছে, একটু এক নজর দেখে দিন। শেষ পর্যন্ত ব্রজনাথ গজগজ করতে করতে ওর হাত থেকে তারখানাকে নিয়ে এক নজর উপরে উপরে চোখ বুলিয়ে বলেন—কলকাতা থেকে এসেছে। মাল পৌঁছায় নি। সবজিওয়ালা ভয়ে ভয়ে বলে—বাবুমশাই, আর একটু দেখুন না কে পাঠিয়েছে। ব্রজনাথ তারটা ছুঁড়ে ফেলে বলেন—আমার এখন সময় নেই।

আটটা বেজে গেছে। ব্রজনাথ হতাশ হতে থাকেন—মুন্নু এত রাতে যেতে পারবে না। মনে মনে ঠিক করেন, নিজেরই যাওয়া উচিত, তা যাই মনে করুন গে, আর কত দুশ্চিন্তা করব? সাফসাফ বলব, আমার টাকাটা দিয়ে দাও। ভালোমানুষের সঙ্গে ভালোমানুষি করা যেতে পারে। এমন ধড়িবাজদের সঙ্গে ভালোমানুষি করা বোকামি, আচকান পরে ভেতরে গিয়ে ভামাকে বলেন—একটা কাজে একটু বাইরে যাচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

যেতে হয় তাই যান; তবে পদে পদে থেমে থেমে হাঁটেন। গোরেলালের বাড়ি দূর থেকে চোখে পড়ে, ল্যাম্প জ্বলছে। দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবতে থাকেন, গিয়ে কী বলব? উনি যদি যেতে না যেতে টাকাটা বের করে দিয়ে দেন আর দেরি হবার জন্য ক্ষমা চান তাহলে আমার খুব লজ্জা করবে। উনি আমাকে ছোটোলোক, ওঁছা, অধৈর্য ভাববেন। না, টাকার কথা তুলতে যাবই বা কেন? বলব—ভাই, বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে পেটব্যথা করছে। তোমার কাছে পুরানো আরক আছে না! কিন্তু না, এই অজুহাতটা খানিকটা বাজে মনে হচ্ছে। আসল মতলবটা বুঝে ফেলবে। উহুঁ! এই ঝঞ্ঝাটের দরকারই বা কী। আমাকে দেখলে উনি আপনা থেকেই বুঝে ফেলবেন। এ নিয়ে কথা বলার কোনো দরকারই হবে না। ব্রজনাথ এসব কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছেন, নদীর ঢেউ যেদিকে খুশি যাক না কেন স্রোত যেমন তার গতি বদলায় না সেরকম।

গোরেলালের বাড়ি আসে। দরজা বন্ধ। ওঁকে ডাকবার সাহস হয় না ব্রজনাথের। ভাবেন হয়ত খেতে বসেছেন। দরজার সামনে দিয়ে এগিয়ে যান, তারপর আস্তে আস্তে পায়চারি করতে করতে মাইলখানেক চলে যান, নটা বাজার আওয়াজ কানে আসে। গোরেলাল হয়ত খাওয়া সেরে নিয়েছেন, ভেবে ফিরে আসেন, কিন্তু বাড়ির দরজায় যখন আসেন, অন্ধকার। আশারূপী প্রদীপটি নিভে গেছে। এক মিনিট দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। কী করি? এখনও সবে সন্ধে। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়ে না। পা টিপে টিপে বারান্দায় ওঠেন। দরজায় কান পেতে শোনেন, চারদিকে তাকিয়ে দেখেন কেউ আবার দেখে না ফেলে। কথাবার্তার কিছু কিছু শব্দ ওঁর কানে আসে। মন দিয়ে শোনেন। বউ বলছে—টাকা তো সবটা খরচ হয়ে গেল, ব্রজনাথকে কোথা থেকে দেবে? গোরেলাল জবাব দেন—এমন কীসের তাড়া, পরে দিয়ে দেব। আজ ছুটির দরখাস্ত জমা দিয়ে এসেছি, কাল মঞ্জুর হয়ে যাবেই। তিন মাস বাদে ফিরব, তখন দেখা যাবে।

ব্রজনাথের মনে হল, কেউ যেন মুখের উপর থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছে। ক্রোধে হতাশায় বারান্দা থেকে নেমে আসেন। বাড়ির দিকে যাবার সময় পা দুটো সোজা পড়ছে না, যেন সারাদিনের শ্রান্ত ক্লান্ত এক পথিক।

পাঁচ

সারাটা রাত ব্রজনাথ এপাশ ওপাশ করেন। কখনও গোরেলালের ধূর্ততায় রাগ হয়, কখনও নিজের বোকামিতে। কে জানে কোন গরিব বেচারার টাকা। ওর মনে না জানি কী হচ্ছে। তবে এখন আর রাগ করে বা দুঃখ করে কী লাভ? ভাবেন—টাকা কোত্থেকে জোগাড় হবে? ভামা আগেই নেই বলেছে, বেতন থেকে এতটা বাঁচানো সম্ভব নয়। পাঁচ-দশ টাকার ব্যাপার হত তাহলে খরচ কাটছাঁট করে দেখা যেত। তাহলে এখন কী করি? কারও কাছ থেকে ধার নেব? কিন্তু আমাকে কে ধার দেবে? আজ অবধি কারুর কাছে হাত পাতবার দরকার হয়নি, আর আমার এমন কোনো বন্ধুও তো নেই। যারা আছে, তারা আমাকেই বিরক্ত করে, আমাকে আবার কী দেবে? হ্যাঁ, যদি কিছুদিন আইনের ক্লাস ছেড়ে অনুবাদের কাজে খাটি, তাহলে টাকার জোগাড় হতে পারে। কম করেও একটা মাসের হাড়ভাঙা খাটুনি। সস্তা অনুবাদকের জন্য দরও তো পড়ে গেছে! হায়রে শয়তান! তুই এমন দাগা দিলি! না জানি কোন জন্মের শত্রুতার প্রতিশোধ নিলি। পথে বসিয়ে দিলি একেবারে।

পরদিন থেকে ব্রজনাথের মাথায় টাকার ভাবনা ভর করে, সকালবেলা আইনের ক্লাসে যান, সন্ধেবেলা অফিস থেকে মামলার রায়ের পুলিন্দা বাড়িতে নিয়ে আসেন আর মাঝরাত অবধি জেগে অনুবাদ করেন। মাথা তোলারও সময় পান না। কখনও কখনও রাত একটা-দুটোও বেজে যায়। মস্তিষ্ক যখন একেবারে শিথিল হয়ে পড়ে তখন বাধ্য হয়ে খাটিয়াতে পড়ে থাকেন।

কিন্তু এতটা পরিশ্রমের অভ্যাস নেই বলে মাঝে মাঝে মাথায় যন্ত্রণা হতে থাকে। কখনও হজমে বিঘ্ন হয়, কখনও জ্বর এসে যায়। তা সত্ত্বেও উনি মেশিনের মতো কাজ করে যান। ভামা কখন কখন রেগেমেগে বলে—কী গো, একটু শোও না, বড়ো ধর্মাত্মা হয়েছ। তোমার মতো পাঁচ-দশটা লোক আরও থাকলে সংসারের কাজকর্মই বন্ধ হয়ে যেত। ব্রজনাথ এই বিঘ্নকারী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কোনো উত্তর দেন না। ভোর হতে না হতেই আবার সেই একই রকম কাজ শুরু করেন।

এমনি করে তিন তিনটে সপ্তাহ কেটে যায় আর এদিকে মাত্র পঁচিশটা টাকা হাতে আসে। ব্রজনাথ ভাবেন—আর দু-তিন দিনের মধ্যে তরি তীরে ভিড়বে। কিন্তু একুশ দিনের দিন ওঁর প্রচণ্ড জ্বর আসে। তিন দিন পর্যন্ত সে জ্বর ছাড়ে না। ছুটি নিতে হয়, শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ভাদ্র মাস। ভামা মনে করে, পিত্তের প্রকোপ। কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে ডাক্তারের ওষুধ খেয়েও যখন জ্বর কমে না তখন ভয় পেয়ে যায়। ব্রজনাথ প্রায়ই জ্বরের মধ্যে বকাঝকা করতে থাকেন। শুনে ভয়ের চোটে ভামা ঘর থেকে পালিয়ে যায়। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে গিয়ে অন্য ঘরে বন্ধ করে রাখে। এবারে ওর মনে হয় এই যন্ত্রণাটা ওই টাকাগুলোর জন্য ভুগতে হচ্ছে না তো! কে জানে, যার টাকা সে হয়তো কিছু করে দিয়েছে। ঠিকই তাই হয়েছে, তা নইলে ওষুধে কাজ হচ্ছে না কেন।

সঙ্কটে পড়লে আমরা ধর্মভীরু হয়ে পড়ি। ওষুধপত্রে হতাশ হয়ে দেবতাদের শরণ নিই। ভামাও দেবতাদের শরণ নেয়। জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি আর তৃতীয়ার উপোস ছাড়া সে এতদিন আর কোনো ব্রত করত না। এবারে সে নবরাত্রের কঠিন ব্রত শুরু করে।

আট দিন পুরো হয়। শেষ দিন আসে। প্রভাত বেলা, ভামা ব্রজনাথকে ওষুধ খাওয়ায়, তারপর বাচ্চা দুটোকে নিয়ে মা দুর্গার পুজো দিতে যায়। ওর হৃদয় আরাধ্যা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরপুর। মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছায় সে। পূজারিরা আসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছেন। ধূপ আর চন্দনের সুগন্ধ আসছে। ভামা মন্দিরে প্রবেশ করে। সম্মুখে দুর্গার বিশাল প্রতিমা শোভা পাচ্ছে। দেবীর মুখারবিন্দে এক অপূর্ব দীপ্তি। বিশাল নেত্রদ্বয়ে উজ্জ্বল জ্যোতি। পবিত্রতার এক জ্যোতির্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত। ভামা এই দীপ্তবর্ণা মূর্তির সামনে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। ওর অন্তঃকরণে একটা নির্মল, বিশুদ্ধ ভাবমিশ্রিত ভয়ের উদয় হয়। চোখ দুটি সে বুজে ফেলে। নতজানু হয়ে বসে জোড়হাত করে করুণ কণ্ঠে সে মিনতি করে—মা গো, আমাকে দয়া করো।

ওর যেন মনে হয় দেবী হাসছেন। দেবীর নেত্রদ্বয় থেকে একটা যেন জ্যোতি এসে তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। দেবীর মুখ থেকে নির্গত এই কথাগুলো সে শুনতে পায়—পরের ধন ফিরিয়ে দে, তোর মঙ্গল হবে।

ভামা উঠে বসে—ওর চোখ দুটিতে নির্মল ভক্তির আভাস ফুটে উঠেছে। মুখমণ্ডল থেকে পবিত্র ভক্তি ঝরে পড়ছে। দেবী বোধ হয় ভামাকে তাঁর আপন প্রভার রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন।

ইতিমধ্যে আরেকজন স্ত্রীলোক আসে। উজ্জ্বল কেশরাশি তার শুষ্ক মুখখানির দুপাশ থেকে ঝুলছে। শরীরে শুধু একখানি শ্বেতশুভ্র শাড়ি। হাতে চুড়ি ছাড়া আর কোনো অলংকার নেই। শোক আর হতাশার যেন সাক্ষাৎ প্রতিমা। সেও দেবীর সামনে মাথা নত করে দুহাতে আঁচলখানা মেলে ধরে বলে—মা, যে আমার টাকা নিয়েছে তার সর্বনাশ কর।

সেতার যেমন মেজরাপের আঘাতে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, ভামার মনটাও তেমনি অনিষ্ট আশঙ্কায় থর থর করে কেঁপে ওঠে। কথাগুলো তীক্ষ্ণ শরের মতো ওর বুকে বিঁধ হয়। সে মা দুর্গার দিকে কাতর নেত্রে তাকায়। দেবীর জ্যোতির্ময় প্রতিমা ভয়ংকর, নেত্রদ্বয় থেকে ভীষণ অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসছে। আকাশ থেকে, মন্দিরের সামনেকার বৃক্ষগুলি থেকে, মন্দিরের সমস্ত স্তম্ভ থেকে, সিংহাসনের প্রজ্বলিত প্রদীপ থেকে এবং দেবীর করাল মুখ থেকে এ কথাগুলো নির্গত হয়ে ভামার অন্তঃকরণে সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—পরের ধন ফিরিয়ে দে, নইলে তোর সর্বনাশ হবে। ভামা উঠে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধাকে বলে—তোমার টাকা কি কেউ নিয়ে নিয়েছে?

বৃদ্ধা এমনভাবে ওর দিকে তাকায়, যেন ডুবন্ত মানুষ কুটোর অবলম্বন পেয়েছে।

বলে—হ্যাঁ, মা।

বৃদ্ধা—এই মাস দেড়েক।

ভামা—কত টাকা ছিল?

বৃদ্ধা—পুরো একশো বিশ টাকা।

ভামা—কী করে হারাল?

বৃদ্ধা—কী জানি কোথায় পড়ে গেছে। আমার স্বামী পল্টনে চাকরি করতেন। আজ কয়েক বছর হল উনি মারা গেছেন। আমি এখন সরকার থেকে বছরে ষাট টাকা করে পেনশন পাই। এবারে দু-বছরের পেনশন একসঙ্গেই পেয়েছিলাম। খাজানাখানা থেকে টাকা নিয়ে আসছিলাম। টের পাইনি কখন কোথায় পড়ে গেছে। আটখানা গিনি ছিল।

ভামা—গিনিগুলো যদি পেয়ে যাও তাহলে কী দেবে?

বৃদ্ধা—বেশি না, ও থেকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দেব।

ভামা—টাকা কী হবে, ওর চেয়ে ভালো কোনো জিনিস দাও।

বৃদ্ধা—মা, আর কী দেব, যদ্দিন বাঁচব তোমার সুখ্যাতি করব।

ভামা—না, তার দরকার নেই আমার।

বৃদ্ধা—মা, এ ছাড়া আমার কাছে আর কী আছে?

ভামা—আমাকে আশীর্বাদ দাও। আমার স্বামী অসুস্থ, উনি যেন ভালো হয়ে যান।

বৃদ্ধা—টাকা কি উনিই পেয়েছেন?

ভামা—হ্যাঁ, উনি সেদিন থেকেই তোমাকে খুঁজছেন।

বৃদ্ধা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ে আর আঁচল পেতে কম্পিত কণ্ঠে বলে—মা! এদের কল্যাণ করো।

ভামা আবার দেবীর দিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাকায়। দেবীর দিব্যরূপে স্নেহের প্রকাশ। দুচোখে করুণার আনন্দদায়িনী আভা। ভামার অন্তঃকরণে কোন এক স্বর্গলোক থেকে এ ধ্বনি কানে আসে—যা তোর কল্যাণ হবে।

ছয়

সন্ধ্যাবেলা। ব্রজনাথের সঙ্গে একায় ভামা তুলসীর বাড়িতে ওর টাকাটা ফেরত দিতে যাচ্ছে। ব্রজনাথের এত পরিশ্রমের রোজগার তো ডাক্তারের পায়ে উৎসর্গ হয়ে গেছে, তবে ভামা এক পড়শির হাত দিয়ে কানের ঝুমকো দুটোকে বেচে টাকার জোগাড় করেছে। ঝুমকো যেদিন তৈরি হয়ে এসেছিল ভামা খুব খুশি হয়েছিল। আজ ওগুলোকে বেচে দিয়ে তার চেয়েও বেশি খুশি।

ব্রজনাথ যখন গিনি আটটা ওকে দেখিয়েছিলেন, ওর মনে রোমাঞ্চ হয়েছিল, তবে সে আনন্দটা মুখে ফুটে ওঠার সাহস পায় নি। আজ সেই গিনিগুলো হাতছাড়া হবার সময় তার অন্তরের আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে চোখে ফুটে উঠছে, ঠোঁটে নাচছে, কপোল দুটিকে রাঙিয়ে তুলছে, আর অঙ্গে অঙ্গে খেলা করছে। ওই আনন্দ ছিল ইন্দ্রিয়ের, এ আনন্দ আত্মার। ওই আনন্দ কুণ্ঠার মধ্যে গোপন ছিল, এ আনন্দ গর্বিতভাবে বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে।

তুলসীর আশীর্বাদ ফলে যায়। আজ পুরো তিন সপ্তাহ বাদে ব্রজনাথ বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসেছেন। উনি বারবার ভামাকে প্রেমপূর্ণ নয়নে দেখছেন। ভামাকে আজ দেবী বলে মনে হচ্ছে। এতদিন উনি ভামার বাহ্য সৌন্দর্যের শোভা দেখেছেন, আজ উনি ভামার আত্মিক সৌন্দর্য দেখলেন।

তুলসীর বাড়ি একটি গলিতে। একা রাস্তার উপরে থাকে। ব্রজনাথ একা থেকে নেমে তাঁর ছড়িতে ভর দিয়ে ভামার হাত ধরে তুলসীর বাড়িতে যান। তুলসী টাকা নেয়, দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে, বলে—মা দুর্গা তোমাদের মঙ্গল করুন।

বর্ষার পরে গাছের পাতাগুলো যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তুলসীর ফ্যাকাশে মুখখানাও তেমনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মুখের বলিরেখাগুলো মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। মনে হয় যেন জীর্ণদেহ সতেজ হয়ে উঠেছে। সে নবজীবন লাভ করেছে।

সেখান থেকে ফিরে এসে ব্রজনাথ ঘরের দরজায় বসে আছেন এমন সময় গোরেলাল এসে বসেন। ব্রজনাথ মুখ ঘুরিয়ে নেন।

গোরেলাল বলেন—দাদা শরীর কেমন আছে?

ব্রজনাথ—খুব ভালো আছি।

গোরেলাল—আমাকে ক্ষমা করবে। আমার বড়ো দুঃখ যে তোমার টাকাটা দিতে এত দেরি হয়েছে। পয়লা তারিখেই বাড়ি থেকে একটা জরুরি চিঠি এসে গেল, আর আমি কোনো মতে তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি ছুটলাম। ওখানকার বিপত্তির কথা বলতে গেলে শেষ হবে না। তোমার অসুখের খবর শুনে আজ ছুটতে ছুটতে আসছি। এই নাও টাকাটা এনেছি। এই দেরির জন্য খুবই লজ্জিত।

ব্রজনাথের ক্রোধ শান্ত হয়ে যায়। বিনয়ের মধ্যে শক্তি। বলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, অসুস্থ ছিলাম বটে, তবে এখন ভালো হয়ে গেছি। তোমাকে আমার জন্য শুধু শুধু কষ্ট করতে হল। এখন যদি তোমার অসুবিধা থাকে, তাহলে পরে টাকা দিয়ে দেবে। আমি এখন ঋণমুক্ত হয়ে গেছি। এমন কিছু তাড়া নেই।

গোরেলাল বিদায় নিলে ব্রজনাথ টাকাটা নিয়ে ভেতরে এসে ভামাকে বলেন—এই নাও তোমার টাকা; গোরেলাল দিয়ে গেল।

ভামা বলে—এ আমার টাকা নয়, তুলসীর। পরের টাকা নেওয়ার শিক্ষা হয়ে গেছে।

ব্রজনাথ—কিন্তু, তুলসীর সব টাকা তো চুকিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে।

ভামা—চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তো কী হয়েছে? এ ওর আশীর্বাদের দান।

ব্রজ—কানের ঝুমকো কোথা থেকে আসবে?

ভামা—ঝুমকো না থাকে না থাকবে, চিরদিনের জন্য 'কান' তো রয়ে গেল।

অনুবাদ ননী শূর

(দুর্গা কা মন্দির / ১৯১৭)

বলিদান

মানুষের আর্থিক অবস্থার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে তার নামের উপর। বেলা গাঁয়ের মঙ্গরু ঠাকুর যেদিন থেকে কনস্টেবল হয়েছেন, সেদিন থেকে তাঁর নাম হয়েছে মঙ্গলসিংহ। এখন কেউ ওঁকে মঙ্গরু বলতে সাহস করে না। কাল্লু গয়লা যেদিন থেকে থানার দারোগা সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে আর গাঁয়ের মোড়ল হয়ে বসেছে, সেদিন থেকে তার নাম কালিকাদিন হয়ে গেছে। এখন কেউ ওকে কাল্লু বললে ও চোখ কটমট করে তাকায়। ঠিক তেমনি হরখচন্দ্র কুর্মি এখন হরখু হয়ে গেছে। আজ থেকে বিশ বছর আগে ওর বাড়িতে চিনি তৈরি হত, কয়েকখানা লাঙল দিয়ে চাষবাস হত আর ব্যাবসাও খুব ফলাও ছিল। কিন্তু বিদেশি চিনি এসে ওর সর্বনাশ করে দিয়েছে। আস্তে আস্তে কারখানা গেছে, জমি গেছে, খদ্দের গেছে আর সেও গেছে। সত্তর বছরের বুড়ো, যে একদিন তাকিয়া ঠেস দিয়ে পালঙ্কে বসে হুঁকো টানত, সে এখন মাথায় করে ঝুড়ি বয়ে নিয়ে সার ছিটিয়ে দিতে যায়। তবে ওর মুখে এক ধরনের গাম্ভীর্য, কথায় বার্তায় এক ধরনের অহংকার, চালচলনে এখনও এক রকমের দম্ভ রয়ে গেছে। এসবের উপর কালের প্রভাব পড়েনি। সুদিন মানুষের চরিত্রে চিরকালের জন্য তার ছাপ রেখে যায়। হরখুর হাতে এখন শুধু পাঁচ বিঘে জমি। শুধু দুটি বলদ। একটা লাঙলেই শুধু চাষ হয়।

তবে নিজেদের মধ্যে কলহবিবাদের সময় পঞ্চায়েতে ওর মতামতকে এখনও সমীহ করা হয়। সে যা বলে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে আর গাঁয়ের নিরক্ষর লোকগুলো ওর সামনে মুখ খুলতে পারে না।

হরখু জীবনে কোনোদিন ওষুধ খায়নি। অসুখ ওর হাত ঠিকই। আশ্বিন মাসে ম্যালেরিয়ার কবল থেকে কখনও রেহাই পেত না। তবে পাঁচ-দশ দিনে সে ওষুধপত্র ছাড়াই চাঙ্গা হয়ে উঠত। এ বছরও কার্তিক মাসে অসুখে পড়ল। ভালো তো হয়েই যাব একথা ভেবে সে কোনো পরোয়া করেনি, কিন্তু এবারের জ্বরটা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। এক সপ্তাহ যায়, দু-সপ্তাহ যায়, এক মাস কেটে যায়, কিন্তু হরখু বিছানা ছেড়ে ওঠে না। এবারে ওর মনে হল ওষুধের দরকার। ওর ছেলে গিরিধারী কখনও নিমের কাথ খাওয়ায়, কখনও কুরচির ছালের রস, কখনও পুনর্নবার শেকড়। কিন্তু এসব ওষুধে কোনো কাজ হল না। হরখুর বিশ্বাস হয়ে গেছে যে এবারে সংসার থেকে বিদায় নেওয়ার দিন এসে গেছে। একদিন মঙ্গলসিংহ ওকে দেখতে এল। বেচারা ভাঙা খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে রামনাম জপছে। মঙ্গলসিংহ বলে—দাদু, ওষুধ না খেলে ভালো হবেন না। কুইনিন কেন খাচ্ছেন না? হরখু উদাসীনভাবে বলে—বেশ, নিয়ে এসো।

পরদিন কালিকাদিন এসে বলে—দাদু, দু-চার দিন কিছু একটা ওষুধ খেয়ে নাও। এখন তোমার তো আর জোয়ান শরীর নেই যে ওষুধপত্র ছাড়াই ভালো হয়ে যাবে।

হরখু তেমনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—তাহলে নিয়ে এসো। কিন্তু রোগীকে দেখে আসা এক কথা আর ওষুধ এনে তাকে দেওয়া আরেক কথা। প্রথম ব্যাপারটা হয় শিষ্টাচারে আর শেষেরটা সত্যিকারের সমবেদনা থাকলে। না মঙ্গলসিংহ খোঁজখবর নেয়, না কালিকাদিন, না আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি। হরখু দালানে খাটের উপর পড়ে থাকে। মঙ্গলসিংহকে দেখতে পেলে বলে—কী রে ভাই, ওষুধটা আনলি না? মঙ্গলসিংহ পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কালিকাদিনকে দেখলে ওকেও এক প্রশ্ন করে; কিন্তু সেও নজর বাঁচিয়ে যায়। হয় হরখুর মনে এ কথাটা আসেই না যে ওষুধ পয়সা ছাড়া মেলে না, কিংবা হয়তো সে পয়সাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করে, কিংবা সে হয়তো জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছে। ওষুধের দামের কথা সে কখনও তোলে না। ওষুধও আসে না। ওর অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে। শেষে পাঁচ মাস ভুগে ঠিক হোলির দিনে সে দেহত্যাগ করে। গিরিধারী খুব ধুমধাম করে ওর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। শ্রাদ্ধশান্তি করল খুব জাঁক করে। কয়েকখানা গাঁয়ের বামুনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল।

বেলা গাঁয়ে হোলির উৎসব পালন করা হল না। না উড়ল আবির গুলাল, না বাজল খঞ্জনি, না বইল ভাঙের নদী। কিছু লোক মনে মনে হরখুকে গালাগালি দেয় এই বলে যে বুড়োটা মরতে আর দিন পেল না, দু-চার দিন বাদে না হয় মরত। তবে এতটা নির্লজ্জ কেউ নেই যে শোকের মধ্যে আনন্দ করবে. এ শহর নয়। যেখানে একজন আর একজনের ব্যাপারে শরিক হয় না, যেখানে প্রতিবেশীর কান্নাকাটির আওয়াজ কারও কানে এসে পৌঁছায় না।

দুই

হরখুর জমিগুলোর উপর গাঁয়ের লোকের নজর রয়েছে। পাঁচ-পাঁচ বিঘে জমি কুয়োর পাশে, সার-গোবরে বোঝাই, আল দিয়ে ভরা ওই জমিতে তিন-তিনটে ফসল হয়। হরখু মরতে না মরতে চারদিক থেকে জমিগুলের উপর হামলা হতে থাকে। গিরিধারী শ্রাদ্ধশান্তি নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকে গাঁয়ের মতলববাজ চাষিরা লালা ওঙ্কারনাথকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না, মোটা মোটা সেলামি দিচ্ছে। কয়েক বছরের খাজনা আগাম দিতেও কেউ কেউ রাজি, কেউ দ্বিগুণ সেলামি দিয়ে দস্তাবেজ লেখাতে উন্মুখ। কিন্তু ওঙ্কারনাথ সবাইকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কথা, গিরিধারীর দাবি সবার আগে। সে যদি অন্যদের চেয়ে কমও সেলামি দেয় তবু জমিগুলো ওকেই দেওয়া উচিত। যাই হোক, যখন শ্রাদ্ধশান্তি সারা হল আর চৈত্রমাসটা শেষ হয়ে এল তখন জমিদার মশাই গিরিধারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—জমিগুলোর ব্যাপারে কী বলিস? গিরিধারী কেঁদে বলে—ওই জমিগুলোই তো ভরসা, চাষ না করে কী করব?

ওঙ্কারনাথ—না, চাষ তো করবিই, জমি তোর, আমি তোকে ছাড়তে বলছি না। হরখু আজ বিশ বছর ওই জমি চাষ করেছে। ওই জমির উপর তোর দাবি রয়েছে। তবে তুই তো দেখছিস আজকাল জমির দর কত বেড়ে গেছে। বিঘে পিছু আট টাকা খাজনায় চাষ করতিস, এখন দশ টাকা পাচ্ছি। আর সেলামির একশো টাকা। সে তো আলাদা, তোকে খাতির করে আমি আগের খাজনাই রাখছি, তবে সেলামির টাকাটা তোকে দিতে হবে।

গিরিধারী— হুজুর, আমার ঘরে তো এখন খাওয়াই জুটছে না। এতগুলো টাকা কোত্থেকে দেব? যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল, বাবার কাজে শেষ হয়ে গেছে। ফসল তো এখনও খামারে। তার উপর বাবার অসুখের জন্য ফসলটাও ভালো হয়নি, টাকা কোথা থেকে জোগাড় করব হুজুর?

ওঙ্কারনাথ— তা তো ঠিকই, তবে আমি কিন্তু এর চেয়ে বেশি ছাড়তে পারব না।

গিরিধারী— না, হুজুর অমন কথা বলবেন না। তাহলে আমি মারার আগেই মরে যাব। আপনি গুরুজন হয়ে যখন বলছেন তখন আমি গরুবাছুর বেচে পঞ্চাশ টাকা জোটাতে পারি। এর চেয়ে বেশি সাহস নেই।

ওঙ্কারনাথ রেগে গিয়ে বলেন — তুই বোধহয় ভাবছিস আমি এ টাকাগুলো নিয়ে আমার ঘরে জমিয়ে রাখি আর খোশ মেজাজে দিন কাটাই। আমার উপর দিয়ে যা যায় সে আমিই জানি, কোথাও অমুক চাঁদা দাও, কোথাও তমুক পুরস্কার দাও, এসবের চোটে নাকাল হয়ে যাচ্ছি। বড়োদিনে শয়ে শয়ে টাকা ভেট দিতে উড়ে যায়। যাকে ভেট দেব না, সেই গাল ফোলাবে। যেসব জিনিসের জন্য ছেলেপুলেরা হাপিত্যেশ করে থাকে সেসব জিনিস আনিয়ে ডালিতে সাজিয়ে তাঁদের পাঠাই। তার উপর কখনও কানুনগো আসছেন, কখনও তহশিলদার, কখনও ডেপুটি সাহেবের দলবল আসছেন। সবাই আমার অতিথি হন, এসব না যদি করি তাহলে সবাই দুষবে আর সবার চক্ষুশূল হয়ে পড়ব। তাঁদের খোরাক জোগাতে বছরে হাজার বারোশো তো মুদির খাতায় দিতে হয়। এসব কোথা থেকে আসে? ইচ্ছে হয়, সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাই। কিন্তু ভগবান তো এই কাজের জন্য আমাকে সৃষ্টি করেছেন — একজনকে নির্যাতন করে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করি আর অন্যকে তা কাঁদতে কাঁদতে দিয়ে দিই। এই তো আমার কাজ। তোকে এত ছাড় দিচ্ছি। কিন্তু তুই এতেও যদি খুশি না হোস তো সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। সেলামিতে একটা পয়সাও ছাড় হবে না। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা দাখিল করলে জমি চাষ করতে পাবি, নইলে নয়। আমি অন্য কোনো ব্যবস্থা করে ফেলব।

তিন

গিরিধারী মনের দুঃখে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। একশো টাকার ব্যবস্থা করা ওর ক্ষমতার বাইরে। ভাবতে থাকে — বলদ দুটোও যদি বেচে দিই তাহলে জমি নিয়েই বা কী করব? বাড়ি বেচতে চাইলে এখানে নেবার লোকই বা কোথায়? তার উপর বাপঠাকুরদার নাম ডুববে। চার-পাঁচটা গাছ আছে, ওগুলো বেচলে পঁচিশ কী তিরিশ টাকার বেশি পাওয়া যাবে না। ধার যে নেব, দেবে কে? এখনও বেনে দোকানের পঞ্চাশ টাকা বাকি পড়ে আছে। সে এক পয়সাও দেবে না। ঘরে গয়নাও তো নেই। তাহলে তাই বেচতাম। অনেক কষ্টে একটা হাঁসুলি বানিয়েছিলাম, তাও বেনের ঘরে বাঁধা পড়ে আছে। এক বছর হতে চলল ছাড়াবার মতো অবস্থা হয়নি। গিরিধারী আর তার বউ সুভাগী দুজনেই এই দুশ্চিন্তায় পড়েছে, কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। গিরিধারীর খাওয়াদাওয়া ভালো লাগে না, রাতে ঘুম হয় না। জমি হাতছাড়া হয়ে যাবার কথা মনে হলেই ওর বুকটা যন্ত্রণায় মোচড়াতে থাকে। হায়! যে জমি আমি বছরের পর বছর ধরে চাষ করেছি, যাকে সার দিয়ে পরিপাটি করেছি, যার আল বেঁধেছি তার মজা লুটবে এখন আরেকজন। ওই জমি

গিরিধারীর জীবনের অঙ্গা হয়ে গেছে। ও জমির প্রতিটি ইঞ্চি ওর রক্তে রাঙা। ওর প্রতিটি পরমাণু ওর ঘামে ভেজা।

জমিগুলোর নাম ওর মুখস্থ; ঠিক যেমন তার তিন ছেলের নাম। কোনোটা চব্বিশা, কোনোটা বাইশা, কোনোটা খালপাড়ের, কোনোটা পুকুরপাড়ের। নামগুলো মনে পড়তেই জমিগুলোর ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। খেতগুলোর কথা সে এমন ভাবে বলে যেন ওরা জীবন্ত। যেন ওরা ওর ভালোমন্দের সাথি। ওর জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত কল্পনা, মনের সব মাধুরী, সমস্ত আকাশকুসুম সব কিছুই এ জমিগুলোকে ঘিরে। এদের ছেড়ে বেঁচে থাকার কল্পনাই সে করতে পারে না। সেগুলোই এখন ওর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, ঘণ্টার পার ঘণ্টা জমিগুলোর আলের উপর বসে বসে কাঁদে, যেন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। এভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। গিরিধারী টাকার জোগাড় করে উঠতে পারল না। অষ্টম দিনে সে শোনে যে কালিকাদিন একশো টাকা সেলামি দিয়ে বিঘে পিছু দশ টাকা খাজনা দিয়ে জমিগুলো নিয়ে নিয়েছে। গিরিধারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পরমুহূর্তে সে তার বাবার নাম করে হু হু করে কাঁদতে থাকে। বাড়িতে সেদিন উনুন জ্বলে না। মনে হয় যেন হরখু আজই মারা গেছে।

চার

তবে সুভাগী এমনি এমনি চুপচাপ বসে থাকার পাত্রী নয়। সে রাগে গজগজ করতে করতে কালিকাদিনের বাড়ি চড়াও হয়ে ওর বউটাকে খুব একচোট কটুকাটব্য করে। কালকের বেনে, আজকের শেঠ। জমি চাষ করতে যাচ্ছেন। দেখব, কে আমার জমিতে লাঙল নিয়ে যায়? আমার রক্ত আর তার রক্ত একাকার করে ফেলব। পাড়াপড়শিরাও ওর পক্ষ নিল। বলে, সবই তো তার আছে, নিজেদের মধ্যে এভাবে দর হাঁকাহাঁকি করা ঠিক নয়। নারায়ণ ধন দিয়েছেন, তাই বলে কি গরিবদের পায়ে পিষবে। সুভাগী ভাবে— আমার জিত হয়েছে। ওর মনটা জুড়োয়। কিন্তু যে বাতাস জলে ঢেউ তোলে সে বাতাসই আবার গাছকে শেকড় সুদ্ধ পড়ে ফেলে। সুভাগী প্রতিবেশীদের বৈঠকে তার দুঃখের কাহিনি শোনায় আর কালিকাদিনের বউয়ের সঙ্গে খিটিমিটি করে। ওদিকে গিরিধারী তার ঘরের দরজায় বসে বসে ভাবে, এবারে আমার কী অবস্থা হবে? এ জীবনটা কাটবে কেমন করে? ছেলেগুলো কার দরজায় যাবে? জনমজুরি খাটার কথা মনে হলেই ওর বুকটা হুহু করে ওঠে। এতদিন স্বাধীনভাবে সম্মান নিয়ে সুখ ভোগ করার পর আজ জনমজুরের মতো গোলামি করার চাইতে মরে যাওয়া ভালো মনে হয়। এতদিন গিরিধারী গৃহস্থ ছিল, গাঁয়ের ভালো লোকদের মধ্যে ও একজন বলে গণ্য হত। গাঁয়ের ব্যাপারে ওর কথা বলার অধিকার ছিল। ওর ঘরে সম্পদ না থাকলেও সম্মান ছিল। নাপিত, ছুতোর, কুমোর, পুরুত, ভাট, চৌকিদার এরা সবাই ওর মুখ চেয়ে থাকত। সে মর্যাদা এখন কোথায়। এখন কে ওকে পয়সা দেবে। কে ওর দুয়ারে আসবে। এখন কারোর সঙ্গে একাসনে বসবার, কারও কথায় কথা বলবার অধিকার আর তার রইল না। পেটের দায়ে এখন ওকে অন্যের গোলামি করতে হবে। এক প্রহর রাত থাকতে উঠে কে এখন বলদগুলোকে ঘাসবিচালি খাওয়াবে। সেসব দিন এখন কোথায় যখন গান গেয়ে সে

লাঙল চালাত। মাথার ঘাম পায়ে পড়ত বটে, তবুও একটু ক্লান্তি আসত না। ঢেউ খেলে-যাওয়া জমিগুলো দেখে তার আনন্দের সীমা থাকত না। খামারে স্তূপাকার ফসল সামনে রেখে নিজেকে সে রাজা ভাবত। ঝুড়ি ভরে ভরে ফসল আর কে আনবে? এখন জমি কই? গোলা কই? এসব কথা ভাবতে ভাবতে গিরিধারীর চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে। গাঁয়ের দু-চারজন ভদ্রলোক, যারা কালিকাদিনের ওপর চটা, মাঝে মাঝে গিরিধারীকে সান্ত্বনা দিতে আসে, কিন্তু সে ওদের সঙ্গেও মন খুলে কথা বলে না। মনে হয় সে সবার চোখেই হেয় হয়ে গেছে।

যদি কেউ বলে, তুমি শ্রাদ্ধশান্তিতে শুধু শুধু অতগুলো টাকা উড়িয়ে দিয়েছ, শুনে ওর খুব দুঃখ হয়। তার ওই কাজের জন্য বিন্দুমাত্র সে অনুশোচনা করে না। ভাবে, আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে; তবে পিতৃঋণ থেকে তো মুক্ত হয়েছি। বাবা বেঁচে থাকতে আমাদের চার বেলা খাইয়ে তবে খেয়েছেন। এখন মরবার পর উনি পিণ্ডজলের জন্য হা-হুতাশ করবেন।

এমনি করে তিন মাস কেটে যায়। আষাঢ় এসে পড়ে। আকাশ মেঘে ছেয়ে যায়, বৃষ্টি হয়। কিষানেরা হাল-লাঙল ঠিকঠাক করতে শুরু করে, ছুতোররা লাঙল সারাতে শুরু করে। গিরিধারী পাগলের মতো একবার ঘরে ঢোকে আবার বাইরে আসে। তার লাঙলগুলোকে বের করে দেখে। এটার মুঠো ভেঙে গেছে, ওটার ফালটা ঢিলে হয়ে গেছে। জোয়ালে খুঁটি নেই। দেখতে দেখতে সে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে ভুলে যায়। ছুটতে ছুটতে ছুতোরের বাড়ি গিয়ে বলে—রজ্জু, আমার লাঙলটাও খারাপ হয়ে গেছে। দাও সারিয়ে দাও। রজ্জু ওর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকায়, তারপর নিজের কাজ করতে থাকে। গিরিধারীর হুঁশ হয়, যেন ঘুম ভেঙে চমকে ওঠে, আত্মগ্লানিতে মাথা হেঁট হয়, চোখে জল আসে। চুপচাপ সে বাড়ি চলে আসে।

গাঁয়ে চারদিকে হইহই পড়ে গেছে। কেউ পাটের বীজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ জমিদারের গোলা থেকে ধানের বীজ নিতে আসছে। কোথাও সলাপরামর্শ হচ্ছে, কোন জমিতে কী লাগানো উচিত। কোথাও আলোচনা হচ্ছে, জল খুব বেশি হয়ে গেছে, দু-চার দিন অপেক্ষা করে বীজ বোনা উচিত। গিরিধারী এসব কথা শোনে আর ডাঙায়-তোলা মাছের মতো ছটফট করে।

পাঁচ

একদিন সন্ধ্যার সময় গিরিধারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বলদ দুটোর গা চুলকে দিচ্ছে এমন সময় মঙ্গলসিংহ আসে। একথা সেকথা বলে। তারপর বলে—বলদ দুটোকে কদ্দিন আর ঘরে বেঁধে খাওয়াবে? বেচে দাও না কেন? গিরিধারী মলিন মুখে বলে—হ্যাঁ, কোনো খদ্দের পেলে বেচে দেব।

মঙ্গলসিংহ—এক খদ্দের তো আমি নিজেই। আমাকেই বেচে দাও না।

গিরিধারী কোনো উত্তর দিতে না দিতেই তুলসী বেনে আসে। গর্জন করে বলে—গিরিধারী, তুমি আমার টাকাটা দেখে কি দেবে না বল। তিন মাস ধরে টালবাহানা করে আসছ। এখন কোন্ চাষবাস করছ যে তোমার ফসলের আশায় বসে থাকব?

গিরিধারী বিনীতভাবে বলে—সাহুভাই, যেমন করে এতগুলো দিন সবুর করেছ, তেমনি করে আজকের দিনটাও সবুর করো। কাল তোমার প্রতিটি পাই চুকিয়ে দেব।

মঙ্গল আর তুলসী ঠারেঠোরে কথা বলে। তুলসী গজগজ করতে করতে চলে যায়। তখন গিরিধারী মঙ্গলসিংহকে বলে—তুমি বলদ দুটোকে নিয়ে যাও, তাহলে বাড়ির গোরু বাড়িতেই থেকে যাবে। মাঝে-মধ্যে গিয়ে চোখের দেখা দেখে আসব।

মঙ্গল — আমার তো এমন কোনো তাড়া নেই, আগে বাড়িতে সলাপরামর্শ করি।

গিরিধারী — আমাকে তুলসীর টাকাটা দিতে হবে, নইলে খাওয়াবার ভুসিতো ঘরেই আছে।

মঙ্গল—লোকটা বড়ো পাজি। আবার নালিশ-টালিশ না করে বসে।

সরলহৃদয় গিরিধারী হুমকিতে কাবু হয়। বিচক্ষণ মঙ্গলসিংহের সস্তায় সওদা করার এক মওকা মেলে। আশি টাকা বলদের জোড়া ষাট টাকায় সাব্যস্ত হয়।

গিরিধারী জানি না কোন আশা নিয়ে বলদ দুটোকে এতদিন ঘরে বেঁধে খাইয়েছে। আজ তার আশার সেই কাল্পনিক সুতোটুকুও ছিঁড়ে যায়। মঙ্গলসিংহ গিরিধারীর খাটে বসে টাকা গোনে আর ওদিকে গিরিধারী বলদ দুটোর কাছে বসে বিষণ্ণ নেত্রে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আহা! এরা আমার জমির রোজগেরে সাথি, আমার জীবনের আধার, আমার অন্নদাতা, আমার মান-মর্যাদার রক্ষক। এক প্রহর রাত থাকতে উঠে এদের জন্য খড় কাটতাম। নিজের খাবারের চাইতে এদের খোলভুষির ভাবনা-চিন্তা বেশি করতাম। বাড়ির সবাই এদের জন্য সবুজ সবুজ ঘাস তুলে আনত। এরা আমার আশার দুটি নয়ন, আকাঙ্ক্ষার দুটি নয়নমণি, আমার সুদিনের দুটি স্মৃতিচিহ্ন, আমার দুটি বাহু—আজ আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গলসিংহ যখন টাকাগুলো গুনে রেখে বলদ দুটিকে নিয়ে রওনা হল গিরিধারী তখন ওদের কাঁধে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। মেয়ে যেমন বাপের বাড়ি থেকে যাবার সময় মা-বাবার পা ছাড়ে না, তেমনি গিরিধারীও বলদ দুটোকে ছাড়ে না। সুভাগীও দালানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে। ওদের ছোট্ট ছেলেটা মঙ্গলসিংহকে একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মারতে থাকে।

রাতে গিরিধারী কিছু খায় না, খাটিয়াতে চুপচাপ পড়ে থাকে, সকালে সুভাগী কলকে সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখে সে খাটিয়ায় নেই। ভাবে, হয়তো কোথাও গেছে। কিন্তু যখন বেলা দু-তিন ঘন্টা গড়িয়ে যায় অথচ গিরিধারী ফিরে আসে না তখন সে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। গাঁয়ের লোকজন জড়ো হয়ে যায়। চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। কিন্তু গিরিধারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ছয়

সন্ধে হয়ে গেছে। অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেছে। সুভাগী প্রদীপ জ্বালিয়ে এনে গিরিধারীর বিছানার শিয়রে রাখে, তারপর বসে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ও পায়ের শব্দ শুনতে পায়। সুভাগীর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। একছুটে বাইরে এসে এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে। দেখে গিরিধারী বলদের নাদার পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে। সুভাগী বলে ওঠে—ঘরে এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ, আর সারাটা দিন কোথায় ছিলে? বলতে বলতে সে গিরিধারীর দিকে এগিয়ে যায়। গিরিধারী কোনো কথা বলে না। পিছু হটতে থাকে। তারপর খানিকটা গিয়ে মিলিয়ে যায়। সুভাগী চেঁচিয়ে ওঠে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়।

পরদিন কালিকাদিন লাঙল নিয়ে জমিতে যায়। তখনও কিছুটা অন্ধকার। বলদ দুটোকে লাঙলে জুততে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ সে দেখে গিরিধারী খেতের আলে দাঁড়িয়ে আছে—সেই ফতুয়া গায়ে, সেই পাগড়ি, সেই লাঠি। কালিকাদিন বলে—আরে গিরিধারী, ব্যাটাচ্ছেলে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ আর ওদিকে বেচারি সুভাগী খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথা থেকে আসছ? বলতে বলতে বলদ দুটোকে রেখে সে গিরিধারীর দিকে এগোয়। গিরিধারী পিছু হটতে থাকে। পেছোতে পেছোতে পিছনের কুয়োটাতে লাফিয়ে পড়ে।

কালিকাদিন চিৎকার করে ওঠে। হাল বলদ সব ওখানেই ফেলে রেখে পালায়। সারা গাঁয়ে হইহই শুরু হয়। লোকেরা নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে। গিরিধারীর জমিতে যাবার আর সাহস হয় না কালিকাদিনের। গিরিধারী উধাও হয়েছে আজ ছমাস। ওর বড়ো ছেলেটা এখন একটা ইটের ভাঁটায় কাজ করে। মাসে বিশ টাকা ঘরে আসে। এখন ও শার্ট আর বুটজুতো পরে। বাড়িতে দুবেলা তরকারি রান্না হয়। যবের বদলে গম খাওয়া হয়। কিন্তু গ্রামে ওর কোনো খাতির নেই। ও এখন মজুর। সুভাগী এখন অন্য গাঁয়ে ঢুকেপড়া কুকুরের মতো কুঁকড়ে থাকে। সে এখন পঞ্চায়েতে আসে না। সে এখন মজুরের মা। কালিকাদিন গিরিধারীর জমি ছেড়ে দিয়েছে। কারণ গিরিধারী এখনও তার জমির চারপাশে ঘুরঘুর করে। অন্ধকার হওয়া মাত্রই আলে এসে বসে আর মাঝে মাঝে রাতের বেলা ওদিক থেকে ওর কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। সে কাউকে কিছু বলে না, কাউকে জ্বালাতন করে না। সে শুধু তার জমিগুলোকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকে। সাঁঝের বাতি জ্বলবার পর ওদিককার রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যায়। লালা ওঙ্কারনাথের খুব ইচ্ছে যে জমিগুলো কেউ নেয়, কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা এখন ও জমির নাম মুখে আনতেও ভয় পায়।

(বলিদান / ১৯১৮)　　　　অনুবাদ ননী শূর

ব্যাঙ্ক-দেউলে

লালা সাঁইদাস লখনউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অফিসে আরামকেদারায় শুয়ে শুয়ে শেয়ারের দর দেখছেন আর ভাবছেন অংশীদারদের এবারে কোথা থেকে লভ্যাংশ দেওয়া হবে। চা, কয়লা কিংবা পাটের শেয়ার কেনার, রুপো, সোনা কিংবা তুলোর ফাটকাবাজির ইচ্ছে হয়, কিন্তু লোকসানের ভয়ে কিছু ঠিক করে উঠতে পারছেন না। শস্যের ব্যাবসায়ে এবারে খুব লোকসান হয়েছে, অংশীদারদের সান্ত্বনা দেবার জন্য লাভক্ষতির একটি কল্পিত বিবরণ বানাতে হয়েছে আর লভ্যাংশ দিতে হয়েছে মূলধন থেকে। তাই শস্যের ব্যাবসায় আবার হাত দিতে বুক কাঁপছে।

কিন্তু টাকাগুলোকে বেকার ফেলে রাখাও অসম্ভব। দু-একদিনের মধ্যে টাকাগুলোকে কোথাও না কোথাও খাটাবার উপযুক্ত উপায় খুঁজে বের করা দরকার; কারণ ডাইরেক্টরদের ত্রৈমাসিক অধিবেশন এক সপ্তাহের মধ্যেই হবার কথা আর যদি এই সময়ের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া যায় তাহলে এর পর তিন মাস আর কিছু হতে পারবে না। ফলে ষাণ্মাসিক লভ্যাংশ বন্টনের সময় আবার সেই কাগুজে কারসাজি করতে হবে, যা বারে বারে ব্যাঙ্কের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন। অনেকক্ষণ এই সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকার পর সাঁইদাস ঘন্টি বাজান। ঘন্টি শুনে পাশের কামরা থেকে এক বাঙালিবাবু মাথা বাড়িয়ে উঁকি দেন।

সাঁইদাস—টাটা স্টিল কোম্পানিকে একখানা চিঠি লিখে দিন তারা যেন তাদের একটা নতুন ব্যালান্স শিট পাঠিয়ে দেয়।

বাবু—ওদের টাকার গরজ নেই। চিঠির উত্তর দেয় না।

সাঁইদাস—বেশ, নাগপুরের স্বদেশি মিলকে লিখুন।

বাবু—ওদের কারবার ভালো নয়। সম্প্রতি ওদের শ্রমিকরা হরতাল করেছে। দুমাস মিল বন্ধ ছিল।

সাঁইদাস—আরে মশাই, কোথাও না কোথাও তো লিখতেই হবে! আপনার চোখে তো সারা দুনিয়াটাই বেইমানে ভরা।

বাবু—আরে বাবা, তা নাহয় আমি সব জায়গায় লিখে দেব, কিন্তু শুধু লিখে দিলেই তো কিছু লাভ নেই।

লালা সাঁইদাস আপন বংশমর্যাদা এবং সম্মানের জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বসেছেন, কিন্তু বাস্তব কাজকর্মের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। এই বাঙালিবাবুটিই তাঁর পরামর্শদাতা। এদিকে এই বাবুমশায়টির কোনো কারখানা বা কোম্পানির উপর আস্থা নেই। এরই অবিশ্বাসের ফলে গত বছর ব্যাঙ্কের টাকা সিন্দুক থেকে বাইরে বেরোতে পারেনি, আর এবার আবার সেই

অবস্থাই দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো উপায় মাথায় আসছে না। এমন সাহসও নেই যে নিজের ভরসায় কোনো ব্যাবসায় হাত লাগাবেন। অস্থিরচিত্তে ঘরে পায়চারি করতে থাকেন, এমন সময় দারোয়ান এসে খবর দেয়—বরহলের মহারানি এসেছেন।

দুই

লালা সাঁইদাস চমকে ওঠেন। আজ তিন-চার দিন হয় বরহলের মহারানি লখনউ এসেছেন আর প্রতিটি লোকের মুখে শুধু ওঁরই কথা। কেউ ওঁর পোশাক পরিচ্ছদে মুগ্ধ, কেউ বা রূপে, কেউ বা ওঁর সাবলীল আচরণে। এমনকী রানির দাসীবাঁদি আর সেপাইরাও লোকেদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। রয়াল হোটেলের সামনে দর্শকের ভিড় লেগেই রয়েছে। কত যে ভাবনাচিন্তাহীন হুজুগে লোক আতরওয়ালা, কাপড়ওয়ালা কিংবা তামাকওয়ালার বেশ ধরে ওঁকে দর্শন করে এসেছে! মহারানির গাড়ি যেখান দিয়ে যায় সেখানেই দর্শকদের ভিড় জমে যায়। বাঃ বাঃ, কী সুন্দর! এমন জমকালো ইরাকি জুড়িঘোড়া তো লাটসাহেব ছাড়া আর কোনো রাজরাজড়ার কাছেও খুব কম দেখা যায়, আর সাজগোজও কী চমৎকার! অরে ভাই, এমন ফরসা লোক তো এখানে দেখাই যায় না। এখানকার বড়োলোকেরা তো 'মৃগনাভি', 'চন্দ্রোদয়' আর ভগবান জানেন কী কী সব ছাইপাঁশ খায়, কিন্তু কারও শরীরে তেজ বা জৌলুসের নামগন্ধও নেই। এই মানুষগুলো না জানি কী খায় আর কোন কুয়োর জলই বা খায় যে যাকেই দেখ, যেন তাজা আপেলটি। এসব হল জল-হাওয়ার গুণ।

বরহল উত্তর দিকে নেপালের কাছে, ইংরেজের অধীনে একটি করদ রাজ্য। লোকে যদিও বরহলকে খুব ধনী দেশ বলে জানে; আসলে কিন্তু ওই রাজ্যের আয় দুলাখের বেশি নয়, হ্যাঁ, আয়তন বেশ বড়ো। অধিকাংশ ভূমি উষর ও জনহীন। লোকবতিসপূর্ণ অংশও উঁচুনিচু এবং অনুর্বর। জমির দাম খুব সস্তা।

লালা সাঁইদাস তাড়াতাড়ি খুঁটি থেকে রেশমি স্যুট নামিয়ে পরে নিয়ে টেবিলে এসে এমন ঠাটে বসে পড়েন, যেন রাজারানিদের এখানে আসাটা একটা মামুলি ব্যাপার। অফিসের ক্লার্করাও সটান হয়ে বসে। সারা ব্যাঙ্কে নীরবতার উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে যায়। দারোয়ান পাগড়ি সামলায়। চৌকিদার তলোয়ার বের করে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে। পাখাটানা কুলির মিষ্টি ঘুমটাও ভেঙে যায় আর বাঙালিবাবু মহারানিকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য অফিস থেকে বেরিয়ে যান।

সাঁইদাস বাইরের ঠাট তো বানিয়ে নেন, কিন্তু আশায় আর ভয়ে চিত্ত তাঁর চঞ্চল। একজন রানির সঙ্গে কথা বলার এই প্রথম সুযোগ, ভয় করছে কথা বলতে পারবেন কি পারবেন না। রাজরাজড়াদের মেজাজ থাকে আশমানে। কী জানি কথা বলতে গিয়ে কোনো ভুলচুক না হয়ে যায়। এখন ওঁর একটা অভাব বোধ হতে থাকে। রাজকীয় আদবকায়দা সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ। মহারানিকে কীভাবে সম্মান দেখানো উচিত, ওঁর সঙ্গে কথা বলার সময় কোন কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত, মহারানির মর্যাদা রক্ষার জন্য কতটা নম্রতা দেখানো উচিত, এসব চিন্তায় তিনি বড়ো বিব্রত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে চান যেন এই পরীক্ষা থেকে শিগগিরই মুক্তি পেয়ে যান। ব্যবসায়ী, মামুলি জমিদার কিংবা বড়োলোকদের সঙ্গে উনি কাটকাট সাফসাফ ব্যবহার

করে থাকেন এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সঙ্গো সৌজন্যমূলক শিষ্ট ব্যবহার করে থাকেন। সেসব ক্ষেত্রে ওঁর বিশেষ কোনো ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এখন বড়ো মুশকিল হচ্ছে। এ যেন এক লঙ্কাবাসী তিব্বতে এসে পড়েছে, আর তিব্বতের রীতিনীতি আর কথাবার্তার সে কিছুই জানে না।

হঠাৎ সাঁইদাসের চোখ পড়ে ঘড়ির দিকে। বিকেল চারটে বেজে গেছে অথচ ঘড়িটা এখনও দুপুরের নিদ্রায় মগ্ন। তারিখের কাঁটাটা দৌড়ে সময়কে হারিয়ে দিয়েছে। উনি তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়ান ঘড়িটাকে ঠিক করে দেবেন বলে কিন্তু ততক্ষণে মহারানি ঘরে পদার্পণ করেছেন। সাঁইদাস ঘড়ি ছেড়ে দিয়ে মহারানির কাছে দাঁড়ান। ঠিক করে উঠতে পারেন না, হাতে হাত মেলাবেন, না ঝুঁকে সেলাম করবেন। রানিজি নিজেই তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে এই সমস্যা থেকে ওঁকে রেহাই দেন।

লোকজন সবাই চেয়ারে এসে বসে পড়লে রানির প্রাইভেট সেক্রেটারি কাজের কথাবার্তা শুরু করেন। বরহলের পুরোনো পাঁচালি শোনানোর পরে উনি রানিসাহেবার প্রচেষ্টায় যেসব উন্নতি হয়েছে তার বর্ণনা দেন। বর্তমানে খালের একটি শাখা কাটাবার জন্য দশ লাখ টাকার দরকার। এই উদ্দেশ্যে উনি একটি ভারতীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গেই লেনদেন করা ভালো মনে করেছেন। এখন এটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কই ঠিক করুক যে, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায় কি না।

বাঙালিবাবু—আমরা টাকা দিতে পারি, তবে কাগজপত্র না দেখে কিছু বলতে পারব না।

সেক্রেটারি—আপনারা কি কোনো জামানত চান?

সাঁইদাস উদারভাবে বলেন—মশায়, আপনাদের মুখের কথার চেয়ে বড়ো জামানত আর কী হতে পারে।

বাঙালিবাবু—আপনাদের কাছে কি রাজ্যের কোনো হিসাবপত্র আছে?

হেডক্লার্কের বৈষয়িক বুদ্ধির এই ভঙ্গি লালা সাঁইদাসের ভালো লাগে না। উনি এখন উদারতার নেশায় চুর। মহারানির মুখই পাকা জামানত। মহারানির সামনে কাগজপত্র আর হিসাবের কথা তোলা বেনিয়াগিরি বলে মনে হচ্ছে, অবিশ্বাসের গন্ধ বেরোচ্ছে তা থেকে। মহিলাদের সামনে আমরা সৌজন্য ও শিষ্টতার মূর্তি হয়ে উঠি। বাঙালিবাবুর দিকে ক্রূর-কঠোর দৃষ্টি হেনে সাঁইদাস বলেন—কাগজপত্র যাচাই করা এমন কিছু একটা আবশ্যক ব্যাপার নয়, শুধু আমাদের বিশ্বাস হলেই হল।

বাঙালিবাবু— ডাইরেক্টররা কখনও রাজি হবেন না।

সাঁইদাস— আমরা তার পরোয়া করি না, নিজেদের দায়িত্বে আমরা টাকা দিতে পারি।

রানি সাঁইদাসের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান। ওঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

তিন

কিন্তু ডাইরেক্টররা হিসাবপত্র, আয়ব্যয় দেখা প্রয়োজন মনে করেন এবং এই কাজটা লালা সাঁইদাসের উপরই দেওয়া হয়; কেননা, নিজের কাজ সেরে তার উপরে একটা পুরো দপ্তরের হিসাব নিরীক্ষণ করতে পারে এমন ফুরসত আর কারও ছিল না। সাঁইদাস নিয়মরক্ষা করেন। তিন-চার দিন ধরে হিসাব পরীক্ষা করতে থাকেন। তারপর দেখেশুনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে রিপোর্ট লেখেন। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়। দস্তাবেজ লেখা হয়। টাকা দেওয়া হয়। সুদ ধার্য হয় শতকরা ন টাকা।

তিন বছর ব্যাঙ্কের কারবারে ভালোই উন্নতি হয়। প্রতি ছমাস অন্তর অন্তর না বলে-কয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার থলে অফিসে এসে যায়। ব্যবসায়ীদের শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। অংশীদারদের শতকরা সাত টাকা লাভ থাকে।

সাঁইদাসের উপর সবাই খুশি। সবাই ওঁর বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা করে। এমনকী, বাঙালিবাবুও আস্তে আস্তে ওঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। সাঁইদাস ওকে বলেন—বাবুমশাই, বিশ্বাস সংসার থেকে লুপ্ত হয়নি, হবে না। সত্যের উপর বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মানুষের ধর্ম। যে মানুষের মন থেকে বিশ্বাস চলে গেছে তাকে মৃত বলে মনে করা উচিত। তার মনে হবে যে আমি চারদিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। বড়ো বড়ো সব সিধ মহাত্মা পুরুষও তার চোখে বিড়ালতপস্বী বলে মনে হবে। প্রকৃত দেশপ্রেমিকরাও তার চোখে নামের কাঙাল বলে মনে হবে। সংসারটা তার চোখে কপটতা আর ছলনায় ভরা বলে মনে হয়। এমনকী, তার মন থেকে পরমাত্মার উপরেও শ্রদ্ধা-ভক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। একজন বিখ্যাত দার্শনিকের বক্তব্য হল যতক্ষণ না বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছ, ততক্ষণ প্রতিটি মানুষকে ভালো মানুষ মনে করবে। বর্তমান আইনব্যবস্থাও এই গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। আর ঘৃণা তো কাউকেই করা উচিত নয়। আমাদের আত্মা পবিত্র। এই আত্মাকে ঘৃণা করা পরমাত্মাকে ঘৃণা করার সমান। একথা বলছি না যে, সংসারে ছলচাতুরি নেই, বরং তা খুব বেশি মাত্রাতেই আছে। তবে এই ছলচাতুরিকে নিবারণ করা যায় অবিশ্বাস দিয়ে নয়, মানবচরিত্রের জ্ঞান দিয়ে এবং এই জ্ঞান একটা ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণ। এমন গুণের দাবি তো আমি করি না, তবে মানুষকে দেখলে তার ভেতরকার মনোভাব বুঝে ফেলতে পারি, এ বিশ্বাস আমার আছে। যে কোনো লোক, তা সে যতই বেশ বদলাক, যতই সাজগোজ করুক, আমার অন্তর্দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারবে না। একথাও মনে রাখা উচিত যে, বিশ্বাসেই বিশ্বাস জন্মায়, অবিশ্বাসে অবিশ্বাস। এটাই জাগতিক নিয়ম। যে মানুষটাকে আপনি প্রথম থেকেই ধূর্ত, কপটাচারী, দুর্জন বলে ধরে নেবেন, সে কখনও আপনার সঙ্গে অকপট ব্যবহার করবে না। সে হঠাৎ আপনাকে হেয় করার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে আপনি যদি কোনো চোরের উপরও আস্থা রাখেন, তাহলে সে আপনার দাস হয়ে থাকবে। সমস্ত সংসারটাকে লুট করলেও আপনাকে ঠকাবে না। যে যতই অপকর্মা, অধার্মিক হোক না কেন আপনি তার গলায় বিশ্বাসের শিকল পরিয়ে তাকে যেদিকে খুশি নিয়ে যেতে পারেন। এমনকী, সে আপনার হাতে পুণ্যাত্মাও হয়ে উঠতে পারে।

বাঙালিবাবুর কাছে এসব দার্শনিক যুক্তিতর্কের কোনো উত্তর থাকে না।

চার

চতুর্থ বছরের প্রথম তারিখ। লালা সাঁইদাস ব্যাঙ্কের অফিসে বসে ডাকপিয়োনের পথ চেয়ে আছেন। আজ বরহল থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আসবে। এবারে ওঁর ইচ্ছা কিছু সাজসজ্জার আসবাবপত্র কিনবেন। এখনও ব্যাঙ্কে টেলিফোন আসেনি। টেলিফোনের আনুমানিক ব্যয়ও আনিয়ে নিয়েছেন। আশার আভায় মুখ প্রদীপ্ত। বাঙালিবাবুকে হেসে বলেন—এ তারিখটাতে আমার হাত চুলকোবেই। আজও হাতের তালুটা চুলকোচ্ছে। একবার ক্লার্ককে বলেন—আরে শরাফত মিএগ, একটু গুনেটুনে বলো তো দেখি, শুধু সুদই আসছে না অফিসের লোকজনদের জন্য

নজরানা-টজরানাও আসছে। আশার প্রভাব বোধ হয় স্থানের উপরও পড়ে, ব্যাঙ্কটাকেও যেন আজ সুন্দর দেখাচ্ছে।

ডাকপিয়োন ঠিক সময়ে আসে। সাঁইদাস অবহেলা ভরে ওর দিকে তাকান। পিয়োন থলে থেকে কয়েকখানা রেজিস্ট্রি খাম বের করে। সাঁইদাস খামগুলোকে উড়োউড়ো চোখে দেখেন। বরহলের কোনো খাম নেই। না ইনশিয়োরেন্স, না শিলমোহর, না সেই হাতের লেখা। কিছুটা হতাশা আসে। ইচ্ছে করে ডাকপিয়োনকে জিজ্ঞেস করেন, কোনো রেজিস্ট্রি চিঠি পড়ে থাকিন তো; কিন্তু আত্মসংবরণ করে নেন। অফিসের ক্লার্কদের সামনে এতটা অধৈর্য অনুচিত। কিন্তু ডাকপিয়োন যখন যেতে উদ্যত হয় তখন আর থাকতে পারেন না। জিজ্ঞেস করেই ফেলেন—আরে ভাই, ইনশিয়োরেন্সের কোনো খাম পড়ে নেই তো? আজ তো ওটা আসার কথা। ডাকপিয়োন বলে—হুজুর, তা কি হতে পারে? আর কোথাও ভুলচুক হয়ে গেলেও আপনাদের কাজে কি ভুল হতে পারে?

সাঁইদাসের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যেন কাঁচা রঙের উপর জল পড়ে। ডাকপিয়োন চলে গেলে বাঙালিবাবুকে জিজ্ঞেস করেন—এই দেরি কেন? আগে তো কখনও এমন হয়নি।

বাঙালিবাবু নিষ্ঠুরভাবে উত্তর দেয়—কোনো কারণে হয়তো দেরি হয়ে গেছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

হতাশা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। সাঁইদাসের এখন মনে হয় হয়তো পার্সেলে টাকা আসছে। হতে পারে, তিন হাজার আশরফি পার্সেল করে পাঠিয়েছে। যদিও এই ধারণার কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করার সাহস হয় না, তবুও ওঁর আশা ততক্ষণ বলবতী থাকে যতক্ষণ না পার্সেলের ডাকপিয়োন এসে ফিরে যায়। শেষে সন্ধ্যাবেলা উনি অস্থির মনে উঠে বাড়ি চলে যান। এখন বাকি থাকে চিঠি কিংবা টেলিগ্রামের প্রতীক্ষা। দু-তিনবার রেগেমেগে উঠে বসেন, ভাবেন খুব কড়া করে চিঠি লিখে দিই আর স্পষ্ট করে জানিয়ে দিই যে, লেনদেনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পালন না করা পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতা। একটি দিনের বিলম্বও ব্যাঙ্কের পক্ষে সর্বনাশ হতে পারে। চিঠি লিখলে ফল এই হবে যে আর কোনো দিন এমন অভিযোগ করার দরকার হবে না, কিন্তু কী মনে করে লিখলেন না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কয়েকজন বন্ধু এসেছেন। গল্পসল্প চলতে থাকে। ইতিমধ্যে পোস্টম্যান সন্ধ্যার ডাক দিয়ে যায়। এমনিতে আগে খবরের কাগজগুলোকে খুলে থাকেন, কিন্তু আজ আগে চিঠিগুলোকে খোলেন। কিন্তু না, বরহলের কোনো চিঠি নেই। তখন হতাশ হয়ে একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ খোলেন। প্রথমেই টেলিগ্রামের শিরোনাম দেখে সাঁইদাসের রক্ত হিম হয়ে যায়। লেখা রয়েছে—

'তিন দিন রোগভোগের পর কাল সন্ধ্যায় বরহলের মহারানির দেহাবসান।'

এরপরে একটি সংক্ষিপ্ত নোটে লেখা—'বরহলের মহারানির এই অকালমৃত্যু শুধুমাত্র এই রাজ্যের পক্ষেই নয় সমস্ত দেশের পক্ষে একটি শোকাবহ ঘটনা। বড়ো বড়ো কবিরাজ রোগ নির্ণয় করিতে না করিতে মৃত্যু তাঁহার সব কিছু শেষ করিয়া দিয়াছে। রানিসাহেবা সদাসর্বদা তাঁহার রাজ্যের উন্নতির বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তাঁহার এই স্বল্পকালীন রাজত্বকালেই রাজন্য তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ লাভবান হইয়াছে, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যদিও ইহা স্বীকৃত সত্য

যে রাজ্য তাঁহার অবর্তমানে অপরের হস্তে চলিয়া যাইবে, তথাপি এই চিন্তা রানিসাহেবার কর্তব্যপালনে বাধক হয় নাই। রাজ্যকে জামানত রাখিয়া ঋণগ্রহণের কোনো অধিকার আইনত তাঁহার ছিল না, কিন্তু প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভাবিয়া তাঁহাকে কয়েক বারই এই নিয়মকে লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। আমাদের স্থির বিশ্বাস তিনি যদি আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে রাজ্যকে ঋণমুক্ত করিয়া নিতেন। দিবারাত্র তিনি এইসব কথা ভাবিতেন। কিন্তু রানির এই অকালমৃত্যু এখন এই বিষয়টি নির্ধারণের ভার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। দেখা যাউক, এই সমস্ত ঋণের এখন কী পরিণাম ঘটে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, নূতন মহারাজা যিনি বর্তমানে লখনউতে বিরাজমান, তাঁহার উকিলদের পরামর্শ অনুযায়ী স্বর্গতা মহারানির ঋণসমূহ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা তাঁহার এইরূপ সিধান্তে মহাজনদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হইবে এবং লখনউর বেশ কয়েকজন মহাজন এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন যে সুদের লোভ কতখানি হানিকারক।'

লালা সাঁইদাস খবরের কাগজখানা টেবিলে রেখে দেন, তারপর আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। এই আকাশ হতাশার শেষ আশ্রয়স্থল। অন্যান্য বন্ধুরাও এই সংবাদ পড়ে। এই নিয়ে বাদবিতণ্ডা চলতে থাকে। চারদিক থেকে সাঁইদাসের উপর দোষারোপ হতে থাকে। সমস্ত দোষটা ওঁরই ঘাড়ে চাপানো হয় এবং ওঁর এতদিনের কর্মকুশলতা এবং দূরদৃষ্টি ধুলোয় মিশে যায়। ব্যাঙ্ক এতবড়ো একটা লোকসান সইতে অসমর্থ। এখন এই চিন্তা এসে উপস্থিত হয় যে কী করে ব্যাঙ্ককে বাঁচানো যায়।

পাঁচ

শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়া মাত্রই সবাই নিজেদের টাকা তুলে নিতে অস্থির হয়ে ওঠে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টাকা তুলতে-আসা লোকেদের লাইন পড়ে যায়। চালু খাতায় যাদের টাকা জমা ছিল, তারা তাড়াতাড়ি তুলে নেয়, কোনো ওজরআপত্তিই শোনে না। ওই পত্রিকায় প্রকাশিত ওই লেখাটির ফলে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমস্ত সুনাম নষ্ট হয়ে যায়। ধৈর্য ধরলে হয়তো ব্যাঙ্ক সামলে নিত। কিন্তু ঝড়-তুফানের মধ্যে কি কোনো নৌকো স্থির থাকতে পারে? শেষ পর্যন্ত খাজাঞ্চি গণেশ উলটে দেয়। ব্যাঙ্কের শিরা থেকে এত রক্ত বেরিয়ে যায় যে ব্যাঙ্ক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে।

তিন দিন কেটে যায়। ব্যাঙ্ক-ঘরের সামনে হাজার হাজার লোক। ব্যাঙ্কের দরজায় সশস্ত্র পুলিশ পাহারা। নানা রকমের গুজব শোনা যাচ্ছে। কখনও গুজব শোনা যায় যে লালা সাঁইদাস বিষ খেয়েছেন। কেউ এসে তাঁর গ্রেফতার হওয়ার খবর শোনায়। কেউ বলে—ডাইরেক্টররা হাজতে আটক হয়েছেন।

হঠাৎ রাস্তায় একটা মোটর আসে, এসে ব্যাঙ্কের সামনে থেমে যায়। কে একজন বলে—বরহলের মহারাজার মোটর। একথা শোনামাত্র শয়ে শয়ে মানুষ অস্থির হয়ে মোটরের দিকে ছোটে। ছুটে গিয়ে ওরা মোটরকে ঘিরে ধরে।

কুমার জগদীশ সিংহ মহারানির মৃত্যুর পর উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লখনউ এসেছেন। অনেক কিছু জিনিসপত্রও কেনবার আছে। যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এতকাল এমনই এক সুযোগের অপেক্ষায় অবরুদ্ধ ছিল, আজ তা পথ পেয়ে জলের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই মোটরখানাও আজই কেনা হয়েছে। লখনউ শহরে একটি হাবেলি কেনারও কথাবার্তা চলছে। বহুমূল্য

বিলাসসামগ্রীতে বোঝাই একখানি গাড়ি বরহলের দিকে রওনা হয়ে গেছে। এখানে এত ভিড় দেখে মহারাজা ভাবেন, হয়তো কোনো নতুন নাটক অভিনীত হবে, তাই মোটর দাঁড় করান। ইতিমধ্যে শয়ে শয়ে মানুষের ভিড় জমে যায়।

কুমারসাহেব জিজ্ঞাসা করেন—আপনারা এখানে কেন জমায়েত হয়েছেন? কোনো নাটক হবে নাকি?

এক ভদ্রলোক, যাঁকে দেখে বখে-যাওয়া বড়োলোক বলে মনে হয়, বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়ো মজার নাটক।

কুমার—কীসের নাটক?

ভদ্রলোক—ভাগ্যের।

কুমারসাহেব এই উত্তর পেয়ে অবাক তো হলেনই, তবে যেহেতু শুনে এসেছেন যে লখনউর মানুষগুলো কথার পিঠে কথা বানায়, তাই তেমন করেই উত্তর দেওয়া উচিত মনে করলেন। বললেন—ভাগ্যের খেলা দেখতে হলে তো এখানে আসার দরকার করে না।

লখনউবাসী—আপনার কথা ঠিক; কিন্তু অন্য জায়গায় এমন মজা কোথায়? এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাগ্য কতজনকে ধনী থেকে নির্ধন এবং নির্ধন থেকে ভিখারি করে দিয়েছে। সকালে যেসব লোক মহলে বসে ছিল, এখন গাছের ছায়াটুকুনও তাদের কপালে নেই। যাদের দরজায় সদাব্রত খোলা ছিল, তারা এখন একখানা রুটির কাঙাল। এই এক সপ্তাহ আগে যে লোকগুলো কালের গতি, সময়ের ফের আর ভাগ্যের খেলাকে কবিদের উপমা মনে করত, এখন তাদের আর্তনাদ আর করুণ ক্রন্দন বিরহীদেরও লজ্জিত করে। এমন নাটক আর কোথায় দেখতে পাবেন?

কুমার—মশায়, আপনি যে হেঁয়ালিকে আরও ঘোরালো করে তুলছেন। গেঁয়ো লোক আমি, আমার সঙ্গে সাদাসিধে ভাবে কথা বলুন।

তখন এক ভদ্রলোক বললেন—মশায়, এটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বেলেছে। আদাব আরজ, আমাকে চিনতে পেরেছেন?

কুমারসাহেব ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন তারপর হাতে হাত মিলিয়ে বলেন—আরে মিস্টার নাসিম! তুমি এখানে কোথায়? ভাই, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দ হল।

মিস্টার নাসিম আর কুমারসাহেব একসঙ্গে কলেজে পড়তেন। দুজনে একসঙ্গে দেরাদুনে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াতেন; কিন্তু কুমারসাহেব পারিবারিক ঝঞ্ঝাটে বাধ্য হয়ে যেদিন কলেজ ছাড়লেন, সেদিন থেকে দুই বন্ধুতে আর দেখা হয়নি। নাসিমও তার পরপরই লখনউ-এ নিজের বাড়িতে চলে এসেছেন।

নাসিম উত্তর দেয় — চিনতে পারছেন, আমার সৌভাগ্য। বলুন, এখন তো পোয়াবারো। বন্ধুদের কথা কি মনে আছে?

কুমার—সত্যি বলছি, তোমার কথা সব সময় মনে পড়ত। বলো, ভালো আছ তো? আমি এখানে রয়্যাল হোটেলে উঠেছি। আজকে এসো, শান্ত হয়ে বসে গল্পসল্প করা যাবে।

নাসিম—জনাব, শাস্তি তো ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গো শেষ হয়ে গেছে। এখন তো রুজির চিন্তা মাথায় চেপেছে। পুঁজিপাটা যেটুকুন ছিল, সবই তো আপনার চরণে ভেট হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কটা দেউলে হয়ে ফকির বানিয়ে দিয়েছে। এখন আপনার দরজায় গিয়ে ধরনা দেব।

কুমার—সে তো তোমার নিজের ঘর, নিঃসংকোচে চলে এসো। আমার সঙ্গেই চলো না কেন? কী বলব, আমি মোটেই বুঝতে পারিনি যে আমার অস্বীকৃতির ফল এই দাঁড়াবে। মনে হচ্ছে ব্যাঙ্ক অনেককেই পথে বসিয়েছে।

নাসিম—ঘরে ঘরে শোক ছেয়ে গেছে। আমার কাছে তো পরনের এই জামাকাপড়গুলো ছাড়া আর কিছু নেই।

ইতিমধ্যে একজন তিলকধারী পণ্ডিতমশাই এসে বলেন—সাহেব, আপনার দেহে তো তবু বস্ত্র আছে। আমার তো ধরিত্রী, আকাশ কোথাও কোনো ঠিকানা নেই। রাধেজি পাঠশালার আমি শিক্ষক। পাঠশালার সমস্ত টাকাপয়সা এই ব্যাঙ্কেই জমা ছিল। পঞ্চাশটি বিদ্যার্থী এরই ভরসায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করত আর ভোজন পেত। কাল থেকে পাঠশালাটি উঠে যাবে। দূরদূরান্তের সমস্ত বিদ্যার্থী। ওরা ওদের ঘরে কীভাবে ফিরে যাবে তা ভগবানই জানেন।

মাথায় পাঞ্জাবি ঢঙের পাগড়ি, খদ্দরের কোট আর চটিজুতো পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নেতৃত্বের ঢঙে বলেন—মশায়, এই ব্যাঙ্ক ফেলিয়োর কত কত ইনস্টিটিউশনকে শেষ করে দিয়েছে। লালা দীননাথের অনাথ আশ্রম আর একদিনও চলবে না। ওদের এক লাখ টাকা ডুবে গেছে। এই তো দিন পনেরো আগে আমি ডেপুটেশন থেকে যখন ফিরে এলাম তখন পনেরো হাজার টাকা অনাথ আশ্রমের খাতায় জমা দিয়েছি; আর এখন কোথ্থাও একটা কানাকড়ি পর্যন্ত নেই।

এক বুড়ো বলেন—সাহেব, আমার তো সারা জীবনের রোজগার ধুলোয় মিশে গেছে। এখন কফনটুকুরও ভরসা আর রইল না।

আস্তে আস্তে আরও লোক জড়ো হয় এবং সাধারণ কথাবার্তা চলতে থাকে। প্রতিটি মানুষ তার কাছের মানুষটিকে নিজের দুঃখের কথা শোনাতে থাকে। কুমারসাহেব আধ ঘন্টা নাসিমের সঙ্গো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব বিপদের কথা শুনে চলেন। যেই মোটরে বসে ড্রাইভারকে হোটেলের দিকে যাবার হুকুম দেন, অমনি মাটিতে মাথা হেঁট করে বসে থাকা একটি লোকের উপর তাঁর নজর পড়ে। লোকটি এক গোয়ালা, ছেলেবেলায় কুমারসাহেবের সঙ্গো খেলাধুলো করেছে। সেসব দিনগুলোতে ওদের মধ্যে উঁচুনিচু বিচার ছিল না, একসঙ্গো ওরা কাবাডি খেলেছে, একসঙ্গো গাছে চড়েছে আর পাখির বাচ্চা চুরি করেছে। কুমারসাহেব যখন দেরাদুনে পড়তে যান, সে সময় এই গোয়ালার ছেলে শিবদাস তার বাবার সঙ্গো লখনউ চলে আসে। এখানে সে দুধের এক দোকান দিয়েছে। কুমারসাহেব ওঁকে চিনতে পেরে উঁচু গলায় ডাকেন—আরে শিবদাস, এদিকে তাকাও।

শিবদাস ডাক শোনে, কিন্তু মাথা তোলে না। নিজের জায়গায় বসে বসেই সে কুমারসাহেবকে দেখছে। ছেলেবেলার সে সব দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে যখন সে জগদীশের সঙ্গো গুলিডান্ডা খেলত, যখন দুজনে বুড়ো গফুর মিঞাকে মুখ ভেংচে বাড়ির ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত, যখন সে গুরুজির কাছ থেকে ইশারা করে জগদীশকে ডেকে আনত, তারপর দুজনে রামলীলা দেখতে

চেলে যেত। শিবদাস ভেবেছিল যে কুমারসাহেব হয়তো ভুলে গেছে, ছেলেবেলার সে সব কথা এখন কোথায়? আজ কোথায় আমি আর কোথায় উনি! কিন্তু কুমারসাহেব যখন নাম ধরে ডাকলেন তখন সে খুশি হওয়ার বদলে মাথা আরও হেঁট করে ওখান থেকে সরে পড়তে চাইল। কুমারসাহেবের সৌজন্যের মধ্যে সেই বন্ধুত্বের ভাবটি নেই। ও চলে যাচ্ছে দেখে কুমারসাহেব মোটর থেকে নেমে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে জিজ্ঞেস করেন—আরে শিবদাস, আমাকে ভুলে গেছ?

এবারে শিবদাস মনের আবেগ দমন করতে পারে না। চোখদুটো ওর ছলছল করে ওঠে। কুমারের গলা জড়িয়ে ধরে বলে—ভুলিনি তো, কিন্তু আপনার সামনে আসতে লজ্জা করছিল।

কুমার—এখানে দুধের দোকান দিয়েছ নাকি? আমি তো জানতামই না,তা নইলে আট দিন ধরে জল খেতে খেতে সর্দি কেন হবে? এসো, মোটরে এসে বোসো, আমার সঙ্গে হোটেলে চলো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছা করছে। তোমাকে বরহল নিয়ে যাব আর আর একবার গুলিডান্ডা খেলব।

শিবদাস—অমন করবেন না। লোকে দেখলে হাসবে। আমি হোটেলে যাব। ওই হজরতগঞ্জের হোটেলেই তো উঠেছেন, তাই না?

কুমার—হ্যাঁ, ঠিক আসবে তো?

শিবদাস—আপনি ডাকবেন আর আমি যাব না?

কুমার—এখানে বসে আছ কেন? দোকান চলছে তো?

শিবদাস—আজ সকাল অবধি তো চলেছে। ভবিষ্যতের কথা জানি না।

কুমার—তোমার টাকাও ব্যাঙ্কে জমা ছিল না কী?

শিবদাস—যখন যাব, বলব।

কুমারসাহেব মোটরে এসে বসে ড্রাইভারকে বলেন—হোটেলে চলো।

ড্রাইভার—হুজুর যে হোয়াইটওয়ে কোম্পানির দোকানে যাবার কথা বলেছিলেন।

কুমার—এখন ওদিকে যাব না।

ড্রাইভার—ব্যারিস্টার জ্যাকব সাহেবের কাছেও যাবেন না?

কুমার—(রেগে গিয়ে) না, কোথ্থাও যাব না। আমাকে সোজা হোটেলে নিয়ে চলো।

হতাশা আর বিপত্তির এসব দৃশ্য জগদীশ সিংহের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে—এখন আমার কী করা কর্তব্য?

ছয়

আজ থেকে সাত বছর আগে যখন বরহলের মহারাজ ঠিক যৌবনকালে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান এবং উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন ওঠে, তখন মহারাজর কোনো সন্তান না থাকায়, বংশক্রমানুসারে তাঁর আপন খুড়তুতো ভাই ঠাকুর রামসিংহের উত্তরাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। উনি দাবিও জানিয়েছিলেন, কিন্তু আদালত রানিকেই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেছিল। ঠাকুরসাহেব আপিলের পর আপিল করেছিলেন, প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু সফলকাম হননি। মামলা-মোকদ্দমায় লাখ লাখ টাকা খরচ হয়, নিজস্ব জমিজমাও হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে; কিন্তু হেরে গিয়েও তিনি চুপচাপ বসে থাকেননি। সব সময় বিধবা রানিকে উত্যক্ত করেছেন। কখনও প্রজাদের

উশকে দিয়েছেন, কখনও প্রজাদের কাছে রানির নামে লাগিয়েছেন, কখনও ওঁকে জাল মোকদ্দমায় ফাঁসানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রানি খুবই তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। উনিও ঠাকুরসাহেবের প্রতিটি আঘাতের মুখের মতো জবাব দিতেন। তবে হ্যাঁ, এই টানাহ্যাঁচড়ায় রানিকেও মোটা মোটা টাকা অবশ্যই খরচ করতে হত। প্রজাদের কাছ থেকে টাকা উশুল হত না, তাই ওঁকে বারবার ঋণ নিতে হত, কিন্তু আইনত ঋণ নেওয়ার অধিকার ওঁর ছিল না। তাই রানিকে হয় এই অবস্থাটা গোপন রাখতে হত, কিংবা সুদের চড়া হার মেনে নিতে হত।

কুমার জগদীশ সিংহের ছেলেবেলা খুবই স্নেহে ও আদরে কেটেছে। কিন্তু ঠাকুর রামসিংহ মোকদ্দমা করতে করতে যখন ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং তাঁর মনে এমন সন্দেহ হতে লাগল যে রানির ষড়যন্ত্রে না আবার কুমারসাহেবের জীবনসংকট হয়, তখন উনি বাধ্য হয়ে কুমারসাহেবকে দেরাদুনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কুমারসাহেব দেরাদুনে দুবছর তো আনন্দেই কাটালেন, কিন্তু যেই কলেজের প্রথম শ্রেনীতে উঠলেন অমনি পিতার লোকান্তর হল। কুমারসাহেবকে পড়া ছাড়তে হল। বরহলে চলে এলেন। তাঁর কাঁধে আত্মীয় প্রতিপালনের এবং রানির সঙ্গো পুরোনো শত্রুতা সাধনের ভার এসে পড়ল। সেই থেকে মহারানির মৃত্যু পর্যন্ত কুমারসাহেবের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ঋণ করা কিংবা মেয়েদের গয়না বন্ধক রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তার উপরে ছিল বংশমর্যাদা রক্ষার ভাবনা। এই তিনটি বছর ছিল কুমারসাহেবের কঠিন পরীক্ষার সময়। প্রায় রোজ মহাজনদের সঙ্গো লেনদেন করতে হয়েছে, ওদের নিষ্ঠুর বাক্যবাণে অন্তঃকরণ বিশ্ব হয়েছে। হাকিমদের কঠোর ব্যবহার এবং অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক ছিল আত্মীয়স্বজনদের আচরণ। তারা আবার সামনে থেকে আঘাত না করে পাশ থেকে আঘাত করত; বন্ধুত্ব আর একতার ছদ্মবেশে কপটাচরণ করত। এসব কঠোর যাতনা কুমারসাহেবকে ক্ষমতা, স্বেচ্ছাচার এবং ধন-ঐশ্বর্যের চরম শত্রু করে তুলেছে। উনি খুবই ভাবপ্রবণ মানুষ। আত্মীয়স্বজনদের নিষ্ঠুরতা এবং দেশপ্রেমিকদের দুর্নীতি ওঁর মনে কালো ছাপ এঁকে চলছিল। তাঁর সাহিত্যপ্রেম তাঁকে মানবমনের তত্ত্ব অনুসন্ধানে আগ্রহী করে তুলছিল। মানবপ্রকৃতির এই জ্ঞান একদিকে যেমন তাঁকে সভ্যতা থেকে প্রতিদিন দূরে নিয়ে যাচ্ছিল, অপরদিকে তাঁর চিত্তে জনগণের ক্ষমতার দাবি এবং সাম্যবাদের ভাবধারাটিকে পুষ্ট করে তুলছিল। ওঁর কাছে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, যদি মানুষের মতো ব্যবহার কোথাও থেকে থাকে তবে তা আছে শুধু কুঁড়েঘরে আর গরিবদের মধ্যে। সেসব কষ্টের সময়ে যখন তাঁর চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে ছিল, তখন তিনি ওসব জায়গাতেই মাঝেমধ্যে সত্যিকারের সহানুভূতির আলো দেখতে পেয়েছিলেন। ধনসম্পদকে উনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ নয়, ভগবানের অভিশাপ বলে মনে করতেন, কারণ ধনসম্পদ মানুষের অন্তর থেকে দয়া এবং প্রেমের বোধকে দূর করে দেয়; এটা এমনই এক মেঘ যা মনের উজ্জ্বল তারাগুলোকে ঢেকে ফেলে।

কিন্তু মহারানির মৃত্যুর পর যেইমাত্র ধন-ঐশ্বর্য তাঁর উপর আঘাত করল, অমনি এসব দার্শনিক যুক্তিতর্কের বর্ম ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আত্মবিচারের শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। যারা শত্রুতুল্য ছিল তারা মিত্র হয়ে উঠল, আর যারা সত্যিকারের হিতৈষী ছিল তারা মন থেকে মুছে গেল। তখন তাঁর সাম্যবাদের কল্পিত চিন্তাধারায় ঘোর পরিবর্তন আসতে শুরু করল। হৃদয়ে উদ্ভব হল অসহিষ্ণুতার।

ত্যাগ ভোগের কাছে মাথা নত করল, মর্যাদার শৃঙ্খল গলায় জড়িয়ে গেল। যে সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দেখে ওঁর রাগ হত, এখন তারাই ওঁর পরামর্শদাতা হয়ে উঠল। যে দৈন্য এবং দারিদ্র্যের প্রতি তাঁর সত্যিকারের সহানুভূতি ছিল, সেই দৈন্য ও দারিদ্র্য দেখে এখন উনি চোখ বুজে ফেলতে লাগলেন।

সন্দেহ নেই যে, কুমারসাহেব এখনও সাম্যবাদের ভক্ত, কিন্তু এখন আর তিনি আগের মতো স্বচ্ছন্দভাবে সেসব চিন্তাধারা প্রকাশ করেন না। আদর্শ এখন বাস্তবকে ভয় করে চলে। উনি কথাকে কাজে পরিণত করার সুযোগ পেয়েছেন; কিন্তু এখন কার্যক্ষেত্রকে সমস্যাসংকুল বলে মনে হচ্ছে। বেগার প্রথার উনি চরম শত্রু ছিলেন; কিন্তু এখন বেগার প্রথাকে বন্ধ করা দুষ্কর বলে বোধ হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার তিনি ভক্ত ছিলেন, কিন্তু এখন ওসব খাতে অর্থ ব্যয় করার আগেই তিনি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিরোধের আশঙ্কা করছেন। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবহারকে উনি পাপ বলে মনে করতেন; কিন্তু এখন কঠোরতা ছাড়া কাজ চলবে মনে হয় না। সার কথা এই যে, যেসব মতাদর্শের প্রতি তাঁর মনে আগে শ্রদ্ধা ছিল এখন সেগুলোকে অসংগত বলে মনে হচ্ছে।

তবে আজ যে দুঃখজনক দৃশ্য ব্যাঙ্কের দরজায় তাঁর চোখে পড়েছে তা আবার তাঁর দয়াবোধকে জাগিয়ে তোলে। তাঁর অবস্থা হয় সেই মানুষটির মতো, যে নৌকোয় বসে বসে সুরম্য নদীতটের সৌন্দর্য উপভোগ করাকালীন একটি শ্মশানের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে দেখল চিতার উপর শবদাহ হচ্ছে। শোকসন্তপ্তরা করুণ ক্রন্দনে মুখর। আর তক্ষুনি সে নৌকো থেকে নেমে নিজেও ওদের শোকেদুঃখে যোগ দিল।

রাত দশটা বেজে গেছে। কুমারসাহেব খাটে শুয়ে আছেন। ব্যাঙ্কের দরজার সামনের দৃশ্যগুলি চোখের সামনে ভাসছে। সেসব বিলাপধ্বনি কানে আসছে, মনে প্রশ্ন জাগছে, এসব বিড়ম্বনার মূলে কি তবে আমিই? কিন্তু যা করার অধিকার আইনত আমার রয়েছে আমি তো তাই করেছি। পুরো জামানত ছাড়াই এতগুলো টাকা ধার দিয়ে রেখেছেন সে কি ব্যাঙ্কের পরিচালকদের ভুল নয়? পাওনাদারদের উচিত ওদের ঘাড় ভেঙে দেওয়া। আমি তো খুদা-ই-ফৌজদার (খুদাই খিদমতগার, ধর্মের ভলান্টিয়ার) নই যে অন্যের বোকামির ফল ভুগব। আবার চিন্তা বদলে যায়—আমি শুধু শুধু এই হোটেলে উঠেছি। চল্লিশ টাকা রোজ দিতে হবে। প্রায় চারশো টাকা খরচ পড়বে। এতগুলো জিনিসপত্র শুধু শুধু কিনেছি। কী দরকার ছিল? মখমলের গদিআঁটা চেয়ারে কিংবা কাচের অলংকরণে আমার মান বাড়তে পারে না। কোনো একটা সাধারণ বাড়ি পাঁচ টাকায় যদি নিয়ে নিতাম, তাহলে কি কাজ চলত না? আমি আর আমার সঙ্গের সব লোকজন আরামে থাকত। বড়োজোর এই হত যে, লোকে নিন্দে করত। তার পরোয়া কে করে? যাদের মাথায় চড়ে এই ঠাট করছি তারা যে একএকখানা রুটির জন্য হা-হুতাশ করছে। এই দশ-বারো হাজার টাকা দিয়ে যদি একটা কুয়ো বানিয়ে দিতাম তাহলে হাজার হাজার গরিব মানুষের উপকার হত। এখন আর মানুষের কথায় ভুলব না। কথায় ভুলব না। অযথা এই মোটরকার। আমার সময় এতটা দামি নয় যে এক ঘন্টা আধ ঘন্টা সময় বাঁচানোর জন্য মাসে দুশো টাকার খরচ বাড়িয়ে নেব। উপোস করে থাকা প্রজাদের সামনে মোটর হাঁকানো ওদের বুকে বাঁশ দেওয়া ছাড়া আর কী? মানলাম যে, ওরা মুগ্ধ হয়ে যাবে, যেদিক দিয়ে যাব শত শত স্ত্রীলোক আর শিশু দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু শুধু এই দেখবার জন্য এতটা খরচ বাড়ানো মূর্খতা। যদি আর সব বড়োলোকেরা অমন করে

থাকেন তো করুন গে, আমি কেন ওদের মতো হতে যাব? এখন পর্যন্ত বছরে দুহাজার টাকায় আমার চলে যেত। এখন দু-এর জায়গায় চার হাজার যথেষ্ট। তাছাড়া অন্যের উপার্জন এভাবে ওড়ানোর অধিকারই বা আমার কোথায়? এই অর্থ উপার্জনের জন্য কোনো কাজকারবার, কোনো ব্যবসাবাণিজ্য তো আমি করি না। আমার পূর্বপুরুষেরা যদি হঠকারিতা ও জবরদস্তি করে এই এলাকা নিজেদের অধিকারে রেখে থাকে, তাহলে ওদের লুণ্ঠনের ধনে অংশীদার হব কীসের অধিকারে? যারা মেহনত করে নিজেদের মেহনতের পুরো ফল তো তাদেরই পাওয়া উচিত। রাজ্য কেবল অন্যের অত্যাচার থেকে ওদের রক্ষা করে। এই সেবারই যোগ্য পারিশ্রমিক রাজ্যের পাওয়া উচিত। ব্যস, আমি তো শুধু রাজ্যের পক্ষ থেকে এই পারিশ্রমিক আদায় করার জন্য নিযুক্ত। এছাড়া এসব গরিব মানুষগুলোর উপার্জনে আমার আর কোনো অংশ নেই। এসব বেচারারা দীনদরিদ্র, মূর্খ, মূক। এখন আমরা এদের যত খুশি উৎপীড়ন করে নিচ্ছি। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে এদের কোনো জ্ঞান নেই। নিজেদের গুরুত্ব এরা বোঝে না, তবে এমন সময় আসবে যেদিন এদের মুখেও কথা ফুটবে। সেদিন আমাদের অবস্থা খারাপ হবে। এ সমস্ত ভোগবিলাস আমাকে আমারই লোকজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে থাকব, ওদেরই মতো জীবনযাপন করব এবং ওদেরই সহায়তা করব। তাতেই আমার কল্যাণ। ঋণের পরিমাণটা যদি অল্পসল্প হত, তাহলে বলতাম, যাক যে মাথার উপর এত ভার, সেগুলোর মতো এ ভারও সইব। আসল আছে, তা ছাড়া আছে আলাদা কয়েক হাজার টাকার সুদ। এছাড়া মহাজনদেরও তিন লাখ টাকা রয়েছে। রাজ্যের আয় বছরে দেড়-দুলাখ টাকার বেশি নয়। আমি এত সাহস করিই বা কোন জোরে? হ্যাঁ, যদি বৈরাগী হয়ে যাই, তাহলে সম্ভব। আমার জীবনকালে—যদি হঠাৎ মরে না যাই, তাহলে হয়তো এ ঝামেলা মিটে যাবে। এ আগুনে ঝাঁপ দেওয়া মানে নিজের সমস্ত জীবন, নিজের সাধআহ্লাদ আর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভস্মীভূত করা। আহা! আজকের এই দিন আসবে বলে আমি কতই না কষ্ট ভোগ করেছি। বাবা এই চিন্তাতেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এই শুভ মুহূর্তটি আমাদের কাছে ছিল আঁধার রাতে দূরের প্রদীপের মতো। আমরা এরই আশা নিয়ে বেঁচে ছিলাম। নিদ্রায় জাগরণে সবসময় এনিয়েই আলোচনা হত, এতে চিত্তের কত যে তৃপ্তি, কত যে গর্ব ছিল, কী বলব। তাই উপবাসে থাকার দিনগুলোতেও আমার মুখ মলিন হয়নি। এতখানি ধৈর্য ও সন্তোষের পর আজ যখন শুভদিন এসেছে, তখন কী করে তা থেকে মুখ ফেরাব। তাছাড়া এ তো শুধু নিজের চিন্তাই নয়, রাজ্যের উন্নতির জন্যে কত না স্কিম ভেবে রেখেছি, তবে কি নিজের ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ওইসব ভাবনা-চিন্তাগুলোকেও বিসর্জন দেব? এই হতভাগা রানি আমাকে খুব ফ্যাসাদে ফেলেছে। যতদিন বেঁচে ছিল কখনও স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। মরল, তাও আমার মাথায় এই আপদ ফেলে দিয়ে গেল। কিন্তু আমি দারিদ্র্যকে কেন এত ভয় করছি? দারিদ্র্য তো কোনো পাপ নয়। যদি আমার এই ত্যাগ হাজার হাজার পরিবারকে কষ্ট এবং দুরবস্থা থেকে অব্যাহতি দেয় তবে এই ত্যাগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আমার উচিত নয়। শুধুমাত্র সুখে জীবন কাটানোই আমাদের লক্ষ্য নয়। সুখভোগের দ্বারা মানপ্রতিষ্ঠা এবং কীর্তি হয় না। রাজপ্রাসাদে বসবাসকারী বিলাসী রানাপ্রতাপকে কে চেনে? তাঁর আত্মত্যাগ এবং কঠোর ব্রতপালনই তো তাঁকে আমাদের জাতির কাছে সূর্য করে তুলেছে। শ্রীরামচন্দ্র যদি তাঁর জীবনটা সুখভোগে কাটাতেন, তাহলে আজ আমরা তাঁর নামটাও জানতে পেতাম না। তাঁর আত্মত্যাগই তাঁকে অমর করে তুলেছে। আমাদের প্রতিষ্ঠা ধনসম্পদ এবং বিলাসের উপর নির্ভর করে না। আমি মোটরে চড়ে বেড়ালেই কী আর

টাট্টু চড়ে বেড়ালেই বা কী, হোটেলে থাকলেই বা কী আর কোনো একটা সাধারণ ঘরে থাকলেই বা কী। বড়োজোর তালুকদারেরা আমাকে ব্যঙ্গ করবে। তার কোনো পরোয়া করি না।

আমি তো মনে মনে চাইছি ওদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকব। যদি ওদের এই নিন্দাটুকুতে শত শত পরিবারের মঙ্গল হয় তাহলে আনন্দের সঙ্গে তা বহন না করলে আমি মানুষ নই। আমি নিজেকে যদি ঘোড়া, ফিটন, ভ্রমণ, শিকার, দাসদাসী আর স্বার্থপর বন্ধুবান্ধব থেকে বঞ্চিত করে সহস্র সহস্র ধনী ও গরিব পরিবারের, বিধবাদের, অনাথদের কল্যাণসাধন করতে পারি তাহলে আমার এতে কখনও বিলম্ব করা উচিত নয়। সহস্র সহস্র পরিবারের ভাগ্য এখন আমার হাতের মুঠোয়। আমার সুখভোগ ওদের কাছে বিষের মতো এবং আমার আত্মসংযম ওদের কাছে অমৃতের মতো। তবে অমৃতই হই, বিষ কেন হতে যাব? আর তাছাড়া এটাকে আত্মত্যাগ বলে মনে করাও আমার ভুল। আমি আজ যে ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছি সে তো শুধু একটা দৈবযোগ মাত্র। এই ঐশ্বর্য আমি উপার্জন করিনি। এর জন্য আমি রক্ত ঝরাইনি, ঘাম ঝরাইনি। এই সম্পত্তি যদি আমি না পেতাম তাহলে হাজার হাজার দীনদরিদ্র ভাইদের মতো আমিও আজ জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকতাম। তার চেয়ে কেন ভুলে যাই না যে, আমি এই রাজ্যের মালিক। এমন অবস্থাতেই মানুষের পরীক্ষা হয়। আমি বছরের পর বছর পুস্তক অধ্যয়ন করেছি, বছরের পর বছর লোকহিত-আদর্শের ভক্ত হয়ে আছি, এখন যদি সেসব আদর্শকে ভুলে যাই, স্বার্থচিন্তাকে মানবতা এবং সদাচরণ থেকে বড়ো করে দেখি, তাহলে বস্তুত সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতা হবে। স্বার্থসাধনের শিক্ষার জন্য গীতা, মিল, এমার্সন আর অ্যারিস্টটলের শিষ্য হওয়ার কী দরকার ছিল? এই শিক্ষা তো আমি আমার আর সব ভাইদের কাছ থেকে এমনিতেই পেয়ে যেতাম। প্রচলিত প্রথার চাইতে বড়ো গুরু আর কে আছে? সাধারণ মানুষের মতো আমিও কি স্বার্থের কাছে মাথা নত করব? তাহলে আমার বিশেষত্ব আর কী রইল? না, আমি বিবেক-বুদ্ধিকে হত্যা করব না। যেখানে পুণ্য করতে পারি সেখানে পাপ করব না। হে পরমাত্মন্, তুমি আমাকে সাহায্য করো, তুমি আমাকে রাজপুত কুলে জন্ম দিয়েছে। আমার কর্মে এই মহান জাতিকে লজ্জিত কোরো না। না, কখনও না। আমর এই মস্তক স্বার্থের কাছে নত হবে না। আমি রাম, ভীষ্ম এবং প্রতাপের বংশধর। আমি নিজের শরীরের দাস হব না।

কুমার জগদীশ সিংহের মনে হল উনি যেন কোনো এক উঁচু মিনারের উপর উঠেছেন। মনটা তাঁর গর্বে ভরে উঠেছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই এই উৎসাহে ভাঁটা পড়তে থাকে। উঁচু মিনার থেকে নীচের দিকে চোখ পড়ে। সারা শরীর কেঁপে ওঠে। নদীর পাড়ে বসে তাতে ঝাঁপ দেবার কথা ভাবছে যে মানুষ তারই মতো মনের অবস্থা হয় তাঁর।

উনি ভাবেন, আমার পরিবারের লোকেরা কি আমার সঙ্গে একমত হবে? যদি আমার মুখ চেয়ে ওরা একমত হয়ও, তবু আমার সঙ্গে ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও বিসর্জন দেব, সে অধিকার আমার কোথায়? অন্যের কথা থাক, মা কখনও এতে রাজি হবেন না, আর সম্ভবত ভাইয়েরাও অসম্মত হবে। রাজ্যের আর্থিক অবস্থার বিচারে ওরা প্রত্যেকে কম করেও বার্ষিক দশ হাজার টাকার অংশীদার আর আমি ওদের অংশে কোনোমতেই হস্তক্ষেপ করতে পারি না। আমি শুধু নিজের মালিক, কিন্তু আমিও তো একা নই। সাবিত্রী নিজে হয়তো আমার সঙ্গে আগুনে ঝাঁপ দিতে রাজি হয়ে যাবে, কিন্তু তার আদরের ছেলেকে এই আঁচের কাছে আসতে দেবে না।

কুমারসাহেব আর ভাবতে পারেন না। উনি অস্থিরভাবে পালঙ্ক থেকে উঠে বসে কামরায় পায়চারি করতে থাকেন। পরে জানালার বাইরে উঁকি দেন, তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেন। চারদিকে অন্ধকার। ওঁর চিন্তার মতো অপার এবং ভয়ংকর গোমতী নদী সামনে বয়ে চলেছে। উনি ধীরে ধীরে নদীর তীরে চলে যান এবং অনেকক্ষণ ধরে ওখানে বেড়াতে থাকেন। উদ্‌বেল হৃদয় জলতরঙ্গ ভালোবাসে। বোধ হয় এজন্য যে তরঙ্গও উদ্‌বেল হতে চায়। কুমারসাহেব তাঁর বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করেন। যদি রাজ্যের আয় থেকে এসব মাসোহারা দেওয়া হয় তাহলে ঋণের সুদই পরিশোধ করা কঠিন হবে, আসল তো দূরের কথা। আয় কি বাড়ানো যেতে পারে না? এখন আস্তাবলে বিশটা ঘোড়া আছে, আমার জন্য একটাই যথেষ্ট। চাকরের সংখ্যা একশোর কম হবে না। আমার পক্ষে দুটোই বেশি। এরা তো আমারই ভাই, এদের হীন কাজ করানো খুবই অনুচিত। ওই মানুষগুলোকে আমি আমার অংশের জমি দিয়ে দেব। সুখে চাষবাস করবে আর আমাকে আশীর্বাদ করবে। বাগানগুলোর ফল এতদিন ডালিতেই ভেট হয়ে যেত, এখন ওগুলোকে বেচব আর সবচেয়ে বড়ো আয় তো হাটের তোলা থেকে। শুধু এক মহেশগঞ্জের বাজার থেকেই দশ হাজার টাকা আসে। এইসব আয় মোহান্তজি হজম করে ফেলেন। ওঁর জন্য বছরে এক হাজার টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। এবারে এই বাজারের ঠিকা দেব, আট হাজারের কম পাব না। এসব খাত থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বার্ষিক আয় হবে। সাবিত্রী আর খোকার জন্যে এক হাজার টাকা যথেষ্ট। আমি সাবিত্রীকে স্পষ্ট বলে দেব, হয় এক হাজার মাসিক নাও আর আমার সঙ্গে থাকো আর না হয় রাজ্যের অর্ধেক আয় নাও আর আমাকে ছেড়ে দাও। রানি হওয়ার যদি ইচ্ছে থাকে, তো আনন্দের সঙ্গে হও, কিন্তু আমি রাজা হব না।

হঠাৎ কুমারসাহেবের কানে আওয়াজ আসে—রাম নাম সত্য। উনি পেছনে ফিরে তাকান। কয়েকজন মানুষ একটি মড়া নিয়ে আসছে। ওরা নদীর ধারে চিতা সাজিয়ে তাতে আগুন দেয়। দুটি স্ত্রীলোক চিৎকার করে করে কাঁদে। কুমারসাহেবের হৃদয়ে এই বিলাপের কোনো প্রভাব পড়ে না। উনি মনে মনে লজ্জা পান যে কী পাষাণ হৃদয়! এক গরিব বেচারার মৃতদেহ জ্বলছে, মেয়েরা কাঁদছে আর আমার মনটা একটুও গলছে না! পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি। একবার একটি স্ত্রীলোক কাঁদতে কাঁদতে বলে—হায় আমার রাজা, তোমার কাছে বিষ কী করে মিষ্টি হল গো? এই মর্মান্তিক বিলাপ শুনেই কুমারসহেবের বুকে যেন আঘাত লাগে। করুণা জেগে ওঠে, চোখ জলে ভরে যায়। এই লোকটি বোধ হয় বিষ খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। আহা! ওর কাছে বিষ কী করে মিষ্টি লাগল! এ কথাগুলোয় কত করুণা, কত দুঃখ, কত বিস্ময়! বিষ তো তেতো। কী করে তা মিষ্টি হয়ে গেল। তিক্ত বিষের বদলে যে তার মধুর প্রাণ দিয়ে দিল, তার জীবনে কোনো কঠিন দুর্ভোগ এসেছিল হয়তো। তেমন অবস্থাতেই বিষ মধুর লাগতে পারে। কুমারসাহেব ছটফট করে ওঠেন। কান্নামাখা করুণ কথাগুলো বারে বারে ওঁর প্রাণে গুনগুন করতে থাকে। উনি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। ওই লোকগুলোর দিকে এগিয়ে যান, একজনকে জিজ্ঞেস করেন—ও কি অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিল? লোকটি কুমারসাহেবের দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে বলে—না মশায়, কোথায় অসুখ। আজও সন্ধ্যায় ভালোভাবে কথা বলেছে। জানি না সন্ধ্যাবেলায় কী খেয়ে নিয়েছে তারপরই রক্ত বমি হতে শুরু হয়েছে। কবিরাজের কাছে নিয়ে যেতে না যেতেই চোখ উলটে গেছে, নাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। কবিরাজ দেখে বললেন—এখন আর কী করব? এই তো মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়স। এমন তাগড়া জোয়ান সারা লখনউ-এ ছিল না।

কুমার—কিছু জানতে পারলেন, কেন বিষ খেল?

মানুষটি সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলে—মশায়, আর তো কোনো কারণ ঘটেনি। যেদিন থেকে ওই বড়ো ব্যাঙ্কটা লালবাতি জ্বেলেছে সেদিন থেকে মনমরা হয়ে গিয়েছিল। কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছিল। ঘি-দই-মালাইয়ের বড়ো দোকান ছিল। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মান-ইজ্জত ছিল। ওই সমস্ত পুঁজিটাই জলে গেল। আমরা কত করে বলেছিলাম ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না; কিন্তু কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? কারোর কথা শোনেনি। আজ সকালে বউয়ের কাছে গয়না চেয়েছিল ওগুলো বাঁধা রেখে গোয়ালাদের দুধের দাম দেবে। এ নিয়ে বউয়ের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া হয়ে গেল। ব্যস, কী জানি কী খেয়ে বসেছে।

কুমারসাহেবের বুকটা কেঁপে ওঠে। হঠাৎ মনে জাগে—শিবদাস নয় তো? জিজ্ঞেস করেন—এর নাম শিবদাস নয় তো? লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ, এই নামই তো, আপনার জানাশোনা ছিল?

কুমার—হ্যাঁ, আমি আর উনি অনেকদিন বরহলে একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি। আজই সন্ধ্যায় ওঁর সঙ্গে আমার ব্যাঙ্কে দেখা হয়েছে। উনি যদি আমাকে এটুকুও বলতেন, তাহলে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। উঃ!

লোকটি এবারে ভালো করে কুমারসাহেবকে লক্ষ করে, তারপর গিয়ে মেয়েদের বলে—চুপ করো, বরহলের মহারাজা এসেছেন। এ কথা শুনেই শিবদাসের মা জোরে জোরে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে কাঁদতে এসে কুমারসাহেবের পায়ে আছড়ে পড়ে। ওর মুখ থেকে শুধু এই কথাগুলো বেরোয়—'বাবা, ছেলেবেলা থেকে যাকে তুমি দাদা বলতে'—বলে গলা আটকে আসে।

কুমারসাহেবের চোখেও জল। শিবদাসের মূর্তি যেন তাঁর চোখের সামনে এসে বল্‌ছে, তুমি বন্ধু হয়ে আমার প্রাণটা নিলে।

সাত

ভোর হয়ে যায়; কিন্তু কুমারসাহেবের চোখে ঘুম আসে না। যখন থেকে ইনি গোমতীর তীর থেকে ফিরে এসেছেন, তখন থেকে ওঁর মনে একটা বৈরাগ্যভাব ছেয়ে এসেছে। ওই করুণ দৃশ্য তাঁর স্বার্থের যুক্তিতর্কগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সাবিত্রীর বিরোধিতা, খোকার হতাশা জেদ আর মায়ের তিরস্কারকে তাঁর আর লেশমাত্রও ভয় নেই। সাবিত্রী রাগ করবে, করুক গে; খোকাকে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, কোনো চিন্তা নেই। মা প্রাণ দিতে চাইবেন, কী ক্ষতি। আমি আমর স্ত্রী-পুত্র আর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের জন্য সহস্র সহস্র পরিবারকে হত্যা করব না। হায়! শিবদাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি এমন কত রাজ্য বিলিয়ে দিতে পারি। সাবিত্রীকে না খেয়ে থাকতে হবে, খোকাকে খেটে খেতে হবে, আমাকে দোরে দোরে হাত পাততে হবে, তবুও অন্যকে বঞ্চিত করব না। এখন আর দেরি নয়। কী জানি এই ব্যাঙ্ক-ফেলের ঘটনা আর কী কী বিপদ ঘটায়। আমি এত ইতস্তত করছি কেন? এ শুধু আমার দুর্বলতা, নইলে কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়, এমন কাজ নয় যা কেউ করেনি। আজ পর্যন্ত লোকে লাখ টাকা দানধ্যান করেছে। আমার কর্তব্যজ্ঞান আছে। সে কর্তব্য করতে কেন বিমুখ হব? যা কিছু হোক, যা কিছু মাথার উপর আসুক, তার চিন্তা কীসের? কুমার ঘন্টি বাজান। পরক্ষণে আরদালি চোখ কচলাতে কচলাতে আসে।

কুমারসাহেব বলেন—এখনই ব্যারিস্টার জ্যাকবসাহেবকে গিয়ে আমার সেলাম দাও। বোধ হয় ঘুম থেকে উঠেছেন। বলবে, জরুরি কাজ। না, এই চিঠিখানাই নিয়ে যাও। মোটর নিয়ে চলে যাও।

আট

মিস্টার জ্যাকব কুমারসাহেবকে অনেক বোঝান। আপনি এই পাঁকে জড়াবেন না, তাহলে বেরিয়ে আসা মুশকিল হবে। জানি না এখনও কত এমন ঋণ রয়েছে, যার কথা হয়তো আপনি জানেনই না। কিন্তু মনে দৃঢ় হয়ে ওঠা সংকল্প হল চুনাপাথরের মেঝের মতো, আপত্তির আঘাত যাকে আরও মজবুত করে তোলে। কুমারসাহেব তাঁর সংকল্পে অটল থাকেন। পরদিন খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেন যে মৃতা মহারানির যত ঋণ আছে, সেগুলো আমরা স্বীকার করছি এবং নির্দিষ্ট সময়ে সব পরিশোধ করে দেব।

এই বিজ্ঞাপন ছাপামাত্রই লখনউ শহরে হইহই পড়ে যায়। বুদ্ধিমানদের মতে এটা কুমারসাহেবের নিতান্ত ভুল কাজ, আর যারা আইনকানুনে অনভিজ্ঞ, তারা ভাবে যে এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। কুমারসাহেবের প্রশংসা হোক না হোক, আশীর্বাদের অভাব হয় না। ব্যাঙ্কের হাজার হাজার গরিব পাওনাদার মন খুলে তাঁকে আশীর্বাদ করছে।

এক সপ্তাহ কুমারসাহেব মাথা তোলার ফুরসত পান না। মিস্টার জ্যাকবের ধারণা ঠিক প্রমাণিত হয়। দেনা প্রতিদিন বাড়তে থাকে। কত কত এমন ঋণপত্র (প্রমিসরি নোট) পাওয়া যায় যার কথা উনি জানতেন না। জহুরি এবং অন্যান্য বড়ো বড়ো দোকানদারের পাওনাও কম ছিল না। প্রায় তেরো-চোদ্দ লাখ টাকা। সর্বমোট বিশ লাখ অবধি ওঠে। কুমারসাহেব ভয় পেয়ে যান। আশঙ্কা হয়—এমন না হয় যে, ওঁকে ভাইদের মাসোহারাও বন্ধ করে দিতে হবে, যার কোনো অধিকার ওঁর নেই। শেষ পর্যন্ত সপ্তম দিনে উনি কয়েকজন মহাজনকে বকে-ঝকে তাড়িয়ে দেন। যেখানে সুদের হার বেশি ছিল সেখানে তাকে কম করান আর যেখানে ঋণের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, সেগুলোকে দিতে অস্বীকার করেন।

মহাজনদের কঠোরতা দেখে তাঁর রাগ হয়। তাঁর মতে মহাজনদের উচিত ডুবে-যাওয়া অর্থের একটি অংশ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকা। এত টানাটানি করেও মোট দেনা উনিশ লাখের কম দাঁড়ায় না।

কুমারসাহেব এসব কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে একদিন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দিকে যান। ব্যাঙ্ক খোলা। মৃত শরীরে প্রাণ ফিরে এসেছে। পাওনাদারদের ভিড় লেগে আছে। লোকেরা প্রসন্নচিত্তে ফিরে যাচ্ছে। কুমারসাহেবকে দেখামাত্রই শয়ে শয়ে মানুষ ভক্তি ভরে ওঁর দিকে ছুটে আসে। কেউ কেঁদে, কেউ পায়ে পড়ে আর কেউ সৌজন্য সহকারে নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানায়। উনি ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন। সবাই বলে—এই বিজ্ঞাপন ব্যাঙ্ককে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। বাঙালিবাবু লালা সাঁইদাসের সমালোচনা করেন—লোকটা মনে করত সংসারে সব মানুষই ভালোমানুষ। আমাদের উপদেশ দিত। এখন ওর চোখ খুলেছে। একা একা ঘরে বসে থাকে। কাউকে মুখ দেখায় না। আমি শুনেছি ও নাকি এখান থেকে পালাতে চাইছে। কিন্তু বড়োসাহেব বলেছেন—পালাবে তো তোমার উপর ওয়ারেন্ট জারি করে দেব। এখন সাঁইদাসের জায়গায় বাঙালিবাবু ম্যানেজার হয়ে বসেছেন।

এরপর কুমারসাহেব বরহল ফিরে আসেন। ভাইয়েরা সব বৃত্তান্ত শুনে রেগে যায়, মামলা করবে বলে শাসায়। মা মনে এত আঘাত পান যে, উনি সেদিনই অসুস্থ হয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই

এই সংসার থেকে বিদায় নেন। সাবিত্রীও আঘাত পায়; তবে সে শুধু সন্তুষ্টই হয়নি, স্বামীর উদারতা এবং ত্যাগের প্রশংসাও করেছে। বাকি থাকে লালসাহেব। সে যখন দেখে আস্তাবল থেকে ঘোড়া বেরিয়ে যাচ্ছে, হাতিগুলোকে মকনপুরের মেলায় বিক্রি করে দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আর পালকি-বেহারাদের বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে, তখন ব্যাকুল হয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে—বাবুজি, এসব চাকর, ঘোড়া, হাতি কোথায় যাচ্ছে?

কুমার—এক রাজাসাহেবের উৎসবে।

লালজি—কোন রাজা?

কুমাব—ওঁর নাম রাজা দীনসিংহ।

লালজি—কোথায় থাকেন উনি?

কুমার—দরিদ্রপুরে।

লালজি—তাহলে আমরাও যাব।

কুমার—তোমাকেও নিয়ে যাব; তবে এই বরযাত্রী যাওয়ার সময় পায়েচলা লোকেদের সম্মান গাড়িচড়া লোকেদের চেয়ে বেশি হবে।

লালজি—তাহলে আমরাও পায়ে হেঁটে যাব।

কুমার—ওখানে খেটেখাওয়া মানুষদের প্রশংসা হয়ে থাকে।

লালজি—তাহলে আমরা সবচেয়ে বেশি খাটব।

কুমারসাহেবের দুভাই পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকার মাসিক বৃত্তি নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। কুমারসাহেব তাঁর আর তাঁর পরিবারের জন্যে অনেক কষ্টে বার্ষিক এক হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু এই আয় একজন রাজার পক্ষে কোনো মতেই পর্যাপ্ত নয়। অতিথি-অভ্যাগত প্রতিদিন লেগেই থাকে। সকলেরই সৎকার করতে হয়। খুব কষ্টে দিন চলে। এদিকে এক বছর হল, শিবদাসের পরিবারের ভারও এসে কাঁধে চেপেছে। তবে কুমারসাহেব কখনও আপন সংকল্পের জন্য অনুতাপ করেন না। ওঁকে কেউ কোনো দিন চিন্তিত হতে দেখেনি। ওঁর মুখমণ্ডল ধৈর্য ও যথার্থ গরিমায় সবসময় উজ্জ্বল। সাহিত্যপ্রেম আগে থেকেই ছিল। এখন বাগান করায় উৎসাহ জাগে। নিজের বাগানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছগাছড়ার দেখাশোনা করতে থাকেন। লালসাহেবকে তো রীতিমতো চাষি বলেই মনে হয়। বয়স এখনও নয়-দশ বছরের বেশি হয়নি, কিন্তু খুব ভোরেই চাষের জমিতে চলে যায়। খাওয়াদাওয়ারও খেয়াল থাকে না।

লালসাহেবের ঘোড়া রয়েছে, কিন্তু মাসের পর মাস তাতে চড়ে না। ওর এমন খেয়াল দেখে কুমারসাহেব খুশি হয়ে বলেন—রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। লালসাহেব কোনোদিন এই শিক্ষা ভুলবে না। ঘরে যদি ঐশ্বর্য থাকত, তাহলে সুখভোগ, শিকার, দুষ্কর্ম ছাড়া আর কীই বা মাথায় আসত! সম্পত্তি বেচে আমরা পরিশ্রম আর সন্তোষ কিনেছি, আর এই সওদা খারাপ হয়নি। সাবিত্রী এত সুখী নয়। সে কুমারসাহেবের নিষেধ সত্ত্বেও প্রজাদের কাছ থেকে ছোটোখাটো ভেট নিয়ে থাকে এবং কুলপ্রথাকে ভাঙতে চায় না।

(বৈংক কা দিবালা) অনুবাদ ননী শূর

দপ্তরি

রফাকত হুসেন আমার আপিসের বাঁধাই-দপ্তরি ছিল। মাসান্তে বেতন পেত দশ টাকা। ছুটছাট কাজ করে বাইরেও দু-তিন টাকা কামাত। তার জীবিকা ছিল এই। কিন্তু ও নিজের অবস্থাতে বেশ সন্তুষ্টই ছিল বলা যায়। তার মনের ভেতরের অবস্থা ঠিক বলতে পারব না, তবে বাইরে ও সদা-প্রসন্ন এবং পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ ফিটফাট থাকত। ঋণ হল এই শ্রেণীর লোকেদের অলংকার। রফাকত কিন্তু এর মায়ায় কখনও বিভ্রান্ত হত না। ওর কথাবার্তায় কৃত্রিম ভদ্রতার ভড়ং ছিল না, যা বলত সে সোজাসুজি বলত, রেখেঢেকে বলত না। আপিসের বাবুদের কারও কোনো অন্যায় দেখলেও সে বলতে ছাড়ত না। এই স্পষ্টবাদিতার জন্যে সবাই ওকে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি সমীহ করে চলত। জন্তুজানোয়ারের প্রতি ওর একটা বিশেষ টান ছিল। বাড়িতে একটা মাদি ঘোড়া, একটা গাই, ক-টা ছাগল, একটা বেড়াল, একটা কুকুর আর গোটাকয়েক মুরগি পুষেছিল। ও এগুলোকেও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ছাগলের জন্যে পাতা পেড়ে আনত, ঘোড়াটার জন্যে কেটে আনত ঘাস। এর জন্য প্রায়ই ওকে খোঁয়াড় দর্শনার্থে ছুটতে হত। লোকে মুশকরাও করত ওর এহেন পশুপ্রীতি দেখে, ও কিন্তু কারও কথায় কান দিত না। ওর এই ভালোবাসা ছিল একেবারেই নিঃস্বার্থ। কেউ ওকে কখনও মুরগির একটা ডিমও বেচতে দেখেনি। ওর পোষা ছাগলের বাচ্চাদের কোনোদিন কসাইয়ের ছুরির তলায় পড়তে হয়নি, ওর ঘোড়াটাও লাগামের চেহারাই দেখেনি কোনোদিন। ওর গোরুর দুধ খেত কুকুরটা, বেড়ালের জন্য বরাদ্দ ছিল ছাগলের দুধ। তারপরেও যা বাঁচত, সেটা ও নিজে খেত।

ভাগ্যক্রমে ওর স্ত্রীটিও ছিল একেবারে পতিগতপ্রাণা। ওর ঘরটা যদিও ছিল খুবই ছোটো, কেউ কোনোদিন দরজা থেকে একবারের জন্যেও তার গলার আওয়াজ পায়নি। একটি বারের জন্যেও কেউ ওকে দরজায় উঁকি দিতে দেখেনি কখনও। গয়না-কাপড়ের তাগাদা দিয়ে সে কখনও তার স্বামীর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়নি। দপ্তরিও তাকে মাথায় করে রেখেছিল। সে গাইয়ের গোবর কুড়োত, ঘোড়াকে ঘাস দিত, পাশে বসিয়ে বিড়ালকে খাওয়াত, এমনকী কুকুরটাকে স্নান করিয়ে দিতেও তার কোনো ঘেন্না ছিল না।

বর্ষাকাল, নদীতে ঢল নেমেছে। দপ্তরের কর্মীরা সবাই মেতে উঠেছে মৎস্য শিকারের হুজুগে। ঝোঁকের মাথায় রফাকতও জুটে গেল তাদের সঙ্গো। দিনভর মাছ ধরল সবাই। সন্ধ্যায় নামল মুষলধারে বৃষ্টি। বাবুরা সবাই রাতটুকুর জন্য আশ্রয় নিল একটা গ্রামে, আর দপ্তরি চলল তার বাড়ির পথে। কিন্তু অন্ধকার রাত,পথ ভুলে ঘুরে মরল সারাটা রাত। ভোরবেলা যখন ঘরে

পৌঁছাল তখনও ভালো করে আঁধার কাটেনি। কিন্তু একী! ওর ঘরের কপাটদুটো হাট করে খোলা। কুকুরটা লেজগুটিয়ে করুণ সুরে বিলাপ করতে করতে এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। দুয়ার খোলা দেখে বুকটা ধক করে উঠল দপ্তরির। ঘরে পা দিল, সেখানেও সম্পূর্ণ নীরবতা। স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকল বার দুয়েক, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। শূন্য ঘর খাঁখাঁ করছে। এঘর ওঘর দুটো ঘরেই উঁকি দিল একবার। কিন্তু সেখানেও না পেয়ে গেল পশুশালার দিকে। ঢুকতে কেমন যেন অজানা একটা ভয় জাগল তার, অচেনা অন্ধকার গুহায় ঢুকতে যে ভয় হয়। ওখানে মাটির ওপারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ওর বউ। মুখে মাছি ভনভন করছে, ঠোঁট বিবর্ণ, চোখদুটো নিশ্চল পাথর। লক্ষণ দেখে মনে হয় সাপে কেটেছে।

পরদিন রফাকত যখন এল ওকে আর চেনাই যায় না। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিনের রোগী। আত্মহারা, নির্বাক বসে রইল সারাটা দিন, যেন সে অন্য কোনো জগতে বিচরণ করছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে উঠে পড়ল, সোজা গিয়ে বসল তার স্ত্রীর কবরের পাশে। অন্ধকার ঘন হল। ক্রমে গড়িয়ে গেল কয়েক প্রহর রাত; তবু টিমটিমে প্রদীপের আলোয় সে বসেই রইল কবরের পাশে, মূর্তিমান বিষাদ আর নৈরাশ্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে। যেন সে নিজেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। কখন ঘরে ফিরল তা তার খেয়ালই নেই। অতঃপর এটাই ওর নিত্যকার নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। ভোরবেলা উঠে মাজারে যায়, ঝাঁট দেয়, ফুলের মালা দিয়ে সাজায় কবরটাকে, ধূপ জ্বালায়, তারপর কোরান থেকে পাঠ করে যায় বেলা ন-টা পর্যন্ত আবার সন্ধ্যাবেলাতেও একই রকম। এটাই এখন তার জীবনের নিয়মিত কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সে নিজের অন্তর্জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়েছে। বাহ্যজগত থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। শোক একেবারে মুহ্যমান করে ফেলেছে বেচারিকে।

মাস কয়েক এইভাবেই কাটল। কর্মচারীরা সকলেই দপ্তরির শোকে সমবেদনা অনুভব করত। ওর করণীয় কাজগুলো করে নিত নিজেরাই, ওকে আর কষ্ট দিতে চাইত না। ওর এই পত্নীপ্রেমে লোকে রীতিমতো বিস্ময় বোধ করত।

কিন্তু মানুষ তো আর সর্বদা অন্তর্লোকে বাস করতে পারে না। সেখানকার জল হাওয়া তার তেমন অনুকূল নয়। এই সমস্ত রূপরসময় ভাবনা-চিন্তাগুলো সেখানে কোথায়? বৈরাগ্যের মধ্যে সেই ভাবোল্লাস কোথায়? আশাময় আনন্দই বা কোথায়? দপ্তরি বেচারি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকলেও তারপর তাকে উনুন জ্বালাতেই হত, সকালে সন্ধ্যায় পোষা প্রাণীগুলোর দেখাশোনাও করতে হত। এই দায় ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিল তার পক্ষে। ফলে আবেগের ওপর বাস্তবই জয়লাভ করল। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো দপ্তরিও আবার দাম্পত্য-সুখের জলধারার দিকে ছুটল। আবার জীবনের সুখদায়ক অভিনয় দেখতে উৎসুক হল সে। মৃত পত্নীর সঙ্গে দাম্পত্য-সুখের স্মৃতি বিলীন হতে লাগল। ছ-টা মাস পরে তার আর চিহ্নমাত্রও রইল না।

মহল্লার অন্য প্রান্তে থাকত বড়োসাহেবের এক আরদালি। ওর বাড়ি থেকেই বিয়ের প্রস্তাব উঠল। মিয়া রফাকতের আনন্দের আর সীমা নেই। আরদালি সাহেবের ইজ্জত-খাতির মহল্লায় কোনো উকিলবাবুর চাইতে কম নয়। ওর রোজগার নিয়েও অনেক জল্পনাকল্পনা হয়ে থাকে। লোকেরা মুখের কথায় বলে, 'পড়ে-পাওয়া চোদ্দো আনাই লাভ'। ও নিজেই বলত যে, উশুলের দিনে আমার পকেটে কুলোয় না, সঙ্গে থলি রাখতে হয় একটা। দপ্তরির মনে হল এবার তার

কপাল খুলছে। এমন উদগ্রীব হয়ে উঠল, যেন শিশু খেলনা দেখেছে। হপ্তা খানেকের মধ্যেই সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম চুকিয়ে ফেলল, নববধূ এল ঘরে। যে মানুষটা মাত্র একটা সপ্তাহ আগেও সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিল, জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে বসে থাকত, তাকেই এখন মাথায় টোপর পরে ঘোড়ায় চড়ে নতুন ফোটা ফুলের চেহারায় দেখা—মানবপ্রকৃতির এক প্রভূত বিস্ময়।

কিন্তু অষ্টমঙ্গল পেরোতে না পেরোতেই শুরু হয়ে গেল নববধূর স্বরূপ উন্মোচন। বিধাতাপুরুষ ওকে রূপ থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন, অবশ্য সেই ঘাটতি তিনি পুষিয়ে দিয়েছিলেন ওর বাগিন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণতর করে। তার প্রমাণ ওর অসাধারণ বাকপটুতা যা অহরহ পড়শিদের আমোদিত করতে এবং দপ্তরির মুখে কালি মাখিয়ে দিতে লাগল। প্রথম দিন আটেক সে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দপ্তরির চরিত্র অনুধাবন করল, তারপর একদিন বলল—আজব লোক তো তুমি! লোকে জন্তুজানোয়ার পোষে নিজের সাশ্রয়ের জন্যে, সুবিধার জন্যে নাকি ঘরের জঞ্জাল বাড়াবার জন্যে? গোরুর দুধ কুকুর খাবে, ছাগলের দুধ বিড়ালে খাবে, এ আবার কী আদিখ্যেতা? আজ থেকে সমস্ত দুধ যেন ঘরে আসে।

দপ্তরি নিরুত্তর রইল। আর একদিন ঘোড়ার দানা গেল বন্ধ হয়ে। সে ছোলাগুলো খোলায় ভেজে নুন-লঙ্কাগুঁড়ো মাখিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল। টাটকা দুধ দিয়ে জলখাবার তৈরি হতে লাগল সকালে। যখন তখন ক্ষীরের মিষ্টি তৈরি হতে লাগল। বড়োলোকের বাড়ির মেয়ে, পান ছাড়া চলে কী করে? ঘি-মশলার খরচও বেড়ে গেল অনেক। প্রথম মাসেই দপ্তরির উপলব্ধি হল যে তার উপার্জন জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ওর অবস্থা হল ঠিক সেই লোকের মতো, যে চিনি বলে ভুল করে কুইনাইন খেয়ে ফেলেছে।

অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিল এই দপ্তরি। মাস দুই-তিন সে এই যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করল। কিন্তু ওর চেহারাটাই কথার চাইতে ওর অবস্থা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সেই দপ্তরি, নিত্য অভাবেও যে ছিল হাসিমুখ, সে নিজেই এখন মূর্তিমান দুশ্চিন্তা। অপরিষ্কার কাপড়, অবিন্যস্ত চুল, চেহারায় একটা মালিন্য, সব সময় হায়-হায় ভাব। ওর পোষা গোরুগুলোর চেহারা এখন হাড্ডিসার, ঘোড়াটা নড়তে অক্ষম, বেড়ালটা প্রতিবেশীদের সিকেয় লাফ দিতে আরম্ভ করেছে। আর কুকুরটা কেবল আস্তাকুঁড়ে হাড় খুঁজে ফিরছে। তবু সেই অসাধারণ মনোবলের অধিকারী মানুষটি তার পুরোনো বন্ধুদের বিদেয় করেনি। ওর সবচেয়ে বড়ো বিপত্তি ওর স্ত্রীর রসনা, যার আক্রমণে মাঝে মাঝেই ওর ধৈর্য, ওর কর্তব্যনিষ্ঠা, ওর উদ্দীপনা সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে যায়। বেচারি কেবল নিজের ঘরের এককোণে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মনের সন্তুষ্টির আনন্দকে খুইয়ে রফাকতের পীড়িত মন ক্রমশ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। আত্মতৃপ্তি, মনের অসন্তোষের যা উপহার, তা ওর চিত্ত থেকে নির্বাসিত হল। সে মাঝে মাঝে উপবাসের পথ ধরল। আজকাল আর জলপাত্রে জল রাখার জন্যে ওর আগ্রহ থাকে না, কুয়ো থেকে তুলেই তৎক্ষণাৎ তা খেয়ে ফেলতে চায়, পাছে মাটিতে গড়িয়ে যায় সেটুকু। বেতন পেয়ে আজকাল আর ও মাসকাবারি সওদা কেনে না, ঠান্ডা জল আর শুকনো রুটিতে আজকাল আর ওর তৃপ্তি হয় না,—বাজার থেকে বিস্কুট কিনে আনে, ঠোঙায় করে রাবড়ি খায়, সুপক্ক আম দেখে উতলা হয়। দশটা টাকার মূল্যই বা কতটুকু? এক সপ্তাহেই উড়ে যায়, তখন বই বাঁধাইয়ের অগ্রিম টাকায় হাত পড়ে। দু-একদিন উপবাসও দিতে হয়। শেষে ঋণ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। ক্রমশ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মাসের বেতনের টাকা সবটাই

পাওনাদারদের হাতে তুলে দিতে হয়। আর মাস পয়লা থেকেই আবার ধার করতে হয়। এতদিন ও অন্যদের উপদেশ দিত মিতব্যয়িতার, এখন লোকেই ওকে বোঝায়, ও কিন্তু নির্বিকারভাবে বলে—সায়েব, আজ জুটছে, খাচ্ছি। কালকের মালিক তো খোদা। দিলে খাব, না দিলে চুপচাপ পড়ে থাকব। ওর অবস্থা এখন সেই রোগীর মতো, যে আরোগ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পথ্যাপথ্যের বিচার ত্যাগ করেছে, চিরবিদায়ের আগে সবরকম চর্ব্যচূষ্য খেয়ে আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে চাইছে।

তবু এতদিন ও ঘোড়া আর গাইটাকে বিক্রি করেনি। কিন্তু একদিন ওরা পশুব্যবসায়ীর খোঁয়াড়ে বাঁধা পড়ল, ছাগলগুলোও ছটফট করতে লাগল তৃষ্ণারূপী ব্যাঘ্রের কবলে পড়ে। কথায় বলে—'নাকে ঢুকল জাফরানি পোলাওর বাস, তো ঋণের দায়ে রুটিওলার ঘটল সর্বনাশ'। মহাজন যেদিন বুঝল যে, নগদ টাকা আর উশুল করা যাবে না, সেদিন সে সবকটা ছাগলকে খেদিয়ে নিয়ে চলে গেল। দপ্তরি শুধু হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেদিকে। বেড়ালের প্রভুভক্তি উঠে গেল। যা ছিল ওর বন্ধনের শেষ সূত্র, সেই গেরুবাছুরগুলো যাওয়ার পর আর দুধের পাত্তরটা চাটার আশাও রইল না। কুকুরটা অবশ্য পুরোনো স্নেহমমতার কৃতজ্ঞতায় এখনও আত্মীয়তা ছিন্ন করেনি। কিন্তু তারও সেই সজীবতা আর নেই। যার জন্যে বাড়ির পাশ দিয়ে কোনো অপরিচিত মানুষ বা কুকুর নির্বিঘ্নে বেরোতে পারত না, এখন তার সাড়াশব্দ বেশ কমে গেছে। এখন সে ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু শুয়ে শুয়ে আর মুখটাকে পেটের ভেতর লুকিয়ে। যেন সে তার আজকের এই দুর্দশায় কাঁদছে। হয় এখন আর তার ওঠার শক্তিটুকুও নেই, নয়তো এতদিনকার সমস্ত সহানুভূতির জন্যে এটুকু করাই পর্যাপ্ত মনে করছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দরজার পাশে বসে একটা চিঠি পড়ছিলাম, এমন সময় দেখি দপ্তরি আসছে। আমি ত্রস্ত হয়ে উঠলাম, বোধহয় সমনবাহী পেয়াদাকে দেখে কিসানও কখনও এতটা সন্ত্রস্ত হয় না, টিকা দিতে আসা সরকারি লোককে দেখে শিশুরাও এত ঘাবড়ে যায় না। ভাবলাম চটে করে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে খিল দিয়ে দিই দরজায়, কিন্তু তার আগেই দপ্তরি পৌঁছে গেল একেবারে সামনে। এখন আর কী করে পালাই? অগত্যা চেয়ারে বসে পড়লাম; কিন্তু ভুরু-কপাল কুঁচকে রইল। দপ্তরি যে কেন আসছে তা বুঝতে একটুও বাকি ছিল না আমার। ধার চাইতে আসা লোকের মনের কুণ্ঠা তার মুখেচোখে আচারব্যবহারে উজ্জ্বল রঙে ফুটে ওঠে। এক ধরনের নম্রতা, সংকোচ আর বশংবদভাব সেখানে বিরাজ করে, যা একবার দেখলে আর কখনও ভোলা যায় না।

দপ্তরি এসেই কোনোরকম ভনিতা না করেই তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল, যা আমি আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।

আমি রূঢ়ভাবে উত্তর দিলাম, আমার কাছে এক পয়সাও নেই।

একটা সেলাম ঠুকে দপ্তরি তৎক্ষণাৎ ফিরে যেতে উদ্যত হল। ওর চেহারায় এত বেশি দীনতা আর অসহায়তা ফুটে উঠেছিল যে, আমার করুণা হল। ওর এই ভূমিকাহীন নীরব প্রস্থান যে কতটা ব্যঞ্জনাময় তা কী বলব! তাতে লজ্জা ছিল, সন্তোষ ছিল, আবার আপশোশও ছিল। ওর মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোল না, কিন্তু ওর চেহারা যেন বলছিল, আমি জানতাম, আপনি এমনই উত্তর দেবেন। এব্যাপারে আমার একরত্তি সন্দেহ ছিল না। তবু একথা জেনেও কেন যে এলাম তা আমি

নিজেও ঠিক বুঝি না। হয়তো আপনারই দয়া, আপনার স্নেহ আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে এখানে। এখন চলে যাচ্ছি, কারণ আমার দুঃখের কথা আপনাকে শোনাবার মতো মুখ আমার নেই।

আমি দপ্তরিকে ডেকে বললাম, আচ্ছা শোনো। তোমার দরকারটা কী বলোতো শুনি।

দপ্তরি বুঝি একটু আশান্বিত হল। বলল, কীই বা বলি আপনাকে। গত দুদিন ধরে অনাহারে আছি এরকম।

খুব আস্তে আস্তে যত্নসহকারে আমি ওকে বোঝালাম, এইভাবে ধার করে করে কি চিরদিন চালানো যায়? তুমি বিচক্ষণ লোক, বোঝোই তো, আজকাল সবাই নিজের মাথার ঘায়েই পাগল। কারও কাছে ফালতু টাকা থাকেই না। আর থাকলেও সে ঋণ দিয়ে ঝঞ্ঝাট পোহাতে যাবে কেন? তুমি অবস্থাটা একটু পালটাবার চেষ্টা করো!

ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিল দপ্তরি, কী আর বলি বলুন, সবই সময়ের ফের। এক মাসের জন্যে যা কিছু আনি, তা একদিনেই উড়ে যায়। আমার গৃহিণীর নোলার জ্বালায় একেবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছি। একটা দিন দুধ না জুটলে কুরুক্ষেত্র করে, মিষ্টি না কিনে ঘরে ঢোকাই মুশকিল। একদিন মাংস না হলে পারলে আমার মাংসই খায়। ভদ্রলোকের ছেলে মশাই, সামান্য খাওয়া নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে রোজ ঝগড়া-কোঁদল, এ বেইজ্জতি তো বরদাস্ত করা যায় না। যা করতে বলে চোখ বুজে তাই করি। এখন খোদার কাছে এটুকুই প্রার্থনা, তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিন। এছাড়া আমার আর কোনো উপায়ই নেই। আমি সব কিছুতেই হেরে গেছি, সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।

আমি বাক্স থেকে পাঁচটা টাকা বের করে ওকে দিয়ে বললাম, এটা রাখো, এটা তোমার পৌরুষের প্রতি আমার দক্ষিণা। আমি কখনও ভাবতেও পারিনি তোমার অন্তরে এতটা বীরত্ব রয়েছে, তোমার হৃদয় এতখানি উদার।

গৃহদাহের আগুনে ঝলসে যাচ্ছে যে বীর, সে রণক্ষেত্রের বীর সৈনিকের চাইতে কোনো অংশেই হীন নয়।

(দফতরী / ১৯২০) অনুবাদ অচিন চক্রবর্তী

আত্মারাম

বেন্দো গ্রামের মহাদেব স্যাকরা নামের ব্যক্তিটিকে সকলেই চিনত। সে প্রতিদিন নিজের বাড়ির বারান্দায় সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বসে বসে আগুনের মালসার সামনে খট খট করতে থাকত। সেখানকার লোক এই নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনি শুনতে শুনতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, যদি কোনো দিন কোনো কারণে সে আওয়াজ বন্ধ থাকত তাহলে তারা মনে করত কী যেন একটার অভাব ঘটছে। সে প্রতিদিন খুব সকালে একবার তার টিয়াপাখির খাঁচাটা হতে নিয়ে ভজন গাইতে গাইতে দিঘির ধার পর্যন্ত যেত। সেই ভোরের অস্পষ্ট আলোয় তার জীর্ণ শরীর, ফোকলা গাল আর নুয়ে-পড়া কোমর কোনো অপরিচিত লোক দেখলে তাকে পিশাচ বলে ভুল করতে পারত। 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা' — এই আওয়াজ যাদের কানে যেত তারা বুঝতে পারত ভোর হয়েছে।

মহাদেবের পারিবারিক জীবন খুব সুখের ছিল না। তার তিন ছেলে এবং তাদের তিন স্ত্রী ছিল আর ছিল কয়েক ডজন নাতিপুতি। কিন্তু তার বোঝা হালকা করার কেউ ছিল না। ছেলেরা বলে বেড়াত, বাবা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন আমরা জীবনের আনন্দ ভোগ করে নিই, পরে ওই ঢোল তো গলায় একদিন বাঁধতেই হবে। বেচারা মহাদেবকে মাঝে মাঝেই অনাহারে কাটাতে হত। খাওয়ার সময় তার বাড়িতে সাম্যবাদের এমন গগনভেদী নির্ঘোষ উঠতে থাকত যে, সে পেটে খিদে নিয়েই উঠে আসত, আর কিছুক্ষণ থেলো হুঁকোয় তামাক টেনে ঘুমোতে যেত। তার ব্যবসার জীবনটা ছিল আরও অশান্তিময়। যদিও সে তার পেশায় সুনিপুণ, তার অ্যাসিড অন্যদের বস্তুর তুলনায় বেশি পরিশোধনক্ষম এবং তার রাসায়নিক প্রক্রিয়া তুলনামূলক ভাবে বেশি কষ্টসাধ্য, কিন্তু তবুও তাকে সন্দিগ্ধমনা এবং অসহিষ্ণু ব্যক্তিদের কাছ থেকে অপবাদ পেতে হত। তবে মহাদেব তার অবিচলিত গাম্ভীর্য নিয়ে মাথা নিচু করে সব শুনে যেত। যখন সব গন্ডগোল মিটে যেত তখন সে তার টিয়ার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিত — 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'। এই মন্ত্র জপ করে নিলেই যেন তার প্রাণে পূর্ণ শান্তি ফিরে আসত।

একদিন ঘটনাক্রমে বাচ্চাকাচ্চাদের মধ্যে কেউ খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছিল। টিয়াটা উড়ে গেল। মহাদেব মাথা তুলে খাঁচার দিকে তাকাতেই তার হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার মতো হল। টিয়া কোথায়? সে বার বার ভালো করে খাঁচাটাকে দেখে। টিয়াপাখি তো পালিয়েছে। মহাদেব ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় আর এদিকে ওদিকে, চারদিকের ঘরের চালের উপর তাকিয়ে তাকিয়ে খোঁজ করে। এই সংসারে তার প্রিয় বলতে যদি কিছু থাকে তো ওই টিয়াপাখিটাই। ছেলেরা, নাতিপুতির দল, সকলের প্রতিই তার বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। বাচ্চাদের গন্ডগোলে তার কাজের বিঘ্ন ঘটত। ছেলেগুলি

নিষ্কর্মা ছিল বলেই যে তাদের ভালোবাসত না একমাত্র তাই নয়, তার আরও কারণ ছিল। ওদের জন্য সে তার 'আনন্দদায়ী সুধাভাণ্ডের' নিয়মিত জোগান থেকে বঞ্চিত হত। প্রতিবেশীদের উপরও মহাদেব বিরক্ত ছিল, কারণ তারা প্রায়ই তার মালসা থেকে আগুন বের করে নিয়ে যেত। এই সমস্ত বিঘ্ন এবং অশান্তি থেকে ত্রাণ পেয়ে কোনো শান্তি লাভের জায়গা যদি থেকে থাকে তো তা হল ওই টিয়াপাখিটা। এর জন্যেই সে কোনোরকম কষ্টবোধ করত না। যে বয়সে মানুষের মানসিক প্রশান্তি লাভ করা ছাড়া আর কোনো বসনা থাকে না, মহাদেবের এখন সেই বয়স।

টিয়াটা একটা চালার উপর বসেছিল। মহাদেব খাঁচাটা নামিয়ে নিয়ে এসে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগল — 'আয়। আয়। সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'। কিন্তু ততক্ষণে বাড়ির আর গ্রামের ছেলেপুলেরা একত্রিত হয়ে চিৎকার করতে আর হাততালি দিতে শুরু করেছে। উপর থেকে কাকগুলো কা-কা করতে শুরু করেছে। টিয়াপাখি ভয় পেয়ে আবার উড়ে গেল এবং একেবারে গ্রামের বাইরে এক গাছের ডালে গিয়ে বসল। মহাদেব খালি খাঁচা নিয়ে পাখির পিছনে ছুটল। বেশ জোরেই দৌড়োল। তার ওই দ্রুতগতি দেখে লোকজন বেশ অবাক হল। মায়ামোহের এর থেকে সুন্দর, সজীব এবং ভাবময় অভিব্যক্তির কথা কল্পনা করা যায় না।

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। চাষিরা সব খেত থেকে ফিরছিল। খানিকটা মজা করার সুযোগপেয়ে গেল তারা। মহাদেবকে রাগিয়ে দিয়ে সবাই মজা পেত। কেউ পাথর ছুঁড়তে লাগল, কেউ হাততালি দিতে লাগল। টিয়া আবার সেখান থেকে উড়ে পালাল। এবারে সে অনেক দূরের আমবাগানে একটা গাছের মগডালে গিয়ে বসল। মহাদেব আবার খালি খাঁচা নিয়ে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে চলল। বাগানে যখন পৌঁছোল, তখন তার পায়ের তালু থেকে আগুন বেরোচ্ছে আর মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। একটু সামলে নিয়ে আবার খাঁচাটা তুলে ধরে আওড়াতে লাগল, 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'। টিয়া মগডাল থেকে নেমে এসে নীচের একটা ডালে বসল। কিন্তু সশঙ্ক নেত্রে তাকাতে লাগল মহাদেবের দিকে। মহাদেব ভাবল, পাখিটা ভয় পাচ্ছে। খাঁচাটা নীচে নামিয়ে রেখে নিজে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। টিয়া চারদিক বেশ ভালো করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গাছ থেকে নেমে এসে খাঁচার উপর বসল। মহাদেবের বুক কাঁপতে শুরু করল। 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত ...' মন্ত্র জপতে জপতে ধীরে ধীরে টিয়ার কাছে এল এবং তাকে ধরবে বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু পাখিকে ধরা গেল না, সে আবার উড়ে গিয়ে গাছে বসল।

সন্ধে পর্যন্ত এইরকম চলল। টিয়া কখনও এডালে কখনও ওডালে গিয়ে বসে। কখনও খাঁচার দরজায় বসে নিজের দানাপানির পাত্রটাত্র দেখেশুনে আবার উড়ে যায়। বুড়োকে যদি মূর্তিমান মোহ বলা যায়, তাহলে টিয়া নিশ্চয়ই মূর্তিময়ী মায়া। এইভাবে আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে গেল এবং মায়া ও মোহের এই সংগ্রাম ক্রমে স্থায়ী অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

রাত্রি হয়ে গেল। চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। পাতার আড়ালে কে জানে কোথায় টিয়াটা লুকিয়ে রইল। মহাদেব ভালো করেই জানত যে রাতের বেলায় সে কোথাও উড়ে যেতে পারবে না, আর খাঁচাতেও আসতে পারবে না। সে তা সত্ত্বেও সেই জায়গা থেকে নড়ার নাম করল না। আজ সারাদিন সে কিছু খায়নি; রাতের খাওয়ার সময়ও পার হয়ে গেল। এক ফোঁটা জলও তার গলা দিয়ে নামেনি। তবু তার না ছিল খিদে, না ছিল তেষ্টা। টিয়ার অবর্তমানে তার জীবন অর্থহীন, রুক্ষ এবং

রিক্তবলে বোধ হতে লাগল। মহাদেব দিনরাত পরিশ্রম করতে পারত কারণ টিয়াপাখিটা ছিল তার প্রেরণাস্বরূপ; অভ্যাসবশতই সে জীবনের অন্যান্য কাজ করে যেত। এই সব কাজে আপন সজীবতার লেশমাত্রও সে অনুভব করতে পারত না। টিয়াই ছিল একমাত্র প্রাণী যা তার মধ্যে প্রাণের আভাস এনে দিত। হাত ফসকে সেই পাখির চলে যাওয়াটা আত্মার দেহত্যাগ করার শামিল।

সারাদিনের খিদে, তেষ্টা, ক্লান্তিতে মহাদেবের মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকিয়ে চোখ খুলে তাকাচ্ছিল আর ওই সর্বপরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে তার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল — 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'।

রাতের আধখানা কেটে গেল। এমন সময় হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে মহাদেব চমকে তাকিয়ে দেখল যে কাছেই আর একটা গাছের নীচে একটা আবছা আলোতে কয়েকটা লোক বসে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। তারা সবাই তামাক খাচ্ছিল। তামাকের মদির গন্ধ মহাদেবকে চঞ্চল করে তুলল। সে উঁচু গলায় হাঁক দেয় — 'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা'। আর তামাক খাওয়ার আশায় লোকগুলোর দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু হরিণ যেমন বন্দুকের আওয়াজ পেলেই পালাতে থাকে, তেমনই তাকে আসতে দেখে লোকগুলোও উঠে সবেগে পালিয়ে গেল। একেক জন একেক দিকে পালাল। মহাদেব চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তারপর হঠাৎ তার মনে হল লোকগুলো বোধ হয় সবাই চোর। সে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল, চোর, চোর, ধরো, ধরো। চোরেরা এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতেও সাহস পেল না।

মহাদেব আলোর কাছে গিয়ে একটা কলসি দেখতে পেল। কলসিতে মরচে পড়ে কালো হয়ে গেছে। মহাদেবের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। কলসিতে হাত দিতেই মোহর আছে বলে মনে হল। একটা মোহর বের করে নিয়ে আলোর সামনে ভালো করে দেখল : হ্যাঁ, তাইতো, মোহরই তো বটে। তাড়াতাড়ি কলসিটা তুলে নিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। তারপর গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইল। সাধু মহাদেব চোর মহাদেবে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে তার ভয় হতে থাকল যে যদি চোরেরা ফিরে এসে তাকে একা পেয়ে মোহর ছিনিয়ে নেয়। সে কিছু মোহর কোমরে বেঁধে নিল। তারপর একটা শুকনো কাঠ দিয়ে জমির মাটি সরিয়ে কয়েকটা গর্ত তৈরি করল। সেগুলোকে মোহর দিয়ে ভরতি করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল।

মহাদেবের মানসনেত্রে চিন্তা এবং কল্পনায় পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ জগতের একটা ছবি ভেসে উঠল। যদিও তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ হাতছাড়া হওয়ার ভয় ছিল, তবুও নানান অভিলাষ মনের ভেতর তাদের কাজ শুরু করে দিল। গড়ে উঠল একটা পাকা বাড়ি; জহুরির একটা কারবার শুরু হয়ে গেল; আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গো আবার সম্পর্ক গড়ে উঠল; ভোগবিলাসের সব সামগ্রীগুলো এক জায়গায় এসে হাজির হল; এ সবের পরেই নিয়মমতো তীর্থযাত্রায় তাকে যেতে হল এবং সেখান থেকে ফিরেই মহাসমারোহ করে যাগযজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণভোজন হল। এ সবের পরে একটা শিবালয় এবং একটা ইঁদারা তৈরি করতে হল। তৈরি হয়ে গেল একটা কুঞ্জ যেখানে সে রোজ পুরাণ-কথকতা শুনতে শুরু করল। সাধুসন্তরা যত্নআত্তি পেতে লাগলেন।

এইসব ভাবতে ভাবতে তার হঠাৎ চিন্তা হল যদি চোরেরা আবার আসে, তাহলে সে পালাবে কী করে। সে পরীক্ষা করে দেখার জন্য কলসিটা তুলল তারপর অনায়াসে তাড়াতাড়ি শ-দুই কদম

দৌড়ে গেল। মনে হচ্ছিল যেন তার পায়ে পাখনা গজিয়েছে। দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। তারপর আবার সেই আকাশকুসুম চিন্তার মধ্যেই আস্তে আস্তে রাত কেটে গেল। উষার প্রকাশে মৃদুমন্দ সমীরণে এবং পাখির কূজনে চারদিক পূর্ণ হয়ে উঠল। সহসা মহাদেবের কানে ভেসে এল —

'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা
রামকে চরণ মে চিত্ত লাগা।'

এই বুলি মহাদেবের জিহ্বায় লেগেই থাকত। সারাদিনে সহস্রবার এই শব্দ তার মুখ থেকে বেরোত। কিন্তু কখনও এই চরণদুটির অন্তর্নিহিত মহৎভাব তার অন্তরকে স্পর্শ করেনি। কোনো নিষ্প্রাণ বাদ্যযন্ত্র থেকে যেমন রাগরাগিণীর আওয়াজ সৃষ্ট হয়ে থাকে, তেমনই তার মুখ থেকে ওই স্তোত্র বেরোত। কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত তার জীবন-তরুতে পত্রপল্লবের উপস্থিতি মাত্র ছিল না। প্রভাতের নির্মল বায়ু তাই সেখানে গুঞ্জনধ্বনি জাগিয়ে তুলতে পারেনি। আর এই মুহূর্তে সেই বৃক্ষে নতুন শাখার উদ্‌গম হল, মঞ্জুরিত হল নবকিশলয়। মলয় পবনে হিন্দোলিত হল বৃক্ষরাজি, গুঞ্জরিত হল বনতল।

ক্রমে অরুণোদয়ের সময় উপস্থিত হল। এক অনির্বচনীয় দ্যুতিতে প্রকৃতি প্লাবিত হয়ে গেল। আকাশ থেকে মাঝে মাঝে তারা যেমন ধরণীর দিকে নেমে আসে, তেমনই ভাবে তখন হঠাৎ উঁচু ডাল থেকে জোড়াপায়ে টিয়াটা নেমে এসে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ল। মহাদেব উৎফুল্ল হয়ে ছুটে এসে খাঁচাটা তুলে ধরে বলল — এসো বাবা আত্মারাম! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ অনেক, কিন্তু আমার জীবন সফল করেও ভুলেছ। আমি এখন থেকে রুপোর খাঁচায় রেখে তোমাকে সোনায় মুড়ে দেব। মহাদেবের প্রতি লোমকূপ থেকে ঈশ্বরের প্রতি অশেষ করুণার জয়গান ধ্বনিত হতে থাকল : হে প্রভু, হে দয়াময়! অসীম তোমার করুণা, না হলে আমার মতো পাপী এবং ঘৃণিত জীব কি তোমার এই দয়া পাওয়ার যোগ্য। একটা পবিত্র ভাবের উদয় হওয়াতে তার চিত্ত উদ্‌বেলিত হয়ে উঠে, গভীর উপলব্ধির সঙ্গে সে বলে উঠে —

'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা
রামকে চরণমে চিত্ত লাগা।'

সে একহাতে খাঁচা, অপর হাতে কলসি নিয়ে ঘরের দিকে রওনা দিল।

মহাদেব যখন বাসায় পৌঁছল তখনও রাতের আঁধার কাটেনি। সারা রাস্তায় একটা কুকুর ছাড়া আর কিছু সে দেখতে পায়নি। কুকুরটাও দৃক্‌পাত করেনি, কারণ কুকুরদের মোহরের প্রতি লোভের কথা বড়ো একটা শোনা যায় না। মহাদেব কলসিটা গামলার ভেতরে লুকিয়ে রেখে সেটাকে ভালো করে কয়লা দিয়ে ঢেকে নিজের ঘরে রেখে দিল।

দিনের আলো ফুটতেই সে সোজা পুরোহিতের বাসায় গিয়ে পৌঁছল। পুরোহিত ঠাকুর তখন পুজো করতে বসে ভাবছিলেন — কালই মোকদ্দমার দিন পড়েছে, অথচ হাতে একটা কানাকড়িও নেই — যজমানদের কেউই তার ধারে কাছে আসে না। এমন সময় মহাদেব এসে প্রণাম কের। পণ্ডিতজি মুখ ফিরিয়ে নিলেন : এই মূর্তিমান অমঙ্গল কোথা থেকে এসে পৌঁছল? কে জানে আজ

কপালে খাওয়া জুটবে কি না? বেশ রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন — কী ব্যাপার? সাত সকালে কী চাই? তুমি তো জানই এই সময়টা আমি পুজোআর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

মহাদেব বিনীত ভাবে বলল — মহারাজ, আজ আমার ওখানে সত্যনারায়ণের পুজো করাতে চাই।

পুরোহিতমশাই তো একেবারে অবাক। নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছে না। মহাদেবের বাড়িতে কথকতার আয়োজন হওয়া আর পুরুতঠাকুরের নিজের বাড়ি থেকে ভিখারির ভিক্ষে পাওয়া যে একই রকমের অসাধারণ ঘটনা। মুখ থেকে তাই বেরিয়ে আসে, কেন, আজ কিছু হল না কী?

মহাদেব বলে, কিছু না, কিছু না, আজ হঠাৎ ইচ্ছে হল ভগবানের নামগান শোনার।

বেলা একটু বাড়তেই নানা প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। বেন্দো গ্রাম এবং কাছাকাছি অন্যান্য গ্রামেও খবর জানিয়ে সুপুরি বিলি করা হল। কথকতার শেষে ভোজের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। যে শোনে সেই অবাক হয়। এই শুকনো মরুভূমিতে ঘাস গজাল কী করে?

সন্ধ্যার সময়, লোকজন জড়ো হয়েছে এবং পণ্ডিতজি নিজের সিংহাসনে বিরাজমান। এমন সময় মহাদেব দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে বলল, ভাইসব, আমার সারা জীবন ছলচাতুরিতে কেটে গেছে। আমি জানি না, কত লোককে আমি ঠকিয়েছি, কত আসল জিনিসকে মেকিতে পরিণত করেছি। এখন ভগবান আমার উপর সদয় হয়েছেন, তিনি আমার মুখের উপর থেকে কলঙ্কের ছাপ মুছে ফেলতে চান। তাই আমি এখানে সমবেত সব ভাই-বন্ধুদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি — যার যা কিছু আমার কাছে গচ্ছিত আছে, যার যার জমা আমি আত্মসাৎ করেছি, আর যার যার খাঁটি জিনিস জাল জিনিসে পরিণত করেছি — তারা যেন এসে নিজের হিসেবের প্রতিটি কানাকড়ি অবধি বুঝে নিয়ে যান। আর যদি কেউ এখানে না এসে থাকেন, তাহলে আপনারা ফিরে গিয়ে সকলকে বলে দেবেন যে, কাল থেকে এক মাসের মধ্যে যে কোনো দিন যে কোনো সময় আমার কাছে এসে তারা যেন নিজের হিসাব চুকিয়ে নিয়ে যান। কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার নেই।

সমবেত সকলে অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ বেশ বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বলল, কেমন? আমি বলেছিলাম কি না? কেউ আবার অবিশ্বাসের সুরে বলল, সব যোগ করলে তো কয়েক হাজার টাকা হবে — ও দেবে কোত্থেকে?

একজন ছত্রী রাজপুত আবার ঠাট্টা করে বলে উঠলেন — আর যারা পরলোকে গেছেন, তাদের কী হবে?

মহাদেব উত্তর দিল, তাদের বাড়ির লোকজন তো আছে।

সেই সময়ে কিন্তু লোকের বকেয়া উশুলের ইচ্ছে যতটা প্রকট ছিল, তার চেয়ে বেশি প্রকট ছিল কোথা থেকে মহাদেবের এত ধনপ্রাপ্তি ঘটল, সেটা জানার ইচ্ছে। কিন্তু মহাদেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করার সাহসও হল না কারও। দেহাতি লোক সবাই, পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটার কলাকৌশল তারা জানে না। তাছাড়া বেশির ভাগ লোকেরই স্মরণে ছিল না মহাদেবের কাছে তাদের কী পাওনা, আর এই পবিত্র মুহূর্তে যদি ভুলচুক কিছু হয়ে যায়, সেই ভয়েও তারা মুখ খুলতে সাহস করেনি। কিন্তু সব থেকে বড়ো কথা হল যে, মহাদেবের এই সাধুতা তাদের বশীভূত করে ফেলেছিল।

হঠাৎই পুরোহিতমশাই বলে উঠলেন, তোমার হয়তো মনে আছে মহাদেব, আমি তোমাকে সেবার ডালার মালা তৈরির জন্যে সোনা দিয়েছিলাম, আর তুমি তা থেকে কয়েক মাষা ওজন করার সময়েই মেরে দিয়েছিলে।

মহাদেব — হ্যাঁ। মনে আছে বইকী। আপনার কতটা লোকসান হয়েছিল?

পুরোহিত — তা, পঞ্চাশ টাকার কম হবে না।

মহাদেব কোমরের খুঁট থেকে দুটো মোহর বার করে পুরোহিতের সামনে রেখে দিল। পুরোহিত ঠাকুরের এই লোলুপতা নিয়ে টীকাটিপ্পনি শুরু হয়ে গেল : এটা একেবারে বেইমানি, খুব বেশি হলে দু-চার টাকা ক্ষতি হয়তো হয়েছিল। আর সেখানে বেচারার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায় করে নিল? নারায়ণের ভয়ও নেই। এদিকে পণ্ডিত হয়েছেন, আর ওদিকে এতটা অসৎ চরিত্র? ছি! ছি!

লোকের মনে মহাদেব সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল। এক ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু ওই হাজার মানুষের জমায়েতের মধ্যে থেকে একজনও উঠে দাঁড়াল না। তখন মহাদেব আবার বলল, মনে হচ্ছে আপনারা নিজেদের হিসেব ভুলে গেছেন। তাহলে আজ কথকতাই শুরু হোক। কিন্তু আমি একমাস পর্যন্ত আপনাদের পথ চেয়ে থাকব। তারপর তীর্থযাত্রায় বেড়িয়ে পড়ব। ভাইসব! আপনাদের সকলের কাছে বিনীত আবেদন করছি, আমাকে উদ্ধার করুন।

একমাস ধরে মহাদেব পাওনাদারদের জন্যে অপেক্ষা করল। রাত্রে চোরের ভয়ে ঘুমোত না পর্যন্ত। এই ঘটনার পর কাজকর্ম করাও ছেড়ে দিয়েছিল। মদের নেশাও ঘুচে গিয়েছিল। সাধুসন্ত প্রভৃতি অভ্যাগতদের, যাঁরা এসে পড়তেন তাঁদের যথাযোগ্য সৎকার করত। বহু দূর পর্যন্ত তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। একমাস পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও একজন লোকও এল না হিসাব মেটানোর জন্য। আজ মহাদেব অনুভব করতে পারল, সংসারে এখনও ধর্ম এবং সদাচার কী বিপুল পরিমাণে অবশিষ্ট আছে; এখন সে বুঝতে পারল, জগৎ খারাপ লোকের কাছেই খারাপ, আর ভালোর কাছে ভালো।

এই ঘটনার পর পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। এখনও কেউ বেন্দো গ্রামে গেলে দূর থেকেই একটা সোনার কলসি দেখতে পাবে। ওটা হল ঠাকুর-দ্বারের কলস। মন্দিরের লাগোয়া একটা বাঁধানো দিঘিতে প্রচুর পদ্ম ফুটে আছে। সেই দিঘির মাছ কেউ ধরে না। দিঘির কিনারায় একটা বিশাল সমাধি স্থাপিত আছে। এটাই 'আত্মারাম'-এর স্মৃতিচিহ্ন, তার সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কেউ বলে তার সেই সোনার খাঁচাসুদ্ধই সে স্বর্গে আছে। কেউ বলে সে 'সত্য গুরুদত্ত...' বলতে বলতে হঠাৎ অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে — ওই পক্ষীরূপী চন্দ্রকে একটা বিড়ালরূপী রাহু গ্রাস করেছিল। লোকে বলে এখনও নাকি মাঝরাতে দিঘির ধারে আওয়াজ শোনা যায় —

'সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা
রামকে চরণ মে চিত্ত লাগা।'

মহাদেবের বিষয়েও অনেক জনশ্রুতি আছে। সেগুলোর মধ্যে যা বিশ্বাসযোগ্য তা হল আত্মারাম সমাধিস্থ হওয়ার পরে পরেই মহাদেব সন্ন্যাসীদের সঙ্গে হিমালয়ে চলে যায় এবং আর ফিরে আসেনি। সেখানে সেও 'আত্মারাম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

(আত্মারাম/১৯২০) অনুবাদ সৌরেন ভট্টাচার্য

পশু থেকে মানুষ

দুর্গা মালি কাজ করত ডক্টর মেহ্‌রা, বার-এট্‌-ল-এর বাড়িতে। তার বেতন ছিল মাসে পাঁচ টাকা। স্ত্রী ও দু-তিনটি ছোটো সন্তান নিয়ে ছিল তার সংসার। দুর্গার স্ত্রী প্রতিবেশীদের গম পেষাই করে দিত। যে বাচ্চা দুটোর একটু বুদ্ধি হয়েছিল তারা এদিক-ওদিক থেকে জ্বালানি কাঠ ও ঘুঁটে জোগাড় করে নিয়ে আসত; কিন্তু এত করেও অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হত। ডক্টর সাহেবের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দুর্গা বাগান থেকে ফুল তুলে বাজারে গিঁয়ে পূজারিদের কাছে বেচে দিত। কোনো কোনো সময় ফলও চুরি করে বেচে দিত। এ সবই ছিল তার উপরি আয়। এ দিয়েই তার তেল-নুনের ব্যবস্থাটা হয়ে যেত। কয়েক বারই সে ডক্টর সাহেবের কাছে তার বেতন বাড়াবার জন্য প্রর্থনা জানিয়েছিল; কিন্তু ডক্টর সাহেব চাকরদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে সংক্রামক ব্যাধি হিসাবে গণ্য করতেন, যা একজনের কাছ থেকে অন্য জনে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সাফ বলে দিতেন: দেখ, আমি তো তোমাকে বেঁধে রাখিনি। তোমার যদি না পোষায় তো অন্য কোথাও চলে যাও। আমার এখানে মালির আকাল হবে না। দুর্গার এত সাহস ছিল না যে হাতের কাজ ছেড়ে দিয়ে চাকরি খুঁজে বেড়ায়। এখান থেকে বেশি বেতন পাবার আশাও ছিল না। কাজেই, এই নৈরাশ্যময় জীবনকে মেনে নিয়ে অদৃষ্টকে সে অভিশাপ দিত। ডক্টর সাহেব ছিলেন বিশেষ বাগানপ্রেমী লোক। নানা রকমের ফুল-পাতার গাছ তিনি লাগিয়েছিলেন। দ্বারভাঙ্গা, মলিহাবাদ, সাহারানপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে ভালো ভালো ফলের গাছ এনে তাঁর বাগানে লাগিয়েছিলেন। গাছ ফলে ভরে আছে দেখলে তাঁর খুব আনন্দ হত। নিজের বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে ফুলের তোড়া আর ঝুড়ি ঝুড়ি শাক-সবজির উপহার পাঠিয়ে যেতেন। তার নিজের ফল খাবার কোনো শখ ছিল না, তবে বন্ধুদের খাইয়ে অসীম আনন্দ পেতেন। প্রত্যেক ফলের মরশুমে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতেন আর 'পিকনিক পার্টি' ছিল তাঁর চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায়।

একবার গরমের সময় তিনি তাঁর কয়েক জন বন্ধুকে আম খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মলিহাবাদি গাছে সুফেদা আম খুব ধরেছিল। ডক্টর সাহেব রোজ এই ফল দেখাশোনা করতেন। প্রথম বারের ফল বলেই তিনি বন্ধুদের মুখ থেকে এই আমের মিষ্টত্ব ও স্বাদের বর্ণনা শুনতে চেয়েছিলেন। একজন পালোয়ান তার কসরত দেখিয়ে যে আনন্দ পায় তিনি বন্ধুদের মুখ থেকে আমের প্রশংসা শুনে সেই আনন্দ পেতেন। এত বড়ো, সুন্দর ও নরম সুফেদা তাঁর নজরে পড়েনি। এই ফলের স্বাদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, তা চেখে দেখার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেননি। একটা ফল চেখে নষ্ট করলে একজন বন্ধুকে তার রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত করা হবে, মুখ্যত এই কারণটাও ছিল।

সন্ধ্যাকাল, চৈত্রমাস। বন্ধুরা এসে বাগানের মধ্যে জলাশয়ের ধারে পাতা চেয়ারে বসেছেন। আগেই তাদের জন্য বরফ ও দুধের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। তখন পর্যন্ত ফল পাড়া হয়নি। ডক্টর সাহেব ফলগুলো গাছে ঝুলছে এটা দেখিয়ে পাড়তে চেয়েছিলেন, যাতে কারোরই এ সন্দেহ না হয় যে ফল তাঁর বাগানের নয়। সবাই এসে গেলে তিনি বললেন, আপনাদের কষ্ট হবে ঠিকই, তবু একটু গিয়ে গাছে ঝুলন্ত ফলগুলো যদি দেখেন। এ দৃশ্য বড়ো মনোরম। গোলাপেরও এমন নয়নলোভন লালিমা হয় না। রং দেখে স্বাদও বোঝা যাবে। আমি এগাছের কলম খোদ মলিহাবাদ থেকে আনিয়েছিলাম আর এই গাছ বড়োও করেছি বিশেষ নিয়মে।

বন্ধুরা সব উঠে দাঁড়ালে ডক্টর সাহেব আগে আগে চললেন। পথের দুধারে ছিল গোলাপের সারি। গোলাপের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে শেষে তারা সুফেদা আমগাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! গাছে তো একটা ফলও নেই। ডক্টর সাহেব ভাবলেন, বোধ হয় এ-গাছ নয়। দু-পা এগোতেই আর একটা গাছ পাওয়া গেল। আর একটু এগিয়ে আরও একটা। আবার পিছিয়ে এসে সেই সুফেদা আমগাছের নীচে বিস্ময়বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গাছ যে ভুল হয়নি তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ফল কোথায় গেল? বিশ-পঁচিশটা আম ছিল, এখন একটারও চিহ্ন নেই! বন্ধুদের দিকে অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আশ্চর্য লাগছে যে এই গাছে একটা আমও নেই। আজ সকালে দেখেছি, গাছ আমে ভরে আছে। এই দেখুন আমের বোঁটা। এটা নিশ্চয়ই মালির বদমাইশি। আজ আমি ওর হাড় গুঁড়ো করব। ব্যাটা পাজি আমাকে কীভাবে ধোঁকা দিল! আমি অত্যন্ত লজ্জিত যে, আপনাদের মিছিমিছি কষ্ট দিলাম। সত্যি কথা বলতে কী, আমার এখন এত খারাপ লাগছে যে তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। এমন সুন্দর এমন নরম লাবণ্যময় ফল আমি কখনও দেখিনি। এই আম এভাবে উবে গেল দেখে আমার মন ভেঙে গেছে।

এসব বলতে বলতে তিনি নৈরাশ্য ও বেদনাভরে চেয়ারে বসে পড়লেন। বন্ধুরা সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, চাকরদের ব্যাপার সব জায়গাতেই এই রকম। এ জাতটাই পাজি। আমাদের কষ্ট হল বলে আপনি দুঃখ করবেন না। সুফেদা নাই বা হল অন্য আম তো রয়েছে।

এক ভদ্রলোক বললেন — সাহেব, আমার তো সব আমই একরকম লাগে। সুফেদা, মোহনভোগ, ল্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি, দসেরা — এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না। জানি না, কীভাবে আপনারা এদের মধ্যে স্বাদের পার্থক্য স্থির করেন।

দ্বিতীয় এক ভদ্রলোক বললেন — আমারও সেই কথা। এই সময়ে যে জাত পাওয়া যায় তাই আনিয়ে দিন না। যা গেছে তা নিয়ে আপশোশ কেন?

ডক্টর সাহেব ব্যথিতভাবে বললেন — আমের কি আর কিছু অভাব আছে? সারা বাগান আমে ছেয়ে আছে। যত খুশি খান আর সঙ্গে করে নিয়েও যান। এগুলো আছে তো ওই জন্যেই। কিন্তু সেই রস আর সেই স্বাদ কোথায় পাওয়া যাবে? আপনাদের বিশ্বাস হবে কিনা জানি না, এই সুফেদা এত মসৃণ ছিল যে আপেলের মতো মনে হত। আপেলও দেখতে সুন্দর, কিন্তু তাতে সেই রুচিবর্ধক কান্তি, সেই অমৃতময় মিষ্টতা কোথায়? এই মালি আজ এমন অনর্থ ঘটাল যে, ইচ্ছা হচ্ছে নিমকহারামটাকে গুলি করে শেষ করে দিই। এখন সামনে পেলে আধমরা করে দেব।

মালি বাজারে গিয়েছিল। ডক্টর সাহেব সইসকে দিয়ে কিছু আম পাড়ালেন। বন্ধুরা আম খেয়ে, দুধ খেয়ে, ডক্টর সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে যে যার পথ ধরলেন। ডক্টর মেহরা কিন্তু সেই জলাশয়ের ধারে হাতে হান্টার নিয়ে মালি ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে দেখে সাক্ষাৎ ক্রোধের প্রতিমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল।

দুই

একটু রাত করে দুর্গা বাজার থেকে ফিরল। এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিপাত করে সে ফিরছিল। যখনই সে দেখল ডক্টর সাহেব হাতে হান্টার নিয়ে জলাশয়ের ধারে বসে আছেন তখনই ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল। সে বুঝল, তার চুরি ধরা পড়ে গেছে। এই ভয়েই সে বাজারে খুব দেরি করেছিল। সে ভেবেছিল — ডক্টর সাহেব হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়ে থাকবেন আর আমি চুপি চুপি কাঁঠাল গাছের নীচে আমার ডেরায় গিয়ে বসে থাকব। সকালে যদি কিছু জিজ্ঞাসাবাদও হয়, সাফাই গাইবার অবসর পাওয়া যাবে। পাকা চোরের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু হল সময়। এক একটা মুহূর্ত তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার পক্ষেই যায়। কিন্তু চোর যদি হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় তখন আর তার বাঁচার উপায় থাকে না। শুকনো রক্তের দাগকে রঙের দাগ বলে চালানো যায়; কিন্তু তাজা রক্ত তো নিজেই সোচ্চার। দুর্গার পা আর চলছিল না, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। ডক্টর সাহেব দুর্গাকে দেখে ফেলেছিলেন। এখন আর পেছন ফেরা সম্ভব ছিল না।

ডক্টর সাহেব তাকে দূর থেকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য ছিল আচ্ছা করে ধোলাই দেবেন। কিন্তু যেহেতু নিজে উকিল ছিলেন তাই ঠিক করলেন তার বক্তব্য শোনা দরকার। ইশারা করে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন — সুফেদা গাছে বেশ আম ধরেছিল। এখন একটাও নেই। কী হল বল তো?

দুর্গা নির্দোষের মতো জবাব দিল — হুজুর, এই একটু আগে যখন আমি বাজারে গিয়েছিলাম তখনও তো সব আম গাছে ঝুলছে দেখে গেছি। এর মধ্যে কেউ পেড়ে নিয়ে থাকলে আমি বলতে পারব না।

ডক্টর — কার উপর তোমার সন্দেহ হয়?

দুর্গা — সরকার, আমি তা কী করে বলব? আপনার কত চাকরবাকর, জানি না কার এই দুর্মতি হয়েছে।

ডক্টর — আমার সন্দেহ তোমাকে। যদি পেড়ে থাকো তো এনে দিয়ে দাও। সোজাসুজি বল, পেড়েছি। নয়তো খুব খারাপ হবে।

চোর যে কেবল দণ্ড থেকেই বাঁচতে চায়, তা নয়; সে অপমানের হাত থেকেও বাঁচতে চায়। সে দণ্ডকে যত না ভয় পায় তার চেয়ে বেশি ভয় পায় অপমানকে। শাস্তি থেকে বাঁচার যখন আর কোনো আশাই থাকে না তখনও সে অপরাধ স্বীকার করে না। অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি থেকে বাঁচার চেয়ে নির্দোষ থেকে দণ্ড ভোগ করাকে সে শ্রেয় মনে করে। দুর্গাও অপরাধ স্বীকার করে শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারত, কিন্তু সে বলল — হুজুর, আপনি মালিক। আপনার যা ইচ্ছা আপনি করবেন। তবে

আমি আম পাড়িনি। আপনিই বলুন, এতদিন আপনি আমাকে রেখেছেন, কোনোদিন কি একটা পাতায় হাত দিয়েছি?

ডক্টর — তুমি দিব্যি করে বলতে পারবে?

দুর্গা — গঙ্গামার নামে দিব্যি করে বলছি যদি আমে হাত দিয়ে থাকি।

ডক্টর — আমি এ শপথ বিশ্বাস করি না। প্রথমে তুমি ঘটিতে জল নেবে, তাতে তুলসী পাতা দেবে তারপর শপথ করে বলবে, আমি যদি আম পেড়ে থাকি তবে আমাকে যেন আমার ছেলের মুখ দেখতে না হয়। তাহলে আমার বিশ্বাস হবে।

দুর্গা — হুজুর, যা সত্য তাতে ভয় কীসের। যা দিব্যি করতে বলবেন করব। যখন একাজ আমি করিনি তখন দিব্যি করলে আর কী হবে।

ডক্টর — ঠিক আছে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। জল নিয়ে এসো।

ডক্টর সাহেব মানবচরিত্র বুঝতেন। সর্বদা অপরাধীদের সঙ্গো তাঁকে কারবার করতে হত। যদিও দুর্গা খুব বড়ো গলায় নিজের সাফাই গাইছিল, তবু মনে তার ভয় ঢুকে গিয়েছিল। সে তার ডেরায় গেল ঠিকই, কিন্তু ঘাটিতে করে জল নেবার সাহস তার হল না। তার হাত কাঁপতে লাগল। এমন সব ঘটনা মনে এল যাতে গঙ্গামার নামে মিথ্যা শপথকারীর উপর দেবীর কোপ পড়েছিল। ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ, এই বিশ্বাস তাকে এমন নিদারুণ ভাবে এর আগে আর কখনও পায়নি। সে ঠিক করল — আমি গঙ্গামার নামে মিথ্যা শপথ করব না। তাতে যদি বেরিয়ে যেতে হয় তো বেরিয়ে যাব। চাকরি কোথাও না কোথাও পাওয়াই যাবে। আর যদি নাই পাওয়া যায় তো দিনমজুরি আছে। কোদাল চালালেও সন্ধ্যা নাগাদ আধা সের আটার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সে আস্তে আস্তে খালি হাতে ডক্টর সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল।

ডক্টর সাহেব কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন — জল এনেছ?

দুর্গা — হুজুর, গঙ্গাজল হাতে নিয়ে দিব্যি করতে পারব না।

ডক্টর — তাহলে তুমি আম পেড়েছ এটাই প্রমাণ হল?

দুর্গা — এখন আপনার যেমন ইচ্ছা আপনি ভাবতে পারেন। ধরে নিন আমিই আম পেড়েছি। তা, আমি তো আপনারই চাকর। দিনরাত আপনার হুকুম তামিল করছি। ছেলেপুলেরা যদি আমের জন্য কান্নাকাটি করে তবে কোথায় বা যাব। এবারকার মতো বাঁচান, আর কোনো দিন এ অন্যায় করব না।

ডক্টর মহোদয় এতটা উদার ছিলেন না। তবে তিনি এই বড়ো উপকারটুকু করলেন যে, দুর্গাকে পুলিশে দিলেন না কিংবা তার উপর হান্টার ব্যবহার করলেন না। দুর্গার ধর্মবিশ্বাস ডক্টর সাহেবকে কিছুটা নরম করে ফেলেছিল। তবে এমন দুর্বলচিত্ত লোককে নিজের কাছে রাখাও ছিল অসম্ভব। তার অর্ধের মাসের বেতন কেটে রেখে তিনি সেই মুহূর্তে দুর্গাকে চাকরি থেকে জবাব দিয়ে দিলেন।

তিন

কয়েক মাস পরে একদিন ডক্টর মেহরা প্রেমশংকরবাবুর বাগানে বড়োতে গেলেন। ওখান থেকে কিছু ভাল কলম আনা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রেমশংকরও ছিলেন বাগানপ্রেমী আর এই দুটি মানুষের

মধ্যে এই জায়গাতেই ছিল মিল। অন্য সব বিষয়ে ওঁরা ছিলেন একে অন্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রেমশংকর ছিলেন অল্পে সন্তুষ্ট, সরল আর সহৃদয় মানষ। কিছুদিন তিনি আমেরিকায় ছিলেন, সেখানে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেন। তারপর দেশে ফিরে তিনি এই কৃষিকেই তার জীবিকা করে নেন। মানবচরিত্র ও বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা ছিল বিচিত্র। এই জন্য শহরের সভ্য সমাজের মানুষ তাঁকে উপেক্ষা করত ও খামখেয়ালি মানুষ বলে গণ্য করত। এটা ঠিকই যে, তাঁর নীতিগুলো সম্পর্কে মানুষের একধরনের দার্শনিক সহানুভূতি ছিল। তবে সেই নীতিগুলো কার্যকর করার প্রশ্নে তাদের মনে যথেষ্ট শঙ্কা ছিল। সংসার কর্মক্ষেত্র, মীমাংসার ক্ষেত্র নয়। এখানে নীতি নীতির স্তরেই থাকবে, বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

ডক্টর সাহেব বাগানে পৌঁছে দেখলেন, প্রেমশংকর ফুলগাছে জল দিচ্ছেন। কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে একটি লোক পাম্পের সাহায্যে জল তুলে দিচ্ছে। মেহরা তাকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনে ফেললেন। ও ছিল দুর্গা মালি। ডক্টর সাহেবের মনে সে সময় দুর্গার প্রতি এক বিচিত্র ঈর্ষার উদয় হল। যে নরাধমকে তিনি দণ্ড দিয়ে নিজের কাছ থেকে তাড়ালেন তার আবার চাকরি হল কী করে? দুর্গাকে যদি তখন কাঁদোকাঁদো মুখে দেখা যেত তাহলে ডক্টর সাহেবের মনে দয়ার উদ্রেক হত। তিনি সম্ভবত তাকে কিছু বকশিশ দিতেন এবং প্রেমশংকরের কাছে তার প্রশংসাও করতেন। তাঁর প্রকৃতিতে দয়া ছিল এবং নিজের ভৃত্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টিও ছিল। তবে তাঁর এই কৃপা বা দয়ার সঙ্গে তাঁর কুকুর বা ঘোড়ার প্রতি যে দয়া তার লেশমাত্র পার্থক্য ছিল না। এই কৃপার ভিত্তিমূলে কিন্তু ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, ছিল দরিদ্র-পালনের দৃষ্টিভঙ্গি। দুর্গা তাঁকে দেখে কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নমস্কার জানিয়ে আবার নিজের কাজ করতে লাগল। তার এই ব্যবহার ডক্টর সাহেবের হৃদয়ে এসে ছুরির ফলার মতো বিঁধল। তার কাছে থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়েছে, এই কথা ভেবে ডক্টর সাহেবের অত্যন্ত ক্রোধ হল। নিজের উদারতার জন্য তাঁর যে অহংকার ছিল তাতে খুব আঘাত লাগল। প্রেমশংকর ডক্টর সাহেবকে নিয়ে ফুলের কেয়ারি দেখাতে গেলে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন — এই লোকটি আপনার এখানে কতদিন আছে?

প্রেমশংকর — প্রায় ছ-সাত মাস হবে।

ডক্টর — কোনো লুটপাট করছে না তো? আমার ওখানে মালির কাজ করত। ওর হাতটানের জন্য বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কখনও ফুল তুলে বেচে দিত, কখনও গাছ উপড়ে নিয়ে যেত, আর ফলের কথা কী বলব! এসব ছাড়া সে চলতেই পারত না। একবার আমি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মলিহাবাদি সুফেদা গাছে ফলও খুব ধরেছিল। সবাই এসে বসলে আমি তাদের নিয়ে গাছের ফল দেখাতে গেলাম। দেখি সব আম বেপাত্তা। তখন আমার অবস্থা কী রকম হাস্যকর হয়েছিল তা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি তখনই একে গালিগালাজ করি। অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক লোক আর এত ধূর্ত যে ধরা মুশকিল। উকিলদের মতো শক্ত লোক হলে হয়তো ধরতে পারে। তার সাফাই গাওয়া, তার ঔদ্ধত্য দেখবার মতো। আপনার এখানে কোনো গোলমাল করেনি তো?

প্রেমশংকর — আজ্ঞে না, কখনও না। অভিযোগের কোনো কারণ ঘটতে দেয়নি। এখানে তো খুব পরিশ্রম করে, এমন কী, দুপুরে ছুটির সময়ও বিশ্রাম করে না। আমার তো এখন ওর উপর এত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে যে, সমস্ত বাগানের ভার ওর উপর ছেড়ে দিয়েছি। সারাদিনে যা বেচাকেনা হয় তার হিসাব সন্ধ্যায় সে আমাকে দিয়ে দেয় আর কখনও এক পাই পয়সারও এদিক-ওদিক হয় না।

ডক্টর — এটাই হল ওর কৌশল। ও আপনার মাথা উলটো ঘুরিয়ে দিলেও বুঝতে পারবেন না। আপনি একে কত বেতন দেন?

প্রেমশংকর — এখানে কাউকেই বেতন দেওয়া হয় না। লাভে সকলের সমান অংশ। সারা মাসে প্রয়োজনীয় খরচের পর যা উদ্‌বৃত্ত থাকে তার শতকরা দশভাগ 'ধর্মখাতে' রাখা হয়। বাকি অংশ সকলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা হয়। গতমাসে একশো চল্লিশ টাকা আমদানি হয়েছিল। আমাকে নিয়ে এখানে সাত জন লোক কাজ করে। বিশ টাকা করে ভাগে পড়েছিল। এখন প্রচুর কমলালেবু হয়েছে, মটর শাক, আখ, কপি ইত্যাদি বেশ বিক্রি হচ্ছে। ভাগে চল্লিশ টাকার কম পড়বে না।

ডক্টর মেহরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — এতেই আপনার চলে যায়?

প্রেমশংকর — হ্যাঁ, খুব ভালোভাবেই চলে যায়। আমি এদের মতোই কাপড় ব্যবহার করি, এদের মতো খাবারই খাই, আর আমার অন্য কোনো নেশাও নেই। এখানে মাসে বিশ টাকা গরিব লোকের ওষুধের জন্য খরচ করা হয়। এই টাকা সকলের সম্মিলিত আয় থেকে আলাদা করে রাখা হয়। কারও কোনো আপত্তি হয় না। এই যে সাইকেল দেখতে পাচ্ছেন এটাও সংযুক্ত আয় থেকে কেনা। যার প্রয়োজন হয় সে এটা ব্যবহার করে। আমাকে এরা সবাই বেশি দক্ষ বলে মনে করে আর পুরোপুরি বিশ্বাস পরে। তাই আমি এদের 'মুখিয়া'। যে সব পরামর্শ দিই এরা মেনে চলে। কেউই এখানে এটা মনে করে না যে 'আমি অমুকের চাকর'। সবাই সবাইকে এখানে অংশীদার হিসাবে ভাবে আর প্রাণ ঢেলে কাজ করে। যেখানে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক সেখানে বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হয়। মালিক চায়, যত কাজ দেওয়া হবে তা করতে হবে; চাকর চায়, যত কম কাজ করা যায় তাই করব। এর মধ্যে সহৃদয়তা বা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। সত্যি কথা বলতে কী, একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষময় পরিণাম আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করছি। মোটা ও রোগা লোকের পৃথক পৃথক শিবির তৈরি হয়েছে আর তাদের মধ্যে চলছে ঘোর সংগ্রাম। সময়ের বিচারে দেখা যাচ্ছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন এর জায়গা নেবে সমবায়। আমারা অন্যান্য দেশে এই আত্মঘাতী সংগ্রামের পরিণাম লক্ষ করেছি; এ জাতীয় কলহে আমাদের ঘৃণা জন্মে গেছে। সমবায়ই পারে এই সংকট থেকে আমাদের মুক্ত করতে।

ডক্টর — আচ্ছা, বলুন তো আপনি কি 'সোশ্যালিস্ট'?

প্রেমশংকর — না মশাই, আমি 'সোশ্যালিস্ট' কিংবা 'ডেমোক্র্যাট' কোনোটাই নই। আমি শুধু ন্যায় ও ধর্মের দীন সেবক। আমার কাছে নিঃস্বার্থ সেবা বিদ্যার চেয়ে বড়ো। আত্মিক কিংবা মানসিক শক্তির কথা বলুন, সম্পদ কিংবা বৈভবের কথা বলুন, আমি এদের কারও গোলামে পরিণত হতে চাই না। বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার উপর আমার বিশ্বাস নেই। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মিক উন্নতি আর আত্মিক উন্নতির প্রকাশ হল উদারতা, ত্যাগ, সদিচ্ছা, সহানুভূতি, ন্যায়পরতা ও দয়াশীলতা। যে শিক্ষা দুর্বলের উপর অত্যাচার শেখায়, যে শিক্ষা আমাদের জমি ও বিত্তের ভৃত্যে পরিণত করে, যে শিক্ষা মানুষকে ভোগবিলাসে মত্ত রাখে, যে শিক্ষা অপরের রক্ত চুষে মোটা হতে শেখায়, সে শিক্ষা শিক্ষা নয়। যদি কোনো মূর্খ ব্যক্তি লোভ, মোহ ইত্যাদির প্রভাবে পড়ে যায় তবে তা ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু বিদ্যা ও সভ্যতার পূজারিদের স্বার্থান্ধতা অত্যন্ত লজ্জাজনক। মানুষ এখন বিদ্যা ও বুদ্ধিকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করার রাস্তায় পরিণত করেছে। বাস্তবে কিন্তু সেবা ও প্রেমের সোপান

বেয়েই সেখানে আরোহণ করতে হয়। কী অদ্ভুত অবস্থা! যিনি এখন যত বেশি বিদ্বান, তিনি তত বেশি স্বার্থান্বেষী। আমাদের সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি, আমাদের সমস্ত উৎসাহ-উদ্যম ধনলিপ্সা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের অধ্যাপকরা যদি এক হাজার টাকার কম বেতন পান তাহলে তাঁরা মুখ ভার করে রাখেন, আমাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ মাসে দুহাজার টাকা আয় করেও হা-হুতাশ বন্ধ করেন না, আমাদের ডাক্তারবাবুরা চান, রোগী বাঁচুক মরুক তাঁদের 'ফিজ' পেতে যেন কোনো বাধা না হয়, আর আমাদের উকিলবাবুরা (ক্ষমা করবেন) ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করেন যাতে ঈর্ষাদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় আর তাঁরা সোনার দেওয়াল তুলতে পারেন। 'সময় সম্পদ' — আমরা এই বাক্যটিকে ঈশ্বরীয় বলে ধরে নিয়েছি। এই মহান পুরুষদের প্রত্যেকে শত-সহস্র-লক্ষ লোকের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছেন আর তবুও তাঁরা দেশপ্রেমিক হতে ব্যস্ত। এঁরাই স্বজাতিপ্রেমের ডঙ্কাধ্বনি করে বেড়ান। উৎপাদনের দায় অন্যের, ঘাম ঝরাবে অন্য লোক, আর গোঁফে তা দিয়ে ভোগ করার অধিকার ওঁদের। আমার মনে হয়, সমস্ত শিক্ষিত সমাজ শুধু অকর্মণ্যই নয়, অনাচারীও।

ডক্টর সাহেব খুব ধৈর্যের সঙ্গে বললেন — তা হলে আপনি কি চাইছেন আমরা সবাই মজুরের বৃত্তি গ্রহণ করি?

প্রেমশংকর — আজ্ঞে না। যদি তাই হত তা হলে বোধ হয় সমস্ত মনুষ্যজাতিরই উপকার হত। আমার যা আপত্তি তা হল এই অবস্থার জন্য, এই অন্যায় প্রভেদের জন্য। একজন মজুর যদি পাঁচ টাকায় চালাতে পারে, তবে মানসিক শ্রম যাঁরা করেন তাদের এর থেকে দ্বিগুণ বা তিন গুণ আয় যথেষ্ট হওয়া উচিত, আর এই বেশিটুকু এইজন্য যে, তাঁদের একটু ভালো খাওয়া, একটু ভালো পোশাক একটু বেশি সুখসুবিধা দরকার। কিন্তু পাঁচ টাকা আর পাঁচ হাজার টাকা, কিংবা পঞ্চাশ টাকা আর পঞ্চাশ হাজার টাকা? এই অস্বাভাবিক প্রভেদ কেন? এখানেই শেষ নয়। আমাদের সমাজ পাঁচ টাকা আর পাঁচ লাখ টাকার প্রভেদকেও অন্যায় বলে না, বরং তার আরও প্রশংসা করে। প্রশাসন, আইনব্যাবসা, চিকিৎসা, চিত্রকর্ম, শিক্ষা, দালালি, ব্যাবসা, সংগীত এবং এরকম আরও অনেক বৃত্তি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এঁরা কেউই নিজেরা ধনোপার্জনে নিযুক্ত নয়, এঁরা অন্যের শ্রমের উপর টিকে থাকে। আমি এটা বুঝতে পারি না যে, কী করে মানুষের শ্রম, মানুষের উদ্যোগ যা সম্পদ সৃষ্টি করে যার উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তা, যাঁরা শুধু মানসিক শ্রম করেন, যাদের প্রধান উদ্দেশ্য বেশি বেশি অর্থোপার্জন করা, তাঁদের কাজ থেকে ছোটো কাজ হয়ে যায়। আজ যদি দেশের সমস্ত উকিল দেশ ছেড়ে চলে যায়, যদি সমস্ত মালিকশ্রেণী লুপ্ত হয়ে যায়, যদি সমস্ত দালাল স্বর্গলাভ করে, তাহলেও সংসার চলবে বরং আরও ভালোভাবেই চলবে। কৃষক জমি চাষ করবে; তাঁতি তাঁত বুনবে; ছুতোর, কামার, রাজমিস্ত্রি, মুচি সবাই আগের মতোই যার যার কাজ করতে থাকবে। তাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু কৃষাণ যদি না থাকে তবে সারা সংসার ক্ষুধায় যন্ত্রনায় কাতর হয়ে পড়বে। অথচ এই কৃষাণের পাঁচ টাকা মজুরি অনেক বেশি বলে ধরা হচ্ছে আর উকিল ডাক্তারদের পাঁচ হাজারও বেশি নয়!

ডক্টর — অর্থশাস্ত্রে শ্রম বিভাজন (division of labour) বলে যে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার রয়েছে তা আপনি ভুলে যাচ্ছেন। প্রকৃতির নিয়মেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ঘটেছে আর শক্তির বিকাশের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রয়োজন রয়েছে।

প্রেমশংকর — আমি তো একথা বলিনি যে প্রত্যেক মানুষকে মজুর-বৃত্তি করতে বাধ্য করা হোক। ভগবান যাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তিনি শাস্ত্রবিচার নিয়ে থাকুন, যিনি ভাবুক তিনি কাব্য রচনা করুন, যিনি অন্যায়কে ঘৃণা করেন তিনি আইনব্যাবসা নিয়ে থাকুন। আমার শুধু কথা হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন কাজে মানুষের আয়ের এই অসমতা থাকা উচিত নয়। মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যে এই পার্থক্য ন্যায়বহির্ভূত ব্যাপার। অত্যাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় কাজ, আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় কাজের উপর প্রাধান্য পাবে — এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। কিছু কিছু শিক্ষিত লোক এই মত পোষণ করেন যে, এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে গুণীদের অনাদর হবে এবং সংসার তাঁদের বিচারশীলতা ও সৎকর্মের সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বড়ো বড়ো পণ্ডিত, বড়ো বড়ো কবি, বড়ো বড়ো আবিষ্কারক, বড়ো বড়ো শিক্ষক সম্পদ ও প্রভুত্বের লোভ থেকে মুক্ত ছিলেন। আমাদের অস্বাভাবিক জীবনের এটাও এক কুফল যে, আমরা গায়ের জোরে কবি ও শিক্ষক বনে যাচ্ছি। পৃথিবীতে আজ অগণিত লেখক, উকিল ও শিক্ষক রয়েছেন। এঁরা সবাই পৃথিবীর উপর ভারস্বরূপ হয়ে রয়েছেন। যখন এদের হুঁশ হবে যে, এই সব 'দিব্য কলায়' কোনো লাভ নেই তখন শুধু তাঁরাই কবি হবেন যাঁরা কবি হবার যোগ্য। সংক্ষেপে আমি এটাই বলতে চাইছি যে, সম্পদের প্রাধান্য আমাদের সমাজকে একেবারে ওলট-পালট করে দিয়েছে।

ডক্টর মেহরা অধীর হয়ে পড়েছিলেন। বললেন — মশাই, সমাজব্যবস্থার এই রূপ দেবলোকের পক্ষে উপযুক্ত হলেও পার্থিব জগতের পক্ষে অচল।

প্রেমশংকর — কেবল এই জন্যই বিত্তশালী, জমিদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব এখনও টিকে রয়েছে। তবে এর আগেও এই প্রভুত্বে কয়েক বার আঘাত লেগেছে এবং লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে এই প্রভুত্বের পরাভব ঘটবে। এই পরাভব চূড়ান্ত রূপ নেবে। সমাজের চক্র সাম্য থেকে শুরু করে আবার সাম্যে পৌঁছেই থামবে। একাধিপত্য, বিত্তশালীদের প্রভুত্ব ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য এই চক্রের মধ্যবর্তী অবস্থা। বর্তমান চক্র তার মধ্যবর্তী অবস্থা পার হয়ে তার অন্তিম অবস্থার কাছাকাছি এসেছে বলা চলে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি অধিকারবোধ ও প্রভুত্বের মাদকতায় এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, আমরা অগ্রপশ্চাৎ কিছুই বিবেচনা করছি না। চারিদিক থেকে গণমানুষের কলরোল আমাদের কানে ভেসে আসছে, কিন্তু আমরা এতই নিশ্চিন্ত হয়ে আছি যে, এই নির্ঘোষকে সাধারণ মেঘের গর্জন বলে ধরছি। আমরা এখনও পর্যন্ত সেই সব বিদ্যা ও বৃত্তিতে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছি যে সব বিদ্যা ও বৃত্তির ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অপরের শ্রমের উপর। আমাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, আমাদের উকিলদের দপ্তরে পা রাখার জায়গা হয় না, গলিতে গলিতে ফটোর স্টুডিয়ো খুলছে, ডাক্তারের সংখ্যা রোগীর সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, তবু আমাদের চোখ খুলছে না। এই অস্বাভিক জীবন থেকে, সভ্যতার এই জাল থেকে বেরিয়ে আসার কোনো চেষ্টা আমরা করছি না। শহরে আমরা কারখানা খুলে বেড়াচ্ছি যাতে করে শ্রমিকের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে আমরা আরও ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারি। শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ ভাগ লাভের কল্পনায় আমরা আনন্দে ডগমগ করছি, কিন্তু এটা কখনও আমাদের চোখে পড়ছে না যে, শিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁত চালাচ্ছে কিংবা চাষ আবাদ করছে। যদি দুর্ভাগ্যবশত কাউকে এসব করতে হয় তবে তাকে আমরা উপহাস করি। আমরা তাকেই সম্মান প্রদর্শনের যোগ্য বিবেচনা করি যে

গদির উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে থাকে, যাকে হাত-পা নাড়াতে হয় না, কেবল আদায়-পত্র আর সুদ-বাট্টার হিসাবে অসংখ্য লোককে জেরবার করে...।

এসব কথা চলছে এমন সময় দুর্গা মালি একটা ধামায় করে কমলালেবু, ফুলকপি, পেয়ারা, মটরশাক ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে এসে ডক্টর সাহেবের সামনে রাখল। দুর্গার চেহারায় একটা গর্বের ভাব ফুটে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল, তার অন্তরাত্মা জেগে উঠছে। সে ডক্টর সাহেবের সামনে একটা মোড়ার উপর বসে বলল — হুজুরের যে যে কলম দরকার সেগুলোর নাম একটা কাগজে লিখে বাবুজির কাছে দিয়ে যাবেন। আমি কাল আপনার বাড়ি পৌঁছে দেব। আপনার ছেলেপুলেরা ভালো আছে তো?

ডক্টর সাহেব একটু সংকোচের সঙ্গে বললেন — হাঁ, ছেলেরা ভালোই আছে। তুমি এখানে ভালো আছ তো?

দুর্গা — আজ্ঞে, হ্যাঁ। আপনার দয়ায় খুব আরামেই আছি।

ডক্টর সাহেব উঠে রওনা দিলেন। প্রেমশংকর তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য গেট পর্যন্ত গেলেন। ডক্টর সাহেব গাড়িতে উঠে মুচকি হেসে প্রেমশংকরকে বললেন — আমি কিন্তু আপনার নীতি মেনে নিতে পারলাম না। তবে আপনি যে একটা পশুকে মানুষে পরিণত করেছেন তাতে কোনো ভুল নেই। এটা আপনার সৎসঙ্গের ফল। তবে, ক্ষমা করবেন, আমি আবার বলছি, আপনি এর থেকে সাবধানে থাকবেন। 'ইউজেনিক্স' (সুপ্রজনন শাস্ত্র) আজ পর্যন্ত এমন কোনো আবিষ্কার করতে পারেনি যার দ্বারা মানুষ তার আজন্ম সংস্কার ভুলে যাবে।

(পশু সে মনুষ্য/১৯২০) অনুবাদ অমলকুমার রায়

ভগবানের সং

স্ত্রী

আমি যথার্থই অভাগিনী, তা না হলে কেন আমাকে রোজ রোজ এমন ঘৃণিত দৃশ্য দেখতে হবে! দুঃখের কথা হল, আমাকে যে শুধু দেখতে হয় তাই নয়, দুর্ভাগ্যবশত এসব ঘটনা আমার জীবনের প্রধান অঙ্গ হয়ে পড়েছে। আমি হলাম এমন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কন্যা যাঁর বিধান ধর্মের প্রধান প্রধান আর গভীর সব বিষয়ে সকলের উপর মান্য করা হয়। মনে হয় না আমাদের বাড়িতে কেউ কোনোদিন বিনা স্নানে কিংবা ঠাকুরের পুজো না করে এক ফোঁটা জল মুখে দিয়েছে। আমার মনে আছে একবার আমাকে কঠিন জ্বরের জন্য স্নানটান না করেই ওষুধ খেতে হয়। এর জন্য আমাকে মাসাবধি অনুশোচনা ভোগ করতে হয়েছিল। আমার ঘরে ধোপা ঢুকতে পারত না, চামারনি বারান্দাতে পর্যন্ত বসতে পারত না। কিন্তু এখানে এসে আমার মনে হয় আমি এক পাপলোকে হাজির হয়েছি। আমার স্বামী বড়ো দয়ালু, খুবই চরিত্রবান ও অত্যন্ত সুযোগ্য পুরুষ। তাঁর এসব সদ্‌গুণ দেখে আমার বাবা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কী করে জানবেন এখানকার সবাই অঘোরপন্থী। সন্ধ্যা-পূজা তো দূরের কথা, কেউ নিয়মিত স্নানও করে না। বৈঠকখানায় সব সময় মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি সব জাতের লোক আসাযাওয়া করে আর আমার স্বামী সেখানে বসেই জল-দুধ-চা সব খান। শুধু তাই নয়, তিনি সেখানে বসেই মিষ্টিও খেয়ে নেন। এই গত কালের কথা, আমি তাঁকে লেমোনেড খেতে দেখেছি। চামার যে সইস সেও সেলাম ঠুকে ঘরে চলে আসছে। শুনছি, তিনি তাঁর মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতেও যান। এই ভ্রষ্টাচার আর দেখতে পারি না। আমার মন ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে আছে। যখন তিনি হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে তাঁর পাশে বসিয়ে দেন তখন আমার মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হলে আমি তার ভিতর প্রবেশ করতাম। হায়, হিন্দু জাতি! তুমি আমাদের স্ত্রীদের পুরুষের দাসী বানিয়ে দেওয়াটাই আমাদের জীবনের পরম কর্তব্য বলে ঠিক করে দিলে! আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের ন্যায়নীতি, এমন কী, আমাদের ধর্মের পর্যন্ত কোনো মূল্য থাকল না।

এখন আর আমার ধৈর্য নেই! এখন আমি এই অবস্থার শেষ করে দিতে চাই। আমি এই আসুরিক পাপের জাল থেকে বেরিয়ে আসব। আমি আমার বাবার আশ্রয়ে ফিরে যাব বলে চিন্তা করছি। আজ এখানে সম্মিলিত ভোজ চলছে; আমার স্বামী যে শুধু এর সঙ্গে যুক্ত তাই নয়, তিনি এর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও। তাঁরই উৎসাহ ও প্রেরণার জন্যই এমন ধর্মীয় অত্যাচার চলছে। সমস্ত জাতির লোক এক সঙ্গে বসে ভোজন করছে। শুনছি, মুসলমানরাও এক পঙক্তিতে বসেছে। আকাশ ভেঙে পড়ছে

না কেন? ভগবান কি ধর্ম রক্ষার্থে অবতার হয়ে অবতীর্ণ হবেন না? ব্রাহ্মণরা নিজের বন্ধু ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণের হাতের রান্নাও গ্রহণ করেন না। সেই মহান জাতির আজ এই অধোগতি হয়েছে যে কায়স্থ, বানিয়া, মুসলমান কারও সঙ্গে বসে খেতে তার লেশমাত্র সংকোচ হচ্ছে না, বরঞ্চ এ ব্যবস্থাকে জাতীয় গৌরব, জাতীয় একতার হেতু বলে মনে করছে।

পুরুষ

কবে সেই শুভ দিনের আবির্ভাব হবে যেদিন এই দেশের নারীর মধ্যে জ্ঞানের উদয় হবে আর তারা রাষ্ট্রগঠনের কাজে পুরুষদের সহায়তা করবে? আমরা কত দিন আর ব্রাহ্মণদের গোলোকধাঁধায় ঘুরে মরব? আমাদের বিবাহনীতি কবে এই সত্য উপলব্ধি করবে যে, স্ত্রী ও পুরুষের মতের সাযুজ্য ও সমতা গোত্র ও বর্ণের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি তা জানা থাকত তাহলে আমিও বৃন্দার স্বামী হতাম না আর বৃন্দাও আমার স্ত্রী হত না। আমাদের দুজনের চিন্তায় আকাশপাতাল ফারাক। যদিও সে মুখে কিছু বলে না, তবু আমার বিশ্বাস, সে আমার মতামতকে ঘৃণার চোখেই দেখে। আমার মনে হয় যে, সে আমাকে স্পর্শ করতে পর্যন্ত চায় না। এটা তার দোষ নয়; এ দোষ আমাদের মা-বাবার, যাঁরা আমাদের দুজনের উপরই ঘোর অবিচার করেছেন।

বৃন্দা কাল মুখ খুলেছিল। আমার কয়েকজন বন্ধু সম্মিলিত ভোজের প্রস্তাব করলে আমি সানন্দে সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলাম। কয়েকদিন বাদানুবাদের পর গতকাল কয়েকজন ভদ্রলোক ভোজের ব্যবস্থা করলেন। আমি ছাড়া আর মাত্র চার জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, বাকি সব অন্য জাতের লোক। এই উদারতা বৃন্দার কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। যখন আমি খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরলাম তখন সে এতটা অস্থির হয়ে পড়েছিল যে, মনে হয়েছিল আঘাত তার মর্মস্থলে গিয়ে লেগেছে। আমার দিকে বিষাদময় চোখে চেয়ে সে বলল — এখন তো তাহলে স্বর্গের দ্বার অবশ্যই খুলে গিয়ে থাকবে!

এই কঠোর বাক্য আমার মুকে গিয়ে তিরের মত বিঁধল। বিরক্ত হয়ে বললাম — স্বর্গ-নরকের চিন্তা নিয়ে তারাই থাকে যারা পঙ্গু, কর্তব্যহীন, নির্জীব। আমাদের স্বর্গ-নরক সব এই পৃথিবীতেই। আমি এই কর্মক্ষেত্রে কিছু করে যেতে চাই।

বৃন্দা — ধন্য আপনার পৌরুষ আর সামর্থ্য। পৃথিবী এখন সুখ আর শান্তির রাজত্ব হয়ে যাবে। আপনিই পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন। এর থেকে বেশি আর কী কল্যাণ আশা করা যায়!

আমি রাগতভাবে বললাম — যখন ভগবান তোমাকে এসব ব্যাপার বোঝবার মতো বুদ্ধিই দেননি, তখন আমি আর কী বোঝাব? জাতপাতের এই বিভেদভাব থেকে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হচ্ছে তার কথা তো অত্যন্ত মোটা বুদ্ধির লোকও বুঝতে পারে। এসব বিভেদ দূর করতে পারলে যে দেশের কল্যাণ হয়, এতে কারও সন্দেহ নেই। তবে, হ্যাঁ, যে জেনেশুনে না জানার ভান করে তার কথা আলাদা।

বৃন্দা — একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া না করলেই কি ভালোবাসা জন্মায় না?

এই বিবাদে জড়ানো আমি সঠিক মনে করলাম না। এমন নীতি গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় মনে হল যাতে কোনো রকমেরই বিবাদের স্থান না থাকে। ধর্মের উপর বৃন্দার খুব শ্রদ্ধা। আমি তাকে তার

শাস্ত্র দিয়েই পরাজিত করব বলেই স্থির করে ফেললাম। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললাম — যদি অসম্ভব নাও হয়, কঠিন তো বটেই। কিন্তু ভেবে দেখ তো, এটা কি ঘোর অন্যায় নয় যে, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান হয়েও একে অন্যকে ঘৃণা করছি, উচ্চনীচ ভেদাভেদ নিয়ে মেতে আছি। এই জগৎসংসার সেই পরম পিতার বিরাট প্রকাশ। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই সেই পরমাত্মার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই পার্থিব ব্যবধানই কেবল আমাদের এক জনের কাছ থেকে আর এক জনকে পৃথক করে রেখেছে। বাস্তবে আমরা সবাই এক। যেমন সূর্যের আলো ভিন্ন ভিন্ন গৃহে প্রবেশ করলেই ভিন্ন হয়ে যায় না, সেই রকম ঈশ্বরের মহান আত্মা পৃথক পৃথক জীবে প্রকাশ করেও পৃথক পৃথক হয়ে যায় না...

আমার এই জ্ঞান বর্ষণ বৃন্দার শুষ্ক হৃদয়কে তুষ্ট করল। সে তন্ময় হয়ে আমার কথা শুনছিল। যখন আমি থামলাম তখন সে আমার দিকে ভক্তিভরা চোখে চেয়ে কাঁদতে লাগল।

স্ত্রী

স্বামীর জ্ঞানোপদেশ আমাকে সজাগ করে দিয়েছিল। আমি অন্ধকার কূপে ডুবে ছিলাম। এই উপদেশ আমাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে এক পর্বতের জ্যোতির্ময় শিখরে বসিয়ে দিল। আমার কৌলীন্যের জন্যে, মিথ্যা অভিমানের বশে, আমার উচ্চবর্ণের পবিত্রতার অহংকারে কত লোককেই না আমি অনাদর করেছি! পরমপিতা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এই অজ্ঞানতার জন্য আমি আমার পূজনীয় স্বামীকে অশ্রদ্ধা করেছি, তাঁকে কঠোর বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছি — আমার এসব অপরাধ ক্ষমা করো।

যখন থেকে এই অমৃতবাণী আমি শ্রবণ করেছি আমার হৃদয় অত্যন্ত কোমল হয়ে গিয়েছে। নানা প্রকার সৎ কল্পনা আমার মনে উদয় হচ্ছে। ধোপানি কাল কাপড় নিয়ে এসেছিল, তার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমি তাকে এই অবস্থায় আগে দেখলে কদাচিৎ মৌখিক সমবেদনা দেখাতাম কিংবা ঝিকে বলে দিতাম তাকে একটু তেল দেবার জন্যে। কিন্তু কাল আমার বন ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, সে যেন আমারই বোন। তাকে আমার পাশে বসিয়ে নিয়ে আমি তার মাথায় ঘন্টা খানেক তেল মালিশ করলাম। সে সময় আমি যে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার মন কোনো এক প্রবল শক্তির বশীভূত হয়ে কেবল তারই দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আমার ননদ এসে আমার এই ব্যবহার দেখে একটু বাঁকা মন্তব্যও করল, কিন্তু আমি তাতে লেশমাত্রও ঘাবড়ালাম না। আজ সকালে অত্যন্ত ঠান্ডা পড়েছিল। হাত-পা সব জমে যাচ্ছিল। ঝি কাজ করতে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। আমি একটা চাদর গায়ে দিয়ে মালসাতে আগুন পোয়াচ্ছিলাম। তবু চাদরের ভিতর থেকে বাইরে মুখ বের করতে পারছিলাম না। ঝি-র অবস্থা দেখে আমার অত্যন্ত দুঃখ হল। আপন স্বার্থচিন্তায় লজ্জা হল। ঝি আর আমার মধ্যে কীসের প্রভেদ! তার আত্মাতেও সেই একই জ্যোতির প্রকাশ। কেন এই অন্যায়? মায়া আমাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে বলেই কী? অন্য আর কিছু চিন্তা করার সাহস আমার হল না। আমি উঠে আমার তুষের চাদর ঝি-র গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তার হাত ধরে তাকে আগুনের মালসার পাশে বসিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার রেজাই খুলে রেখে ঝি-র সঙ্গে বসে বাসন মাজতে শুরু করে দিলাম। সেই সরলহৃদয় মেয়ে আমাকে বারবার সেখান থেকে উঠিয়ে দিতে চাইছিল। আমার ননদ এসে আমাকে

কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল, ভাবটা এমন যেন আমি মজা করছিলাম। সারা বাড়িতে হইচই পড়ে গেল, আর তা কি না এই সাধারণ ব্যাপার নিয়ে! আমাদের চোখের উপর কত পুরু আবরণ পড়ে গিয়েছে, আমরা পরমাত্মার কী অপমানই না করছি!

পুরুষ

মধ্যপন্থা গ্রহণ করা কখনও নারীপ্রকৃতির ধর্ম নয়। নারী সব সময় চরম পন্থাই নিয়ে থাকে। যে বৃন্দা তার কৌলীন্য আর কুলমর্যাদার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, সেই এখন সাম্য আর সহৃদয়তার মূর্ত বিগ্রহ। আমার এই সামান্য উপদেশের এই আশ্চর্য ফল! এখন আমিও আমার ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করতে সমর্থ। বৃন্দা যে এখন নীচ জাতির স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বসেছে, হাসছে ও কথা বলছে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তাদের সে কিছু কিছু পড়েও শোনাচ্ছে। ভালো কথা। কিন্তু তাদের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণ হওয়া আমি একেবারেই পছন্দ করতে পারছি না। তিন দিন হল আমার কাছে এক চামার এসেছিল জমিদারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ দায়ের করতে। আমি নিঃসন্দেহ যে জমিদার তার উপর জুলুম করেছিল; কিন্তু উকিলদের কাজ তো আর বিনা পয়সায় মোকদ্দমা করা নয়! তার উপর আবার এক চামারের জন্য এক বড়ো জমিদারকে শত্রু বানানো! এভাবে তো ওকালতি চলে না। লোকটার কান্নার আওয়াজ বৃন্দার কানে গিয়েও পৌঁছল। আর যাবে কোথায়, সে নাছোড়বান্দা যাতে আমি ওই মামলা তক্ষুনি নিয়ে নিই। সে আমার সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করতেও তৈরি হয়ে গেল। আমি বাহানা করে কোনো রকমে তাকে নিরস্ত করতে চাইলাম, কিন্তু সে আমাকে ওকালতনামায় সই করিয়েই ছাড়ল। তার পরিণাম এই হল যে, পরপর তিন দিন আমার এখানে বিনাপয়সার মক্কেলের ভিড় লেগে রইল আর আমারও বেশ ক-বার বৃন্দার সঙ্গে কটু বাক্য ব্যবহার করে কথা বলতে হল। এই জন্যই প্রাচীন কালের বিধানদাতারা স্ত্রীজাতিকে ধর্মোপদেশের পাত্রী বলে মনে করতেন না। এদের মাথায় এটা আসে না যে, প্রত্যেক নীতিরই একটা ব্যবহারিক দিক রয়েছে, যা একটু ভিন্ন। আমরা সবাই জানি যে ঈশ্বর ন্যায়শীল; কিন্তু তাই বলে ন্যায়ের জন্য কে আর নিজের অবস্থা ভুলে যায়! আত্মার ব্যাপকতাকে যদি ব্যবহারিক জীবনে মেনে নেওয়া যায় তাহলে তো আজই পৃথিবীতে সাম্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু সাম্য হল দর্শনের একটা নীতিজ্ঞান, আর তা তেমনই থাকবে। ঠিক একই রকম, রাজনীতিও এক অলভ্য বস্তু, থাকবেও তাই। আমরা এই দুই নীতিকেই মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করব; তা নিয়ে আলোচনাও করব; নিজের কাজ হাসিল করার জন্যে এগুলোর সাহায্যও নেব, কিন্তু তার প্রয়োগ অসম্ভব। আমি বুঝতে পারি নি যে, বৃন্দা এই সাদামাটা কথাটাও বুঝতে পারবে না।

বৃন্দার বুদ্ধি দিন দিন উলটো হয়ে যেতে শুরু করেছে। আজ রান্নাঘরে সকলের জন্য একই রকম রান্না হয়েছে। এত দিন বাড়ির লোকের খাবার জন্য মিহি চাল রান্না করা হত, তরকারি ঘি দিয়ে তৈরি করা হত এবং তাদের জন্য ঘি-দুধের বরাদ্দও থাকত। চাকরদের জন্য মোটা চাল, মটরের ডাল আর তেল দিয়ে তরকারি রান্না হত। বড়ো বড়ো ধনী লোকের বাড়িতেও এই প্রথা চলে আসছিল। আমার চাকররা কখনও এই ব্যাপার নিয়ে কোনো অভিযোগ করেনি। কিন্তু আজ দেখছি সবার জন্যই একরকম রান্না করিয়েছে। আমি কিছু বলতে পারলাম না, কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে

গিয়েছিলাম। বৃন্দা হয়তো ভেবে থাকবে যে, খাবার ব্যাপারে ভেদাভেদ করার অর্থ চাকরদের উপর অন্যায় করা। কী রকম বাচ্চা ছেলের মতো চিন্তাভাবনা। একেবারে বুদ্ধিহীন। এই পার্থক্য বরাবর ছিল, এখনও থাকবে। আমিও জাতীয় ঐক্য চাই। সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয়তা করে করে প্রাণ দিচ্ছে, কিন্তু মজদুর ও চাকরবাকরের সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেউ স্বার্থও লোপ করছে না। আমরা তাদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাই, দীন অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করতে চাই। এই হাওয়া সারা পৃথিবী জুড়েই বইছে। তবে এসবের অন্তর্নিহিত অর্থ কি তা মনে মনে অনুভব করলেও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছে না। এসবের উদ্দেশ্য হল এই যে, এতে আমাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, আমাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, আমাদের জাতীয় আন্দোলন জোরদার হয়, আমাদের একথা বলার অধিকার জন্মায় যে, আমাদের বক্তব্য শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের নয় বরং সমস্ত জাতির সকলের কথাই এখানে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু বৃন্দাকে এই রহস্যের কথা কে বোঝাবে?

স্ত্রী

কাল আমার স্বামীদেবতা খোলাখুলি সব বললেন। এজন্য আমার মন খারাপ হয়ে আছে। হায় ভগবান! সংসারে এত জাঁকজমক, এত স্বার্থান্ধতা, আমাদের হাতে গরিবরা এত মার খায়! স্বামীর উপদেশ শুনে আমি তাঁকে দেবতুল্য ভাবতে শুরু করেছিলাম। আজ আমার জ্ঞান হয়েছে যে, যারা একই সঙ্গে দু-নৌকোয় পা রেখে চলতে পারে তাদেরকেই জাতির হিতৈষী বলা হয়।

কাল ছিল আমার ননদের বিদায়ের দিন। সে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল। এই উপলক্ষে সমাজের বেশ কয়েকজন মহিলা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা দামি দামি শাড়ি গয়না পরে কার্পেটের উপর বসে ছিলেন। আমি তাঁদের অভ্যর্থনা করছিলাম। আমি দেখলাম, দরজার কাছে যেখানে ওই মহিলাদের জুতোচটি রয়েছে সেখানে কয়েকজন স্ত্রীলোক বসে আছে। সেই বেচারারাও বিদায়যাত্রা দেখতে এসেছিল। ওরা ওখানে বসে থাকবে, এটা আমার ভালো লাগেনি। আমি ওদের এনে কার্পেটের উপর বসিয়ে দিলাম। এই নিয়ে ওই মহিলাদের মধ্যে ইশারা শুরু হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কোনো না কোনো ছুতো করে প্রত্যেকেই উঠে চলে গেলেন। আমার স্বামীকে কেউ এই সংবাদ দিলে তিনি অত্যন্ত কুপিত হয়ে বাইরে থেকে এসে চোখ লাল করে বললেন — তুমি এসব কী করছ, তুমি কি আমার মুখে কালি দিতে চাও? কাদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়, এই বুদ্ধিটুকুও কি ভগবান তোমাকে দেন নি? ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে ছোটোজাতের মেয়েছেলেদের বসিয়ে দিয়েছ? তারা মনে মনে কী ভাববে? তুমি আর আমার মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না? ছিঃ ছিঃ!

আমি সরলভাবে বললাম — এতে মহিলাদের কী অপমান হল? আত্মা তো সবারই এক। অলংকার পরলে তো আর আত্মা উন্নত হয়ে যায় না!

স্বামী ঠোঁট কামড়ে বললেন—চুপ করো তো। উলটো-পালটা কথা বলতে শুরু করেছ। ওই এক কথা। আত্মা এক, পরমাত্মা এক! কিছু জানও না, কিছু বোঝও না। সারা শহরে ঢিঢি পড়ে গিয়েছে। তারপরও আবার কথা বলছ। একবার ভেবে দেখেছ কি ওই মহিলাদের আত্মা কতটা ব্যথিত হয়েছে?

আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম।

আজ সকালে উঠেই এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম। অতিথিদের এঁটো পাতা, ভাঁড়, ঠোঙা ইত্যাদি রাত্রে মাঠে ফেলা হয়েছিল। জন পঞ্চাশেক মানুষ ওইসব এঁটো জিনিসের উপর হামলে পড়ে সেগুলো চাটছিল। হ্যাঁ, মানুষ, যে মানুষ, যে মানুষ পরমাত্মার স্ব-স্বরূপ। কতগুলো কুকুরও ওই পাতার উপর গিয়ে কামড়াকামড়ি করছিল, কিন্তু ওই মানুষগুলো কুকুরগুলোকে মেরে মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তাদের অবস্থা ছিল কুকুরগুলোর চেয়েও হীন। এই ব্যাপার দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল; আমার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। ভগবান! এরাও আমাদের ভাইবোন, আমাদের আত্মা! এদের এই শোচনীয় দীন দশা! আমি তক্ষুনি ঝিকে দিয়ে ওই মানুষগুলোকে ডেকে পাঠালাম আর যত পুরি মিষ্টি অতিথিদের জন্য রাখা হয়েছিল সব পাতায় ভাগ করে তাদের দিয়ে দিলাম। ঝি দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল। সে এই জন্যে কাঁপছিল যে, বাবু শুনলে আর তাকে আস্ত রাখবে না। আমি তাকে আশ্বাস দিলে পরে সে শান্ত হল।

ওই কাঙালরা তখনও বসে খাচ্ছে এমন সময় পতিদেবতা মুখ লাল করে এসে অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন—তুমি নেশা করনি তো? একটা না একটা উপদ্রব তো লাগিয়েই রেখেছে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা তোমার কী হয়েছে। এসব মিষ্টি হাড়ি-ডোমদের জন্যে বানানো হয়নি। এসব তৈরি করতে ঘি, চিনি, ময়দা লেগেছে আর তুমি সব নিয়ে এসে ডোমদের খাইয়ে দিলে। এখন অতিথিদের কী দেওয়া হবে? তুমি কি আমার মানমর্যাদা সব নষ্ট করবার জন্য পণ করে বসেছ?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—আপনি মিছিমিছি এত রাগ করছেন। আপনার যত মিষ্টি আমি ওদের খাইয়েছি তা আমি আনিয়ে দেব। কেউ মিষ্টি খাবে আর কেউ এঁটো পাতা চাটবে এটা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ডোমরাও তো মানুষ। এদের মধ্যেও তো সেই একই...

আমার স্বামী কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন—ছাড় এসব কথা, রাখ তোমার আত্মা। তুমি রক্ষা করলেই আত্মা রক্ষা পেয়ে যাবে? ভগবানের যদি সে ইচ্ছে থাকত যে, প্রাণীমাত্রেরই সমান সুখভোগ হবে, তাহলে সবারই এক অবস্থা করে দিতে তাঁকে কে বাধা দিয়েছিল? উচ্চনীচের ভেদাভেদ হতেই বা তিনি দিচ্ছেন কেন? যখন তাঁর আদেশ ছাড়া একটা পাতাও নড়তে পারে না, তখন এই মহান সামাজিক ব্যবস্থা তাঁর আদেশ ছাড়া কি করে ভাঙা সম্ভব? তিনি নিজে যখন সর্বব্যাপী তখন কেনই বা তিনি নিজেকে এমন ঘৃণ্য অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেছেন? যখন তুমি এসমস্ত প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারবে না তখন তো সংসারের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চলাই তোমার উচিত। এসব মাথামুন্ডুহীন কথায় হাসি অথবা নিন্দা ছাড়া আর কোনো কিছু লাভ হয় না।

আমার মনের অবস্থা কী হল তার আর বর্ণনা করে কী বোঝাব! আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হায় স্বার্থ! হায় মায়ান্ধকার! ভগবানকে আমরা সং বানিয়ে তুলেছি।

সেই মুহূর্তেই পতিশ্রদ্ধা বা পতিভক্তির ভাব আমার মন থেকে লোপ পেয়ে গেল। এই বাড়ি আমার কাছে কারাগার তুল্য। কিন্তু আমি নিরাশ হইনি। আমার বিশ্বাস, আজ হোক কিংবা কাল হোক, ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশ এখানে অবশ্যই দেখা যাবে এবং তার প্রভায় এই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।

(ব্রহ্ম কা স্বাঁগ/১৯২০) অনুবাদ অমলকুমার রায়

ঝগড়ার শেষ

জোখু ভগত আব বেচন চৌধুরিতে তিন পুরুষের শত্রুতা। এক চিলতে আল-জমি নিয়ে সামান্য ঝগড়া ছিল। তাই নিয়ে ঠাকুরদাদার আমলে খুনখারাপিও হয়ে গেছে কয়েকবার। বাপের আমলে চলেছে মামলা-মোকদ্দমা, দুপক্ষই বেশ কয়েকবার দৌড়েছে হাইকোর্ট পর্যন্ত। ছেলেদের জমানায় সেই লড়াইয়ের তীব্রতা বেড়েছে আরও বহুগুণ। পরে অবস্থা এমন হল যে দুপক্ষেরই আর লড়বার ক্ষমতা রইল না। একদিন এই দুই পরিবার ছিল বলতে গেলে সমস্ত গ্রামটারই আধাআধি বখরাদার আর আজ যে আলটুকু নিয়ে ঝগড়া তার দুপাশের খেত ছাড়া একখানি জমিও নেই কারও। জোতজমি গেছে, ধনসম্পদ গেছে, মানমর্যাদা সব গেছে, তবু বিবাদ যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হাইকোর্টের ধুরন্ধর বিচারকও এই মামুলি ঝগড়াটার নিষ্পত্তি করতে পারেননি।

দুপক্ষকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রামটাই মোটামুটি দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদলের সিদ্ধি-ভাঙ-এর আড্ডা বসে চৌধুরির ঘরের দাওয়ায়, অপর দল ভগতের ঘরের চৌহদ্দিতে দল বেঁধে দম দেয় গাঁজায়। ভাগাভাগি হয়ে গেছে মেয়েদের আর বাচ্চাদের মধ্যেও। এতদূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা যে, উভয় দলের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার বিচারেও একটা সুস্পষ্ট বিভাজন হয়ে গেছে। চৌধুরি কাপড়চোপড় পরেই ছাতু খেতে বসে যান, ভগতকে উপহাস করে বলেন লোক দেখানো ভণ্ড। ভগত কিন্তু কাপড় না ছেড়ে কিছুতেই ছোঁবেন না খাবার। চৌধুরিকে বলেন ভ্রষ্টাচারী। ভগত সনাতন ধর্মে অন্ধ বিশ্বাসী, চৌধুরি নাম লিখিয়েছেন আর্যসমাজে। এমনকী, চৌধুরি যে কাপড়ওয়ালা, সবজিওয়ালা বা মুদির কাছে সওদা করেন, সেদিকে তাকানো পর্যন্ত মহাপাপ মনে করেন ভগত। তেমনি ভগতজি যে ময়রার কাছে মিষ্টি, যে গোয়ালার কাছে দুধ ও যে তেলির কাছে তেল কেনেন, চৌধুরির কাছে তারা অস্পৃশ্য।

এমনকী, দুই পরিবারের রোগারোগ্যের প্রশ্নেও বহাল ছিল এই বিদ্বেষ-চিন্তা। ভগতজি কোবরেজি মতে বিশ্বাসী, চৌধুরির আস্থা য়ুনানি প্রক্রিয়ায়। বরং অসুখ করে মরে যাবে রোগী, তবু দুজনের কেউই গোঁ ছাড়বেন না।

দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল, তার উত্তাপ এসে লাগল এই ছোট্ট গ্রামেও। চৌধুরি আন্দোলনের পক্ষে কাজ করতে লাগলেন, ভগত রয়ে গেলেন বিপক্ষে। গ্রামে কিষান সমিতি প্রতিষ্ঠা হল, চৌধুরি ভিড়ে গেলেন তাতে। ভগত থাকলেন আলাদা। সচেতন হল মানুষ, স্বরাজ নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলতে লাগল। চৌধুরি স্বরাজবাদীদের দলে যোগ দিলেন, ভগত পক্ষ নিলেন রাজভক্তদের। চৌধুরির বাড়িটা স্বরাজবাদীদের আড্ডা হল, ভগতের বাড়িটা হল রাজভক্তদের ক্লাব।

চৌধুরি জনসাধারণের কাছে প্রচার শুরু করে দিলেন স্বরাজ সম্বন্ধে—বন্ধুগণ, স্বরাজ কথাটার অর্থ হল নিজেদের রাজত্ব। নিজের দেশে নিজের রাজত্ব, নিজের শাসন থাকবে সেটাই তো ঠিক, না কী অন্যের রাজত্ব, অন্যের শাসন?—'নিজের রাজত্ব চাই, নিজের রাজত্ব!' ধ্বনি উঠল জনতার মধ্যে থেকে।

চৌধুরি—কিন্তু স্বরাজ আসবে কী ভাবে? একে আনতে গেলে চাই আত্মবল, চাই পুরুষকার, চাই ঐক্য। পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্বদ্বেষ সবাই ভুলে যাও, নিজেদের ঝগড়া নিজেরাই মিটিয়ে নাও।

একজনের মন্তব্য—আপনি নিজেই তো রোজই ছোটেন আদালতে।

চৌধুরি—হ্যাঁ, তা ছুটি। তবে আজ থেকে আর যদি ওমুখো হই তবে যেন গোহত্যার পাপ লাগে আমার। সবাই রোজগার করে আপন আপন বউবাচ্চাদের খাওয়াও পরাও আগে, তারপর সম্ভব হলে পরোপকার করো। উকিল-মোক্তারের পকেট ভারী করে কী হবে? দারোগাকে ঘুষ দেবে কেন, আর আমলাদেরই বা তোষামোদি করতে যাবে কেন?—আগে আমাদের ছেলেরা ধর্মশিক্ষা পেত, সদাচারী, ত্যাগী, উদ্যোগী পুরুষ হয়ে গড়ে উঠত তারা। আজকাল সব ম্লেচ্ছ মাদ্রাসায় পড়তে যাচ্ছে, তারপর চাকরি করছে, ঘুষ নিচ্ছে, ফুটানি ওড়াচ্ছে। নিজের বাপ-পিতেমো, ঠাকুর-দেবতাদের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছে, মুখে কালি মাখাচ্ছে। সিগারেট টানছে, বাহার করে চুল ছাঁটছে, আর সায়েবসুবোদের তোষামোদ করছে। এই সমস্ত ছেলেপুলেদের ধর্মপথে শিক্ষা দেওয়া কি আমাদের কর্তব্য নয়?

জনতা—চাঁদা তুলে একটা পাঠশালা চালু করা হোক।

চৌধুরি—আগে আমরা মদ স্পর্শ করাও পাপ মনে করতাম। আর এখন গাঁয়ে গাঁয়ে, অলিতেগলিতে, মদের দোকান ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা কোটি কোটি টাকা আমরা মদে-গাঁজায় উড়িয়ে দিচ্ছি।

জনতা—মদ-গাঁজা যার ছোঁবে তাদের জরিমানা করা উচিত।

চৌধুরি—আমাদের বাপঠাকুরদা চিরটাকাল ঘরে-বোনা মোটা খদ্দর পরে এসেছেন। আমার ঠাকুরমা নিজে হাতে চরকা কাটতেন। দেশের টাকা দেশেই থাকত। আমাদের তাঁতি ভাইয়েরা খেয়েপরে বাঁচত। আজকাল আমরা রঙদার বিলিতি কাপড়ের জন্য মাথা খুঁড়ে মরছি। এই ভাবে বিদেশিরা আমাদের সমস্ত সম্পদ লুটে নিচ্ছে। হতভাগ্য তাঁতিরা দিনকে দিন আরও গরিব হয়ে পড়ছে। আমরা কি নিজের ভাইয়ের ভাতের থালা কেড়ে নিয়ে বিদেশিদের বিলিয়ে দেব? এটাই কি আমাদের ধর্ম?

জনতা—ঘরে-কাটা খদ্দর আর চোখে পড়ে না আজকাল।

চৌধুরি—ঘরে ঘরে চরকা কেটে খদ্দর বুনে পরো সবাই। আদালত বর্জন করো, নেশা-ভাঙ কর়া ছেড়ে দাও, ছেলেপিলেদের ধর্মশিক্ষা দাও, পরস্পর মিলেমিশে থাকো সবাই। এই তো স্বরাজ। যারা বলে স্বরাজ আনতে রক্তের নদী বহাতে হবে তারা পাগল। ওদের কথায় কান দিয়ো না।

জনতা এই সমস্ত কথা খুব মন দিয়ে শুনত। দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকলে শ্রোতার সংখ্যা। চৌধুরিকে শ্রধা করতে লাগল সবাই।

ওদিকে ভগত ছড়িয়ে চলল রাজভক্তির উপদেশ—ভাইসব, রাজার কাজ রাজত্ব করা আর প্রজার কাজ রাজার আজ্ঞা পালন করা। একেই বলে রাজভক্তি। আমাদের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিতে

এই কথাই বলা হয়েছে। রাজা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। কাজেই তাঁর আজ্ঞার বিরোধী হওয়া মানে মহাপাতক হওয়া। রাজদ্রোহীদের স্থান হয় নরকে।

একজন বলে উঠল—কিন্তু রাজারও তো উচিত নিজের ধর্ম ঠিকমতো পালন করা।

আরেকজন—আমাদের রাজা তো নামমাত্র, আসল রাজ হচ্ছে বিলেতের বানিয়া মহাজনেরা।

তৃতীয়জনের মন্তব্য—বানিয়া জানে শুধু টাকা কামাতে! রাজত্বের কী বোঝে ওরা?

ভগত—লোকে তোমাদের বোঝাচ্ছে যে আদালতে যেয়ো না, সব ঝগড়া-বিবাদ ফয়সালা কর পঞ্চায়েতে গিয়ে। কিন্তু এমন মোড়ল কোথায় আছে যে ন্যায় বিচার করে, দুধ থেকে জলকে আলাদা করে দিতে পারে? ওখানে কাজ হয় মুখ চিনে। যার খুঁটির জোর আছে সেই জেতে। যার জোর নেই সে বরাবরই হারে। কিন্তু আদালতে সবকিছুই চলে আইন মোতাবেক। সেখানে ছোটোবড়ো সবাই সমান, বাঘ-ছাগলকে একই ঘাটে জল খেতে হয়।

একজন আশঙ্কা প্রকাশ করল—আদালতের ন্যায়বিচার মুখেই। যার প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, টাকা আছে, প্যাঁচানো বুদ্ধিতে ওস্তাদ উকিল আছে, সেই জেতে। সত্যিমিথ্যের বিচার কেউ করেন না। তবে হ্যাঁ, হয়রানিটা ঠিকই হয়!

ভগত—বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু গরিব মানুষের পক্ষে এ হবে চরম অন্যায়। বাজারে আমি যে জিনিসটা ভালো আর সস্তা পাব সেটাই নেব, তা সে স্বদেশি বিদেশি যাই হোক না কেন! আমাদের পয়সা তো আর উড়ে আসে না যে মুঠো মুঠো খয়রাত করব আজেবাজে স্বদেশি জিনিসের পেছনে!

একজন—কিন্তু পয়সা তো নিজের দেশেই থেকে যাচ্ছে। অন্যের হাতে তো আর যাচ্ছে না!

অন্যজন—নিজের বাড়িতে ভালোমন্দ খেতে পাই না বলে বেজাতের কাছে পাত পাড়তে হবে নাকি?

ভগত—তোমাদের শেখানো হচ্ছে ছেলেপুলেদের সরকারি মাদ্রাসায় পাঠিয়ো না। সরকারি মাদ্রাসায় না পড়লে আমাদের ভাইরা বড়ো বড়ো চাকরি পাবে কী ভাবে? বড়ো বড়ো কারখানা চালাতে শিখবে কী ভাবে? এই জগতে নতুন নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করতে না পারলে চলা শক্ত, পুরনো বিদ্যেতে শুধুমাত্র পাঁজি দেখা আর পুজোপাঠ ছাড়া আর কোন কাজটা হয় শুনি? ওদের দিয়ে আবার রাজকাজ হবে?

জনৈক—রাজকাজে প্রয়োজন নেই আমাদের। চাষাবাদ নিয়ে বেশ আছি আমরা, কারও গোলাম তো আর নই!

অন্যজন—যে বিদ্যা অহংকারী করে, তার চাইতে মূর্খতা ঢের ভালো। নতুন কেতার বিদ্যা শিখে সুট-বুট, ঘড়ি-ছড়ি, হ্যাট-কোট পরে বেড়াচ্ছে, শখ মেটাবার নামে নিজের দেশের ধনদৌলত সব তুলে দিচ্ছে বিদেশি বানিয়াদের পকেটে। ওরা সব দেশদ্রোহী।

ভগত—আজকাল লোকে গাঁজা-মদের প্রতি নজর রাখছে। নেশা যে কত ক্ষতিকারক তা সবাই জানে। অথচ নেশার জিনিসের দোকানগুলো থেকে সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব পায়। —মদের দোকানে না গিয়ে যদি লোকের নেশার অভ্যাস চলে যায় তবে তো তা ভালোই।—কিন্তু মতি কি অত সহজে পালটায়? দোকানে না গেলেও তারা দু-চারগুণ বেশি দাম দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে নেশা করবেই। সাজা দাও, তবু পরোয়া নেই, নেশা ছাড়বে না।—তাহলে এমন কাজ কেন

করব যাতে সরকারেরও লোকসান হয়, আবার গরিব প্রজাদেরও ক্ষতি হয়? তাছাড়া কারও কারও ক্ষেত্রে নেশাটা যথেষ্ট দরকারিও বটে। আমি তো আফিম না খেয়ে একটা দিনও থাকতে পারি না। গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়, দম আটকে আসে, একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়।

একজন বলে উঠল—তাছাড়া মাল টানলে শরীরে ফূর্তিও আসে।

সরকার অধর্ম করে পয়সা কামাচ্ছে, এটা ভালো কথা নয় মোটেই। এমনতরো অধর্ম চলতে থাকলে সে রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণ হতে পারে কখনো?—আশঙ্কা প্রকাশ করল একজন।

প্রথমে মদ খাইয়ে খাইয়ে মাথাটা বিগড়ে দিচ্ছে। নেশা একবার ধরে গেলে তখন প্রয়োজন হয় অর্থের। কিন্তু এত পয়সা আর কজন কামায় যাতে বউ-বাচ্চাকে খাইয়ে-পরিয়েও নেশা ভাঙ করার পয়সা হাতে থাকে? তখন হয় ছেলেপিলেকে শুকিয়ে মারো, আর নয়তো চুরি করো।—এই মদের দোকানগুলোই হচ্ছে গোলামি ছড়ানোর আখড়া।

জনতা ক্রমেই পাতলা হচ্ছে। চৌধুরির উপদেশ শুনতে যাচ্ছে সব। সেখানে তিলধারণের ঠাঁই নেই। দিনেদিনে চৌধুরির যশ দারুণ বেড়ে গেছে। ওর ওখানে পঞ্চায়েত, দেশের উন্নতি এসব নিয়ে কথা হয় রোজই। লোকের খুব ভালো লাগে সে সব আলোচনা। ওদের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশ বাড়ছে। ওরা উপলব্ধি করতে শিখেছে নিজেদের গৌরব, নিজেদের আত্মমর্যাদা। নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে উঠেছে। স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রমশ ধূমায়িত হচ্ছে পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ। স্বাধীনতার স্বাদ পেল ওরা। ঘরের তুলো, ঘরের সুতো, ঘরের কাপড়, ঘরের খাওয়া, ঘরের আদালত। না আছে পুলিশের ভয়, না আছে আদালতের তোষামোদ—সুখ আর শান্তিতে ভরপুর জীবন। বহুলোকে নেশা করা ছেড়ে দিল, মিলেমিশে জীবনযাপন করতে লাগল সৎভাবে।

কিন্তু ভগতের ভাগ্য ততখানি সুপ্রসন্ন ছিল না। তাঁর রাজভক্তির বক্তৃতায় ক্রমশ অরুচি ধরে গেল জনসাধারণের। এমন হল যে তাঁর সভায় শ্রোতা বলতে পাটওয়ারি, চৌকিদার, শিক্ষক আর ঐ সব কর্মচারীর স্যাঙাত ছাড়া অন্য কেউ থাকতই না। মধ্যে মধ্যে বড়ো হাকিমসাহেব এসে ভগতজির খুব সুখ্যাতি টুখ্যাতি করে ভগতজির চোখের জল কিছুক্ষণের জন্য মুছিয়ে দিয়ে চলে যেতেন। কিন্তু ক্ষণিকের এই সমাদর ও স্বীকৃতি কি আর শীতল করতে পারে অষ্টপ্রহর তাচ্ছিল্য আর অশ্রদ্ধার দাহ? যে পথে ভগতজি যান সেপথেই লোকে আঙুল তুলে তুলে তাঁকে দেখায়। কেউ বলে সাহেবদের মোসায়েব, কেউ বলে পুলিশের চর। দাঁতে দাঁত চেপে ভগতজিকে সয়ে যেতে হয় নিজের অপযশ আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সুনামের সমস্ত জ্বালা। জীবনে এই প্রথম বার তাঁকে নিচু হতে হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে। জীবনভর কুলমর্যাদার ধ্বজা উড়িয়ে এসে, তার জন্য তাঁর সর্বস্ব বাজি রেখে, সেই মর্যাদা আজ ধুলায় গড়াগড়ি যাবে। অপমানের এই নিদারুণ জ্বালা ভগতজিকে একমুহূর্তের জন্য স্থির থাকতে দিচ্ছে না। সবসময় শুধু এক চিন্তা. হারানো সম্মান কী করে উদ্ধার করি, কী ভাবে বিধ্বস্ত করি প্রতিদ্বন্দ্বীর গৌরব? কী উপায়ে ভেঙে দেয়া যায় ওর ওই অহংকার?

অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে তিনি উপায় ঠাওরালেন একটা। সিংহকে তার নিজেরই ডেরায় পেড়ে ফেলতে হবে।

সেদিন সন্ধেবেলায় চৌধুরির বাড়ির সামনেটায় একটা মহতী জনসভা ছিল। আশপাশের গ্রাম থেকে চাষিরা সব এসেছে দলে দলে। হাজার হাজার মানুষের জমায়েত। চৌধুরি সেখানে

স্বরাজ নিয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভারতমাতার জয়ধ্বনি উঠছে ঘন ঘন। একপাশে মেয়েরাও সমবেত হয়েছেন। বক্তৃতা শেষ হতেই চৌধুরি গিয়ে বসেন তাঁর নিজের আসনে। স্বেচ্ছাসেবকরা চাঁদা সংগ্রহ করতে লাগল স্বরাজ্য-তহবিলের জন্য। হঠাৎ ভগতজি লাফিয়ে উঠলেন মঞ্চের ওপর, শ্রোতাদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—

ভাইসব, আমাকে এখানে এভাবে দেখে তোমরা আশ্চর্য হবে না। আমি স্বরাজের বিরোধী নই। এমন হীন কে আছে যে স্বরাজের নিন্দে করে! কিন্তু স্বরাজ পাবার যে রাস্তা চৌধুরি দেখাল, যা শুনে তোমরা গদগদ হয়ে উঠছ, তা দিয়ে হবে না। যেখানে নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিভেদ সেখানে পঞ্চায়েত কী করতে পারে? বিলাসিতার ভূতটাকে কীভাবে নামানো যাবে ঘাড় থেকে, কীভাবে বর্জন করা যাবে মদের দোকানগুলোকে? সিগারেট, সাবান, মোজা, গেঞ্জি, আদ্দির ওপর মানুষের মোহ কবে কাটবে? ক্ষমতা আর উচ্চাশার লোভ যতক্ষণ থাকছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারি মাদ্রাসা বয়কট করবে কীভাবে? কী করে ভাঙবে বিধর্মী শিক্ষার শিকল-বেড়ি? স্বরাজ আনতে হলে একটাই উপায় আছে, তা হল আত্মসংযম। এই একটাই মহৌষধ যা সমস্ত রোগ সমূলে উচ্ছেদ করবে। আত্মার দুর্বলতাই হচ্ছে পরাধীনতার মূল কারণ, আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে সবল কর, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো, মনকে বশ মানাও, তবেই না তোমার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের সঞ্চার হবে, বিভেদ-বিবাদ মিটবে, হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হবে, তবেই না ভোগবিলাস থেকে মন সংযত হবে, নেশা কাটবে। আত্মবল ছাড়া স্বরাজ আসতেই পারে না। সমস্ত পাপের মূলে হচ্ছে স্বার্থ।—এই স্বার্থবোধই তোমাদের আদালতে টেনে নিয়ে যায়, তোমাদের বিধর্মী শিক্ষার দাস বানিয়ে রেখেছে। এই অপদেবতাকে ধ্বংস করতে চাই আত্মবল, তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারবে। তোমরা সবাই জানো, আমি চল্লিশ বছর ধরে আফিম খেয়ে আসছি, আজ থেকে আফিম আমার কাছে গো-রক্তের সমান। চৌধুরির সঙ্গে আমার তিন পুরুষের ঝগড়া। আজ থেকে চৌধুরি আমার ভাই। আজ থেকে আমাকে কিংবা আমার বাড়ির কাউকে যদি ঘরে-বোনা কাপড় ছাড়া অন্য কিছু পরতে দেখো, তাহলে যা খুশি সাজা দিও। আমি আর কিছু বলতে চাই না। ঈশ্বর সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

এই বলে ভগতজি তার বাড়ির পথে পা বাড়াতেই চৌধুরি এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। তিন পুরুষের দ্বন্দ্ব এক নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল।

সেদিন থেকে চৌধুরি আর ভগতজি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বরাজ-এর প্রচার করতে লাগলেন। দুজনের মধ্যে মিত্রতা গড়ে উঠল অচিরেই, ঠাওরানো মুশকিল হল জনতা কাকে বেশি সম্মান করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্ফুলিঙ্গে দুজনেরই অন্তরের অন্তস্তল উদ্ভাসিত হতে থাকল।

(লাগ-ডাট/১৯২১) অনুবাদ অচিন চক্রবর্তী

বুড়ি কাকি

বার্ধক্য প্রায় শৈশবের পুনরাগমনের সূচক। তাই বুড়ি কাকির জিহ্বার স্বাদ ভিন্ন অন্য আর কোনো ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল না। একমাত্র কান্না ছাড়া নিজের কষ্টের প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অন্য কোনো উপায়ও ছিল না তাঁর। সমস্ত ইন্দ্রিয়, চোখ, হাত ও পা জবাব দিয়ে দিয়েছিল। তিনি কেবল মাটিতে পড়ে থাকতেন আর বাড়ির কেউ যদি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করত, খাবার সময় যদি পার হয়ে যেতে, ক্ষুধার পূর্ণ নিবৃত্তি যদি না হত কিংবা বাজার থেকে কোনো জিনিস এলে যদি তাকে দেওয়া না হত, তাহলে তিনি কাঁদতে শুরু করে দিতেন। তার কান্না সাধারণ কান্না ছিল না, তিনি গলা ছেড়েই কাঁদতেন।

এক যুগ হল তার স্বামী স্বর্গত হয়েছেন। একের পর এক তাজা ছেলেও মারা গিয়েছে। এখন এক ভাইপো ছাড়া আর কেউ নেই। এই ভাইপোর নামেই তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন। সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার সময় তার ভাইপো অনেক বড়ো বড়ো কথা বলেছিল; কিন্তু আসলে সেসব ছিল কুলি-ডিপোর দালালদের মতো ভুলিয়ে নেওয়ার ধান্দা। যদিও ওই সম্পত্তির বার্ষিক আয় দেড়শো-দুশো টাকার কম ছিল না তবু বুড়ি কাকির পেট ওরে খাওয়া জুটত অনেক কষ্টে। এব্যাপারে তার ভাইপো পণ্ডিত বুধিরামের দোষ, না তার অর্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী রূপার দোষ তা নির্ণয় করা সহজ ছিল না। বুধিরাম ছিল স্বভাবে সজ্জন; তবে ততক্ষণই সে সজ্জনতা দেখাত যতক্ষণ না তার পকেটে হাত পড়ত। রূপা [illegible] স্বভাবের ছিল ঠিকই, তবে সে ছিল ধর্মভীরু। তাই রূপার স্বভাবের উগ্রতা কাকিকে ততটা উত্যক্ত করত না যতটা করত বুধিরামের ভালোমানুষি।

কখনও কখনও নিজের অত্যাচারের জন্য বুধিরামের খেদ হত। মনে মনে ভাবত, এই সম্পত্তির দৌলতেই তো আমি আজ ভালোমানুষ হয়ে বসেছি। যদি শুধু মুখের কথায় আর শুষ্ক সহানুভূতিতে কাজ হত তাহলে কখনও সে আপত্তি করত না; কিন্তু বাড়তি খরচের ভয় তার সদিচ্ছাকে দাবিয়ে রেখে দিয়েছিল। এমন কী, যদি দরজায় এসে কোনো ভদ্রলোক বসতেন আর বুড়ি কাকি তার কাছে নিজের কথা বলতে আরম্ভ করতেন তাহলে বুধিরাম রেগে আগুন হয়ে যেত ও ঘরে গিয়ে তাকে আচ্ছা করে শাস্তি দিত। ছেলেপুলেদের সঙ্গে বুড়োদের একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষের সম্পর্ক থাকে। তার উপর তারা যখন বুড়ি কাকির সঙ্গে নিজেদের মা-বাবার এই ব্যবহার দেখত, তখন তারা আরও বেশি করে তার পেছনে লাগত। কেউ একটা চুটকি মন্তব্য করে পালিয়ে যেত; কেউ বা জল মুখে নিয়ে তার উপর কুলকুচি করে দিত। কাকি

চিৎকার করে কাঁদতেন; কিন্তু যেহেতু সবাই জানত যে, কাকি কেবল খাবার জন্যই চিৎকার করেন, তাই কেউই আর তার হা-হুতাশ কিংবা আর্তনাদে গুরুত্ব দিত না। তবে ক্রুদ্ধ কাকি যদি বাচ্চাদের গালি দিতে শুরু করতেন তাহলে রূপা ঘটনাস্থলে এসে হাজির হত। এই ভয়ে কাকি কদাচিৎই তার জিহ্বা-কৃপাণের প্রয়োগ করতেন, যদিও কান্নার চেয়ে উপদ্রব দমনের জন্য এই পন্থা ছিল অনেক বেশি উপযুক্ত।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে যদি কাকির সঙ্গে কারও অনুরাগের সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তা ছিল বুদ্ধিরামের ছোট মেয়ে লাডলির সঙ্গে। লাডলি তার দুই ভাইয়ের ভয়ে তার ভাগের ছোলাভাজা, মিষ্টি ইত্যাদি বুড়ি কাকির পাশে বসে খেত। এই ছিল তার রক্ষাগার, তবে যদিও কাকির লোলুপতার জন্য তার আশ্রয় অত্যন্ত দুর্মূল্যের ব্যাপার হয়ে পড়েছিল; তবুও ভাইদের অন্যায়ের চেয়ে এ আশ্রয় ছিল অনেক সুলভ। পরস্পরের এই স্বার্থচিন্তা দুজনের মধ্যে সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল।

দুই

রাত্রিকাল। বুদ্ধিরামের বাড়ির দরজায় শানাই বাজছে আর গ্রামের বাচ্চাদের একটা দল বিস্ময়াবিষ্ট চোখে সংগীতের রসাস্বাদন করছে। খাটিয়ার উপর বসে বিশ্রাম করতে করতে অতিথিরা নাপিতদের দিয়ে গা-হাত টেপাচ্ছে। পাশে উপস্থিত ভাট বীরগাথা শোনাচ্ছে আর কিছু আবেগপ্রবণ অতিথির 'বাঃ! বাঃ!' শুনে তারা খুশি হয়ে ভাবছে, এই প্রশংসার যথার্থ অধিকারী বুঝি সে নিজেই। দু-একটি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবক অবশ্য এসব ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বসেছিল। এই রকম অশিক্ষিত সমাজে কিছু বলা অথবা যোগ দেওয়া নিজেদের মর্যাদার হানিকর বলে তারা ধরে নিয়েছিল।

আজ বুদ্ধিরামের বড়ো ছেলে মুখরামের আশীর্বাদ। এ হল তারই উৎসব। বাড়ির ভিতর স্ত্রীলোকেরা গান গাইছে আর রূপা-অতিথিদের খাওয়াদাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। উনানের উপর কড়া বসানো হয়েছে। একটায় পুরি, কচুরি ইত্যাদি ভাজা হচ্ছে, আর একটায় অন্য রান্না চড়েছে। একটা বড়ো হাঁড়িতে মশলাদার ব্যঞ্জন রান্না হচ্ছে। ঘি ও মশলার ক্ষুধাবর্ধক সুগন্ধে চারিদিক ভুরভুর করছে।

বুড়ি কাকি নিজের কুঠুরিতে শোকের প্রতিমার মতো বসেছিলেন। খাবারের এই সুগন্ধ তাকে ব্যগ্র করে তুলেছিল। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, আমাকে পুরি সম্ভবত দেবে না। এত দেরি হয়ে গেল, অথচ কেউ খাবার নিয়ে এল না। মনে হচ্ছে, সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমার জন্য আর কিছু পড়ে নেই। একথা ভেবে তার কান্না পেল। কিন্তু অমঙ্গালের আশঙ্কায় কাঁদতে পারলেন না।

আহা! কী সুগন্ধ? এখন আর কে আমার খবর নেয়? যখন রুটিই জোটে না তখন কী আর এমন ভাগ্য হবে যে পেট পুরে পুরি খাব? এসব মনে হয়ে তার কান্না এল; বুকের মধ্যে একটা ব্যথার মতো শুরু হল। কিন্তু রূপার ভয়ে তিনি আবার চুপ করে গেলেন।

এই সব যন্ত্রণাদায়ক চিন্তায় বুড়ি কাকি অনেকক্ষণ মগ্ন হয়ে রইলেন। ঘি ও মশলার সুগন্ধ থেকে থেকে তার মনকে হতচেতন করে দিচ্ছে। মুখ জলে ভরে ভরে আসছে। পুরির স্বাদ মনে হতেই তার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হচ্ছে। কাকেই বা ডাকা যায়। আজ তো লাডলি বেটিও

আসেনি। ছেলে দুটো সব সময় এসে দিক করে, আজ তাদেরও কোনো পাত্তা নেই। কী হচ্ছে না হচ্ছে তার কিছু খবর তো পাওয়া যেত।

বুড়ি কাকির কল্পনায় পুরির ছবি নাচতে শুরু করল। খুব লাল লাল, ফোলা ফোলা, নরম নরম। রূপা খুব ভোজের ব্যবস্থা করে থাকবে। কচুরিতে দেওয়া শা-জিরে ও এলাচের সুগন্ধ ভেসে আসছিল। একটা পুরি পেলে হাতে নিয়ে দেখা যেত। কেন, কড়ার সামনে গিয়েই একটু বসি না। কলকল করে পুরি ভাজা হবে। কড়া থেকে গরম গরম উঠিয়ে থালায় রাখা হবে। ঘরে বসে ফলের গন্ধ শোঁকা যায়, তবে বাগানে যেতে পারলে আরও ভালো। এসব ভেবে বুড়ি কাকি উবুড় হয়ে বসে হাতে ভর দিয়ে দিয়ে অনেক কষ্টে চৌকাঠ পার হয়ে ঘসটাতে ঘসটাতে কড়ার কাছে গিয়ে বসলেন। ভোজনরত মানুষের সামনে বসে ক্ষুধার্ত কুকুরের যে অবস্থা হয়, কড়ার পাশে বসে বুড়ি কাকিরও তাই হল।

রূপা তখন কাজের চাপে উদ্ব্যস্ত। কখনও এঘরে যাচ্ছে, কখনও ওঘরে; কখনও কড়ার পাশে আসছে, কখনও যাচ্ছে ভাঁড়ারে। কে একজন বাইরে থেকে এসে বলল—মহারাজ ভাঙ চাইছেন। তখনই সে ভাঙ দিতে লেগে গেল। এরই মধ্যে আবার কেউ এসে বলল—ভাট এসেছে, তাকে কিছু দিয়ে দিন। ভাটের জন্য সিধা বের করছে এমন সময় তৃতীয় কেউ এসে জিজ্ঞাসা করল— রান্না হতে এখন আর কত বাকি আছে? ঢোল আর করতালএকটু বের করে দিন। একা মেয়েছেলে, বেচারা দৌড়ে দৌড়ে একেবারে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে রেগেও উঠছিল, তবু ক্রোধ প্রকাশ করার অবসর পাচ্ছে না। ভয় ছিল, কোনো প্রতিবেশী না বলে বসে, এতেই এত মেজাজ! পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। গরমের চোটে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তবুও এতটুকু অবকাশ পাচ্ছে না যে একটু জল খেয়ে নেয় কিংবা পাখা নিয়ে হাওয়া খায়। এই ভয়ও ছিল যে, একটু চোখ সরালেই হয়তো হরির লুট লেগে যাবে। এই অবস্থায় বুড়ি কাকিকে কড়ার পাশে বসে থাকতে দেখেই রূপা জ্বলে উঠল। ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না। এটাও মনে এল না যে, পড়োশি মহিলারা বসে আছে, তারা কী ভাববে; অন্য লোক শুনেই বা কী বলবে! ব্যাঙ যেভাবে কেঁচোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেও সেইভাবে বুড়ি কাকির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে দুহাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এভাবে পেটে আগুন লাগে, পেট, না খোলা? ঘরে বসে কি দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? এখনও অতিথিদের খাওয়া হল না, দেবতার ভোগ হল না, তুমি কি সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারলে না? এসে বুকের উপর বসে গেছ। এরকম জিভ পুড়ে যায় না কেন। সারা দিন না খেয়ে থাকলে কার হাঁড়িতে গিয়ে মুখ দিতে কে জানে? গ্রামের লোক দেখলে বলবে যে, বুড়ি ভরপেট খেতে পায় না বলেই তো এরকম ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। ডাইনি মরেও না, আসনও ছাড়ে না। নাম ডুবিয়ে ছাড়বে। বেইজ্জত না করে থামবে না। এত গিলছে, তবুও কে জানে সব ভস্ম হয়ে কোথায় যাচ্ছে। নাও, ভালো চাও তো কুঠুরিতে গিয়ে বস। যখন বাড়ির লোকের খাওয়া শুরু হবে তখন তুমিও পাবে। তুমি তো আর কোনো দেবী নও যে কারও মুখে জলও পড়ল না অথচ তোমার পুজো হয়ে গেল!

বুড়ি কাকি মাথা তুললেন না, কাঁদলেন না, কথাও বললেন না, ঘসটাতে ঘসটাতে চুপচাপ নিজের কুঠুরিতে চলে গেলেন। রূপার আওয়াজ এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, মন ও মস্তিষ্কের সমস্ত

ক্ষমতা, সম্পূর্ণ বিচারশক্তি এবং সম্পূর্ণ জোর ওই দিকেই আকর্ষিত হয়েছিল। নদীতে যখন কোনো বিশাল পাড় ভেঙে পড়ে তখন আশপাশের জল সেই জায়গা ভরার জন্য ছুটে আসে।

তিন

রান্না হয়ে গেলে উঠোনে পাতা পড়ল। অতিথিদের ভোজন শুরু হয়ে গেল। মহিলারা ভোজের গীত আরম্ভ করে দিলেন। অতিথিদের নরসুন্দর ও ভৃত্যরাও তাদের সঙ্গে অথচ একটু দূরে খাবার জন্য বসে গিয়েছে। তাহলেও রীতি অনুসারে সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই উঠতে পারছিলেন না। কিছুটা শিক্ষিত ছিলেন এমন দু-একজন অতিথি ভৃত্যদের অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া দেখে বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকার এই ব্যবস্থাকে তারা অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন ব্যাপার বলে মনে করছিলেন।

বুড়ি কাকি নিজের কুঠরিতে গিয়ে অনুতাপ করছিলেন : আমি কী ছিলাম, কী হয়েছি! রূপার উপর তার ক্রোধ হল না। নিজের অস্থিরতার জন্য দুঃখ হল। সত্যিই তো, অতিথিদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির লোক কী করে খায়! আমার এতটুকু তর সইল না। সবার সামনে এই অপমান! এখন যতক্ষণ পর্যন্ত ডাকতে না আসবে যাব না।

মনে মনে এইসব চিন্তা করে তিনি তাকে ডাকার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ঘির রুচিবর্ধক সুবাসকে কঠোর ধৈর্য-পরীক্ষক বলেই মনে হল। এক এক মুহূর্ত তার কাছে এক এক যুগ বলে মনে হতে লাগল ঃ এখন বোধ হয় পাতা বিছানো হয়ে গেছে। এতক্ষণে অতিথিরা এসে গিয়ে থাকবেন। নাপিত জল দিচ্ছে আর অতিথিরা হাত-পা ধুচ্ছেন। লোক খেতে বসে গেছে বোধ হয়। ভোজের গীত গাওয়া হচ্ছে। — এই সব চিন্তা করে মনকে প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে একটা গীত গুনগুন করতে লাগলেন। তার মনে হল — আমি অনেকক্ষণ গান গাইছি। তা, এত দেরিতেও কি লোক এখনও খাচ্ছে! কারও কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই সবাই খাওয়াদাওয়া করে চলে গেছে। আমাকে ডাকতেও কেউ এল না। রূপা রেগে গেছে; কে জানে হয়ত ডাকবেই না। হয়তো ভাবছে, আমি নিজেই যাব। আমি তো আর কোনো অতিথি নই যে আমাকে ডেকে পাঠাতে হবে। বুড়ি কাকি যাবার জন্য তৈরি হলেন। মুহূর্তের মধ্যেই পুরি ও মশলাযুক্ত ব্যঞ্জন তার সামনে হাজির হবে; কাকির স্বাদেন্দ্রিয় উশখুশ করে উঠল। মনে মনে তিনি নানা রকমের পরিকল্পনা করলেন: প্রথমে তরকারি দিয়ে পুরি খাব; তারপর খাব দই ও মিষ্টি দিয়ে। মাঠার সঙ্গে কচুরি জমবে ভালো। কেউ ভালো বলুক আর খারাপই বলুক, আমি চেয়ে চেয়ে খাব। এতে লোকে বলবে তো যে, কোনো বিবেচনা নেই? কী করব? এত দিন বাদে যখন পুরি জুটেছে তখন কি আর মুখ নষ্ট করে এমনি উঠে যাব?

কাকি উবু হয়ে হাতে ভর দিয়ে উঠোনে এলেন। কিন্তু, হা দুর্ভাগ্য! আগের বারের মতো এবারও কল্পনা সময়ের হিসাবে ভুল করে বসেছিল। অভ্যাগত-মণ্ডলী তখন সবে বসেছেন। কেউ খেয়ে আঙুল চাটছিলেন; কেউ বা তির্যক দৃষ্টিতে দেখছিলেন অন্যেরা তখনও খাচ্ছে কী না। কেউ ভাবছিলেন, পাতে পড়ে-থাকা পুরি কোনো রকমে পেটে ভরে নেওয়া যায় কী না। কেউ কেউ দই খেয়ে জিব দিয়ে তৃপ্তিসূচক শব্দ করছিলেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বার চাইতে সংকোচ হচ্ছিল। এমনি

সময়ে বুড়ি কাকি ঘসটাতে ঘসটাতে তাদের মধ্যে গিয়ে হাজির হলেন। অমনি কজন চিৎকার করে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—আরে, কে এই বুড়ি? এ কোথা থেকে এসে গেল? দেখবেন, কাউকে ছুঁয়ে না দেয়।

পণ্ডিত বুধিরাম কাকিকে দেখেই রাগে একেবারে তিড়বিড়িয়ে উঠল। পুরিভর্তি থালা নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। থালা মাটিতে রেখে নিষ্ঠুর মহাজন যেভাবে বিশ্বাসঘাতক কিংবা পালিয়ে বেড়ানো কাউকে দেখা মাত্র লাফ দিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরে, ঠিক সেইভাবে লাফ দিয়ে বুধিরাম কাকির দুই হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে তাকে অন্ধকার কুঠুরিতে ছুঁড়ে দিল। আশার ইমারত ঝড়ের এক ঝাপটায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

অতিথিদের ভোজন হল। বাড়ির লোকদের আহার শেষ হল। বাদ্যকর, ধোবি, চামারদেরও খাওয়া হল; কিন্তু বুড়ি কাকিকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। বুধিরাম ও রূপা দুজনেই বুড়ি কাকিকে তার নির্লজ্জতার জন্য শাস্তি দেবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। তার বার্ধক্য, তার দীনতা, তার বুদ্ধিভ্রষ্টতা—কোনো কিছুতেই কারও মনে করুণার উদ্রেক করল না। একমাত্র লাডলি তার জন্য কষ্ট পাচ্ছিল।

কাকি আর লাডলির ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত নিবিড়। বেচাড়া লাডলি খুব ভালো মেয়ে। ছেলেছোকরাদের চ্যাংড়ামি কিংবা চঞ্চলতার লেশমাত্রও তার ছিল না। দু-দুবার যখন ওর মা-বাবা কাকিকে নিষ্ঠুর ভাবে টানাটানি করল তখন ও খুব মর্মাহত হয়েছিল। তার রাগ হচ্ছিল, এরা কেন কাকিকে পুরি দিচ্ছে না? কেন, সবই কি অতিথিরাই খেয়ে নেবে? আর যদি কাকিকে অতিথিদের আগেই খেতে দিয়ে দেওয়া হত তাহলেই বা কী এমন অপরাধ হত? সে কাকির কাছে গিয়ে তাকে প্রবোধ দিতে চাইছিল; কিন্তু মার ভয়ে যেতে পারছিল না। সে তার নিজের ভাগের পুরি একেবারেই খেল না, তার পুতুলের বাক্সে বন্ধ করে রেখে দিল। সে চাইছিল, এই পুরি নিয়ে কাকিকে দেয়। তার মন অধীর হয়ে উঠেছিল ঃ বুড়ি কাকি আমার আওয়াজ শুনেই উঠে বসবে। পুরি দেখে কি খুশিই না হবে! আমাকে খুব আদর করবে!

চার

রাত এগারোটা হয়ে গিয়েছে। রূপা উঠোনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। লাডলির চোখে ঘুম আসছিল না। কাকিকে পুরি খাওয়াবার উৎসাহ তাকে ঘুমোতে দিচ্ছিল না। সে পুতুলের বাক্স সামনেই রেখে দিয়েছিল। যখন সে বুঝল যে, মা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে চুপি চুপি উঠে ভাবতে লাগল কেমন করে যাবে। চারিদিক অন্ধকার। কেবল উনানে আগুন জ্বলছে আর উনানের পাশে একটা কুকুর শুয়ে আছে। লাডলির দৃষ্টি দরজার সামনে নিমগাছে গিয়ে পড়ল। তার মনে হল, গাছে হনুমানজি বসে আছেন। তাঁর ল্যাজ, তাঁর গদা সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ভয়ে সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। ঠিক তখনই কুকুরটা উঠে বসায় লাডলি সাহস ফিরে পেল। একজন ঘুমন্ত মানুষের চেয়ে একটা পলায়মান কুকুর তার কাছে অনেক বেশি সাহসের কারণ হয়ে দেখা দিল। সে তার বাক্স তুলে নিয়ে বুড়ি কাকির কুরির দিকে চলল।

পাঁচ

বুড়ি কাকির শুধু এইটুকুই মনে ছিল যে, কেউ তার হাত ধরে হিঁচড়ে নিয়ে গেল; তার আরও মনে হয়েছিল, কেউ যেন তাকে পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তার পা বারবার পাথরে ঠোক্কর খেল, কে যেন তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দিল আর তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন কারোই কোনো সাড়া পেলেন না। ভাবলেন ঃ সবাই খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছে আর সেই সঙ্গো আমার কপালও। কী করে রাত কাটবে? হা রাম! কী খাব? পেটে তো আগুন জ্বলছে। হায়! কেউ আমার খবরও নিল না! আমাকে খেতে না দিলে কি ধনবৃদ্ধি হবে? এই লোগুলোর কি এতটুকু দয়াও হল না যে, বুড়ি কবে মরে যাবে তার মনে আর কেন দুঃখ দেওয়া! আমি শুধু পেট পূরণ করছি, আর তো কিছু নয়? এতেই এই অবস্থা! আমি তো আর অন্ধ কিংবা পঙ্গু নই যে কিছু বুঝবও না, শুনবও না। যদি উঠোনে চলেই গিয়েছিলাম, তাতেই বা কী! বুদ্ধিরাম কি বলতে পারল না যে, কাকি, এখন লোক খাচ্ছে, পরে এসো। আমাকে হিঁচড়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিল! ওই পুরির জন্যই রূপা সকলের সামনে গালিগালাজ করল। ওই পুরির জন্যই এত দুর্গতির পরেও ওদের পাথরের কলিজা নরম হল না। সবাইকে খেতে দিল অথচ আমার কথা জিজ্ঞাসাও করল না। তখনই যখন দিল না, এখন আর কী দেবে?

এই সব চিন্তা করে কাকি নিরাশাভরা সন্তোষ নিয়ে শুয়ে পড়লেন। আত্মগ্লানিতে তার মন ভরে গেল, তবু অতিথিদের ভয়ে কাঁদলেন না।

হঠাৎ তার কানে আওয়াজ গেল ঃ কাকি ওঠ, আমি পুরি নিয়ে এসেছি।

কাকি লাডলির গলার আওয়াজ চিনতে পারলেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসে দুই হাতে লাডলিকে আদর করে কোলে বসালেন। লাডলি পুরি বের করে দিলে কাকি জিজ্ঞাসা করলেন—কী, তোর মা দিয়েছে?

লাড়লি বলল—না, এটা আমার ভাগের।

কাকি পুরির উপর হামলে পড়ে পাঁচ মিনিটেই বাক্স খালি করে দিলেন। লাডলি জিজ্ঞাসা করল—কাকি, পেট ভরে গেছে?

অল্প বর্ষায় যেমন ঠান্ডার পরিবর্তে আরও গরম লাগে, তেমনি ওই অল্প কটা পুরি কাকির ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছা আরও বাড়িয়ে দিল। তিনি বললেন—না রে, দিদি। মার কাছ থেকে গিয়ে আরও চেয়ে নিয়ে আয়।

লাডলি বলল—মা ঘুমিয়ে আছে, জাগালে মারবে।

কাকি বাক্স আবার হাতড়ে দেখলেন। ওতে ভাঙাচোরা কিছু পড়ে ছিল, তিনি সেগুলো বের করে খেয়ে ফেললেন। বারে বারে ঠোঁট চেটে চেটে ঢেকুর তুললেন।

কী করে আরও পুরি পাওয়া যায় এই ভেবে মন অস্থির হয়ে উঠল। মানুষের সন্তোষের বাঁধ যখন ভেঙে যায় তখন আর কামনার সীমা-পরিসীমা থাকে না। মাতাল মদের কথা মনে করে মদান্ধ হয়ে যায়। কাকির অধীর মন ইচ্ছার প্রবল প্রবাহে ভেসে গেল। উচিত-অনুচিতের বিচার ভেসে গেল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছাকে দমন করে রেখে হঠাৎ তিনি লাডলিকে বললেন—অতিথিরা যেখানে বসে খেয়ে গেছে আমার হাত ধরে সেখানে নিয়ে চল।

লাডলি তার অভিপ্রায় বুঝতে পারল না। সে কাকিকে হাত ধরে নিয়ে উচ্ছিষ্ট পাতার পাশে বসিয়ে দিল। দীন ক্ষুধাতুর হতজ্ঞান বৃদ্ধা পাতা থেকে পুরির টুকরো খুঁজে খুঁজে খেতে শুরু করলেন। আহা, দই কি সুস্বাদু! কচুরি কী মুচমুচে, কী খাস্তা, কী নরম! বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েও কাকি এটা বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি যা করছেন তা কদাপি করা উচিত নয় : আমি অন্যের এঁটো পাতা চেটে খাচ্ছি! কিন্তু বার্ধক্য তো আকাঙক্ষা-রোগের অন্তিম অবস্থা। সমস্ত কামনা তখন এক কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে জমা হয়। বুড়ি কাকির সেই কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার জিহ্বা।

ঠিক সেই সময় রূপার চোখ খুলল। সে বুঝতে পারল, লাডলি তার পাশে নেই। চমকে গিয়ে খাটিয়ার দুপাশে তাকিয়ে দেখল, নীচে পড়ে গেছে কি না। সেখানে না পেয়ে সে উঠে দেখে কি, লাডলি এঁটো পাতার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আর বুড়ি কাকি পাতা থেকে পুরির টুকরো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছেন। রূপার মন ভারী হয়ে গেল। কোনো গোরুর গলায় ছুরি চালাতে দেখলে তার যে অবস্থা হত এখন সেই অবস্থা হল। এক ব্রাহ্মণী অন্যের এঁটো পাতা চাটছেন; এর চেয়ে করুণ দৃশ্য আর কী হতে পারে! কয়েক গ্রাস পুরির জন্য তার খুড়ি শাশুড়ি এরকম নিকৃষ্ট কাজ করছেন! এ হল সেই রকম দৃশ্য যা দেখে দর্শকের মন কেঁপে উঠে। এমন মনে হয় যেন পৃথিবী থেমে গেছে; আকাশ চক্রাকারে ঘুরছে; পৃথিবীতে যেন কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসছে। রূপার ক্রোধ হল না। শোকের কাছে ক্রোধ আসবে কী করে? অনুকম্পা ও ভয়ে তার চোখ সজল হয়ে এল। এই অধর্মের পাপের ভাগী কে? সে নিষ্পাপ মনে আকাশের দিকে হাত তুলে বলল—ভগবান, আমার সন্তানদের কৃপা কর। এই অধর্মের সাজা আমাকে দিও না, তা হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

রূপা তার নিজের স্বার্থপরতা ও অন্যায়ের এরকম বাস্তব ছবি আর কখনও দেখেনি। সে চিন্তা করতে লাগল—হায়, আমি কী নিষ্ঠুর! যার সম্পত্তি থেকে বছরে আমাদের দুশো টাকা আয় হয় তার এই দুর্গতি! আর তা আমারই জন্য! হে দয়াময় ভগবান, আমার জঘন্য অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা কর। আজ আমার ছেলের আশীর্বাদ। শতশত মানুষ খেয়ে গেছে। আমি তাকে আমার অঙ্গুলিহেলনের মুখাপেক্ষী করে রেখে দিয়েছি। নিজেদের নামের জন্য কত শত টাকা খরচ হয়ে গেল, অথচ যার দৌলতে হাজার হাজার টাকা ভোগ করেছি তাকে এই উৎসবে পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দিতে পারলাম না। কারণ তো একটাই যে সে বৃদ্ধা ও অসহায়!

রূপা প্রদীপ জ্বালাল; নিজের ভাঁড়ারের দরজা খুলল ও একটা থালায় সম্পূর্ণ আহার্য সামগ্রী সাজিয়ে নিয়ে বুড়ি কাকির কাছে গেল। অর্ধেক রাত পার হয়ে গিয়েছিল। তারার থালায় আকাশ সজ্জিত আর সেখানে বসে দেবতারা স্বর্গীয় সুষমা বন্টন করছিলেন। কিন্তু তার সামনে সাজানো থালা দেখে বুড়ি কাকির যে পরমানন্দ লাভ হল দেবতাদের কারোই তা হল না। রূপা অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—কাকি, ওঠ, খেয়ে নাও। আমার আজ বড়ো ভুল হয়ে গেছে। তুমি সেজন্য কিছু মনে করো না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলো যেন তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

সরল শিশু যেমন মিষ্টি পেলে সব মার ও তিরস্কার ভুলে যায়, বুড়ি কাকি তেমনি সব ভুলে উঠে বসে খাবার খেতে শুরু করে দিলেন। প্রতিটি গ্রাসে তার যথার্থ সদিচ্ছা ফুটে বেরোতে লাগল আর রূপা বসে থেকে এই স্বর্গীয় দৃশ্যের আনন্দ উপভোগ করতে লাগল।

(বূঢ়ী কাকী/১৯২১)

অনুবাদ অমলকুমার রায়

সমস্যা

আমার দপ্তরে চারজন চাপরাশি ছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম গরিব। খুবই সরল, অনুগত, কর্মপটু, ভর্ৎসনা খেয়েও নিরুত্তর, যথা নাম যথা গুণ। আমি এই দপ্তরে এসেছি বছর খানেক হল। কিন্তু আমি তাকে একদিনের জন্যে গরহাজির হতে দেখিনি। তাকে সকাল নটার সময় দপ্তরে ছেঁড়া শতরঞ্জির ওপর বসে থাকতে দেখতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম যে মনে হত সে যেন এই ভবনেরই একটি অংশ। খুবই সরল, কারো কথা ঠেলতে পারত না। ওদিকে আর একজন মুসলমান ছিল। গোটা দপ্তর তাকে ভয় পেত, জানিনা কেন। ওর লম্বা লম্বা বাতচিত ছাড়া আর কোনো কারণ ছিল বলে মনে হয় না। বলত যে ওর চাচাতো ভাই রামপুর তালুকের কাজি আর পিসেমশাই হল তোঁক তালুকের কোতোয়াল। লোকটিকে সবাই মিলে কাজি সাহেব উপাধি দিয়েছিল। বাকি দুজন জাতে ব্রাহ্মণ। তাদের আশীর্বাদের মূল্য তাদের কাজের চেয়ে বেশি। এই তিন জন ফাঁকিবাজ, দাম্ভিক এবং কুঁড়ে। কোনো সামান্য কাজ করতে বললেও নাক-ভুরু না কুঁচকে করত না। ক্লার্কদের কিছু আমলই দিত না। শুধু বড়োবাবুকে কিছুটা ভয় করত, তাও মাঝে মাঝে তার সঙ্গেও ঝগড়া করে বসত। কিন্তু এইসব বদগুণ থাকা সত্ত্বেও তাদের অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না যতটা ছিল গরিবের। পদোন্নতির কোনো মওকা এলে এই তিন জনই তার সুযোগ নিয়ে নিত, গরিবকে কেউ পাত্তা দিত না। আর সকলে দশ টাকা করে পেত, বেচারা গরিব ছ-টাকায় পড়ে ছিল। সকাল থেকে বিকেল অব্দি তার পা এক মিনিটের জন্যও স্থির থাকত না। এমনকী অন্য তিন জন চাপরাশিও ওর ওপর হুকুম চালাত, উপরি আয় থেকে ওকে কোনো ভাগ দিত না। তার উপর দপ্তরের সমস্ত কর্মচারী, দপ্তরি থেকে শুরু করে বড়োবাবু, সকলেই ওকে দেখে বিরক্ত হত। বহুবার ওর নামে নালিশ, জরিমানা হয়েছে, বকুনি ছিল তার নিত্যকার পাওনা। এর রহস্য আমি বুঝতে পারতাম না। ওর প্রতি আমার করুণা হত এবং আমার ব্যবহারে বোঝাতে চাইতাম আমার চোখে ওর সম্মান অন্য তিন চাপরাশির চেয়ে কম নয়। এমনকী, বারকয়েক আমি ওর আড়ালে ওর পক্ষ নিয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে ঝগড়াও করেছি।

একদিন বড়োবাবু গরিবকে তাঁর টেবিল পরিষ্কার করতে বললে সে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করতে থাকে। দৈবাৎ ঝাড়নের ঝটকা লেগে দোয়াত উলটে গিয়ে টেবিলে কালি ছাড়িয়ে পড়ে। বড়োবাবু এ দেখে রেগে জ্বলে ওঠেন। তার কান দুটো ধরে কষে মুচড়ে দেন আর ভারতবর্ষের সমস্ত প্রচলিত ভাষায় গালাগাল বেছে বেছে তাকে ঝাড়তে থাকেন। বেচারা গরিব জলভরা চোখে চুপচাপ পাষাণের মতো শুনতে থাকে, যেন সে কাউকে খুন করে ফেলেছে। সামান্য ব্যাপারে

বড়োবাবুর এত ভয়ংকর রূপধারণ করাটা আমার খুব খারাপ লাগে। যদি অন্য কোনো চাপরাশি এর চেয়েও বেশি অপরাধ করত তাহলেও তার প্রতি এত কঠোর ব্যবহার করা হত না। আমি ইংরেজিতে বলি—বড়োবাবু আপনি অন্যায় করছেন, সে তো আর জেনেশুনে কালি ফেলেনি। এই ব্যাপারে এত কঠিন সাজা দেওয়াটা অনৌচিত্যের পরাকাষ্ঠা।

বড়োবাবু নম্রভাবে বলেন—আপনি একে জানেন না, মহা বদমাইশ।

আমি এর কোনো বদমাইশি দেখি না।

আপনি একে এখনও চিনতে পারেননি। বড়ো পাজিও বটে। এর বাড়িতে একজোড়া লাঙলের চাষ হয়, হাজার টাকার লেনদেন করে, অনেক দুধেলা মোষ আছে, ওর দেমাক বেশি।

বাড়ির অবস্থা যদি তেমনই হত তাহলে আপনার কাছে চাপরাশিগিরি করত কেন?

বড়োবাবু গম্ভীর ভাবে বলেন—বিশ্বাস করুন, বড়ো গেঁতো লোক, তাছাড়া রাম কিপটে।

এমন হলেও কোনো অপরাধ সে করেনি।

যদি আপনি আরও কিছুদিন এখানে থাকেন তাহলে জানতে পারবেন এ বেটা কেমন পাজি।

অন্য একজন সহকর্মী বলে ওঠে—দাদা, এর বাড়িতে মনে মনে দুধ-দই হয়, জোয়ার ছোলা মটর মনে মনে হয়, কিন্তু এর কখনও ইচ্ছে হয় না যে দপ্তরের লোকদেরও কিছুটা দেয়। এখানে এসব জিনিসের জন্য সবাইকে হাপিত্যেশ করে থাকতে হয়। ওর ওপর লোকের মন বিষিয়ে যাবে না কেন বলুন? এতসব তো হয়েছে এই চাকরি করেই, নইলে ওর ঘর থেকে এর আগে এক কুনকে খুদও বেরোত না।

বড়োবাবু সংকুচিত হয়ে বলেন—না, না, এটা কোনো ব্যাপার নয়। ওর জিনিস, দেয়া না দেয়া ওর ইচ্ছে। তবে, ও একটা জানোয়ার।

আমি এর মর্ম কিছু কিছু বুঝতে পারি। বলি—সত্যি তো, যদি এমন ছোটো মনের লোক হয়ে থাকে, তাহলে বাস্তবিক পশু। আমি এটা জানতাম না।

এবার বড়োবাবু মনের কথা খুলে বলেন, সংকোচ দূর হয়। বলেন—এসব সওগাত পেয়ে কারো কোনো মোক্ষ লাভ হয় না, শুধু যে দেয় তার হৃদয়ের উদারতা প্রকাশ পায়। তাছাড়া যে এসবের যোগ্য তার কাছেই আশা করা চলে। যার কোনো সামর্থ্য নেই তার কাছে আশাও করা যায় না। ন্যাংটার কাছ থেকে কে আর কী পাবে?

রহস্য উন্মোচিত হয়। বড়োবাবু সহজেই সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে দেন। সমৃদ্ধির শত্রু সকলেই হয়, শুধু ছোটো না, বড়োরাও। আমাদের শ্বশুরবাড়ি কিংবা মামার বাড়ি যদি দরিদ্র হয় আমরা তাদের কাছে কোনো আশা করতে পারি না। একসময় আমরা তাদের ভুলেও যাই, কিন্তু তারা সমর্থ হয়েও যদি আমাদের খোঁজখবর না করে, পালা-পরবে যদি কিছু না পাঠায়, তাহলে আমাদের খুব খারাপ লাগে।

আমরা কোনো গরিব বন্ধুর কাছে গিয়ে এক খিলি পান পেয়েই সন্তুষ্ট থাকি, কিন্তু এমন কে আছে যে ধনী বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে জলখাবার না খেয়ে ফিরে এসে গালাগালি দেবে না এবং চিরকালের জন্য তিরস্কার করবে না। সুদামা যদি কৃষ্ণের বাড়ি থেকে নিরাশ হয়ে ফিরত, তাহলে সেও হয়তো শিশুপাল ও জরাসন্ধের চেয়ে বড়ো শত্রু হয়ে দাঁড়াত। এটাই মানুষের স্বভাব।

কয়েকদিন পরে আমি গরিবকে জিজ্ঞেস করি—তোমার কিছু চাষবাস আছে কী?

গরিব দীনভাবে বলে—হ্যাঁ হুজুর, চাষবাস হয়, হুজুরের দুই গোলাম আছে। তারাই করে।

আমি প্রশ্ন করি—গোরু-মোষ আছে?

— হ্যাঁ হুজুর, দুটো মোষ দুধ দেয়। গোরুটা এখনও গাভিন হয়নি। আপনাদের দয়ায় পেটের অন্ন জুটে যায়।

— দপ্তরের বাবুদের কখনও খাতির-টাতির কর তো?

গরিব খুব বিনীত ভাবে বলে—হুজুর, আমি বাবুলোকদের কী বা খাতির করতে পারি। খেতে যব, ছোলা, ভুট্টা, জোয়ার, ঘাসপাতা ছাড়া আর কী বা জন্মায়। আপনারা হুজুর রাজা মানুষ, এই সব মোটা ভারী জিনিস কোন মুখে ভেট করি। ভয় লাগে পাছে বকুনি দিয়ে না বসেন—এককড়ির লোক তার এত বুকের পাটা। এই জন্য বাবু কখনও সাহস হয় না। নইলে দুধ-দইয়ের কীসের অভাব। কিন্তু সে তো আপনাদের উপযুক্ত হওয়া চাই।

— ভালো কথা, একদিন কিছু এনে দাও এদের, দেখ এঁরা কী বলেন। শহরে এসব জিনস কোথায় বা পাওয়া যায়! মাঝেমাঝে মোটাভারী জিনিস খেতেও তো এঁদের ইচ্ছে হয়।

— আজ্ঞে, যদি কেউ কিছু বলে? যদি সাহেবকে কেউ লাগিয়ে দেয় তাহলে আমার একূল-ওকূল দুটোই ডুববে।

— আমি এর দায়িত্ব নিলাম। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। কেউ যদি কিছু বলেও, আমি তাকে বুঝিয়ে দেব।

— হুজুর, এখন মটরের ফসলের সময়, কলুর ঘানিও চলছে। ছোলার শাকও হয়েছে।

— ঠিক আছে, তাই এনো।

— কোনো গোলমাল হলে আপনাকেই সামলাতে হবে।

— আচ্ছা, আচ্ছা, বললাম তো আমি দেখব।

পরদিন গরিব আসে, সঙ্গে তিন জন হৃষ্টপুষ্ট যুবক। দুজনের মাথায় দুটো ঝুড়ি। তাতে মটরের ছড়া ভর্তি। একজনের মাথায় মটকা, তাতে আখের রস। তিন জনই তাদের কাঁধে করে আখের বান্ডিল বয়ে এনেছে। গরিব এসে চুপচাপ বারান্দার সামনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ে। দপ্তরে ঢোকার সাহস হয় না, যেন সে কত অপরাধী। গাছের তলায় দাঁড়াতেই দপ্তরের চাপরাশিরা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা তাকে ঘিরে ঘেলে। কেউ কেউ আখ নিয়ে চুষতে থাকে। কেউ কেউ আবার ঝুড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুটপাট শুরু হয়ে যায়। এরি মধ্যে বড়োবাবুও দপ্তরে এসে হাজির হন। কৌতুক দেখে উচ্চস্বরে বলেন—এখানে এত ভিড় কীসের? যাও, নিজের নিজের কাজ করোগে।

আমি গিয়ে তার কানে কানে বলি—গরিব তার বাড়ি থেকে এসব সওগাত এনেছে, কিছু আপনি রাখুন, বাকিটা এদের মধ্যে ভাগ করে দিন।

বড়োবাবু কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলেন—গরিব, তুমি এসব জিনিস এখানে এনেছ কেন? এক্ষুনি ফেরত নিয়ে যাও, নইলে এক্ষুনি আমি সাহেবকে বলে দেব। আমাদের কি কাঙাল ভেবেছ?

গরিবের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। থরথর করে কাঁপতে থাকে। মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোয় না। অপরাধী চোখে আমার দিকে দেখতে থাকে।

আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাই। অনেক বলাকওয়ার পর বড়োবাবু রাজি হন। প্রতিটি জিনিসের অর্ধেক নিজের বাসায় পাঠান। বাকি অর্ধেক অন্য সকলকে ভাগ করে দেন। এভাবে এই অভিনয় শেষ হয়।

এর পর থেকে দপ্তরে গরিবের সম্মান হতে থাকে। সে আর রোজ বকুনি খায় না। সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে হয় না। কর্মচারীদের ব্যঙ্গ, সহকর্মীদের কটুবাক্য শুনতে হয় না। চাপরাশিরা এখন নিজেরাই তার কাজ করে দেয়। ওর নামেও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন গরিব থেকে গরিবদাস। স্বভাবেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। দীনতার জায়গায় আত্মগৌরব দেখা দিয়েছে। তৎপরতার বদলে আলস্য। সে এখন মাঝেমাঝে দেরি করে দপ্তরে আসে। মাঝেমাঝে শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়িতে বসে থাকে। তার সকল অপরাধ এখন ক্ষমাযোগ্য। এখন তার নিজের প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি হাতে পেয়েছে। সে এখন পাঁচ-দশ দিন পরপর দুধ-দই এনে বড়োবাবুকে ভেট দেয়। সে দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে শিখে গেছে। সরলতার পরিবর্তে এখন তার চালাকি এসেছে। একদিন বড়োবাবু তাকে সরকারি ফর্মের পাশে ছাড়িয়ে আনতে স্টেশনে পাঠান। কয়েকটা বড়ো বড়ো প্যাকেট, ঠেলায় করে আনে। ঠেলাওয়ালার সঙ্গে গরিব বারো আনা ভাড়ায় ঠিক করে। কাগজ দপ্তরে পৌঁছলে সে বড়োবাবুর কাছ থেকে বারো আনা পয়সা ঠেলাওয়ালাকে দেওয়ার জন্য আদায় করে। কিন্তু দপ্তর থেকে বেরিয়ে কিছুটা যেতেই তার উদ্দেশ্য পালটে যায়। নিজের দস্তুরি চাইতে থাকে, ঠেলাওয়ালা রাজি হয় না। গরিব রেগে গিয়ে সমস্ত পয়সা পকেটে পুরে, ওকে ধমক দেয়—একটা ফুটো পয়সাও তুই আর পাবি না। যেখানে পারিস নালিশ কর্‌গে। দেখি তুই আমার কী করতে পারিস।

ঠেলাওয়ালা যখন দেখল, ভেট না দিলে সব পাওনাই গায়েব হয়ে যাচ্ছে, তখন কেঁদেকেটে চার আনা পয়সা দিতে রাজি হয়। গরিব ওকে আট আনা দেয়, আর বারো আনার রসিদ লিখে ওর বুড়ো আঙুলের ছাপ নেয়, তারপর দপ্তরে জমা দিয়ে দেয়।

এই কাণ্ড দেখে আমি থ হয়ে যাই। এই সেই গরিব—কয়েক মাস আগেও সারল্য ও নম্রতার প্রতিমূর্তি ছিল। অন্য চাপরাশির কাছ থেকেও নিজের ভাগের টাকা চাইতে তার সাহস হত না। অন্যকে খাওয়াতেও জানত না, খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তার এই স্বভাবের পরিবর্তন দেখে আমার দুঃখ হয়। এর জন্য দায়ি কে? নিশ্চয় আমিই। আমিই তাকে খোশামোদি ও ধূর্তামির প্রথম পাঠ শেখাই। তার এই ধূর্তামি এখন টুঁটি চেপে ধরছে। তাব সারল্যই যা কিনা অপরের অন্যায় সহ্য করে নিত—তা কি অনেক ভালো ছিল না? আমি যখন তাকে প্রতিষ্ঠা পাবার পথ দেখিয়েছিলাম, সেটা ছিল অশুভ মুহূর্ত, কেননা বাস্তবে সেটাই ছিল তার পতনের ভয়ংকর পথ। আমি বাহ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তার আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে বলি দিয়েছি।

(সমস্যা) অনুবাদ সুবিমল বসাক

অধিকার-রক্ষা

মির দিলাবর আলির একটা ভীষণ তেজি লাল ঘোড়া ছিল। তিনি বলতেন এটা তাঁর এমন ঘোড়া যার পেছনে সারা জীবনের অর্ধেক রোজগার তিনি খরচ করেছেন। তবে আসলে তিনি এই ঘোড়া সস্তা দামে পলটন থেকে কিনেছিলেন। একটা রটনা আছে যে, তার এই ঘোড়া পলটনের বাতিল ঘোড়া। মনে হয়, পলটনের অফিসাররা এই ঘোড়া পলটনে রাখা অনুচিত মনে করে নিলামে চড়িয়ে দিয়েছিলেন। মির সাহেব ছিলেন কাছারির মুহুরি। বাড়ি ছিল শহরের বাইরে। কাছারিতে আসতে তিন মাইল পথ ঠ্যাঙাতে হত, তাই একটা ঘোড়ার খোঁজে ছিলেন। আর এই ঘোড়া সুবিধায় পেয়ে কিনে ফেলেছিলেন। এই তিন বছর ঘোড়া মির সাহেবকেই আনা-নেওয়া করেছে। ঘোড়ার কোনো খুঁত দেখতে পাওয়া যেত না, তবে তার আত্মসম্মানের মাত্রা ছিল একটু বেশি। তাকে তার ইচ্ছার বিরুধে কিংবা কোনো অসম্মানসূচক কাজে লাগানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যাই হোক, সস্তায় তেজি ঘোড়া পেয়ে মির সাহেব আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘোড়া কিনে এনে একেবারে দরজায় বেঁধে দিলেন। সইসের ব্যবস্থা করা ছিল কঠিন ব্যাপার। বেচারা মির সাহেব নিজেই সকাল-সন্ধ্যা ঘোড়ার দলাইমলাই করতেন। ঘোড়া সম্ভবত এই সম্মানে খুশিই হত। এই জন্যই অনেক কম খেতে পেয়েও তাকে অসন্তুষ্ট বলে মনে হত না। মির সাহেবের সঙ্গে তার একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার এই প্রভুভক্তির পরিণাম হয়েছিল তার ক্ষীণ শরীর, তবু ঠিক সময়ে খুশি মনেই সে মির সাহেবকে কাছারিতে পৌঁছে দিত। তার গতিভঙ্গির মধ্যে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেত, দৌড়ে চলাকে তাই সে তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের প্রতিকূল বলেই গণ্য করত। তার দৃষ্টিতে অস্থিরতা ফুটে বেরোত। প্রভুভক্তির জন্য কত জন্মগত অধিকারই না তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে! তবে যদি কোনো অধিকারের প্রতি এখনও তার যথার্থ প্রেম থেকে থাকে তা হল রবিবারের পূর্ণ বিশ্রাম। মির সাহেব রবিবার কাছারি যেতেন না। ঘোড়াকে দলাইমলাই করতেন, চান করাতেন, সাঁতার কাটাতেন। এসব করে তিনি মানসিক আনন্দ লাভ করতেন। কাছারিতে গাছের নীচে বাঁধা অবস্থায় ঘোড়াকে শুকনো ঘাস চিবোতে হত, লু লেগে সমস্ত শরীর তার ঝলসে যেত। অন্য দিকে একটা দিন আস্তাবলের শীতল ছায়ায় সবুজ দূর্বাঘাস খাবার সুযোগ সে পেত। অতএব রবিবারের আরামকে সে তার ন্যায্য পাওনা বলেই মনে করত এবং এই অধিকার তার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নেবে এটা সে মেনে নিতে পারত না। মির সাহেব কখনও কখনও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রবিবার বাজারে যাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ঘোড়া তার মুখে লাগামটা পর্যন্ত লাগাতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত মির সাহেব হার স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি তার আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে নিজের ক্ষমতার পরীক্ষায় যেতে চাননি।

দুই

মির সাহেবের এক প্রতিবেশী ছিলেন মুনশি সওদাগরলাল। তাঁরও কাছারির সঙ্গে কিছু সম্পর্ক ছিল। তবে তিনি মুহুরিও ছিলেন না, কর্মচারীও ছিলেন না। কেউ তাঁকে সেখানে লেখাপড়ার কোনো কাজেও দেখেনি। তবু উকিল ও মোক্তারের সমাজে তাঁর যথেষ্ট খাতির ছিল। তিনি ছিলেন মির সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

জ্যৈষ্ঠ মাস, বিয়ের ধুম পড়ে গিয়েছিল। বাজনদাররা কথাই বলতে চায় না, আতশবাজিওয়ালাদের দরজায় দরজায় লোক হন্যে হয়ে ঘুরছে, ভাঁড় ও কথকরা লোককে নাচিয়ে মারছে আর পালকিবাহক কাহার যেন পাথরের দেবতা, পূজা পেয়েও অনড়। লগনসার এই ভিড়ে মুনশিজিও নিজের ছেলের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। নিজে ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তি, দেখতে দেখতে বিয়ের সব ব্যবস্থাই করে ফেললেন, পারলেন না কেবল পালকির ব্যবস্থা করতে। কাহাররা শেষ সময়ে এসে বায়নার টাকা ফেরত দিয়ে গেল। মুনশিজি খুব রাগ করলেন, ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন বলে ভয় দেখালেন, কিন্তু কোনো ফল হল না। হাল ছেড়ে দিয়ে মুনশিজি এই সিম্ধান্ত করলেন যে, বরকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে শোভাযাত্রা করার প্রথা পুরোপুরি পালন করা হবে। সন্ধ্যা ছটায় বর নিয়ে বরযাত্রীদের রওনা হবার কথা ছিল। চারটার সময়ে মুনশিজি এসে মির সাহেবকে বললেন, দোস্ত, আপনার ঘোড়াটা একটু দেবেন, বর নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত যাবে। পালকি তো কোথাও পাওয়া গেল না।

মির সাহেব—আপনার খেয়াল নেই, আজ যে রবিবার।

মুনশিজি—খেয়াল থাকবে না কেন? ঘোড়া তো আজ বসেই আছে। কোনো রকমে স্টেশনে ঠিক পৌঁছেই দেবে। খুব বেশি দূর কী?

মির সাহেব—এতো আপনারই ঘোড়া, নিয়ে যান। তবে বলতে পারছি না আজ ওর পিঠে কারোর হাত সে রাখতে দেবে কিনা।

মুনশিজি—মারের চোটে ভূত পালায়। আপনি ভয় পান তাই আপনার সঙ্গে বদমাইশি করে। ছেলে একবার পিঠে উঠে বসতে পারলে যতই লাফালাফি করুক না কেন তাকে তো আর ফেলে দিতে পারবে না।

মির সাহেব—ঠিক আছে, নিয়ে যান। তবে আপনি যদি ওর এই জেদ ভাঙতে পারেন তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

তিন

কিন্তু মুনশিজি আস্তাবলে পৌঁছতেই ঘোড়া সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে একবার চিঁহি করে যেন জানিয়ে দিল—তুমি কে আজ আমার শান্তি বিঘ্নিত করতে এলে। বাদ্যযন্ত্রের ঘড়ঘড়, পোঁপোঁ শুনে এমনিতে সে উত্তেজিত হয়ে ছিল। মুনশিজি যখন দড়ি খুলতে শুরু করলেন তখন সে কান খাড়া করে অভিমানভরে কাঁচা ঘাস খেতে আরম্ভ করল।

তবে মুনশিজিও ছিলেন চতুর খেলোয়াড়। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে কিছু ছোলা চেয়ে এনে ঘোড়ার সামনে ধরলেন। এদিকে, ঘোড়া অনেক দিন ছোলা চোখেও দেখেনি। সে খুব আগ্রহ

সহকারে খেতে শুরু করে মুনশিজির দিকে কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে চেয়ে দেখল। মনে হল সে যেন অনুমতি দিল যে মুনশিজির সঙ্গে যেতে তার কোনো আপত্তি নেই।

মুনশিজির বাড়ির সামনে বাজনা বাজছিল। পোশাক-আশাক পরে বর ঘোড়ার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। পাড়ার মহিলারা তাকে যাত্রা করিয়ে দেবার জন্য প্রদীপ ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। হঠাৎ মুনশিজিকে ঘোড়া নিয়ে আসতে দেখা গেল। বাজনদাররা এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হল। একজন লোক মির সাহেবের বাড়ি থেকে দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার সাজপোশাক নিয়ে এল।

ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগাবার জন্য দাঁড় করাতেই দেখা গেল ঘোড়া লাগাম দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। মুনশিজি মুখে চুচু শব্দ করে, শিস দিয়ে আদর করলেন, পিঠে সুড়সুড়ি দিলেন, তার সামনে আবার ছোলা এনে রাখলেন, কিন্তু ঘোড়া মুখ খুলল না। মুনশিজির তখন রাগ হল। পরপর চাবুক চালালেন, কিন্তু তবুও যখন ঘোড়া লাগাম পরতে চাইল না তখন তিনি ঘোড়ার নাকে বার কয়েক ঘা লাগালেন। নাক থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। ঘোড়া তখন বিষণ্ন চোখে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে বুঝল সমস্যা খুব কঠিন। কোনো দিন সে এত মার খায়নি। সে ছিল মির সাহেবের নিজের ঘোড়া, তাই মির সাহেব কখনও তার সঙ্গে এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেননি। সে ভাবল, মুখ না খুললে না জানি আরও কত মার খেতে হবে। তাই লাগাম পরতে আর আপত্তি করল না। আর কী, মুনশিজির বাজিমাত। সঙ্গে সঙ্গে জিন এটে ফেলা হল। বরও লাফ দিয়ে উঠে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বসল।

চার

বর ঘোড়ার পিঠে আসন গেড়ে বসতেই ঘোড়ার যেন নিদ্রাভঙ্গ হল। সে চিন্তা করতে লাগল— ক টা ছোলার বিনিময়ে আমার এই অধিকার ত্যাগ করার অর্থ এক বাটি তরকারির জন্য নিজের জন্মগত অধিকার বেচে দেওয়া। তার মনে হল—আমি আজ কতদিন ধরে রবিবারে একটু আরাম করি, আজ মিছিমিছি কেন বেগার খাটতে যাব? এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে। যে-ছোকরা পিঠে বসেছে তাকে তো খুব সেয়ানা মনে হচ্ছে। আমাকে ছোটাবে, পা দিয়ে পেটে মারবে, চাবুক মেরে মেরে আধমরা করে ছাড়বে। তারপর কে জানে খেতে দেবে কি না দেবে। এসব চিন্তা-ভাবনা করে সে ঠিক করল—আর এখান থেকে এক পা নড়ব না। কী করবে, মারবে। সওয়ার পিঠে নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ব, তখন নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে। আমার মালিক মির সাহেবও তো এদিকে কোথাও থেকে থাকবেন। আমাকে অত মারতে তিনি দেবেন না। কাল তো তাহলে কাছারিতেই নিয়ে যেতে পারব না।

ঘোড়ায় উঠে বসতেই মহিলারা মঙ্গল সংগীত গাইলেন। পুষ্পবৃষ্টি শুরু হল। বরযাত্রীর দল এগোতে লাগল, কিন্তু ঘোড়া এমন বেঁকে দাঁড়াল যে পা তুললই না। বর পেটে গুঁতো মারল, চাবুক লাগাল, লাগাম ধরে টানল, কিন্তু মনে হচ্ছিল ঘোড়া পা মাটিতে এমন ভাবে গেড়ে বসেছে যে, আর উঠবেই না।

মুনশিজির এমন রাগ হল যে; নিজের ঘোড়া হলে গুলি করেই মেরে ফেলতেন। এক বন্ধু বললেন—একগুঁয়ে জানোয়ার। এতে কাজ হবে না। পেছনে ডান্ডা পড়লে ঠিক দৌড়াবে।

মুনশিজি এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। পেছনের দিকে গিয়ে বেশ কবার লাঠি চালালেন। ঘোড়া কিন্তু পা তুলল না। যদিও বা তুলল সামনের পা, তাও আবার আকাশের দিকে। দু-একবার পেছনের পাও তুলল, যেন বোঝাবার জন্য যে সে একেবারে প্রাণহীন নয়। মুনশিজিও অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন।

তখন আর এক বন্ধু বললেন—এটার লেজের কাছে একটা জ্বলন্ত চেলাকাঠ ধরো। আগুনের ভয়ে ছুটবে।

এই প্রস্তাবও গৃহীত হল। ফল হল এই যে, ঘোড়ার লেজ জ্বলে গেল। ঘোড়া দু-তিনবার লাফিয়ে উঠল, কিন্তু এগোল না। সে ছিল যথার্থ এক সত্যাগ্রহী, তাই এসব অত্যাচার তাকে তার সংকল্পে আরও দৃঢ় করে তুলল।

এরই মধ্যে সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল। পণ্ডিতজি বললেন—তাড়াতাড়ি করুন, নইলে সময় পার হয়ে যাবে। বললে হবে কী, তাড়াতাড়ি করতে বললেই তো আর হয় না। বরযাত্রীদের দল ততক্ষণে গ্রামের বাইরে চলে গেছে। এদিকে শুধু স্ত্রীলোক আর বাচ্চাদের ভিড়। লোক বলতে শুরু করল—এ কেমন ঘোড়া, পা পর্যন্ত উঠাচ্ছে না। এক সহানুভূতিসম্পন্ন ভদ্রলোক বললেন—মারপিটে কাজ হবে না। কিছু ছোলা একটা ঝোলায় করে দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলুক। ছোলার লোভে দেখবেন তাড়াতাড়ি যাবে। মুনশিজি এব্যবস্থা করেও সফলমনোরথ হতে পারলেন না। ঘোড়া তার আপন অধিকার কোনো মূল্যেই বিকিয়ে দিতে রাজি নয়। এক ভদ্রলোক বললেন—এই ঘোড়াকে কিছুটা মদ খাইয়ে দিন, নেশা হয়ে গেলেই চরকি কাটতে শুরু করবে। মদের বোতল এল। একটা বেলিতে ঢেলে ঘোড়ার সামনে সে মদ রাখা হল, কিন্তু সে শুঁকেও দেখল না।

এখন কী করা? আলো জ্বলে উঠেছে, সময়ও বসে নেই। এসব নানা অত্যাচার সহ্য করেও ঘোড়া কিন্তু মনে মনে খুশিই হচ্ছিল। তার অধিকার কেড়ে নেবার কাজে যারা রত তাদের অসুবিধাগ্রস্ত ও উদ্‌বিগ্ন দেখে তার খুব আনন্দও হচ্ছিল। এই সব লোকের ধৈর্য ও নিষ্ঠা দেখে সে এক রকমের দার্শনিক অনুভূতির আনন্দ পাচ্ছিল। সে অপেক্ষা করছিল ওরা এখন আব কী করে তা দেখার জন্য। সে বুঝেছিল, এখন আর মার খাবার সম্ভাবনা নেই। কারণ সকলেই এটা বুঝতে পেরেছিল যে, মেরে আর কোনো লাভ হবে না। এখন সে ওদের বিভিন্ন উপায়গুলোর কথা ভাবছিল।

কয়েকজন ভদ্রলোক বললেন—এখন আর একটাই রাস্তা খোলা আছে। মাঠে ময়লা ফেলার যে দু-চাকার গাড়ি আছে তাই এনে ঘোড়ার সামনে রাখা হোক। তারপর ঘোড়ার সামনের পা দুটো সেই গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা সবাই গাড়ি টেনে নিয়ে যাব। তাহলেই ঘোড়ার পেছনের পা গাড়িতে উঠে আসবে। সামনের পা যদি এগোয় তবে পেছনের পাও বাধ্য হবে উঠতে। ঘোড়াও চলবে।

মুনশিজি হলেন নিমজ্জমান ব্যক্তি। তৃণখণ্ডের সাহায্যও তাঁর কাছে যথেষ্ট। দুজন লোক গিয়ে দু-চাকার গাড়ি বের করে নিয়ে এল। বর লাগাম টেনে ধরলে চার-পাঁচজন ঘোড়ার পাশে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দুজন লোক তখন প্রায় জবরদস্তি করে ঘোড়ার সামনের পা দুটো গাড়িতে তুলে দিল। ঘোড়া এতক্ষণ পর্যন্ত এটা ঠিক করে রেখেছিল যে, এভাবেও কিছু করতে দেব না। কিন্তু গাড়ি যখন চলতে শুরু করল পেছনের পা তখন আপনা থেকেই গাড়িতে উঠে এল। তার মনে হচ্ছিল যেন সে জলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে খালি চাইছিল কোনোরকমে পা দিয়ে গাড়ি আটকে দেবে, কিন্তু

কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল—চলেছে চলেছে। হাততালি পড়তে লাগল। মজা পেয়ে সবাই হাসতে লাগল। এই উপহাস ও অপমান ঘোড়ার অসহ্য মনে হতে লাগল। কিন্তু কীই বা করে? সে ধৈর্য হারাল না। মনে মনে ভাবল—এভাবে আর কতদূর নিয়ে যাবে। যখনই গাড়ি থামবে আমিও তো দাঁড়িয়ে যাব। আমার খুব ভুল হয়ে গেছে, গাড়িতে পা রাখা ঠিক হয়নি।

যা সে ভেবেছিল শেষে তাই হল। কোনো রকমে একশো গজ তো টেনে নিয়ে গেল, তারপর আর এগোতে পারল না। যদি শ-দুশো গজ রাস্তা হত তাহলে হয়তো কেউ হাল ছাড়ত না। কিন্তু স্টেশনের দূরত্ব ছিল পুরো তিন মাইল। অত দূর ঘোড়া টেনে নিয়ে যাওয়া ছিল এক অসাধ্য ব্যাপার। যেই গাড়ি টানা বন্ধ হয় অমনি ঘোড়াও হয় নিশ্চল। বর আবার লাগাম ধরে ঝটকা মারে, পা দিয়ে পেটে গুঁতো লাগায়, চাবুকের পর চাবুক চালায়, কিন্তু ঘোড়া তার জেদ ছাড়ে না। তার নাক দিয়ে আবার রক্ত ঝরতে লাগল। চাবুকে চাবুকে পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। পেছনের পা দুটো কেটে গিয়েছিল। কিন্তু সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ঘোড়া তার সংকল্পে অটল।

পাঁচ

পুরোহিত বললেন—আটটা বেজে গেছে। সময় পার হয়ে গেছে। অসহায়, দুর্বল ঘোড়া বাজিমাত করে ফেলল। মুনশিজি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে চিৎকার শুরু করলেন। বরের তো এক পাও হেঁটে যাওয়া চলবে না, বিয়ের লগ্নে বরকে মাটিতে পা রাখতে নেই। রাখলে নিয়ম ভঙ্গ হবে, নিন্দা হবে, কুলে কলঙ্ক লাগবে, কিন্তু এখন তো পায়ে হেঁটে না গিয়ে আর কোনো উপায়ও নেই। মুনশিজি ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, মহাশয়, আপনার ভাগ্য ভালো যে, আপনি মির সাহেবের বাড়ির ঘোড়া। যদি আমি আপনার মালিক হতাম তাহলে আপনার হাড় আর মাংস এক জায়গায় থাকত না। আজ আমার এই জ্ঞান হল যে, পশুও কোনো না কোনো প্রকারে তার অধিকার রক্ষা করতে পারে। আমি জানতাম না যে আপনি ব্রতধারী। বেটা, নেমে পড়, বরযাত্রীরা এতক্ষণে স্টেশনে পৌঁছে গিয়ে থাকবে। চল্, হেঁটেই যাই। আমরা নিজেরা দশ-বারোজন রয়েছি, হাসবার কেউ নেই। তবে এই রঙিন পোশাক খুলে ফেল, নইলে রাস্তার লোক দেখে হাসবে। বলবে, পায়ে হেঁটে বিয়ে করতে যাচ্ছে। চলেরে, জেদি ঘোড়া, তোকে মির সাহেবের কাছে রেখে আসি।

(স্বত্বরক্ষা / ১৯২২)

অনুবাদ অমলকুমার রায়

বিধ্বংস

বেনারস জেলায় বীরা নামে একটা গ্রাম আছে। সে গ্রামে এক সন্তানহীনা বিধবা বৃদ্ধা গোন্ড স্ত্রীলোক বাস করত। নাম তার ভুনগি। তার না ছিল এক ছটাক জমি, না ছিল থাকার ঘর। তার জীবনের অবলম্বন ছিল কেবল একটা বড়ো উনুন। গাঁয়ের লোকেদের খাবার হিসেবে একবেলার মতো ছোলা-ভুট্টা ভাজা কিংবা ছাতু জুটত। তাই ভুনগির উনুনের ধারে নিত্য ভিড় লেগে থাকত। ভাজতে গিয়ে সে তার ভাগে যেটুকু পেত তাই ভেজে বা পিষে খেয়ে নিত; তারপর ঝুপড়ির এক ধারে উনুনের পাশে পড়ে থাকত। সে খুব সকালে উঠত, তারপর চার পাশ থেকে উনুন ধরাবার জন্য শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনত। কাছেই পাতার বিশাল এক টাঁই। দুপুরের পর সে তার উনুনে আঁচ দিত। একাদশী বা পূর্ণিমার দিন প্রথানুসারে উনুন ধরানো হত না, কিংবা যেদিন গাঁয়ের জমিদার পণ্ডিত উদয়ভানু পাণ্ডের দানা ভাজতে হত সেদিন তাকে উপোসি থেকেই শুয়ে পড়তে হত। পণ্ডিত তার কাছে থেকে বিনে মজুরিতে শুধু দানাই ভাজাত না, তাকে মাঝে মাঝে পণ্ডিতের বাড়ির জলও তুলে দিতে হত। সে কারণেও মাঝেসাঝে তার উনুন ধরত না। সে পণ্ডিতের গাঁয়ে থাকত, তাই পণ্ডিতের পুরো অধিকার ছিল তার কাছ থেকে সব রকমের বেগার নেওয়ার। একে অন্যায় বলা যায় না। অন্যায় শুধু এটুকু যে পণ্ডিত তার কাছ থেকে শুখা বেগার নিত। তার ধারণা, খাবার যদি দেওয়া হয়, তাহলে বেগার কীসের! কৃষকের অধিকার আছে বলদদের সারা দিন চাষের কাজে খাটিয়ে নিয়ে সাঁঝবেলায় উপোসি রেখে খুঁটির সঙ্গো বেঁধে রাখা। কিন্তু সে যদি এমন না করে তাহলে সেটা তার দয়া নয় বরং নিজের স্বার্থের কারণেই। পণ্ডিতের এধরনের চিন্তাই ছিল না, কেননা প্রথমত ভুনগি দু-একদিন উপোসে থাকলে মরবে না, যদি বা দৈবযোগে মারাও যায়, তার জায়গায় অন্য কোনো গোন্ডকে অনায়াসে বসানো যাবে। পণ্ডিতজি যে ভুনগিকে তাঁর গাঁয়ে বাস করতে দিয়েছেন সেটা কি তাঁর কম কৃপা!

দুই

চৈত্র মাস, সংক্রান্তি পর্ব। এই দিনে নতুন শস্যের ছাতু খাওয়া হয়, দান করা হয়। ঘরে সেদিন আর উনুন ধরানো হয় না। ভুনগির উনুনের উপর আজ খুব চাপ পড়েছে। সামনে যেন একটা মেলার মতো বসেছে। নিঃশ্বাস নেওয়ার ফুরসতটুকুও নেই। খদ্দেররা তাড়া দেওয়ায় সে মাঝে মাঝে ঝাঁঝিয়ে উঠছিল, এমন সময় জমিদারবাড়ি থেকে শস্যভরা দুটো বড়ো বড়ো ঝুড়ি এসে হাজির। হুকুম হয়—এক্ষুনি ভেজে দাও। ভুনগি ঝুড়ি দুটো দেখে একেবারে দমে যায়। এখন দুপহর,

সূর্যাস্তের আগে এত ভেজে শেষ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। আরও ঘন্টাখানেক বা দুঘন্টা সময় পেলে হয়তো সপ্তাহ খানেকের মতো খাবার জড়ো করতে পারা যেত। হায়, ঈশ্বর সেটুকুও সহ্য করতে পারে না,এই যমদূতদের পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন প্রহর-রাত অবধি অমনি অমনি উনুনের ধারে জ্বলতে হবে। হতাশ ভাবে ঝুড়ি দুটো সে তুলে নেয়।

চাপরাশি ধমক দিয়ে বলে—দেরি যেন না হয়, তাহলেই বুঝবি।

ভুনগি—বেশ তো, এখানে বসে থাকো। ভাজা হয়ে গেলে নিয়ে খেও। অন্য কারোর ভাজলে আমার হাত কেটে বাদ দিও।

চাপরাশি—আমার বসায় সময় নেই। তৃতীয় পহরে যেন ভাজা তৈরি থাকে।

চাপরাশিরা সবাধান করে দিয়ে চলে যায়, ভুনগি দানা ভাজতে শুরু করে। কিন্তু মন খানেক দানা ভাজা তো আর ঠাট্টা নয়, তার ওপর আবার মাঝে মাঝে ভাজা বন্ধ করে উনুনে পাতা গুঁজতে হয়। অতএব তৃতীয় প্রহর হল, অথচ অর্ধেক কাজও হল না। ভয় হতে থাকে জমিদারের লোক বুঝি চলে এল। আসার সঙ্গে সঙ্গেই গালাগাল দেবে, মারধোর করবে। সে আরও তাড়াতাড়ি হাত চালাতে শুরু করে। রাস্তার দিকে তাকায়, হাঁড়িতে বালি ফেলতে থাকে। এক সময় বালিও ঠান্ডা হয়ে পড়ে, দানা আধ-ভাজা হতে থাকে। তার বুদ্ধিতে কুলোয় না সে কী করবে। ভাজাও হয় না, ছাড়াও যায় না। ভাবে, আচ্ছা বিপদ তো! পণ্ডিতজি তো আমার পেটের জোগাড় করে দেন না, আমার দুঃখও ঘোচান না। নিজের রক্ত জল করে তবে দুমুঠো খাবার মেলে। কিন্তু যখনই কিছু হয়, অমনি ঘাড়ের ওপর চেপে বসে, কেননা ওর চার আঙুল জমিতে আমার গতি। এই সামান্য জমির দাম এত হতে পারে? এমন কত টুকরো জমিই না গাঁয়ে মিছিমিছি পড়ে আছে, কত মরাই ফাঁকা পড়ে আছে। হুঁ, সে জায়গায় তো সোনা ফলে না, তবে কেন অষ্টপ্রহর আমার ওপর এমন দাপট! কোনো কিছু হলেই ভয় দেখায়—উনুন তুলে ফেলে দেব, ভেঙে ফেলব, আজ আমার মাথার ওপর যদি কেউ থাকত তাহলে কি এত চোখ রাঙানি সহ্য করতে হত।

এইসব কুৎসিত ভাবনায় যখন সে মগ্ন তখন দুই চাপরাশি এসে কর্কশ স্বরে বলে—কী রে, ভাজা হয়েছে?

ভুনগি নিঃশঙ্ক হয়ে বলে—ভাজছি তো। দেখতে পাচ্ছ না?

চাপরাশি—গোটা দিন পার হল, আর তোর এই দানা ভাজা হল না? এ তুই কী ভাজছিস? ওটার যে বারোটা বাজাচ্ছিস! আধভাজা রেখে দিয়েছিস, এ দিয়ে ছাতু হবে কী করে? আমার সর্বনাশ করে দিয়েছিস। দেখিস, আজ জমিদার বাবু তোর কী গতি করে।

পরিণামে, সেই রাতে উনুন উপড়ে ফেলা হল এবং সেই অভাগিনী বিধবা অবলম্বনহীন হয়ে পড়ল।

তিন

ভুনগির এখন পেট চালাবার কোনো উপায় নেই। উনুন বিধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে গাঁয়ের বাসিন্দাদেরও বেশ কষ্ট হতে থাকে। অনেক ঘরে দুপুরে অর ভুজা মেলে না। গাঁয়ের লোকেরা পণ্ডিতকে গিয়ে ধরে, বলে—বুড়িকে উনুন পাতার আজ্ঞা করুন, কিন্তু পণ্ডিত তাদের কোনো

কথায় কান দিতে নারাজ। সে তার দাপট কম করতে চায় না। বুড়িকে তখন কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী অনুরোধ জানায় সে যেন অন্য কোনো গাঁয়ে গিয়ে বাস করে। কিন্তু বুড়ির মন এই প্রস্তাব মানতে চায় না। এই গাঁয়ে সে তার দুঃখী জীবনের পঞ্চাশটা বছর কাটিয়েছে। এখানকার প্রতিটি গাছগাছালির সঙ্গে তার টান—ভালোবাসার সম্পর্ক। জীবনের সুখদুঃখ সে এ গাঁয়েই ভোগ করেছে। এখন শেষ বয়সে সে এটা ত্যাগ করে কীভাবে! এই চিন্তাই তার কাছে দুঃসহ বলে মনে হয়। অন্য গাঁয়ে সুখের চেয়ে এখানকার দুঃখও অনেক ভালো।

এভাবে একটা পুরো মাস পার হয়। সকাল বেলা। পণ্ডিত উদয়ভানু দু-তিনটে পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে খাজনা আদায় করতে বেরিয়েছে। কর্মচারীদের ওপর তার বিশ্বাস নেই। নজরানা, দণ্ড ও জরিমানা আর প্রথানুসারে প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে সে সচরাচর অন্য লোকদের সঙ্গে নিত না। বুড়ির উনুনের দিকে তাকাতেই তার শরীরে আগুনের তাপ যেন এসে লাগে। নতুন করে উনুন বানানোর কাজ চলছিল। বুড়ি ক্ষিপ্র হাতে ভাঙা উনুনের ওপর মাটির দলা রাখছিল। রাত থাকতেই সে কাজে হাত দিয়েছে এবং সূর্যোদয়ের আগেই কাজটা সে শেষ করে ফেলতে চাইছিল। তার লেশমাত্র শঙ্কা ছিল না যে এর দ্বারা সে জমিদারের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে চলেছে। ক্রোধ যে এমন জিইয়ে থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনাও তার মনে ছিল না। প্রতাপশালী কোনো পুরুষ যে কোনো দীন অবলার প্রতি এত দ্বেষ জমিয়ে রাখতে পারে, এমন ধারণাও তার ছিল না। সে স্বভাবত মানবচরিত্রকে এর চেয়ে আরও উঁচু মনে করত। কিন্তু, হা হতভাগিনী! মিছিমিছিই তোর চুলে পাক ধরেছে!

সহসা উদয়ভানু গর্জে বলে ওঠে—কার হুকুমে?

ভুনগি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখে সামনে জমিদার বাবু দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়ভানু আবার জিজ্ঞেস করে—কার হুকুমে পাতছিস?

ভুনগি ভয়ে ভয়ে বলে—সবাই পাততে বলছিল, তাই পাতছি।

উদয়ভানু—আমি এখন এটাকে আবার ভেঙে ফেলব। এই বলে সে উনুনে একটা লাথি মারে। নরম মাটি, সব নিয়ে টিয়ে একেবারে বসে যায়। হাঁড়ির ওপর আর একটালাথি চালায়, কিন্তু বুড়ি সামনে এগিয়ে আসতে পা-টা তার কোমরে গিয়ে পড়ে। এরপর তার রাগ হয়। কোমরে হাত বুলোতে জীবন বুলোতে সে বলে ওঠে—মহারাজ, মানুষের ভয় তোমার না থাক, কিন্তু ভগবানের ভয় থাকা উচিত। আমাকে এভাবে উচ্ছেদ করে তুমি কী পাবে? এই চার আঙুল জমি থেকে কি সোনা বেরিয়ে আসবে? আমি তোমার ভালোর জন্য বলছি, গরিবের অভিশাপ নিও না। আমাকে আর দুঃখ দিও না।

উদয়ভানু—এখন আর উনুন পাততে পারবি না।

ভুনগি—উনুন না পাতলে খাব কী?

উদয়ভানু—তোর খাওয়ার ঠিকে কি আমি নিয়েছি?

ভুনগি—কেন, তোমারই তো বেগার দি, খাবার জন্য কোথায় যাব?

উদয়ভানু—গাঁয়ে থাকতে হলে বেগার দিতেই হবে।

ভুনগি—উনুন পাতলে পরেই বেগার দেব। গাঁয়ে বসবাস করার জন্য বেগার দিতে পারব না।

উদয়ভানু—তাহলে গাঁ ছেড়ে চলে যা।

ভুনগি—কেন ছেড়ে যাব? বারো বছর মাঠে চাষ করলে প্রজার স্বত্ব জন্মায়। আমি এই ঝুপড়িতে জীবন কাটিয়ে বুড়ি হয়ে গেছি। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, তাদের বাপঠাকুরদাও এই ঝুপড়িতেই থেকেছে। এখন শুধু যম ছাড়া আর কেউ আমাকে সরিয়ে নিতে পারবে না।

উদয়ভানু—ওঃ, এখন দেখছি আবার আইন কপচানো হচ্ছে। হাতে পায়ে ধরলে হয়তো আমি থাকতে দিতাম। কিন্তু, এখন আমি তোকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব। (চাপরাশিদের) এক্ষুনি গিয়ে ওর পাতার গাদায় আগুন ধরিয়ে দে, দেখি এখন কী করে উনুন পাতে?

চার

মুহূর্তে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে। লেলিহান শিখা আকাশের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। অগ্নিশিখা উন্মত্তের মত ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে। গাঁয়ের সব লোক ওই অগ্নিপর্বতের চারদিকে জড়ো হয়। ভুনগি তার উনুনের ধারে উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে এই লংকাদহন দেখতে থাকে। সহসা সে দ্রুতবেগে ছুটে এসে ওই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকেরা চারদিক থেকে ছুটে আসে, কিন্তু কারও সাহস হয় না সেই আগুনের মধ্যে ঢোকে। মুহূর্তে তার চিমসে শরীরটা আগুনে মিশে যায়।

সেই সময় বাতাস দ্রুত বইতে শুরু করে। উর্ধ্বগামী অগ্নিশিখা পুব দিকে ছুটতে থাকে। উনুনের কাছাকাছি চাষিদের কয়েকটা ঝুপড়ি ছিল, উন্মত্ত অগ্নির গ্রাসে সব কটা নিঃশেষ হয়ে যায়। উৎসাহিত হয়ে অগ্নিশিখা আরও এগিয়ে যেতে থাকে। সামনেই পণ্ডিত উদয়ভানুর মরাই, সেখানেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাঁয়ে হইচই পড়ে যায়। আগুন নেবানোর চেস্টা চলতে থাকে। কিন্তু জলের ছিটে যেন তেলের কাজ করে। আগুন আরও লকলক করে উঠে, পণ্ডিতের বিশাল ভবনকে খামচে ধরে। সেই ভবন যেন নৌকোর মতো উন্মত্ত তরঙ্গের মাঝে দুলতে থাকে, তারপর দেখতে দেখতে অগ্নিসমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। সেই ভগ্নাবশেষ থেকে যে কান্নার রোল উঠতে থাকে তা ভুনগির শোকার্ত বিলাপের চেয়েও বেশি বিষাদময়।

(বিধ্বংস / ১৯২২) অনুবাদ সুবিমল বসাক

অধিকার-চিন্তা

টমিকে এমনিতে দেখতে খুব তাগড়া। সে যখন ডাকে তখন লোকের কানের পরদা ফেটে যাওয়ার জোগাড় হয়। গড়ন পেটনও এমন যে, আঁধার রাতে দেখলে গাধা বলে ভুল হয়। কিন্তু কোনো লড়াইয়ের ময়দানেই ওর কুকুরসুলভ বীরত্ব প্রমাণিত হত না। দু-চার বার যখন বাজারের কুকুরীরা ওকে উশকে দিয়েছিল তখন তাদের গর্ব চূর্ণ করার জন্য আসরে নেমে পড়েছিল টমি। দর্শকেরা বলে, যতক্ষণ সে লড়েছে তেজের সঙ্গো লড়েছে। নখ আর দাঁত দিয়ে যত না আঘাত করেছে তার থেকে বেশি করেছে ওর লেজ দিয়ে। কে জিতত তা নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু টমিকেই জয়মাল্য দেওয়া উচিত। কারণ প্রতিপক্ষের তো অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশের প্রয়োজন হয়েছিল। তবে সেই অবসরে টমি কৌশল করে দাঁত বার করে দিল যার অর্থ সে সন্ধি চায়। তারপর থেকে টমি এই রকম নীতিজ্ঞানহীন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গো লড়াই করা আর উচিত বলে মনে করেনি।

এত শান্তিপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু টমির শত্রুসংখ্যা দিনকে-দিন বেড়েই যেতে লাগল। ওর সমান সমান যারা, তারা এই ভেবে রেগে যেত যে, এত তাগড়া তবু টমিটা এত ভিতু কেন। আর বাজারের দলটা এই জন্য জ্বলত যে টমির জ্বালায় হাড়টাড় কিছুই পাবার জো নেই। রাত থাকতেই উঠে সে হালুইকরের দোকানের ঠোঙা এবং পাতা, কসাইখানার সামনে প..ড়-থাকা হাড় ও বাজে মাংসের টুকরো সব শেষ করে দিত। তাই এত সব শত্রুর মাঝখানে টমির জীবন থেকে থেকে সংকটময় হয়ে উঠেছিল। মাসের পর মাস পেট ভরে খাবার মেলে না। দু-তিন বার তার প্রাণ ভরে খাওয়ার এমন প্রবল বাসনা জাগল যে কিছু অসদুপায় অবলম্বন করেও সে তার পূরণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু পরিণাম হল প্রতিকূল। সুস্বাদু খাবারের বদলে এমন সব অরুচিকর অবাঞ্ছিত জিনিস জুটল যে তাতে পেটের বদলে পিঠে কয়েকদিন ধরে বিষম বেদনা লেগে রইল। অতএব নিরাশ হয়ে টমি আবার সৎপথে ফিরে গেল। লাঠ্যৌষধিতে পেট ভরলেও সেই বাসনার কিন্তু নিবৃত্তি হল না। টমি চাইত — আমি এমন একটা জায়গায় যাব যেখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যাবে। খরগোশ, হরিণ এবং ভেড়ার বাচ্চা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াবে এবং তাদের কোনো মালিক থাকবে না। সেখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর গন্ধ মাত্র থাকবে না। আরাম করবার জন্য থাকবে নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া, পান করার জন্য থাকবে নদীর পবিত্র জল, যেখানে ইচ্ছেমতো শিকার করব খাব আর নিদ্রা দেব। চতুর্দিকে আমার অধিকার ছড়িয়ে যাবে। সবার কাছে আমার এমন নাম ডাক হয়ে যাবে যে সবাই আমাকে তাদের রাজা বলে মেনে নিতে শুরু করবে। ধীরে ধীরে

আমার এমন অধিকার কায়েম হয়ে যাবে যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আর সেখানে পদার্পণ করার সাহস পর্যন্ত পাবে না।

মাথা ঝুঁকিয়ে এই সব সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে টমি একদিন বড়ো রাস্তা ছেড়ে গলি দিয়ে চলছিল। হঠাৎ আর এক মহাশয়ের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেল। কোনো রকমে এড়িয়ে পালাবে এই ছিল টমির ইচ্ছা। কিন্তু সেই দুরাত্মা এত শান্তিপ্রিয় নয়, ঝাঁপিয়ে পড়ে টমির টুঁটি চেপে ধরল সে। টমি প্রচুর অনুনয়-বিনয় করল। কাকুতিমিনতি করে বলল, ভগবানের দোহাই, আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দাও, আমি দিব্যি করছি ভাই, আর এ তল্লাটে পা বাড়াব না। নেহাত কপাল খারাপ বলে তোমার শাসনের এলাকায় ঢুকে পড়েছি। কিন্তু মদমত্ত নির্দয় সেই প্রাণী কি তাতে একটুও রেয়াত করল? শেষে হেরে গিয়ে টমি গাধার মতো চিৎকার করে নালিশ জানাতে শুরু করল। এইসব হট্টগোল শুনে আবার সেখানে জড়ো হয়ে গেল এলাকার নেতাগোছের কিছু প্রাণী। কোথায় দয়া দেখাবে, না তার বদলে তারা টমির গায়েই দাঁত বসাতে ছুটে গেল। কিন্তু দুর্বলের উপরই এই অন্যায় ব্যবহারে টমির হৃদয় ভেঙে গেল। প্রাণ হাতে করে পালাল সে। অত্যাচারী জানোয়ারগুলো বহুদূর পর্যন্ত তাকে তাড়া করে এল। এর মধ্যে রাস্তায় একটা নদী পড়ে যাওয়ায় তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাল টমি।

কথায় বলে, সকলেরই একদিন বরাত ফেরে। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে টমির বরাত ফিরে গেল। ঝাঁপ দিয়েছিল প্রাণ বাঁচানোর জন্য, হাতে পেয়ে গেল মুক্তো। সাঁতার কেটে ওপারে পৌঁছে দেখে তার প্রাণে পুষে রাখা এতদিনের সব ইচ্ছা যেন ফলবতী হয়ে রয়েছে।

দুই

সে এক বিশাল প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই সবুজ। কোথাও স্রোতস্বিনীর মধুর কলরব, কোথাও ঝরনার মৃদু সংগীত, কোথাও বা বিস্তীর্ণ বালুকাবেলা। বড়োই সুরম্য মনোহারী দৃশ্য।

সেখানে তীক্ষ্ণ নখরধারী সব পশুর আবাস। তাদের দেখে টমির পিলে চমকে উঠত। কিন্তু তারা টমিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। নিজেদের মধ্যে প্রতিদিন লড়াই করত তারা। রক্তের নদী বয়ে যেত। টমি দেখল এই সব ভয়ঙ্কর জানোয়ারদের সঙ্গে লেগে পার পাবে না। সে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করল। যখনই দুটো জানোয়ারের মধ্যে লড়াই হতে হতে একটা ঘায়েল হয়ে বা মরে গিয়ে মাটিতে পড়ত তক্ষুনি লাফ দিয়ে মাংসের কিছু টুকরো নিয়ে পালাত টমি। তারপর একান্তে বসে সেগুলো খেত। বিজয়ী পশুটি বিজয়ের উন্মাদনায় তাকে তুচ্ছজ্ঞান করত। কিছুই বলত না।

এখন টমির পোয়াবারো। সব সময়েই তার মোচ্ছব চলছে। চর্বচোষ্য কিছুরই কমতি নেই। নিত্যনতুন জিনিস খাচ্ছে আর গাছের নীচে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। এই স্বর্গসুখ সে কল্পনাও করেনি কখনও। মরে নয়, বেঁচে থেকেই তার স্বর্গলাভ হয়ে গেল।

পুষ্টিকর পদার্থ সেবন করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই টমির ভাবসাব একটু অন্য রকম হয়ে দাঁড়াল। তার শরীর হল তেজস্বী, সুগঠিত। এখন সে নিজেই ছোটোখাটো জন্তু, ছোটোখাটো

জানোয়ারের ওপর হাত দিতে লাগল। এই দেখে জঙ্গালের জন্তুদের টনক নড়ল, তারা তাকে সেখান থেকে তাড়ানোর চেষ্টা শুরু করল। এবার নতুন চাল চালল টমি। এক একটা পশুকে বলতে লাগল, তোমার অমুক শত্রু তোমাকে হত্যা করবার মতলব করছে, তোমায় গালি দিচ্ছিল। জঙ্গালের জন্তুগুলো তার প্ররোচনায় পড়ে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লেগে যেত আর লাভ হত টমির। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে জঙ্গালের সব বড়ো বড়ো পশু লড়াই করে শেষ হয়ে গেল। ছোটো ছোটো জন্তুদের টমিকে মোকাবিলা করবার মতো সাহস হত না। টমির শ্রীবৃদ্ধি ও পরাক্রম দেখে দেখে তাদের মনে হতে লাগল, আমাদের শাসন করবার জন্যই স্বর্গ থেকে এই চিচিত্র জীবকে প্রেরণ করা হয়েছে। টমিও নিজের শিকারের বাহাদুরি দেখিয়ে সকলের এই অলীক ধারণাকে পুষ্ট করে তুলতে লাগল। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গো সে বলত, পরমাত্মা তোমাদের ওপর রাজত্ব করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছা। তোমরা নিশ্চিন্তে নিজের নিজের জায়গায় থাকো। তোমাদের কাউকেই আমি কিছু বলব না। শুধু, তোমাদের সেবা করছি বলে, তার পুরস্কার হিসেবে মাঝে মাঝে দু-একজনকে শিকার করব। যাই বলো না কেনা, আমারও তো পেট আছে। না খেয়ে আমি বাঁচবই বা কী করে? জঙ্গালের চতুর্দিকে খুবই গর্বিত দৃষ্টিপাত করে দৃপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায় টমি।

এখন টমির একমাত্র চিন্তা—এই দেশে তার কোনো প্রতিপক্ষ যেন উঠে না দাঁড়ায়। সে সব সময় সজাগ ও সন্ত্রস্ত থাকতে লাগল। দিন যায় আর তার নোলা বাড়তে থাকে। ততই তার চিন্তাও বাড়তে থাকে। মাঝে মাঝেই রাত্রে চমকে উঠে কোনো অজ্ঞাত শত্রুর পিছনে দৌড়োয় সে। ‘অন্ধ কুকুর বাতাসের পেছনে তাড়া করে’—টমি হয়ে উঠল এই প্রবাদের সার্থক রূপ। জঙ্গালের পশুদের সে বলত, ঈশ্বরের কৃপায় তোমরা যেন অন্য কোনো শাসকের খপ্পরে না পড়ো। সে তোমাদের পিষে ফেলবে। আমি তোমাদের হিতৈষী। সর্বদা তোমাদের শুভকামনায় মগ্ন থাকি, অন্য কারও ওপর এই ভরসা রেখো না। পশুরা সব সমস্বরে বলত, আমরা যদদিন বাঁচব, আপনার অধীনেই থাকব।

শেষে এমন হল যে, টমি এক মুহূর্তও শান্তিতে বসে থাকতে পারত না। রাতদিন সে ভরা নদীর পারে এদিক থেকে ওদিকে চক্কর মারত। দৌড়োতে দৌড়োতে হাঁপাত, দম ফুরিয়ে যেত, কিন্তু শান্তি পেত না মনে পাছে কোনো শত্রু ঢুকে পড়ে।

কিন্তু ভাদ্র মাস আসতেই টমির মন আবার তার পুরোনো সহচরীদের সঙ্গো দেখাসাক্ষাতের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠল। কোনোভাবেই সে নিজের মনকে সামলে রাখতে পারছে না। দু-চারজন প্রাণের বন্ধুর সঙ্গো অলিতে-গলিতে কোনো প্রেমিকার পিছনে যখন সে ঘুরে বেড়িয়েছে—সেই সব দিনের কথা তার মনে পড়ল লাগল। দু-চার দিন সে নিজেকে আটকে রাখল, কিন্তু শেষে তার আবেগ এত প্রবল হয়ে দাঁড়াল যে কপাল ঠুকে সে উঠে পড়ল। এতদিনে নিজের শক্তি ও তেজস্বিতা সম্বন্ধে তার অহংকারও তৈরি হয়েছে। এখন দু-চার জনের মহড়া সে নিতে পারবে।

কিন্তু নদীর এপারে এসেই ভোরবেলার অন্ধকারের মতো টমির আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরতে লাগল। তার গতি হয়ে এল শ্লথ। মাথা নিজের থেকেই নত হয়ে এল, লেজটি গেল গুটিয়ে। কিন্তু

তারই মধ্যে এক প্রেমিকার আর্বিভাবে বড়োই বিহ্বল হয়ে পড়ল সে। চলতে লাগল তার পিছু পিছু। টমির এই উদ্যম কিন্তু সেই প্রেমিকার তেমন পছন্দ হল না। তারস্বরে সে তাকে রিস্কার করল। আওয়াজ শুনেই সেখানে এসে পৌঁছোল তার কয়েকজন প্রেমিক এবং টমিকে দেখতে পেয়েই তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। টমি তো হতভম্ব। সে ঠিক করতে পারছে না কী করবে। তখনই চতুর্দিক থেকে তার ওপর দাঁত ও নখের প্রহার শুরু হল। পালাতেও পারল না সে। তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে গেল। পালাবার সময়ও শয়তানদের একটা দল তার পিছু ছাড়ল না।

সেই দিন থেকে টমির প্রাণে ভয় ঢুকে গেল। সব সময়েই সে আতঙ্কিত হয়ে থাকত, এই বুঝি আক্রমণকারীরা এল আমার সুখ-শান্তিতে ছাই দিতে, আমার স্বর্গ ধ্বংস করতে। এই ভয় আগেও কম ছিল না, এখন আরও বেড়ে গেল।

একদিন টমির প্রাণ ভয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে পড়ল যে, তার দৃঢ় বিশ্বাস হতে লাগল, শত্রুরা এসে গেছে বুঝি বা। ভোঁ করে নদীর পাড়ে এসে সে এদিক-ওদিক দৌড়োতে লাগল।

দিন কেটে গেল। রাতও কাটল। টমির কিন্তু বিশ্রাম নেই। দ্বিতীয় দিনও কেটে গেল। কিন্তু টমি মুখে কুটোটি পর্যন্ত না তুলে শুকিয়ে-যাওয়া নদীর পাড়ে চক্কর লাগাতে থাকল।

এই অবস্থায় পাঁচদিন কেটে গেল। তার পায়ের শক্তি ফুরোল, চোখে অন্ধকার ছেয়ে এল। ক্ষুধায় কাতর হয়ে সে বারবার লুটিয়ে পড়ছে, কিন্তু কিছুতেই তার আশঙ্কা গেল না।

শেষে সপ্তম দিনে, অধিকারবোধের চিন্তায় জর্জর ও ব্যাকুল বেচারার ভবলীলা সাঙ্গ হল। বনের কোনো পশু তার ধারে কাছে গেল না। কেউ তার সম্বন্ধে কোনো কথা পর্যন্ত বলল না। তার মৃত্যুতে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না কেউ। কিছুদিন কাক ও শকুনের দল তার শরীরকে ঘিরে বিচরণ করল। শেষ পর্যন্ত হাঁড়-পাঁজর ছাড়া আর কিছুই রইল না।

(অধিকার-চিন্তা/১৯২২) অনুবাদ অনিরুদ্ধ মৈত্র

পরীক্ষা

দেবগড় রাজ্যের দেওয়ান সর্দার সুজনসিংহ বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন তাঁর মন টেনেছে পারমার্থিক ভাবনায়। মহারাজের কাছে গিয়ে একদিন তিনি নিবেদন করলেন ঃ হে দীনবন্ধু, দীর্ঘ চল্লিশটা বছর তো এ অধম আপনার সেবা করল। কিন্তু এবারে যে শরীর ঢলে পড়েছে, রাজকার্য সামলানোর সামর্থ্য আর নেই। কখন কোথায় কী ভুলচুক করে ফেলব, বুড়ো বয়সে কী কলঙ্ক পড়ে যাবে, অর্জিত সুনাম ধুলোয় মিশে যাবে।

মহারাজ তাঁর এই অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ দেওয়ানকে বড়োই ভালোবাসতেন। উনি অনেক বোঝালেন, কিন্তু দেওয়ান সাহেব যখন কিছুতেই মানছেন না, তখন ক্ষান্ত দিয়ে মহারাজ ওঁর আর্জি মঞ্জুর করলেন। তবে শর্ত রইল যে, নতুন দেওয়ানের ব্যবস্থা তাঁকেই করে যেতে হবে।

পরদিন দেশের সমস্ত বড়ো বড়ো কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল যে, দেবগড় রাজ্যের জন্যে একজন সুযোগ্য দেওয়ান চাই। যে গুণী ব্যক্তি নিজেকে যোগ্য বিবেচনা করবেন তিনি যেন বর্তমান দেওয়ান সর্দার সুজনসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রার্থীকে যে গ্রাজুয়েট হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অবশ্যই হওয়া চাই। অগ্নিমন্দ ব্যক্তিদের আগ্রহ দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই। একমাস ধরে প্রার্থীদের চলাফেরা ওঠাবসা সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হবে। বিদ্যাবত্তার চাইতে কর্তব্যজ্ঞানের দিকটাতেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই পরীক্ষায় যিনি সফলকাম হবেন তাঁকেই ওই সম্মানিত পদে নিয়োগ করা হবে।

এই বিজ্ঞাপনে চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। এত বড়ো একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ, অথচ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কিছু নেই, শুধুই কপালের জোর! শয়ে শয়ে লোক ছুটল নিজের ভাগ্যপরীক্ষা দিতে! বিচিত্র বর্ণের সব মানুষে দেবগড় ভরে উঠল। প্রতিটা ট্রেন থেকেই দলে দলে প্রার্থী নামছে। কেউ পাঞ্জাব থেকে আসছে, কেউ মাদ্রাজ থেকে। কেউ নতুনতম ফ্যাশানে বিচিত্রিত, কেউ আবার প্রাচীন রুচিতেই গর্বিত। পণ্ডিত আর মৌলবিরাও এবার নিজেদের কপালের জোর দেখতে চাইছেন। ডিগ্রি-তকমার জন্যে এতদিন তাঁদের বড়োই হেনস্থা হত। এখানে সে সবের প্রয়োজন নেই! রঙিন পাগড়ি-কুর্তা-চোগা-চাপকান, আংরাখা, হ্যাটের সাজে দেবগড় ভরে উঠল। তবে গ্রাজুয়েট প্রার্থীই ছিল সংখ্যায় সবথেকে বেশি, ডিগ্রি-তকমার বাধ্যবাধকতা এখানে না থাকলেও তা দিয়ে অনেক অক্ষমতাই ঢাকা যায়!

সর্দার সুজনসিংহ এই সমস্ত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের আদর-আপ্যায়নের অতি চমৎকার বন্দোবস্ত করেছিলেন। আপন আপন কামরায় বসে সবাই রোজানিষ্ঠ মুসলমানের মতো মাসের প্রতিটি দিন

গুনতে লাগলেন। প্রত্যেকেই আপন আপন চরিত্র, বুদ্ধি প্রভৃতির চরম উৎকর্ষ দেখাবার জন্য প্রাণপাত করতে লাগলেন। শ্রীযুক্ত 'অ' বেলা ন-টার আগে বিছানা ছাড়তেন না কোনো দিন। এখন তিনি উদ্যানে পদচারণা করতে করতে প্রত্যহ সূর্যোদয় দেখেন। শ্রীযক্ত 'ব'-এর চিরকেলে অভ্যাস হুঁকো খাওয়ার, তিনি দরজা বন্ধ করে গভীর রাত্রি পর্যন্ত চুরুট ফোঁকা মকশো করতে লেগেছেন। শ্রীযুক্ত 'দ', 'স' আর 'জ'-এর স্বগৃহে চাকর-খানসামাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত থাকে হুকুমের ঠেলায়। এখানে কিন্তু তাঁরা ভৃত্যদের সঙ্গেও 'আপনি'-'আজ্ঞে' ছাড়া কথাই বলছেন না। 'ক'-বাবু কট্টর নাস্তিক, হাক্সলির অনুগামী। অথচ এখন তাঁর ধর্মনিষ্ঠার ঠেলায় মন্দিরের পূজারির চাকরি যাবার জোগাড়। মিস্টার 'ল'-এর কাছে সবথেকে ঘৃণার বস্তু হল গ্রন্থ। তিনি এখন উদয়াস্ত ডুবে থাকেন পেল্লায় পেল্লায় সব কেতাবের পঠনপাঠনে। যার সঙ্গেই কথা বলুন, নম্রতা আর সদাচারের একেবারে পরাকাষ্ঠা। শর্মাজি তো রাত থাকতেই বেদপাঠ শুরু করে দেন, আর মৌলবি সাহেবের যেন নমাজ-তলাবত ছাড়া আর কাজই নেই! সবাই ভাবছে একটা মাসের তো ব্যাপার, কোনোক্রমে পেরিয়ে যাক একবার ভালোয় ভালোয় তারপর কাজ ফুরোলে কে কার কড়ি ধারে!

কিন্তু মানুষ-রত্নের প্রবীণ জহুরি অন্তরালে বসে নিবিষ্ট চিত্তে খুঁজে চলেছেন বকের সারিতে রাজহংসের ডানা।

নব্য ফ্যাশান দুরস্তদের খেয়াল চাপল যে নিজেদের মধ্যে হকি খেলা যাক একদিন। হকিতে দড় খেলোয়াড়ই প্রস্তাবটা তুলল। হাজার হোক এও তো একটা বিদ্যা, একেই বা লুকিয়ে রাখা কেন। বলা যায় না, হয়তো এর মারপ্যাঁচেই কাজ হাসিল হয়ে গেল। অগত্যা উদ্যোগ-আয়োজন করে কোর্ট তৈরি হল, খেলাও শুরু হল, আর বল বেচারি কোনো দপ্তরের অ্যাপ্রেন্টিস ছোকরার মতো ঠোক্কর খেতে লাগল এদিক থেকে সেদিক।

দেবগড় রাজ্যে এই খেলা একেবারেই নতুন: শিক্ষিত পদস্থ সজ্জনেরা দাবা-পাশা-তাস প্রভৃতি সিরিয়াস ধরনের খেলাই পছন্দ করেন, এসব দৌড়োদৌড়ি হুটোপুটির খেলা নিতান্ত বালসুলভ বলেই বিবেচিত হয় এখানে।

খেলা চলছিল খুব উৎসাহের সঙ্গে। এ পক্ষের খেলোয়াড়েরা যখন বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন বিশাল এক তরঙ্গ ধেয়ে চলেছে সগর্জনে, আবার ও পক্ষের খেলোয়াড়েরা সেই ঢেউকে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে আটকে দিচ্ছে যেন দুর্ভেদ্য লোহার দেওয়াল।

সন্ধে পর্যন্ত চলল এই হুজুগ। ঘেমে নেয়ে উঠল সব খেলোয়াড়। রক্তের উত্তাপ ফুটে বেরুচ্ছে চোখে মুখে, হাঁপাতে হাঁপাতে সবাই অস্থির, তবু খেলার নিষ্পত্তি হয় না।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। ময়দানের কিছু দূর দিয়ে একটা নালা গিয়েছে। সেখানে পারাপারের কোনো সেতু নেই। নালার ভেতর দিয়েই যাতায়াত করতে হয় সবাইকে। খেলা সবেমাত্র বন্ধ হয়েছে। খেলোয়াড়েরা বসে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলেন খানিক। এমন সময় এক চাষি ফসলভর্তি গোরুর গাড়ি নিয়ে সেই নালা পেরোতে গেল। কিন্তু কিছুটা নালার পাঁকের জন্য, আবার কিছুটা পাড়ের খাড়াই-এর কারণেও গাড়ি কিছুতেই উঠতে পারছিল না নালা থেকে। বেচারা চাষি বলদদের নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে নিজে চাকা ঠেলে কত চেষ্টাই না করল। কিন্তু বোঝা যত ভারী ছিল,

বেচারি বলদদুটির সামর্থ্য তেতটা ছিল না, গাড়ি কিছুতেই ওঠে না। কখনো খানিক ওঠে, তো পরক্ষণেই নেমে যায় হড়হড় করে। চাষি বারে বারে জোর লাগায় আপ্রাণ, বারে বারে বলদজোড়াকে উত্তেজিত করে, ঠেঙায়, কিন্তু গাড়ি আর ওঠে না। বেচারি হতাশ চোখে ইতিউতি তাকায়, কিন্তু আশেপাশে এমন একজনও নজরে পড়ে না যে তাকে একটু মদত দিতে পারে। অথচ গাড়ি ফেলে রেখে যাওয়াও যায় না কোথাও। ভীষণ বিপত্তিতে পড়ে বেচারি একেবারে নাজেহাল। ঠিক সেই সময় হকি স্টিক হাতে খেলোয়াড়েরা সেদিক দিয়েই যাচ্ছিল! চাষি বেচারি করুণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কাউকে যে বলবে একটু সাহায্য করতে সে সাহসই তার হল না। খেলোয়াড়রাও ওকে দেখল, সহানুভূতিহীন নিরাসক্ত সেই দেখা। ওদের সবারই মনে স্বার্থবোধ ছিল, অহংকার ছিল। কিন্তু ঔদার্য আর স্নেহপরায়ণতার লেশমাত্রও ছিল না।

কিন্তু তাদের মধ্যেই এমন একজন মানুষও ছিল যার প্রাণে দয়া ছিল, সাহসও ছিল। আজকে হকি খেলতে গিয়ে তার পায়ে আঘাত লেগেছে। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল খানিকটা পিছনে। হঠাৎ গাড়িটার ওপর তার চোখ পড়ল। সে থমকে দাঁড়াল। চাষিটির করুণ মুখের দিকে তাকাতেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। হাতের স্টিকটি একপাশে রেখে দিল সে, কোট খুলে ফেলল; তারপর চাষিটির কাছে গিয়ে বলল—তোমার গাড়িটা কি বের করে দেব?

চাষি দেখল তার সামনে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। শশব্যস্তে প্রণাম জানিয়ে সে বলে উঠল—কিন্তু আপনাকে কীভাবে তা বলি হুজুর!

যুবক বলল—মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ আটকে আছো। যাও, গাড়িতে বসে বলদ সামলাও, আমি পেছন থেকে চাকায় ঠেলা দিচ্ছি। এক্ষুনি গাড়ি উঠে যাবে।

চাষিটি গাড়িতে গিয়ে বসল। যুবক পেছন থেকে চাকায় জোরে ঠেলা লাগাল। বড্ড বেশি পাঁক ছিল সেখানটায়। চাকার মাঝবরাবর ডুবে গিয়েছিল সেই পাঁকে। কিন্তু হিম্মত দুর্জয়। যুবক আবার প্রাণপণে জোর লাগাল। চাষিও তার বলদদুটিকে উৎসাহ দিতে থাকল। তারা কাঁধ ঝুঁকিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই একসময় গাড়ি উঠে এল নালার ওপারে।

কৃতজ্ঞ চাষিটি হাত জোড় করে গদগদ কণ্ঠে যুবককে বলল—মহারাজ, আপনি আমাকে বাঁচালেন। নয়তো সারা রাত এখানেই পড়ে থাকতে হত।

যুবক হেসে বলল—এবার তাহলে আমাকে কী পুরস্কার দেবে দাও।

চাষিটি গম্ভীর হয়ে বলল—ঈশ্বর করুন দেওয়ানি যেন আপনারই হয়।

চকিতে চাষির দিকে তাকাল যুবক। তার কেমন সন্দেহ হল, এ সুজনসিংহ নয়তো! অবিকল সেই রকম গলার স্বর, আকার-প্রকারেও অনেকটা তেমনি। চাষিটিও ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে। বোধহয় যুবকের মনোভাব আঁচ করেই একটু মুচকি হেসে বলল—গভীর জলে ডুব দিলে তবেই না মক্তা পাওয়া যায়!

দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল একটা মাস। মনোনয়নের দিনও এসে গেল। প্রার্থীরা সকাল থেকেই নিজের নিজের ভাগ্য জানবার জন্য ব্যগ্র। দিন যেন আর কাটে না। প্রত্যেকের চেহারায় ছায়া ফেলেছে যুগপৎ আশা আর নিরাশা। কেউ জানে না কার কপাল আজ খুলবে, কার মাথায় ঝরে পড়বে লক্ষ্মীর আশিস।

সন্ধ্যাবেলায় মহারাজের দরবার বসল। শহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা, সভাসদ আর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা আর দেওয়ান পদের প্রার্থীরা—সকলেই দস্তুরমতো সেজেগুজে দরবারে এসে বসেছেন। প্রার্থীদের বুক ধড়ফড় করছে উত্তেজনায়।

এক সময় সর্দার সুজনসিংহ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন—

সমবেত দেওয়ান পদের প্রার্থীগণ!

এতদিন আপনাদের যা কিছু কষ্ট হয়েছে, যা কিছু অসুবিধা ঘটেছে, তার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এই পদের জন্য আমাদের এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল যাঁর হৃদয়ে করুণা কোমলতার পাশাপাশি থাকবে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস। এমন একটি হৃদয় যা হবে মহৎ, উদার। এমনই আত্মবিশ্বাস, যা মোকাবিলা করবে যে কোনো প্রতিকূলতার। এই রাজ্যের সৌভাগ্য যে তেমন একজন পুরুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরকম যথার্থ গুণবন্ত মানুষ সংসারে সত্যিই দুর্লভ। যে কয়েকজন আছেন, তাঁরা সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করছেন। ততদূরে আমাদের নাগাল পৌঁছয় না।

পণ্ডিত জানকীনাথের মতো নতুন দেওয়ান পাওয়ার জন্য আমি এই রাজ্যকে অভিনন্দিত করছি।

সমবেত রাজকর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত মানুষেরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন জানকীনাথকে দেখবার জন্য। সমস্ত প্রার্থীরও নজর সেখানেই গিয়ে পড়ল, অবশ্য সে চোখে অভিনন্দনের উষ্ণতা ছিল না, ছিল ঈর্ষার দাহ।

সর্দার সুজনসিংহ আবার বলতে লাগলেন—

আপনাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করতে আপত্তি হবে না যে, যে ব্যক্তি নিজে আহত হয়েও পাঁকের মধ্যে থেকে এক দরিদ্র কৃষকের মালবোঝাই গাড়ি ঠেলে ওপরে তুলে দেন, তাঁর হৃদয়ে আছে সাহস, আছে আত্মবিশ্বাস, আছে উদারতা। এমন মানুষ গরিবদের কখনও কষ্ট দিতে পারে না। তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা ওঁর চিত্তবৃত্তিকে সর্বদা সুস্থির রাখবে। এমনকী, নিজে প্রতারিত হলেও কখনও দয়া, ধর্ম ও বিশ্বাসের পথ থেকে তিনি সরে আসবেন না।

(পরীক্ষা/১৯২৩) অনুবাদ অচিন চক্রবর্তী

খ্যাপা

দেবীপুরে এসেছি আজ পাঁচদিন। এমন একটা দিনও যায় না যেদিন খ্যাপার কথা ওঠে না। সকাল থেকে সন্ধে অবধি গাঁয়ের লোকেরা আমার কাছে বসে থাকে। এর আগে কখনও আমার সবজান্তা ভাবটাকে জাহির করবার এমন ভালো সুযোগ পাইনি, প্রলোভনও হয়নি। বসে আমি এ গল্প সে গল্প হাঁকি, বলি, বড়োলাটসাহেব গান্ধি-বাবাকে একথা বলেছেন, গান্ধি-বাবা এভাবে তার উত্তর দিয়েছেন। এখনই দেখছেন কী, এরপর দেখতে পাবেন কী কী মজা হয়। একেকবার পঞ্চাশ হাজার যুবক জেলে যাবার জন্যে কোমর বেঁধে বসে আছে। গান্ধিজির আদেশ, হিন্দুদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার যেন না থাকে, তাহলে দেশকে এর চেয়েও বড়ো দুর্দিন দেখতে হবে। যাই হোক, সবাই আমার কথাগুলো তন্ময় হয়ে শোনে। মুখগুলো ওদের ফুলের মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মুখে আত্মগরিমার আভা ছড়িয়ে পড়ে। গদগদ কণ্ঠে বলে, আজকাল তো মহাত্মাজিই একমাত্র ভরসা। খ্যাপাটা নেই, থাকলে আপনার পিছু ছাড়ত না। আপনার নাওয়া-খাওয়া মুশকিল হয়ে উঠত। কেউ যদি ওকে এসব কথা শোনায় তাহলে রাতের পর রাত হয়তো বসে থাকবে। একদিন জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা, এই খ্যাপাটা কে? পাগল-টাগল নাকি? এক ভদ্রলোক বলেন,না মশায়, পাগল কীসর তবে মাথায় ছিট আছে আর কী। বাড়িতে লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি, একটা চিনির মিল সিবানে, দুটো কারখানা ছাপরায়। তিন-তিনশো চার-চারশো টাকা মাইনের সব কর্মচারী, কিন্তু ওকে দেখুন কাঙালের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ির লোকেরা সিবানে পাঠিয়ে দিয়েছিল যাতে সেখানে গিয়ে কাজ দেখাশোনা করে। দু মাসের মধ্যেই ম্যানেজারের সঙ্গে খটাখটি শুরু করে বসল। ম্যানেজার লিখে পাঠালেন, আমার ইস্তফা নিন। আপনাদের ছেলে মজদুরদের মাথায় তুলে রাখছে, তারা মন দিয়ে কাজ করে না। শেষে বাড়ির লোকেরা ফিরিয়ে নিয়ে এল। চাকরবাকরেরা লুটেপুটে খাচ্ছে, সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই, কিন্তু ওই যে সামনে আমবাগানটা দেখছেন, দিনরাত সেটার তদারক করছে, কার সাধ্য যে একটা ঢিল ছুঁড়বে ওদিকে। এক মিশ্রসাহেব বলেন—বাবুমশায়, বাড়িতে কত যে রকমারি রান্না হয়, কিন্তু ওর তকদিরে সেই এক রুটি আর ডাল লেখা, আর কিছু মুখেই তোলে না। বাপ ভালো ভালো জামা কাপড় কিনে দেয়, কিন্তু সেদিকে চোখ তুলেও তাকায় না। শুধু ওই সেই মোটা পাঞ্জাবি পরে মোটা কাপড়ের লুঙ্গি কোমরে বেঁধে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। আপনাকে ওর গুণের কথা কত আর বলব, একেবারে যাকে বলে খ্যাপা।

দুই

এসব কথা শুনে আমারও এই অদ্ভুত লোকটাকে দেখতে বড়ো আগ্রহ হয়। হঠাৎ একটি লোক বলে ওঠে—ওই যে দেখুন খ্যাপা আসছে। আমি কৌতূহলভরে ওর দিকে তাকাই। বিশ-একুশ বছরের

একটি হৃষ্টপুষ্ট যুবক। মাথা খালি, মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে, খদ্দরের ঢিলে পায়জামা পরে এদিকেই আসছে। পায়ে জুতো। আগে আমার দিকেই আসে। আমি বলি, আসুন বসুন। সে আমার দিকে তাচ্ছিল্যের চোখে তাকিয়ে বলে, এখন নয় আর এক সময় আসব। বলে সে চলে যায়।

সন্ধে হলে যখন আড্ডা ভেঙে যায় তখন সে আমবাগানের দিক থেকে ধীরে-ধীরে এসে আমার পাশে বসে পড়ে বলে—ওরা হয়তো আমার নামে খুব যা-তা নিন্দা করেছে। আমি এখানে খ্যাপা খেতাব পেয়েছি।

সংকোচের সঙ্গে বলি—হ্যাঁ, আপনার কথা সবাই রোজ বলে। আপনাকে দেখবার আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। আপনার নাম কী?

খ্যাপা বলে—নাম তো আমার মহম্মদ খলিল, তবে আশপাশের পাঁচ-দশখানা গাঁয়ে আমাকে লোকে ওদের রাখা নামেই বেশি করে চেনে। আমার এই নাম হল খ্যাপা।

আমি—আচ্ছা, লোকে আপনাকে খ্যাপা বলে কেন?

খলিল—সে ওদের খুশি, এছাড়া আর কী বলব? তবে জিন্দেগিটাকে আমি কিছুটা অন্য চোখে দেখি। পাঁচ বক্ত নমাজ পড়তে পারি এমন ফুরসত আমার নেই। আব্বা আছেন, চাচা আছেন। ওঁরা দুজন পহর খানেক রাত থাকতে উঠে এক পহর রাত অবধি কাজেকম্মে মেতে থাকেন। দিনরাত হিসাবকিতাব, লাভলোকসান, তেজিমন্দা ছাড়া আর কোনো কথাই হয় না, যেন ওরা খোদাতালার বান্দা নন, দৌলতের বান্দা। চাচাসাহেব সেই একপহর রাত অবধি গুড়ের পিপেগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সেগুলোকে গাড়িতে চাপান। আব্বা সাহেব প্রায় সময়ই নিজের হাতে গুড় ওজন করেন। দুপুরের খানা খান সাঁঝে আর সাঁঝের খানা মাঝরাতে। কেউ নমাজ পড়বার ফুরসত পান না। আমি বলি, আপনারা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন? বড়ো বড়ো কারবারের কাজ সবই বিশ্বাসের উপর চলে। মালিককে কিছু না কিছু ঘাটা সইতেই হয়। নিজেদের খাটাখাটুনির উপর ছোটোখাটো কারবারই শুধু চলতে পারে। আমার নীতি ওঁদের কারও পছন্দ নয়, তাই আমি খ্যাপা।

আমি—আমার মতে তো আপনার কথাটাই ঠিক।

খলিল—ভুলেও অমন কথা বলবেন না, তাহলে একজনের জায়গায় দুজন খ্যাপা হয়ে দাঁড়াবে। এদের যত গরজ শুধু কারবার নিয়ে, না আছে ধর্মের গরজ, না দুনিয়ার। না দেশের গরজ, না জাতির। আমি খবরের কাগজ আনাই, স্মর্না ফান্ডে কিছু টাকা পাঠাতে চাই। খিলাফত ফান্ডকে মদত করাটাকে আমার ফরজ বলে মনে করি। সবচেয়ে বড়ো দোষ আমার, আমি খিলাফতের স্বেচ্ছাসেবক। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো সাহেব, যখন জাতির উপর, দেশের উপর, ধর্মের উপর চারদিক থেকেই দুশমনদের হামলা চলছে তখন এটা কি আমার কর্তব্য নয় যে নিজের স্বার্থকে জাতির স্বার্থে কোরবান করি? এসবের জন্যেই ঘরে বাইরে আমাকে খ্যাপা খেতাব দেওয়া হয়েছে।

আমি—আপনি তো ঠিক তাই করছেন যা এখন সমস্ত জাতির করা প্রয়োজন।

খলিল—আমার ভয় হচ্ছে এই চৌপট নগরী থেকে আপনি বদনাম না নিয়ে যাবেন না। আমার হাজার হাজার ভাই যখন জেলে পড়ে আছে, যাদের নসিবে হাতেবোনা মোটা কাপড়ও জুটছেনা, সেখানে মিষ্টি মিষ্টি গরাস তুলে খেতে আর হাতায়, গলায় ছুঁচের কাজ করা চিকনের পাঞ্জাবি পরতে বিবেকে বাধছে।

আমি—এ আপনি খুবই উচিত কাজ করেছেন। দুঃখ এই যে আর কেউ আপনার মতো ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসুক নয়।

খলিল—এটাকে আমি ত্যাগ মনে করি না কিংবা দুনিয়াকে দেখানোর জন্যেও এই বেশ নিয়ে ঘুরি না। আমার মনটাই সব রকমের মজা আর শখ-আহ্লাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই কদিন আগে আব্বা সাহেব আমাকে সিবানের মিলে কাজকম্ম দেখাশোনা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের খানসামা, বেয়ারা, মেথর, ধোপা, মালি, চৌকিদার সব্বার নাম মজদুরদের খাতায় লেখা। কাজ করত সাহেবের, মজুরি পেত কারখানা থেকে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাহাদুরের নিজের তো নিয়মকানুনের বালাই ছিল না, অথচ মজদুরদের উপর এমন কড়াকড়ি ছিল যে, যদি পাঁচ মিনিটেরও দেরি হয়ে যেত তাহলে আধা দিনের মজুরি কাটা যেত। আমি সাহেবের একটু খবরাখবর করতে চাইলাম, মজদুরদের সঙ্গে রেয়াত করতে শুরু করলাম। তারপর আর কী? সাহেব বিগড়ে গেলেন, ইস্তফা দেবার হুমকি দিলেন। বাড়ির সবাই ওর হালচালেরই খবর রাখতেন। পয়লা নম্বরের হারামখোর লোকটা। তবুও ওর হুমকি পেয়েই সবার মাথা খারাপ হয়ে গেল। তার পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে আসা হল আর বাড়িতে ফিরে আসার পর আমার উপর একচোট নেওয়া হল। এ ঘটনার আগে খ্যাপা হতে যেটুকু বা বাকি ছিল তা এবার পূরণ হয়ে গেল। জানিনা সাহেবকে সবাই কেন এত ভয় করে?

আমি—আপনি এমন কিছু করেননি যা এমন অবস্থায় আমিও করতাম না। আমি তো প্রথমে সাহেবের নামে তহবিল তছরুপের মোকদ্দমা করতাম, গুন্ডা দিয়ে পেটাতাম, তারপরে অন্য কথা বলতাম। এসব হারামখোরদের এটাই শাস্তি।

খলিল—তবে তো একে আর একে দুই হয়ে গেল। আপশোশ এটাই যে, আপনি বেশিদিন এখানে থাকবেন না। ইচ্ছে করছে কটা দিন আপনার সঙ্গে থাকি। অনেকদিন পর আপনার মতো একজন লোক পেলাম যার সঙ্গে দুটো মনের কথা বলতে পারি। এসব মূর্খ লোকগুলোর সঙ্গে আমি কথাও বলি না। আমার চাচাসাহেবের যৌবনকালে এক চামারনির সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক ঘটেছিল। বেচারির দুটো বাচ্চা হয়েছিল, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটিকে কোলে রেখে চামারানি মারা যায়। তখন থেকে আমাদের বাড়িতে বাচ্চা দুটোর হাল যা দাঁড়িয়েছে তা শুধু অনাথদের বেলাতেই হয়ে থাকে। কেউই পোঁছে না। ওরা খেতে-পরতেও পায় না। বেচারারা চাকরবাকরদের সঙ্গে খায় আর ঝুপড়িতে পড়ে থাকে। জনাব, আমার এটা বরদাস্ত হল না। ওদের আমি আমার সঙ্গে বসিয়ে খাইয়েছি, এখনও খাওয়াচ্ছি। বাড়িতে হইহই পড়ে গেছে। যাকেই দেখুন সেই রেগে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে। তবে আমি কারও পরোয়া করি না। শত হলেও ওদের ভেতরেও তো আমাদেরই খুন। তাইতেই আমাকে সবাই পাগল বলে।

আমি—যারা আপনাকে পাগল বলে, তারা নিজেরাই পাগল।

খলিল—জনাব, এদের সঙ্গে বাস করাটাও আজব। কাবুলের শাহ কোরবানি বন্ধ করে দিয়েছেন। হিন্দুস্তানের উলেমারাও একই ফতোয়া দিয়েছেন, তবুও এখানে বিশেষ করে আমাদেরই বাড়িতে কোরবানি হয়েছে। আমি যদিও হইচই করেছি, কিন্তু আমার কথা কে কানে তোলে? এর কফারাও (প্রায়শ্চিত্ত) আমি করেছি। আমার চড়ে বেড়াবার ঘোড়াটাকে বেচে দিয়ে তিনশো ফকিরকে

খাইয়েছি। আর সেদিন থেকে কোনোও কসাইকে গোরু নিয়ে যেতে দেখলে পয়সা দিয়ে কিনে নিই। এ পর্যন্ত দশটা গোরুর জান বাঁচিয়েছি। ওগুলো সব এখানে হিন্দুদের বাড়িতে আছে। তবে মজাটা হল এই যে, যাদের আমি গোরু দান করেছি, ওরাও আমাকে খ্যাপা বলে। আমারও এ নামটা এতটা অভ্যেস হয়ে গেছে যে এর সঙ্গে আমার এখন মোহব্বত হয়ে গেছে।

আমি—আহা, আপনার মতো খ্যাপা যদি দেশে আরও থাকত।

খলিল—নিন, আপনিও মজাক করতে শুরু করে দিলেন! ওই যে দেখুন আমের বাগান। ওটাকে আমি আগলাই। লোকে বলে, যেখানে হাজার হাজার টাকার লোকসান হচ্ছে সেখানে তো পাহারা দেবার নাম নেই, ছোট্ট একটুখানি বাগানটার এত তদারকি! জনাব,এখানে ছেলেছোকরাগুলোর হাল এই যে একটা আম খাবে তো পঁচিশটা আম ফেলবে। কত কত গাছ যে চোট খেয়ে যায় আর তারপরে কোনো কাজে আসে না। আমি চাই আমগুলো আগে পাকুক, পেকে ঝরে পড়তে থাকুক, তখন যার যেমন খুশি কুড়িয়ে নিয়ে যাক। কাঁচা আম বরবাদ করে কী লাভ? এও নাকি আমার একটা খ্যাপামি।

তিন

এইসব কথা হচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, তিন-চারজন লোক একজন বেনেকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করলে ওদের মধ্যে একজন, যাকে দেখতে মৌলবি বলে মনে হচ্ছিল, বলেন—লোকটা বড়ো বেইমান, এর বাটখারাগুলোর ওজন কম। একটু আগে এর কাছ থেকে এক সের ঘি কিনে নিয়ে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে ওজন করে দেখি আধ পো-ই গায়েব। এখন যেই ফিরিয়ে দিতে এসেছি তো বলে কিনা আমি তো ঠিক ঠিকই ওজন করে দিয়েছি। বলুন তো,যদি তুই ঠিকঠাক ওজন করে দিলি তাহলে কি আমি রাস্তায় খেয়ে নিয়েছি দুচোক। এখন নিয়ে যাচ্ছি থানায়, ওখানেই ওকে দুরস্ত করা হবে।

অন্য ভদ্রলোকটি এখানকার ডাকঘরের কেরানি, বলেন—স্বভাবটাই ব্যাটার চিরকাল এমনই, কখনো ঠিক ওজন দেয় না। আজকেই দু আনার খানসারি গুড় আনতে পাঠিয়েছি। ছেলে যখন বাড়ি নিয়ে এল, বড়োজোর এক আনার হবে তাতে। ফেরত দিতে গেলাম তো চোখ রাঙাতে লাগল। বাটখারাগুলো ওর আজ যাচাই করে দেওয়াতেই হবে। তৃতীয় লোকটা গয়লা। মাথা থেকে খোলের গাঁটরি নামিয়ে সে বলে—সাব, এই আট খানার খোল। টাকায় ছয় সের করে দিয়েছে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মেপে দেখি দুসের, নিয়ে গেলাম যে ফেরত দেব। কিন্তু ব্যাটা নিচ্ছেই না। এখন এর ফয়সালা থানাতেই হবে। শুনে কয়েকজন বলে ওঠে—ব্যাটা সত্যি সত্যিই বেইমান।

বেনে বলে—আমার বাটখারা যদি এক রত্তিও কম থাকে তাহলে হাজার টাকা দণ্ড দেব।

মৌলবি সাহেব বলেন—তাহলে ব্যাটা, তুই টাকি মারিস। কেরানি বাবু বলেন—টাকি মারিস তাহলে, তুই বল। গয়লা বলে—দুরকমের বাটখারা রেখেছে, একটা দেখানোর জন্য, আর একটা বেচবার জন্য। পুলিশ এর বাড়িতে তল্লাশি চালাক। বেনে আর একবার প্রতিবাদ করে, পাকড়াও করনেওয়ালারা আবার রুখে ওঠে। আধ ঘন্টা ধরে এভাবেই তর্কবিতর্ক চলতে থাকে। আমার মাথায় আসে না কী করব না করব। বেনেকে ছেড়ে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করব, না চলে যেতে দেব। বেনের উপর সবাই চটে আছে বলে মনে হচ্ছে। খলিলের দিকে তাকাতে দেখি সে উধাও।

জানিনা কখন উঠে চলে গেছে। বেনে কোনো মতেই দমছে না, এমন কী, থানায় যেতেও ভয় পাচ্ছে না।

চার

ওরা থানায় যাবার জন্য উঠছে এমন সময় দেখা যায় খ্যাপা আসছে। ওর এক হাতে একটা বড়ো ঝুড়ি, আর হাতে একটা বড়ো টুকরি আর পেছনে সাত-আট বছরের একটা ছেলে। এসেই সে মৌলবি সাহেবকে প্রশ্ন করে—এই বাটিটা কি আপনার কাজি সাহেব?

মৌলবি—(চমকে) হ্যাঁ, আমারই তো। কিন্তু আমার বাড়ি থেকে তুমি এটাকে কেন এনেছ?

খ্যাপা—এনেছি এজন্যে যে এই বাটিটায় সেই আধপো ঘি রয়েছে যেটা নিয়ে আপনি বলছিলেন যে বেনে কম দিয়েছে। সেই একই ঘি। ওজনও তাই। বেইমানি এই গরিব বেনেটার নয়, বেইমানি কাজি হাজি মৌলবি জহুর আহমদের।

মৌলবি—তোমার পাগলামি এখানে দেখিয়ো না, দেখালেও আমি কাউকে ভয় পাই না। তুমি লাখপতিই হও আর যেই হও সে তোমার নিজের বাড়িতে। কোন সাহসে তুমি আমার বাড়িতে পা দাও?

খ্যাপা—সেই একই সাহসে যে সাহসে ভর করে বেনেকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন এই ঘিটাও থানায় যাবে।

মৌলবি—(ঘাবড়ে গিয়ে) সব বাড়িতেই অল্পস্বল্প জিনিস রাখা থাকে। কোরান শরিফের কসম, আমি এখনি তোমার আব্বাসাহেবের কাছে যাচ্ছি, আজ অবধি গাঁয়ে আমার নামে এমন দোষ কেউ দেয়নি।

বেনে—মৌলবি সাহেব, চললেন কোথায় আপনি? চলুন আপনার আমার ফয়সালা হবে থানায়। আমি একটা কথাও শুনব না। নামে মৌলবি, আল্লার আদমি, এমন ভাবখানা দেখান যেন স্বয়ং দেবতা। আর এদিকে বাড়িতে জিনিস লুকিয়ে রেখে আরেকজনকে বেইমান বলছেন। এই লম্বা দাড়ি রেখেছেন কি ধোঁকা দেবার জন্যে?

মৌলবি সাহেব কিন্তু দাঁড়ান না। বেনেকে ছেড়ে দিয়ে খলিলের বাপের কাছে চলে যান, আসলে তা এসময় লজ্জা থেকে বাঁচবার কেবল একটা ছুতো।

খলিল তারপর গয়লাকে বলে—কী রে, তুইও থানায় যাচ্ছিস? চল আমিও যাচ্ছি। তোর বাড়ি থেকে এই সেরখানেক খোল নিয়ে এসেছি। মৌলবি সাহেবের দুর্গতি দেখে গয়লার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল।

সে বলে—দাদা, বয়েসের দিব্যি, আমাকে মৌলবি সাহেব শিখিয়ে দিয়েছেন।

খলিল—কেউ শিখিয়ে দিয়েছে বলে তুই আরেকজনের ঘরে আগুন লাগাবি নাকি? নিজে তো ব্যাটা দুধে আদ্দেক পানি মিশিয়ে বেচিস আর আজ তোর কাঁধে এমন বাহাদুরি ভর করেছে যে, একজন ভালোমানুষকে তবাহ্ করতে উঠেপড়ে লেগেছিস। খোল সরিয়ে বাড়িতে রেখে দিয়েছিস, তার উপরে বেনের নামে দোষ দিচ্ছিস যে ওজনে কম দিয়েছে।

বেনে—দাদা, আমার লাখটাকার ইজ্জত নষ্ট হয়ে গেছে। আমি থানায় রিপোর্ট না করে ছাড়ব না।

গয়লা—সাহুজি, এবারটা ভাই মাফ করো, নইলে মরে যাব।

এরপর খলিল কেরানিবাবুকে বলে—বলুন জনাব, হাটে আপনার হাঁড়ি ভাঙব, না চুপচাপ বাড়ির দিকে পা বাড়াবেন?

কেরানি—তুমি বাপু হাটে আমার হাঁড়ি কী ভাঙবে হে? আমাকেও কি গয়লা ঠাউরেছ নাকি যে তোমার ভড়কিতে ভয় পাব?

খলিল—(ছেলেটাকে) কী বাবা, তুমি গুড় কিনে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিলে, তাই না?

ছেলে—(কেরানিবাবুর দিকে সশঙ্ক নেত্রে তাকিয়ে) — বলব?

কেরানি—ছেলেমানুষকে যেমনটি শিখিয়ে পড়িয়ে আনবে তেমনি বলবে।

খলিল—বাবা, এই একটু আগে তুমি আমাকে যা যা বলেছ, সে কথাটাই আবার এঁদের বলে দাও।

ছেলে—বাবা মারবেন।

কেরানি—তাহলে কি তুই রাস্তায় গুড় খেয়ে নিয়েছিস?

ছেলে কাঁদতে শুরু করে।

খলিল—জি হ্যাঁ, তাই। ও আমাকে নিজের মুখে সব বলেছে; কিন্তু আপনি তো ওকে জিজ্ঞেস করে দেখেননি, বেনের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিলেন। এই বুঝি ভদ্রলোকের ব্যবহার?

কেরানি—আমি কি জানি যে রাস্তায় ও এই পেজোমি করেছে?

খলিল—তাহলে এমন কমজোর সাবুদের জোরে আপনি থানায় যাচ্ছিলেন কী করে? গেঁয়ো লোকদের মানি অর্ডারের টাকা দেবার সময় সে টাকা থেকে দুআনা নিজের দস্তুতির কেটে রাখেন। দুপয়সার পোস্টকার্ড বেচেন চার পয়সায়, যখনি বলবেন প্রমাণ করে দেব। এই কাজগুলোকে কি আপনি বেইমানি বলে মনে করেন না?

কেরানিবাবু খ্যাপাকে ঘাটানো উচিত মনে করেন না। ছেলেটাকে মারতে মারতে বাড়ি নিয়ে যান। বেনে খ্যাপাকে মন খুলে আশীর্বাদ করে। দর্শকেরাও একে একে চলে যায়। আমি তখন খলিলকে বলি—আপনি বেনেটার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, নইলে নিরপরাধ বেচারা পুলিশের কবলে ফেঁসে যেত।

খলিল—আপনি জানেন আমি এর কী ইনাম পাব? থানার দারোগা আমার দুশমন হয়ে যাবেন। বলবেন, ব্যাটা আমার শিকার ভাগিয়ে দিচ্ছে। আব্বাসাহেব পুলিশের নামে থর থর করে কাঁপেন। আমার ওপর একচোট নেবেন, বলবেন, তুই কেন অন্যের ব্যাপারে ফোঁপরদালালি করতে যাস? এখানে এও একট পাগলামি। একজন বেনের হয়ে আমার এসব জনাবদের ভেতরের কথা ফাঁস করে দেওয়াটা উচিত হয়নি। এসব ঝামেলা শুধু খ্যাপারাই লাগায়!

আমি শ্রধাপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠি—এখন থেকে আপনাকে আমি এই নামেই ডাকব। আজ আমি বুঝতে পেরেছি খ্যাপা বলে কাদের। যে লোক স্বার্থের জন্য বিবেককে বলি দেয় সে চালাক, বুদ্ধিমান। যে বিবেকের জন্য, সৎ সংকল্পের জন্য, সত্যের জন্য, স্বার্থের, লোকনিন্দার পরোয়া করে না, সে খ্যাপা, সে বোকা।

(বৌড়ম/১৯২৩) অনুবাদ ননী শূর

গৃহদাহ

সত্যপ্রকাশের জন্মের উৎসবে লালা দেবপ্রকাশ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তার বিদ্যারম্ভও হয়েছিল যথেষ্ট ধুমধামের মধ্যে দিয়ে। হাওয়া খেতে যাবার জন্যে ওর একটা ছোটো গাড়িও ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় একজন পরিচারক ওকে বেড়াতে নিয়ে যেত। অপর একজন ওকে পাঠশালায় পৌঁছে দিত, তারপর দিনভর সেখানেই অপেক্ষা করে ওর ছুটি হলে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসত। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সুশীল বালক ছিল সে। ফরসা মুখ, বড়ো বড়ো দুটো চোখ, প্রশস্ত কপাল, টুকটুকে দুটি পাতলা ঠোঁট, সুপুষ্ট দুটি পা। ওকে দেখলেই মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে আসে—ভগবান একে বাঁচিয়ে রাখুন, স্বনামধান্য হবে এ ছেলে। ওর শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষে লোকে অবাক হয়ে যেত। সবসময় ওর মুখে লেগে থাকত হাসি। কেউ ওকে কোনোদিন জেদ কিংবা কান্নাকাটি করতে দেখে নি।

সেবার বর্ষাকাল। দেবপ্রকাশ সস্ত্রীক গেছেন গঙ্গাস্নানে। ভরাভর্তি নদী, যেন কোনো অনাথ শিশুর সজল দুটি চোখ। ওঁর স্ত্রী নির্মলা জলে নেমে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। কখনও সামনে এগিয়ে যান, কখনও পেছিয়ে আসেন খানিক, কখনও ডুব দেন জলে, আবার কখনও আঁজলা করে জল ছিটিয়ে দেন চতুর্দিকে। দেবপ্রকাশ ওঁকে বললেন—আচ্ছা যথেষ্ট হয়েছে, এবার উঠে পড়ো। নয়তো ঠান্ডা লেগে যাবে। নির্মলা বললেন—দেখো, আমি বুকজলে চলে যাই! দেবপ্রকাশ—আর যদি পা ফসকে যায়? নির্মলা—পা ফসকাবে কেন?

এই বলে তিনি বুকজলে নেমে গেলেন। তার স্বামী ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললেন—হয়েছে হয়েছে, আর এগিও না। কিন্তু ততক্ষণে নির্মলার শিয়রে শমন এসে ভর করেছে। তখন আর সেটা জলক্রীড়া নেই, মৃত্যুক্রীড়া হয়ে গেছে। আর মাত্র এক পা আগে বাড়াতেই পা ফসকে গেল। মুখ থেকে একটা তীব্র চিৎকার বেরিয়ে এল, দুটি হাত সাহায্যের জন্যে বারেক ওপরে উঠল, তারপর হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো। পিপাসার্ত নদী ক্ষণেকের মধ্যেই তাকে নিজের গহ্বরে পুরে নিল।

দেবপ্রকাশ পাড়ে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে, সঙ্গের পরিচারকও নামল। লফিয়ে পড়ল দুজন মাঝিও। জলে ডুব দিয়ে দিয়ে জল তোলপাড় করে সবাই খুঁজল কিন্তু নির্মলার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন ডুবুরি এলো, নৌকো এলো। মাল্লারা বারে বারে চেস্ট করল, কিন্তু লাশ পাওয়া গেল না কিছুতেই। শোকে মুহ্যমান দেবপ্রকাশ বাড়ি ফিরে এলেন। সত্যপ্রকাশ ছুটে এল উপহারের আশায়। তার বাবা তাকে কোলে নিয়ে প্রচণ্ড চেস্টা সত্ত্বেও অশ্রু রোধ করতে পারলেন না। সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল—মা কোথায়? দেবপ্রকাশ—মা গঙ্গা ওকে নেমন্তন্ন খাওয়ানোর জন্য আটকে রেখেছে।

বাবার মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সত্যপ্রকাশ, তারপর ব্যাপার বুঝে 'মা মা' বলে কাঁদতে লাগল।

দুই

এই দুনিয়ায় সব দুর্ভাগা হল সেই শিশু যার মা নেই। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীরও একটা ঐশ্বরিক অবলম্বন থাকে যা তাদের হৃদয়কে সব সময় আগলে রাখে। মাতৃহীন শিশু সেই অবলম্বন থেকেও বঞ্চিত। জননীই যে তার জীবনের একমাত্র আশ্রয়। মা-হারা সে তো ডানাকাটা পাখি।

সত্যপ্রকাশ ক্রমশ নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠল। একা একা বসে থাকে। গাছপালার কাছে সে অজানা সহানুভূতির ছোঁয়া পেত, যা বাড়ির কোনো লোকের কাছ থেকে পেত না। মায়ের স্নেহ হারিয়ে গেছে, অমনি সবাই নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। বাবার চোখেও সেই ভালোবাসার জ্যোতি আর নেই। দরিদ্রকে কে আর ভিক্ষে দেয়?

ছমাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন ওর মনে হল বুঝি নতুন মা আসছে তার। ছুটে গিয়ে বাবার কাছে জিজ্ঞেস করল—বাবা আমার নতুন মা আসবে? বাবা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ বাবা, সে এসে তোমাকে আদর করবে।

সত্য—আমার মা-ই স্বর্গ থেকে আসবে আবার?

দেব—হ্যাঁ, সেই মা-ই আসবে।

সত্য—আমাকে সেই রকমই ভালোবাসবে?

একথার কী উত্তর দেবেন দেবপ্রকাশ? সত্যপ্রকাশ কিন্তু সেইদিন থেকেই খুব খুশিমনে থাকতে লাগল। মা আসবে! আমাকে কোলে নিয়ে আদর করবে! আর আমি কখনও মাকে বিরক্ত করব না, কখনও জিদ করব না, মাকে ভালো ভালো সব গল্প বলব।

বিবাহের দিন এসে গেল। বাড়িতে তার তোড়জোড় শুরু হল। সত্যপ্রকাশের আনন্দ আর ধরে না। নতুন মা আসবে! বরযাত্রীদের সঙ্গে সেও গেল। নতুন নতুন কাপড়-জামা পরল। পালকিতে বসল। দিদিমা ওকে ভেতর বাড়িতে ডেকে কোলে নিয়ে ওর হাতে একটা টাকা দিলেন। সেখানেই সে নতুন মাকে দেখতে পেল। দিদিমা মাকে বলল—দেখ মা,কী সুন্দর ছেলে। একে যত্ন করো মা।

সত্যপ্রকাশ নতুন মাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। শিশুরাও রূপের কদর বোঝে। এক অপরূপা লাবণ্যময়ী মূর্তি অলংকারভূষিতা হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। সে দুই হাত দিয়ে তার আঁচল জড়িয়ে ধরে বলল—মা!

কী বিশ্রী, লজ্জার এবং কতখানি অপ্রিয় শব্দ! সেই রমণী, লোকে যাকে দেবপ্রিয়া বলে ডাকত, এই দায়িত্ব, ত্যাগ আর ক্ষমাসুন্দর সম্বোধন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি এখন প্রেম আর বিলাসব্যসনের সুখস্বপ্ন দেখছেন, — ভরা যৌবনের মাতাল হাওয়ায় আন্দোলিত তাঁর সেই সুখস্বপ্নে রূঢ়তম আঘাত হানল শব্দটি—একটু রাগত স্বরেই তিনি বললেন, আমাকে মা বলে ডাকবে না।

বিস্মিত হয়ে তাকাল সত্যপ্রকাশ। তার শিশুস্বপ্ন ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। জলে ভরে উঠল চোখ। তাই দেখে দিদিমা বললেন—আহা, মা, দেখো ছেলেটা কত দুঃখ পেল। ও বেচারি কি জানে কাকে কী বলতে হয়? না হয় তোমাকে মা-ই বলেছে তাতে কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হল তোমার?

দেবপ্রিয়া বললেন—না, আমাকে মা বলবে না।

তিন

সপত্নীপুত্র বিমাতার চোখে এত অপ্রিয় হয় কেন? আজ পর্যন্ত কোনো পণ্ডিত এ প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন নি। আমি তো কোন ছার। যতদিন পর্যন্ত না দেবপ্রিয়া অন্তঃসত্ত্বা হলেন, কখনও-সখনও তিনি সত্যপ্রকাশের সঙ্গে কথা-টথা বলতেন, ওকে গল্পটল্প শোনাতেন। কিন্তু সন্তান সম্ভাবনার পর থেকেই তাঁর ব্যবহার কঠোর হয়ে গেল এবং প্রসবকাল যতই নিকটবর্তী হতে লাগল ততোই বাড়তে লাগল সেই কঠোরতা। যেদিন তাঁর কোলজুড়ে এল চাঁদের মতো ফুটফুটে এক শিশু, সত্যপ্রকাশ আনন্দে অধীর হয়ে নেচেকুঁদে ছুটল আঁতুড়ঘরে বাচ্চাকে দেখতে। শিশু তখন ছিল দেবপ্রিয়ার কোলেই। সাগ্রহে তাকে দেবপ্রিয়ার কোলের থেকে তুলতে গেল সত্যপ্রকাশ। অমনি সহসা দেবপ্রিয়া তীব্রস্বরে ধমকে উঠলেন—খবরদার, ওর গায়ে হাত দিবি না একদম। কান টেনে ছিঁড়ে ফেলব বলে দিলাম।

বালক সত্যপ্রকাশ মর্মাহিত হয়ে ফিরে এল এবং ঘরের ছাতে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদল। কী সুন্দর বাচ্চাটা। ওকে কোলে আমি নিয়ে বসতে পারলে কী মজাই না হত। আমি ওকে ফেলে দিতাম না কি? তবে কেন উনি আমাকে বকলেন? বেচারি বালক, সে আর কী করে জানবে যে এই নিষেধাজ্ঞা মাতৃহৃদয়ের সাবধানতা থেকে নয়, এর মূলে আছে অন্য কিছু।

আর একদিন বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিল। ওর নাম রাখা হয়েছে জ্ঞানপ্রকাশ। দেবপ্রিয়া তখন স্নানের ঘরে। সত্যপ্রকাশ খুব চুপি চুপি এসে বাচ্চার ঢাকনিটা সরিয়ে পরম অনুরাগের দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল। ওকে একটিবার কোলে নিয়ে আদর করার জন্য আকুলিবিকুলি করতে লাগল ওর প্রাণটা, কিন্তু ভয়ে সে তাকে তুলল না, শুধু ওর গালে চুমু খেতে লাগল। এমন সময় দেবপ্রিয়া বেরিয়ে এসেছেন। সত্যপ্রকাশ বাচ্চাকে চুমু খাচ্ছে দেখেই রেগে একেবারে আগুন। দূর থেকেই চিৎকার করে উঠলেন—বেরিয়ে যা বলছি ওখান থেকে।

সত্যপ্রকাশ করুণ নেত্রে মাকে দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল বাইরে।

সন্ধে বেলায় বাবা জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ভাইকে কাঁদাচ্ছিলে কেন?

সত্য—আমি ওকে কাঁদাইনি তো। মা আমাকে ওর সঙ্গে খেলা করতে দেয় না।

দেব—মিছে কথা বলছ। আজ তুমি ওকে চিমটি কেটেছ।

সত্য—না তো, আমি তো শুধু ওর হামি নিচ্ছিলাম।

দেব—ফের মিথ্যে কথা।

সত্য—না, মিছে কথা বলিনি।

ভীষণ রাগ হল দেবপ্রকাশের। ওকে ধরে দু-তিনটে থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন সজোরে। বাবার কাছে সত্যপ্রকাশ এই প্রথম আঘাত পেল, তাও বিনা অপরাধে। এই আঘাত ওর জীবনের গতিকেই পালটে দিল।

চার

এর পর থেকে সত্যপ্রকাশের স্বভাবে এক বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। সে ঘরে আসে খুব কম। বাপের সামনে পড়লে মুখ লুকিয়ে সরে যায়। কেউ খেতে ডাকলে চোরের মতো অধোবদনে

চুপচাপ কোনোরকমে গলাধঃকরণ করে নেয় খাবারগুলো। কিছু চায়ও না। আগে সে ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছেলে। ওর কথাবার্তায়, চলাফেরায়, সপ্রতিভতায় মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। এখন সে পড়তে চায় না, অপরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় পরে থাকে। বাড়িতে তাকে ভালোবাসার কেউ নেই। সে রাস্তার বাউন্ডুলে ছেলেদের সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ঘুড়ি লুটতে যায়, মুখ খারাপ করে। ওর শরীরও অনেক দুর্বল হয়ে গেল। চেহারায় সেই স্নিগ্ধতা কোথায় হারিয়ে গেল। দেবপ্রকাশকে এখন প্রায় রোজই ওর অপরাধের ফিরিস্তি শুনতে হয় আর সত্যপ্রকাশ রোজই ধমকানি কিংবা চড়চাপড় খায়। এমনকী, সে কোনো প্রয়োজনে বাড়িতে এলেও বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে ওকে দূর দূর করতে থাকে। জ্ঞানপ্রকাশকে পড়তে মাস্টার আসেন। দেবপ্রকাশ প্রতিদিন তাকে হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যান। হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছেলে। দেবপ্রিয়া ওকে সত্যপ্রকাশের সঙ্গ থেকে দূরে রাখতে চাইত সব সময়, দুই ছেলেতে কত তফাত! একজন পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর পোশাক পরিহিত, ভব্যতা আর বিনয়ের একেবারে অবতার, সত্যভাষী। যে দেখে তারই মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ আশীর্বাদ বেরিয়ে আসে। অপরজন নোংরা, বদমাইস, চোরের মতো মুখ লুকিয়ে ঘোরে, অসভ্য, মুখে মুখে জবাব করে, ঝগড়া করে আর গালাগালি দেয়। একজন যেন পুষ্পেপল্লবে ভরা তরু। প্রেমে প্লাবিত, স্নেহে সিঞ্চিত। দেখে বুক জুড়িয়ে যায় বাপের, অপর জনকে দেখলে আগুন জ্বলে ওঠে।

পাঁচ

সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যপ্রকাশের কিন্তু ছোটো ভাইয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র ঈর্ষা ছিল না। ওর অন্তরে যদি সামান্যতম কোমল জায়গাও থেকে থাকে তবে তা এই ভাইয়ের প্রতি তার ভালোবাসা। ওর মনের মরুভূমিতে ওই একটি মাত্র সবুজের আভাস। ঈর্ষা হল সাম্যভাবের দ্যোতক। সত্যপ্রকাশ নিজের ভাইকে আপনার চাইতে বড়ো এবং সৌভাগ্যবান বলে মনে করত। ওর মনে ঈর্ষা ভাবটাই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ঘৃণা থেকে ঘৃণারই উৎপত্তি হয়। আর প্রেম থেকে প্রেমের। জ্ঞানপ্রকাশও দাদাকে পছন্দ করত। মাঝে মাঝে দাদার পক্ষ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথাকাটাকাটিও করে বসত। দাদার জামাটা ছিঁড়ে গেছে, তুমি নতুন জামা কিনে দিচ্ছনা কেন? মা উত্তর দিতেন—ওর ওই ভালো। এমন কী একদিন ওকে ন্যাংটা থাকতে হবে। জ্ঞানপ্রকাশ চাইত নিজের পকেট খরচা থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে দাদাকে দেয়, কিন্তু সত্যপ্রকাশ কখনো তা নিতে রাজি হত না। আসলে যতটুকু সময় সে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে পারত ততক্ষণ ওর মুখ দিয়ে কোনো খারাপ কথা বা কটু কথা বেরোত না। কিছুক্ষণের জন্য ওর সুপ্ত অন্তরাত্মা জেগে উঠত।

একবার পরপর কদিন সত্যপ্রকাশ ইস্কুলে গেল না। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার, তুমি আজকাল পড়তে যাচ্ছ না কেন? ভেবেছ কি যে আমি সারা জীবন তোমার খোরাক জুটিয়ে যাব?

সত্য—ইস্কুলে আমার ক-টাকা মাইনে আর জরিমানা বাকি পড়েছে। আমি ইস্কুলে গেলে আমাকে ঢুকতে দেয় না।

দেব—কেন, মাইনে বাকি পড়ল কেন? তুমি তো প্রতি মাসেই টাকা নিয়ে নাও।

সত্য—রোজ রোজ চাঁদা দিতে হয়, তাই মাইনের টাকায় চাঁদা দিয়েছি।

দেব—আর জরিমানা কীসের জন্যে?

সত্য—মাইনে দেওয়া হয়নি বলে।

দেব—তুমি চাঁদা দিলে কেন?

সত্য—জ্ঞানু চাঁদা দিল তাই আমিও দিলাম।

দেব—তুমি জ্ঞানুকে হিংসে করছ?

সত্য—হিংসে করব কেন? এখানে আমি আর ও দুরকম কিন্তু বাইরে তো তা নয়। সবাই ওকে আর আমাকে একই মনে করে। তাই আমি লোককে জানাতে চাইনি যে আমার কাছে কিছু নেই।

দেব — কেন, সে কথা জানাতে লজ্জা করছিল বুঝি?

সত্য — হ্যাঁ, কারণ আপনার বদনাম হত।

দেব—আচ্ছা, তাহলে তুমি আমার মানরক্ষা করেছ। এ কথাটা কেন স্বীকার করছ না যে পড়াশোনায় তোমার আর মন বসছে না। আমার এত টাকা নেই যে তোমাকে এক এক ক্লাসে তিন বছর করে পড়াব আর তারও ওপর তোমার নিজের খরচের জন্য প্রতিমাসে কিছু কিছু দিয়ে যাব। জ্ঞানু তোমার থেকে কত ছোটো, কিন্তু তোমার থেকে মাত্র এক ক্লাস নীচে পড়ছে। এ বছর তুমি ফেল করবেই আর ও ঠিক পাশ করে আগামী বছর তোমার সমান হয়ে যাবে। তখন তোমার মুখে কালি পড়বে না?

সত্য—লেখাপড়া আমার কপালে নেই।

দেব—তবে তোমার কপালে কী আছে শুনি?

সত্য—ভিক্ষে করা।

দেব—তবে তাই করো গে যাও। আমার বাড়ি থেকে দূর হও।

দেবপ্রিয়া এসে শুনছিলেন। বললেন—বেহায়ার লজ্জা তো নেই, আবার মুখে মুখে জবাব করা হচ্ছে।

সত্য—যাদের কপালে ভিক্ষে করা থাকে, শুধুমাত্র তারাই শৈশবে অনাথ হয়।

দেবপ্রিয়া—উঃ, এই গা-জ্বালানো কথা আর সহ্য হয় না আমার। আমার মাথায় খুন চেপে যায়।

দেবপ্রকাশ—বেহায়া কোথাকার। কাল থেকে ওর নাম কাটিয়ে দেব। ভিক্ষাই যদি করার আছে তবে তাই করুক।

ছয়

পরদিন সত্যপ্রকাশ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য তৈরি হল। এখন ওর বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হয়েছে। এত সব কথা শোনার পর আর এ বাড়িতে থাকা ওর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। যতদিন হাত-পা ছিল না, কিশোর বয়সের অসামর্থ্যে সমস্ত অবহেলা অনাদর নিষ্ঠুরতা ভর্ৎসনা সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করেও ঘরে থাকতে হয়েছে। এখন হাত-পা হয়েছে, সে আর ওই বন্ধনে থাকবে কেন? আত্মসম্মান বোধ আশার মতোই অজর অমর অক্ষয়।

গ্রীষ্মের দিন। দুপুরবেলা। বাড়ির সবাই নিদ্রাচ্ছন্ন। সত্যপ্রকাশ নিজের ধুতিটা গুছিয়ে নিল, একটা ছোটো হাতব্যাগ নিয়ে নিল। ভেবেছিল চুপচাপ সকলের অলক্ষ্যে বৈঠকখানা দিয়ে বেরিয়ে পড়বে, এমন সময় জ্ঞানু এসে পড়ল আর ওকে কোথাও যেতে প্রস্তুত দেখে জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছ দাদা?

সত্য—চাকরি করতে যাচ্ছি ভাই।

জ্ঞানু—আমি গিয়ে মাকে বলে আসি।

সত্য—তাহলে আমি তোমাকে লকিয়ে চুপচাপ পালাব।

জ্ঞানু—কেন তুমি চলে যাচ্ছ? তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না।

সত্যপ্রকাশ ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলল—তোমাকে ছেড়ে যেতে তো আমি কখনো চাইনা ভাই, কিন্তু এ বাড়িতে কেউ চায় না যে আমি থাকি, এখানে পড়ে থাকা যে নির্লজ্জতার চূড়ান্ত। পাঁচ-দশ টাকা মাইনের একটা চাকরি কোথাও জুটিয়ে নেব, তাই দিয়েই নিজের পেট চালাব। আর কী করতে পারি?

জ্ঞানু—মা তোমার উপর এত চটা কেন? আমাকে তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করে কেন?

সত্য—আমার কপালটাই খারাপ আর কী।

জ্ঞানু—তোমার লেখাপড়া করতে মন বসে না?

সত্য—ভালোই লাগে না, কী করি বল? কেউ যখন আমার কথা কিছু ভাবে না তখন ভাবছি বেরিয়েই যাই। হোঁচট খাব, আর কী!

জ্ঞান—আমাকে ভুলে যাবে না তো দাদা? আমি তোমাকে চিঠি লিখব। তুমি একবার তোমার ওখানে আমাকে নিয়ে যেয়ো, কেমন?

সত্য—তোমার স্কুলের ঠিকানায় চিঠি লিখব।

জ্ঞানু—(কাঁদো কাঁদো স্বরে) আমি তোমাকে এত ভালোবাসি কেন জানি না।

সত্য—আমি তোমাকে সব সময় মনে রাখব।

এই বলে আবার একবার ভাইকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। সঙ্গে একটা কানাকড়িও নেই, আর সে চলল কলকাতা!

সাত

সত্যপ্রকাশ কীভাবে কলকাতা পৌঁছাল তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যুবকদের মধ্যে দুঃসাহস বস্তুটা কিঞ্চিৎ বেশি পরিমাণেই থাকে। তারা হাওয়ায় দুর্গ গড়ে নিতে পারে, খটখটে শুকনো জমির বুকে চালাতে পারে অর্ণবযান। দুঃসাধ্য বলে কিছু তাদের অভিধানে নেই। অসীম আত্মবিশ্বাসে তারা ভরপুর। কলকাতা পৌঁছানো তেমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। সত্যপ্রকাশ চালাকচতুর ছেলে। আগেই ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল কলকাতা গিয়ে কী করবে, কোথায় থাকবে। নিজের হাতব্যাগটির মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছিল লেখবার সমস্ত সরঞ্জাম। বড়ো বড়ো শহরে জীবিকা অর্জন যেমন কঠিন ঠিক ততখানি সোজাও। তাদের পক্ষে সহজ যারা হাতের কাজ করতে পারে, কিন্তু কঠিন তাদের

জন্যে যারা শুধু কলম চালিয়ে খেতে চায়। সত্যপ্রকাশ মজদুরি করাটাকে নিচু কাজ ভাবত। সে গিয়ে এক ধর্মশালায় নিজের জিনিসপত্তর রেখে শহরের প্রধান প্রধান জায়গাগুলো দেখে বেড়াল, তারপর একটা ডাকঘরের সামনে নিজের লিখন সামগ্রী নিয়ে বসে পড়ল আর নিরক্ষর মানুষজনের চিঠি, মনিঅর্ডার ইত্যাদি লিখে দেবার ব্যাবসা শুরু করল। প্রথম কটা দিন তেমন পয়সা জুটল না যাতে সে ভরপেট খেতে পায়। তারপর ধীরে ধীরে রোজগার বাড়তে লাগল। শ্রমিক-মজুরদের সঙ্গো ও এত ভদ্রভাবে এত সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলত আর তাদের বক্তব্য এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখে দিত যে তারা সেই চিঠির বয়ান শুনে যারপরনাই সন্তুষ্ট হত। অশিক্ষিত মানুষ একই কথা দুবার তিনবার করে বলে। তাদের অবস্থা ঠিক রোগীদের মতো হয়, যারা কবিরাজকে তাদের ব্যথা-বেদনার বৃত্তান্ত বারে বারে বলতে থাকে। সত্যপ্রকাশ তাদের সেই কথাকে স্পষ্ট ভাবে লিখে তাদের মুগ্ধ করে দিত। একজন সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেত, তারপর তার পরিচিত আত্মীয়স্বজনদের ডেকে নিয়ে আসত। এক মাসের মধ্যেই সত্যপ্রকাশের দৈনিক এক টাকা উপার্জন হতে লাগল। তখন ধর্মশালা ছেড়ে দিয়ে শহরের বাইরে মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় একটা ছোটো ঘর নিল। এক বেলা খেত। বাসন মেজে নিত নিজেই। মেঝেয় শুত। নিজের এই নির্বাসনে ওর এক বিন্দুও খেদ বা দুঃখ ছিল না। ঘরের লোকের কথা মনেও পড়ত না। নিজের অবস্থায় সে সন্তুষ্টই ছিল। বিদায়ের সময়কার সেই কথাগুলি, সেই ছবিটা তার চোখের সামনে ভাসত। নিজের জীবিকার ব্যাপারটা সামলে উঠে সে জ্ঞানপ্রকাশকে একটা চিঠি লিখল। যখন তার উত্তর এল ওর আর আনন্দের সীমা রইল না। আমার কথা মনে করে জ্ঞানু কাঁদে, সে আমার কাছে আসতে চায়, তার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। পিপাসার্ত লোকের জল খেয়ে যে তৃপ্তি হয়, এই চিঠি পেয়ে সত্যপ্রকাশের তাই হল। আমি একলা নই, আমাকেও কেউ ভালোবাসে, আমার কথাও কেউ ভাবে।

সেইদিন থেকেই সত্যপ্রকাশের মাথায় ঢুকল জ্ঞানপ্রকাশকে একটা উপহার পাঠাতে হবে। যৌবনে মানুষের মিত্রলাভ হয় খুব তাড়াতাড়ি। সত্যপ্রকাশেরও কয়েকটি যুবকের সঙ্গো বন্ধুত্ব হল। বার কয়েক সিনেমাও দেখতে গেল তাদের সঙ্গো। কিছুদিন ভাঙ গাঁজা মদ মাংস চলল। আয়না তেল চিরুনির শখও চাপল। যা কিছু রোজগার করত এইভাবেই উড়িয়ে দিত। অত্যন্ত দ্রুত নৈতিক অধঃপতন এবং শারীরিক বিনষ্টির দিকে ছুটে চলেছিল। এই স্নেহমাখানো চিঠিটা এসে টেনে ধরল তার রাশ।

উপহার দেবার চিন্তা এসে বন্ধ করল তার এই সমস্ত বদখেয়ালের স্রোত। সিনেমার নেশা ছুটে গেল। নানান অজুহাতে এড়িয়ে চলতে লাগল বন্ধুদের। খাওয়াদাওয়াতে সংযত হল। অর্থসঞ্চয়ের চিন্তা তার অন্য সমস্ত চিন্তাকে মুছে ফেলল মন থেকে। সে ঠিক করল একটা ভালো ঘড়ি পাঠাবে। তার দাম কম-সে-কম ৪০ টাকা তো হবেই। যদি এখন থেকে তিন মাস একটা পয়সাও অপব্যয় না করি তবে ঘড়ি কেনা সম্ভব হতে পারে। ঘড়ি দেখে জ্ঞানু কতই না আনন্দ পাবে। মা আর বাবাও দেখবেন। ওরা বুঝতে পারবেন যে আমি না খেতে পেয়ে পেয়ে মরে যাচ্ছি না। খরচ কমাবার জন্য সে প্রায়ই রাতে ঘরে আলো পর্যন্ত জ্বালায় না। সাতসকালে বেরিয়ে যায় কাজে, সারাটা দিন দু-চার পয়সার মিঠাই, এটা সেটা খেয়েকাটিয়ে দেয় আর কাজ করে। দিনে দিনে ওর মক্কেলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। চিঠিপত্র ছাড়াও আজকাল ও টেলিগ্রাম লেখা শিখে নিয়েছে। মাত্র দুমাসেই ওর

কাছে ৫০ টাকা জমে গেল। যখন সোনালি চেন সমেত ঘড়িটা পার্শেল করে জ্ঞানুর নামে পাঠিয়ে দিল, ওর এত ভালো লাগছিল যেন কোনো নিঃসন্তান ব্যক্তি হঠাৎ সন্তানের মুখ দেখেছে।

আট

ঘর—এই কথাটা মনে হলেই কত না কোমল, পবিত্রতার সুন্দর সুন্দর স্মৃতি মনে পড়ে যায়। এ যে প্রেমের নিজস্ব আলয়, সুকঠিন তপস্যায় প্রেম এই বর লাভ করেছে।

কিশোর বয়সে ঘর বলতে বোঝায় বাবা মা ভাই বোন বন্ধু বান্ধবীর ভালোবাসা, প্রৌঢ় বয়সে তা হল গৃহিণী আর সন্তানসন্ততিদের ভালোবাসা। এই হল সেই বস্তু যা মানবজীবনকে সুস্থির রাখে, জীবনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বাঁচিয়ে চলে এবং মগ্ন শিলাখণ্ডের আঘাত থেকে রক্ষা করে। এই আশ্রয় সমস্ত বাধাবিপত্তি থেকে জীবনকে সুরক্ষিত রাখে।

সত্যপ্রকাশের সেই 'ঘর' কোথায়? সে কোন শক্তি যা তাকে কলকাতা শহরের শতসহস্র প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করে?—মায়ের স্নেহ, বাবার ভালোবাসা, ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বেগ?—না, তার রক্ষক, উধারক কিংবা সন্তুষ্টি যাই বলা যাক, সবই সেই জ্ঞানপ্রকাশের ভালোবাসা। তার জন্যই সে একটা একটা পয়সা খরচেও হিসেবি, তার জন্যই সে দিবারাত্র কঠিন পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের নতুন নতুন রাস্তা উদ্ভাবনের চেষ্টা করে। জ্ঞানপ্রকাশের চিঠি থেকে সে জানতে পেরেছে যে আজকাল দেবপ্রকাশের অবস্থা ভালো নয়। তিনি একটা বাড়ি তৈরি করেছেন যার ব্যয় অনুমানের চাইতে বেশি হয়ে যাওয়ায় ঋণ করতে হয়েছে, যার জন্য আজকাল আর জ্ঞানপ্রকাশকে পড়াতে মাস্টার আসে না। এ কথা জানার পর থেকে সত্যপ্রকাশ প্রতিমাসেই জ্ঞানুকে কিছু না কিছু পাঠিয়ে দেয়। এখন আর সে সামান্য পত্রলেখক নয়, লিখনসামগ্রীর একটা ছোটো দোকানও করে নিয়েছে। তার থেকেও উপার্জনটা ভালোই হচ্ছে। এই ভাবে পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটে গেল। তার ফুর্তিবাজ বন্ধুবান্ধবেরা যখন দেখল যে সে আর তাদের কবজায় আসবে না, তখন তারা তার কাছে আসাযাওয়াই বন্ধ করে দিল।

নয়

সন্ধ্যাবেলা। দেবপ্রকাশ নিজের বাড়িতে বসে দেবপ্রিয়ার সঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশের বিবাহ সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। জ্ঞানু এখন ১৭ বছরের সুন্দর যুবক। বাল্যবিবাহের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও দেবপ্রকাশ আর সেই শুভ মুহূর্তটাকে ছাড়তে চাইছেন না। বিশেষত যখন কোনো মহাশয় কন্যাকর্তা নগদ ৫০০০ টাকা পণ দেবার জন্য প্রস্তুত।

দেবপ্রকাশ—আমি তো তৈরি, কিন্তু তোমার ছেলেকে রাজি করাও আগে।

দেবপ্রিয়া—তুমি কথাবার্তা পাকা করে নাও তো। সে ঠিক রাজি হয়ে যাবেখন। সব ছেলেই গররাজি থাকে একটু আধটু।

দেব—আরে, জ্ঞানুর আপত্তি কেবল সংকোচ মাত্র নয়, ওটা ওর সিদ্ধান্ত। সে তো স্পষ্টই বলেছে যে যতদিন না দাদার বিয়ে হচ্ছে, আমি বিয়ে করবই না।

দেবপ্রিয়া—তাকে কে বলতে যাচ্ছে? দেখ গিয়ে হয়তো একটা রাখ্‌নি রেখে নিয়েছে, সে আবার বিয়ে করতে যাবে কোন দুঃখে? কেই বা দেখতে যাচ্ছে ওকে ওখানে?

দেব—(ঝাঁজিয়ে উঠে) তাই যদি হত তবে মাসে মাসে তোমার ছেলেকে চল্লিশটা করে টাকা পাঠাত না, আর সেই সমস্ত জিনিসও দিত না যা সে প্রথম মাস থেকেই দিয়ে আসছে বরাবর। ভগবান জানে কেন তোমার মন ওর প্রতি এতটা বিরূপ। সম্ভবত ও নিজের প্রাণটা দিয়ে দিলেও তোমার শান্তি হবে না।

দেবপ্রিয়া রাগ করে উঠে চলে গেলেন। দেবপ্রকাশ তাঁকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে প্রথমে সত্যপ্রকাশের বিবাহ দেওয়া উচিত। তিনি কিন্তু কোনো দিন এ প্রসঙ্গটাই আসতে দিতেন না। স্বয়ং দেবপ্রকাশের আন্তরিক ইচ্ছা যে প্রথমে বড়ো ছেলের বিবাহ দেবেন, কিন্তু উনিও আজ অবধি সত্যপ্রকাশকে একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেননি। দেবপ্রিয়ার প্রস্থানের পর আজ এই প্রথম বসলেন সত্যপ্রকাশকে পত্র লিখতে। প্রথমে এই সুদীর্ঘকালের নীরবতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তারপর ওকে অন্তত একটিবার বাড়ি আসার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। লিখলেন, এখন আমার কটা দিনই বা বাকি। আমার একান্ত ইচ্ছা তোমার আর তোমার ছোটো ভাইয়ের বিবাহ দিয়ে যাই। যদি তুমি আমার এই ইচ্ছেটুকু পূরণ না কর, তবে প্রাণে বড়োই আঘাত পাব। জ্ঞানপ্রকাশের দ্বিধার কথাও লিখলেন। সবশেষে একথাও লিখে দিলেন যে অন্য কোনো বিবেচনা থেকে না হলেও অন্তত জ্ঞানুর কথা ভেবে সে যেন একটিবার আসে এবং এই বন্ধন স্বীকার করে নেয়।

এই চিঠি পড়ার পর সত্যপ্রকাশের খেদের আর অন্ত রইল না। ভ্রাতৃস্নেহের যে এই পরিণাম হবে তা সে বুঝতে পারেনি। পাশাপাশি ওর একথা ভেবেও এক ধরনের ঈর্ষামিশ্রিত আনন্দ হল যে মা এবং বাবার এখন মানসিক বেদনা হচ্ছে। আমার জন্য ওদের কী কিছু চিন্তা ছিল? আমি মরে গেলেও ওঁদের চোখে দুফোঁটা জল বেরোত কিনা সন্দেহ। সাত-সাতটা বছর হয়ে গেল কোনোদিন ভুল করেও চিঠি লেখেনি জানতে মরে গেছি না বেঁচে গেছি। এবারে বুঝতে পারবে। জ্ঞানপ্রকাশ শেষ অবধি হয়তো বিবাহ করতে রাজি হয়ে যাবে, কিন্তু খুব সহজে নয়। যাক আর কিছু না হোক অন্তত আমার তো সুযোগ মিলল জানাবার যে আমি কেন বিয়ে করতে চাই না। জ্ঞানুর সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক আছে ঠিকই, কিন্তু সেটার কারণে আমি কোনো পারিবারিক অন্যায়ের দায়ভাগী হতে পারব না। আমাদের পারিবারিক জীবনই হচ্ছে যত নষ্টের মূল। এর ফেরে পড়েই মানুষ দুর্বুদ্ধিপরায়ণ হয়, ক্রুর আর নৃশংস হয়ে ওঠে, এর মায়াতেই মানুষ নিজের সন্তানকেও শত্রু করে তোলে। জেনেশুনে আমি বিষপান করতে পারব না। অবশ্য আমি জ্ঞানুকে বোঝাব, আমার নিজের বলতে যা কিছু সঞ্চয় সব আমি ওর বিবাহে খরচ করব। ব্যাস, এর বেশি আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর জ্ঞানু যদি অবিবাহিত থাকে তবেই বা সংসারের কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? এমন পিতার পুত্র হয়ে সে কি বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করবে না? আমার জীবনে যে সর্বনাশ নেমে এসেছে জ্ঞানুও কী সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবে না?

পরের দিন সত্যপ্রকাশ বাবার কাছে ৫০০ টাকা পাঠিয়ে দিল, সঙ্গে লিখল, আমার পরম সৌভাগ্য আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন। জ্ঞানুর বিবাহ স্থির হয়ে গেছে বলে অভিনন্দন জানাই।

এই টাকাটা দিয়ে বউমাকে অলংকার বানিয়ে দেবেন। আমার বিবাহের কথাটা অনুক্তই থাক। নিজের চোখ দুটো দিয়ে আমি যা দেখেছি আর আমার উপর যা যা ঘটেছে সে সব কথা স্মরণে থাকা সত্ত্বেও যদি আমি পুনরায় কুটুম্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হই, তবে আমার চেয়ে বড়ো নির্বোধ আর দুনিয়ায় দুটি নেই। আমি আশা করব আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। বিবাহের কথা উঠলেই আমার মনে কষ্ট পাই।

আরেকটি চিঠি লিখল জ্ঞানপ্রকাশকে। লিখল যে মা-বাবার আজ্ঞা শিরোধার্য করো। আমি অশিক্ষিত, মূর্খ, বুদ্ধিহীন লোক, আমার বিবাহ করার কোনো অধিকারই নেই। আমি তোমার বিবাহের শুভ উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারছি না, কিন্তু এই অনুষ্ঠানের চেয়ে বড়ো আনন্দ এবং তৃপ্তির বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

দশ

এই পত্র পেয়ে দেবপ্রকাশ নির্বাক হয়ে রইলেন। পুনরায় আগ্রহ দেখানোর মতো সাহসও তাঁর আর রইল না। দেবপ্রিয়া মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠলেন—ও ছোঁড়া দেখতে অমনি ভিজে বেড়াল, আসলে বদমাশের ধাড়ি। কেমন দূরে বসে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে বর্শার ফাল।

জ্ঞানপ্রকাশ যখন তার পত্র পড়ল, তার মনে হল বজ্রপাত হয়েছে। বাবা এবং মায়ের অন্যায় আচরণই ওকে এই দুশ্চর সংকল্প নিতে বাধ্য করেছে, এরাই ওকে নির্বাসিত করেছে এবং হয়তো তা চিরদিনের জন্যেই। ওর ওপর মায়ের যে কেন এত জ্বলুনি কে জানে। আমার তো এখন মনে হয় কিশোর বয়স থেকেই ও যথেষ্ট অনুগত, নম্র এবং সংযতবাক্ ছিল। মায়ের কথায় ও কোনোদিন জবাব করত না। আমি ভালো ভালো খেতুম, কিন্তু সেজন্য ও তো কোনোদিন হিংসে করেনি। যদিও উচিত ছিল হিংসে করা।

তাই অবস্থার ফেরে ওর যদি গার্হস্থ্য জীবনে ঘৃণা জন্মেই থাকে, তাতে আশ্চর্য কী? আর আমিই বা কেন ওই বিপত্তিতে পড়ি? ভগবান জানেন, হয়তো আমাকেও এই রকম কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। দাদা অনেক ভেবেচিন্তেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলায় যখন বাবা-মা দুজনে বসে এই বিষয়েই আলোচনা করছিলেন, জ্ঞানপ্রকাশ এসে বলল—আমি কাল দাদার কাছে যাব।

দেবপ্রিয়া—কী, কোথায় যাবে? কলকাতা?

জ্ঞান—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেবপ্রিয়া—ওকেই বা ডেকে পাঠাচ্ছ না কেন?

জ্ঞান—কোন মুখে ওকে আসতে বলব? আপনারা তো আগেই সে মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছেন। এমন দেবতার মতো মানুষ আপনাদের জন্যেই আজ বিদেশে পড়ে কষ্ট ভোগ করছেন, আর আমি কি এতই নির্লজ্জ যে.............

দেবপ্রিয়া—যথেষ্ট হয়েছে, চুপ কর। বিয়ে করতে না চাও কোরো না। কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না। মা-বাপের কর্তব্য, তাই বলা না হলে আমার বলতে বয়েই গেছে। তুই বিয়ে করবি কী আইবুড়ো থাকবি সে তোর খুশি, কিন্তু আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

দেব —কেন, আমার মুখ দেখতেও ঘেন্না হচ্ছে?

দেবপ্রিয়া—তুই যখন আমার কথা শুনবিই না তো যেখানে খুশি থাক গিয়ে। মনে করব ভগবান আমাকে সন্তান দেন নি।

দেব —কেন শুধু শুধু আজেবাজে কথা বলছ?

জ্ঞান—তোমরা যদি তাই চাও তবে তাই হবে।

দেবপ্রকাশ দেখলেন যে কথায় হাওয়া ঘুরতে লেগেছে, উনি জ্ঞানপ্রকাশকে ইশারায় বললেন চুপ করে যেতে এবং পত্নীর ক্রোধ শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দেবপ্রিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, আমি ওর মুখদর্শন করতে চাই না। শেষমেশ দেবপ্রকাশ বিরক্ত হয়ে বললেন, তা তুমিই তো কটু কথা শুরু করলে আর ওকে উত্তেজিত করে তুললে।

দেবপ্রিয়া—এ সমস্ত কিছুর মূলে সেই চণ্ডালটা যে সাতসমুদ্রের ওপারে বসে চেষ্টা করছে কী করে আমাকে ধ্বংস করে ফেলা যায়। আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যেই ওর এই প্রেমের অভিনয়। আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ওর মন্ত্র আমাকে প্রাণে মারবে, তা নইলে আমার জ্ঞানু, যে কখনো আমার কথার জবাব করে না, সে আমাকে এমন জ্বালাত না।

দেব—আরে তার মানে কি এই যে ও বিয়ে করবেই না। এখন রাগের মাথায় উলটো-পালটা বকে গেল। খানিক শান্ত হোক, আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করে দেবখন।

দেবপ্রিয়া—ও এখন আমাদের হাতের বাইরে।

দেখা গেল দেবপ্রিয়ার আশঙ্কাই সত্যি। দেবপ্রকাশ ছেলেকে অনেক বোঝালেন। এই শোকেদুঃখে তোমার মা মরে যাবেন, কিন্তু কোনো ফল হল না তাতেও। একবারও সে 'না' থেকে 'হ্যাঁ' বলল না। কাজেই বাবাও বিফলমনোরথ হয়ে চুপ করে গেলেন।

তারপর থেকে বছর তিনেক ধরে তার বিবাহের কথাটা উঠলেও জ্ঞানপ্রকাশ নিজের প্রতিজ্ঞাতে অটল থাকল। মায়ের কান্নাকাটি নিষ্ফল হল। তবে হ্যাঁ, সে মায়ের একটি কথা রেখেছিল— বড়োদাদার সঙ্গে দেখা করতে কলকাতা যায়নি।

এই তিন বছরে ওদের বাড়িতে অনেক কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। দেবপ্রিয়ার তিন কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। এখন ঘরে তিনি ছাড়া আর অন্য কোনো মেয়েমানুষ নেই। শূন্য ঘরবাড়ি ওঁর কাছে অসহ্য মনে হয়, যেন গিলতে আসে হাঁ করে। এমনতর নৈরাশ্য আর ক্রোধে যখন তিনি পাগল হয়ে যেতেন, প্রাণভরে গালাগালি দিতেন সত্যপ্রকাশকে। এসব সত্ত্বেও কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য-পত্র বিনিময় অক্ষুণ্ণ আছে।

দেবপ্রকাশের স্বভাবে এক বিচিত্র উদাসীনতা লক্ষ করা যাচ্ছে। উনি ইদানীং পেনশন নিয়েছেন এবং প্রায় সবসময় ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করছেন। জ্ঞানপ্রকাশও ইতিমধ্যে আচার্য উপাধি অর্জন করেছে এবং একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। দেবপ্রিয়া এখন সংসারে একদম একা।

ছেলেকে সংসারী করার জন্যে দেবপ্রিয়া প্রায়ই নানা রকম টোটকা-টুটকির ব্যবস্থা করেন। সগোত্রীয়দের মধ্যে কোন মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, গুণসম্পন্না, সুশিক্ষিতা—সবিস্তারে তার ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু জ্ঞানপ্রকাশের এতসব শোনবার সময় কোথায়?

পাড়ার অন্যান্য বাড়িতে প্রায়ই বিবাহ লেগেই থাকে। নববধূ আসে, তাদের কোলে ফুটফুটে বাচ্চা আসে, জমজম করে ঘর। কোথাও 'বিদায়' হচ্ছে। কোনো বাড়িতে সম্বন্ধ আসছে, কোনো

বাড়িতে গানবাজনা হয় আবার কোথাও বা বাজনা বাজে। এই সমস্ত দেখে দেখে দেবপ্রিয়ার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয়, সংসারে আমিই বুঝি সবচাইতে অভাগিনি। এইসব সুখ শুধু আমার কপালেই নেই। হে ঈশ্বর, এমন দিন কি আসবে যেদিন আমার বাড়িতেও আনন্দ উৎসবের মধুর ধ্বনি উঠবে। দিনরাত্রি এই কথা ভেবে ভেবে দেবপ্রিয়ার অবস্থা পাগলিনি-প্রায়। নিজের মনেই সত্যপ্রকাশকে গালমন্দ করেন। ওই আমাকে শেষ করবে। উদ্ভট কল্পনা উন্মাদদশার প্রধান লক্ষণ। এই কল্পনাপ্রবণতা অত্যন্ত সৃজনশীল হয়। তিনি আকাশে দেবতাদের পুষ্পকরথের আনাগোনা দেখতে লাগলেন। খাবারে নুন একটু বেশি হয়ে গেলে সেখানে শত্রুর চক্রান্ত কল্পনা করতে লাগলেন। দেবপ্রিয়া আজকাল কখনও কখনও এমনও ভেবে বসেন যে সত্যপ্রকাশ বাড়িতে ফিরে এসেছে,সে তাঁকে মেরে ফেলতে চায়, জ্ঞানপ্রকাশকে বিষ খাওয়ায়। একদিন তিনি সত্যপ্রকাশের উদ্দেশে একখানি চিঠি লিখলেন এবং তাতে যারপরনাই কটুকথা ব্যবহার করলেন। তুই আমার প্রাণের শত্তুর, আমাদের বংশের শত্রু, তুই খুনি। কবে যে তোর সর্বনাশ ঘটবে। আমার ছেলেকে তুই মন্ত্র দিয়ে বশ করেছিস ইত্যাদি। তার পরদিন আবার অনুরূপ আর একখানি লিখলেন। এর পর থেকে এটা তাঁর একটা নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াল। যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্যপ্রকাশকে গালমন্দ করে একখানা চিঠি লিখছেন ততক্ষণ তাঁর শান্তি নেই। এক ঝি-এর হাত দিয়ে তিনি এই সমস্ত চিঠি ডাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

এগারো

জ্ঞানপ্রকাশের অধ্যাপনাবৃত্তি গ্রহণ সত্যপ্রকাশের পক্ষে বড়োই বেদনাদায়ক হল। বিদেশে বসে মনে মনে সে এইটুকু সন্তোষ লাভ করত যে, সংসারে আমি একেবারে নিরালম্ব কিছু নই। কিন্তু এখন সেই অবলম্বনটুকুও যায়-যায়। জ্ঞানপ্রকাশ বিশেষ জোর দিয়েই লিখেছে যে আর আমার জন্যে আপনাকে কষ্ট করে কিছু পাঠাতে হবে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমি এখন পাচ্ছি।

সত্যপ্রকাশের দোকান যদিও মোটামুটি ভালোই চলত, কিন্তু কলকাতার মতো শহরে একজন ছোটো দোকানদারের জীবন বড়ো একটা সুখের হতে পারে না। মাসিক ৬০-৭০ টাকার রোজগারে কীই বা হয়? এতদিন যা কিছু সে সঞ্চয় করত, প্রকৃতপক্ষে সেটা সঞ্চয় নয়, সে ছিল ত্যাগ। এক বেলা রুখা-শুখা চারটি খেয়ে, একটা নোনাধরা ভ্যাপসা খুপরিতে থেকে সে ২৫-৩০ টাকা সঞ্চয় করত। এখন দুবেলাই খাওয়া শুরু করল। পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে লাগল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ওর খরচের একটা মোটা অংশ যেতে লাগল ওষুধের পেছনে। বছরেরপর বছর মুক্ত বায়ু বা পুষ্টিকর ভোজনের অভাবে লোহার শরীরও ভেঙে পড়তে বাধ্য। সত্যপ্রকাশেরও অরুচি মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগ শুরু হল। কখনও কখনও জ্বরও হত। যুবা বয়সে আত্মবিশ্বাস থাকে প্রবল, কোনো অবলম্বনের পরোয়াই থাকে না তখন। বয়স বাড়লে অপরের মুখাপেক্ষী হতে হয়, অবলম্বন খুঁজতে হয়। আগে আগে সত্যপ্রকাশ শুলে একঘুমে রাত কাবার হয়ে যেত। কোনোদিন বাজার থেকে লুচিটুচি কিনে খেয়ে নিত, কোনোদিন বা শুধু মিষ্টি খেয়েই কাটিয়ে দিত। কিন্তু এখন রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, বাজারের খাবারে ঘৃণা হয়, রাত হয় বাড়ি ফিরতে, তখন ক্লান্তিতে শরীর যেন

ভেঙে পড়তে চায়। তারপর উনুন ধরানো,খাবার তৈরি করা—সে এক দুরূহ দায়। নিঃসঙ্গতার বোধ মাঝে মাঝে ওকে কাঁদায়। যেদিন রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসে না, সেদিন ওর মন কারও সঙ্গে কথা বলবার জন্য আকুলিবিকুলি করে। কিন্তু তার ঘরে কেই বা আছে রাত্রির অন্ধকার ছাড়া? দেয়ালের কান থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুখ নেই। এদিকে আবার জ্ঞানপ্রকাশের পত্র আজকাল কমই আসে, তাও নিতান্তই নিষ্প্রাণ। সেগুলিতে আর অন্তরের সেই সরল প্রকাশ থাকে না। সত্যপ্রকাশ এখনো সেইরকম উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি লেখে। কিন্তু একজন অধ্যাপকের কি আর তা শোভা পায়? ক্রমশ সত্যপ্রকাশের মনে হতে লাগল যে জ্ঞানপ্রকাশও আমার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা শুরু করেছে, তা নইলে কি দু-চারদিনের জন্যে আসাও অসম্ভব হত? আমার জন্যে না হয় ঘরের দরজা বন্ধ কিন্তু ওর বাধাটা কোথায়? বেচারি তো জানে না যে এদিকে জ্ঞানপ্রকাশ মায়ের কাছে কলকাতা না যাবার প্রতিজ্ঞা করেছে। কাজেই এই ভ্রান্তি ওকে আরও বেশি হতাশ করে তুলল।

শহরে মানুষ থাকে বহু, কিন্তু মনুষ্যত্ব হাতে গোনা যায়। সত্যপ্রকাশ সেই গমগমে শহরেও নিঃসঙ্গ একলা। ওর মনে ইদানীং একটা নতুন চিন্তা মাথাচাড়া দিচ্ছে। বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয়? কিংবা যদি কোনো সঙ্গিনীর প্রেমে নিজেকে সমর্পণ করি? তাতে যে সুখ আর শান্তি তা কি আর কোথাও পাব? আমার জীবনে নিরাশার সমস্ত অন্ধকারকে দূর করতে একমাত্র ওই জ্যোতিই সক্ষম। সবরকম যুক্তি দিয়ে সত্যপ্রকাশ এই আবেগকে আটকাতে চাইত। কিন্তু ঘরে রাখা মিষ্টান্নের কথা মনে পড়লে বালক যেমন বারে বারে খেলা ভুলে যায় তেমনি করে এই সমস্ত মদির স্বপ্ন তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে বারে বারে। সে ভাবে —বিধাতা আমাকে সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন, তা নাহলে আমার অবস্থা এমন হবে কেন? ঈশ্বর কি আমাকে বুদ্ধি দেননি? না কি আমি শ্রমবিমুখ, ফাঁকিবাজ ছিলাম? শৈশবেই যদি আমার উৎসাহ ও অভিরুচিতে ছাই না পড়ত, যদি আমার বুদ্ধিশক্তির দফা রফা না করা হত, তবে আজ আমি মানুষ হতাম। পেটের দায়ে এই দূরে বিদেশে পড়ে থাকতাম না। না, আমি নিজের ওপর এমন অত্যাচার আর করব না কিছুতেই।

মাসের পর মাস ধরে সত্যপ্রকাশের মধ্যে মন আর বুদ্ধির এই টানাপোড়েন চলল। একদিন সে দোকান থেকে ফিরে উনুন ধরাতে যাচ্ছে এমন সময় ডাকহরকরা এল। সত্যপ্রকাশের কাছে জ্ঞানপ্রকাশ ছাড়া আর কারও চিঠিপত্র আসত না। আজকেই একটা চিঠি এসেছে তার। আবার আর একটা কেন? কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে না কী? তাড়াতাড়ি চিঠি নিয়ে পড়তে গেল সত্যপ্রকাশ। পরক্ষণেই চিঠি ওর হাত থেকে খসে পড়ে গেল, দুহাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে সে বসে পড়ল সেখানেই, না হলে হয়তো পড়েই যেত। এ হল দেবপ্রিয়ার সেই বিষমাখা লেখনী থেকে নির্গত হলাহলের পাত্র, স্পর্শমাত্রই যা তাকে প্রায় মূর্ছিত করে ফেলেছে। ওর ইদানীং কালের সমস্ত ব্যথা, বেদনা, ক্রোধ, নৈরাশ্য, কৃতঘ্নতা, গ্লানি—সব একটিমাত্র হিম নিশ্বাসের ছোঁয়ায় জমে পাথর হয়ে গেল।

সত্যপ্রকাশ গিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল। তার যাবতীয় যন্ত্রণার আগুন নিবে দুঃখের প্রবাহ হয়ে গেছে। হায় হায়! সারা জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। আমি নাকি জ্ঞানপ্রকাশের শত্রু। প্রতিদিন ধরে আমি কেবল চেষ্টা করেছি ওর জীবনকে মাটিতে মিশিয়ে দেবার জন্যে! তার জন্যেই আমি স্নেহের অভিনয় করেছি! ভগবান, তুমিই জান এর বৃত্তান্ত, তুমিই এর সাক্ষী।

পরের দিন আবার এল দেবপ্রিয়ার চিঠি। সত্যপ্রকাশ ওটা হাতে নিয়েই ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলল, পড়তে সাহস করল না। তারপর একদিন পরেই আবার তৃতীয় চিঠি। তারও সেই একই গতি হল। অতঃপর এটা একটা দৈনন্দিন কর্মে দাঁড়িয়ে গেল। চিঠি আসে এবং চিঠি ছিঁড়ে ফেলা হয়। কিন্তু চিঠি না পড়া হলেও দেবপ্রিয়ার মনোবাঞ্ছা ঠিকঠিক পূরণ হয়ে যায়—সত্যপ্রকাশের মর্মমূলে প্রত্যেকটা চিঠিই এক একটা আঘাত দিয়ে যায়।

এই ভাবে একমাস কাটল। দুঃসহ অন্তর্বেদনায় জীবনের ওপর ঘৃণা জন্মে গেছে সত্যপ্রকাশের। সে দোকান বন্ধ করে দিয়েছে, বাইরে বেরুনো ছেড়ে দিয়েছে। সারাটা দিন খাটিয়ায় পড়ে থাকে। সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে যখন ওর মা ওকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলতেন 'বাবা'। মায়ের সেই সজীব মূর্তি ওর সামনে ভেসে আসে যেন। ঠিক সেই দিনের মতো যেদিন তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সজীব স্নেহময় কথাগুলো কানে এসে লাগে। তারপর সেই দিনের ছবিটাও ভেসে আসত যেদিন সে তার নতুন মা—নববধূকে—মা বলে ডেকেছিল। সেদিনের সেই কটু-কথা মনে পড়ে যায়, তাঁর সেই ক্রোধান্বিত চক্ষুদুটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার মনে পড়ে যায় নিজের সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। সেই আঁতুড় ঘরের দৃশ্য। কত ভালোবেসেই না সে বাচ্চাটাকে কোলে নিতে চেয়েছিল সেদিন। কানে বাজে মায়ের সেই বজ্রকঠোর ভর্ৎসনা। সেদিনের সেই বজ্রস্বরই আমার সর্বনাশ করেছে, সে ভাবে। এমনতর আরও কত-না ঘটনা মনে আসে। বিনা দোষে মা বকতেন। বাবার নির্দয়, নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে পড়ে যায়। প্রতি কথায় তাঁর জটিল ভ্রূকুটি, মায়ের চাপানো মিথ্যে অপবাদে বিশ্বাস—হায় হায়। আমার সারা জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। পাশ ফিরে শুলেও সেই ছবি আবার ভেসে আসে—কেন যে এমন জীবনটার শেষ হয়ে যায় না।

এইভাবে সে পড়ে থাকল কয়েকটা দিন। সেদিন সন্ধে হয়ে গেছে। সহসা দরজায় কার ডাক শুনতে পেল সে। কান পেতে শুনল সত্যপ্রকাশ, শিহরিত হল, কোনো পরিচিত মানুষের গলা। ছুটে গেল দরজায়, দেখে জ্ঞানপ্রকাশ দাঁড়িয়ে আছে। কী সুন্দর কান্তি তার! দেখামাত্র তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। জ্ঞানপ্রকাশ তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। দুভাই ঘরের ভেতরে এল। অন্ধকার নেমে এসেছিল আগেই। জ্ঞানপ্রকাশ এতক্ষণ নিজের আবেগকে বন্দী করে রেখেছিল। ঘরের সেই দশা দেখে সে কেঁদে ফেলল। সত্যপ্রকাশ লণ্ঠন জ্বালাল। এ কী ঘর, এ যে ভূতের ডেরা। সত্যপ্রকাশ তাড়াতাড়ি একটা জামা গলিয়ে নিল। দাদার হাড্ডিসার শরীর, ফ্যাকাশে মুখ, কোটরগত চক্ষু কিছুই জ্ঞানপ্রকাশের দৃষ্টি এড়াল না, সে কাঁদতে লাগল।

সত্যপ্রকাশ বলল—দিনকয় খুব ভুগছি।

জ্ঞানপ্রকাশ—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

সত্য—তুমি আসবে সে কথা তো জানাওনি, বাড়ি চিনতে পারলে কী করে?

জ্ঞান—জানিয়েছিলাম তো, তাহলে বোধহয় তুমি চিঠি পাওনি।

সত্য—আচ্ছা, তাহলে বোধহয় সে চিঠিটা দোকানেই দিয়ে দিয়েছে। আমি কদিন ধরে দোকানে যেতে পারছি না। তারপর, বাড়ির সব ভালো তো?

জ্ঞান—মা, মারা গেছেন।

সত্য—সেকী, কী হয়েছিল?

জ্ঞান—না সে সব কিছু নয়। কী জানি কী খেয়ে ফেলেছিল। পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল কিছুদিন থেকে। বাবা কী না কী বলেছিলেন, বোধহয় তার ফলেই কিছু খেয়ে নিয়েছিল।

সত্য—বাবা ভালো আছেন তো?

জ্ঞান—হ্যাঁ, এখনও মরেননি আর কী।

সত্য—কেন, খুব অসুস্থ নাকি?

জ্ঞান—মা বিষ খেল, বাবা ওঁকে হাঁ করিয়ে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন। মা জোর করে ওঁর দুটো আঙুল কামড়ে দিয়েছিল। সেই বিষ তাঁর শরীরেও ঢোকে। তারপর থেকেই সারা শরীর ফুলে উঠেছে। হাসপাতালেই পড়ে আছেন। কাউকে দেখতে পেলেই কামড়াতে ছোটেন। বাঁচার কোনো আশাই নেই।

সত্য—তবে তো বাড়ির কিছুই রইল না।

জ্ঞান—এমন বাড়ি আরও অনেক আগেই না-থাকা উচিত ছিল।

দুদিন পরে দু ভাই সকালবেলায় কলকাতা ছেড়ে চলে গেল।

(গৃহদাহ/১৯২৩) অনুবাদ অচিন চক্রবর্তী

শত্রুতার অবসান

রামেশ্বর রায় তার ভাইয়ের মৃতদেহ খাট থেকে নামিয়ে রাখতে রাখতে ছোটো ভাইকে বলল—মৃতদেহ দাহ করার ব্যবস্থা তো করতেই হবে, তোর কিছু টাকা থাকলে দে। আমার হাত একেবারে খালি।

ছোটো ভাইয়ের নাম বিশ্বেশ্বর রায়। সে এক জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করত। আয় মোটামুটি ভালোই ছিল। সে বলল—অর্ধেক খরচা আমার কাছ থেকে নাও, বাকি অর্ধেক তুমি দাও।

রামেশ্বর—আমার কাছে কোনো টাকা নেই।

বিশ্বেশ্বর—তাহলে এর জন্যে দাদার কিছুটা চাষের জমি বন্ধক রাখো।

রামেশ্বর—তাহলে যা একজন মহাজনের খোঁজ কর। দেরি করবি না।

বিশ্বেশ্বর রায় তার এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে তখনকার মতো কাজ চালিয়ে নিল। পরে আরও কিছু টাকা নিয়ে জমি বন্ধক রাখার জন্য লেখাপড়া করে ফেলল। সবসুদ্ধ পাঁচ বিঘে জমি ছিল। মোট ৩০০ টাকা পাওয়া গেল। গ্রামের সব লোকের ধারণা শ্রাদ্ধশান্তিতে খুব বেশি হলেও ১০০ টাকার মতো খরচ হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর রায় ষোলো দিনের দিন ৩০১ টাকার হিসেব ভাইয়ের সামনে ফেলে দিল। রামেশ্বর রায় চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, সব টাকাই খরচ হয়ে গেল।

বিশ্বেশ্বর—শ্রাদ্ধের টাকা থেকেও কিছুটা সরিয়ে রাখতে পারি আমাকে এতটা নীচ ভাবলে? শ্রাদ্ধের টাকা কি কেউ হজম করতে পারে?

রামেশ্বর—না, না। আমি তোকে তো চোর বলিনি। কেবল জিজ্ঞাসা করছিলাম।

বিশ্বেশ্বর—বেশ তো, ইচ্ছে হলে যার কাছ থেকে মাল কিনেছি তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

দুই

এক বছর পার হলে বিশ্বেশ্বর রায় তার ভাইকে বলল, টাকা থাকলে দাও, খেতটা ছাড়িয়ে আনি।

রামেশ্বর—আমি কোথায় টাকা পাব? ঘরের অবস্থা তো তোর কাছে লুকোনো নেই।

বিশ্বেশ্বর—তাহলে আমি সবটা টাকা দিয়ে জমিটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। যখন তোমার টাকা হবে তখন অর্ধেক টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে অর্ধেকটা জমি ছাড়িয়ে নিও।

রামেশ্বর—খুব ভালো কথা, ছাড়িয়ে নে।

এরপর তিরিশটা বছর কেটে গেছে। বিশ্বেশ্বর রায়ই জমিটা ভোগ করছিল। সার-টার দিয়ে জমিটা বেশ তৈরি করে নিয়েছিল। সে ঠিকই করে নিয়েছিল, দখল আমি ছাড়ছি না। এতে আমার মৌরসি স্বত্ব জন্মে গেছে। মামলা-মোকদ্দমা করেও কেউ নিতে পারবে না। এদিকে রামেশ্বর অনেকবারই টাকাটা দিয়ে জমিটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই তিরিশ বছরের মধ্যে কখনোই সে ১৫০ টাকাও জমাতে পারেনি।

কিন্তু রামেশ্বর রায়ের ছেলে জগেশ্বর কিছুটা দাঁড়িয়ে গেল। সে গাড়িতে মাল ওঠানোর কাজ শুরু করেছিল, আর এতে তার বেশ লাভও হচ্ছিল। তার মনে ওই জমিটা নিয়ে রাতদিন ভাবনা-চিন্তা লেগেই ছিল। শেষের দিকে রাতদিন পরিশ্রম করে বেশ পয়সাও জমিয়ে ফেলল। একদিন সে কাকাকে গিয়ে বলল, কাকা, আপনার টাকাটা নিয়ে নিন, আর জমিটা আমাদের নামে ফিরিয়ে দিন।

বিশ্বেশ্বর—চালাকি পেয়েছিস? এতদিন তোদের টনক নড়েনি, আর আজ যেই জমিতে অনেক কষ্টে সোনা ফলাতে শুরু করেছি তখন জমির ভাগ চাইতে এসেছিস?

রামেশ্বর — জমিকে যেমন সোনা বানিয়েছিস তেমনি এতদিন তার ফলও ভোগ করেছিস। তখন তো আমি দাবি করতে যাইনি।

বিশ্বেশ্বর—এখন এ জমি ফেরত পাবে না।

রামেশ্বর—ভাইয়ের টাকা মেরে কারও ভালো হয় না।

বিশ্বেশ্বর—জমি আমার। ভাইয়ের নয়।

জগেশ্বর—তাহলে আপনি সোজা রাস্তায় দেবেন না?

বিশ্বেশ্বর—সোজা, বাঁকা কোনো রাস্তাতেই দেব না। আদালতে যা।

জগেশ্বর—আদালতে যাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি—জমি যদি ফিরে নাও পাই, আপনার দখলেও কিন্তু থাকতে দেব না।

বিশ্বেশ্বর—যা যা অন্য কাউকে ভয় দেখা গে।

জগেশ্বর—পরে কিন্তু একথা বলতে আসবেন না যে ভাই হয়ে শত্রুতা শুরু করেছে।

বিশ্বেশ্বর—পকেটে হাজার খানেক টাকা রেখে তবে মনে যা চায় তাই কর।

জগেশ্বর—গরিব মানুষ, হাজার টাকা কোথা থেকে পাব। কিন্তু কখনও কখনও ভগবান গরিবদের প্রতি চোখ মেলে তাকান।

বিশ্বেশ্বর—এই ভয়ে আমি লুকোনোর জন্য গর্ত খুঁড়ছি না।

রামেশ্বর রায় তো চুপ করে গেল, কিন্তু জগেশ্বর এতটা ক্ষমাশীল ছিল না। সে উকিলদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। এখন আর অর্ধেক জমি নয়, পুরো জমিটার জন্যেই দাবি জানাল।

মৃত সিদ্ধেশ্বর রায়ের তপেশ্বরী নামে একটি মেয়ে ছিল। বাবা বেঁচে থাকতেই তার বিয়ে-থা হয়ে যায়। বাবা তার জন্য কী রেখে গিয়েছিল, আর সেগুলি কেই বা ভোগ করছে সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। শ্রাদ্ধশান্তি ভালোমতো হয়ে গিয়েছিল, আর সে তাতেই খুশি। ষোলো দিনের ক্রিয়ার সময় এসেছিল। আবার ফিরে গিয়েছিল। ৩০ বছর কেটে গেছে, কেউ তাকে ডাকেওনি, আর সেও বাপের বাড়ি আসেনি। শ্বশুরবাড়ির অবস্থাও ভালো ছিল না, তার স্বামীর

মৃত্যু হয়েছিল আগেই। ছেলেগুলো খুব অল্প মাইনের চাকরি করত। জগেশ্বর গিয়ে তার জ্যাঠতুতো দিদিকে দলে টানার চেষ্টা শুরু করল। সে তাকেই বাদী খাড়া করতে চাইল।

তপেশ্বরী বলল—থাক ভাই, ভগবান আমাকে যা দিয়েছেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট। আমার জমিজায়গার প্রয়োজন নেই। মামলা-মোকদ্দমা চালানোর মতো পয়সাও আমার নেই।

জগেশ্বর — টাকা আমি খরচ করব। তুমি কেবলমাত্র মামলাটা রুজু করবে।

তপেশ্বরী — তোমাকে মামলায় লড়িয়ে দিয়ে কাকা তোমার সর্বনাশ করবে।

জগেশ্বর—কিন্তু এও তো আর হয় না যে একজন জমিজায়গা মজা করে ভোগ করবে আর আমরা বোকার মতো তাকিয়ে থাকব। আদালতের খরচা আমি দেব। ওই জমির জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেব, কিন্তু তাকে ছেড়ে দেব না।

তপেশ্বরী—আর জমি যদি ফেরত পাওয়া যায় তাহলে তোমার টাকা খরচ করে মামলা লড়েছ বলে সেই জমি তুমি নিয়ে নেবে। তাতে করে আমার হাতে কী আসবে? আমি শুধু শুধু কাকার কাছে খারাপ কেন হতে যাব?

জগেশ্বর—জমি তুমি নিয়ে নেবে। আমি কেবল কাকাবাবুর অহংকার চূর্ণ করে দিতে চাই।

তপেশ্বরী—ঠিক আছে, তুমি আমার পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করতে পার।

জগেশ্বর কিন্তু ভাবল, কাকার হাত থেকে জমিটা যদি একবার বার করে আনতে পারি তাহলে দিদিকে বছরে পাঁচ-দশ টাকা করে দিয়ে জমিটা নিজে ভোগ করতে পারব। এখন তো একটা কানাকড়িও সে পায় না। তখন যা পাবে সেটাই সে যথেষ্ট ভাববে। পরের দিনই সে মামলা দায়ের করে দিল। মুনসেফের এজলাসে মামলা রুজু করা হল।

বিশ্বেশ্বর রায় কিন্তু আদালতে প্রমাণ করে দিল যে তপেশ্বরী সিধেশ্বর রায়ের মেয়েই নয়।

গাঁয়ের সব লোকের উপর বিশ্বেশ্বরের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। প্রায় সকলেই তাঁর কাছ থেকে টাকাপয়সা ধার করত। মামলা-মোকদ্দমায় তার পরামর্শ নিত। তারা প্রত্যেকেই আদালতে সাক্ষ্য দিল যে, তারা তপেশ্বরীকে কোনোদিন দেখেইনি। সিধেশ্বরবাবুর কোনো মেয়েই ছিল না। জগেশ্বর মামলায় বড়ো বড়ো উকিল নিয়োগ করল, প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেল, কিন্তু মুনসেফ তার বিরুদ্ধে রায় দিল। এতে বেচারি খুব মুশড়ে পড়ল। আদালতে সবার সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের বেশ হৃদ্যতা ছিল। জগেশ্বরকে যেখানে কোনো কাজ করানোর জন্য মুঠো মুঠো টাকা খরচ করতে হত সেখানে বিশ্বেশ্বরের একটু অনুরোধই যথেষ্ট ছিল।

জগেশ্বর আপিল করার সিদ্ধান্ত নিল। টাকা ছিল না। গাড়ি-গোরু বিক্রি করে টাকা জোগাড় হল। আপিল হল। মাসের পর মাস মামলা চলল। বেচারা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাছারিতে গিয়ে আমলা আর উকিলদের তোষামোদ করত। সব টাকা এইভাবে শেষ হয়ে গেল। এবার মহাজনের কাছ থেকে ধার করতে হল। শেষ পর্যন্ত মামলায় সে ডিক্রি পেল। পাঁচশো টাকার ঋণের বোঝা মাথার উপরে থাকলেও, এই জয় তার চোখের জল মুছে দিল।

বিশ্বেশ্বর হাইকোর্টে আপিল করল। এবার আর জগেশ্বর কোনো জায়গা থেকে টাকা জোগাড় করতে পারল না। বাধ্য হয়ে সে নিজের ভাগের জমি বন্ধক রাখল। তারপর বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার মতো অবস্থা দেখা দিল। বাড়ির মেয়েদের গায়ের গয়না বিক্রি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টেও তার জিত হল। যা কিছু টাকা তখনও হাতে ছিল তাও আনন্দোৎসবে বেরিয়ে গেল।

এইভাবে প্রায় হাজার টাকা জলে গেল। ওই পাঁচ বিঘে জমি ফেরত পাওয়া গেছে, এটাই যা আনন্দের কথা। তপেশ্বরী কি এতটাই নির্দয় হবে যে সামনে থেকে থালা টেনে নিয়ে যাবে।

কিন্তু জমিতে নিজের নাম কায়েম হতেই তপেশ্বরীর মনোভাব পালটে গেল। সে একদিন গ্রামে এসে জিজ্ঞেসবাদ করে জানতে পারল যে পাঁচ বিঘে জমি ১০০ টাকাতে বিলি-বন্দোবস্ত করা সম্ভব। খাজনা কেবল ২৫ টাকা আর ৭৫ টাকা লাভ এক বছরে। এই টাকা তার মধ্যে লালসা জাগিয়ে তুলল। জমি প্রজাবিলি করে দিল। জগেশ্বর রায় কিন্তু পেল না। শেষ পর্যন্ত সে আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলল—দিদি, তুমি তো জমি অন্যকে দিয়ে দিলে, এখন আমি যাই কোথায়?

তপেশ্বরী—প্রথমে নিজের ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে তবে মসজিদে আলো জ্বালাতে হয়। এতটা জমি পাওয়া গেল বলেই না বাপের বাড়ির লোকজনের আত্মীয়তা থাকছে। নইলে কে আর তত্ত্বতালাশ নিত।

জগেশ্বর—কিন্তু আমি তো নিঃস্ব হয়ে গেছি।

তপেশ্বরী—যে খাজনায় অন্যদের দিয়েছি তার থেকে দু-চার টাকা কম করে তুমি নিজেই জমি বন্দোবস্তে নিয়ে যাও না।

তপেশ্বরী এর দু-চার দিনের মধ্যেই বিদায় নিল। রামেশ্বর রায়ের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। বুড়ো বয়সে মজুরি করতে নামতে হল। মান-মর্যাদাও নষ্ট হল। খাবারের রুটি জোগাড় করাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। বাপ আর ছেলেতে মিলে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পরিশ্রম করত। তারপর উনুন ধরানো হত। দুজনের মধ্যে মাঝে মাঝেই ঝগড়া হত। রামেশ্বর সব কিছুর জন্য ছেলেকেই দোষ দিত। আর জগেশ্বর বলত, আপনারা আমাকে তখন বাধা দিলে কি আর আমি এমন বিপত্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়ি! ওদিকে বিশ্বেশ্বর পাওনাদারদের উশকিয়ে দিতে শুরু করল। এক বছর কাটতে না কাটতেই বেচারা একেবারে নিঃসহায়, আশ্রয়হীন হয়ে পড়ল। সব জমি হাতছাড়া হয়ে গেল, ভিটেমাটি নিলাম হয়ে গেল। দশ-বারোটা গাছ ছিল, শেষপর্যন্ত তাও নিলাম হয়ে গেল। তার আর বড়োলোক হওয়া তো হলই না, বরং আরও গরিব হয়ে গেল। এসবের উপর বিশ্বেশ্বরের টিপ্পনী আরও জ্বালা ধরিয়ে দিত। এ যেন একেবারে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, সব বিপত্তির উপর নির্মম কশাঘাত।

এইভাবে এই দুঃখী পরিবারের দুটো বছর কেটে গেল। কী প্রচণ্ড দুঃখকষ্টের ঝড় এদের উপর দিয়ে গেল, তা কেবল তারাই জানে। কোনো দিনই ভরপেট খাওয়া জোটেনি। কিন্তু একমাত্র আত্মাভিমানের জন্যে স্বভাব পালটায় নি। দারিদ্র্য সব রকম কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু আত্মাকে নীচে টেনে নামাতে পারেনি। বংশমর্যাদা আত্মরক্ষার মস্ত প্রেরণা।

একদিন সন্ধের সময় বাপ আর ছেলেতে বসে আগুনের তাপ পোয়াচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ একজন লোক এসে বলল, মশায় চলুন, বিশ্বেশ্বর রায় ডাকছেন।

রামেশ্বর উদাস সুরে বলল, আমাকে ডাকবে কেন? আমি তার কে? নাকি আবার কোনো নতুন ঝামেলা তৈরি করার ইচ্ছে।

এসব কথার মধ্যেই আরও একজন দৌড়ে এসে বলল, তাড়াতাড়ি চলো। বিশ্বেশ্বর রায়ের অবস্থা ভালো নয়।

ইদানীং কিছুদিন ধরে বিশ্বেশ্বর রায়ের জ্বর আর কাশির প্রকোপ চলছিল। কিন্তু কোনো শত্রুর দুঃখকষ্টে সাধারণত আমাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা থাকে না। রামেশ্বর এবং জগেশ্বর কোনোদিন কুশল সমাচার নিতেও যায়নি। বরং বলত, ওর আবার হয়েছেটা কী? বড়োলোকদের টাকা পয়সার রোগ হয়। যখন বিশ্রাম করার ইচ্ছে হয়, তখন পালঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়ে। দুধে সাবুদানা ফুটিয়ে নিয়ে তাতে মিছরি মিশিয়ে খেয়েটেয়ে আবার উঠে বসে। অতএব বিশ্বেশ্বর রায়ের অবস্থা ভালো নেই শুনেও কেউ জায়গা থেকে নড়ল না।

রামেশ্বর বলল, এমন আর কী খারাপ অবস্থা হয়েছে, আরাম করে শুয়ে শুয়েই তো কথা বলছে।

জগেশ্বর—কোনো ডাক্তার-বদ্যি ডাকাতে পাঠাবে মনে হচ্ছে। জ্বরটা বেড়েছে বোধহয়।

রামেশ্বর—এখানে অত সময় কার আছে? সারা গ্রামের লোকই তো তার পক্ষে, যাকে ইচ্ছে তাকেই পাঠাতে পারে।

জগেশ্বর—কিন্তু গেলে ক্ষতিটাই বা কী? একটু গিয়ে শুনে আসব?

রামেশ্বর—যাও কয়েকটা ঘুঁটে নিয়ে এস। উনুনটা ধরাই। তারপর যেয়ো। পায়ে তেল দেওয়া ধাতে সইলে তো আমাকে আজ এই অবস্থায় পড়তে হত না।

জগেশ্বর ঝুড়িটা তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বর রায়ের বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। সে ঝুড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে কাকার ঘরে গিয়ে পৌঁছল। গিয়ে দেখে যে কাকাকে তখন লোকেরা চারপাই থেকে নীচে নামাচ্ছে। জগেশ্বরের মনে হল যেন তার মুখে কে কালি লাগিয়ে দিয়েছে। সে উঠোন থেকে ঘরের কাছে এসে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকল। যৌবনের ধর্মই হল আবেগপ্রবণ হওয়া, সে যেমন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে তেমনি আবার করুণায় গলে জলও হয়ে যায়।

তিন

বিশ্বেশ্বর রায়ের তিন মেয়ে ছিল। তাদের বিয়ে-থা আগেই হয়ে গিয়েছিল। আর ছিল তিন ছেলে। কিন্তু তারা ছোটো। সব থেকে বড়োটার বয়স দশের বেশি ছিল না। ওদের মাও বেঁচে ছিল। খাওয়ার লোক ছিল চার জন, কিন্তু রোজগার করার জন্য কেউই ছিল না। গ্রামদেশে যার ঘরে দুবেলা উনুন ধরানো হয়, তাকে সবাই বড়োলোক বলে মানে, তার ঘরের জমানো টাকার পরিমাণ সম্পর্কেও লোকে বেশি বেশি করে ভাবে। লোকেরা সবাই ভাবত বিশ্বেশ্বর রায় হাজার হাজার টাকা রেখে গেছে, কিন্তু আসলে তার কিছুই ছিল না। আয়ের উপর সকলেরই নজর ছিল কিন্তু খরচাটা কেউই দেখত না। সে মেয়েদের বিয়েও খুব জাঁকজমক করেই দিয়েছিল।

খাওয়াপরায়, অতিথি এবং আত্মীয়স্বজনের আদর-আপ্যায়নে তার সব টাকা পয়সা খরচ হয়ে যেত। গ্রামে নিজের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য সে যেমন দু-চারশো টাকার লেনদেন করত তেমনি মহাজনের কাছে তার ঋণ ছিল। এর ফলে ছোটো মেয়ের বিয়ের সময় জমি বন্ধক পর্যন্ত রাখতে হয়েছিল।

বিধবা ভদ্রমহিলা বছর খানেক কোনোরকম বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ করল, গয়না বিক্রি করে কাজ চালাল, কিন্তু সেই সম্বলটুকুও যখন রইল না, তখন চূড়ান্ত কষ্ট হতে শুরু করল। তিনি মনে

মনে ঠিক করলেন যে তিন ছেলেকে তিন মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কেবল নিজের জন্যে আর দুশ্চিন্তা কী? তিন দিন অন্তর যদি এক পোয়া করে আটা মেলে তাহলেও কোনোভাবে দিন কেটে যেতে পারে। মেয়েরা প্রথম প্রথম আদর যত্নেই রেখেছিল, কিন্তু তিন মাসের বেশি কেউই রাখতে পারল না। তাদের বাড়ির লোকজনেরাও খিচ খিচ করত এবং অনাথ ছেলেগুলোকে ধরে ধরে মারত। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে মা সব ছেলেকে ফেরত নিয়ে এল।

ছোটো ছোটো ছেলে সারাদিন না খেয়ে কাটিয়ে দিত। কাউকে কোনো কিছু খেতে দেখলেই বাড়ি গিয়ে মার কাছে তাই খেতে চাইত। আস্তে আস্তে মার কাছে চাওয়া ছেড়ে দিল। যে খেত তারই সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্ত চোখে তাকিয়ে থাকত। কেউ কেউ হয়তো একমুঠো ছোলা বের করে দিত, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই লোকেরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত।

তখন শীতকাল। মটরের খেতে ফল ধরতে শুরু করেছে। একদিন তিনটে বাচ্চাই একটা মটর খেতে ঢুকে মটর দানা ছিঁড়তে শুরু করেছে, এমন সময় চাষির নজর সেদিকে পড়ল। লোকটি এমনিতে দয়ালু। সে নিজেই এক বোঝা মটর তুলে নিয়ে বিশ্বেশ্বর রায়ের বাড়িতে এসে বিধবাকে ডেকে বলল—কাকিমা, ছেলেদের একটু বকে দেবেন, যাতে অন্যের খেতে না যায়। জগেশ্বর রায় সেই সময় নিজের দরজায় বসে বসে ছিলিম টানছিল। সে চাষিকে মটর নিয়ে আসতে দেখল। তিনটে ছেলেই কুকুরের বাচ্চার মতো পেছনে পেছনে দৌড়তে দৌড়তে এল। তার চোখে জল এল। ঘরে এসে বাবাকে বলল, কাকিমার কাছে এখন আর কিছু নেই, ছেলেগুলো না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে।

রামেশ্বর—তুমি স্ত্রীচরিত্রের কী জান? এসবই লোকদেখানো ব্যাপার। সারা জীবনের কামাই এর মধ্যেই কোথায় উড়ে গেল?

জগেশ্বর—নিজের সামর্থ্য থাকলে কি আর কেউ নিজের ছেলেদের না খেতে দিয়ে মারে?

রামেশ্বর—এর তুমি কী জানবে, সে বড়ো চালাক মেয়েছেলে।

জগেশ্বর—কিন্তু লোকেরা তো আমাদের দেখে উপহাস করবে।

রামেশ্বর—উপহাসের ভয় থাকে তো গিয়ে নিজের কাছে নিয়ে এসো। খাওয়াও দাওয়াও। মুরোদ আছে?

জগেশ্বর—না হয় পেট ভরে খাব না। আধপেটাই ভালো। কিন্তু দুর্নাম তো হবে না। ঝগড়া তো ছিল কাকার সঙ্গে। বাচ্চাগুলো আমার কী ক্ষতি করেছে?

রামেশ্বর—কিন্তু ওই রাক্ষুসিটা তো এখনও বেঁচে আছে

জগেশ্বর চলে এল। কতবার ওর মনে হয়েছে যে কাকিমাকে কিছু সাহায্য করে, কিন্তু কাকির জ্বালা-ধরানো কঠিন বাক্যবাণের ভয়ে সে এগোয়নি। এখন থেকে সে একটা নূতন পথ্থতি গ্রহণ করল। বাচ্চাগুলোকে খেলতে দেখলে কাছে ডেকে নিত। কিছু খেতে দিত। মজুররা দুপুর বেলায় কাজ থেকে কিছুক্ষণের ছুটি পেত। এখন থেকে সে ওই বিশ্রামের সময়ও কিছু কাজ করত বলে মজুরির পয়সা কিছু বেশি পেত। বাড়ি ফেরার সময় কিছু না কিছু খাওয়ার জিনিস নিয়ে ফিরত এবং নিজের বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে ওই অনাথ শিশুদের দিয়ে দিত।

এইভাবে ধীরে ধীরে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে তার এমন ভাব হয়ে গেল যে ওকে দেখলেই তারা ভাইয়া ভাইয়া বলে দৌড়ে আসত, সারাদিন তার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকত। প্রথম প্রথম ওদের

মা খুব ভয় পেত এই ভেবে যে, কী জানি আমার ছেলেগুলোর উপর পুরোনো ঝগড়ার শোধ তুলবে না তো। সে তখন জগেশ্বরের কাছে ছেলেগুলোকে যেতে দিত না বা তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে খেতে গেলে বাধা দিত। কিন্তু বাচ্চারা কে শত্রু কে মিত্র তা বড়োদের থেকেও বেশি চিনতে পারে। তাই ছেলেগুলো তাদের মায়ের নিষেধের পরোয়া করত না বরং এইভাবে ধীরে ধীরে মাকেও জগেশ্বরের সহৃদয়তার প্রতি আস্থাশীল করে তুলল।

একদিন রামেশ্বর ছেলেকে ডেকে বলল—তোমার কাছে পয়সা যদি বেশি হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে দু-চার পয়সা জমাতে তো পার। সব বিলিয়ে দিচ্ছ কেন?

জগেশ্বর—আমি তো প্রতিটি পাইপয়সা হিসেব করে খরচ করি।

রামেশ্বর—আজ যাকে নিজের বলে ভাবছ সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

জগেশ্বর—মানুষের ধর্ম বলেও তো একটা বস্তু আছে। পুরোনো শত্রুতার রেশ টেনে একটা গোটা পরিবারের ধ্বংস আমি করতে পারব না। তাছাড়া আমার ক্ষতিটাই বা কী হচ্ছে, না হয় রোজ এক-দুঘন্টা বেশি পরিশ্রম করতে হয়।

রামেশ্বর মুখ ঘুরিয়ে নিল। জগেশ্বর এরপর ঘরের ভেতরে যেতেই তার স্ত্রী বলে উঠল—নিজের ইচ্ছে মতো যা খুশি করে বেড়াচ্ছ, কারও কথাই শুনছ না। লোকে প্রথমে নিজের ঘরে আলো জ্বালায়।

জগেশ্বর—কিন্তু এটাও তো উচিত নয় যে নিজের ঘরে প্রদীপের বদলে মোমবাতি জ্বালাব আর মসজিদে অন্ধকারই থাকবে।

স্ত্রী—তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় আমি তো কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছি। কী সুখ তুমি আমাকে দিচ্ছ? গায়ের গয়নাও তো সব খুলে নিয়েছ, আর এখন কোনো উচ্চবাচ্য করছ না।

জগেশ্বর—তোমার গয়না থেকে আমার কাছে ভাইদের জীবন বেশি প্রিয়।

জগেশ্বরের স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে বলল, শত্রুর সন্তান কখনও নিজের হয় না।

জগেশ্বর বাইরে যেতে যেতে উত্তর দিল, শত্রুর জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুতারও শেষ হয়।

(বৈর কা অন্ত) অনুবাদ সৌরেন ভট্টাচার্য

সত্যাগ্রহ

মহামান্য বড়োলাট বাহাদুর বেনারস আসছেন। ছোটো থেকে বড়ো সব সরকারি কর্মচারী তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজনে নিযুক্ত। এদিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহরে হরতাল পালনের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এতে কর্মচারীদের মধ্যে খুব আলোড়ন পড়েছে। একদিকে ছোটো ছোটো নিশান লাগিয়ে রাস্তা সাজানো হচ্ছে, রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ চলছে, ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে, অন্যদিকে মিলিটারি ও পুলিশের লোক সঙিন উঁচিয়ে শহরের গলিতে রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরছে। কর্মচারীদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা ছিল যাতে হরতাল না হয়; কিন্তু কংগ্রেসিরাও জেদ ধরে বসেছিল যে, হরতাল হবেই। কর্মচারীদের যদি থাকে পশুবল তো অপরপক্ষে রয়েছে নৈতিক শক্তির ভরসা। এবার দুয়েরই পরীক্ষা হয়ে যাবে; দেখা যাক কারা বাজি জেতে।

ঘোড়ায় চড়ে ম্যাজিস্ট্রেট সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকানদারদের ধমক দিয়ে ফিরছেন। বলছেন — সব ব্যাটাকে জেলে পাঠাব; বাজার লুট করিয়ে দেব। এটা করব, সেটা করব। দোকানদাররা হাত জোড় করে বলছে, হুজুর, আপনি বাদশাহ,ভগবান। আপনি যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু আমরা কী করব? কংগ্রেসিরা আমাদের আস্ত রাখবে না। আমাদের দোকানে ধরনা দেবে, শাপমন্যি করার জন্য চুল-দাড়ি রাখবে, কুয়োয় ঝাঁপ দেবে, অনশন করবে। কে জানে দু-চার জন হয়তো প্রাণই দিয়ে দেবে। তাহলে আমাদের মুখে চিরকালের জন্য চুনকালি পড়বে। হুজুর যদি এই কংগ্রেসওয়ালাদের বোঝান তাহলে আমাদের খুবই উপকার হয়। হরতাল না করলে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। দেশের বড়ো বড়ো লোক সব আসবেন, আমাদের দোকান খোলা থাকবে, দুনো দামে সওদা বেচব, চড়া দরে জিনিস বিক্রি হবে; কিন্তু কী করব বলুন, এই শয়তানগুলোর হাত থেকে তো কিছুতেই রেহাই নেই।

রায় সাহেব হরনন্দন, রাজা লালচাঁদ ও খান বাহাদুর মৌলবি মহমুদ আলি—এঁরা ছিলেন সরকারি কর্মচারীদের চেয়েও বেশি উদ্‌বিগ্ন। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সঙ্গে এবং আলাদা ভাবেও তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন। বাড়িতে দোকানদারদের ডেকে এনে বোঝাতে লাগলেন, অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন, চোখ রাঙাতে লাগলেন। এক্কাওয়ালাদের ধমকাতে আর মজুরদের খোশামোদ করতে লাগলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু কংগ্রেসি ওদের মধ্যে এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল যে তারা কেউ এদের কোনো কথাই শুনছিল না। এমন কী, পাড়ার সবজিওয়ালি পর্যন্ত নির্ভয়ে বলে দিল—হুজুর মেরে ফেললেও দোকান খুলব না। লোকের কাছে মুখ দেখাব কী করে? সবচেয়ে বড়ো চিন্তার বিষয় ছিল, ম্যারাপ বাঁধার মজদুর, ঝাড়ুদার, কামার, ছুতোর ইত্যাদি কাজ

না বন্ধ করে দেয়। তাহলে তো অনর্থ হয়ে যাবে। রায়সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, হুজুর অন্য শহর থেকে দোকানদার এনে আর একটা বাজার খুলে দিলে কেমন হয়।

খান সাহেব বললেন—সময় এত কম যে, আর একটা বাজার খোলা সম্ভব হবে না। হুজুর কংগ্রেসিদের গ্রেপ্তার করে ফেলুন কিংবা ওদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিন। তারপর দেখুন শায়েস্তা কী করে না হয়।

রাজা সাহেব বললেন—ধরপাকড় করলে তো লোক আরও বেশি বিরক্ত হবে। কংগ্রেসকে হুজুর বলে দিন যে, যদি হরতাল না হয় তা হলে সবাইকে সরকারি চাকরি দিয়ে দেওয়া হবে। কংগ্রেসের অধিকাংশ লোক বেকার, এই প্রলোভন দেখলেই নেচে উঠবে।

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কারও কথা তেমন পছন্দ হল না। এদিকে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের আসার আর তিন দিন বাকি।

দুই

শেষ পর্যন্ত রাজা সাহেব এক বুধি বের করলেন : আমরাই বা কেন নৈতিক শক্তির প্রয়োগ করব না? কংগ্রেসিরাও তো ধর্ম ও নীতির নামে এই হইচই বাঁধায়। আমরাও যদি ওদের অনুকরণ করি তা হলে ওদের অস্ত্রেই ওদের ঘায়েল করা যাবে। এমন কাউকে আমাদের খাড়া করতে হবে যে ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলবে, দোকান না খুললে প্রাণত্যাগ করব। এই ব্যক্তি কে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে এবং এমন ব্রাহ্মণ যাকে শহরের লোক ভক্তি করে আরো ভালোও বাসে। উপস্থিত অন্যান্যদেরও এই প্রস্তাব মনে ধরল। সবাই লাফিয়ে উঠলেন। রায় সাহেব বললেন — ব্যস, এবার বাজি মাত। আচ্ছা এমন পণ্ডিত কে আছে? পণ্ডিত গদাধর শর্মা?

রাজা—আজ্ঞে না। তাকে কে মানে? খালি খবরের কাগজে লিখে বেড়ায়। শহরের লোক তাকে কতটুকু চেনে?

রায় সাহেব—আচ্ছা, আমরা যে রকম লোক খুঁজছি দমড়ি ওঝা তো খানিকটা ওই রকমই, তাই না?

রাজা—আজ্ঞে না। কলেজের কিছু ছেলে ছাড়া তার নাম আবার কে জানে?

রায় সাহেব—পণ্ডিত মোটেরাম শাস্ত্রী?

রাজা—বস্ বস্। চমৎকার বের করেছেন। ইনি নিঃসন্দেহে একেবারে যা চাইছি তাই। এঁকেই ডাকতে হবে। বিদ্বান, ধর্মেকর্মে মতি রয়েছে। বেশ চতুরও। ইনি যদি আমাদের কথায় রাজি হয়ে যান তাহলে তো আমাদেরই জিত।

রায় সাহেব সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মোটেরামের বাড়িতে সংবাদ পাঠালেন। ওই সময় শাস্ত্রীজি পূজা করছিলেন। সংবাদ পেয়েই তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করে রওনা হলেন। রাজা সাহেব ডেকেছেন। ধন্য ভাগ্য! স্ত্রীকে বললেন—আজ খুব ভালো দিন মনে হচ্ছে। কাপড় দাও, গিয়ে দেখি কেন ডেকেছেন।

স্ত্রী বললেন—খাবার তৈরি, খেয়ে যাও। কে জানে কখন ফিরতে পারবে।

কিন্তু শাস্ত্রীজি এতক্ষণ লোকটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা সমীচীন মনে করলেন না। ঠান্ডার দিন ছিল। তিনি লাল বাঁধুনি লাগানো সবুজ রঙের আচকান পরলেন, কাঁধে এক জরির চাদর ফেললেন আর মাথায় বাঁধলেন এক বেনারসি পাগড়ি। তারপর লাল চওড়া পাড়ের রেশমি ধুতি পরে খড়ম পায় দিয়ে রওনা হলেন। তাঁর মুখ থেকে ব্রহ্মতেজ ফুটে বেরোচ্ছিল। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, কোনো মহাত্মা আসছেন। রাস্তায় যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছিল তিনিই মাথা নুইয়ে তাঁকে নমস্কার করছিলেন। কত দোকানদার তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাল। সমস্ত কাশী তো এখন এই একজনের নামেই চলছে, ইনি ছাড়া আর কেই বা রয়েছে? কী নম্র স্বভাব! ছেলেপুলেদের সঙ্গে পর্যন্ত হেসে কথা বলেন। এইভাবে পণ্ডিতজি রায়সাহেবের বাড়ি এসে পৌঁছুলেন। তিন বন্ধুই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। খান বাহাদুর বললেন—বলুন পণ্ডিতজি, শরীর ভালো তো? অবশ্য আপনাকে তো এগজিবিশনে সাজিয়ে রাখা চলে। আপনার ওজন বোধ হয় দশ মনের কম হবে না।

রায় সাহেব—এক মন বিদ্যার জন্য দশ মন বুদ্ধি তো চাই। অমনি করেই বলতে পারি, এক মন বুদ্ধির জন্য দশ মন শরীর তো চাইই চাই। তা না হলে তার ভার কে বইবে?

রাজা সাহেব—আপনি এর মর্ম বুঝতে পারবেন না। বুদ্ধি এক প্রকারের সর্দির মতো, যখন মগজে ধরে না তখন দেহে এসে ভর করে।

খান সাহেব—আমি তো প্রবীণদের কাছে শুনেছি, যে মোটা তার সঙ্গে বুদ্ধির ঝগড়া।

রায় সাহেব—আপনার অঙ্কটাতেই গলদ ছিল, নইলে আপনি এটা সহজেই বুঝতে পারতেন যে, বুদ্ধি আর দেহের অনুপাত যদি ১ : ১০ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই, মানুষ যত মোটা হবে তার বুদ্ধির ওজনও তত বেশি হবে।

রাজা সাহেব—এথেকে এটাই প্রমাণ হল যে, যে যত মোটা তার বুদ্ধিও তত মোটা।

মোটেরাম—যখন মোটা বুদ্ধির দৌড়েই রাজ দরবারে ডাক পড়ে তখন চিকন বুদ্ধি আর কোন কাজে লাগবে।

হাস্যপরিহাসের পর রাজা সাহেব বর্তমান সমস্যাটি পণ্ডিতজির কাছে উপস্থিত করলেন এবং সমস্যার সমাধানকল্পে যে উপায় ভাবা হয়েছিল তাও প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন—বস্, আপনি এটা বুঝে নিন যে, এখন আপনার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি আপনার হাতে। নিজের ভাগ্য নির্ণয়ের এমন সুবর্ণ সুযোগ বোধহয় আর কারও হয়নি। হরতালটা যদি আটকাতে পারেন তাহলে আর কিছু না হোক অন্তত এটুকু বলতে পারি যে, আপনাকে আর সারা জীবন কারও দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। বস্, আপনি এমন কোনো ব্রতে লেগে পড়ুন যাতে শহরের লোক আঁতকে ওঠে। কংগ্রেসিরা তো ধর্মের দোহাই দিয়েই লোকের এত শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। বস্, এমন কোনো যুক্তি বের করুন যাতে মানুষের ধর্ম-ভাবনায় চোট লাগে।

মোটেরাম গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—এতো এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আমি এমন এমন আচার-অনুষ্ঠান করতে পারি যাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামবে; মহামারীর প্রকোপ শান্ত হয়ে যাবে; ফসলের দাম চড়ে যাবে বা কমে আসবে। কংগ্রেসিদের পরাস্ত করা তো এমন একটা বড়ো ব্যাপার নয়। যারা দুপাতা ইংরেজি পড়েছে সেই সব মহাত্মারা নিজেদের বড়ো ভাবে, যে কাজ আমার দ্বারা করা সম্ভব তা অন্য কেউ করতে পারবে না। কিন্তু ওদের তো গুপ্তবিদ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।

খান সাহেব—তাহলে তো, জনাব, বলতে হয় আপনি দ্বিতীয় ঈশ্বর। আমরা কী করে জানব আপনার এত বিভূতি? খামোখা এতদিন আমরা ভেবে হয়রান হয়েছি।

মোটেরাম — সাহেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান দিতে পারি, পূর্বপুরুষদের এনে হাজির করতে পারি। চাই কেবল সমজদার। সংসারে গুণী লোকের অভাব নেই, অভাব গুণগ্রাহীর — গুণ হারায় না, হারায় গুণের সমজদার।

রাজা — আচ্ছা, এই ব্রতের জন্যে আপনাকে দক্ষিণা কত দিতে হবে?

মোটেরাম — ভক্তি করে যা দেবেন।

রাজা — কিছু বলা যাবে কি ব্রতটি কী রকম হবে?

মোটেরাম — অনশন-ব্রত চলবে, সেই সঙ্গে চলবে মন্ত্র জপ। সারা শহরে যদি হইচই না ফেলতে পারি, তবে আমার নাম মেটেরাম নয়।

রাজা — তা হলে কখন থেকে?

মোটরাম — আজ থেকেই হতে পারে। হ্যাঁ, প্রথমেই দেবতাদের আবাহনের নিমিত্ত কিছু টাকা দিয়ে দেবেন। টাকার কোনো অভাব ছিল কি? পণ্ডিতজি টাকা পেয়ে গেলেন এবং খুশি হয়ে বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রীকে সব কথা জানালে তিনি চিন্তিত হয়ে বললেন — তুমি অনর্থক নিজের কাঁধে এই ঝামেলা নিলে, খিদে যদি সইতে না পার তখন? সারা শহরে ঢি ঢি পড়ে যাবে, লোক হাসবে। টাকা ফিরিয়ে দাও।

মোটেরাম আশ্বাস দিয়ে বললেন — ক্ষুধা সহ্য করা যাবে না কেন? আমি কি এতই মূর্খ যে ওখানে গিয়েই বসে পড়ব? প্রথমে আমার খাবার ব্যবস্থা কর। অমৃত্তি, লাড্ডু, রসগোল্লা, নিয়ে এসো। পেট ভরে খেয়ে নিই। শোনো, আধ সের মালাইও খাব তার ওপর। আধসের বাদামের একটা পরত জমিয়ে নেব। কিছু কম-সম পড়লে সরপড়া দই দিয়ে পুষিয়ে নেব। দেখব ক্ষুধা কী করে কাছে ঘেঁষতে পারে। তিন দিন তো দমই নিতে পারা যাবেনা, ক্ষুধা আর এগোবে কী করে। এতেই তো সারা শহরে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে। আমার ভাগ্য-সূর্য উদয় হওয়ার মুখে, এই সময়ে মনস্থির করতে না পারলে পরে পস্তাতে হবে। হরতাল যদি ভেস্তে দিতে পারি, ধরে রাখো, লাল হয়ে যাব। আর বিফল হলেই বা কী? আমার গাঁটের কড়ি তো আর কিছু যাচ্ছে না! একশো টাকা তো হাতে এসেই গেছে।

এদিকে তো খাবারের এই ব্যবস্থা হল, অন্যদিকে পণ্ডিত মোটেরাম ঢ্যাড়া পিটিয়ে দিলেন এই বলে যে, সন্ধ্যায় পণ্ডিত মোটেরাম টাউন হল ময়দানে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে ভাষণ দেবেন। সবাই যেন অবশ্য যোগ দেন। পণ্ডিতজি বরাবরই রাজনৈতিক বিষয় থেকে দূরে থাকতেন। আজ যখন তিনি এই বিষয় নিয়েই কিছু বলবেন তখন শুনতে হবে। লোকের ঔৎসুক্য হল। শহরে পণ্ডিতজির খুব নামডাক ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে কয়েক হাজার লোকের ভিড় হয়ে গেল। পণ্ডিতজি বাড়ি থেকে বেশ ভালোভাবেই তৈরি হয়ে সেখানে পৌঁছুলেন। পেট এত ভর্তি ছিল যে তার পক্ষে চলাই কঠিন হয়ে পড়েছিল। যেইমাত্র তিনি উপস্থিত হলেন শ্রোতারা সব দাঁড়িয়ে উঠে তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করল।

মোটেরাম বলেন — নগরবাসী, ব্যবসায়ী, শেঠ ও মহাজনগণ, আমি শুনেছি, তোমরা কংগ্রেসিদের কথায় বড়লাট বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে হরতাল প্রতিপালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটা কত বড়ো কৃতঘ্নতা! তিনি তো চাইলেই আজ তোমাদের তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে পারেন, সারা শহর ধ্বংস করে দিতে পারেন। রাজা তো হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়। তিনি এ সব দেখেও দেখেন না। তোমাদের দৈন্যের জন্য তার মনে আছে দয়া। আর তোমরা গোবুর মতো অন্যের খেতে চরেই যাচ্ছ — এই ভরসায় যে, গোহত্যার পাপের ভয়ে কেউ তোমাদের গায়ে হাত দেবে না। লাটসাহেব চাইলে তো আজই রেল বন্ধ করে দিতে পারেন; ডাক বন্ধ করে দিতে পারেন; জিনিসপত্রের যাতায়াত বন্ধ করে দিতে পারেন। বলো, তখন কী করবে? উনি চাইলে তো আজ সমস্ত শহরবাসীকে জেলে পুরতে পারেন। বলো, তখন কী করবে? তোমরা তার হাত থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে? মনে রাখবে, তোমাদের প্রাণ তাঁর হাতের মুঠোয়। উনি যদি প্লেগের জীবাণু ছড়িয়ে দেন তাহলে চারিদিকে হাহাকার পড়ে যাবে। ঝাঁটা দিয়ে কালবৈশাখী ঠেকাতে চাইছ তোমরা? খবরদার, কেউ বাজার বন্ধ করেছে কি, আমার সাফ কথা, অন্নজল না গ্রহণ করে আমি প্রাণত্যাগ করব।

একজন আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন — মহারাজ, আপনার প্রাণ বেরুতে বেরুতে এক মাসের কম লাগবে না। তিন দিনে কী হবে?

মোটোরাম খেপে উঠে বললেন — প্রাণ শরীরে থাকে না, থাকে ব্রহ্মাণ্ডে। আমি ইচ্ছা করলে যোগবলে এখনই প্রাণ ত্যাগ করতে পারি। আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করে দিলাম। এবার তোমরা কী করবে না করবে তোমরাই জান। আমার কথা শুনলে তোমাদের কল্যাণ হবে। যদি না শোন ব্রহ্মহত্যার পাতক লাগবে, জগতে কোথাও আর মুখ দেখাতে পারবে না। বস্, এই আমার কথা, আমি এই বসলাম।

তিন

শহরে এই সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক বিমূঢ় হয়ে পড়ল। অফিসারদের এই নতুন চাল তাদের প্রায় হতবুদ্ধি করে দিল। কংগ্রেসের লোক তো বলতে লাগল যে, এ সব বুজরুকি। যারা রাজভক্ত তারা পণ্ডিতকে কিছু টাকা খাইয়ে এই ভাঁড়ামি শুরু করেছে। যখন আর কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আইন সব কিছুই ফেল পড়ে গেছে তখনই এই নতুন জাল পাতা হয়েছে। এটা আর কিছু নয়, রাজনৈতিক দেউলেপনা। তা না হলে পণ্ডিতজি কবে আর এমন দেশসেবক ছিলেন যে হঠাৎ দেশের দুঃখে গলে গিয়ে ব্রত লাগিয়ে দিলেন। একে না খেয়ে মরতে দেওয়াই উচিত, দুদিনেই চুকে যাবে। এই নতুন চালের উদ্দেশ্য এখনই ফাঁস করে দিতে হবে। যদি এই চাল সফল হয়ে যায় তা হলে বুঝতে হবে অফিসারদের হাতে একটা নতুন অস্ত্র এসে গেছে আর তারাও সব সময় এর প্রয়োগ করতে থাকবে। জনসাধারণ তো আর এত বুঝবে না যে, এর রহস্যটা কী। মিথ্যে ভয়ের শিকার হয়ে পড়বে।

কিন্তু শহরের বানিয়া সম্প্রদায় ও মহাজনরা, যাঁরা প্রায়শই খুব ধর্মভীরু হন, তাঁরা এত ঘাবড়ে গেলেন যে, এইসব কথা তাদের মনে কোনো দাগই কাটতে পারল না। তাঁরা বলতে লাগলেন —

সাহেব, আপনাদের কথায় সরকারের চোখে আমরা খারাপ হয়ে গেছি, ক্ষতি স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছি। রোজগার গেছে, কত লোক দেউলিয়া হয়ে গেছে, অফিসারদের কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই। আগে যখন যেতাম তারা 'আসুন শেঠজি' বলে খাতির করত। এখন রেলগাড়িতে ধাক্কা খেলেও কেউ কিছু বলে না। আয় হোক আর নাই হোক, হিসাবের খাতার ওজন দেখে ট্যাক্স বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসবেই সয়েছি, সইবও; কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে আপনাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারব না। যখন একজন পণ্ডিত, কুলশ্রেষ্ঠ ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমাদের জন্য অন্নজল ত্যাগ করছেন তখন আমরা কী ভাবে খাওয়াদাওয়া সেরে পা টান করে শুয়ে থাকব? যদি মারা যায় তাহলে ভগবানের সামনে কী জবাবদিহি করব?

মোটকথা হল, কংগ্রেসিদের কথা খাটল না। ব্যবসায়ীদের এক ডেপুটেশন রাত নটায় পণ্ডিতজির কাছে উপস্থিত হল। পণ্ডিতজি তো আজ আচ্ছা করেই খেয়ে নিয়েছিলেন। তবে আচ্ছা করে খাওয়া তার কাছে একটা খুব অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল না। মাসে প্রায় বিশদিন অবশ্যই তিনি নিমন্ত্রণ পেতেন আর নিমন্ত্রণে আচ্ছা করে খাওয়া তো একটা সাধারণ ব্যাপার। সহভোজীদের দেখাদেখি, জেদাজেদি করে গৃহস্বামীর সবিনয় আগ্রহে কিংবা সর্বোপরি ভোজ্যবস্তুর উৎকৃষ্টতার কারণে ভোজন মাত্রাতিরিক্ত হয়েই পড়ত। এই রকম পরীক্ষায় পণ্ডিতজির জঠরাগ্নি ক্রমাগতই উত্তীর্ণ হত। অতএব এই সময় খাবার সময় হওয়ার ফলে পণ্ডিতজির মনের মধ্যে একটু দ্বন্দ্ব শুরু হল। উনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন একথা বলছি না তবে, পেট না ফাঁপলে, অজীর্ণ না হলে, খাবার সময় যখন আসে তখন খাবার জন্য মনে এক প্রকার ইচ্ছা জেগে ওঠে।

শাস্ত্রীজির এ সময় সেই দশা হয়েছিল। মন চাইছিল, কোনো ফেরিওয়ালাকে ডেকে কিছু কিনে নেন, কিন্তু অফিসাররা তাঁরই নিমিত্ত সেখানে কয়েক জন পুলিশ মোতায়েন করে দিয়েছিলেন। তারা সেখান থেকে যাবার নামও নিচ্ছিল না। কী করে এই যমদূতগুলোকে সেখান থেকে সরানো যায়, এই সমস্যার সমাধানকল্পে পণ্ডিতজি তার বিপুল বুদ্ধি নিয়োজিত করেছিলেন। খামোখা এই পাজিগুলোক এখান দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তিনি তো আর কোনো কয়েদি নন যে ভেগে যাবেন।

অফিসাররা সম্ভবত এই ব্যবস্থা এই জন্য করে রেখেছিলেন যাতে কংগ্রেসিরা জোর জবরদস্তি করে পণ্ডিতজিকে ওখান থেকে সরাতে না পারে। কে জানে, ওরা কী চাল চালবে। এরকম অনুচিত ও অপমানকর অবস্থার হাত থেকে পণ্ডিতজিকে রক্ষা করা তো ছিল অফিসারদের কর্তব্য।

তিনি এই সব চিন্তা করছেন এমন সময় ব্যবসায়ীদের ডেপুটেশন এসে পৌছোল। পণ্ডিতজি কনুইয়ের উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন, উঠে ঠিক হয়ে বসলেন। নেতারা তাঁর চরণ স্পর্শ করে বললেন — মহারাজ, আমাদের উপর কেন আপনি কুপিত হলেন? আপনার যা আজ্ঞা তাই আমরা শিরোধার্য করব। আপনি উঠুন, অন্নজল গ্রহণ করুন। আমাদের ধারণা ছিল না যে আপনি যথার্থই এই ব্রত পালনে ইচ্ছুক। তা না হলে প্রথমেই আপনাকে মিনতি করতাম। আপনি দয়া করুন, দশটা বাজে। আপনার কথা আমরা কখনও ফেলব না।

এই কংগ্রেসিরা তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। নিজেরা তো ডুবতে বসেছেই, তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে ডুববে। বাজার বন্ধ থাকলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে, সরকারের কী হবে? তোমরা চাকরি ছেড়ে দিলে তোমারই না খেয়ে মরবে, সরকারের কী হবে? তোমরা জেলে গিয়ে ঘানি

টানবে, সরকারের কী হবে? জানি না, কীভাবে এই সব উদ্ভট চিন্তা মাথায় ঢুকেছে আর তোমরা নিজেদের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করছ। এই সব শয়তানদের কথায় তোমরা থেকো না। কী, দোকান খোলা রাখবে?

শেঠ — মহারাজ, যতক্ষণ পর্যন্ত শহরের সমস্ত লোক এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না নিচ্ছে ততক্ষণ আমরা কী করে বিরোধিতা করব? কংগ্রেসিরা যদি লুটতরাজ শুরু করিয়ে দেয় তখন কে আমাদের সাহায্য করবে? আপনি উঠুন, আহার করুন। কাল আমরা সকলে বসে যা ঠিক হয় আপনাকে জানিয়ে দেব।

মোটেরাম — তা হলে সভা করেই এসো।

ডেপুটেশন যখন নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছে তখন পণ্ডিতজি বললেন — তোমাদের কারুর কাছে নস্যি নেই বোধ হয়?

এক ভদ্রলোক নস্যির ডিবা বের করে দিয়ে দিলেন।

লোকজন চলে গেলে মোটেরাম পুলিশদের জিজ্ঞাসা করলেন — তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ?

সিপাহিরা বলল — সাহেবের হুকুম, কী করব?

মোটেরাম — এখান থেকে চলে যাও।

সিপাহি — আপনার কথাতেই চলে যাব? কাল যখন চাকরি চলে যাবে তখন কি আপনি খেতে দেবেন?

মোটেরাম — আমি বলছি চলে যাও। নইলে আমিই এখান থেকে চলে যাব। আমি কি কয়েদি যে তোমরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছ?

সিপাহি — চলে যাবেন কী? ক্ষমতা আছে?

মোটেরাম — ক্ষমতা থাকবে না কেন রে, ব্যাটা, কোনো অপরাধ করেছি?

সিপাহি — আচ্ছা যান তো দেখি?

পণ্ডিতজি ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত হয়ে সিপাহীকে এমন জোরে এক ধাক্কা দিলেন যে, সে কয়েক পা গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। অন্য সিপাহিরা এতে সাহস হারিয়ে ফেলল। তারা সকলেই পণ্ডিতজিকে ভেবেছিল থলথলে। পরাক্রম দেখে নিঃশব্দে সরে পড়ল।

মোটেরাম এবার চারিদিকে দেখতে লাগলেন, কোনো ফেরিওয়ালা দেখা যায় কিনা, যাতে তার কাছ থেকে কিছু নিতে পারেন। কিন্তু চিন্তা হল, যদি সেই ব্যক্তি কাউকে বলে দেয় তা হলে তো সবাই হাততালি দেবে। না, এমন চতুরতার সঙ্গে কাজটা সারতে হবে যাতে খবরটা পাচার না হয়ে যায়। এরকম সংকটেই তো মানুষদের বুদ্ধিবলের পরিচয় মেলে। এক মুহূর্তেই তিনি এই কঠিন প্রশ্নের সমাধান করে ফেললেন।

দৈবযোগে ঠিক ওই সময় এক ফেরিওয়ালাকে যেতে দেখা গেল। এগারোটা বেজে গেছে, চারদিক নিস্তব্ধ। পণ্ডিতজি ডাকলেন — ফেরিওয়ালা, ও ফেরিওয়ালা।

ফেরিওয়ালা — বলুন, কী দেব? তাহলে খিদেটা পেল, বলুন? অন্নজল ত্যাগ করা সাধুদের সাজে, আমার আপনার কাজ নয়।

মোটেরাম — ব্যাটা, বলছিস কী? আমি সাধুর চেয়ে কম কীসে? চাইলে মাসের পর মাস পড়ে থাকতে পারি; ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই লাগবে না। তোকে শুধু এই জন্য ডেকেছি যে, তোর কুপিটা আমাকে একটু দিবি। দেখতে চাই ওখানে কী একটা নড়াচড়া করছে। ভয় হচ্ছে সাপটাপ নয় তো!

ফেরিওয়ালা কুপি তুলে নিয়ে দিলে পণ্ডিতজি কী যেন এদিক ওদিক খুঁজে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ হাত থেকে ছিটকে কুপি মাটিতে পড়ে গিয়ে নিবে গেল আর সমস্ত তেল পড়ে গড়িয়ে গেল। পণ্ডিতজি তার উপর আবার এক এমন ঠোক্কর মারলেন যাতে বাকি তেলটাও আর না থাকে।

ফেরিওয়ালা — (কুপি ঝাঁকিয়ে) মহারাজ, এতে তো এক ফোঁটা তেলও আর নেই। এখনও চার পয়সার মতো সওদা বেচতে পারতাম। আপনি আমাকে এই ঝামেলায় ফেললেন।

মোটেরাম — ভাইয়া, মানুষের হাত তো, ছিটকে পড়ে গেছে। তা, এখন কী হাত কেটে ফেলব? এই নে পয়সা। কোনো জায়গা থেকে গিয়ে তেল ভরে নিয়ে আয়।

ফেরিওয়ালা — (পয়সা নিয়ে) তেল ভরিয়ে নিয়ে এখন থোড়াই এখানে আসব।

মোটেরাম — ঝুড়ি রেখে ছুটে গিয়ে একটু তেল নিয়ে আয়। তা নয় তো আমাকে সাপে কাটলে তোর উপরই খুনের দায় পড়বে। কিছু একটা প্রাণী অবশ্যই আছে। দেখ, কী নড়ছে। এই আবার পালিয়েছে। আরে যা তো দেখি, যা যা। তেল নিয়ে আয়। আমি তোর ঝুড়ি পাহারা দিচ্ছি। যদি ভয় পাস তো তোর টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়েই যা।

ফেরিওয়ালা পড়ল নিদারুণ উভয় সংকটে। ঝুড়ি থেকে পয়সা বের করে নিল ভয়, পণ্ডিতজি মনে মনে খারাপ না ভাবেন। যদি মনে করেন তাঁকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে। ফেলে রেখে গেলে কে জানে তাঁর মনে কী আছে! সবার মন তো আর সব সময় ঠিক থাকে না! শেষ পর্যন্ত সে স্থির করল, ঝুড়ি রেখেই সে যাবে। কপালে যা আছে তা হবে। সে বাজারের দিকে রওনা হতেই পণ্ডিতজির নজর গিয়ে পড়ল ঝুড়ির উপর। বুকটা খুব দমে গেল। ঝুড়িতে মিষ্টি খুব কমই পড়ে ছিল। পাঁচ-ছটা মাত্র ঠোঙা ছিল। তাদের প্রত্যেকটা থেকে দুটোর বেশি তুলে নেবার উপায় ছিল না কারণ তা হলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবার সম্ভাবনা। পণ্ডিতজি ভাবলেন : এতে কী হবে। লাভের মধ্যে ক্ষুধা আরও প্রবল হবে, অর্থাৎ বাঘ রক্তের স্বাদ পাবে। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না। নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। কিন্তু মুহূর্ত পরেই ক্ষুধা আবার চাড়া দিয়ে উঠল। ভাবলেন, কিছু উপশম তো হবেই। খাবার যত কমই হোক, খাবার তো! উঠে গিয়ে মিষ্টি বের করে প্রথমে যেই লাড্ডু মুখে দিয়েছেন অমনি দেখলেন ফেরিওয়ালা তেলের কুপি জ্বালিয়ে পা চালিয়ে আসছে। সে এসে পড়ার আগেই মিষ্টিগুলি শেষ করে ফেলাই ছিল কর্তব্য। এক সঙ্গে দুটো মিষ্টি মুখে পুরে দিলেন এবং তিনি চিবোতেই চিবোতেই সেই নিশাচর আরও দশ পা এসে গেল। এবার তিনি এক সঙ্গে চারটা মিষ্টি মুখে পুরলেন এবং তা আধ-চিবানো অবস্থাতেই গলাধঃকরণ হল। তখনও আরও ছটা মিষ্টি পড়ে ছিল এবং ফেরিওয়ালাও গেট পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। তিনি পুরো মিষ্টিটাই মুখে ফেলে দিলেন। না পারেন চিবোতে, না পারেন ওগরাতে। সেই শয়তান মোটর গাড়ির মতো কুপির আলো ফেলতে ফেলতে ছুটে আসছিল। যখন সে একেবারেই সামনে এসে পড়ল, পণ্ডিতজি দ্রুত সমস্ত মিষ্টিটাই গিলে ফেললেন। কিন্তু পণ্ডিতজিতো আর কুমির নন, মানুষ। চোখে জল এসে

গেল; গলা বন্ধ হয়ে গেল; শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি জোরে কাশতে শুরু করলেন। ফেরিওয়ালা তেলের কুপি তুলে ধরে বলল — এটা নিয়ে দেখুন। করতে চলেছেন উপাবাস — তা, প্রাণের এত ভয়! আপনার কী চিন্তা। যদি প্রাণ চলেই যায়, তাহলে তো সরকার ছেলেপুলের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

পণ্ডিতজি এত রেগে গেলেন, যে ইচ্ছা হল এই পাজিকে খুব গালমন্দ করেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। বিনা বাক্যে কুপি নিয়ে মিছামিছি এদিক ওদিক দেখে কুপি ফিরিয়ে দিলেন।

ফেরিওয়ালা — আপনার কী এমন দরকার পড়ল যে সরকারের পক্ষ নিতে গেলেন? হয়তো কাল সারাদিন আলোচনা হলে রাত্রে কোনো ফয়সালা হবে। ততক্ষণে তো আপনি চোখে সর্ষে ফুল দেখবেন।

এই কথা বলে সে চলে গেল আর পণ্ডিতজিও কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেশে শুয়ে পড়লেন।

চার

পরদিন সকাল থেকেই ব্যবসায়ীরা ব্যাপারটা নিয়ে মন্ত্রণা শুরু করলেন। ওদিকে কংগ্রেসিদের মধ্যেও আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। শান্তি-কমিটির কর্তাব্যক্তিরাও কানখাড়া করে রইলেন। সাদাসিধা এই বানিয়াদের ভয় দেখানোর এই চমৎকার উপায় এসে গিয়েছিল। পণ্ডিতসমাজ আলাদাভাবে এক সভা করলেন এবং সেখানে এই সিদ্ধান্ত হল যে, পণ্ডিত মোটেরামের রাজনীতির ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোনো অধিকার নেই। আমাদের সঙ্গে রাজনীতির কী সম্পর্ক! মোট কথা, সারাদিন এই রকম বাদবিবাদেই কেটে গেল এবং কেউই আর পণ্ডিতজির খবর করলেন না। লোকে খোলাখুলি বলতে শুরু করল যে, পণ্ডিতজি সরকারের কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে এই অনুষ্ঠান করছেন।

বেচারা পণ্ডিতজির রাতটা তো কোনোরকমে এপাশ-ওপাশ করে কাটল; কিন্তু উঠতে গিয়ে মনে হল শরীরে প্রাণ নেই। দাঁড়াতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখলেন, মাথা ঘুরতে লাগল। পেটের মধ্যে বসে যেন কেউ কুরে কুরে খাচ্ছে। রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, কিন্তু কই, কেউ তো তাকে সাধাসাধি করতে আসছে না! সন্ধ্যাহ্নিকের সময়টা এই প্রতীক্ষাতেই কেটে গেল! এই সময় পূজা করে প্রতিদিন তিনি কিছু খেয়ে নিতেন। আর এখনও মুখে জল পর্যন্ত ওঠেনি। কে জানে কখন সেই শুভ মুহূর্ত আসবে? স্ত্রীর উপর তার খুব রাগ হতে লাগল! সে নিশ্চয়ই রাত্রে ভরপেট খেয়ে শুয়ে আছে। এখন তার জলখাবার খাওয়াও হয়ে গিয়ে থাকবে। তবুও একবার ভুলেও এদিকে উঁকি দিয়ে দেখছে না লোকটা মরে গেছে না বেঁচে আছে। কথা বলার অছিলায় কি কিছু মোহনভোগ বানিয়ে নিয়ে আসতে পারে না? কিন্তু তার কি কোনো চিন্তা আছে? টাকা নিয়ে রেখে দিয়েছে, তারপর আবার যা পাওয়া যাবে তাও রেখে দেবে। আমাকে খুব বুদ্ধু বানিয়েছে।

মোদ্দা কথা, সারাদিন পণ্ডিতজির প্রত্যাশায় কাটল, কিন্তু কোনো মধ্যস্থের দেখা পাওয়া গেল না। লোকের মনে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে পণ্ডিতজি কিছু নিয়ে এই তামাশা করছেন, স্বার্থের বশীভূত হয়ে এই ভণ্ডামি দেখাচ্ছেন, সেটাই মধ্যস্থতা করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাঁচ

রাত নটা বেজে গিয়েছিল। ব্যবসায়ী সমাজের নেতা শেঠ ভোন্দুমল দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন — মেনে নিলাম যে পণ্ডিতজি স্বার্থবশেই এই অনুষ্ঠান করছেন। কিন্তু তাতে তো তাঁর কষ্ট কম হচ্ছে না, অন্নজল গ্রহণ না করলে প্রাণী মাত্রকেই তো কষ্ট সইতে হয়। একজন ব্রাহ্মণ আমাদের জন্য অন্নজল ছেড়ে দেবেন আর আমরা পেট ভরে খেয়ে আরামে নিদ্রা দেব, এটা ধর্মবিরুদ্ধ ব্যাপার। তবে তিনি যদি ধর্মবিরুদ্ধ কোনো আচরণ করে থাকেন তা হলে তার দণ্ড তাঁকে ভোগ করতে হবে। আমরা কেন আমাদের কর্তব্য থেকে সরে যাব?

কংগ্রেসের সম্পাদক ভারী গলায় বললেন — আমার যা কিছু বলার ছিল আমি বলেছি। আপনারা সমাজের অগ্রগামী অংশ, আপনারা যা স্থির করবেন আমরা তা মেনে নেব। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। পুণ্যকাজের কিছু অংশ আমারও প্রাপ্য হবে। তবে একটা অনুরোধ করব। আমি যখন ওখান থেকে ফিরে আসব তখন আপনারা যাবেন। এতে কি আপনাদের কারুর কোনো আপত্তি আছে? — প্রার্থনা মঞ্জুর হয়ে গেল।

সম্পাদক মহাশয় অনেক দিন পুলিশ বিভাগে ছিলেন। মানবচরিত্রের দুর্বলতার কথা তিনি জানতেন। তিনি সোজা বাজারে গিয়ে পাঁচ টাকার মিষ্টি কিনলেন। তাতে বেশি করে গোলাপজল দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তাকে রুপার তবকে মুড়ে একটা ঠোঙায় করে নিয়ে রুষ্ট ব্রহ্মদেবের পূজা করতে চললেন। সঙ্গে একটা কুজোতে নিলেন ঠান্ডা কেওড়া দেওয়া জল। দুটো জিনিসেরই সুবাস হাওয়ায় উড়ছিল। সুবাসের উত্তেজিত করার ক্ষমতা যে কত তা আর কে না জানে। এর দ্বারা ক্ষুধা নিজেই ক্ষুধার্ত বোধ করে, আর ক্ষুধার্ত যারা তাদের তো কথাই নেই।

পণ্ডিতজি তখন মাটির উপর অচৈতন্যের মতো পড়েছিলেন। রাত্রে তো কিছু খাওয়া হয়নি। পাঁচ-দশটা ছোটো ছোটো মিষ্টিতে আর কী হয়! দুপুরেও কিছু জোটেনি। আর এই বেলাও ভোজনের সময় পার হয়ে গিয়েছিল। ক্ষুধায় এখন আর আশার ব্যাকুলতা ছিল না, ছিল নিরাশার শিথিলতা। সমস্ত শরীর নেতিয়ে পড়েছিল তাঁর। এমন কী, চোখ পর্যন্ত খুলছিলেন না। তিনি বার বার চোখ খোলবার চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছিল। ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রাণের কোনো চিহ্ন যদি থেকে থাকে তো তা ছিল ধীর কোঁকানোর শব্দে। তিনি জীবনে কখনও আর এমন সংকটে পড়েননি।

বদহজমের শিকার তাকে মাসে দু-চারবার হতে হয়েছে। তিনি তা হরীতকী ও অন্যান্য ওষুধের সাহায্যে সারিয়ে ফেলতেন। কিন্তু অজীর্ণ অবস্থাতেও এমন কখনও হয়নি যে তাকে খাওয়া বন্ধ করে দিতে হয়েছে। শহরের অধিবাসীদের, শান্তি-কমিটির লোকদের, সরকারকে, ভগবানকে, কংগ্রেসিদের এবং ধর্মপত্নীকে তিনি প্রাণভরে গালি দিয়ে নিলেন। কারুও কাছ থেকেই আর কোনো আশা ছিল না। এখন তাঁর এমন শক্তিও ছিল না যে নিজে উঠে বাজারে যাবেন। তিনি স্থিরনিশ্চয়ই হয়েছিলেন যে, সেই রাত্রেই তাঁর প্রাণপাখি উড়ে যাবে। জীবন-সূত্র তো আর এমন কিছু একটা মোটা কাছি নয় যে, যত খুশি টানাটানিই করা হোক না কেন তা কোনো মতেই ছিঁড়বে না।

সম্পাদক মশাই ডাকলেন — শাস্ত্রীজি।

মোটেরাম শুয়ে শুয়েই চোখ খুললেন। তাঁর সেই চোখে এমন করুণ বেদনা মাখানো ছিল যেন কোনো বালকের হাতের মিষ্টি কাক নিয়ে পালিয়েছে।

সম্পাদক মশাই ঠোঙার মিষ্টি সামনে রেখে কুঁজোর উপর একটা বাটি উপুড় করে রাখলেন। তারপর এমনিতে বললেন — এখানে কত দিন পড়ে থাকবেন?

খাদ্যের সুবাস পণ্ডিতজির ইন্দ্রিয়ের উপর সঞ্জীবনী সুধার কাজ করেছিল। পণ্ডিতজি উঠে বসে বললেন — দেখুন, কবে পর্যন্ত মিটমাট হয়।

সম্পাদক — মিটমাট টিটমাট কিছু হবে না। আজ সারাদিন সভা চলেছে, কিছুই ঠিক হয়নি। কাল সন্ধ্যায় কখন লাটসাহেব আসবেন, সেই পর্যন্ত কে জানে আপনার দশা কী হবে। আপনার চেহারা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

মোটেরাম — আমার মৃত্যু যদি এখানেই লেখা থাকে তবে কে আটকাবে? এই ঠোঙায় কি কলাকান্দ্ আছে?

সম্পাদক — হাঁ, নানা রকমের মিষ্টি আছে। আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে তত্ত্ব পাঠাবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

মোটেরাম — তাই এতে গন্ধ ভুরভুর করছে। ঠোঙার মুখটা একটু খুলুন তো।

সম্পাদক মশাই মুচকি হেসে ঠোঙা খুলতেই পণ্ডিতজি চোখ দিয়েই ভোজন শুরু করলেন। অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেলেও বোধ হয় পৃথিবীকে এত তৃষ্ণাতুর নয়নে দেখে না। মুখ জলে ভরে এল। সম্পাদক বললেন — আপনার ব্রত না থাকলে দু-চারটা মিষ্টি আপনাকে চাখাতাম। পাঁচ টাকা সের দাম দিয়েছি।

মোটেরাম — তাহলে তো খুবই ভালো হবে। আমি অনেক দিন কলাকান্দ্ খাই না।

সম্পাদক — আপনিও তো গায়েপড়ে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিলেন। প্রাণই যদি না থাকে তবে ধন কোন কাজে আসবে?

মোটেরাম — কী করব, ফেঁসে গেছি। জানেন তো, আমি এই এত মিষ্টি দিয়ে জলখাবার খেতাম। (হাত দিয়ে মিষ্টির ঠোঙা ধরে) ভোলার দোকানের বোধ হয়?

সম্পাদক — দু-চারটা চেখে দেখবেন?

মোটেরাম — কী চাখব? ধর্মসংকটে পড়ে গেছি।

সম্পাদক — আরে, ছাড়ুন তো। এতে যে আনন্দ পাবেন তা লক্ষ টাকাতেও পাবেন না। কে আর কাকে বলতে যাচ্ছে?

মোটেরাম — বলুক না, এ শর্মা কাউকে পরোয়া করে না। আমি এখানে অন্নজল ছাড়া মরছি অথচ কারও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তাহলে আমার আবার কীসের ভয়? দিন, এদিকে ঠোঙা দিন। যান, সবাইকে বলে দিন, শাস্ত্রীজি ব্রত ভেঙে ফেলছেন। ব্যাবসা, বাজার গোল্লায় যাক। এদিকে কারও চিন্তা নেই। যখন ধর্মই নেই তখন আমিই কি শুধু ধর্মের ঠিকেদারি করব?

এই কথা বলে পণ্ডিতজি তাঁর দিকে ঠোঙা টেনে নিয়ে এমন ভাবে হাত চালাতে লাগলেন যে, মুহূর্তের মধ্যে ঠোঙা অর্ধেক হয়ে গেল। শেঠজিরা এসে গেটে অপেক্ষা করছিলেন। সম্পাদক

মশাই গিয়ে বললেন — একটু গিয়ে মজাটা দেখুন। আপনাদের বাজারও খোলা রাখতে হবে না, খোশামোদও করতে হবে না। আমি সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি। কংগ্রেসের জোর হল এখানেই।

চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। লোক এসে দেখল, পণ্ডিতজি মিষ্টির সদ্ব্যবহারে এমন তন্ময় হয়ে রয়েছেন যেন কোনো মহাত্মা সমাধিতে মগ্ন।

ভোন্দুমল বললেন — পণ্ডিতজিকে প্রণাম। আমরা তো আসছিলামই। এত তাড়াতাড়ি করলেন কেন? এমন রাস্তা বলে দিতাম যে আপনার প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হতো না অথচ কার্যও সিদ্ধ হত।

মোটে — আমার কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে। রাশি রাশি টাকাতেও এ অলৌকিক আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। যদি কিছু শ্রদ্ধা থাকে তা হলে এই দোকানেরই আরও অনেকটা মিষ্টি আনিয়ে দাও।

(সত্যাগ্রহ/১৯২৩) অনুবাদ অমলকুমার রায়

* আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে, সম্পাদক মশাই মিষ্টি নিয়ে যখন এই মাঠে আসছিলেন তখন পুলিশকে তাঁর চার আনা পয়সা দিতে হয়েছিল। এটা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ; কিন্তু তা নিয়ে বেশি হইচই করা তিনি উচিত মনে করলেন না। — লেখক

মুক্তিমার্গ

সিপাহির গর্ব যেমন তার লাল পাগড়ি, সুন্দরীর গর্ব তার অলংকার এবং বৈদ্যের গর্ব তার বৈঠকখানায় অপেক্ষমান রোগীড় ভিড়, তেমনি কৃষকের গর্ব তার খেতের ঢেউখেলানো ফসল। ঝিঙ্গুর তার আখের খেতটার দিকে তাকিয়ে থাকে আর কেমন একটা নেশায় বুঁদ হয়ে যায়। তিন-তিন বিঘে আখ। মেরেকেটে ছশো টাকা তো দেবেই। তারপর ভগবান যদি দামটা একটু চড়িয়ে দেন, তাহলে তো আর কথাই নেই। বলদ দুটো বুড়ো হয়ে পড়েছে, এবার বটেশ্বরের মেলা থেকে নতুন এক জোড়া কিনে আনতে হবে। বিঘে দুই জমি আরও পাওয়া গেলে তাও কিনে নেবে। টাকার জন্যে চিন্তা নেই! ব্যাপারি মহাজনরা তো এখন থেকেই ওর খোশামোদ করতে লেগেছে। গ্রামে এমন একটা লোক নেই যার সঙ্গো ওর ঝগড়া হয়নি, কিন্তু কাউকে ও পরোয়া করবার লোকই নয়।

সেদিন সন্ধেবেলায় ছেলেটাকে কোলে করে খেত থেকে সে মটরশুঁটি তুলছিল। এমন সময় চোখে পড়ল একপাল ভেড়া ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। আপন মনেই বলতে শুরু করল ঝিঙ্গুর — এখান দিয়ে ভেড়া নিয়ে যাবার রাস্তা তো নয়। কেন, ওদিকের আলে আলে নিয়ে যাওয়া চলত না? কী প্রয়োজনটা ছিল ওর এদিকপানে আনার? এখুনি জমিতে নামবে আর তছনছ করবে সবকিছু। ফসল মুড়িয়ে দেবে। তখন খেসারতটা কে দেবে শুনি? এ ওই বুধু রাখালিয়াটার কাজ। বড্ড বাড় বেড়েছে ওর, তা নইলে জমির মধ্যে দিয়ে পাল নিয়ে যায়। সাহস দেখো, আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে হাত গুটিয়ে, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি দেখেও ভেড়াগুলোকে ফিরিয়ে নিচ্ছে না। কবে আমার কোন্ উপকারটা করেছে শুনি যে ওর রেয়াত করতে হবে আমাকে? এখনি একটা ভেড়া কিনতে চাও, দর হাঁকবে পাঁ-চ টাকা। দুনিয়াভর কম্বল বিকোচ্ছে চার টাকায়, আর ও পাঁচ টাকার কমে কথাই বলবে না।

ততক্ষণে ভেড়াগুলো জমির একেবারে কাছে এসে পড়েছে। চেঁচিয়ে উঠল ঝিঙ্গুর — আরে এই! কোন্ দিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস ভেড়াগুলো?

— ওই আলপথ দিয়ে ভেড়াগুলো বেরিয়ে যাবে, মাহাতো। মিষ্টি করে উত্তর দিল বুধু — নইলে ঘুরে যেতে হলে কোশটাক দূর পড়ে যাবে গো।

ঝিঙ্গুর — তাই বলে তোমার ঘুরপথ বাঁচাতে আমি কেন আমার খেতটা তছনছ করতে দেব? আলে আলেই যদি যাবে অন্য খেত দিয়ে গেলে না কেন? নাকি আমাকে ছোটোলোক চামার ঠাউরেছ? পয়সার গুমোর হয়েছে বুঝি? ঘোরাও বলছি ভেড়ার পাল।

বুদ্ধু — মাহাতো, আজকের মতো যেতে দাও। আর একদিন যদি এমুখো দেখ তো যেমন খুশি শাস্তি দিও।

ঝিঙ্গুর — একবার বলেছি ভেড়া ফেরাও। একটা ভেড়াও যদি আলের ওপর ওঠে তো ছেড়ে কথা কইব না বলে দিচ্ছি!

বুদ্ধু — মাহাতো, তোমার জমির একটা কুটোও যদি আমার ভেড়ার খুরে উঠে আসে তো আমায় দাঁড় করিয়ে হাজারটা গাল দিয়ো।

অত্যন্ত নম্র সুরেই কথা বলছিল বুদ্ধু, যদিও পিছু হঠে আসাটা তার কাছে অবমাননাকর বলেই মনে হচ্ছিল। সে মনে মনে ভাবছিল, যদি আজ এই সামান্য তড়পানিতেই পিছু হটি, তবে আমার ভেড়াচরানো ডকে উঠল আর কী! আজ যদি ফিরে যাই, কাল থেকেই ভেড়া নিয়ে যাবার আর রাস্তাই পাব না কোনোদিন। সবাই মেজাজ দেখাতে শুরু করবে।

সেও বিচক্ষণ মানুষ। বারোটা ভেড়া আছে তার। কারও খালি খেতে রাতে ভেড়া ছেড়ে দিলে সে কড়ি-পিছু আট আনা হিসেবে পেত। তাছাড়া ছিল দুধ বিক্রি, ভেড়ার লোম থেকে বানানো কম্বল বিক্রি। সে ভাবছিল, এত তড়পাচ্ছে ও, করবেটা কী আমার? আমি ওর থেকে কমতি কীসে? মাঠভরা কচি পাতা দেখে ভেড়াগুলো চনমনিয়ে উঠেছে। জমিতে নেমে পড়ছে ওরা। লাঠি হাতে বুদ্ধু ওদের সামলাতে এদিকে ছোটে, তো ওদিকে ততক্ষণে অবস্থা বেশামাল।

রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গর্জে উঠল ঝিঙ্গুর, কথাটা কানে যাচ্ছে না, না কী? খুব বাড় বেড়েছে দেখছি।

বুদ্ধ — তোমাকে দেখেই তো ভেড়াগুলো ঘাবড়ে গিয়ে এধার-ওধার ঢুকে পড়ছে। তুমি সরে যাও, আমি সমস্ত ভেড়া বার করে নিচ্ছি এখনি।

ক্রুদ্ধ ঝিঙ্গুর ছেলেটাকে কোল থেকে ধপ করে নামিয়ে দিয়ে লাঠিগাছটা নিয়ে লাফিয়ে পড়ল ভেড়ার পালের ওপরে। ধোপাও বোধহয় তার গাধাকে এতটা নির্দয়ভাবে পেটায় না। এলোপাথাড়ি লাঠিতে কোনোটার মাজা ভাঙল, কোনোটার বা পা। ব্যা-ব্যা রবে প্রাণপণ আর্তনাদ করতে লাগল সবকটা। বুদ্ধু নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে দেখল তারই চোখের ওপর তার বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। তবু সে ভেড়াগুলোকে শামলাতে গেল না, ঝিঙ্গুরকে বলল না একটা কথাও। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে গেল শুধু আগাগোড়া কাণ্ডটা। দু মিনিটের মধ্যেই এই অমানুষিক প্রহারে ভেড়ার পালকে ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হল ঝিঙ্গুর। মেষকুলের সংহার-পর্ব সমাপ্ত হলে পর বিজয়গর্বে উদ্ধত ঝিঙ্গুর বুদ্ধুকে বলল, এবার সিধা রাস্তা দেখ্। আর কোনোদিন যেন এমুখো না দেখি তোকে!

জখম ভেড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুদ্ধ বলল, ঝিঙ্গুর, কাজটা মোটেই ভালো করলে না। পরে পস্তাতে হবে তোমাকে।

দুই

একটা কলাগাছকে দু-টুকরো করাটা যতটা না কঠিন, তার চাইতে ঢের সোজা একজন চাষির ওপর প্রতিশোধ নেয়া। তার সংবচ্ছরের পরিশ্রমের ফসল ছড়ানো থাকে খেতেখামারে। কত দৈবিক আর প্রাকৃতিক বিপত্তি পেরিয়ে তবে না ঘরে ফসল তোলা! এই বিপত্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেউ যদি আবার বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে, তবে বেচারা কিষান যায় কোথা?

ঝিঙ্গুর বাড়ি এসে এই লড়াইয়ের ঘটানাটা বলতেই আর সবাই ওকেই দুষতে লাগল। — মারাত্মক ভুল করেছ, ঝিঙ্গুর। জেনেশুনে কী বলে তুমি করলে এমনটা? তুমি জান না, বুদ্ধু কী ধরনের টেঁটিয়া লোক?...এখনও তেমন কিছু ঘটে নি। শিগগির যাও, ওর সঙ্গে মিটিয়ে নাও, তা নইলে হয়তো একা তোমার দোষে গোটা গ্রামটাই বিপদ্‌গ্রস্ত হবে। এতক্ষণে ঝিঙ্গুরও সেটা উপলব্ধি করেছে মনে মনে। আপশোশ করছে, — আমি কেন ওকে আটকালুম! ভেড়াগুলো না হয় খানিক চরতই, তাতে আর কতটুকু ক্ষতি হত আমার! সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের কিষানদের মাথাটা নিচু রাখাই মঙ্গল। স্বয়ং বিধাতাও চান না যে আমরা ঘাড় সোজা করে হাঁটি। ও কিছুতেই বুদ্ধুর বাড়ি যেতে রাজি ছিল না, কিন্তু অন্যদের পীড়াপীড়িতে তাকে বেরুতেই হল।

অঘ্রান মাস, কুয়াশা পড়ছে। চারিদিক অন্ধকার। ঝিঙ্গুর সবে গাঁ ছাড়িয়েছে, হঠাৎ নজরে পড়ল আখের খেতের দিকে একটা আগুন। ওর বুকটা ধক করে উঠল। খেতে আগুন লেগেছে! পাগলের মতো সে ছুটল। মনে মনে বলছিল — হে ভগবান, ও আগুন যেন আমার খেতে না হয়। কিন্তু যতই সে কাছে এগুতে থাকে, ক্রমশ বিলীন হয় ওর আশার মরীচিকা। যে অনর্থকে ও শামাল দিতে বেরিয়েছিল, তা ঘটেই গেছে। শয়তানটা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে খেতে। আমার সঙ্গে সঙ্গে সারা গ্রামকে ধ্বংস করল। সে দ্রুত তার জমির কাছে এসে গেল, মনে হল মাঝখানের পতিত জমিগুলোর কোনো অস্তিত্বই বুঝি নেই। যখন সে তার জমিতে পৌঁছুল আগুন তখন পূর্ণ তাণ্ডবে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কপাল চাপড়াতে লাগল ঝিঙ্গুর। গ্রামের লোকজন সব দৌড়ে এসেছে, অন্য জমি থেকে গোছা গোছা অড়হরের গাছ উপড়ে নিয়ে তাই দিয়ে পেটাচ্ছে আগুনকে। আগুন আর মানুষের লড়াই ততক্ষণে অত্যন্ত গুরুতর রূপ ধারণ করেছে। এক প্রহর পর্যন্ত চলল হাহাকার। কখনও এ তেড়েফুঁড়ে ওঠে, কখনও ও আসে দাবড়িয়ে। অগ্নিপক্ষের যোদ্ধারা মরতে মরতে বেঁচে উঠছে দ্বিগুণ তেজে, উন্মত্ত বিক্রমে চারিদিক ঘুরিয়ে চলেছে তার সংহার-আয়ুধ। অপর দিকে মানুষের পক্ষে সব থেকে রণকুশলী যে যোদ্ধা সে হল বুদ্ধু, প্রাণটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বারে বারে লাফ দিয়ে পড়ছে অগ্নিবেষ্টনীর মাঝে, আর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় শত্রুকে পর্যুদস্ত করছে বারে বারে। তারপর একচুলের জন্যে বেঁচে ফিরে আসছে প্রতিবারই। তুমুল সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হল মানুষই। কিন্তু এ এমন বিজয় যার চাইতে পরাজয়ও ছিল বুঝি শ্রেয়। সারা গ্রামের সমস্ত আখ জ্বলে পুড়ে খাক, তার সঙ্গে কিষানদের অভিলাষও পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তিন

আগুন কে লাগিয়েছে তা সবারই জানা। কিন্তু কারও সাহসই নেই যে তাকে অভিযুক্ত করে। কেননা কোনো প্রমাণই নেই তার বিরুদ্ধে। আর প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ তো অর্থহীন। বাড়ির বাইরে বেরুনো মুশকিল হল ঝিঙ্গুরের। যেখানেই যায়, শুধু অভিসম্পাত, শুধু দোষারোপ। লোকে ওকেই দায়ি করে: তোমার দোষেই এই আগুন লেগেছে। তুমিই আমাদের সর্বনাশের মূল। অহংকারে মাটিতে পা পড়ছিল না, এখন কেমন? নিজে তো গেলেই, সেই সঙ্গে গোটা গ্রামটাকেই ডোবালে। বুদ্ধুর পেছনে যদি তুমি না লাগতে, তাহলে কি এমনটা হত কখনও?

সর্বস্বান্ত হয়েও ঝিঙ্গুরের যত না দুঃখ হয়েছিল, তার চাইতেও ঢের বেশি জ্বালাধরানো এই বিরূপ মন্তব্যগুলো। বেচারা দিনভর চুপচাপ ঘরে বসে থাকে। পৌষমাস এসে গেল। অন্যান্যবার যে সময়টা সারা রাত কলুর ঘানি ঘুরতে থাকে, নতুন গুড়ের সুগন্ধে ম-ম করে বাতাস, গুড়ের ভাঁটি ঘিরে বসে লোকে হুঁকোয় মৌতাত জমায়, এবার সেখানে বিরাজ করছে এক বিষণ্ণ নীরবতা। নিদারুণ শীতের প্রকোপে লোকে সন্ধে হলেই খিল দেয় দরজায়, আর ঝিঙ্গুরের মুণ্ডপাত করে। তারপর এল মাঘ মাস, সে আরও নির্মম, আরো নিষ্করুণ।

কিষানের কাছে আখ কেবল অর্থই নয়, জীবনদাতাও। এই আখের ভরসাতেই শীত কাটায় কিষান। এর রস গরম করে সে পান করে, আখের পাতা জ্বাল দিয়ে আগুন পোহায়। তার গোরুবাছুরও খায় আখের পাতা। গাঁয়ের তাবৎ কুকুর যেগুলো ভাঁটির ছাইয়ের উপর পড়ে থাকত সবসময়, এবার সবকটা মরে গেছে দুঃসহ শীতে। চারণের কত না জানোয়ার মারা গেছে। শীতের সঙ্গে সঙ্গে কাশি আর জ্বর মড়কের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। আর এই সমস্ত দুর্দৈবের দায় চাপছে হতভাগ্য ঝিঙ্গুরের মাথায়।

অনেক ভেবে ভেবে ঝিঙ্গুর সংকল্প নিল যে বুদ্ধুর দশাও সে এই রকমটা করে ছাড়বে। ওর জন্য সর্বনাশ হয়ে গেল, আর ওর সুখের বান ডাকবে! বারোটা বাজাবে ওর।

যেদিন থেকে এই সাংঘাতিক বিবাদের সূত্রপাত, সেদিন থেকেই এপথ মাড়ানো বন্ধ করেছে বুদ্ধু। ঝিঙ্গুর ওর সঙ্গে খুবই সহৃদয় ব্যবহার শুরু করল। ওকে বোঝাতে চাইল যে, তোমার ওপর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একদিন তার কাছে গেল কম্বল চাইবার অছিলায়, আর একদিন গেল একটু দুধ চাইতে। বুদ্ধু ওর খুবই খাতির-যত্ন করে। হুঁকো, তামাক তো মানুষ শত্রুকেও দেয়। ওকে কিন্তু কখনোই অন্তত একটু দুধ বা শরবত না খাইয়ে ছাড়ে না।

ঝিঙ্গুর কিছুদিন হল এক কলে মজুর খাটতে যাচ্ছে। সেখানে পাটের গাঁট বাঁধা হয়। এই কলে কয়েকদিনের পয়সাটা একসঙ্গে দেয়। বুদ্ধু ঝিঙ্গুরের দৈনন্দিন খরচ মেটাতে সাহায্য করত। ফলে ঝিঙ্গুর বুদ্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। একদিন বুদ্ধু কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ঝিঙ্গুর, তোমার আখের খেতে যে আগুন ধরিয়েছিল, তাকে যদি এখন পাও, কী করবে বলতো? সত্যি কথা বলবে কিন্তু!

ঝিঙ্গুর গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, তাকে বলব, ভাই যা করেছ, খুবই ভালো কাজ করেছ। আমার অহংকার ভেঙে দিয়েছ একদম, তুমি আমাকে মানুষ করেছ।

বুদ্ধু — তোমার জায়গায় যদি আমি হতাম, তাহলে ওর ঘর না জ্বালিয়ে ছাড়তাম না।

ঝিঙ্গুর — দুদিনের এই জীবনে আর ঝগড়া-কাজিয়া করে লাভ কী বলো? আমার যা হওয়ার তা তো হয়েছেই, তাই বলে তাকেও মেরে কী লাভ?

বুদ্ধু — ঠিকই বলেছ, এটাই তো মানুষের ধর্ম। কিন্তু কী জান, রাগলে আবার অনেকের মাথার ঠিক থাকে না যে।

চার

ফাল্গুন মাস। চাষিরা আখ লাগাবার জন্যে জমি প্রস্তুত করছে। বুদ্ধুর বাজার এখন রীতিমতো গরম। ভেড়া রাখা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে লোকের মধ্যে। দু-চারজন তো প্রায় সবসময়ই

দাঁড়িয়ে থাকে তার দুয়ারে, তার তোষামোদ করে। বুধ্ধু কাউকেই তেমন পাত্তা দেয় না। ভেড়া রাখার পয়সা দ্বিগুণ দাবি করে বসে। কেউ ইতস্তত করলে সোজা বলে দেয়, আরে ভাই, তোমার ওপর তো আর জোর করে আমি ভেড়া চাপাচ্ছি না, না পোষায়, রেখো না আমার এখানে। কিন্তু আমি যা বলছি তার একটা পয়সাও কম হবে না। গরজ বড়ো বালাই। এত মেজাজ সত্ত্বেও লোকে ওকে ছাড়ে না, যেমন পান্ডারা লেগে থাকে তীর্থযাত্রীর পেছনে।

মা লক্ষ্মীর আকার খুব একটা বড়ো নয়, আর তাও আবার সময়বিশেষে ছোটোবড়ো হয়ে থাকে। কখনও তিনি নিজের বিরাট শরীর গুটিয়ে নিয়ে কাগজের ছোটো ছোটো অক্ষরমালায় মিশে যান। কখনও বা ভর করেন মানুষের রসনায়। সে সময় তাঁর আকারটাই লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর অধিষ্ঠানের জন্য প্রশস্ত স্থানের প্রয়োজন হয়। তিনি আসেন, গেরস্থালি বাড়ে। ছোটো বাড়িতে তিনি থাকতে পারেন না। বুধ্ধুর ঘরও বাড়তে লাগল। সামনেটায় বারান্দা হল, দুটোর জায়গায় ছটা কুঠুরি হল। বলতে গেলে গোটা বাড়িটাই নতুন করে গড়ে উঠল। কোনো চাষির বাড়ি থেকে কাঠ চেয়ে আনল, কাউকে ধরে করে খাপরার পাঁজা পোড়াবার ব্যবস্থা হল, কারও কাছ থেকে বাঁশ জোগাড় হল, কারও থেকে বা শর। দেয়াল গাঁথতে মজুরি দিতে হল। তাও নগদে নয়, ভেড়া খাটিয়ে। মা লক্ষ্মীর এমনই প্রভাব। সমস্ত কাজকর্ম সারা হল একরকম নিখরচায়। মুফতে খাসা একখানা বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। এরপর প্রস্তুতি শুরু হল গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের।

এদিকে ঝিঙ্গুর বেচারি দিনভর মজুর খাটে, তাতে কোনোক্রমে আধপেটা অন্নের সংস্থান হয়। অথচ বুধ্ধুর ঘরে ঐশ্বর্য যেন উপচে পড়ে। হিংসায় জ্বলতে থাকে ঝিঙ্গুরের বুক আর সেটা খুবই স্বাভাবিক, কেই বা সইতে পারে এহেন অসাম্য?

ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঝিঙ্গুর গিয়ে হাজির হল চামারদের পাড়ায়। হরিহরকে ডাকল। নমস্কার বিনিময়ের পর তামাক সাজল হরিহর। তারপর দুজনে বসে ধূমপান শুরু করল। এই চামার-সম্প্রদায়ের প্রধান সে, বড়োই শয়তান। তার ভয়ে সমস্ত কৃষকই তটস্থ থাকে।

কলকেতে টান দিতে দিতে ঝিঙ্গুর বলল, আজকাল আর ফাগের গানটান হয় না, না কি হে? শুনতেই পাই না...?

হরিহর — আর ফাগ! পেটের ধান্দা থেকেই ছুটি মেলে না।...তা তোমার আজকাল চলছে কেমন?

ঝিঙ্গুর — চলছে আর কই? নাককাটা হয়ে বেঁচে আছি। সারাটা দিন কলে গতর খাটিয়ে আসব, তবে না উনুন জ্বলবে। টাকা তো সব আজকাল বুধ্ধুর সিন্ধুকে। রাখার জায়গা নেই হে, একেবারে উপচে পড়ছে। নতুন ঘর হল, আরও ভেড়া নিচ্ছে। আবার শুনছি নাকি ধুমধাম করে গৃহপ্রবেশ হবে, সাতগাঁয়ের লোক নেমন্তন্ন পাবে।

হরিহর — মা লক্ষ্মী যখন আসেন তখন মনুষ্যের মন বড়ো হয়। আর ওর কিনা মাটিতে পা পড়ে না। কেমন মেজাজ দেখিয়ে কথা বলে।

ঝিঙ্গুর — বলবে নাই বা কেন? এ গাঁয়ে ওর সমকক্ষ কেউ আছে নাকি আর। কিন্তু বন্ধু, এই অনাচার তো আর সহ্য করা চলে না। ভগবান যখন দেন তখন তো উচিত মাথা নামিয়ে চলা।

কাউকে গেরাজ্জই করবে না, এটা তো ভালো কথা নয়। যত শুনছি ওর এই বাড়াবাড়ির কথা গায়ে যেন আগুন জ্বলে উঠছে আমার। কালকের বানিয়া আজকে শেঠ বনে গেছে। আমার সামনেও বুক ফুলিয়ে হাঁটে। কাল পর্যন্ত একটা নেংটি পরে মাঠে মাঠে কাক তাড়িয়েছে, আর আজ একেবারে ঐশ্বর্যের চুড়োয় উঠেছে।

হরিহর — তুমি যদি চাও তো আমি এর একটা ব্যবস্থা করি।

ঝিঙ্গুর — কী আর করবে ব্যবস্থা? ওই ভয়েই তো শয়তানটা গোরুমোষ কিছু রাখে না।

হরিহর — ভেড়া তো রাখে।

ঝিঙ্গুর — তা দিয়ে আর কী হবে? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।

হরিহর — তবে তুমিই বাতলাও কী করে হবে?

ঝিঙ্গুর — এমন বুদ্ধি বার কর যাতে সে আর খাড়া হতে না পারে!

এরপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফুসফুস গুজগুজ চলল। একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার যে, সৎ কাজের সময় যতটা দলাদলি হয়, অসৎ কাজের বেলায় ততই গলাগলি দেখা যায়। বিদ্বান বিদ্বানকে দেখে, কবি কবিকে দেখে জ্বলে ওঠেন ঈর্ষায়, কেউ কাউকে বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু একজন জুয়াড়ি আর এক জুয়াড়িকে, একজন মাতাল আর এক মাতালকে, একটা চোর অন্য একটা চোরকে দেখে মমত্ব অনুভব করে, পরস্পরের পাশে দাঁড়ায় তারা। একজন পণ্ডিত যদি অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান, অন্য পন্ডিত ওঁকে দেখলেও টেনে তো তুলবেনই না, উলটে ওপর থেকে আরও দু-চার ঘা লাথি লাগাবেন যাতে তিনি আর উঠতেই না পারেন। কিন্তু এক চোর যদি বিপদে পড়ে, অন্য চোর তার সাহায্যে এসে দাঁড়াবে। অন্যায়কে সকলেই ঘৃণা করে, তাই অন্যায়কারীদের মধ্যে থাকে পারস্পরিক ভালোবাসা। ভালো কাজের প্রশংসা করে সারা দুনিয়া, তাই ভালো মানুষদের মধ্যে অত বিরোধ। একজন চোরকে মেরে আর একজন চোর কী আর পাবে? সেই ঘৃণাই। আর একজন বিদ্বানকে অপদস্থ করতে পারলে অন্য বিদ্বান কী পাবে? যশ।

অনেক পরামর্শের পর ঝিঙ্গুর আর হরিহর একটা ষড়যন্ত্র ছকে ফেলল। তা কেমন হবে, কখন হবে আর কী ভাবে হবে সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে গেল। তারপর ঝিঙ্গুর উঠল, সারাটা পথ হেঁটে চলল বেশ মেজাজের মাথায়। ভাবখানা — আর কী! কেল্লা তো ফতে, বাছাধন এবার পালাও কোথায় দেখি!

পরদিন ঝিঙ্গুর যথারীতি কাজে বেরুল। প্রথমে গেল বুদ্ধুর বাড়ি। বুদ্ধু জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? আজ কাজে গেলে না।

ঝিঙ্গুর — হ্যাঁ, কাজেই তো যাচ্ছি। তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। আমার বাছুরটাকে তোমার ভেড়াগুলোর সঙ্গে কটা দিন চরাও না ভাই! সারাটা দিন খুঁটিতে বাঁধা থাকে বেচারি, মরে যাবে যে। ঘরে আমার না আছে ঘাস, না আছে খোল। কী খাওয়াব ওটাকে?

বুদ্ধু — কিন্তু ভায়া, আমি যে গোরুমোষ রাখিনা। চামারগুলোকে তো জান, সব কটা আসল শয়তান। ওই হরিহর আমার দু-দুটো গাইকে মেরে ফেলেছিল সেবার। কী জানি কী খাইয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে কান ধরেছি, আর কোনোদিন গোরুমোষ রাখব না। ...কিন্তু তোমারও তো ওই একটাই মাত্র বাছুর, ওকে আর কে কী করবে? রেখে যেয়ো সুবিধেমতো, দেখব।

এই বলে বুখ্‌ধু তার বাড়ির আসন্ন অনুষ্ঠানের তৈজসপত্র দেখাতে লাগল ওকে। ঘি চিনি ময়দা সবজি এসে গেছে। দেরি শুধু সত্যনারায়ণের পাঁচালি গানের। ঝিঙ্গুরের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল দেখে। এত আয়োজন ও নিজে তো কখনও করেইনি, দেখেও নি অন্য কোথাও। খেটেখুটে বাড়ি ফেরার পর ওর প্রথম কাজ হল বাছুরটা বুখ্‌ধুর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। সেই রাতেই বুখ্‌ধুর বাড়িতে সত্যনারায়ণের কথা হচ্ছিল। ব্রাহ্মণ ভোজনও হচ্ছিল। তাদের আদরআপ্যায়নেই রাতটা কাবার হয়ে গেল, গোয়ালের দিকে যাবার ফুরসত হল না বুখ্‌ধুর একবারও। সকালে খাওয়াদাওয়া সেরে উঠছে (কেননা রাতের খাওয়াটাই জুটল এই সকালে) সবে, এমন সময় একজন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল — আরে বুখ্‌ধ, তুমি এখানে, ওদিকে দেখ গিয়ে তোমার ভেড়াগুলোর মধ্যে একটা বাছুর মরে পড়ে রয়েছে। আচ্ছা লোক যা হোক, ওর গলার ফাঁসটাও খুলে দাওনি!

বুখ্‌ধু কথাটা শুনল, ওর মনে হল যেন জোরে একটা ঠোক্কর খেল। খাওয়া সেরে ঝিঙ্গুরও বসে ছিল সেখানেই। সে বলল, হায় হায় গো! আমার বাছুর! চলো চলো, দেখি। আমি তো ওর গলায় রশি বাঁধি নি। ভেড়ার পালের মধ্যে ওটাকে রেখে দিয়েই তো আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। তুমি আবার রশিটা বেঁধেছিলে কখন?

বুখ্‌ধু — ভগবান জানেন, আমি ওর গলার রশিটা দেখিওনি পর্যন্ত। সেই কখন থেকে আমি আর ভেড়াগুলোর দিকে যেতেই পারিনি!

ঝিঙ্গুর — নাই যদি গিয়েছিলে তবে রশিটা বাঁধল কে শুনি? গিয়েছিলে নিশ্চয়ই, এখন মনে পড়ছে না।

জনৈক ব্রাহ্মণ — কিন্তু মরেছে তো তোমার ভেড়াগুলোর মধ্যে! লোকে তো বলবেই যে বুখ্‌ধুর অসাবধানেই বাছুরটা মরেছে। রশিটা যারই হোক না কেন!

হরিহর — কাল সন্ধেবেলায় আমি ওকে ভেড়াগুলোর সঙ্গে বাছুরটাকেও বাঁধতে দেখেছিলাম।

বুখ্‌ধু — আমাকে দেখেছিলে?

হরিহর — লাঠিগাছটা কাঁধে রেখে তুমি বাঁধছিলে না বাছুরটাকে?

বুখ্‌ধু — ওরে আমার যুধিষ্ঠির রে! তুই দেখেছিস আমাকে?

হরিহর — তা তুমি চটছো কেন আমার ওপর? বেশ তো, বাঁধনি বলছ, তবে তাই!

ব্রাহ্মণ — এটা কে করেছে তা খুঁজে বার করা চাই। গো-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ কী চাট্টিখানি ব্যাপার নাকি?

ঝিঙ্গুর — কিন্তু প্রভু, জেনে শুনে তো আর বাঁধেনি?

ব্রাহ্মণ — তাতে কী হয়েছে? হত্যা তো এমনি করেই ঘটে। কেউই সাধ করে গোরুকে মারে না কখনও!

ঝিঙ্গুর — গোরু খোলা-বাঁধার কাজটাই বড়ো ঝুঁকির কাজ।

ব্রাহ্মণ — শাস্ত্রে বলেছে, গো-হত্যা মহাপাপ। একটা গোরুকে হত্যা করা একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করার সমান।

ঝিঙ্গুর — হ্যাঁ, গোরুই তো। সেইজন্যেই তো এদের এত মান। গোরু যে জননী। ...কিন্তু প্রভু, দোষ যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন দয়া করে ব্যবস্থা দিন যাতে বেচারা অল্পে নিষ্কৃতি পায়।

বুদ্ধু চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আর শুনে যাচ্ছিল কত অনায়াস কৌশলে তার ঘাড়ে চাপানো হল গো-হত্যার দায়। ঝিঙ্গুরের প্যাঁচটাও সে বুঝতে পারছিল পরিষ্কার। এখন আমি যতই বলি যে বাছুর আমি বাঁধিনি, সে কথা মানছেটা কে? উলটে লোকে বলবে যে প্রায়শ্চিত্ত এড়ানোর জন্যে আমি এই সমস্ত মিথ্যে কথাগুলো বলছি।

ওকে প্রায়শ্চিত্ত করালে তো ব্রাহ্মণ-দেবতারও কল্যাণ। এমন সুযোগ কে আর হাতছাড়া করে? ফলে যা হওয়ার তাই হল, বাছুর হত্যার দায় ওর ঘাড়েই চাপানো হল। ব্রাহ্মণদেরও রাগ ছিল ওর ওপর। প্রতিশোধ নেবার এই মোক্ষম সুযোগ। তারা বিধান দিলেন তিনমাসের ভিক্ষাদণ্ড, তারপর সপ্ততীর্থ দর্শন, সবশেষে পাঁচশো ব্রাহ্মণ ভোজন এবং পাঁচটি গাভী দান। সমস্ত শুনে বুদ্ধুর মাথায় হাত। সে কাঁদতে লাগল। তখন ভিক্ষাদণ্ড কমিয়ে দুমাস বহাল করা হল। এর বেশি আর রেয়াত করা গেল না। এর ওপর আর কোনো আপিল আদালত চলে না। নিরুপায় হয়ে বেচারিকে এই দণ্ডই মেনে নিতে হল।

বুদ্ধু ভেড়াগুলিকে সমর্পণ করল ঈশ্বরের জিম্মায়। ছেলেরা সব ছোটো। বউ একলা আর কত করতে পারে? বুদ্ধু বেচারা কাপড়ে মুখ ঢেকে দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে এই বলে ভিক্ষে চাইতে লাগল, গোমাতা-সন্তান দিয়েছে বনবাস। ভিক্ষা জোটে, তার সঙ্গে উপরি জোটে কিছু কটুকাটব্যও। সারা দিন যেটুকু সংগ্রহ হয়, সন্ধেবেলায় কোনো একটা গাছের তলায় বসে সেটাই আগুনে ফুটিয়ে নিয়ে গলাধঃকরণ করে, তারপর সেখানেই পড়ে থাকে রাতটুকু। ...কষ্ট হচ্ছে হোক, তাতে বুদ্ধুর পরোয়া নেই, ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও তো সারাটা দিন হাঁটতই, শুতেও হত গাছের তলাতে, খাওয়াও এমন কিছু আহামরি জুটত না সে সময়। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জা তো আছেই। বিশেষত যখন কেউ কু-কথা শোনায়, উপহাস করে বলে, রুটি জোগাড়ের ভালোই ধান্দা বেবর করেছে সে, তখন বুকে বড়ো বাজে। কিন্তু উপায়ই বা কী?

দুমাস পর ঘরে ফিরল বেচারি। চুলগুলো বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। এত দুর্বল, যেন ষাট বছরের বুড়ো। তীর্থযাত্রার জন্য টাকার জোগাড় করতে হবে। তার মতো মেষপালককে কোন মহাজন ঋণ দেবে? ভেড়ার ওপর ভরসা করে তো দেওয়া যায় না। একবার যদি মড়ক ধরে তো ব্যস, রাতারাতি সব উজাড়। তার ওপর এটা জ্যৈষ্ঠ মাস, ভেড়ার লোম থেকেও একটা পয়সা আমদানির সম্ভাবনা নেই। এক তেলি রাজি হল, কিন্তু টাকায় দুআনা সুদ। তার মানে আট মাসেই সুদ আসলের সমান হয়ে যাবে। এখান থেকে টাকা নেওয়া সাহসে কুলোলো না। এদিকে গতমাসে কত যে ভেড়া চুরি গেছে তার! ছেলেরা চরাতে নিয়ে যেত। অন্য গ্রামবাসীরা চুপিসাড়ে খেতে বা বাড়িতে লুকিয়ে ফেলত তার দুটো-একটাকে, তারপর এক সময় কেটে খেয়ে ফেলত। ছেলেরা ছোটো, একে তো ধরতেই পারে না চোরকে, আর ধরলেও লড়তে পারে না তার সঙ্গে। সারা গ্রামটা ওর বিপক্ষে। আর একটা মাসে তো অর্ধেক ভেড়াও থাকেব না। ভীষণ সমস্যায় পড়েছে বেচারি। নিরুপায় হয়ে বুদ্ধু শেষ পর্যন্ত এক কসাইকে ডেকে তাকেই বেচে দিল ভেড়াগুলো। হাতে পেল পাঁচ শত টাকা। তার থেকে দুশত টাকা নিয়ে সে তীর্থযাত্রায় বেরুল। বাকি টাকাটা রেখে দিল ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচার জন্যে।

বুদ্ধু ঘর ছাড়ার পর দু-দুবার সিঁধ পড়ল ওর বাড়িতে। কিন্তু সবাই জেগে ওঠায় টাকাটা বেঁচে গেল দুবারই।

পাঁচ

শ্রাবণ মাস। চারদিক সবুজে সবুজ। ঝিঙ্গুরের বলদ নেই। সে ভাগে দিয়ে দিল তার জমি। বুদ্ধু প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্ত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে পার্থিব মোহ থেকে। ঝিঙ্গুরের কোনো সম্পদ নেই, বুদ্ধুরও নেই। কে কাকে হিংসা করবে, আর কেনই বা করবে?

কলটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঝিঙ্গুর এখন মুটের কাজ করে। শহরে একটা বিশাল ধর্মশালা তৈরি হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে সেখানে। ওদের মধ্যে ঝিঙ্গুর আছে। সপ্তাহান্তে মজুরি নিয়ে ঘরে ফেরে, আর রাতটুকু কাটিয়ে পরদিন ভোরে উঠেই আবার চলে যায় কাজের জায়গায়।

এদিকে কাজ খুঁজতে খুঁজতে বুদ্ধু সেখানে গিয়ে হাজির হল। সর্দার দেখল লোকটা দুর্বল, কঠিন কোনো কাজ এর দ্বারা হবে না। সে ওকে মিস্ত্রিদের জোগাড় দেওয়ার কাজে লাগিয়ে দিল। বুদ্ধু মাথায় করে কড়াই নিয়ে কাদা আনতে গিয়ে দেখতে পেল ঝিঙ্গুরকে। কুশল বিনিময় হল দুজনে, ঝিঙ্গুর কড়াই ভরে দিল, বুদ্ধু সেটা নিয়ে চলল। সারাটা দিন দুজনেই মুখটি বুজে আপন আপন কাজ করে চলল।

সন্ধেবেলায় ঝিঙ্গুর জিজ্ঞেস করল, কিছু বানাবে তো, না কী?

বুদ্ধু — তা নয়তো খাবটা কী?

ঝিঙ্গুর — আমি তো এক বেলা এটা-ওটা চিবিয়ে কাটিয়ে দিই। আর রাত্রে ছাতু মেখে তাই দিয়ে খাওয়া সেরে নিই। কে আর ঝামেলা করে?

বুদ্ধু — কয়েকটা কাঠের টুকরো জোগাড় করো তো। আমি বাড়ি থেকে আটা নিয়ে এসেছি। ঘরের পেষা আটা। এখানে বড্ড দাম। এখানে এই পাথরের চাতালটার ওপরই মেখে নিচ্ছি। তুমি তো আমার রান্না খাবে না, তা তুমি তোমার রুটিটা সেঁকে নাও নিজে, আমি বানিয়ে দিচ্ছি।

ঝিঙ্গুর — চাটু তো নেই।

বুদ্ধু — চাটু আনা আছে। মশলা বইবার কড়াই মেজে নিলেই হবে।

আগুন জ্বালানো হল। আটা মাখা হল। ঝিঙ্গুর আধকাঁচা কয়েকটা রুটি বানাল। বুদ্ধু জল নিয়ে এল। তরপর পাকা লংকা আর নুন দিয়ে দুজনে খেয়ে নিল রুটিগুলো। খাওয়া হলে পর তামাক সাজাল কলকেতে। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দুজনে ধূমপান করতে লাগল পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

বুদ্ধু বলল — তোমার আখের খেতের আগুনটা ... ওটা আমিই লাগিয়েছিলাম।

ঝিঙ্গুর হালকা ভাবে বলল — জানি।

একটু পরে সে আবার বলল — বাছুরটাকে বেঁধে ছিলাম আসলে আমি ... আর হরিহর ওটাকে কী একটা খাইয়ে দিয়েছিল।

বুদ্ধুও ঠিক সেইভাবে বলল — জানি।

তারপর দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

(মুক্তিমার্গ /১৯২৪)

অনুবাদ অচিন চক্রবর্তী

দাবাড়ু

ওয়াজিদ আলি শাহের সময়ের কথা। সেই সময় সারা লখনউ শহর ডুবে ছিল বিলাসিতার সুখে। ছোটো-বড়ো ধনী-গরিব সবাই মজে ছিল বিলাসের মধ্যে। কেউ বসাতেন নাচগানের আসর তো কেউ আফিমের মৌতাতে বুঁদ হয়ে থাকতেন। জীবনের প্রায় প্রতি স্তরেই আমোদা-আহ্লাদের ঠাঁই ছিল সবার উপরে। শাসনকাজে, সাহিত্যে, সমাজব্যবস্থায়, কল-কারিগরিতে, ব্যাবসাবাণিজ্যে আচার-ব্যবহারে সব কিছুতেই ব্যাপ্ত হয়ে ছিল সেই বিলাসিতা। রাজকর্মচারীরা বিত্তবাসনায় আর কবিরা প্রেম-বিরহের বর্ণনায় লিপ্ত ছিলেন। কারিগরেরা শুধু তৈরি করত সোনারুপোর শৌখিন জরি-সলমা আর চিকনের জিনিস; ব্যবসায়ীর ব্যাবসা চলত সুরমা, আতর, মিশি আর নানারকম রূপটানের বেচাকেনায়। সবাইকার চোখে বিলাসের নেশা। বিশ্বসংসারে কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খবর নেওয়ার সময় আছে কার? বটের পাখিদের লড়াই জমেছে কোথাও। তিতির পুষে বড়ো করা হচ্ছে লড়াইয়ের জন্যে। কোথাও পাশার দান বিছানো। পো-বারোর হই-হট্টগোল চলছে। কোথাও বা দাবার ঘোর সংগ্রাম শুরু হয়েছে। রাজা থেকে ভিখিরি অবধি এই এক নেশায় মাতোয়ারা। এমনই যে, ফকিরেরা পর্যন্ত পয়সা পেলে রুটি না কিনে মৌজ করত আফিম বা মোদকের নেশায়। দাবা-তাস-পাশা এই তিন খেলাতেই বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, বিচার শক্তি বাড়ে, জটিল সমস্যার প্যাঁচ খোলার অভ্যেস তৈরি হয় — খুব জোরের সঙ্গেই তখন লোকে এইসব যুক্তি দেখাত। (তবে এ ধরনের লোকেরা এখনও দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়নি)।

এইসব কারণেই যদি মিরজা সজ্জাদ আলি আর মির রোশন আলি তাদের বেশির ভাগ সময় বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করার চেষ্টায় কাটান তাহলে তাতে কোনো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আপত্তি করতে যাবে কেন? দুজনেরই বেশ কিছু বংশগত জমিজায়গা ছিল। রুজিরোজগারের ভাবনা-চিন্তা আদৌ ছিল না। ঘরে বসেই মজা ওড়াতেন। আর এ ছাড়া করবেনটাই বা কী? সকালবেলায় জলখাবার সেরে নিয়েই দুই বন্ধুতে বসে যেতেন দাবার ছক বিছিয়ে — ঘুঁটিগুলোও সাজানো হয়ে যেত যুদ্ধের জন্যে। তারপর শুরু হয়ে যেত লড়াইয়ের মারপ্যাঁচ। খেলার মধ্যে কখন সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে সন্ধে হয়ে যেত কেউ জানতেই পারত না। বাড়ির ভেতর থেকে বার বার খাওয়ার ডাক পড়ত। উত্তর যেত — আরে এই যাচ্ছি, ফরাশটা বিছিয়ে ফ্যালো। আমরা এলুম বলে। শেষকালে বাবুর্চি অবধি হয়রান হয়ে সেই ঘরেই খাবার এনে দিত, দুই বন্ধুতে খাওয়া আর খেলা দুটো কাজ এক সঙ্গেই সারতেন। মিরজা সজ্জাদ আলির বাড়িতে গুরুজন কেউই ছিলনা, তাই সে বাড়ির বৈঠকখানাতেই খেলা হত। তবে তার মানে এই নয় যে, তার এই ব্যবস্থায় বাড়ির লোকজনের খুব

সায় ছিল। বাড়ির সকলে তো বটেই, তার ওপর পাড়াপড়শি, চাকরবাকর সবাই বাঁকা বাঁকা টিপ্পনী কাটত — এ বড়ো অলক্ষুনে খেলা। ঘরসংসার সব গোল্লায় দেয়। খোদা রক্ষে করুন, কেউ যেন এই খেলার পাল্লায় না পড়ে। তখন মানুষ একেবারে কাজের বার হয়ে যায়, না ঘরকা না ঘাটকা। এ ভয়ংকর রোগ। এমন কী, মিরজা সাহেবের বেগমেরও এই খেলার ওপর এত রাগ ছিল যে ফাঁক খুঁজে খুঁজে স্বামীকে দু-চার কথা শোনাতে ছাড়তেন না। তবে এরকম সুযোগ পাওয়াই বেশ কঠিন ছিল। তাঁর ঘুম ভাঙার আগেই ওদিকে দাবার ছক পাতা হয়ে যেত। আর রাত্তিরে শুয়ে পড়ার পর কোনো একসময় মিরজা সাহেব ঘরে ফিরতেন। বেগম সাহেবা চাকরবাকরদের উপরেই গায়ের ঝাল মেটাতেন — কী, পান চাইছে? বলগে, এসে নিয়ে যাক। কী রে, খাওয়ার ফুরসতও নেই নাকি? যা গিয়ে খাবারটা মাথার উপর উলটে দিয়ে আয় — খায় খাক, না খায় তো কুকুরের পেটে যাক। কিন্তু তিনি স্বামীর সামনে কিছুই বলতে পারতেন না। বেগম সাহেবার নিজের স্বামীর ওপর যতটা না অভিযোগ ছিল তার থেকে বেশি রাগ ছিল মির সাহেবের ওপর। তার নাম রেখেছিলেন 'মির বিগাড়' অর্থাৎ 'মাথা-খেকো মির'। মনে হয়, মিরজা সাহেব নিজের সাফাই গাইবার জন্য সমস্ত দোষ মির সাহেবের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন।

একদিন বেগম সাহেবের খুব মাথা ধরেছে। তিনি বাঁদিকে বললেন — যা গিয়ে মিরজা সাহেবকে ডেকে আন তো, কোনো হাকিমের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে আসুক। জলদি দৌড়ে যা। বাঁদি এসে খবর দিতে মিরজা সাহেব বললেন, আচ্ছা তুই যা, আমি এখনই আসছি। বেগম সাহেবের মেজাজ এমনিতেই বেশ গরম ছিল। তার ওপর তাঁর মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে আর পতিদেবতাটি মনের সুখে বসে দাবা খেলছেন, সে কি সহ্য করা যায়? রাগে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে গেল। বাঁদিকে বললেন — যা গিয়ে বল এক্ষুনি যেন উঠে আসে, নয়তো আমি একলাই চলে যাব হাকিমের কাছে।

মিরজা সাহেব তখন খুব মন দিয়ে খেলছিলেন — আর দু-এক দানেই মির সাহেব মাত হয়ে যাবেন। ঝেঁঝে উঠে বললেন, এক্ষুনি প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে নাকি? সবুর সইছে না একটু?

মির — আরে গিয়ে শুনেই আসুন না কী বলছে, জানেনই তো মেয়েরা একটুতেই কাতর হয়ে পড়ে।

মিরজা — হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো যেতে বলবেনই। আর দুটো দানেই মাত হয়ে যাবেন যে।

মির — আরে জনাব, সে আশায় বসে থাকবেন না। এমন একটা চাল ভেবেছি যে, আপনার ঘুঁটি তো ধরা আছেই, তার ওপর মাতও হয়ে যেতে পারেন। গিয়ে একটু শুনেই আসুন না। কেন শুধু শুধু ওঁর মনে কষ্ট দিচ্ছেন।

মিরজা — আচ্ছা, এই কথা? তাহলে তো মাত করেই উঠতে হচ্ছে।

মির — তাহলে আমি এই খেলা বন্ধ করলুম। যান, আগে শুনে আসুন গিয়ে।

মিরজা — আরে ভাই যেতে হবে সেই হাকিমের কাছে। মাথাব্যথা না ছাই। ঝুটমুট আমাকে হয়রান করার চেষ্টা।

মির — সে যাই হোক, ওঁর মন রেখে তো চলতেই হবে।

মিরজা — ঠিক আছে, আর একটা চাল দিয়ে যাচ্ছি।

মির — কিছুতেই না। যতক্ষণ না আপনি গিয়ে শুনে আসছেন আমি ঘুঁটি ছোঁবই না। বাধ্য হয়ে মিরজা সাহেবকে ভেতরে যেতে হল। ভেতরে যেতেই বেগম সাহেবা ভুরু কুঁচকে কিন্তু কাতরাতে কাতরাতে বলতে লাগলেন —ওই হতচ্ছাড়া দাবা খেলাই তোমার এত পেয়ারের হল! কেউ যদি মরেও যায় তাহলেও খেলা ছেড়ে ওঠবার নামই কর না। তোমার মতো লোক যেন দুনিয়ায় আর না হয়।

মিরজা — কী বলব, মির সাহেব যে কোনো কথাই শুনতে চান না। অনেক কষ্টে ওঁর হাত ছাড়িয়ে উঠে এসেছি।

বেগম — লোকটা ভেবেছে কী? নিজে যেমন নিকম্মা, আর সব্বাইকে তাই ঠাউরেছে নাকি! তার নিজের ঘরেও তো ছেলেপিলে আছে — নাকি সে সব বালাই চুকিয়ে দিয়েছেন?

মিরজা — বড্ড নেশাড়ু লোক। এসে পড়লে বাধ্য হয়ে আমাকেও খেলতেই হয়।

বেগম — গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দিতে পার না?

মিরজা — একে সমান দরের লোক, তার ওপরে বয়সে অবস্থায় আমার দুকাঠি ওপরে। কিছুটা খাতির তো করতেই হয়।

বেগম — ঠিক আছে, তাহলে আমিই দুকথা শুনিয়ে আসছি। রাগ করলে বয়েই গেল। কে কার কড়ি ধারে? বেশি রাগ হলে বাড়ি গিয়ে দুটো ভাত বেশি খাবেন! হরিয়া, যা বাইরে গিয়ে দাবার ছকটা তুলে আন। আর মির সাহেবকে বলবি, সাহেব খেলবেন না, উনি এখন আসতে পারেন।

মিরজা — আরে ছি ছি, এমন কাজ কোরো না। ওঁর কাছে আমার মাথা হেঁট করতে চাইছ। এই হরিয়া, দাঁড়া, কোথায় যাচ্ছিস!

বেগম —ওকে আটকাচ্ছেন কেন? আমার মরা মুখ দেখবেন বলে দিচ্ছি, ওকে আটকান যদি। আচ্ছা ওকে থামান আপনি — আমি নিজেই যাচ্ছি এবার বলতে। দেখি কে আমায় আটকায়।

এই বলে বেগম সাহেবা তিরিক্ষি মেজাজে বৈঠকখানার দিকে এগোলেন। তাই দেখে বেচারা মিরজা সাহেবর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বউকে মিনতি করতে লাগলেন, খোদার দোহাই তোমায়, হজরত হোসেনের দিব্যি, যদি ওদিকে যাও তো আমার মরা মুখ দেখবে। কিন্তু বেগম সাহেবা তাঁর একটা কথাও শুনলেন না। বৈঠকখানার দরজা অবধি এসে পৌঁছলেন, তারপর থমকে গেলেন। হঠাৎ পরপুরুষের সামনে বেরোতে তাঁর পা সরছিল না। ঘর দেখলেন ফাঁকা, ভাগ্যক্রমে কেউ নেই সেখানে। মির সাহেব দু-একটা ঘুঁটি এদিক ওদিক করে দিয়ে নিজের সাফাই গাইবার জন্যে বাইরে পায়চারি করছিলেন। বেগম তখন ঘরে ঢুকে ছকটাকে উলটে দিলেন। ঘুঁটিগুলোর কিছু গিয়ে পড়ল চৌকির তলায়, কিছু একদম ঘরের বাইরে। তারপর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন। মির সাহেব তো বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন — ঘুঁটিগুলোকে বাইরে এসে পড়তেও দেখলেন, রেশমি চুড়ির আওয়াজও কানে এল। এরপরে দরজাটা বন্ধ হতেই বুঝলেন বেগম সাহেবার মেজাজ বিগড়ে গেছে। তখন চুপচাপ নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

মিরজা বললেন — তুমি কিন্তু অন্যায় করলে।

বেগম — এরপর মির সাহেব এখানে এসে দেখুন। সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেব। ইস্ এত ভক্তি যদি খোদার ওপর থাকত এতদিনে রাজা হয়ে যেতে। উনি বসে দাবা খেলবেন আর এদিকে হাঁড়ি-হেঁশেলের ভাবনা চিন্তায় আমার হাড়মাস কালি হবে। কী, হাকিমের ওখানে যাবে, না এখনও আগুপিছু ভাববে?

মিরজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাকিমের বাড়ি না গিয়ে সোজা মির সাহেবের বাড়ি গিয়ে ওকে সব খুলে বললেন। মির সাহেব বললেন, আমি তো ঘুঁটিগুলো বাইরে এসে পড়তে দেখেই বুঝে ফেললুম — শিয়রে সংক্রান্তি। ছুটে পালিয়ে এসেছি। বেগমসাহেবা বেশ রাগি মনে হচ্ছে। আপনি তো তাঁকে একেবারে মাথায় চড়িয়ে রেখেছেন। এতটা উচিত নয়। আপনি বাইরে কী করছেন না করছেন অত খবরে ওঁর কাজ কী? ওঁর কাজ ঘরসংসার দেখা, অন্য ব্যাপারে উনি নাক গলাতে আসেন কেন?

মিরজা — যাক গে, ছেড়ে দিন। এখন বলুন এবার আমাদের খেলার আসর কোথায় বসবে?

মির — তার জন্যে আর ভাবনা কী? এত বড়ো ঘর পড়ে রয়েছে। এখানেই খেলা হবে।

মিরজা — তা না হয় হল, কিন্তু বেগম সাহেবাকে বোঝাব কী করে? ঘরে বসে খেলতাম তাতেই ওই মেজাজ। আর এখানে এসে খেলা হবে শুনলে তো আর জ্যান্ত রাখবে না।

মির — আরে দিন না গজগজ করতে। দু-চার দিনে আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা — আজ থেকেই বাড়িতে একটু কড়া হতে শুরু করুন।

দুই

মির সাহেবের বেগম আবার কোনো এক অজানা কারণে মির সাহেবের এই বাইরে বাইরে থাকাটাই পছন্দ করতেন। এই জন্যেই মির সাহেবের অতিরিক্ত দাবা-প্রেমের ব্যাপারে উনি কোনো কথাই বলতেন না। উপরন্তু কখনো-সখনো দেরি হয়ে গেলে খেলতে যাবার কথা মনে করিয়ে দিতেন। এইসব কারণেই মির সাহেবের এই ভুল ধারণা জন্মেছিল যে, তাঁর বউ খুব চুপচাপ আর বিনীত স্বভাবের। কিন্তু যেদিন থেকে বৈঠকখানায় দাবার ছক পাতা হল আর মির সাহেব সারাদিন বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করলেন বেগমের খুব অসুবিধে হতে লাগল। তাঁর স্বাধীনতায় বাধা পড়ল। সারা দিন দরজায় গিয়ে উঁকি মারার জন্য মনটা ছটফট করত।

ওদিকে চাকরবাকরদের মধ্যেও গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর শুরু হল। এর আগে তাদের কোনো কাজ ছিল না — সারাদিন বসে বসে মাছি মারত। বাড়িতে কে এল কে গেল তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আর এখন অষ্টপ্রহর প্রায় ডাক পড়ে, গালাগালি খেতে হয়। কখনও পান আনবার হুকুম হয় তো কখনও মিঠাই আনবার। আর হুঁকোর তো কথাই নেই। প্রেমিকের হৃদয়ের মতো সে সর্বক্ষণ জ্বলছে। তারা বেগম সাহেবাকে গিয়ে বলত — হুজুরাইন, মিঞা সাহেবের এই দাবা খেলার চোটে তো আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন দৌড়ে দৌড়ে তো পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। এ আবার কোন দিশি খেলা, সকালে বসেন আর শেষ হতে সেই সন্ধে? মন ভালো রাখার জন্যে এক-আধ ঘন্টা খেলা — সে আলাদা কথা। যাক গে, আমাদের আর এসব কথায় কাজ কী? আমরা হুজুরের হুকুমের চাকর, যা হুকুম হবে তাই তামিল করব। তবু বলব এ খুব সর্বনেশে খেলা। এটা যারা খেলে তাদের কপালে সুখ হয় না। বাড়িতে ঠিক কোনো না কোনো

বিপদ ঘটে। এমন কী, একজনের সঙ্গে সঙ্গে পুরো পাড়ারই সর্বনেশে হয়ে যায়। সারা মহল্লা জুড়ে সকলে এই কথা বলছে। হুজুরের নুন খাচ্ছি, মনিবের নামে খারাপ কথা শুনলে মনে বড্ড কষ্ট হয়। কিন্তু কী করি বলুন। এইসব কথা শুনে বেগম সাহেবা বললেন, আমি নিজেই তো এইসব দুচক্ষে দেখতে পারি না। কিন্তু কী করব, উনি কাবুর কথা শুনলে তো?

পাড়ার মধ্যে যে দু-চারজন পুরোনো দিনের লোক ছিলেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে নানারকম অমঙ্গলের আশঙ্কা করতে শুরু করলেন — আর রক্ষে নেই। যখন আমাদের রইস লোকদেরই এই হাল, তখন দেশকে খোদাই রক্ষে করুন। এই সাম্রাজ্য এক দাবাতেই রসাতলে দেবে। সময় বড়ো খারাপ।

সারা রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেছে। প্রজাদের ওপর দিন-দুপুরেই লুঠতরাজ চলছে। নালিশ শোনার লোক নেই। গ্রামাঞ্চলের সমস্ত পয়সা এসে জমা হচ্ছিল লখনউ শহরে। সেই টাকাকড়িও উড়ে যাচ্ছিল বেশ্যা, ভাঁড় আর বিলাসিতার আরও নানা ফন্দিতে। দিনে দিনে ইংরেজ কোম্পানির ঋণ বেড়েই চলেছে। এইভাবেই ক্রমশ পাল্লা ভারী হচ্ছিল। দেশে সুব্যবস্থা না থাকায় ঠিকমতো বার্ষিক করও আদায় হচ্ছিল না। রেসিডেন্ট সাহেব বার বার সাবধান করছিলেন কিন্তু লোক বিলাসের নেশায় মশগুল; এসব কোনো কথা তাদের কানেই ঢুকত না।

বেশ কয়েকমাস হল মির সাহেবের বৈঠকখানায় দাবা খেলা চলছে। কত নতুন নতুন দুর্গ গড়া হচ্ছে। চলছে নিত্যনতুন ব্যূহ রচনা। কখনো-সখনো খেলতে খেলতে ঝগড়াও বেধে যেত। তবে ওই মুখে মুখে ঝগড়া অবধি। আবার খুব তাড়াতাড়ি দুজনে মিলও হয়ে যেত। অবশ্য এমনও কখনও কখনও হত যে খেলা বন্ধ হয়ে গেল, মিরজা সাহেব রেগেমেগে নিজের বাড়ি চলে গেলেন। মির সাহেব বসে রইলেন নিজের ঘরে। কিন্তু এক রাত ঘুমের সঙ্গে সঙ্গেই সব মনোমালিন্য দূর হয়ে যেত। সকালে আবার দুই বন্ধুতেই বৈঠকখানায় এসে পৌঁছতেন। একদিন যখন দুই বন্ধু দাবা খেলার পাঁকের মধ্যে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় বাদশাহি ফউজের একজন কর্মচারী মির সাহেবের খোঁজে এসে পৌঁছলেন। ভয়ে মির সাহেবের প্রাণ উড়ে গেল। এ যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। হঠাৎ এ তলব কীসের? নিস্তারের তো কোনো পথ দেখছি না! তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। চাকরকে বললেন, বলে দে বাড়িতে নেই।

সওয়ার — বাড়িতে নেই তো আছে কোথায়?

চাকর — তা আমি জানিনা। কী দরকার?

সওয়ার — তা তোকে বলে কী করব? দরবারে ডাক পড়েছে, বোধহয় কিছু সৈন্য চেয়ে পাঠাবেন। জমিদার হওয়া তো আর ইয়ারকির নয়। যখন যুদ্ধে যেতে হবে তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

চাকর — ঠিক আছে, আপনি যান। উনি এলে বলা যাবে।

সওয়ার — বলার কোনো দরকার নেই। আমি কাল আসব। সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে।

ঘোড়সওয়ার চলে গেল। মির সাহেবের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। মিরজা সাহেবকে বললেন, এখন কী হবে বলুন তো।

মিরজা — আচ্ছা ঝামেলা তো। আমার না আবার ডাক পড়ে।

মির — হতভাগাটা কাল আবার আসবে বলে গেছে।

মিরজা — কী বিপদ, যদি যুদ্ধে যেতে হয় তাহলে তো বেঘোরে মারা পড়ব।

মির — ব্যস, এই একটাই উপায় আছে। কাল থেকে আর বাড়িতেই থাকব না। গোমতীর ধারে কোনো নিরালা নির্জন জায়গায় গিয়ে আসর জমাব। ওখানে কে আর আমাদের খবর পাবে? এ মহাত্মাটি আমাকে বাড়িতে না পেয়ে আপনিই ফিরে যাবেন।

মিরজা — বাহ্! আপনার কী বুদ্ধি। এছাড়া তো আর কোনো উপায়ই নেই।

এদিকে মির সাহেবের বেগম সেই ঘোড়সওয়ারকে বলছিলেন, তুমি তো দারুণ ভাবে তাড়িয়েছ ওদের।

উত্তরে সে বলল, এরকম বোকাদের তো তুড়ি মেরে নাচাই আমি। এদের সমস্ত বুদ্ধি আর হিম্মত তো দাবার ছকেই চুরি করে নিয়েছে। আর ভুলেও কখনও বড়িতে থাকবে না।

তিন

পরের দিন থেকে দুই বন্ধু অন্ধকার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়তেন বাড়ি থেকে। ছোটো একটা শতরঞ্জি বগলে নিয়ে, বাটায় পানের খিলি ভরে চলে যেতেন গোমতীর ধারে একটা ভাঙাচোরা নির্জন মসজিদে। সেটা সম্ভবত আসফউদ্দৌলার সময় তৈরি হয়েছিল। যাবার সময় রাস্তায় তামাক ছিলিম গড়গড়া নিয়ে নিতেন। তারপর মসজিদে গিয়ে শতরঞ্জি বিছিয়ে হুঁকো সাজিয়ে বসে যেতেন দাবা খেলতে। ব্যস, আর জগৎসংসারের বিষয়ে হুঁশ থাকত না তাঁদের। কিস্তি, চাল এই শব্দগুলো ছাড়া আর কোনো কথাই থাকত না মুখে। কোনো যোগীও বোধহয় ধ্যানের সময় এত একাগ্র হন না। দুপুর বেলায় খিদে পেলে দুই বন্ধুতে মিলে রাস্তার ধারে কোনো রুটিওয়ালার দোকানে গিয়ে খাবার খেয়ে নিতেন। তারপর এক ছিলিম হুঁকো টেনে নেমে পড়তেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কখনও কখনও খাওয়ার কথাও বেমালুম ভুলে যেতেন তাঁরা।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দিনের পর দিন ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কোম্পানির ফউজ এগিয়ে আসছে লখনউ-এর দিকে। শহরে হইচই পড়ে গিয়েছে। লোকে ছেলেপিলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে গ্রামে। কিন্তু আমাদের এই দুজন খেলোয়াড়ের এসব নিয়ে একটুও মাথাব্যথা ছিল না। বাড়ি থেকে আসতেন গলির ভেতর দিয়ে, ভয় ছিল যদি বাদশাহি কর্মচারীর নজরে পড়ে যান তাহলে খামোখা ধরে নিয়ে যাবে। বছরে হাজার টাকা আয়ের জমি জায়গা মিনি-মাগনায় হজম করার ইচ্ছে বেটাদের।

একদিন দুই বন্ধুতে সেই পোড়ো মসজিদে বসে দাবা খেলছেন। মিরজা সাহেবের খেলার অবস্থা বেশ টালমাটাল; তার ওপর মির সাহেব কিস্তির পর কিস্তি লাগাচ্ছেন। এমন সময় কোম্পানির ফউজ আসতে দেখা গেল। সেটা ছিল গোরা সাহেবদের ফউজ, যারা লখনউ দখল করতে আসছে।

মির সাহেব বললেন — ইংরেজ ফউজ আসছে, খোদা রক্ষা করুন।

মিরজা — আসতে দিন। আগে কিস্তি তো সামলান। এই রইল কিস্তি।

মির — একটু দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা কী? ওই আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই।

মিরজা — আরে দেখবেন না হয়। এত তাড়া কীসের। এই নিন আবার কিস্তি।

মির — সঙ্গে তোপখানাও রয়েছে। প্রায় হাজার পাঁচেক লোক হবে — কেমন জোয়ান সব দেখছেন? লাল বাঁদরের মতো মুখ। চেহারা দেখলেই বুক কাঁপে।

মিরজা — আরে মশাই, বাহানা করবেন না। এসব ধাপ্পা অন্য কাউকে দেবেন। এই রইল কিস্তি।

মির — আপনি তো মশাই অদ্ভুত লোক। এদিকে শহরে এই বিপত্তি আর আপনার মাথায় কিস্তি ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা নেই। এই কথাটাও একটু ভেবে দেখুন যে শহর ঘিরে ফেললে বাড়ি ফিরব কী করে।

মিরজা — যখন বাড়ি ফেরার সময় হবে তখন দেখা যাবে। এই কিস্তি! ব্যস, এই চালেই মাত।

কোম্পানির ফউজ চলে গেল। তখন দশটা বেজেছে। আবার খেলা শুরু হল।

মিরজা বললেন — আজ খাওয়াদাওয়ার কী হবে?

মির — আরে ভাই, আজ তো রোজা আছে। কেন, আপনার কি খুব খিদে পেয়েছে?

মিরজা — নাঃ! শহরে কী হচ্ছে কে জানে।

মির — কিছুই হচ্ছে না। লোকে খাবারদাবার খেয়ে-টেয়ে বেশ আরামে ঘুমোচ্ছে। নবাব সাহেব বোধহয় এখন বিলাসখানায় রয়েছেন।

দুই বন্ধুতে আবার যখন খেলতে বসলেন তখন তিনটে বেজে গেছে। মিরজা সাহেবের খেলার অবস্থা একটু খারাপ। চরটের ঘন্টা বাজছে। এমন সময় সৈন্যদের ফিরে আসার শব্দ পাওয়া গেল। নবাব ওয়াজিদ আলিকে গ্রেফতার করে কোনো এক অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শহরে না আছে কোনো হইচই, না ঘটেছে কোনো মারদাঙ্গা, একফোঁটাও রক্তপাত হয়নি। বোধহয় আজ অবধি কোনো স্বাধীন দেশের রাজার পরাজয় এত শান্তিতে, একটুও খুনোখুনি ছাড়া এমন নির্বিঘ্নে হয়নি। এ সেই অহিংসা নয় যার জন্যে দেবতারা প্রসন্ন হন। এ সেই কাপুরুষতা যার জন্যে অতি বড়ো কাপুরুষকেও চোখের জল ফেলতে হয়েছে। যখন অযোধ্যার বিশাল রাজ্যের নবাব বন্দী হয়ে চলে যাচ্ছেন সেই সময় লখনউ ডুবে রয়েছে আরামের ঘুমে। রাজনৈতিক অধঃপতনের এ এক চরম সীমা।

মিরজা বললেন, শুনুন, নবাব বাহাদুরকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে।

মির — হবে হয়তো। এই নিন আমি চাল দিলাম।

মিরজা — একটু দাঁড়ান না মশাই। এখন খেলায় মন লাগছে না। বেচারা নবাব সাহেব হয়তো এখন মৃত্যুর অপেক্ষায় চোখের জল ফেলছেন।

মির — ফেলছেন বেশ করছেন। ওদের কাছে এ আরাম পাবেন কোথায়? আবার কিস্তি।

মিরজা — কারও দিন সমান যায় না। কী দুঃখের কথা।

মির — হ্যাঁ, তা তো বটেই। — এই নিন, আবার কিস্তি। এই কিস্তিতেই মাত — আর বাঁচতে হচ্ছে না।

মিরজা — খোদার দিব্যি মশাই, আপনার প্রাণটা পাষাণের মতো। এতবড়ো বিপর্যয় দেখেও আপনার কষ্ট হচ্ছে না? হায়! বেচারা ওয়াজিদ আলি শাহ!

মির — আগে আপনার রাজাকে তো বাঁচান, পরে নবাব সাহেবের জন্যে বিলাপ করবেন।

বাদশাহকে নিয়ে সৈন্যরা সামনে দিয়ে চলে গেল। ওরা চলে যেতেই মিরজা সাহেব আবার খেলা শুরু করে দিলেন। হেরে যাওয়ার চোট খুব খারাপ হয়। মির সাহেব বললেন, আসুন নবাব

সাহেবের জন্য শোক প্রকাশ করে আমরা একটা শোকগাথা গাই। কিন্তু মিরজা সাহেবের রাজভক্তি দাবায় হেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উবে গিয়েছিল। উনি হেরে যাওয়ার শোধ তোলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন।

চার

সন্ধে হয়ে গেছে। পোড়ো বাড়িটাতে বাদুড় আর চামচিকের চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। দোয়েল বাবুই পাখিরা উড়ে উড়ে ফিরে আসছে যে যার নিজের বাসায়। কিন্তু দুজন খেলোয়াড় সেই একই ভাবে খেলে যাচ্ছেন, যেন দুই রক্তপিপাসু বীর আপসে লড়ে যাচ্ছেন নিজেদের মধ্যে। মিরজা সাহেব পরপর তিনটে বাজি হেরে গিয়েছিলেন। এই চতুর্থ খেলাতেও সেরকম সুবিধে করতে পারছিলেন না। উনি বারবার যত ঠিক করে সতর্ক হয়ে খেলছেন একটা না একটা এমন বেঢপ চাল এসে পড়ছে যে খেলাটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবারের পরাজয়ের সঙ্গে জেতার ইচ্ছেটা আরও উগ্র হয়ে উঠছে। ওদিকে মির সাহেব জেতার আনন্দে গুনগুন করে গজল গাইছেন; তুড়ি দিচ্ছেন। যেন কোনো গুপ্তধন পেয়ে গেছেন। আর মিরজা সাহেব এসব শুনতে শুনতে বার বার ঝেঁঝে উঠছেন, আর পরাজয়ের আক্ষেপ মেটানোর জন্যে বারবার তাঁর ভুল ধরছেন। কিন্তু ক্রমশ খেলা দুর্বল হয়ে পড়ায় আর ধৈর্য থাকছে না। এমনকী, কথায় কথায় খেঁকিয়ে উঠছেন — শুনুন মশাই, চাল ফেরত চলবে না। একটা চাল দেবেন আবার সেটা বদলে নেবেন, এটা কী রকম ব্যাপার। যা চাল দেওয়ার একবারে দিয়ে দিন। একী, আপনি ঘুঁটিতে হাত দিচ্ছেন কেন? ঘুঁটি ছেড়ে দিন। যতক্ষণ না চাল ঠিক করবেন ঘুঁটিতে হাত দেবেন না। আপনি আধঘন্টা ধরে একটা চাল দেবেন এটা নিয়ম নেই। যার একটা চাল দিতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগে সে মাত হয়ে গেছে বলে ধরতে হবে। একী, আবার আপনি চাল বদলালেন। চুপচাপ যেখানকার ঘুঁটি সেখানে রাখুন।

মির সাহেবের একটা বোড়ে মারা যাচ্ছিল। বললেন, আমি আবার চাল দিলাম কখন!

মিরজা — আপনার চাল দেওয়া হয়ে গেছে। ঘুঁটিটা ওখানে রেখে দিন, — ওই ঘরেই।

মির — ওই ঘরে রাখব কেন? আমি হাত থেকে ঘুঁটি নামালাম কখন?

মিরজা — ঘুঁটি যদি আপনি নিদানের অবধি না ছাড়েন তাহলে চাল বন্ধ থাকবে না কী। যেই দেখেছেন বোড়েটা মার যাচ্ছে অমনি জোচ্চুরি শুরু করেছেন।

মির — জোচ্চুরি আমি করি না, আপনি করেন। খেলায় হারজিতটা কপালের ব্যাপার। জোচ্চুরি করে কখনও জেতা যায়?

মিরজা — ও, তাহলে এই খেলায় আপনার মাত হওয়া ঠেকায় কে?

মির — আমি মাত হতে যাব কোন দুঃখে?

মিরজা — তাহলে আপনি ঘুঁটিটা যে ঘরে ছিল ওই ঘরে আগে রেখে দিন।

মির — ওখানে কেন রাখব? রাখব না।

মিরজা — কেন রাখবেন না। রাখতেই হবে আপনাকে।

তর্কাতর্কি বেড়েই চলেছে। কেউ কারও জায়গা থেকে একচুলও সরছে না। না এ মুখ বন্ধ করে, না ও। নানা অবান্তর কথাও চলে আসতে থাকে। মিরজা সাহেব বললেন, চোদ্দ পুরুষে

কেউ যদি কোনোদিন দাবা না খেলে থাকে, তবে সে কেমন করে এ খেলার নিয়মকানুন জানবে। আভিজাত্য ব্যাপারটা অন্য জিনিস। জমি থাকলেই কেউ রইস অভিজাত হয়ে যায় না।

মির — কী? আপনার বাবা হয়তো ঘাস কাটতেন। পুরুষ পুরুষ ধরে আমরা দাবা খেলে আসছি।

মিরজা — আরে যান যান, গাজিউদ্দিন হায়দরের ওখানে বাবুর্চির কাজ করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেললেন, আজ আবার রইস হওয়ার শখ কত। রইস হওয়া কি ইয়ার্কি নাকি?

মির — কেন নিজের পূর্বপুরুষদের মুখে চুনকালি মাখাচ্ছেন? তাঁরাই হয়তো বাবুর্চির কাজ করতেন। আমরা তো হামেশা বাদশাহি দস্তরখান বিছিয়ে খাবার খেয়ে আসছি।

মিরজা — আরে যা যা, ঘোড়ার বাচ্চা। এত লম্বাচওড়া বাত ছাড়িস না।

মির — মুখ সামলে কথা বলুন, নয়তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমি এসব কথা সহ্য করব না। কেউ যদি চোখ রাঙায় তার চোখ উপড়ে নেব আমি। আছে সে সাহস?

মিরজা — বটে! আপনি আমার সাহস দেখতে চান? আসুন তাহলে আজ একহাত হয়ে যাক — এসপার নয়তো ওসপার।

মির — তো এখানে তোমাকে ভয়টা পাচ্ছে কে?

দুই বন্ধু কোমর থেকে তলোয়ার বার করলেন। সেটা নবাবি আমল, সবাই কোমরে তলোয়ার, পেশকব্জ, ছোরা এসব বেঁধে রাখত। দুজনেই শৌখিন লোক ছিলেন, কিন্তু কাপুরুষ ছিলেন না। ওঁদের রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার মধ্যে সার কিছু ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিগত বীরত্বের অভাব ছিল না কারোই। দুজনে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন — আর সেখানেই ছটফট করতে করতে তাঁদের প্রাণ চলে গেল। নিজেদের বাদশাহের জন্যে যাদের চোখে এক ফোঁটাও জল বেরোয়নি, সেই দুজন দাবাখেলার মন্ত্রী বাঁচাতে প্রাণ দিলেন।

অন্ধকার হয়ে আসছে। দাবার ছক পাতা রয়েছে। দুই রাজা নিজের নিজের সিংহাসনে বসে আছেন, যেন এই দুই বীরের মৃত্যুতে চোখের জল ফেলছেন।

চারিদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। পোড়ো মসজিদের ভেঙে-পড়া খিলানগুলো, ধসে-পড়া দেওয়াল আর ধূলিধূসরিত মিনারগুলো এই দুই মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ক্ষোভে দুঃখে যেন মাটিতে মাথা কুটছে।

(শতরঞ্জ কে খিলাড়ী / ১৯২৪) অনুবাদ দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

সওয়া সের গম

এক গ্রামে শংকর নামে এক কুর্মি কিষান বাস করত। সে ছিল সাদাসিধে গরিব লোক। নিজের কাজ নিয়েই সে থাকত, কারও কোনোরকম সাতেপাঁচে সে থাকত না। কোনো রকম তঞ্চকতা সে জানত না। কোনো ছলচাতুরী তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারত না। প্রবঞ্চিত হবার কোনো চিন্তা ছিল না, নিজেও প্রবঞ্চনার কিছু জানত না। খাবার জুটলে খেত, না জুটলে মুড়িটুড়ি চিবিয়ে কাটিয়ে দিত। যদি তাও না জুটত তবে জল খেয়ে রাম নাম করে শুয়ে পড়ত। কিন্তু যখন কোনো অতিথি এসে দরজায় দাঁড়াত তখন তাকে এই নিবৃত্তি-মার্গ ছাড়তে হত। বিশেষ করে কোনো সাধুমহাত্মার পদার্পণ হলে তাকে অনিবার্যভাবেই সাংসারিক রীতিনীতি মেনে চলত হত। নিজে অভুক্ত থেকেও শুয়ে থাকা যায়; কিন্তু সাধুকে কী করে না খাইয়ে রাখা চলে! সাধু যে ভগবানের ভক্ত!

একদিন সন্ধ্যার সময় এক মাহাত্মা শংকরের দরজায় এসে হাজির হলেন। তাঁর তেজস্বী মূর্তি, গায় পীতবাস, মাথায় জটা, হাতে পিতলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম, চোখে চশমা — তাঁর বেশভূষা ছিল পুরোপুরি সেই সব মহাত্মার মতোই যারা ধনী ব্যক্তির প্রাসাদে থেকে তপস্যা করে, মোটরগাড়ি করে তীর্থ পরিক্রমা করে এবং যোগসিদ্ধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুস্বাদু খাবারদাবার ভোজন করে। ঘরে যবের আটা ছিল, তবে তা আর কী করে সাধুকে খাওয়ানো যায়! পুরাকালে যবের যে মহত্ত্বই থাকুক না কেন, এযুগে কিন্তু যবের আটা সিদ্ধপুরুষের হজম হয় না। সে খুবই চিন্তায় পড়ল। মাহাত্মাজিকে কী খেতে দেবে? শেষ পর্যন্ত ঠিক করল, কোনো জায়গা থেকে গমের আটা ধার করে নিয়ে আসবে। কিন্তু গোটা গ্রামে কোথাও গমের আটা পাওয়া গেল না। গ্রামে সবাই ছিল শুধুই মানুষ, দেবতা একজনও ছিলেন না। অতএব দেবতার খাদ্যবস্তু কী করে পাওয়া যাবে? সৌভাগ্যক্রমে গ্রামের ব্রাহ্মণ দেবতার কাছে কিছু পাওয়া গেল। তা থেকে সওয়া সের গম ধার করে এনে সে তার স্ত্রীকে পিষে দিতে বলল। মহাত্মা ভোজন সেরে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। সকাল বেলা আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

ব্রাহ্মণ দেবতাটি বছরে দুবার করে আদায় নিতেন। শংকর মনে মনে ভাবল, সওয়া সের গম আর এঁকে কী ফিরিয়ে দেব! উনি তো আদায় নেন এক পসেরি (ছ সের) করে। এবারে আদায়ের সময় এক পসেরির কিছু বেশিই দিয়ে দেব। উনিও বুঝে নেবেন। আমারও দেওয়া হয়ে যাবে। চৈত্র মাসে বিপ্রজি যখন এলেন তখন শংকর তাকে প্রায় দেড় পসেরি গম দিয়ে দিল এবং নিজে ঋণমুক্ত হয়েছে ভেবে সে আর এনিয়ে কোনো কথা বলল না। বিপ্রজিও আর কিছু চাইলেন না। সরল শংকর কী করে বুঝবে যে সওয়া সের গমের ঋণ মেটাবার জন্য তাকে আবার জন্ম নিতে হবে।

দুই

সাত বছর পার হয়ে গেছে। বিপ্রজি এখন ব্রাহ্মণ থেকে মহাজন। আর শংকর কিষান থেকে মজুর। ওর ছোটো ভাই মঙ্গল এখন ওর থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে। দুজন যখন এক সঙ্গে ছিল তখন দুজনই ছিল কিষান, আর এখন পৃথক হয়ে মজুর। শংকর চেয়েছিল, বিদ্বেষের আগুন যেন বাড়তে না পারে; কিন্তু পরিস্থিতি তাকে নাচার করে ফেলল। যেদিন আলাদা আলাদা উনুন জ্বলল, সেদিন শংকর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আজ থেকে ভাই ভাই শত্রু হয়ে যাবে, একজন কাঁদলে অন্যজন হাসবে, একজনের ঘরে শোকের ঘটনা ঘটলে অন্যজনের ঘরে মিষ্টি বিতরণ হবে। ভালোবাসার বন্ধন, রক্তের বন্ধন, মাতৃদুগ্ধের বন্ধন — আজ সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কঠোর পরিশ্রম করে সে কুলমর্যাদার বৃক্ষ রোপণ করেছিল। নিজের রক্ত সিঞ্চন করে সেই বৃক্ষ সে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আজ তাকে উৎপাটিত হতে দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। সাত দিন হল একটা দানাও জোটেনি। সারাদিন জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে কাজ করে রাত্রে মুখ বুজে শুয়ে থাকত। এই চরম বেদনায় ও দুঃসহ কষ্টে তার রক্তই জল হয়ে গিয়েছিল। মাংস ও মজ্জা শুকিয়ে গিয়েছিল। অসুস্থ হয়ে সে একমাস আর খাটিয়া থেকে উঠতেই পারেনি। এখন খাওয়া জোটে কী করে? পাঁচ বিঘা জমির অর্ধেক রয়ে গেল; দুটো বলদের একটা থেকে গেল, — চাষবাস কী হবে? শেষ পর্যন্ত চাষবাস কেবল মর্যাদা রক্ষার উপায় মাত্র হয়ে থাকল। জীবিকা উপার্জনের জন্য মজুরবৃত্তি নিতে হল।

সাত বছর কেটে গেল। একদিন শংকর মজুরি করে ফিরছে এমন সময় বিপ্রজি রাস্তায় তাকে ধরে বললেন — শংকর, কাল এসে তোর সঙ্গে লেনদেনের হিসাব মেটাতে হবে। তোর এখানে কবে থেকে সাড়ে পাঁচ মন গম পাওনা পড়ে আছে তুই দেওয়ার নাম করছিস না। কী, হজম করার ইচ্ছা, না কী?

শংকর আশ্চর্য হয়ে বলল — আপনার কাছ থেকে কবে গম নিলাম যে সাড়ে পাঁচ মন বাকি পড়ে গেল? আপনি ভুল করছেন। আমার কাছে কারুর এক ছটাক শস্য বা এক পয়সা বাকি পড়ে নেই।

বিপ্রজি — এই চরিত্রেরই ফল তুমি ভোগ করছ, তাই তোমার খাওয়াও জুটছে না।

এই কথা বলে বিপ্রজি তাকে সেই সওয়া সের গমের কথা বললেন, যে গম তিনি আজ থেকে সাত বছর আগে শংকরকে দিয়েছিলেন। শংকর শুনে অবাক হয়ে গেল। ঈশ্বর! আমি একে কতবার নজরানা দিয়েছি। ইনি আমার কোন কাজটা করেছেন? যখন কুষ্ঠিঠিকুজি বিচার করতে কিংবা দিনক্ষণ ঠিক করতে আমার এখানে এসেছেন, কিছু-না-কিছু দক্ষিণা নিয়েই গেছেন। এত বড়ো স্বার্থপর। সওয়া সের গমের ডিমে তা দিয়ে সে আজ এই পিশাচ খাড়া করেছে আমাকে গিলে খাবে বলে। এত দিনের মধ্যে যদি একবারও বলত তাহলেও তো ওজন করে দিয়ে দিতাম। এই উদ্দেশ্যেই কি চুপ করে বসেছিল। শংকর বলল — মহারাজ, বলেকয়ে আমি দিই নি বটে, কিন্তু কয়েকবারই তো সের-দুসের করে নজরানা দিয়েছি। এখন আপনি সাড়ে পাঁচ মন দাবি করছেন, দেব কোথা থেকে?

বিপ্রজি — খাতায় তোলা হিসেব এক জিনিস, আর নজরানা অন্য ব্যাপার। তুই যা কিছু দিয়েছিস বলে বলছিস তার তো কোনো হিসেব নেই, তা এখন এক পসেরির জায়গায় চার পসেরি

কিংবা আর যাই দিয়ে থাকিসনা কেন। তোর নামে ওই সাড়ে পাঁচ মনই লেখা আছে। যাকে দিয়ে খুশি হিসেব করিয়ে নে। দিয়ে দিলে তোর নাম বাদ দিয়ে দেব; না দিলে আরও বাড়তে থাকবে।

শংকর — পাঁড়ে, কেন এক গরিবকে ভোগাবেন? আমার নিজের খাওয়ারই ঠিক নেই। এত গম আমি কার ঘর থেকে জোগাড় করব?

বিপ্রজি — যার ঘর থেকে পারিস আনবি। আমি এক ছটাকও ছাড়ব না। এখানে না দিবি, ভগবানের ঘর তো দিতে হবে!

শংকর কেঁপে উঠল। লেখাপড়া জানা লোক হলে বলে দিত, ঠিক আছে ঈশ্বরের কাছেই শোধ করব; ওখানকার মাপ তো আর এখান থেকে বেশি হবে না! অন্তত এর কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই, কাজেই আর কী চিন্তা! কিন্তু শংকর তো তর্ক জানত না, এত চালাক চতুরও সে ছিল না। একে তো ঋণ — তার উপর আবার ব্রাহ্মণের ঋণ। নাম না কাটাতে পারলে তো সোজা নরক! এ কথা মনে হতেই তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল — মাহারাজ, আপনার যা প্রাপ্য আমি তাই দেব। ঈশ্বরের কাছে কেন দিতে যাব? এই জন্মে শুধু আঘাতই পাচ্ছি; পরজন্মের জন্য কেন আর কাঁটা বুনতে যাব? তবে এ তো কোনো ন্যায়ের কথা নয়। আপনি তিলকে তাল বানিয়েছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার এরকম করা উচিত হয়নি। তখনই তাগাদা করে নিয়ে নিতে পারতেন, তাহলে এত বড়ো বোঝা কি আর আমার ঘাড়ে এসে পড়ত? আমি দেব, তবে এজন্য আপনাকে ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

বিপ্রজি — ওখানকার ভয় তুই করবি, আমি করব কেন? ওখানে তো সবাই আমাদের ভাইবন্ধু। মুনিঋষিরা তো সবাই ব্রাহ্মণ; দেবতাও ব্রাহ্মণ। যদি কিছু অসুবিধা হয় সেটা সামলে নিতে পারব। তা, কবে দিচ্ছিস?

শংকর — আমার কাছে তো জমা করা নেই। কারুর কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে আনব তবে তো দেব!

বিপ্রজি — আমি শুনব না। সাত বছর হয়ে গেছে; এখন আর এক দিনের জন্যও অপেক্ষা করব না। গম দিতে না পারিস তমসুক লিখে দে।

শংকর — আমাকেই তো দিতে হবে — তা, গমই নিন, আর দলিলেই সই করান। কী হিসাবে নেবেন?

বিপ্রজি — বাজারের ভাও তো পাঁচ সের। তোর জন্য সওয়া পাঁচ সের করে দেব।

শংকর — যখন দিতেই হবে তখন বাজারের মতোই দেব। এক পোয়া ছাড় নিয়ে দোষী হব কেন?

হিসাব করে গমের দাম দাঁড়াল ষাট টাকা। ষাট টাকার দলিল লেখা হল — শতকরা তিন টাকা সুদ। সারা বছর দিতে না পারলে সুদের হার হবে শতকরা সাড়ে তিন টাকা। স্ট্যাম্পের খরচ আট আনা আর দলিল লেখার খরচ এক টাকা শংকরের ঘাড়েই চাপল।

গ্রামের সকলেই বিপ্রজির নিন্দা করল; কিন্তু সামনে কেউ কিছু বলতে পারল না। মহাজনকে তো সকলেরই কাজে লাগে, তাকে আর কে চটাতে চায়!

তিন

সারা বছর ধরে শংকর কৃচ্ছ্রসাধন করল। মেয়াদের আগেই টাকা শোধ করে দেওয়ার ব্রত সে গ্রহণ করেছিল। দুপুরের রান্নার পাট আগে উঠে গিয়েছিল; মুড়ি দিয়েই খিদের নিবৃত্তি হত। এখন তাও বন্ধ হল। কেবল ছেলের খাবার জন্য রাত্রে রুটি রাখা থাকত। রোজই সে এক পয়সার তামাক খেত। এটা এমন এক নেশা ছিল যা সে কোনো দিন ছাড়তে পারেনি। আজ সেই নেশাও এই কঠিন ব্রতের বলি হল। সে কলকে ফেলে দিয়ে, হুঁকো ভেঙে ফেলে তামাক রাখার পাত্র চুরমার করে ফেলল। ত্যাগের চরম সীমায় পৌঁছুলে যা হয় তার পরনের কাপড়ের সেই দশা আগেই হয়েছিল। এখন তা শুধু লজ্জা নিবারণের কাজটুকুই করে। হাড়কাঁপানো শীতে সে আগুন পুইয়ে কাটিয়ে দিত। এই ধ্রুব সংকল্পের ফল সে আশাতীত ভাবেই পেল। বছরের শেষে তার হাতে ষাট টাকা জমা হল। সে ভাবল, পণ্ডিতজিকে এই টাকা জমা দিয়ে বলবে, মহারাজ, বাকি টাকাটাও খুব শিগগির আপনাকে দিয়ে দেব। আর তো মাত্র পনেরো টাকার ব্যাপার। পণ্ডিতজি কি এতে রাজি হবেন না? সে টাকা নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতজির চরণকমলে অর্পণ করল। পণ্ডিতজি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — কারুর কাছ থেকে ধার করে নিয়ে এলি?

শংকর — না, মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে এখন মজুরি ভালোই হয়।

বিপ্রজি — কিন্তু এ তো দেখছি মাত্র ষাট টাকা!

শংকর — হাঁ, মহারাজ, এখন এই টাকাটা নিয়ে নিন। বাকি টাকা আমি দু-তিন মাসের মধ্যে দিয়ে দেব। আমাকে ঋণমুক্ত করে দিন।

বিপ্রজি — ঋণমুক্ত তখনই হবি যখন আমার পাওনা কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে পারবি। যা, আমার বাকি পনেরো টাকা নিয়ে আয়।

শংকর — মহারাজ, এটুকু দয়া করুন। এখন রাত্রের খাবার রুটির ব্যবস্থাটা পর্যন্ত নেই। আমি তো গ্রামেই রয়েছি, এক সময় দিয়েই দেব।

বিপ্রজি — আমি এই রোগ পুষে রাখি না। বেশি কথাও বলতে জানি না। যদি আমি পুরো টাকা না পাই তবে আজ থেকে শতকরা সাড়ে তিন টাকা করে সুদ চাপবে। তোর টাকা ইচ্ছে করলে নিজের কাছে রাখতে পারিস কিংবা এখানেই ফেলে রাখতে পারিস।

শংকর — ঠিক আছে, য এনেছি, তা রেখে দিন। আমি যাচ্ছি, পনেরো টাকা কারুর কাছ থেকে জোগাড় করতে পারি কি না দেখি।

শংকর সারা গ্রাম চষে ফেলল; কিন্তু কেউ তাকে টাকা দিল না। তার উপর বিশ্বাসের অভাবে দিল না তা নয় কিংবা টাকা ছিল না বলে দিল না তাও নয়। দিল না এই জন্যে যে, পণ্ডিতজির শিকার নষ্ট করার হিম্মত কারুরই ছিল না।

চার

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া নৈসর্গিক নিয়মেই হয়। সারা বছর কৃচ্ছ্রসাধন করেও যখন শংকর ঋণমুক্ত হতে পারল না তখন তার সংযম নৈরাশ্যে পরিণত হল। সে বুঝতে পারল যে, যখন এত কষ্ট সহ্য

করেও সারা বছরে সে ষাট টাকার বেশি জমা করতে পারেনি তখন তার দ্বিগুণ টাকা জমানোর আর কোনো উপায় নেই। মাথার উপর ঋণের বোঝা যখন চেপেই রইল তখন তা এক মনও যা সওয়া মনও তা। তার উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে গেল। পরিশ্রম করতে অনীহা জন্মাল। আশাই উৎসাহের জননী — আশাই শক্তি, আশাই প্রেরণা, আশাই জীবন। আশাই সংসারের সঞ্চালিকা শক্তি।

শংকর আশাহীন হয়ে উদাসীন হয়ে পড়ল। যেসব প্রয়োজনকে শংকর সারা বছর ধরে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিল এখন আর তা দরজায় দাঁড়ানো ভিখারিনির রূপ নিয়ে ফিরে এল না; এল বুকের উপর চেপে-বসা পিশাচিনীর রূপে, যে পিশাচিনী তার প্রাপ্য আদায় না করে তাকে প্রাণে বাঁচতে দেবে না। কাপড়ে তালি লাগানোর একটা সীমা থাকে। এখন আর শংকর মহাজনের তাগিদকে পরোয়া করে না। সে আর টাকা জমায় না, বরং কাপড় কেনে কিংবা কোনো খাবার জিনিস। আগে যেখানে সে শুধু তামাক খেত, এখন সেখানে গাঁজা এবং চরস ধরল। এখন টাকা শোধ করার কোনো চিন্তাই আর তার থাকল না, যেন তার কাছে কেউ আর এক পয়সাও পায় না। আগে সে জ্বর গায়েও কাজে কামাই দিত না। আর এখন কাজে না যাবার বাহানা সে খুঁজে বেড়ায়।

এইভাবে তিন বছর কেটে গেল। বিপ্রজি মহারাজ একবারও তাগাদা দিলেন না। তিনি চতুর শিকারির মতো অব্যর্থ নিশানার মধ্যে শিকারকে পেতে চেয়েছিলেন। আগে থেকেই শিকারকে সতর্ক করে দেওয়া ছিল তার রীতিবিরুদ্ধ।

একদিন পণ্ডিতজি শংকরকে ডেকে হিসাব দেখালেন। যে ষাট টাকা জমা ছিল তা ধরেও শংকরের কাছে পাওনা দাঁড়াল একশো কুড়ি টাকা।

শংকর — এত টাকা তো এই জন্মে দিতে পারব না, পরজন্মে দেব।

বিপ্রজি — আমি এই জন্মেই নেব। আসল না হোক, সুদ তো দিতেই হবে।

শংকর — একটা বলদ আছে, ওটা নিয়ে নিন। একটা কুঁড়ে আছে, ওটাও নিয়ে নিন। আর, আমার কাছে আছেই বা কী?

বিপ্রজি — গোরুবাছুর নিয়ে আমি কী করব? আমাকে দেবার মতো তোর কাছে অনেক কিছুই রয়েছে।

শংকর — আর কী আছে, মহারাজ?

বিপ্রজি — কিছু না থাক, তুই তো রয়েছিস। তুই তো কোথাও না কোথাও কাজ করতে যাস্। আমাকেও খেতের কাজের জন্য মজুর রাখতেই হয়। তুই এখন থেকে সুদের বদলে আমার এখানে কাজে লেগে যা। যখন সুবিধে হবে, আসল টাকাটা শোধ করে দিবি। মোট কথা হল, আমার টাকা মিটিয়ে না দিয়ে এখন আর তুই অন্য কোনো জায়গায় কাজ করতে যেতে পারবি না। তোর তো কোনো জমিজায়গাও নেই। এত বড়ো ঋণের বোঝা আমি কীসের উপর ভরসা করে ফেলে রাখব? তুই যে আমাকে মাসে মাসে সুদ দিয়ে যেতে থাকবি, এই দায়িত্ব কে নেবে? আর নিজে রোজগার করে যখন সুদটাও দিতে পারছিস না, তখন আসলের কথা আর কী বলব?

শংকর — মহারাজ, সুদের বদলে কাজ তো করব, কিন্তু খাব কী?

বিপ্রজি — তোর পরিবার রয়েছে, ছেলেরা রয়েছে। ওরা হাত-পা নিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে? কথা শোন, তোকে আধ সের যব রোজ দুপুরে খাওয়ার জন্যে দেব। বছরে একটা

কম্বল পাবি। একটা মেরজাইও বানিয়ে দেব, — আর কী চাস্! এটা ঠিকই যে, অন্য লোক তোকে ছ-আনা রোজ হিসেবে দেবে। তবে আমার অত গরজ নেই। আমি তো তোকে আমার টাকা শোধ করবার জন্য রাখছি।

শংকর কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে থেকে বলল — মহারাজ, এতো সারা জন্মের মতো গোলামি!

বিপ্রজি — গোলামি মনে করিস, গোলামি। মজুরি মনে করিস, মজুরি। আমার টাকা শোধ না করা পর্যন্ত তোকে আমি কখনও ছাড়ব না। তুই পালালে তোর ছেলেকে শোধ করতে হবে। হ্যাঁ, যখন কেউই থাকবে না, তখনকার কথা আলাদা।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলে না। মজুরের জামিন কে হবে? কোনো জায়গাও নেই, পালাবে কোথায়? পরের দিন থেকে সে বিপ্রজির ওখানে কাজ করতে শুরু করে দিল। সওয়া সের গমের জন্য সারা জীবনের গোলামির বেড়ি পায়ে পরতে হল। এই অভাগার এখন কোনো কিছু থেকে সান্ত্বনার কিছু থাকলে তা হল এই — এ আমার পূর্বজন্মের কর্মফল। তার স্ত্রীকে এমন সব কাজ করতে হল যা কোনো দিন করতে হয় নি। ছেলেরা খাবার জন্য ছটফট করত, কিন্তু চুপচাপ দেখা ছাড়া শংকরের আর কিছু করার ছিল না। ওই গমের দানা কোনো দেবতার অভিশাপের মতো সারাজীবন তার মাথা থেকে আর নামল না।

পাঁচ

বিপ্রজির ওখানে বিশ বছর গোলামি করার পর শংকর এই দুঃসহ সংসার থেকে বিদায় নিল। তবু সেই একশো কুড়ি টাকা তার মাথার উপর চেপে থাকল। পণ্ডিতজি ওই গরিব বেচারাকে ঈশ্বরের দরবারে কষ্ট দেওয়া উচিত মনে করলেন না। এতটা অবিবেচক, এতটা নির্দয় তিনি ছিলেন না। তাই শংকরের জোয়ান ছেলের ঘাড়ে হাত পড়ল। আজও সে বিপ্রজির ওখানে কাজ করে। তার মুক্তি কবে হবে, আদৌ হবে কিনা, তা ঈশ্বরই জানেন।

পাঠক! এই ঘটনাকে কপোলকল্পিত বলে মনে করবেন না। এটা সত্য ঘটনা। এরকম শংকর আর এরকম বিপ্রজি পৃথিবীতে কিছু কম নেই।

(সবা সের গেঁহু / ১৯২৪) অনুবাদ অমলকুমার রায়

তেঁতর*

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল ঠিক তাই হল। ঠিক সেইটাই হল যা বাড়ির সব লোক, বিশেষ করে প্রসূতি, চিন্তা করছিল। তিনটি পুত্রের পরে কন্যার জন্ম হল। আঁতুড় ঘরে মার আনন্দ নষ্ট হল, বাইরের উঠোনে বসে-থাকা মেয়ের বাবা নিরাশ হল। আঁতুড়ের দরজাতেই মেয়ের বাবার বৃধা মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। অনর্থ, ভীষণ অনর্থ। ভগবান বাঁচালে তবেই নিস্তার আছে। এতো মেয়ে নয়, রাক্ষুসি। হতভাগি এই ঘরেই জন্ম নিল। আসবি তো কিছুদিন আগে এলি না কেন। চরম শত্রুর ঘরেও যেন ভগবান এই রকমভাবে তিন ছেলের পর মেয়ের জন্ম না দেন।

বাবার নাম পণ্ডিত দামোদর দত্ত। শিক্ষিত লোক, শিক্ষা বিভাগেই চাকরি করেন। তিন ছেলের কোলে মেয়ে হলে সে যে হতভাগি হয়ে থাকে, হয় সে মাকে খায় না হলে বাবাকে, কিছু না হলে নিজেকেই — বহু যুগের এই সংস্কারকে দূর করেন কী করে? তাঁর বৃধা মা উঠতে বসতে নবজাত কন্যাকে দোষারোপ করতে লাগলেন — মুখপুড়ি, মুখপুড়ি! এখানে কী করতে এল কে জানে। কোনো বাঁজা মেয়েছেলের ঘরে গেলে তার দিন ফিরে যেত।

দামোদর দত্ত মনে মনে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাকে বোঝাতে লাগলেন, মা, ওসব তেঁতর টেঁতর কিছু নয়, ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হয়। ভগবান যদি চান সব ঠিক হয়ে যাবে। গাইয়ে মেয়েদের ডেকে আনো, নয়তো লোকে বলবে, তিন ছেলের বেলায় কেমন বুক ফুলিয়ে ঘুরত, এখন মেয়ে হয়েছে তো ঘরে যেন কী অনর্থই না হয়ে গেছে।

মা বলেলেন, এসব ব্যাপার তুই বুঝিস কী? এসব আমরা ভুগেছি। আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে। এই তেঁতরের জন্মের জন্যই তোর দাদু মারা গেল। তখন থেকে তেঁতরের নাম শুনলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে।

দামোদর জিজ্ঞেস করলেন — তা এর থেকে পার পাবার কোনো উপায় কী আছে?

মা বললেন — উপায় তো অনেকই বলা যায়। পণ্ডিতজিকে বললেই কোনো না কোনো উপায় বাতলিয়ে দেবেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না। আমি কোনটা না করেছি। তাতে পণ্ডিতজির ট্যাঁকই গরম হল কেবল, আমার কপালে যা ছিল তাই হল। এখন তো সব পয়সার জন্য পণ্ডিত। যজমান মরল কি বাঁচল বয়েই গেল। তাঁর দক্ষিণাটি পেলেই হল। তারপর একটু ধীরে বললেন, মেয়েটাতো রোগা- সোগাও নয়। ছেলে তিনটের থেকেও মোটা সোটা। বড়ো বড়ো

---

* তিন ছেলের পর মেয়ে কিংবা তিন মেয়ের পর ছেলে হলে তাকে বলে তেঁতর। এরকম সন্তানকে অশুভ বলে মনে করা হয়।

চোখ, পাতলা লাল ঠোঁট, যেন গোলাপের পাতা। ফর্সা রং, লম্বা নাক। স্নান করানোর সময় মুখপুড়ি কাঁদলও না। পিটপিট করে তাকাচ্ছিল, লক্ষণ মোটেও ভালো নয়।

দামোদরের তিন ছেলেরই গায়ের রঙ শ্যামলা, দেখতেও তেমন কিছু সুন্দর নয়। মেয়ের রূপের ব্যাখ্যান শুনে তাঁর চিত্ত কিছু প্রসন্ন হল। বললেন, মা, ভগবানের নাম করে গাইয়ে মেয়েদের ডেকে পাঠাও। গান বাজনা হতে দাও। বরাতে যা আছে, তা তো হবেই।

মা বললেন — মন চাইছে না করি কী!

দামোদর উত্তর দিলেন, গান না হলে কষ্ট তো কমবে না? কমবে কী? এত সহজে যদি পার পাওয়া যায় তবে গান করানোর দরকার নেই।

মা বলেন, ডাকছি বাবা, ডাকছি। যা হবার তো তো হয়েই গেছে।

আঁতুড় ঘর থেকে দাই চেঁচিয়ে বলল, বউমা বলছেন গান-টান করানোর দরকার নেই।

মা উত্তর দেন — ওকে চুপ থাকতে বল্। বাইরে বেরিয়ে খুশিমতো কাজ করবে। বেশি না, বারোটা দিন তো মোটে। খুব দাপিয়ে বেড়াত। এটা করব না, ওটা করব না! দেবদেবী আবার কী! পুরুষদের কথা শুনে শুনে সব বলে বেড়াত। এখন চুপ করে থাক তো! মেমসাহেবরা তো তেঁতরকে অশুভ বলে মানে না, সব কথাতেই তো মেমেদের মতো করে — এখন করুক না!

মা ঝিকে পাঠিয়ে দিলেন গানের মেয়েদের ডেকে আনার জন্যে। বলে দিলেন, যাওয়ার সময় যেন প্রতিবেশীদের খবরটা দিয়ে যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই চোখ মুছতে মুছতে এসে বড়ো নাতি জিজ্ঞেস করল, ঠাকুমা,কাল মার কী হয়েছে?

ঠাকুমা উত্তর দিলেন, মেয়ে হয়েছে, মেয়ে।

খুশিতে উছলে উঠল ছেলেটি। বলল, আ-হা-হা, নূপুর পায়ে ছুন ছুন্ন করে চলবে! আমায় একটু দেখাও না ঠাকুমা!

—আঁতুড়ের মধ্যে ঢুকবি? পাগল নাকি!

নাতির ঔৎসুক্য মোটেই কমল না। আঁতুড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, মা, আমাকে একটু বোনকে দেখাও না!

দাই বলল, বাচ্চা এখন ঘুমোচ্ছে।

ছেলে তবু বলে, কোলে করে একটু দেখাও না।

মেয়েটিকে দেখাতেই সে দৌড়ল ছোটো ভাইদের কাছে। তাদের ডেকে তুলে সুখবর শোনাতে লাগল।

একজন বলল, খুব ছোট্ট, না।

বড়ো ভাই বলল — একেবারে ছোটো, বড়ো একটা পুতুলের মতো। এমন ফরসা, মনে হচ্ছে কোনো সাহেবের মেয়ে। আমি ওকে নেব।

সব থেকে ছোটোটি বলল,আমাকেও এত্তু দেত্তে দাও।

তিনজনে মিলে চলল বোন দেখতে। তারপর লাফাতে লাফাতে ফেরত এল।

বড়ো ভাই বলল, কেমন চোখ বন্ধ করে পড়েছিল।

ছোটোটি বলল, আমাকেও এত্তু দিয়ো।

বড়ো আবার বলল, বরযাত্রী আসবে। হাতি-ঘোড়া আসবে,বাজনা বাজবে, আতসবাজি পুড়বে। ওঃ!

মেজো আর ছোটো ভাই এমন মগ্ন হয়ে গেছে যেন ওই মনোহর দৃশ্য তারা চোখের সামনে দেখছে। আনন্দে চকচক করছে তাদের চোখ।

মেজো বলল, ফুলঝুরি জ্বালানো হবে।

ছোটো বলল, আমিও ফুল নেব।

দুই

ষষ্ঠী হল। বারো দিনের কাজও হল।গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া, দানধ্যান সব কিছু হল, তবে সবই করতে হয় তাই করা, মনের খুশিতে নয়। মেয়ে দিন দিন দুর্বল কমজোরি হয়ে যেতে লাগল। বাচ্চার মা তাকে দুবেলা আফিম খাইয়ে দিত আর সে দিনরাত নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকত। নেশা একটু কাটলেই ক্ষুধায় কাতর হয়ে কান্না শুরু করত। তখন খানিক দুধ খাইয়ে আবার আফিম খাইয়ে দেওয়া হত। আশ্চর্যের ব্যাপার এবার বাচ্চার মায়ের বুকে দুধ এলো না। এমনিতেই তার দুধ আসতে দেরি হত। ছেলেদের সময় বাচ্চার মাকে এজন্যে নানারকম ওষুধপত্র খাওয়ানো হয়েছিল। সেও বার বার তার বুকে বাচ্চার মুখ লাগাত। এক সময় দুধ এসেও যেত। কিন্তু এখন এ সমস্ত কোনো চেষ্টাই করা হল না। ফুলের মতো শিশুটি শুকিয়ে যেতে থাকল। মা তো তার দিকেদেখতই না। দাই কখনও তুড়ি দিলে বা আদর করলে শিশুটির মুখে এমন করুণ বেদনার ছাপ দেখা যেত যে দাই চোখ মুছতে মুছতে দূরে সরে যেত। বাচ্চার মাকে কিছু বলার সাহস তার হত না।বড়ো ছেলে সিন্ধু বার বার বলত, মা, ওকে আমার কাছে দাও না। বাইরে থেকে খেলা করিয়ে আনি। মা তাকে ধমকে তাড়িয়ে দিত।

তিন-চার মাস হয়ে গেল। একদিন রাত্রে জল খেতে উঠে দামোদর দত্ত দেখেন মেয়ে জেগে রয়েছে। সামনের তাকে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বলছে। সে দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মেয়ে একমনে আঙুল চুষছে। শব্দ হচ্ছে চুকচুক করে। মুখে বেদনার আভাস। কিন্তু, না কাঁদছে, না হাত-পা ছুঁড়ছে। আঙুল চোষায় এমনই মগ্ন যেন সুধারস আছে সেখানে। মাতৃস্তনের দিকে সে আর মুখও ফেরায় না — যেন সেখানে তার কোনো অধিকার নেই, কোনো আশা নেই। দামোদরের দয়া হল। আমার ঘরে জন্ম নিয়ে কী দোষ করেছে বেচারি? আমার বা ওর মায়ের যদি কিছু হয় তাতে ওর অপরাধ কোথায়? কী এক অনিষ্টের কল্পনা করে আমি এর ওপর কী নিষ্ঠুরতাই না করছি। অমঙ্গল যদি কিছু হয়ই তার জন্য এর প্রাণ নিতে হবে? যদি অপরাধী কেউ থাকে তো সে আমার ভাগ্য। এই ছোট্ট বাচ্চাটার ওপর আমার নিষ্ঠুরতা ঈশ্বরের ভালো লাগছে? কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে দামোদর তাকে চুমু খেতে লাগলেন। এই প্রথম সত্যিকারের স্নেহ উপলব্ধি করতে পারল মেয়েটি। হাত-পা নেড়ে নানারকম শব্দ করতে লাগল সে,হাত বাড়াতে লাগল আলোর দিকে। যেন ওটাই তার জীবনের দীপশিখা।

সকালে মেয়েকে কোলে নিয়ে বাইরে এলেন দামোদর। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বারবার বললেন, পড়ে থাকতে দাও ওকে। কী এমন সুন্দর দেখতে! অভাগি দিনরাত জ্বালিয়ে খেল। মরেও না! দামোদর কান দিলেন না। মেয়েকে বাইরে নিয়ে এসে ছেলেদের সঙ্গে খেলাতে লাগলেন। বাড়ির সামনে কিছুটা ফাঁকা জমি। কোনো প্রতিবেশীর একটা ছাগল চরে বেড়াত সেখানে। এই সময়ও সেটা

চরছিল। দামোদর বড়ো ছেলেকে বললেন, সিধু, ছাগলটাকে ধর্ দেখি, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াই। ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে। এই ছোটো বোনটাকে দেখছিস? রোজ ওকে বাইরে এনে খেলাবি।

সিধু দুষ্টুমি করার উপায় পেল। তার ছোটো ভাইও দৌড়ল। দুজনে মিলে ছাগলটাকে ঘিরে ফেলল,তারপর নিয়ে এল তার কান ধরে টেনে। দামোদর বাঁটে বাচ্চার মুখ লাগিয়ে দিলেন। শিশুটি চুষতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে দুধ যেতে শুরু করল। যেন নিভন্ত প্রদীপে তেল দেওয়া হয়েছে। মেয়ের মুখ হাসি হাসি হয়ে উঠল। আজই প্রথম বোধ করি তার ক্ষুধা তৃপ্ত হয়েছে। বাবার কোলে হাত-পা নেড়ে খেলতে লাগল সে। ছেলেরাও তাকে নিয়ে খুব নাচাকোঁদা করতে লাগল।

সেই দিন থেকে সিধুর বিনোদনের একটা নূতন উপায় হল। ছোটো ছেলেরা এমনিতেই বাচ্চাদের খুব ভালোবাসে। কোনো পাখির বাসায় বাচ্চা দেখতে বারবার সেখানে যায়। দেখে মা কীভাবে বাচ্চাদের খাবার খাওয়ায়। কেমন করে বাচ্চাটা ঠোঁট ফাঁক করে, মুখে খাবার নেওয়ার সময় কেমন চিঁ চিঁ শব্দ করে, ডানা ফড় ফড় করে। তারপর নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা হয়। বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে দেখায়। সিধু তক্কে তক্কে থাকত। যেই তার মা রান্না করতে,কি স্নান করতে যেত, তখনই বোনকে নিয়ে চলে আসত। তারপর ছাগলটাকে চেপে ধরে তার বাঁটে বাচ্চার মুখ লাগিয়ে দিত। কখনও কখনও দিনে দু-তিনবার পর্যন্ত এই রকম হত। ছাগলটাকে ভুসি খাইয়ে খাইয়ে এমন বশ করে ফেলেছিল যে, সে নিজেই ভুসির লোভে চলে আসত এবং দুধ দিয়ে চলে যেত। এভাবে এক মাস চলল। মেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। মুখ হয়ে উঠল ফুলের মতো। চোখ হল ডাগর। শৈশবের সরল আভা সবার মনোহরণ করতে শুরু করল।

মেয়ের মা তাকে দেখে চমকে উঠত। কাউকে কিছু বলতেও পারত না। কিন্তু শঙ্কিত হত মনে মনে। এ তো মরবে না, আমাদের কাউকে মারবে। ঈশ্বর একে রক্ষা করছেন। দিন দিন ও ফুটে উঠছে — নয়তো এতদিনে তাঁর কাছে পৌঁছে যেত।

তিন

কিন্তু ঠাকুমার চিন্তা মায়ের থেকে কিঞ্চিৎ বেশি। তাঁর মনে হতে লাগল, মেয়ের মা মেয়েকে খুব দুধ খাওয়াচ্ছে — দুধ খাওয়াচ্ছে না সাপ পুষছে। শিশুটির দিকে চোখ তুলেও দেখতেন না তিনি। একদিন তিনি বলেই ফেললেন, মেয়েকে খুব যত্নআত্তি করছ, না? তা — তুমি তো মা, তুমি যত্ন করবে না তো কে করবে?

— ঈশ্বর জানেন মা, আমি ওকে দুই দিই না।

— আরে আমি কি তোমাকে মানা করছি? মিছিমিছি পাপের ভাগী হতে যাই কেন। তোমাদের কপালে যাই হোক না কেন, আমার তাতে কী এসে যায়।

— আপনি বিশ্বাস না করলে কী করি বলুন?

— আমাকে পাগল পেয়েছ, না? হাওয়া খেয়ে খেয়েই ও অমন হয়ে যাচ্ছে, তাই না?

— ভগবান জানেন মা, আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

বউ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা শাশুড়ি কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। তিনি ভাবলেন, বউ আমার আশঙ্কাকে ভিত্তিহীন ভাবছে। যেন মেয়েটার সঙ্গে আমার

শত্রুতা আছে। তাঁর মনে একটাই চিন্তা অঙ্কুরিত হতে লাগল — এই এখন কিছু একটা হয়ে যাক, তবেই এরা বুঝবে যে আমি মিথ্যে বলছি না। যাদের তিনি প্রাণের থেকেও ভালোবাসতেন, তাদেরই অমঙ্গল কামনা করতে লাগলেন — শুধুমাত্র এইজন্যে যাতে তার আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কেউ মারা যাক এটা তিনি চাইতেন না। কিন্তু এমন একটা কিছু হোক যাতে তিনি বলতে পারেন — দেখেছ, আমার কথা শুনলে না তো, এসব তারই ফল।

এদিকে বাচ্চার প্রতি শাশুড়ির বিদ্বেষ যত প্রকট হয়, মেয়ের প্রতি মায়ের স্নেহ তত বাড়তে থাকে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, কোনোমতে একটা বছর কেটে যাক, তারপর দেখব। কিছুটা মেয়ের আলাভোলা চেহারার জন্যে, কিছুটা আবার স্বামীর স্নেহ বাৎসল্য দেখেও তার উৎসাহ হত! অবস্থা অতি বিচিত্র হয়ে উঠল। না পারে মন খুলে ভালোবাসতে, না পারে পুরোপুরি নির্দয় হতে, না পারে হাসতে, না পারে কাঁদতে।

এই ভাবে কেটে গেল আরও দুটো মাস। কোনো রকম অনিষ্ট হল না। বৃথা শাশুড়ি কিন্তু অস্থিরতার চরমে। দু-চার দিনের জন্যে বউ-এর জ্বর পর্যন্ত আসে না যাতে তাঁর আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। দামোদর একদিনও সাইকেল থেকে পড়ে যান না, বউয়ের বাপের বাড়ির কারও মৃত্যু সংবাদও আসে না। একদিন দামোদর সোজাসুজি বলেই ফেললেন, ওসব মিথ্যা বিশ্বাস মা। পৃথিবীতে কারও তিন ছেলের পর মেয়ে হয় না? নাকি তাদের বাবা-মা সব মরে যায়? শেষে নিজের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য বৃথা এক উপায় বার করলেন। একদিন স্কুল থেকে ফিরে দামোদর দেখেন তাঁর মা অচেতন হয়ে খাটের উপর পড়ে রয়েছেন। স্ত্রী মালসায় আগুন নিয়ে সেঁক দিচ্ছেন তাঁর বুকে। ঘরের সব জানলা দরজা বন্ধ। ঘাবড়ে গেলেন। দামোদর জিজ্ঞাসা করলেন — কী হয়েছে, মা?

উত্তর দিলেন তাঁর স্ত্রী : দুপুর থেকে বুকের যন্ত্রণা হচ্ছে। খুব ছটফট করছেন।

দামোদর বললেন, আমি গিয়ে ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনি? দেরি করলে রোগ বেড়ে যেতে পারে। মা, কেমন আছ?

মা চোখ খুললেন। কাতরাতে কাতরাতে বললেন, খোকা তুই এসে গেছিস? আমি আর বাঁচব না, হায় ভগবান! আর আমি বাঁচব না। আমার কলজেতে যেন কেউ হুল ফোটাচ্ছে। এমন যন্ত্রণা আমার কখনও হয়নি। এত বয়স হল, এমন যন্ত্রণা আমি কখনও পাইনি।

দামোদর স্ত্রীকে বললেন, এই মুখপুড়ি যে কোন অশুভ মুহূর্তে জন্মেছিল!

দামোদরের মা বললেন, খোকা, যা করার সব ভগবানই করেন। ও বেচারি কী জানে। দেখো, আমি সেরে গেলে ওকে কষ্ট দিয়ো না যেন। ভালোই হয়েছে। বিপদ আমার ওপর এসেছে। অঘটন তো ঘটতই। আমার ওপর এসেছে এই ভালো হল। হায় ভগবান, আমি আর বাঁচব না।

দামোদর জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার ডেকে আনি? এক্ষুনি ফিরে আসব।

দামোদরের মায়ের ইচ্ছা শুধু নিজের কথার মর্যাদা আদায় করা। ছেলের টাকা খরচ করানোর কোনো ইচ্ছেই তাঁর নেই। তিনি বললেন, না না, ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে? সে তো আর ভগবান নয়? ডাক্তার কি আমাকে অমৃত পান করিয়ে দেবে? বরং দশ-বিশটা টাকা নিয়ে নেবে। ডাক্তার দিয়ে কিছু হবে না। খোকা, তুই জামাকাপড় ছাড়। আমার পাশে বসে ভাগবত পড়। আমি আর বাঁচব না, হায় রাম!

দামোদর বললেন, এই তেঁতর অতি খারাপ। আমি ভাবতাম এ সব বুঝি মিথ্যে বিশ্বাস।

তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন, এই জন্যেই আমি কোনোদিন ওর দিকে নজর দিইনি।

দামোদরের মা বললেন, খোকা, বাচ্চাদের ভালোভাবে রাখিস, ভগবান তোদের সুখে রাখুন। ভালোই হল বিপদটা আমারই ওপর দিয়ে এসেছে। তোদের চোখের সামনে আমি সঙ্গে যাব। ভগবান, অন্য কারও বিপদ হলে কী হত? ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন, হায় রাম!

দামোদর নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, তাঁর মা আর বাঁচবেন না। খুব দুঃখ হল তাঁর। তাঁর মনের কথা বলতে গেলে — মায়ের বদলে ওই বাচ্চা তাঁর চাই না। যে মা জন্ম দিয়েছেন, নানা দুঃখকষ্ট স্বীকার করেও তাঁকে মানুষ করেছেন, অকালে বিধবা হয়েও তাঁর লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেছেন — তাঁর কাছে একটা দুধের বাচ্চার মূল্য কী? ওই বাচ্চার হাতের এক গেলাস জলও তিনি খাননি। জামাকাপড় বদলে শোকাচ্ছন্ন হয়ে মায়ের মাথার কাছে বসে তিনি ভাগবত শোনাতে লাগলেন।

রাত্রে দামোদরের স্ত্রী রান্না করতে যাচ্ছিলেন। শাশুড়িকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, আপনার জন্য একটু সাবু করে নিয়ে আসি?

মা ব্যঙ্গ করলেন, বউমা, না খাইয়ে মেরো না। সাবু খাব কী! যাও, কয়েকটা লুচি ভেজে নিয়ে এসো। শুয়ে শুয়ে যা ইচ্ছা হয় খেয়ে নেব। কচুরিও করো কয়েকটা। মরবই যখন খাবারের জন্যে হা-হুতাশ করে মরব কেন? চট থেকে একটু ক্ষীরও আনিয়ে নাও। আর কি খেতে আসব কখনও? কটা কলাও এনো, কলা খেলে পেটব্যথা আরাম হয়।

খাওয়ার সময় ব্যথা সেরে গেল। কিন্তু আধঘণ্টা বাদেই আবার খুব জোরে শুরু হল। বৃদ্ধা যখন ঘুমোলেন তখন প্রায় মাঝরাত। এক সপ্তাহ এই রকম চলল। দিনভর শুয়ে থাকেন আর কাতরান। খাওয়ার সময় যন্ত্রণা একটু কমে। মাথার কাছে বসে দামোদর হাওয়া করেন আর আসন্ন মাতৃবিয়োগের শোকে অশ্রুপাত করেন। ঘরের ঝি সারা পাড়ায় খবর পৌঁছে দিল। প্রতিবেশীরা বৃদ্ধাকে দেখতে এল এবং যাবতীয় দোষ গিয়ে পড়ল শিশুটির ঘাড়ে।

একজন বলল, ভাগ্যিস ব্যাপারটা বুড়ির ওপর দিয়ে যাচ্ছে। নয়তো তেঁতর তার মা-বাপের কাউকে খেয়ে তবে শান্ত হয়। ভগবান করুন কারও ঘরে যেন তেঁতরের জন্ম না হয়।

আর একজন বলল, আমার তো তেঁতরের নাম শুনলেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। ভগবান আমাকে বন্ধ্যা রাখুন — কিন্তু তেঁতর যেন না দেন।

এক সপ্তাহ পরে বৃদ্ধার কষ্টের উপশম হল। মরার বাকি কিছু ছিল না। কিন্তু — সে তো পূর্বপুরুষদের পুণ্য প্রভাব। ব্রাহ্মণদের গোদান করা হল, চণ্ডীপাঠ হল — তবে সংকট কাটল।

(তেঁতর / ১৯২৪) অনুবাদ অনিরুদ্ধ মৈত্র

ডিক্রির টাকা

দুটি প্রাণীতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে যত রকমে অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব, তার সমস্তই ছিল নইম আর কৈলাসের মধ্যে। নইম ছিল দীর্ঘকায়, বিশাল এক মহীরুহ, আর কৈলাস উদ্যানের এক কোমল চারাগাছ। নইমের অনুরাগ ফুটবল-ক্রিকেটে, ভ্রমণে আর শিকারে, কৈলাসের নেশা বইয়ে। নইম এক ফুর্তিবাজ, বাকপটু, নির্দ্বন্দ্ব, সদাহাস্যময়, শৌখিন যুবক। ভবিষ্যতের চিন্তা সে কখনো করত না। বিদ্যালয় ওর কাছে খেলবার জায়গা ছাড়া আর কিছু নয়, মাঝে মাঝে বেঞ্চির উপর দাঁড়াবার জায়গাও বটে। অন্যদিকে কৈলাস এক আত্মমগ্ন, অলস যুবক, যে শরীরচর্চা থেকে কয়েক ক্রোশ দূর দিয়ে হাঁটে, আমোদ-প্রমোদকে এড়িয়ে চলে, চিন্তাশীল এবং আদর্শবাদী। ভবিষ্যতের স্বপ্নে সর্বদা মশগুল হয়ে থাকে। নইম এক বিত্তশালী, উচ্চপদস্থ পিতার একমাত্র পুত্র। কৈলাস এক সাধারণ ব্যবসায়ীর কয়েকটি সন্তানের অন্যতম। বই কেনার জন্যে ওর পর্যাপ্ত টাকা জুটত না, চেয়ে-চিন্তে কাজ চালাতে হত। এক জনের কাছে জীবন ছিল আনন্দের সুখস্বপ্ন, আরেক জনের কাছে তা সমস্যার বোঝা। তবু এত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। কৈলাস মরে গেলেও নইমের অনুগ্রহ-পাত্র হতে রাজি নয়, আবার নইম বরং মরে যাবে, তবু কৈলাসের সঙ্গে কোনোমতেই দুর্ব্যবহার করবে না। নইমের কল্যাণে কৈলাসও কখনো-সখনো মুক্ত নির্মল বায়ু সেবনে উজ্জীবিত হত, আবার নইমও কৈলাসের সাহচর্যে মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত। নইমের জন্যে উচ্চ রাজপদ সাজানোই ছিল, তার ভবিষ্যৎ তেমন কিছু দুস্তর সমুদ্র নয়। কৈলাসকে নিজের হাতে কুয়ো খুঁড়ে জল তুলে খেতে হবে। তার ভবিষ্যৎ এক ভয়ংকর যুদ্ধের মতো, যার কথা ভাবলেই ওর মানটা অশান্ত হয়ে ওঠে।

দুই

তৃতীয় বিভাগে পাশ করা সত্ত্বেও কলেজ থেকে বেরিয়েই প্রশাসনের এক উচ্চপদে নইম অধিষ্ঠিত হল। কৈলাস পাশ করল, প্রথম বিভাগে, কিন্তু শত দৌড়োদৌড়ি করে, জুতোর সুকতলা খইয়ে ফেলেও তার কোনো কাজ জুটল না। ক্রমে হতাশ হয়ে সে শরণ নিল আপন লেখনীর। একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করল। একজন নিল সরকারি কর্তৃত্ব যার লক্ষ্য শুধু অর্থ-সম্পদ, অপরজন গেল জনসেবার পথে যার পরিণাম বলতে খ্যাতি এবং দুর্দশা দুইই, উপরন্তু মাঝে-মধ্যে কারাবাসও জোটে। নিজের দপ্তরের বাইরে নইমের কোনো পরিচিতি নেই, কিন্তু ও থাকে নিজস্ব বাংলোতে, মোটরগাড়িতে হাওয়া খেতে চলে যায় নৈনিতাল। কৈলাস এদিকে গোটা অঞ্চলে সুপরিচিত অথচ

ওর বাসস্থান বলতে মাটির বাড়ি, বাহন হিসেবে শুধু নিজের দুটো পা। বাচ্চাদের জন্যে দুধ জোটানোও তার পক্ষে কঠিন হয়। শাকসবজিতে ছাঁটকাট করতে হয়। নইমের সব থেকে বড়ো সৌভাগ্য ওর সন্তান বলতে একটি; অপরপক্ষে কৈলাসের দুর্ভাগ্য ওর সন্তানের আধিক্য, যার ফলে সচ্ছলতার মুখ সে দেখতে পায় না। দুই বন্ধুতে চিঠিচাপাটি চলে। কখনো-সখনো দুজনের মোলাকাতও হয়ে যায়। নইম বলে — আর ভাই, তুমিই আছ ভালো। দেশ আর জাতির সেবা করছ। অথচ এদিকে আমাকে দিয়ে পেটপুজো ছাড়া আর অন্য কাজ হয় না। অবশ্য এই পেটপুজোও ওকে শিখতে হয়েছে অনেক দিনের কঠিন সাধনার দ্বারা। এখন খালি তা প্রয়োগের সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কৈলাস বেশ বুঝতে পারত যে, এটা নইমেব বিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। সে ভাবত — আমারই দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে নইম এইভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে। আর তাই তার কাছে নিজের প্রকৃত অবস্থাটা গোপন করার অর্থহীন প্রচেষ্টা করত সব সময়।

বিষ্ণুপুর রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেছে। রাজ্যের ম্যানেজার তাঁর নিজের বাংলোয়, দিনদুপুরে কয়েকশো লোকের চোখের সামনে খুন হয়েছেন। হত্যাকারী পলাতক, কিন্তু তা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সন্দেহ যে কুমার সাহেবের দুরভিসন্ধিতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কুমার বাহাদুর এখনও সাবালক হননি। রাজ্যের কাজকর্ম পরিচালিত হয় কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস দ্বারা। কুমার সাহেবের দেখাশোনার ভারও ছিল ম্যানেজারের ওপর। বিলাসপরায়ণ কুমার সাহেবের কাছে ম্যানেজারের এই অভিভাবকত্ব বড়োই বিসদৃশ ঠেকত। বছরের পর বছর ধরে চলে আসছিল এই মনকষাকষি। এমনকী, বারকয়েক কটু বাক্য বিনিময়ও হয়ে গেছে এ নিয়ে। কাজেই কুমার সাহেবের ওপর সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই ঘটনার তদন্তের জন্য জেলাশাসক মনোনীত করলেন মিরজা নইমকে। পুলিশের কোনো সাহেবকে দিয়ে তা করাতে গেলে কুমার বাহাদুরের সম্মানহানি হবার ভয় ছিল।

নইম দেখল নিজের কপাল ফেরানোর এই হল সুবর্ণ সুযোগ। সে ত্যাগীও নয়, জ্ঞানীও নয়। ওর চারিত্রিক দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে সবাই জানত, জানত না হাকিমরা। কুমার বাহাদুর ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তাই পেলেন। নইম বিষ্ণুপুরে পৌঁছতেই আদর-আপ্যায়নের ধুম পড়ে গেল। উপহার আসতে লাগল গাদা গাদা; তার আর্দালি থেকে শুরু করে চাপরাশি, পেশকার, সইস, বাবুর্চি, খিদমতগার সবারই খুব খাতিরযত্ন হতে থাকল, টাকাপয়সার আমদানি ভালো হতে লাগল। কুমার সাহেবের লোকজন রাতদিন তাকে ঘিরে থাকত, যেন জামাই এসেছে শ্বশুরবাড়ি।

একদিন সকালে কুমার সাহেবের জননী এসে নইমের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। নইম শুয়ে শুয়ে তামাক খাচ্ছিল। তপস্যা, সংযম আর বৈধব্যের এই তেজস্বিনী প্রতিমাকে সামনে দেখে সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

রানিমা তাঁর স্নেহসিঞ্চিত দৃষ্টিতে ওকে অভিষিক্ত করে বললেন — হুজুর, আপনার হাতেই এখন আমার ছেলের বাঁচামরা নির্ভর করছে। আপনিই ওর ভাগ্যবিধাতা। আপনি যে মায়ের সুযোগ্য পুত্র তাঁর দিব্যি দিয়ে আমি বলছি আমার ছেলেকে আপনি বাঁচান। আমি আমার সর্বস্ব, আমার ধনমান সমর্পণ করছি আপনার পায়ে।

দয়ার সঙ্গে স্বার্থবোধ সম্মিলিত হয়ে নইমকে একেবারেই বশীভূত করে ফেলল।

তিন

সেই দিনই কৈলাস এল নইমের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা হওয়া মাত্রই দুই বন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে। কথায় কথায় নইম এই সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত কৈলাসকে জানাল এবং নিজের কর্তব্যের ঔচিত্য ওর কাছে প্রমাণ করতে চাইল।

কৈলাস বলল — আমার মতে পাপ সব সময়ই পাপ, তা তাকে যে পোশাকেই সাজাও না কেন।

নইম — আমার কিন্তু মনে হয়,পাপ করলে যদি একজনের প্রাণ বাঁচে, তবে তা বিশেষ পুণ্য। কুমার সাহেবের এখন অল্প বয়স। অত্যন্ত ভদ্র, বুদ্ধিমান, উদার এবং হৃদয়বান মানুষ। আলাপ করে দেখো ওঁর সঙ্গে, ভালো লাগবে। স্বভাবেও অত্যন্ত নম্র। আসলে ওই শয়তান ম্যানেজারটাই নানান অছিলায় কুমার সাহেবকে হয়রানি করতে চেষ্টা করত। একটা মোটরগাড়ি কেনবার ব্যাপারে ওকে টাকা তো দিলই না, এমনকী, কোনো সুপারিশ পর্যন্ত করল না। আমি বলছি না যে, কুমার সাহেবের এই কাজ প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে, ওঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দ্বীপান্তরে পাঠানো উচিত, নাকি অভিযোগ খণ্ডন করে ওর প্রাণরক্ষা করা উচিত। আর তা ছাড়া, তোমাকে বলতে বাধা নেই, পুরো বিশটি হাজার টাকার তোড়া! আমাকে শুধু এইটুকু লিখে দিতে হবে যে, ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, এর সঙ্গে রাজাসাহেবের কোনো সম্পর্কই নেই। ব্যস! সাক্ষ্য প্রমাণ যা কিছু ছিল, তা আমি লোপাট করে দিচ্ছি। তাছাড়া কর্তারা অনেক ভেবেচিন্তেই আমাকে এই কাজের ভার দিয়েছেন। কুমার সাহেব হিন্দু অতএব কোনো হিন্দু কর্মচারীকে নিযুক্ত না করে জেলাশাসক নিযুক্ত করলেন আমাকে। ওঁরা ভেবেছেন সাম্প্রদায়িক প্রভেদ আমাকে তার প্রতি নিস্পৃহ করে রাখবে। দু-চার বার আমি,কখনো উপরওয়ালাদের আদেশে, কখনো বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছি। সেই থেকেই ওদের ধারণা আমি কট্টর হিন্দুবিদ্বেষী। হিন্দুরাও আমাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলেই মনে করে। ওদের এই ভুল ধারণা আমাকে ভবিষ্যতের আক্ষেপ থেকে বাঁচাতে পারবে। একেই বলে কপাল,না কী বলো?

কৈলাস — আর যদি জানাজানি হয়ে যায়?

নইম — তাহলে ধরে নিতে হবে আমার বোঝার ভুল হয়েছে, তদন্তের ত্রুটি — মানবপ্রকৃতির এক অনিবার্য স্বাভাবিকতা হিসেবেই তা গণ্য হবে। আমি তো আর সর্বজ্ঞ নই। আমি যে জেনেশুনে এমন করেছি তা কেউ ভাববে না। কোন ঘুষ-টুসের সন্দেহ পর্যন্ত জাগবে না। তুমি এর ব্যবহারিক দিকটা নিয়ে চিন্তিত হোয়ো না, শুধু নৈতিক দিকটা ভাবো। বলো, এটা নীতিসম্মত বটে কী না। শুধু নৈতিক বিচারে বলো, আধ্যাত্মিক বিচারের দরকার নেই।

কৈলাস — এর একটা অনিবার্য ফল এই হবে যে, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেও এই ধরণের অপরাধপ্রবণতা বাড়বে। টাকা থাকলে নিকৃষ্টতম পাপকেও চাপা দেয়া যায়, এই উপলব্ধির ফলটা কত মারাত্মক হবে ভেবে দেখ একবার।

নইম — আরে না, ওসব ভেবে ফায়দা নেই! ঘুষ দিতে পারলে শতকরা নব্বুইটা অপরাধই এখনও চাপা পড়ে যায়। তবু তো সকলের মনেই পাপের ভয় আছে।

অনেক সময় কাটল দুই বন্ধুর এই বির্তকে, কিন্তু কৈলাসের ন্যায়-বুদ্ধি নইমের হাসি আর বিদ্রুপের কাছে দাঁড়াতেই পারল না।

চার

বিষ্ণুপুরের এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে সমস্ত সংবাদপত্রে লেখালেখি শুরু হল। সব কাগজই সমস্বরে রাজাসাহেবকেই দোষী এবং গভর্নমেন্টকে তাঁর প্রতি অনুচিত পক্ষপাতী সাব্যস্ত করে দুষতে লাগল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও লিখে দিচ্ছিল যে, সমস্ত ঘটনাই এখনও বিচারাধীন। তাই এখনই এ নিয়ে কোনো মন্তব্য সমীচীন নয়।

মিরজা নইম তার তদন্তকে একটা যুক্তিসিদ্ধ রূপ দিতে পুরো একটা মাস সময় নিল। যখন ওর রিপোর্ট প্রকাশিত হল, ঝড় উঠল রাজনৈতিক আকাশে। জনগণের সন্দেহ বহুগুণ বেড়ে গেল।

কৈলাসের সামনে এবার এক দুরূহ সমস্যা।এতদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে ও মৌনী ছিল। কী লিখবে তা ভেবে উঠতে পারছিল না। গভর্নমেন্টের পক্ষ অবলম্বন করার অর্থ নিজের অন্তরাত্মাকে পদদলিত করা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকিয়ে দেয়া। কিন্তু নির্বাক থাকা যে আরও বেশি অপমানজনক। শেষমেশ যখন ওর সমবৃত্তির লোকেরা ঠারেঠোরে শোনাতে লাগল যে, ওর এই নীরবতা নিরর্থক নয় মোটেই, তখন তা সহ্য করা ওর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠল। ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধ এবং জাতীয় কর্তব্য — এই দুই-এর মধ্যে শুরু হল ভীষণ টানাপোড়েন। ওর হৃদয় থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে, নিঃশেষে নির্বাসিত করতে হবে সেই মৈত্রীর বীজ, যা অঙ্কুরিত হয়েছিল আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, তারপর কালক্রমে এতদিনে যা ঘনপল্লবিত সুবিশাল এক মহীরুহ। তার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী সেই বন্ধু,যার উদার হৃদয় সবসময় ব্যগ্র থাকত তার সাহায্যের জন্যে,যার বাড়িতে গেলে ও নিজের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ভুলে থাকতে পারত, যার উষ্ণ আলিঙ্গনে বিদূরিত হত তার সমস্ত কষ্ট, যার দর্শনমাত্রেই ওর মনে ফিরে আসত আশ্বাস, দৃঢ়তা আর মনোবল,তার সেই পরম বন্ধুর অনিষ্ট করতে হবে। ভাগ্যদোষে এই সম্পাদকীয় কাজে ভিড়তে হয়েছে, নইলে আজ এই নীতির সংকটে পড়তে হত না। কী জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে ওর সঙ্গে! আর বিশ্বাসই হল বন্ধুত্বের মূল কথা। নইম আমাকে বিশ্বাস করে, আমার কাছে কোনোকথাই লুকোয় না। ওর এই গোপন কথা যদি আমি প্রকাশ করে দিই তা হলে তা হবে ঘোর অন্যায়। না না, আমি বন্ধুত্বের অমর্যাদা করতে পারব না। ওর চরিত্রে কালি ছিটোতে পারব না। বন্ধুত্বের মাথায় বজ্রাঘাত করতে পারব না কিছুতেই। ঈশ্বর না করুন আমার দ্বারা নইমের কোনো ক্ষতি হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ যদি আমার কোনো সংকটকাল উপস্থিত হয়, তবে নইম আমার জন্যে দরকার হলে প্রাণ দিতে পারে। এমন বন্ধুকে আমি সংসারের সমক্ষে লাঞ্ছিত করব, তার গলায় কুঠারাঘাত করব! ঈশ্বর, তেমন দিন যেন না আসে।

আবার জাতীয় কর্তব্যের পক্ষেও যুক্তির অভাব ছিল না। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ঐতিহ্যগত ভাবে জাতির সেবক। তারা যা কিছু দেখে বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে। তারা যা কিছু বিচার করে জাতীয়তাবোধেই করে। সর্বদা বৃহত্তর জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিচরণ করার ফলে ব্যক্তির গুরুত্ব ওদের কাছে লঘু হয়ে যায়। ব্যক্তিকে ওরা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য বোধ করে। ওদের আদর্শের প্রথম কথাই হল জাতীয়তার পায়ে ব্যক্তিত্বের বলিদান। ওদের জীবনের লক্ষ্য সেই সব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ, যাঁরা দেশ গঠনের ব্রতে ব্রতী হয়েছেন, যাঁদের কীর্তি চিরস্থায়ী হয়েছে, যাঁরা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছেন। ওরা যথাসম্ভব এমন কোনো কাজ করেন না যার ফলে ওদের পূর্বসূরীদের গৌরবগাথায় কালিমা পড়তে পারে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট নামডাক ও প্রতিষ্ঠা ছিল কৈলাসের। ওর মতামত যথেষ্ট সমাদরে গৃহীত হত। ওর নির্ভীক লেখনীপ্রসূত রচনাসমূহ ওকে সম্পাদক সমাজের অগ্রণী নেতার স্থান করে দিয়েছিল। কাজেই এই ব্যাপারটাতে বন্ধুত্বের প্রশ্নটা যে কেবলমাত্র ওর নীতি ও আদর্শের বিরোধী তাই নয়, ওর মানসিকতারও বিরোধী। এতে ওর অসম্মান হচ্ছিল, ভীরুতা প্রকাশ পাচ্ছিল। এতে কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুতি এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক গগন থেকে চিরদিনের মতো নির্বাসনের আশঙ্কা ফুটে উঠেছিল। একজন ব্যক্তি, তা যতই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হোন না কেন, রাষ্ট্রের কাছে তার মূল্য কতটুকু? নইমের থাকা না থাকায় দেশের কিছু এসে যায় না। কিন্তু শাসক-শক্তির নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচারের প্রতিবাদ না করলে তা রাষ্ট্রের পক্ষে ভয়ংকর ক্ষতিকারক হতে পারে।

নিজের লেখার কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটল কি ঘটল না এ নিয়ে তার মোটেই মাথাব্যথা ছিল না। সম্পাদকদের নিজেদের কাছে নিজেদের লেখা সিংহনাদের মতোই মনে হয়, তারা ভাবে যে, আমার কলমের জোরে শাসনব্যবস্থা থরহরি কাঁপবে, দুনিয়াটা উলটে যাবে। আমার কলমের জোরে থরথরিয়ে কেঁপে উঠবে দুনিয়া, আর আমার ভাবধারা প্রকাশিত হলেই বিপ্লব ঘটে যাবে। নইম আমার বন্ধু, কিন্তু দেশ যে আমার ইষ্টদেবতা। বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে কি শেষে আমি আমার দেবতার কাছে বিশ্বাসঘাতক হব?

কটা দিন কৈলাসের এই ব্যক্তিগত দায় ও জাতীয় কর্তব্যবোধের মধ্যে চলল জোর টানাহেঁচড়া। অবশেষে ব্যক্তি পরাস্ত হল জাতির কাছে। সে ঠিক করল যে, এই রহস্যের আসল চেহারা সে উন্মোচন করবে। শাসনযন্ত্রের কর্তব্য কী হওয়া উচিত তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। শাসন বিভাগের কর্মচারীদের স্বার্থলোলুপতার নমুনা তুলে ধরবে, দুনিয়াকে দেখিয়ে দেবে সরকার কাদের কান দিয়ে শোনে, কাদের চোখ দিয়ে দেখে। অপদার্থতা, অযোগ্যতা আর দুর্বলতা সপ্রমাণ করার এমন উদাহরণ আর কী হতে পারে? নইম আমার বন্ধু থাক না। কিন্তু জাতির কাছে সে কতটুকু! ওর একার ক্ষতির আশঙ্কায় জাতীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব, নিজের অন্তরাত্মাকে কুলষিত করব, কলঙ্কিত করব স্বাধীনতাকে?

হায়, প্রাণপ্রিয় নইম! আমাকে মাপ করো ভাই। আজ তোমার মতো রত্নতুল্য বন্ধুকেও সঁপে দিতে হচ্ছে কর্তব্যের যূপকাষ্ঠে।

পরদিন থেকেই কৈলাস এ ব্যাপারে নিয়ে লেখালেখি শুরু করল। যা কিছু সে নইমের কাছে শুনেছিল, তার প্রত্যেকটি কথাই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে লাগল কাগজে। ঘরের শত্রু বিভীষণ কিনা! অন্য সম্পাদকেরা যেখানে অনুমান, তর্ক আর যুক্তির মারপ্যাঁচে নিজেদের কেরামতি জাহির করতে চাইত আর তা করতে গিয়ে অনর্গল কত হাজারো বাজে কথাই না লিখত, সেখানে কৈলাসের এই বর্ণনা একেবারে প্রত্যক্ষ — প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ। ওর আনুপূর্বিক সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনার নির্ভীকতা একেবারে আমোঘ সত্যের মতোই মনে হত। তার প্রত্যেকটি রচনাই সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ হত ভীষণভাবে।

নইমকে সে ছেড়ে কথা কয় না, তার স্বার্থপরায়ণতা নিয়েও খুব একচোট নিল। এমনকী, এই জঘন্য অপকর্মটাকে চাপা দেবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল, তার সঠিক অঙ্কটাও সে লিখে দিল কাগজে। ব্যাপারটাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য সে নইমের

সঙ্গো এক রাষ্ট্রীয় গুপ্তচরের কথা বানাল যে নাকি নইমকে ওই টাকাটা নিতে দেখেছে। শেষমেশ সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে বসল যে সাহস থাকে তো তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক। এতেই শেষ নয়, নইমের সঙ্গো তার যে এ নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল সেটাও একেবারে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করে দিল। নইমের কাছে রানির আগমন, তার হাতেপায়ে ধরে কান্না, নানা রকম উপহার নিয়ে স্বয়ং কুমার সাহেবের আগমন, এ সমস্ত কিছুই তার রচনায় একেবারে গোয়েন্দা কাহিনীর আকর্ষণ সৃষ্টি করল।

তার এই সমস্ত লেখা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো রাজনৈতিক জগতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা সরকারি আমলাদের ওপর বেশ একহাত নেওয়ার চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেল। জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ জমায়েত হতে লাগল শাসনব্যবস্থার এই জঘন্য দুর্নীতিপরায়ণতার বিরুখে। ব্যবস্থাপক সভাতেও কয়েকজন সদস্য এ নিয়ে আলোচনার দাবি জানাতে লাগলেন সরবে। শাসকদলের মুখে এতটা চুনকালি কোনোদিনও পড়েনি এর আগে। শেষ পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে ওরা মিরজা নইমকে দিয়ে কৈলাসের বিরুখে মানহানিকর মোকদ্দমা রুজু করানো ছাড়া গত্যন্তর খুঁজে পেল না।

পাঁচ

কৈলাসের বিরুখে অভিযোগ দায়ের করা হল। মিরজা নইমের পক্ষ নিল স্বয়ং সরকার। কৈলাসের পক্ষে সে নিজেই। বড়ো বড়ো ন্যায়রক্ষকরা (উকিল ব্যারিস্টার প্রভৃতি) কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কৈলাসের হয়ে সওয়াল চালাতে অস্বীকার করল। অনন্যোপায় বিচারককে তখন বাধ্য হয়েই, আইনে মঞ্জুরি না থাকা সত্ত্বেও, কৈলাসকে তার নিজের হয়ে সওয়াল করবার অনুমতি দিতেই হল। মাসের পর মাস চলল সওয়াল। জনসাধারণের মধ্যে একটা কী হয় কী হয় ভাব। প্রতিদিন হাজারে হাজারে মানুষ আসতে লাগলেন আদালতে। বাইরে বাজারে এই অভূতপূর্ব মোকদ্দমার বিবরণ পড়বার জন্য সংবাদপত্র লুঠ হতে থাকল। চতুর পাঠকরা তাদের একবার পড়ে-ফেলা কাগজ থেকেই দুগুণ পয়সা কামাতে লাগল রাতারাতি। কেননা ততক্ষণে কাগজওয়ালাদের কাছে কাগজ যে আর নেই। যে সমস্ত ব্যাপার এতদিন মুষ্টিমেয় জনাকয় লোক ছাড়া কেউ জানতেনই না, আজকাল তারই ওপর মতামত জাহির হতে লাগল যত্রতত্র।

মানসম্মান নিয়ে এতটা বিব্রত নইমকে কখনো এর আগে হতে হয়নি। পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে সর্বত্র একই আলোচনা। তারই ওপর কেন্দ্রীভূত হতে লাগল জনসাধারণের যাবতীয় বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ। তারপর এল সেই দিন। সেই কখনও ভুলতে না-পারা সেই দিনটা—যেদিন দুই সত্যিকারের বন্ধু, পরস্পরের বিপদে প্রাণ দিতে-পারা দুই বন্ধু — মুখোমুখি দাঁড়াল কাঠগড়ায়, আর কৈলাস মিরজা নইমকে জেরা করতে শুরু করল। বুকে এত অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল কৈলাসের যেন সে নইমের ঘাড়ে তরোয়ালের কোপ বসাতে চলেছে। আর নইমের তো এটা অগ্নিপরীক্ষা। যন্ত্রণার স্পষ্ট ছাপ দুজনারই মুখে। একজন আত্মগ্লানিতে ভুগছে, অপরজন আশঙ্কায়। নইম বারে বারে চেষ্টা করছে প্রসন্ন থাকতে, মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে সুখের হাসি। কিন্তু কৈলাস — আহ্‌, সে বেচারার মনে যা হচ্ছে, তা আর কে বুঝবে?

কৈলাস জিজ্ঞাসা করল — আপনি কি স্বীকার করেন যে, আপনি আর আমি একই সঙ্গে পড়তাম?

নইম — নিশ্চয়ই স্বীকার করি।

কৈলাস — আমাদের এত ঘনিষ্ঠতা ছিল যে দুজনের মধ্যে কোনো আড়াল ছিল না কখনোই — এটা স্বীকার করেন?

নইম — নিশ্চয়ই স্বীকার করি।

কৈলাস — সেই সময় কি আপনি আমায় বলেননি যে, কুমার সাহেবের প্ররোচনাতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে?

নইম — কখনোই নয়।

কৈলাস — আপনার মুখ থেকে কি একথা উচ্চারিত হয়নি যে, বিশ হাজার টাকা উৎকোচের বন্দোবস্ত আছে?

নইম একবারও ইতস্তত করল না, একটু ঘাবড়ালও না। ওর রসনায় এতটুকু দ্বিধাও প্রকাশ পেল না,গলা কেঁপে উঠল না একরত্তিও। কোনো রকম অশান্তি, অস্থিরতা বা অপ্রস্তুত ভাব দেখা গেল না ওর মুখে। নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে। কৈলাস খুব ভয়ে ভয়েই এ প্রশ্নটা করেছিল। ওর ভয় হচ্ছিল পাছে নইম একথার কোনো উত্তর দিতে না পারে, পাছে সে ভেঙে পড়ে। নইম কিন্তু নিঃশঙ্ক গলায় উত্তর দিল — মনে হচ্ছে আপনি স্বপ্নে আমাকে একথা বলতে শুনেছেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কৈলাস স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর বিস্ময়ের দৃষ্টিতো নইমের দিকে তাকিয়ে বলল — আপনি কি আমাকে একথাও বলেন নি যে, ইতিপূর্বেই আপনি দু-চারটি ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন এবং সেই কারণেই আপনাকে হিন্দু-বিদ্বেষী ধরে নিয়েই এবারে এই মামলার তদন্তের ভার আপনার ওপর দেয়া হয়েছে?

এতেও নইম বিচলিত হল না এতটুকুও। সম্পূর্ণ শান্ত, স্থির গলায় সে বলল — আপনার কল্পনাশক্তি সত্যিই অসাধারণ। এত বছর আপনার সঙ্গে মিশছি, কিন্তু কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝতেই পারিনি যে, আপনি এত চমৎকার গল্প বানাবার ক্ষমতা ধরেন।

কৈলাস আর একটাও প্রশ্ন করল না। নিজের পরাজয়ে তার তত দুঃখ হচ্ছিল না, যতটা হচ্ছিল নইমের এই চারিত্রিক অধোগতি দেখে। সে ভাবতেও পারেনি যে, কোনো মানুষ তার নিজেরই মুখ থেকে বেরোনো কথাও এমন নির্বিকার ভাবে বেমালুম অস্বীকার করে যেতে পারে, তাও আবার এমন একজনের মুখের ওপর যাকেই সে কিনা কথাগুলো বলেছিল। মানসিক দুর্বলতার পরাকাষ্ঠা। সেই নইম, যার অন্তর-বাহির সর্বদা খোলামেলা, একাকার ছিল, যার চিন্তায় আর কাজে কোনোদিন কোনো ফারাক থাকত না, যার মুখের কথাই ছিল মনের আন্তরিকতার দর্পণ, সেই সরল,আত্মাভিমানী, সত্যপ্রিয় নইম এতটা ধূর্ত, এত শঠ কী করে হয়ে উঠতে পারল? দাসত্বের দায়ে মানুষ কি তার মনুষ্যত্বও খুইয়ে বসবে? নাকি এই ব্যবস্থাটাই সমস্ত সদ্‌গুণকে নষ্ট করে দেয়ার একটা যন্ত্রবিশেষ?

আদালত নইমকে কুড়ি হাজার টাকার ডিক্রি দিল। বজ্রপাত ঘটল কৈলাসের মাথায়।

ছয়

মামলার এই পরিণতিতে আবার তোলপাড় হল রাজনৈতিক জগৎ। সরকারপক্ষীয় কাগজগুলো কৈলাসকে ধূর্ত, প্রবঞ্চক বলে প্রচার করতে লাগল। অন্যদিকে জনগণের পক্ষাবলম্বী কাগজগুলো

নইমকে বলল শয়তান। নইমের এই দুঃসাহসিক অপরাধ আইনের চোখে বেকসুর খালাস পেলেও জনগণের বিচারে ওকে আরো হীন প্রতিপন্ন করে দিল। কৈলাসের কাছে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি আর তার আসতে লাগল সহানুভূতি জানিয়ে। পত্রপত্রিকায় ওর ন্যায়নিষ্ঠা এবং নির্ভীকতার প্রশংসা হতে থাকল শতসহস্র মুখে। স্থানে স্থানে সভা সমাবেশ করে আদালতের এই অন্যায় বিচারে রীতিমত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে হতে লাগল। কিন্তু শুধু কথায় তো আর চিড়ে ভেজে না। ডিক্রির টাকা কোথা থেকে আসবে? তাও আবার কমসম কিছু নয়, বি-শ হাজার!

আদর্শবাদিতার মূল্য এমনই, দেশসেবার মহার্ঘ পুরস্কার। বিশ হাজার। এত টাকা কৈলাস কোনোদিন চোখেও দেখেনি, আর আজ তাকেই দিতে হবে সেই টাকা। কোথা থেকে দেবে সে? এতগুলো টাকা, শুধুমাত্র এর সুদ থেকেই তার জীবিকানির্বাহ হতে পারে অক্লেশে। নিজের কাগজে নিজের এই দুরবস্থার কাঁদুনি গেয়ে চাঁদা সংগ্রহে ওর প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। আমি আমার পাঠকদের মতামত নিয়ে তো এই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইনি। নিহত ম্যানেজারের হয়ে ওকালতি করার জন্য কেউ আমাকে তাগাদাও দেয়নি। আমি আমার নিজ কর্তব্যবোধেই এ কাজ বেছে নিয়েছি। যে কাজের দায়দায়িত্ব একা আমার, সে দায় গ্রাহকদের ওপর চাপাব কেন? এ অন্যায়। হয়তো পাঠক সমাজের কাছে সমস্ত বিবরণ জানিয়ে হাত পাতলে দু-চার হাজার টাকা উঠে আসবে, কিন্তু সেটা সম্পাদকীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ হবে। আমার সুনামে কালি পড়বে। অন্যদের এমন কথা বলার সুযোগ দেব কেন যে, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজে নাম কুড়োচ্ছে। নিজের অবস্থা বুঝে কাজে নামা উচিত ছিল। আমার দুঃসাহসিকতার জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা, এর দায় অন্যদের ঘাড়ে চাপাব কেন? চাই কি আমার কাগজ বন্ধ হয়ে যাক, আমাকে হাজতে নিয়ে ভরুক, আমার বসতবাড়ি ক্রোক হয়ে যাক, বাসনকোশন, আসবাব সব নিলামে চড়ুক,সব সইব। যা কিছু হবে, সহ্য করতেই হবে তা। কিন্তু কিছুতেই কারও কাছে হাত পাতব না।

সূর্যোদয়ের লগ্ন তখন। পূর্ব দিগন্ত থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে রক্তিমাভা, যেন কারো অপ্রতিরোধ্য অশ্রুর রাশি। কারও করুণ ক্রন্দনধ্বনির মতো ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ফুসফুসে ঢুকছে। সামনের মাঠটা যেন কোনো দুঃখীর হৃদয়, অহরহ আলোর তির এসে তাকে বিঁধছে। ঘরে থমথম করছে নিস্তব্ধতা, বুঝি তা গৃহস্বামীর গোপন বেদনার ভারে নীরব। শিশুদের কলরোল নেই, নেই স্নেহময়ী জননীর ললিত ঝংকার। বাতি যখন নিবেই থাকে, তখন ঘরে কোথায় পাবে তার প্রকাশ? এতো আশার প্রভাব নয়, এ যেন থরথর করছে শোক। আজকেই যে ক্রোকের পেয়াদা আসবে কৈলাসের যাবতীয় সম্পত্তি নিলাম করবার জন্য।

এই দুঃসহ অন্তর্বেদনায় কাতর হয়ে কৈলাস ভাবল — আহ্! আজই আমার জীবনের অন্তিম দিন। যে বাড়িটা গড়ে তুলতে ক্ষয় হয়ে গেছে জীবনের পঁচিশ-পঁচিশটা বছর, তা আজ বেহাত হয়ে যাবে। কাগজটার মাথায় নেমে আসবে খড়্গাঘাত, উপহাস আর অপমানের শৃঙ্খল পায়ে পায়ে বেঁধে ফেলবে আমার সমস্ত কিছু। মুখে কালি পড়বে, ছত্রখান হয়ে যাবে শান্তির নীড়। শুকনো ফুলের মতো ঝরে পড়ে যাবে এই শোকাহত পরিবারের মানুষগুলো। কোথাও এতটুকু আশ্রয় জুটবে না কারও।...মানুষের স্মরণশক্তি কিছু চিরস্থায়ী নয়। আমার আজকের সুকৃতি দুদিন পরেই তলিয়ে যাবে বিস্মৃতির অন্তরালে। কারও কোনো দুঃখ থাকবে না, আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে দুফোঁটা চোখের জল ফেলারও কেউ থাকবে না।

সহসা তার মনে পড়ে গেল যে, আজকের কাগজে সম্পাদকীয়টা লিখে ফেলতে হবে। শুভানুধ্যায়ী পাঠকদের জানিয়ে দিতে হবে এই কাগজের আজই শেষদিন, আর কোনোদিন তাদের সেবায় লাগার সৌভাগ্য তার হবে না। অনেক ভুলত্রুটি হয়তো হয়েছে, এতদিন সে সবের জন্যে আজ ক্ষমা চাইছি। আমার প্রতি আপনাদের যে সমবেদনা এবং সহৃদয়তার পরশ আমি পেয়েছি, তার জন্যে আপনাদের কাছে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। কারও সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। এই যে আজকের অকালমৃত্যু, এর জন্যেও আমার কোনো দুঃখ নেই, কেননা এই সৌভাগ্যজনক পরিণাম তো তাদের সকলের জন্যে যারা আপন কর্তব্যে অবিচল থাকতে চায়। দুঃখ বা আপশোশ শুধু একটাই, আমি জাতির জন্যে এর বেশি কিছু করে যেতে পারলাম না। এইভাবে সমস্ত আদ্যন্ত ছকে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল কৈলাস, এমন সময় মনে হল কে যেন আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। মিরজা নইম। সেই হাসিখুশি চেহারা, সেই মৃদু মৃদু হাসি, সেই চঞ্চল দুটি চোখ। এসেই সে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল কৈলাসকে।

কৈলাস নিজেকে মুক্ত করতে করতে বলল — কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এসেছে বুঝি? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা?

নইম তাকে আরও সবলে জড়িয়ে ধরে বলল — তা নয়তো কি? ভালোবাসার ওটাই তো মজা।

কৈলাস — একদম ঠাট্টা করো না বলে দিলাম। মেজাজ ঠিক নেই, মেরে বসব কখন।

নইমের চোখ জলে ভরে উঠল। বলল — ওরে শয়তান, আমি যে তোর মুখ থেকে এইরকম কটু কথাই শুনতে চাইছিলাম। যত খুশি রাগ করো, যা খুশি গালি দাও, এসবই এখন আমার কাছে গানের চাইতেও মিষ্টি লাগছে।

কৈলাস — আর একটু পরেই যখন আদালতের ক্রোকের পেয়াদা এসে আমার ঘর-গেরস্থালি সব নিলামে চড়াবে, তখন কেমন লাগবে? বলো, জবাব দাও। নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে তো বেরিয়ে এলে খুব।

নইম — কেন, আমরা দুজনে মিলে খুব করে হাততালি দেব আর ওকে বাঁদর-নাচ নাচাব।

কৈলাস — তুই এবার সত্যি সত্যিই মার খাবি আমার কাছে, শয়তান। আমার বাচ্চাগুলোকে দেখেও তোর দয়া হল না?

নইম — এসেছিলে কেন আমার সঙ্গে টক্কর লাগাতে? একটা সময় ছিল, যখন বাজি নাচছিল তোমারই কপালে। এবার আমার পালা। তুমি ফাঁকফিকির দেখলে না, আমার ওপর ঘা দিলে।

কৈলাস — ওইরকম নির্লজ্জের মত সত্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

নইম — আমার কাজই হল সত্যের টুঁটি চেপে ধরা।

কৈলাস — এখন একটা গোটা পরিবার তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিই, তবে তুমি বুঝবে ঠ্যালা। আয়তনে আমি তোমার আর্ধেকও নই, কিন্তু সন্তানোৎপাদনে তোমার মতো তিন তিন জনের চেয়ে বেশি। সাত সাতটা বাচ্চা, কম-বেশি নয়, হুঁ!

নইম — আচ্ছা, কী ব্যাপার, কিছু খাওয়াবে টাওয়াবে তো, না কি, শুধুই পোড়াকপালের দুঃখের গানই গেয়ে যাবে? দিব্যি গেলে বলছি, খুব খিদে পেয়েছে। বাড়ি থেকে না খেয়ে বেরিয়েছি।

কৈলাস — এবাড়িতে আজ একাদশী চলছে। সবাই শোকে অভিভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে আদালতের জল্লাদের। খাওয়াদাওয়া? তোমার ঝোলায় যদি কিছু থাকে তো বার কর বরং, আজকের মতো একসঙ্গে বসে খাই, তারপর সারা জীবনভর তো কাঁদতে হবেই।

নইম — আর কখনো এইরকম ধৃষ্টতা করবে না তো?

কৈলাস — আরে, ও জিনিসটা তো শরীরের প্রতি রোমকূপে ছড়িয়ে আছে। যতদিন পর্যন্ত সরকার তার পশুবল দিয়ে আমাদের শাসন করবে, আমি তার বিরোধিতা করব। দুঃখ একটাই, আর কোনোদিন আমার সে সুযোগই আসবে না। কিন্তু তোমার কুড়ি হাজারের মধ্যে কুড়িটা টাকাও পাবে না, এই বলে দিলাম। এ বাড়িতে রদ্দি জিনিস ছাড়া মূল্যবান কিছুই নেই।

নইম — ঠিক আছে, আমি ওই বিশ হাজারের বদলে তোমার কাছ থেকে পাঁচগুণ উশুল করে নেব। তুমি ভেবেছটা কী?

কৈলাস — হাত ধুয়ে বসে থাক।

নইম — আমার টাকার প্রয়োজন। এসো একটা বোঝাপড়ায় আসা যাক।

কৈলাস — কুমার বাহাদুরের বিশ হাজার টাকা খেয়েছ, এতেও সন্তুষ্ট নও। বদহজম হয়ে যাবে যে।

নইম — টাকা পেলেই টাকার খিদে বাড়ে, তৃপ্তি হয় না কখনো। এসো, বোঝাপড়া করে নেয়া যাক, সরকারি কর্মচারীদের হাতে পড়লে ভুগতে হবে তা নইলে।

কৈলাস — আরে বাবা, বোঝাপড়াটা করব কী দিয়ে? এখানে কাগজের গাদা ছাড়া তো আর কিছুই নেই।

নইম — আমার ঋণ মেটাতে ওই যথেষ্ট। বেশ, এসো, এভাবে করা যাক যে, আমি যা জিনিস চাইব তা নিয়ে নেব, কেমন? পরে কিন্তু আপশোশ করবে না।

কৈলাস — অরে ভাই, তুমি গোটা দপ্তরটাই নিয়ে যাও না মাথায় করে, ঘরবাড়ি নাও, আমাকেও ধরে নিয়ে চলো, আর মিষ্টি খাওয়াও। দিব্যি গেলে বলছি, টুঁ-শব্দও করব না।

নইম — না, আমি শুধু একটা জিনিস চাই, একটা মাত্র জিনিস।

কৈলাসের কৌতূহলের আর সীমা রইল না। সে ভাবতে লাগল, আমার কাছে কী এমন মহামূল্য বস্তু আছে? ও আমাকে মুসলমান হতে বলবে না তো? এই এক বস্তু ধর্ম, যার দাম এক থেকে অসংখ্য যা খুশি হতে পারে। দেখাই যাক, হজরত কী বলেন?

সে জিজ্ঞেস করল — বস্তুটি কী?

নইম — মিসেস কৈলাসের সঙ্গে একান্তে এক মিনিট বাক্যালাপ করার অনুমতি।

কৈলাস নইমের মাথায় এক চাঁটি বসিয়ে দিয়ে, বলল — ফের ওই শয়তানি, হাজার বার তো দেখেছ, কী এমন ইন্দ্রের অপ্সরী সে?

নইম — তা সে যাই হোক না কেন, চুক্তি করছ কিনা বল। কিন্তু খেয়াল রেখো, 'একান্ত' কথাবার্তার শর্ত।

কৈলাস — বেশ, রাজি। কিন্তু ফের যদি ডিক্রির টাকা চাইতে আস, তবে একেবারে ছিঁড়ে ফেলব।

নইম — হ্যাঁ, ঠিক আছে।

কৈলাস (গম্ভীর ভাবে) — কিন্তু দেখ ভাই, খুব স্পর্শকাতর স্ত্রী আমার। কোনো অভদ্ররকম ঠাট্টা করে বসো না যেন।

নইম — আরে, এসব ব্যাপারে তোমার উপদেশ আমার লাগবে না। কই চলো, ওঁর ঘরে নিয়ে চলো।

কৈলাস — মাথা নামিয়ে রাখবে।

নইম — ঠিক আছে, চোখে পট্টি বেঁধে দাও।

কৈলাসের ঘরে কোনো পরদা ছিল না। উমা চিন্তামগ্ন হয়ে বসেছিল। হঠাৎ কৈলাস আর নইমকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠে পড়ল। বলল — আরে আসুন, মির্জাজি। অনেক দিন পর এলেন এবার।

কৈলাস নইমকে সেখানেই রেখে ঘরের বাইরে চলে এল। কিন্তু আড়ালে লুকিয়ে শুনতে লাগল কী কথা সে বলে। কোনো খারাপ সন্দেহ ওর মনে ছিল না, কেবল ছিল অদম্য কৌতূহল।

নইম — আমাদের সরকারি কর্মীদের এত অবসর কোথায়? ডিক্রির টাকাটা নেবার ছিল, তাই আসতেই হল।

উমা এতক্ষণ মুচকি মুচকি হাসছিল, টাকার নাম শোনামাত্র ওর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গম্ভীর স্বরে বলল — আমরা নিজেরাই সেই চিন্তাই করছি। টাকা জোগাড়ের কোনো ভরসাই নেই। আর ওর তো জনসাধারণের কাছে সাহায্য চাইতে লজ্জা করে।

নইম — কী বলছেন আপনি? আমি তো সমস্ত টাকা পাই-পয়সা সুদ্ধু উশুল করে নিয়েছি।

বিস্মিত উমা বলল — সত্যি? ওর কাছে টাকা কোথায় ছিল?

নইম — আরে ওর স্বভাবই ওই। আপনাকে বোধহয় বলেছে যে, আমার কাছে কানাকড়িও নেই। কিন্তু আমি তুড়ি দিতেই সব টাকা উশুল। উঠুন উঠুন, খাবার বন্দোবস্ত করুন কিছু।

উমা — টাকা দিয়েছে! আমার প্রত্যয় হয় না!

নইম — আপনি সরল মানুষ, আর ওটা তো একটা শয়তান। আমি চিনি না ওকে? নিজের দারিদ্র্যের গল্প শুনিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখে ও।

কৈলাস হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বলল — যথেষ্ট হয়েছে, এবার বেরোও বাইরে। এখানে এসেও শয়তানি ফলাতে লেগেছ?

নইম — টাকাটার রসিদটা লিখে দিই?

উমা — তুমি টাকা দিয়ে দিয়েছ? কোত্থেকে?

কৈলাস — পরে বলব। এই ওঠো।

উমা — বলছ না কেন, কোত্থেকে? মির্জাজির কাছে লুকোনোর দরকার কী?

কৈলাস — নইম, তুমি উমার সামনে আমাকে অপমানিত করতে চাও?

নইম —তুমি গোটা দুনিয়ার সামনে আমাকে অপমান করনি?

কৈলাস — তোমার মানহানি করেছি, তার জন্যে বিশ হাজার টাকা খেসারত দিতে হয়েছে।

নইম — আমিও ওই টাকশালেরই টাকা তোমায় ফিরিয়ে দেব। উমা, আমি টাকা পেয়ে গেছি। এ বেচারির ইজ্জত ঢাকাই থাক।

(ডিক্রী কে রুপয়ে / ১৯২৫) অনুবাদ অচিন চক্রবর্তী

সভ্যতার রহস্য

দুনিয়ার হাজার একটা কথার কোনো মানে আমার মগজে ঢোকে না। মানুষ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঁঠেই কেন তার চুলে চিরুনি চালায়? কেনই বা পুরুষ মানুষেরা এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তাদের চুলের ভার তারা নিজেরা সামালাতে পারছে না? লেখাপড়া জানা সব মানুষগুলোর দৃষ্টিশক্তিই বা কেন একই সঙ্গে এত কমে গিয়েছে? এসবের কারণ কি তাদের বুদ্ধির শক্তিহীনতা না আর কিছু? খেতাব ও সম্মানের পিছনে মানুষজন কেন এমন ছুটে বেড়াচ্ছে? কিন্তু এ মুহূর্তে আমার এসব কথায় কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মনে এখন এক নতুন প্রশ্ন জাগছে, আর সে প্রশ্নের সঠিক জবাব কেউ আমাকে দিচ্ছে না। প্রশ্নটা হল, সভ্য কে আর অসভ্যই বা কে? সভ্যতার লক্ষণই বা কী? ওপর ওপর দেখলে, এর চেয়ে সহজতর প্রশ্ন আর কিছুই হতে পারে না। নিতান্ত ছেলেমানুষও এ প্রশ্নের সমাধান করে ফেলতে পারে। কিন্তু একটু ভেতর থেকে, একটু গভীরে গিয়ে দেখলে প্রশ্নটা এত সহজ মনে হবে না। কোট-প্যান্ট পরা, টাই-হ্যাট লাগানো, চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া, দিনে তেরো বার কোকো কিংবা চা এবং সিগ্রেট — এটাই যদি সভ্যতা হয়, তাহলে যারা সন্ধের সময় ইতিউতি তাকাতে তাকাতে পথ চলে, মদের নেশায় যাদের চোখ লাল হয়ে থাকে, যাদের পা টলমল করে কাঁপতে থাকে, যারা পথচারীদের টিটকিরি দেয় সেই সাদা চামড়ার মানুষগুলোকেও তো সভ্য বলতে হয়। কী, ওই সাদা চামড়ার লোকগুলোকেও কি সভ্য বলা চলতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে এটাই স্থির হচ্ছে যে, সভ্যতা হচ্ছে অন্য কিছু, শরীরের সঙ্গে এর সম্পর্ক ততটা নয় যতখানি সম্পর্ক তার মনের সঙ্গে।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে রায় রতনকিশোর একজন। তিনি খুব সহৃদয়, খুবই উদার এবং শিক্ষিত মানুষ। খুব ভালো বেতন পাওয়া সত্ত্বেও ওঁর আয় ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এক চতুর্থাংশ বেতন তো তার বাংলো ভাড়াতেই খরচ হয়ে যায়। এর জন্যে উনি খুবই চিন্তিত। ঘুষ তিনি নেন না, অন্তত আমি তো সে কথা জানি না — যারা বলার তারা বলে বটে — কিন্তু আমি এইটুকু জানি যে উনি বাড়তি ভাতা আদায়ের জন্য খুবই দৌড়ঝাঁপ করেন। এমনকী, এর জন্য প্রতিবছর খরচ মেটাতে অন্য কোনোভাবে টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে। ওঁর ওপরওয়ালা বলেন, এত ছোটাছুটি করছ কেন? উনি তার জবাবে বলেন, এ জেলার কাজই এমন, খুব করে ছোটাছুটি না করলে জনসাধারণ শান্ত থাকতে পারে না। কিন্তু মজাটা হল, রায় সাহেব যত ছোটাছুটি করার কথা ওর রোজনামচায় লেখেন, প্রকৃতপক্ষে ততখানি ছোটাছুটি উনি করেন না। ওঁর ক্যাম্প তো শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। ওখানে ওঁর উপস্থিতির স্মারক হিসাবে একটা নিশানা থাকে, ক্যাম্পের কর্মচারীরাও থাকে ওখানে, কিন্তু রায়সাহেব নিজে ঘরে বসে বসে ওঁর বন্ধুবান্ধবদের

সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে থাকেন। ওঁর সভ্য মানুষ হওয়া নিয়ে কারও কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

একদিন আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন উনি ডমড়িকে বকাঝকা করছিলেন। ডমড়ি ওর রাতদিনের সর্বক্ষণের চাকর। কিন্তু রুটি খাবার জন্য সে তার বাড়ি যেত। কিছু দূরে এক গাঁয়ে ওর ঘর। কাল রাতে কোনো কারণে সে ওখান থেকে ফিরতে পারেনি। সেজন্যেই উনি ওকে ধমকাচ্ছিলেন।

রায়সাহেব — রাতদিনের জন্যে তোকে রেখেছি। কাল কেন তুই বাড়ি থাকলি? কালকের রোজ তোর কাটা যাবে।

ডমড়ি — হুজুর, একজন অতিথি এসেছিলেন, সে জন্যে আসতে পারিনি।

রায়সাহেব — তাহলে কালকের রোজ ওই অতিথির কাছ থেকেই নে।

ডমড়ি — হুজুর, আর কখনো ওরকম হবে না।

রায়সাহেব — চুপ কর। বাজে বকবক করিস নে।

ডমড়ি — হুজুর ....

রায়সাহেব — দুটাকা সাজা হল, — যা।

ডমড়ি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। রোজার উপোস রদ করাতে এসে এখন নমাজটাও গলায় ফাঁস এঁটে বসল। দুটাকা জরিমানা হয়ে গেল ওর। দোষ মাফ করাতে আসাটাই ভুল হয়েছিল বেচারির।

এ হল এক রাতে কাজে গরহাজির থাকার শাস্তি। ও বেচারি সারাদিনের কাজ সবই করেছিল, কেবল রাতে ওখানে শোয় নি। তারই শাস্তি এটা। এদিকে ঘরে বসে বসে ভাত-ওড়ানেওয়ালাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে না। কেউ কোনো শাস্তিও দেয় না। তবে সাজা সে পায় — এমন সাজা যা জীবনভর মনে থাকে, কিন্তু ধরাটাই মুশকিল হয়ে পড়ে। ডমড়ি যদি তেমন চালাক হত তাহলে কিছুটা রাত ঘরে থেকে, ফিরে এসে ওর কামরায় শুয়ে পড়ত। তাহলে কী করে আর রায়সাহেব জানতে পারতেন যে কাল সে কোথায় ছিল। কিন্তু গরিব মানুষেরা এতখানি প্রতারক হয়না।

দুই

ডমড়ির সাকুল্যে ছ-বিঘে জমি ছিল। তার ওপর এতগুলো প্রাণীর জীবনধারণের খরচও ছিল। ওর দুই ছেলে, দুই মেয়ে এবং স্ত্রী — সকলেই জমিটুকুর ওপর নির্ভরশীল। তবু সারা বছরের পেটের রুটিও তাতে জুটত না। কিন্তু এইটুকু জমি কী সোনা ঢেলে দেবে। অবশ্য যদি সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে মজুরের কাজ করতে যেত তাহলে সবাই আরামে থাকতে পারত। সমস্যা হল বংশপরম্পরায় যারা চাষি তারা মজুর হবার অপমান সহ্য করতে পারে না। এই বদনাম থেকে বাঁচবার জন্যেই দুটো বলদ সে পুষে রেখেছিল। ওর বেতনের একটা বড়ো অংশই ওদের চানাদানা কিনতে খরচ হয়ে যেত। এসব সমস্ত কষ্টই মেনে নিয়েছিল সে, কিন্তু জমি ছেড়ে দিয়ে মজুর হয়ে যাওয়ায় তার সম্মতি ছিল না। কৃষকের যে সম্মান রয়েছে সেটা কি কখনও মজুরের হতে পারে? তা রোজই সে টাকা কামাক না কেন। চাষবাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে মজুর খাটা এমন অপমানের

কিছু নয়। বাঁধা বলদ দুটো তার সম্মান রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু এ বলদ দুটো বেচে দিলে আর কোথাও তার মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে?

একদিন রায়সাহেব ওকে সর্দি জ্বরে কাঁপতে দেখে বললেন, কাপড়-জামা বানাস না কেন, ডমড়ি? কাঁপছিস কেন?

ডমড়ি — হুজুর, ভরপেট রুটি তো খেতে পাইনে, জামাকাপড় বানাব কোত্থেকে?

রায়সাহেব — বলদজোড়া বেচে দিস না কেন? হাজারবার বুঝিয়েছি, বুঝি না কেন যে এত মোটা কথাও তোর মাথায় ঢোকে না।

ডমড়ি — হুজুর, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কোথাও আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না, আমাকে একঘরে করে দেবে।

রায়সাহেব — এই সংস্কারের জন্যেই তোদের এত দুর্গতি, বুঝলি? এরকম লোকগুলোকে দয়া দেখানোও পাপ। (আমার দিকে ফিরে) কি মুনশিজি, এ পাগলামির কি কোনো ওষুধ আছে? শীতে কেঁপে মরছে তবু দরজায় বলদ বেঁধে রাখবে।

আমি বললাম, রায়সাহেব এ তো যার যার নিজের ব্যাপার।

রায়সাহেব — ওই রকম বুদ্ধিকে দূর থেকে সেলাম করুন মশায়। আমার এখানে কয় পুরুষ ধরে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হত। হাজার হাজার টাকা জলের মত ব্যয় হত। গানবাজনা হত, খাওয়াদাওয়া হত, আত্মীয়স্বজনদের উপহার দেয়া হত, গরিবদের মধ্যে কাপড়চোপড় বিলোনো হত। ওয়ালিদ সাহেবের পরে আমি প্রথম বছরেই সে উৎসব বন্ধ করে দিলাম। কী লাভ বলুন এসব করে? খামোকা চার-পাঁচ হাজার টাকার চাপ পড়ত। গোটা এলাকায় খুব একটা শোরগোল পড়ে গেল, খুব হইচই হল, কেউ আমাকে নাস্তিক বলল, কেউ আবার দেবদূত বানাল, কিন্তু এখানে এসব কথার কে আর তোয়াক্কা করে বলুন। শেষ পর্যন্ত কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত হইচই ঠান্ডা হয়ে গেল। মশাই, সে বড়ো মজার ব্যাপার। মহল্লায় কারো বিয়ে হলে কাঠ আমার কাছ থেকেই নিত। বহুদিন ধরে এ নিয়ম চলে আসছে। ওয়ালিদ সাহেব তো অন্যের কাছ থেকে কাঠ চেয়ে নিয়ে এ চাহিদা মেটাতেন,তা তাঁর ক্ষমতা থাক আর নাই থাক। আমি তৎক্ষণাৎ কাঠ দেয়া বন্ধ করে দিলাম। এ নিয়ে লোকে খুব অনুনয়-বিনয় করল, কান্নাকাটি করল। কিন্তু আমি কি লোকেদের কান্নাকাটিই শুনব না আমার নিজের লাভ দেখব? বছরে কম করে ৫০০ টাকার মতো কাঠ বেঁচে গেল। এখন কেউ ভুল করেও এসব নিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে আসে না।

আমার মনে আবার প্রশ্ন জাগল, দুজনের মধ্যে কে সভ্য, কুলের সম্মান বাঁচাবার জন্য প্রাণপাতকারী মানুষ ডমড়ি, না অর্থের জন্যে বংশের মর্যাদা বিনষ্টকারী রায় রতনকিশোর?

তিন

রায়সাহেবের এজলাসে এক বড়ো ধরনের মোকদ্দমা চলছিল। শহরের এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি এক খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। ওর জামিনের জন্য রায়সাহেবকে খুবই খোশামোদ-টোসামোদ করা হচ্ছিল। তাঁর কাছে এটি ছিল মানসম্মানের প্রশ্ন। সেই সম্ভ্রান্ত ধনী ভদ্রলোকের হুকুম ছিল, সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করতে হয় হোক তবু এ মোকদ্দমা থেকে বেকসুর মুক্তি পেতে হবে। ঘুষ দেবার চেষ্টা হয়েছে, অনেক সুপারিশও করা হয়েছে তবু রায়সাহেবের ওপর তার কোনো প্রভাব

পড়েনি। রায় সাহেবের সঙ্গে সরাসরি ঘুষের বিষয়ে আলোচনা করার সাহস হচ্ছিল না কারও। যখন কেউই কিছু করতে পারছে না তখন সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী নিজে রায়সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ঘুষ দেবার চেষ্টা করলেন।

রাত দশটা বাজে। দুই মহিলার কথা হচ্ছে তো হচ্ছেই। শেষ পর্যন্ত বিশ হাজার টাকার কথাবার্তা চলছিল। রায়সাহেবের স্ত্রী খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ উনি রায়সাহেবের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলতে লাগলেন — নিয়ে নাও তো, নিয়ে নাও। তুমি না হলে কিন্তু আমিই নিয়ে নেব।

রায়সাহেব বললেন, এত অধৈর্য হোয়ো না, ও তোমাকে মনে মনে কী ভাববে? নিজের মানসম্মানের খেয়াল আছে, না নেই? মানি, টাকাটা বেশ বড়ো অঙ্কের আর এ টাকা দিয়ে আমি তোমার অনেক দাবিদাওয়া মেটাতে পারব। কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মানসম্মান তো তুচ্ছ নয়। তোমার তো প্রথমেই চটে গিয়ে বলা দরকার ছিল, আমার সঙ্গে ওসব কথা বলবে, তো এখান থেকে চলে যাও। আমি নিজের কানে এসব শুনতে চাই না।

স্ত্রী — আমি তো শুরুতেই বলেছি সে কথা। চটে গিয়ে খুব কড়া কথাও শুনিয়েছি। এটুকুও জানি না ভেবেছ? বেচারা যে আমার পায়ের উপর মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করল।

রায়সাহেব — রায়সাহেবকে একথা বললে আমাকে উনি কাঁচাই চিবিয়ে খাবেন — বলেছ একথা? এই কথা বলতে বলতে রায়সাহেব স্ত্রীকে আদরে-সোহাগে বুকে জড়িয়ে নিলেন।

স্ত্রী — হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। জানি না ওরকম কত কথাই না আমি বলেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। উনি কাঁদতে কাঁদতে শেষ হয়ে গেলেন।

রায়সাহেব — ওকে তুমি কোনো কথা দাওনি তো?

স্ত্রী — কথা দেব কী? আমি তো টাকা নিয়ে সিন্দুকে রেখেই আসছি। সবই নোট ছিল যে।

রায়সাহেব — কেমন আহাম্মক তুমি! জানি না ঈশ্বর তোমাকে কখনও বুদ্ধিসুদ্ধি দেবেন কিনা।

স্ত্রী — এখন আর কী হবে? দেবার হলে আগেই দিতেন।

রায়সাহেব — সেরকমই তো মনে হচ্ছে। আমাকে না বলে টাকা সিন্দুকে ঢুকিয়ে বসে আছ? এখন কথা ফাঁস হয়ে গেলে কী করে মুখ দেখাব?

স্ত্রী — তাহলে বাপু, ভালো করে ভেবে দেখ। যদি কোনো গোলমাল হয় তো আমি টাকা ফেরত দিয়ে আসি।

রায়সাহেব — ফের সেই বোকামি? আরে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ঈশ্বরের নামে এখন জামিন দিতেই হবে। তুমি যা মূর্খামি করেছ তার কি চারা আছে? এটা সাপের মুখে আঙুল দেওয়া, বুঝলে? এসব কথাকে কতটা ঘেন্না করি তাও তো জান, তবুও এমন নির্লজ্জ হয়ে যাও। আর এখন তোমারই বোকামির জন্যে আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হচ্ছে। মনে মনে আমি ঠিক করেছিলাম, এ মামলায় আমি হাত দেব না, কিন্তু তোমার বোকামির জন্যে আমার কি কোনো কিছুর ঠিক থাকবে?

স্ত্রী — আমি গিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে আসছি।

রায়সাহেব — আমিও খানিকটা বিষ খেয়ে নিই তাহলে।

এদিকে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ নাটক অভিনীত হচ্ছিল তখন ওদিকে ডমড়ি গাঁয়ের প্রধানের জমি থেকে জোয়ার কেটে নিচ্ছিল। আজ সে সারা রাতের জন্য ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে। বলদগুলোর খাওয়ার মতো একটুও কিছু ঘরে ছিল না। বেতন পেতে এখনও কিছু দিন দেরি আছে, ফলে কেনার ক্ষমতাও তার নেই। ঘরের লোকেরা কিছু ঘাস কেটে খাওয়ালেও তা উটের মুখে জিরে গোঁজার মতোই। ওইটুকু ঘাসে কী হয়? বলদ দুটো খিদে-তেষ্টার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। ডমড়িকে দেখেই তারা লেজ খাড়া করে ডাকতে লাগল। ওদের কাছে যেতেই বলদ দুটো ডমড়ির হাত চাটতে লাগল। বেচারা ডমড়ির মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ভাবল, এমন সময়ে তো কিছুই করা যাবে না, সকাল বেলায় কারো কাছ থেকে কিছু চেয়েচিন্তে এনে ওদের খেতে দেবে।

রাত এগারোটা নাগাদ ঘুম ভাঙতে সে দেখল বলদজোড়া তখনো দোরের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাঁদনি রাত। ডমড়ির মনে হল, বলদগুলো যেন আরও মিনতিভরা, আরও করুণ চোখে ওর দিক চেয়ে রয়েছে। ওদের ক্ষুৎপিপাসাকাতর মুখগুলো দেখে তার চোখের কোণও জলে ভরে উঠল। চাষির নিজের বলদ-গোরু তার নিজের সন্তানের মতোই একান্ত প্রিয়। সে তাদের নিতান্ত পশু মনে করে না, তার বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে গণ্য কর। বলদগুলোকে খিদে-তেষ্টার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর ঘুম ছুটে গেল। কী একটা ভাবতে ভাবতে সে উঠে দাঁড়াল। কাস্তে বের করে বেরুলো ঘাসের সন্ধানে। গাঁয়ের বাইরে বাজরা এবং জোয়ারের খেত। ডমড়ির হাত ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। কিন্তু বলদজোড়ার কথা মনে হতেই ডমড়ি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ইচ্ছে করলেই যে কেউ বোঝা বোঝা কেটে নিতে পারে, কিন্তু সে তো চুরি করতে থাকলেও চোর নয়। সে কেবল সেই পরিমাণ ঘাসই কাটল যা কিনা তার বলদ দুটোর সারা রাতের খাবার হিসেবে যথেষ্ট হবে। ভাবল, কেউ যদি দেখে ফেলে, সে তাকে সরাসরি বলে দেবে যে গোরু দুটো না খেয়ে রয়েছে আর তাদের জন্যেই সে এগুলো কেটেছে। সামান্য ঘাসের জন্যে তাকে যে কেউ ধরে বেঁধে নিয়ে যাবে না এ বিশ্বাস তার ছিল। আমি বিক্রি করার জন্যে তো এগুলো কেটে নিয়ে যাচ্ছি না, আমাকে ধরে নিয়ে যাবার মতো এমন নির্দয় মানুষই বা কে আছে? খুব বেশি করলে সে তার জিনিসের দাম নিয়ে নেবে। খুব করে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল সে। পাত্রটার সামান্যই সে ভর্তি করল। এই সামান্য পরিমাণে নেওয়াটাই তাকে চুরির অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। চোর ততটাই কাটত যতখানি সে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। ওর তো কারও লাভলোকসানের কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। গাঁয়ের লোকজন ডমড়িকে ঘাস নিয়ে যেতে দেখে নিশ্চয়ই বিরক্ত হত, কিন্তু চুরির দায়ে কেউ তাকে ফাঁসাত না। ঘটনাক্রমে সে সময় থানা থেকে এক পুলিশ সেই পথে যাচ্ছিল। সে পাড়ার বেনিয়ার ঘরে জুয়ার আড্ডার সংবাদ পেয়ে কিছু ঘুষ বাগাবার মতলবে সেখানে এসেছিল। ডমড়িকে ঘাসের বোঝা ওঠাতে দেখেই তার সন্দেহ হল। এত রাতে কে আবার ঘাস কাটে? কেউ না কেউ নিশ্চয়ই চুরি করেই কেটেছে। একথা ভেবেই সে ধমক দিয়ে হাঁক পাড়ল, ঘাসের বোঝা নিয়ে কে যাচ্ছিস? দাঁড়া।

ডমড়ি এক চক্কর ঘুরে পিছনে তাকিয়েই পুলিশকে দেখতে পেল। তার হাত-পা যেন ফুলে ভারী ও অবশ হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে সে বলল, এই তো দুটো মাত্তর কেটেছি হুজুর, দেখুন না, দেখুন।

পুলিশ — কম কাটিস আর বেশিই কাটিস, চুরিতো বটে? এ জমি কার?

ডমড়ি — বলদেও মাহাতোর, হুজুর।

পুলিশ বুঝতে পারল যে শিকার আটকেছে। এর থেকে কিছু আদায় করা যাবে। কিন্তু ওখানে কি রেখেছিল? তাকে গাঁয়ে ধরে নিয়ে এল। যখন কোনো কিছুই আদায়ের সম্ভাবনা দেখল না তখন সে তাকে থানায় নিয়ে গেল। দারোগাবাবু ওকে হাজতে চালান করে দিলেন। আর মামলা উঠল রায়সাহেবেরেই এজলাসে।

রায়সাহেব ডমড়িকে মামলায় আসামি হতে দেখে সহানুভূতির পরিবর্তে অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গেই তা গ্রহণ করলেন। এতো আমারই বদনাম। তোর আর কি ক্ষতি হবে, এক বছর বা ছ-মাসের সাজা হবে বেশি হলে। লজ্জা তো আমারই। লোকে তো বলবে, রায়সাহেবের লোক এমন বদমাশ, এমন চোর। তুই আমার চাকর না হলে তোকে আমি কম সাজা দিতাম। কিন্তু তুই আমার চাকর বলেই তোকে আমি কঠিনতর সাজা দেব। আমার চাকর বলে তোকে ছেড়ে দিয়েছি এ বদনাম কখনই আমি শুনতে পারব না।

এই কথা বলে রায়সাহেব ডমড়িকে ছ মাসের সশ্রম কয়েদের হুকুম দিলেন।

ওই দিনই উনি খুনের মামলার জামিন দিয়ে দিলেন। আমি দুটি ঘটনাই শুনলাম আর আমার মনে এ কথাই দৃঢ়মূল হল যে, দক্ষতার সঙ্গে দোষ করার নামই সভ্যতা। খুব খারাপ কাজ করেও যদি আপনি তাকে খুব ভালোভাবে আচ্ছাদিত করতে পারেন তাহলেই আপনি অত্যন্ত সভ্য ও সজ্জন ব্যক্তি, আর যদি তা না করেন তা হলেই আপনি অসভ্য, গাঁইয়া ও বদমাশ। এটাই সভ্যতার রহস্য।

(সভ্যতা কা রহস্য / ১৯২৫) অনুবাদ রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

শূদ্রা

গ্রামের ওপ্রান্তে মা-মেয়ে একটি ঝুপড়িতে থাকে। মেয়ে জঙ্গল থেকে পাতাটাতা কুড়িয়ে আনে, মা সেসব দিয়ে চুলো ধরানোর কাজ করে। এই ওদের জীবিকা। সের-দুসের গমটম জুটে যায়, খেয়ে পড়ে থাকে। মা বিধবা, মেয়ে কুমারী, বাড়িতে আর কোনো বেটাছেলে নেই। মায়ের নাম গঙ্গা, মেয়ের গৌরা।

আজ কটা বছর ধরে গঙ্গার মনে এই চিন্তা, কোথাও যেন গৌরার বিয়েটা হয়ে যায়। কিন্তু কথা কোথাও পাকাপাকি হয় না। স্বামী মারা যাবার পর গঙ্গা আর কোনো ঘর বাঁধেনি, অন্য কোনো পেশাও ওর নেই। এতে লোকের মনে সন্দেহ, তাহলে এদের চলে কী করে? আর সবাই তো প্রাণপাত পরিশ্রম করে, তবুও ভরপেট খাওয়া জোটে না। এই মেয়েছেলেটা কোনোও কাজ করে না, তবুও মায়ে-ঝিয়ে আরামে দিন কাটাচ্ছে, কারুর সামনে হাতটাতও পাতে না। এর পেছনে কিছু না কিছু রহস্য অবশ্যই আছে। আস্তে আস্তে সন্দেহটা আরও বদ্ধমূল হয় এবং আজও তা রয়েছে। নিজের জাতের মধ্যে কেউ গৌরাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না। শূদ্রদের গণ্ডিটা খুব ছোটো। তার চৌহদ্দি পাঁচ-দশ মাইলের বেশি নয়। তাই একের দোষগুণ অপরের কাছে লুকোনো থাকে না, সেগুলোকে পর্দা দিয়ে ঢেকেঢুকে রাখাও যায় না।

সাময়িকভাবে এই সন্দেহ দূর করার জন্য মা মেয়েকে নিয়ে কয়েকটি তীর্থ ঘুরে আসে। উড়িষ্যা পর্যন্ত যায়, তবুও সন্দেহ দূর হয় না। গৌরা যুবতী, সুন্দরী, কিন্তু ওকে কুয়োর পাড়ে কিংবা মাঠেঘাটে হাসিঠাট্টা করতে কেউ দেখে না। ওর দৃষ্টি কখনো উপরের দিকে ওঠেই না। কিন্তু এসব ব্যাপার সন্দেহটাকে আরও জোরদার করে। অবশ্যই কিছু না কিছু রহস্য আছে। কোনো সোমত্ত মেয়ে এত সতী হতে পারে না। ঢাকঢাক-গুড়গুড় ব্যাপার কিছু নিশ্চয়ই আছে।

এভাবেই দিন কেটে যায়। দিনে দিনে বুড়ি ভাবনাচিন্তায় শুকোতে থাকে। ওদিকে সুন্দরীর চেহারা দিনে দিনে আরও খোলে, যেন কুঁড়ি ফুটে ফুলের রূপ নেয়।

দুই

একদিন একজন ভিনগাঁয়ের লোক ওই গাঁয়ে আসে। দশ-বারো মাইল দূর থেকে আসছে। চাকরির সন্ধানে কলকাতা যাচ্ছিল। রাত হয়ে গেছে। কাহারদের কোনো ঘর আছে কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে গঙ্গার বাড়িতে এসে ওঠে। গঙ্গা ওকে খুব আদর-আপ্যায়ন করে। ওর জন্য গমের আটা আনায়, ঘর থেকে বাসনকোশন বের করে দেয়। অতিথি কাহারটি নিজে রান্নাবাড়া করে খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে গেলে ধীরে ধীরে আলাপ-সালাপ হতে থাকে। বিয়ের কথা এসে পড়ে।

কাহার ছেলেটি বয়সে যুবক। গৌরার ওপরও নজর পড়ে, ওর চালচলন দেখে, ওর লাজুক লাজুক মুখখানা চোখে ধরে যায়। বিয়ে করতে সে রাজি হয়ে যায়। বাড়িতে ফিরে গিয়ে দুচারখানা গয়নাগাঁটি বোনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসে। গাঁয়ের কাপড়ওয়ালা জামাকাপড় ধারে দেয়। দুচারজন ভাই-বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে করতে চলে আসে। বিয়েটা চুকে যায়, তারপর এখানেই থেকে যায়। মেয়ে-জামাইকে গঙ্গা চোখের আড়াল করতে পারে না।

কিন্তু পাঁচ-সাত দিন যেতে না যেতেই মঁগরুর কানে একথা-সেকথা আসতে শুরু করে। শুধু নিজের জাতের লোকেরা নয়, অন্য জাতের লোকেরাও ওর কানে লাগাতে শুরু করে। এসব কথা শুনে শুনে মঁগরু পস্তায়, ভাবে, কেন এখানে এসে ফেঁসে গেলাম। কিন্তু গৌরাকে ছেড়ে দেবার কথা ভাবলে ওর বুকটা কেঁপে ওঠে।

এক মাস বাদে মঁগরু তার বোনের গয়নাগাঁটিগুলো ফেরত দিতে যায়। খাবার সময় ওর বোনাই ওর সঙ্গে খেতে বসে না। মঁগরুর কিছুটা সন্দেহ হয়, বোনাইকে জিজ্ঞেস করে — তুমি আসছ না কেন?

বোনাই বলে — তুমি খেয়ে নাও, আমি পরে খেয়ে নেব।

মঁগরু — ব্যাপারটা কী? তুমি খেতে বসছ না যে?

বোনাই — যদ্দিন না পঞ্চায়েত বসে, তোমার সঙ্গে আমি খাই কী করে? তোমার জন্য তো জাতভাইদের ছাড়তে পারিনা। কাউকে জিজ্ঞেস করলে না, কোনো খোঁজখবর নিলে না, গিয়ে একটা কুলটাকে বিয়ে করে বসলে। মঁগরু পাত থেকে উঠে আসে, ফতুয়া গায়ে চাপিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে আসে। বোনটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। সে রাতেই কাউকে কিছু না বলে কয়ে মঁগরু গৌরাকে ছেড়ে কোথায় চলে যায়। গৌরা তখন নিদ্রায় মগ্ন। ও কী করে জানবে যে রতনটিকে সে এত তপস্যার পর পেয়েছে সে তাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে।

তিন

কয়েক বছর কেটে যায়। মগঁরুর কোনও খোঁজখবর মেলে না। কোনো চিঠিপত্রও আসে না। তবে গৌরা বেশ ভালোই আছে। সে সিঁথেয় সিঁদুর দেয়, রঙবেরঙের শাড়ি পরে, ঠোটে মিশি মাখে। ভজনের একখানি পুরানো বই মগঁরু ফেলে গেছে। বইটি সে কখনো কখনো পড়ে আর গায়। মগঁরু ওকে হিন্দি শিখিয়ে দিয়েছে। বানান করে ভজন পড়ে। আগে ও একা একা বসে থাকত। গাঁয়ের আর সব মেয়েদের সঙ্গে কথাটথা বলতে ওর লজ্জা করত। ওর কাছে তখন সে জিনিস ছিল না যা নিয়ে অন্য মেয়েরা গর্ব করত। সবাই নিজের নিজের স্বামীর কথা বলত। গৌরার স্বামী কই? ও কার কথা বলবে? এখন ওরও স্বামী আছে। এখন সে আর সব মেয়েদের সঙ্গে এনিয়ে গল্প করার অধিকারিণী। সেও এখন মঁগরুর কথা বলে, বলে মঁগরু কত স্নেহপরায়ণ, কত ভালোমানুষ, কত সাহসী। পতিচর্চা করে করে ওর আর আশই মেটে না। মেয়েরা জিজ্ঞেস করে — মঁগরু কেন তোকে ছেড়ে চলে গেল?

গৌরা — কী করবে? মরদ কখনও শ্বশুর বাড়িতে পড়ে থাকে? দেশে বিদেশে দু-চারটে পয়সা রোজগার করাটাই তো মরদদের কাজ,তা নয়তো কি মান-কান থাকে?

যখন কেউ জিজ্ঞেস করে — চিঠি পত্তর কেন পাঠায় না তখন হেসে বলে — নিজের ঠায়-ঠিকানা জানাতে ভয় পায়। জানে তো গৌরা এসে ঘাড়ে চেপে বসবে। সত্যি বলতে কী,

ওর ঠিকানা-ফিকানা জানতে পারলে একটা দিনও আমি বোধ হয় সবুর সইতে পারব না। ও ভালোই করছে আমার কাছে চিঠি-টিঠি লেখে না। বেচারা বিদেশবিভুঁয়ে কী করে ঘর-গেরস্তি সামলে বেড়াবে?

একদিন এক সই বলে — আমি মানব না, তোর সঙ্গে নিশ্চিত মঁগরু ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, নইলে কিছু না বলে কয়ে কেন চলে যাবে? গৌরা হেসে বলল — আরে বোন, নিজের দেবতার সঙ্গে কেউ ঝগড়া করে? ও আমার মালিক, আর আমি করব ওর সঙ্গে ঝগড়া? যেদিন ঝগড়া করার অবস্থা হবে, সেদিন কোথাও ডুবে মরব। আমাকে আগেভাগে বললে কি ও যেতে পারত? আমি তাহলে ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরতাম না?

চার

একদিন কলকাতা থেকে একটি লোক এসে গঙ্গার বাড়িতে ওঠে। পাশেরই কোন এক গাঁয়ে তার বাড়ি বলে। কলকাতার সে মঁগরুর কাছাকাছিই থাকে। মঁগরু ওকে বলে দিয়েছে সঙ্গে কার গৌরাকে নিয়ে যেতে। দুখানা শাড়ি আর রাহা খরচের জন্য টাকাও পাঠিয়েছে। গৌরার খুশির সীমা নেই। বুড়ো ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হয়ে যায়। যাবার সময় সে গাঁয়ের সব মেয়েদের গলা জড়িয়ে কাঁদে। গঙ্গা ওকে তুলে দিতে স্টেশন অবধি যায়। সবাই বলে, বেচারির কপাল ফিরেছে, নইলে এখানে জ্বলেপুড়ে মরত।

যেতে যেতে সারা রাস্তা গৌরা ভাবছে — না জানি ও কেমন দেখতে হয়েছে। এতদিনে বোধ হয় ভালো করে গোঁফ গজিয়েছে। বিদেশে লোকে সুখে থাকে। বোধহয় মোটাসোটা হয়েছে। হয়তো বাবুসাহেব বনে গেছে। গিয়ে প্রথম প্রথম দু-তিনদিন ওর সঙ্গে কথাই বলব না। তারপর জিজ্ঞেস করব — আমাকে ফেলে তুমি চলে এলে যে? যদি কেউ আমার নামে কিছু ভালোমন্দ বলেও থাকে, তুমি তা কেন বিশ্বাস করে বসলে? নিজের চোখে না দেখে তুমি অন্যের কথায় নাচলে? আমি ভালো কি খারাপ যাই হই না কেন আমি তো তোমারই, এতদিন তুমি আমাকে কাঁদালে কেন? তোমার বেলায় কেউ যদি এভাবে আমাকে কিছু বলত তাহলে কি আমি তোমাকে ফেলে দিতাম? আমার হাতটাকে যখন হাতে নিয়েছ তখন তো তুমি আমার হয়ে গেছ। এরপর তোমার মধ্যে হাজার দোষই থাকুক না কেন, আমার ভাবনার কী আছে। তুমি মুসলমানই হয়ে যাও, আমি তো তোমাকে ফেলতে পারি না। আমাকে ফেলে কেন পালিয়ে এলে? কী, ভেবেছিলে পালানোটা সোজা? শেষ অব্দি আমাকে ডাকলে তো? না ডেকে কি উপায় আছে? আমি তো তোমার উপর দয়া করেছি, চলে এসেছি, নইলে বলে দিতাম যে, আমি অমন নির্দয়ীর কাছে যাব না, তাহলে তুমি নিজেই ছুটে আসতে। তপস্যা করলে তো দেবতাকেও পাওয়া যায়, সামনে এসে দেখা দেন; তা তুমি কেমন না এসে পারতে? বারে বারে উদ্‌বিগ্ন হয়ে বুড়ো ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করে, আর কত দূর? দুনিয়ার আরেক মাথায় থাকে নাকি? আরও কত কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, সংকোচবশত জিজ্ঞেস করতে পারে না। মনে মনে অনুমান করে নিয়ে নিজেকে বুঝ দেয়। বাড়িটা ওর বড়ো-সড়ো হবে, শহরে লোকে পাকা বাড়িতে থাকে। ওর সাহেব যখন ওকে এতখানি মানে, তখন বাড়িতে চাকরও থাকবে। আমি চাকর ছাড়িয়ে দেব। সারাদিন ঘরে বসে বসে আমি কী করব?

থেকে থেকে ওর বাড়ির কথা মনে পড়ে। মা বেচারি হয়ত কান্নাকাটি করছেন। ঘরের সব কাজকম্ম এখন ওঁকে নিজের হাতেই করতে হবে। ছাগলগুলোকে চরাতে নিয়ে যাচ্ছেন কিনা কি জানি। বেচারিরা সারাদিন হয়তো ম্যাঁম্যাঁ করছে। ছাগলগুলোর জন্য আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাব। কলকাতা থেকে যখন আসব তখন সবার জন্য শাড়ি আনব। তখন এমনি খালি হাতে মোটেই ফিরব না। সঙ্গে আমার অনেক জিনিসপত্র থাকবে। সবার জন্য কিছু না কিছু সওগাত আনব, ততদিনে তো অনেকগুলো ছাগল হয়ে যাবে। এসব সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে গৌরা সারাটা রাস্তা কাটিয়ে দেয়। পাগলি কি জানে যে মানুষ ভাবে এক, ওদিকে বিধাতার মনে আরেক। ও কি জানে বুড়ো বামুনের সঙ্গেও পিশাচ থাকে। এমনি সাত-পাঁচ সে ভাবতে থাকে।

পাঁচ

তিনদিনের দিন গাড়ি কলকাতায় পৌঁছোয়। গৌরার বুকটা ধড়ফড় করতে থাকে। ও এখানেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। এখনই এল বলে। ভেবে সে ঘোমটা টেনে সামলে-সুমলে বসে। কিন্তু মঁগরুকে ওখানে দেখা যায় না। বুড়ো বামুন বলে — মঁগরুকে তো এখানে দেখছি না, আমি চারিদিকেই তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেছি। হয়তো কোনো কাজে আটকে পড়েছে, আসবার ছুটি পায়নি। জানতও না তো যে আমরা কোন গাড়িতে আসছি। ওর পথ চেয়ে কেন আর বসে থাকি, চলো ওর বাসাতেই যাই।

দুজনে গাড়িতে চড়ে রওনা হয়। গৌরা এর আগে কখনও ঘোড়াগাড়ি চড়েনি। তার গর্ব হচ্ছে এই ভেবে যে, কত বাবুলোকেরা পায়ে হেটে যাচ্ছে আর সে ঘোড়াগাড়ি চড়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি মঁগরুর বাসায় গিয়ে পৌঁছায়। বিরাট একটা বাড়ি, চারপাশ ঝকঝকে তকতকে, বাইরের বারান্দায় ফুলের সব টব সাজানো। গৌরা উপরে উঠতে থাকে। বিস্ময়ে, আনন্দে আর আশায় ওর কোনও দিকে খেয়াল নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ওর পা ব্যথা করতে থাকে, পুরো বাড়িটা তবে ওর। ভাড়া বোধ হয় অনেক দিতে হয়। টাকাটাকে যেন কিছুই মনে করে না। ওর বুকটা ধড়ফড় করছে মঁগরু উপরের কোনো ঘর থেকে নেমে আসছে না তো। সিঁড়িতে যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে আমি কী করব? ভগবান করুন ও যেন পড়ে পড়ে ঘুমুতে থাকে, আমি গিয়ে ওকে জাগাব, আমাকে দেখেই ও হড়বড় করে উঠে বসবে। অবশেষে সিঁড়ি শেষ হয়। উপরে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বামুন ঠাকুর গৌরাকে বসায়।

এটা মঁগরুর ঘর। কিন্তু মঁগরু এখানেও হাওয়া। কুঠুরিতে শুধু একখানা চৌকি। একপাশে দু-চার খানা বাসনকোশন রাখা। এটাই ওর কুঠুরি। বাড়িটা তাহলে আরেক জনের। ও এই কুঠুরি ভাড়া নিয়েছে। দেখছি, উনুনটা ঠান্ডা পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে রাতে বাজারে পুরিটুরি খেয়ে এসে ঘুমিয়েছে। এটাই ওর শোবার চৌকি। একপাশে জলের কলসি রাখা। তেষ্টায় গৌরার তালু শুকিয়ে যাচ্ছে। কলসি থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে নেয়। একপাশে একটা ঝাড়ু রাখা গৌরা পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু এই প্রেমের আনন্দে ক্লান্তি কীসের? সে কুঠুরিটাকে ঝাঁটপাট দেয়, বাসনগুলোকে ধুয়েমুছে একজায়গায় গুছিয়ে রাখে। কুঠুরির প্রতিটি জিনিসে, এমনকি তার মেঝে আর দেওয়ালেও সে আপনজনের ছোঁয়া পায়। জীবনের পঁচিশটি বছর যে ঘরে সে কাটিয়েছে সেখানেও সে প্রভুত্বের এমন গৌরবময় আনন্দ পায়নি।

কিন্তু ওই কুঠুরিতে বসে বসে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে অথচ মঁগরুর কোনও পাত্তা নেই। এতক্ষণে বোধ হয় ছুটি পেয়ে গেছে। সাঁঝে সবখানেই ছুটি থাকে। এখনই হয়তো ও এসে পড়বে। কিন্তু বুড়ো বাবা তো ওকে খবর দিয়েই দিয়েছেন, তাহলে কি ও ওর সাহেবকে বলে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি নিতে পারছে না? কিছু একটা হবে। সে কারণেই বোধ হয় আসছে না। অন্ধকার নেমে গেছে। কুঠুরিতে বাতিটাতি নেই। গৌরা দরজায় দাঁড়িয়ে স্বামীর পথপানে চেয়ে থাকে। সিঁড়িতে অনেক লোকের নামাওঠার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, বারে বারে গৌরার মনে হচ্ছে, এই মঁগরু আসছে, কিন্তু এদিকে কেউ আসে না।

রাত নটার সময় বুড়ো বাবা আসেন। গৌরা ভাবে মঁগরু। তড়াক করে লাফিয়ে কুঠুরির বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে ব্রাহ্মণ! জিজ্ঞেস করে — ও কোথায়?

বুড়ো — ও তো এখান থেকে বদলি হয়ে গেছে। অফিসে গিয়েছিলাম, গিয়ে শুনি যে ও কাল ওর সাহেবের সঙ্গে এখান থেকে চলে গেছে, সে প্রায় আট দিনের রাস্তা। সাহেবের হাতেপায়ে খুব ধরেছিল, বলেছিল, আমাকে অন্তত দশটা দিন সময় দিন, কিন্তু সাহেব একটা কথাও শুনলেন না। মঁগরু এখানে লোকজনদের বলে গেছে যে, বাড়ি থেকে লোকজন এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। নিজের ঠিকানা রেখে গেছে। কাল আমি তোমাকে এখান থেকে জাহাজে তুলে দেব। ওই জাহাজে আমাদের দেশের আরও অনেক লোক থাকবে, কাজেই পথে তোমার কোনও কষ্ট হবে না।

গৌরা জিজ্ঞেস করে — জাহাজ কদিনে পৌছুবে?

বুড়ো — আট-দশ দিনের কমে তো হবেই না, তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমার কোনও কিছুর কষ্ট হবে না।

ছয়

এ পর্যন্ত গৌরার মনে গাঁয়ে ফেরবার একটা আশাভরসা ছিল। কোনও না কোনও দিন সে তার স্বামীকে অবশ্যই টেনে নিয়ে যেত। কিন্তু জাহাজে বসে তার মনে হয় যে আর কোনও দিন সে তার মাকে দেখতে পাবে না, তার গাঁখানিকে আর দেখবে না। চিরদিনের জন্য দেশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে ঘাটে দাঁড়িয়ে সে কাঁদতে তাকে, জাহাজ আর সমুদ্র দেখে ওর ভয় করছে। বুক কাঁপছে। সন্ধের সময় জাহাজ ছাড়ে। সে সময় গৌরার হৃদয় একটা অজানা আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্যে নৈরাশ্যের আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে ফেলে। কী জানি কোন দেশে চলেছি; ওর সঙ্গে ওখানে দেখা হবে কি হবে না কী জানি। ওকে কোথায় খুঁজে বেড়াব। কোনও ঠিকানা-টিকানাও তো জানি না। বারে বারে সে পস্তাতে থাকে যে একটা দিন আগে কেন এলাম না। কলকাতায় দেখা হয়ে যেত, তাহলে আমি ওকে কখনো ওখানে যেতে দিতাম না।

জাহাজে আরও কতশত যাত্রী রয়েছে, কিছু মেয়েছেলেও রয়েছে। ওদের মধ্যে একনাগাড়ে গালিগালাজ চলছে, তাই ওদের সঙ্গে গৌরার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। শুধু একজন মহিলাকে বড্ড বিষণ্ণ লাগছে। চালচলন দেখে ওকে কোনও ভালো ঘরের বলেই মনে হয়। গৌরা ওকে জিজ্ঞেস করে — তুমি কোথায় যাচ্ছ, বোন?

মেয়েটির বড়ো বড়ো চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে, বলে — কী বলব বোন, কোথায় যাচ্ছি। কপাল যেখানে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানেই যাচ্ছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

গৌরা — আমি তো আমার কর্তার কাছে যাচ্ছি। এই জাহাজ যেখানে গিয়ে থামবে, ও সেখানে চাকরি করে। আমি যদি কাল এসে পড়তাম, তাহলে কলকাতাতেই দেখা হয়ে যেত। আসতে দেরি হয়ে গেল। আমি কি জানতাম যে ও এত দূরে চলে যাবে, তাহলে কি আর দেরি করতাম!

মহিলা — আরে বোন, তোমাকেও কেউ আবার ভুলিয়ে ভালিয়ে আনেনি তো? বাড়ি থেকে তুমি কার সঙ্গে এসেছ?

গৌরা — আমার কর্তা কলকাতা থেকে লোক পাঠিয়ে আমাকে আনিয়েছে।

মহিলা — ওই লোকটা তোমাদের চেনাশোনা?

গৌরা — না, তবে ওদিককারই এক বুড়ো বামুন।

মহিলা — সেই লম্বামতন, রোগাপাতলা, ছিপছিপে বুড়ো, যার একটা চোখে ছানি।

গৌরা — হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই। তুমি ওকে চেন নাকি?

মহিলা — ওই বদমাশটাই তো আমারও সর্বনাশ করেছে। ভগবান করুন ওর সাত পুরুষ যেন নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, ওর বংশ যেন নির্বংশ হয়, মুখে জল দেবারও যেন কেউ না থাকে, কুষ্ঠ হয়ে মরুক। আমি আমার সব কথা শোনালে তুমি বুঝবে সব মিথ্যা। কারুর বিশ্বাস হবে না। কী আর বলব বোন, শুধু এটুকু বুঝে নাও যে, ও ব্যাটার জন্য আমি আজ ঘরেরও নই, বাইরেরও নই। কাউকে মুখ দেখাতে পারছি না। তবুও প্রাণটাতো খুব প্রিয়। মিরিচের দেশে যাচ্ছি, ওখানে মেহনত-মজুরি করে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাব।

গৌরার প্রাণটা যেন উবে গেল। মনে হল, জাহাজটা যেন অথই জলে ডুবে যাচ্ছে। বুঝতে পারে, বুড়ো বামনটা ধোঁকা দিয়েছে। ওদের গাঁয়ে শুনত যে, গরিব লোকেরা মিরিচের দেশে যাবার জন্য নাম লেখায়। কিন্তু যে একবার সেখানে যায়, সে আর ফিরে আসে না। হায় ভগবান! তুমি আমাকে কোন পাপের এই দণ্ড দিলে? বলে — এরা সবাই কেন এভাবে ছলচাতুরী করে লোকেদের মিরিচের দেশে পাঠায়?

মহিলা — টাকার লোভে, আর কেন? শুনেছি লোক পিছু এরা সবাই কিছু টাকা পায়।

গৌরা — তাহলে বোন, ওখানে আমাদের কী করতে হবে?

মহিলা — মজুরি।

গৌরা ভাবে আর ভাবে, এখন কী করব? যে আশা-নৌকা চড়ে সে পাড়ি দিচ্ছিল, তা ভেঙে গেছে। এখন সমুদ্রের ঢেউ ছাড়া ওকে রক্ষা করবার আর কেউ নেই। যে ভিতের উপর সে তার জীবনের প্রাসাদটা বানিয়েছিল তা অতলে ডুবে গেছে। এখন ওর কাছে জল ছাড়া আর কোথায় আশ্রয়? মায়ের কথা, বাড়ির কথা, গাঁয়ের সইদের কথা তার মনে পড়ে এবং এমন গভীর মর্মবেদনা হতে থাকে যেন কোনও সাপ অন্তস্তলে বসে বারংবার দংশন করছে। ভগবান! আমাকে যদি এই যাতনাই দেবার ছিল তবে তুমি আমাকে জনমই বা দিলে কেন? গরিবদুঃখীজনের উপর কি

তোমার মায়াদয়া হয় না? যারা একেই যাতনা ভুগছে তাদের আরও যাতনা দিচ্ছ। করুণ গলায় জিজ্ঞেস করে — এখন তাহলে কী করতে হবে, বোন?

মহিলা — সে তো ওখানে গিয়ে জানতে পারব। মজুরিই করতে হয় তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু কেউ যদি কুদৃষ্টিতে দেখে তাহলে আমি ঠিক করেছি যে, হয় তারই প্রাণটা নিয়ে নেব কিংবা নিজেরই প্রাণটা দেব।

বলতে বলতে নিজের সব বৃত্তান্ত শোনাবার তীব্র ইচ্ছা হয় তার। যা দুঃখীমাত্রেরই হয়ে থাকে। বলে — বড়ো ঘরের মেয়ে আমি আর তার চেয়েও বড়ো ঘরের বউ, কিন্তু অভাগি। বিয়ের পর তিনটে বছর পেরুতে না পেরুতেই পরিদেবতা দেহ রাখলেন। মনের এমন অবস্থা হল যে, নিত্যই মনে হত যে উনি আমাকে ডাকছেন। প্রথম প্রথম তো চোখ বুজলেই ওঁর মূর্তি সামনে দেখতে পেতাম, তারপরে তো এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াল যে, জাগ্রত অবস্থাতেও থেকে থেকে ওঁকে দর্শন করতে লাগলাম। কেবলই মনে হত উনি সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন। লজ্জায় কাউকে বলতাম না, কিন্তু মনে সন্দেহ জাগত যে, ওঁর যখন দেহাবসান হয়ে গেছে, তাহলে ওঁকে দেখতে পাচ্ছি কেমন করে? আমি সেটাকে মনের ভুল মনে করে চিত্তকে শান্ত করতে পারছিলাম না। মন বলত, যে বস্তুকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাকে কেন পাওয়া যাবে না? শুধু সে জ্ঞান থাকা চাই। সাধু মহাত্মারা ছাড়া আর কে জ্ঞান দিতে পারে? আমার তো এখনো বিশ্বাস যে, এমন সব ক্রিয়া আছে যার মাধ্যমে আমরা মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি, ওদের স্থূলরূপে দেখতে পারি। মহাত্মাদের খোঁজে রইলাম। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই সাধুসন্ত আসতেন, ওঁদের সঙ্গে একান্তে এবিষয়ে কথা বলতাম, কিন্তু তাঁরা সদুপদেশ দিয়ে আমাকে এড়িয়ে যেতেন। সদুপদেশের আমার প্রয়োজন ছিল না। বৈধব্যধর্ম আমি ভালো করেই জানি। আমি তো এমন জ্ঞান খুঁজছিলাম যা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার পর্দাটাকে সরিয়ে দেবে। তিনটি বছর ধরে আমি ভাবনাতেই মেতে রইলাম। আজ দুমাস আগে ওই বুড়ো বামনটা সন্ন্যাসীর বেশে আমাদের বাড়িতে আসে। আমি ওর কাছেও সেই একই ভিক্ষে চাই। এই ধূর্তটা এমন এক মায়াজাল বিস্তার করল যে, আমি চোখ থাকতেও ফাঁদে পড়লাম। এখন ভাবলে নিজের উপরেই আশ্চর্য হতে হয় যে, ওর কথায় আমার কেন এতটা বিশ্বাস হয়েছিল। পতি-দর্শনের জন্য আমি সব কিছু সইতে, সব কিছু করতে রাজি ছিলাম। ও আমাকে রাতে ওর কাছে যেতে বলেছিল। আমি বাড়ির লোকেদের কাছে পাশের বাড়িতে যাচ্ছি বলে ওর কাছে যাই। একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে ওর ধুনি জ্বলছিল। সেই বিমল জ্যোৎস্নালোকে ধূর্ত জটাধারীটাকে জ্ঞান ও যোগের দেবতার মতো মনে হচ্ছিল। আমি ধুনির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে সময় যদি বাবাজি আমাকে আগুনেও ঝাঁপ দিতে বলত তাহলে আমি তক্ষুনি ঝাঁপ দিতাম। লোকটা আমাকে খুব আদর করে বসাল। তারপর আমার মাথায় হাত রেখে কী যে করল আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর আর জানিনা আমি কোথায় গেছি, কী হয়েছে। যখন জ্ঞান হল দেখি রেলগাড়িতে বসে আছি। একবার মনে হল চিৎকার করে উঠি। কিন্তু এখন যদি গাড়ি থেমেও যায় আর আমি নেমেও পড়ি,তবুও বাড়িতে তো আর ঢুকতে পাব না, একথা ভেবে চুপচাপ বসে থাকি। পরমাত্মার দৃষ্টিতে আমি নির্দোষ, কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে কলঙ্কিনী হয়ে গেছি। রাতে কোনও যুবতীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া

কলঙ্কিনী হবার পক্ষে যথেষ্ট। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এরা আমাকে মিরিচ দ্বীপে পাঠাচ্ছে তখন আমি একটুও আপত্তি করিনি। আমার কাছে এখন সারা দুনিয়াই এক। সংসারে যার কেউ নেই তার কাছে দেশ বিদেশ দুইই সমান। হ্যাঁ, এই দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছি মরবার আগে পর্যন্ত আমার সতীত্ব রক্ষা করব। নিয়তির কাছে মৃত্যুর চেয়ে বড়ো কোনো যাতনা নেই। বিধবার আবার মৃত্যুর ভয় কীসের? বিধবার তো বাঁচামরা দুইই সমান। মরে গেলে বরং জীবনের যত বিপত্তি শেষ হয়ে যাবে। গৌরা ভাবে — এই মহিলাটির মনে কতখানি ধৈর্য আর সাহস। আমি কেন তবে এতটা অস্থির আর হতাশ হচ্ছি? জীবনের সব কামনা-বাসনাই যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে জীবনটা শেষ হবার আর ভয় কীসের! বলে — বোন, তুমি আর আমি একই সঙ্গে থাকব। তুমিই তো এখন আমার ভরসা।

মহিলাটি বলে — ভগবানের উপর ভরসা রাখো, আর মরতে ভয় পেয়ো না।

গহন অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে আছে। উপরে কালো আকাশ, নীচে কালো জল। গৌরা আকাশের দিকে তাকিয়ে, ওর সঙ্গিনী জলের দিকে। ওর সামনে আকাশকুসুম, এর চারপাশে অনন্ত, অখণ্ড, অপার অন্ধকার!

সাত

জাহাজ থেকে নামতেই একটা লোক যাত্রীদের নাম টুকতে শুরু করে। পোশাক-আশাক তো ওর ইংরেজদের মতো তবে কথা শুনে মনে হচ্ছে ভারতীয়। গৌরা মাথা হেঁট করে তার সঙ্গিনীর পেছনে দাঁড়িয়ে। লোকটার গলা শুনে সে চমকে ওঠে। আড়চোখে সে ওর দিকে তাকায়। ওর সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। স্বপ্ন দেখছি না তো? নিজের দুচোখকে বিশ্বাস হয় না। আবার ওকে তাকিয়ে দেখে। ওর বুকটা জোরে জোরে ধড়ফড় করতে থাকে। পা দুটো থর থর করে কাঁপতে থাকে। মনে হয় চারপাশে শুধু জল আর জল আর তাতে সে ভেসে চলেছে। গৌরা তার সঙ্গিনীর হাতটা ধরে ফেলে, নইলে মাটিতে পড়ে যেত। গৌরার সামনে সেই ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে যে তার প্রাণাধার আর যার সঙ্গে এজীবনে সাক্ষাৎ হবার লেশমাত্র আশাও ছিল না। এ যে মঁগরু এতে একটুও সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, মঁগরুর চেহারাটা পালটে গেছে। যৌবনের সেই কান্তিমান, সহাস্য, সদয় চেহারার চিহ্নমাত্রও নেই। চুলগুলো সব কাঁচায় পাকায় মেশানো। গাল তোবড়ানো। লাল লাল চোখ দুটো থেকে কুপ্রবৃত্তি আর কঠোরতা প্রকাশ পাচ্ছে। তবে এ সেই মঁগরুই। গৌরার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে স্বামীর পা দুখানিকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু লজ্জা মনকে দমিয়ে রাখে। বুড়ো ব্রাহ্মণ ঠিক কথাই বলেছে। স্বামী ঠিকই আমাকে আনতে পাঠিয়েছিল আর আমার আসবার আগেই এখানে চলে এসেছে। সে তার সঙ্গিনীর কানে কানে বলে — বোন, তুমি ওই ব্রাহ্মণকে শুধু শুধুই খারাপ বলছিলে। যাত্রীদের নাম যে লিখছে ওই তো সে।

মহিলা — সত্যি, ভালো করে চিনিস তো?

গৌরা — বোন, এতেও কি ভুল হতে পারে?

মহিলা — তাহলে তো তোর কপাল খুলে গেছে, আমার কথাটাও মনে রাখিস।

গৌরা — বেশ, বোন এও কি সম্ভব যে তোমাকে এখানে ফেলে যাব?

মঁগরু যাত্রীদের উপর কথায় কথায় চটে যাচ্ছে, কথায় কথায় গালাগালি দিচ্ছে। কয়েকজন লোককে লাথি মারে আর কয়েকজনকে শুধু তার গাঁয়ের জেলার নামটা না বলতে পারার জন্য ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। গৌরা মনে মনে লজ্জায় মরে যাচ্ছে। আবার তার স্বামীর প্রভুত্বে গর্বিতও হচ্ছে। অবশেষে মঁগরু ওর সামনে দাঁড়িয়ে লালসার চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে — তোমার নাম কি?

গৌরা বলে — গৌরা।

মঁগরু চমকে ওঠে, তারপর জিজ্ঞেস করে — বাড়ি কোথায়?

গৌরা উত্তর দেয় — মদনপুর, জেলা — বেনারস।

বলতে বলতে ওর হাসি পেয়ে যায়। মঁগরু এবারে ওর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে, তারপর একলাফে এসে ওর হাতখানা ধরে বলে, গৌরা। তুমি এখানে কোথায়? আমাকে চিনতে পারছ?

গৌরা কাঁদছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

মঁগরু আবার জিজ্ঞেস করে — তুমি এখানে এলে কী করে?

গৌরা উঠে দাঁড়ায়, চোখের জল মুছে ফেলে মঁগরুর দিকে তাকিয়ে বলে — তুমিই তো আমাকে আনতে পাঠিয়েছ।

মঁগরু — আমি! আমি তো সাত বচ্ছর ধরে এখানে।

গৌরা — আমাকে নিয়ে আসতে ওই বুড়ো বামুনটাকে পাঠাওনি?

মঁগরু — বলছি তো, আমি সাত বচ্ছর ধরে এখানে আর শুধু মরলেই এখান থেকে যাব। তাছাড়া তোমাকে কেন আনতে পাঠাব? মঁগরুর কাছে গৌরা এই নিষ্ঠুরতা প্রত্যাশা করেনি। সে ভাবে, যদি এটা সত্যিও হয় ও আমাকে আনতে পাঠায়নি, তবুও ওর আমাকে এভাবে এপমান করা উচিত নয়। কী ভাবছে ও যে, আমি ওর রুটির লোভে এসেছি? ও তো এমন বাজে স্বভাবের ছিল না। বোধ হয় হাতে ক্ষমতা পেয়ে অহংকার হয়ে গেছে। নারীসুলভ অভিমানভরে মাথা উঁচু করে বলে — তুমি যদি চাও তো আমি ফিরে চলে যাব, তোমার উপরে বোঝা হতে চাই না। মঁগরু কিছুটা লজ্জিত হয়ে বলে — এখন তুমি এখান থেকে ফিরে যেতে পারবে না, গৌরা। এখানে এসে কদাচিৎ কেউ ফিরে যায়। বলে সে খানিকক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন মহাসংকটে পড়ে গেছে, কী করা উচিত ঠিক করতে না পেরে। ওর কঠোর মুখাকৃতিতে অসহায় ভাব ফুটে ওঠে। তারপর কাতরস্বরে বলে — এসে যখন পড়েছ, তো থাকো। যেমন যা হবার, দেখা যাবে।

গৌরা — জাহাজ আবার কবে ফিরবে?

মঁগরু — তুমি এখান থেকে পাঁচ বছরের আগে যেতে পারবে না।

গৌরা — কেন, জোরজবরদস্তি নাকি?

মঁগরু — হ্যাঁ, এখানকার তাই হুকুম।

গৌরা — আমি তাহলে আলাদা খেটেখুটে আমার পেট চালাব।

মঁগরু সরল চোখে বলে — যদ্দিন আমি বেঁচে আছি তুমি আমার কাছ থেকে আলাদা থাকতে পার না।

গৌরা — তোমার উপর বোঝা হয়ে আমি থাকব না।

মঁগরু — আমি তোমাকে বোঝা মনে করি না, গৌরা, তবে এ জায়গাটা তোমার মতো দেবীদের থাকবার মতো নয়, না হলে এতদিনে আমি কবে তোমাকে আনিয়ে নিতাম। ওই বুড়ো লোকটা যে তোমাকে ভুলিয়ে এনেছে, বাড়ি থেকে আসার সময় ওরই সঙ্গে পাটনায় আমার দেখা হয়েছিল। ধাপ্পা দিয়ে সেই আমাকে এখান ভর্তি করে দিয়েছে। সেই থেকে এখানেই পড়ে আছি। চলো, আমার ঘরে চলো; সেখানে কথা হবে। এই মেয়েটি কে?

গৌরা — এ আমার সই। একেও বুড়োটা ধোঁকা দিয়ে এনেছে।

মঁগরু — এ তো কোনো এক কুঠিতে যাবে। এসব লোকেদের ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে। যার ভাগে যত লোক পড়বে, ততজনকে প্রতিটি কুঠিতে পাঠানো হবে।

গৌরা — ইনি তো আমার সঙ্গে থাকতে চান।

মঁগরু — ভালো কথা, এঁকেও নিয়ে চলো।

যাত্রীদের নাম লেখা আগেই হয়ে গিয়েছিল, মঁগরু ওদেরকে একজন চাপরাশির হাতে সঁপে দিয়ে দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তার আস্তানার পথ ধরে। দুপাশে ঘন গাছের সারি। যতদূর চোখ যায়, শুধু আখ আর আখ। সমুদ্রের দিক থেকে শীতল, নির্মল বায়ু বইছে। অতি মনোরম দৃশ্য। কিন্তু সেদিকে মঁগরুর নজর নেই। মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাথা হেঁট করে সে অনিশ্চিত ভাবে চলেছে, যেন মনে মনে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজছে।

একটুখানি যেতে না যেতেই সামনের দিক থেকে দুজন লোককে আসতে দেখা যায়। কাছে এসে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ে আর একজন হেসে বলে — মঁগরু, এ দুটির মধ্যে একটি আমার।

আরেকজন বলে — বাকিটা আমার।

মঁগরুর চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বলে — এ দুজন আমার বাড়ির মেয়ে। বুঝলে?

দুজনেই জোরে অট্টহাসি হেসে ওঠে, একজন গৌরার কাছে এসে ওর হাতটা ধরার চেষ্টা করতে করতে বলে — এটি আমার। তা সে তোমার ঘরেরই হোক আর বাইরেরই হাক। ব্যাটা, আমাদের ধাপ্পা দিচ্ছ।

মঁগরু — কাশিম, এদের বিরক্ত করো না, তাহলে ভালো হবে না। আমি বলে দিয়েছি, আমার বাড়ির মেয়ে এরা।

মঁগরুর চোখদুটো থেকে যেন আগুন বেরুতে থাকে। লোক দুজনে ওর মুখের ভাব দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে যায়, তারা দেখে নেবার হুমকি দিয়ে এগিয়ে যায়। মঁগরুর আওতার বাইরে গিয়েই একজন পেছন থেকে আস্ফালন করে বলে — দেখব, কোথায় নিয়ে যাও।

মঁগরু ওদিকে কান দেয় না। একটু পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। যেন সে সন্ধ্যার নির্জনতায় কারখানার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। প্রতিপাদে মনে আশঙ্কা জাগে যেন কোনো শব্দ কানে না এসে পড়ে, কেউ সামনে এসে না দাঁড়িয়ে পড়ে, মাটি ফুঁড়ে কফন গায়ে কেউ না উঠে আসে।

গৌরা বলে — লোক দুটো বড়ো বদমাশ।

মঁগরু — আমি কেন তবে বলছিলাম যে, এ জায়গা তোমার মতো মেয়েদের উপযুক্ত নয়।

হঠাৎ ডানদিক থেকে এক ইংরেজ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ে মঁগরুকে বলে — ওয়েল জমাদার, এই মেয়েছেলে দুটো আমার কুঠিতে থাকবে। আমার কুঠিতে কোনও মেয়েছেলে নেই।

মঁগরু মেয়েদের দুজনকে তার পেছনে আড়াল করে সামনে দাঁড়িয়ে বলে — সাব, এরা দুজন আমার বাড়ির মেয়ে।

সাহেব — ও হো! তুমি মিথ্যুক। আমার কুঠিতে কোনও মেয়েছেলে নেই আর তুমি দুটো নিয়ে যাবে। তা হতে পারে না। (গৌরার দিকে ইশারা করে) একে আমার কুঠিতে পৌঁছে দাও। মঁগরু মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে বলে — তা হতে পারে না। কিন্তু সাহেব ততক্ষন এগিয়ে গেছে, ওর কানে কথা পৌঁছায় না। হুকুম সে দিয়ে দিয়েছে আর তা তামিল করা জমাদারের কাজ।

বাকি পথটা নির্বিঘ্নে শেষ হয়। সামনে মজুরদের থাকবার মাটির সব ঘর। দরজায় দরজায় স্ত্রী-পুরুষেরা যেখানে সেখানে বসে রয়েছে। সবাই এই স্ত্রীলোক দুটির দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে ইশারা করে মুচকি হাসছে। গৌরা দেখে, ওদের মধ্যে বড়ো-ছোটো কোনোও মানামানি নেই, নেই কারুর চোখে শরম। একটা ধুমসি মেয়েছেলে হাতে করে কলকে টানতে টানতে তার পাশের আরেকটি মেয়েছেলেকে বলে — চার দিন কি চাঁদনি, ফির অঁধেরা পাখ।

অন্য মেয়েছেলেটি বেণী বাঁধতে বাঁধতে বলে — একদম কচি!

আট

মঁগরু সারাদিন দরজায় বসে থাকে, যেন এক কিষান তার মটরখেত আগলাচ্ছে। কুঠুরির ভেতরে মহিলা দুটি বসে বসে তাদের ভাগ্যে নিয়ে হা-হুতাশ করছে। এটুকু সময়ের মধ্যেই ওরা দুজন এখানকার অবস্থার পরিচয় পেয়ে গেছে। দুজনেই ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে বসে আছে। এখানকার রকম-সকম দেখে ওদের খিদে-তেষ্টা সব পালিয়ে গেছে।

রাত তখন বোধহয় দশটা হবে, একজন সিপাই এসে মঁগরুকে বলে — চলো, তোমাকে জন্ট সাব ডাকছেন।

মঁগরু বসে বসে বলে — দেখো নব্বি, তুমিও আমার দেশের লোক। দুঃসময়ে তুমি আমায় সাহায্য করবে না? গিয়ে সাহেবকে বলে দাও, মঁগরু কোথাও গেছে। কী হবে, বড়ো জোর কিছু জরিমানা করে দেবেন।

নব্বি — না ভাইয়া, রেগে টং হয়ে আছে, মদে চুর হয়ে রয়েছে। যদি মার লাগায়, আমার চামড়া অত মজবুত নয়।

মঁগরু — বেশ, তবে গিয়ে বলে দাও, আসছে না।

নব্বি — আমার কী, গিয়ে বলে দেব, তবে তোমার ভালো হবে না।

মঁগরু খানিকক্ষণ ভেবে লাঠিটা হাতে নিয়ে নব্বির সঙ্গে সাহেবের বাংলোর দিকে যায়। এই সেই সাহেব যার সঙ্গে আজ মঁগরুর দেখা হয়েছিল। মঁগরু জানে সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করে এখানে এক মুহূর্তও টেকা যাবে না। গিয়ে সাহেবের সামনে দাঁড়ায়। সাহেব দূর থেকেই গর্জে ওঠে — মেয়েছেলেটা কোথায়? তুমি ওকে তোমার ঘরে কেন রেখেছ?

মঁগরু — হুজুর, ও আমার বিয়ে করা বউ।

সাহেব — বেশ, আরেকটা কে?

মঁগরু — ও আমার আপন বোন হুজুর!

সাহেব — আমি কিচ্ছু জানি না। তোমাকে আনতে হবে। দুটোর যে কোনও একটা, দুটোর যে কোনও একটা।

মঁগরু সাহেবের পা দুটোর উপর লুটিয়ে পড়ে। কেঁদে কেঁদে তার সব দুঃখের কথা বলে। কিন্তু সাহেবের মন তাতে একটু গলে না। শেষে মঁগরু বলে — হুজুর, ওরা আর সব মেয়েদের মতো নয়। যদি এখানে আসেও, তাহলে প্রাণ দিয়ে দেবে।

সাহেব হেসে বলে — ওঃ। প্রাণ দেওয়াটা অত সহজ নয়।

নব্বি — কি মঁগরু, নিজের বেলায় কাঁদছিস যে? তুই আমার ঘরে ঢুকিস নি? এখনও সুযোগ পেলেই চলে যাস। এখন কাঁদছিস কেন?

এজেন্ট — ওঃ, ব্যাটা বদমাশ। এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আয়, নাইলে তোকে হাণ্টার দিয়ে পিটব।

মঁগরু — হুজুর যত খুশি মারুন, কিন্তু আমাকে ও কাজ করতে বলবেন না, ও আমি প্রাণ থাকতে করতে পারব না।

এজেন্ট — আমি একশো হাণ্টার মারব।

মঁগরু — হুজুর এক হাজার মারুন, তবু আমার বাড়ির মেয়েদের কিছু বলবেন না।

এজেন্ট নেশায় চুর। হাণ্টার হাতে মঁগরুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সপাসপ হাণ্টার কশাতে থাকে। দশ-বারো ঘা তো মঁগরু ধৈর্য ধরে সহ্য করে, তারপর হায় হায় করতে শুরু করে। দেহের চামড়া ফেটে গিয়ে মাংসের উপর যখন চাবুক পড়ে তখন অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গলা থেকে আর্তনাদ বেরিয়েই পড়ে; অথচ এখন পর্যন্ত একশোর মধ্যে মোটে পনেরো চাবুক পড়েছে।

রাত দশটা বেজে গেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ আর এই নীরব অন্ধকারে মঁগরুর করুণ বিলাপ যেন একটি পাখির মতো আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। গাছগুলি স্তম্ভিতের মত মৌন ক্রন্দনের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে। পাষাণহৃদয়, লম্পট, বিবেকহীন এই জমাদারটি এই মুহূর্তে একজন অপরিচিতা নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য তার প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত, শুধু এজন্য যে সে তার স্ত্রীর সঙ্গিনী। সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টিতে সে অধঃপতন স্বীকার করতে পারে, কিন্তু তার পত্নীর ভক্তির উপর সে একাধিপত্য করতে চায়। এতে অণুমাত্র ন্যূনতাও তার কাছে অসহ্য, সেই অপার্থিব ভক্তির কাছে তার জীবনের কী মূল্য?

ব্রাহ্মণী তো মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু গৌরা স্বামীর পথ চেয়ে বসে আছে। মঁগরুর সঙ্গে এখনো সে কোনও কথা বলতে পারেনি। সাতটি বছরের দুঃখের গাওনা গাইতে আর শুনতে অনেকটা সময়ের দরকার, আর রাত ছাড়া সে সময় কখন পাওয়া যেতে পারে? ব্রাহ্মণীর উপরে তার কিছুটা রাগ মতন হয় এজন্যে যে, এ কেন আমার ঘাড়ে চাপল। এরই জন্য তো ও ঘরে আসছে না।

হঠাৎ কাবুর কান্না শুনে সে চমকে ওঠে। ভগবান। এত রাতে কোন বেচারি কাঁদছে। নিশ্চয়ই কেউ কোথাও মারা গেছে। গৌরা উঠে দরজায় আসে আর মঁগরু ওখানে বসে আছে অনুমান করে বলে — ও কে কাঁদছে? একটু গিয়ে দেখো তো।

কিন্তু কোনও উত্তর না পেয়ে সে নিজে কান পেতে শুনতে থাকে। হঠাৎ বুকটা ওর ধ্বক্ করে ওঠে। এ তো ওরই গলা। শব্দটা এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মঁগরুর কান্না। দরজার বাইরে বেরিয়ে আসে ও। সামনে খানিকটা দূরেই এজেন্টের বাংলো। আওয়াজটা সেদিক থেকেই আসছে। কেউ মঁগরুকে মারছে। লোকে মার খেলেই অমন করে কাঁদে। মনে হচ্ছে ওই সাহেবটাই ওকে মারছে। গৌরা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সমস্ত শক্তিতে সে বাংলোর দিকে ছোটে। রাস্তা পরিষ্কার। কিছুক্ষণের মধ্যে ফটকে গিয়ে পৌঁছায়। ফটক বন্ধ। জোরে জোরে ফটকে ধাক্কা দেয়। তবু ফটক খোলে না। আরও কয়েকবার জোরে জোরে ডাকা সত্ত্বেও কেউ বাইরে আসে না। তখন সে ফটকের শিকগুলোর উপর পা রেখে ভেতর দিকে লাফিয়ে পড়ে আর ও পাশে যাওয়া মাত্রই এক নিদারুণ দৃশ্য চোখে পড়ে। মঁগরু খালি গায়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর একজন ইংরেজ ওকে হান্টার দিয়ে মারছে। গৌরার চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। একলাফে সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মঁগরুকে তার সমস্ত ভালোবাসা ঢেলে দিয়ে বাহু দুটি দিয়ে ঢেকে বলে — দয়া করো হুজুর, এর বদলে আমাকে যত খুশি মারো, ওকে ছেড়ে দাও।

এজেন্ট মার থামিয়ে উন্মত্তের মতো গৌরার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলে — আমি একে ছেড়ে দিলে তুমি আমার কাছে থাকবে? মঁগরুর নাসারন্ধ্র স্ফীত হতে থাকে। পামর, নীচ এই ইংরেজটা আমার বউয়ের সঙ্গে এ ধরনের কথা বলছে। যে অমূল্য রত্নকে রক্ষা করার জন্য সে এতক্ষণ এত যন্ত্রণা সহ্য করছিল তাই এখন সাহেবের হাতে চলে যাচ্ছে, এ অসহ্য। তার ইচ্ছে হয় লাফ দিয়ে গিয়ে সাহেবের গলায় চেপে বসে তারপর যা হবার হোক। এই অপমান সইবার পর বেঁচে থেকে কী করব? নব্বি ওকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে, কয়েকজন লোক ডেকে ওর হাত-পা বেঁধে দেয়। মঁগরু মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে।

গৌরা কাঁদতে কাঁদতে সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলে — হুজুর, একে ছেড়ে দিন, আমাকে দয়া করুন।

এজেন্ট — তুমি আমার কাছে থাকবে?

প্রচণ্ড ক্রোধকে দমন করে গৌরা বলে — হ্যাঁ, থাকব।

নয়

বাইরে পড়ে পড়ে মঁগরু কাতরাচ্ছে। শরীরটা ওর ফুলে গেছে, কাটা জায়গাগুলোতে জ্বালা, সমস্ত শরীর আষ্টেপৃষ্ঠে কষে বাঁধা। নড়বারও শক্তি নেই। কাটা ঘাগুলোতে হাওয়া তিরের মতো বিঁধছে। তবে এসমস্ত ব্যথাই ও সইতে পারে। অসহ্য এটাই যে, সাহেব গৌরাকে নিয়ে এই ঘরেতেই বিহার করছে আর সে কিছু করতে পারছে না। শরীরের যন্ত্রণা সে প্রায় ভুলে গেছে, কান পেতে আছে ওদের কথা কিছু কানে আসে কিনা, শুনতে চায় কী সব কথা হচ্ছে। গৌরা নিশ্চয়ই চিৎকার করে পালাবে আর সাহেব ওর পেছনে পেছনে ছুটবে। আমি যদি উঠতে পারতাম তাহলে তখনই ব্যাটাকে গেড়ে কবর দিয়ে দিতাম। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যায়, না গৌরা চিৎকার করে, না বাংলো থেকে বেরিয়ে পালায়। সেই সাজানো গোছানো কামরাতে সাহেবের সঙ্গে বসে গৌরা ভাবছে — সাহেবটার মনে কি একটুও দয়ামায়া নেই? মঁগরুর কাতর ক্রন্দন শুনে শুনে ওর বুকটা ফেটে যাচ্ছে। এর কি ভাই-বন্ধু, মা-বোন কেউ নেই? এর মা যদি এখানে থাকতেন, তাহলে একে

কিছুতেই এতটা অত্যাচার করতে দিতেন না। আমার মা ছেলেছোকরাগুলোর উপর কত রাগ করতেন যখন দেখতেন ওরা কোনও গাছে ঢিল ছুঁড়ছে। গাছেরও প্রাণ আছে। এর মা কি একে একটা মানুষের প্রাণ নিতে দেখেও নিষেধ করতেন না? সাহেব মদ গিলে চলেছে আর গৌরা মাংস কাটবার ছুরিটাকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

হঠাৎ একখানি ছবির উপর গৌরার চোখ পড়ে। ছবিতে এক মা বসে আছেন। গৌরা জিজ্ঞেস করে — সাহেব, এ কার ছবি?

সাহেব মদের গেলাস টেবিলে রেখে বলে — ও, উনি আমাদের ঈশ্বরের মা মেরী।

গৌরা — খুব সুন্দর ছবি। সাহেব, তোমার মা বেঁচে আছেন না?

সাহেব — উনি মারা গেছেন। আমি এখানে আসবার পর উনি অসুখে পড়লেন। আমি ওঁকে দেখতেও পারি নি।

সাহেবের মুখমণ্ডলে করুণার আভাস ফুটে ওঠে।

গৌরা বলে — তাহলে তো উনি খুব দুঃখ পেয়ে থাকবেন। তুমি তোমার মাকেও ভালোবাসনি। উনি কেঁদে কেঁদে মরে গেলেন আর তুমি দেখতেও গেলে না। এজন্যেই তোমার মনটাও এত পাষাণ।

সাহেব — না না, মাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। এমন নারী দুনিয়াতে হয় না। আমার বাবা আমাকে খুব ছোটো রেখে মারা গিয়েছিলেন। আমার মা কয়লার খনিতে মজুরি করে করে আমাকে বড়ো করেছেন।

গৌরা — তবে তো উনি দেবী ছিলেন। এতটা দুঃখকষ্ট সয়েও অন্যের উপর তোমার দয়া হয় না? সেই দয়াবতী দেবী তোমার এতখানি নিষ্ঠুরতা দেখেও কি দুঃখ পাবে না? তোমার মায়ের কোনো ছবি আছে তোমার কাছে?

সাহেব — হ্যাঁ, আমার কাছে ওঁর কয়েকখানা ফটো আছে। ওই দ্যাখো, ওটা ওঁরই ছবি, ওই দেওয়ালে।

গৌরা কাছে গিয়ে ছবি দেখে করুণ স্বরে বলে — সত্যিসত্যিই দেবী ছিলেন। মনে হচ্ছে যেন দয়ার দেবী। উনি কি কখনো তোমাকে মারতেন, না মারতেন না? আমি তো জানি, উনি কখনও কারুর উপর রাগ করতেন না। একেবারে দয়ার প্রতিমা।

সাহেব — মা আমাকে কখনো মারতেন না। উনি খুব গরিব ছিলেন, তবুও নিজের রোজগার থেকে কিছু না কিছু দানখয়রাত অবশ্যই করতেন। কোনও বাপমরা ছেলেকে দেখলে ওঁর দুচোখে জল আসত। উনি খুবই দয়াবতী ছিলেন।

গৌরা ভর্ৎসনার সুরে বলে — আর ওই দেবীর ছেলে হয়ে তুমি এত নির্দয়। যদি উনি বেঁচে থাকতেন তাহলে তোমাকে এভাবে জল্লাদের মতো কাউকে মারতে দিতেন? উনি হয়তো স্বর্গে বসে কাঁদছেন। স্বর্গ-নরক তো তোমাদেরও আছে। এমন দেবীর ছেলে হয়ে তুমি কী হয়ে গেলে?

এসব কথা বলতে গৌরার আদৌ ভয় করছে না। মনে মনে সে একটা দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছে। আর তাই এখন তার মনে আর কোনও রকমের ভয় নেই। প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প করে ফেলার পর ভয়ের ছায়াও আর থাকে না। আর এই হৃদয়হীন ইংরেজটি এসব তিরস্কার শুনে রেগে আগুন হয়ে ওঠার বদলে আরও নরম হয়ে পড়ছে। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে গৌরা যতই অনভিজ্ঞা হোক না কেন, একথা সে জানে যে, আপন জননীর প্রতি প্রতিটি হৃদয়ে, তা সে সাধুরই হোক কি

কসাইর হোক, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার একটি কোণ সুরক্ষিত থাকে। এমনও কি কোনো অভাগা মানুষ আছে, মাতৃস্নেহের কথা মনে পড়লে কিছুক্ষণের জন্য হলেও কাঁদে না, তার হৃদয়ে কোমল ভাব জাগিয়ে তোলে না? সাহেবের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। মাথা হেঁট করে সে বসে থাকে। গৌরা একই ভাবে বলে চলে — তুমি ওঁর সমস্ত তপস্যা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছ। যে দেবী প্রাণ দিয়ে তোমাকে বড়ো করে তুলেছেন, মরে যাবার পরে তুমি তাঁকে এতটা কষ্ট দিচ্ছ? এজন্যেই কি মা তার ছেলেকে বুকের রক্ত নিঙড়ে মানুষ করেন? যদি উনি কথা বলতে পারতেন, তাহলে কি চুপ করে বসে থাকতেন? তোমার হাত ধরতে পারলে কি ধরতেন না? আমার তো মনে হয়, উনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে এসব দেখে বিষ খেয়ে প্রাণ দিতেন।

সাহেব আর সহ্য করতে পারে না। নেশার মাঝে ক্রোধের মত আত্মগ্লানির আবেগও সহজেই এসে পড়ে। দুহাতে মুখ ঢেকে সাহেব কাঁদতে শুরু করে, এত কাঁদে যে ওর হেঁচকি উঠতে শুরু করে। মায়ের ছবির সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে, যেন মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। তারপর আর্দ্রকণ্ঠে বলে — আমার মা এখন কী করে শান্তি পাবেন? হায় হায়! আমার পাপে উনি স্বর্গেও সুখ পাচ্ছেন না। আমি কত অভাগা।

গৌরা — এখুনি একটু বাদেই তোমার মতটা পালটে যাবে আর তুমি আবার অন্যদের উপর একই অত্যাচার করতে থাকবে।

সাহেব — না না, আর আমি মাকে কখনও দুঃখ দেব না। আমি এক্ষুনি মঁগরুকে হাসপাতালে পাঠাচ্ছি।

দশ

রাতেই মঁগরুকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। এজেন্ট নিজে ওকে ভর্তি করতে এসেছে। গৌরাও তার সঙ্গে ছিল। মঁগরুর জ্বর এসে গেছে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে সে।

তিন দিন মঁগরু চোখ খোলে না। গৌরা তিন দিনই ওর পাশটিতে বসে থাকে। এক মুহূর্তের জন্যেও সে ওখান থেকে নড়ে না। এজেন্টও কয়েকবার খবরাখবর নিতে আসে আর প্রতিবারই গৌরার কাছে ক্ষমা চায়।

চতুর্থ দিন মঁগরু চোখ মেলতেই দেখতে পায়, গৌরা সামনে বসে আছে। ওকে চোখ খুলতে দেখে গৌরা কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে — এখন কেমন লাগছে?

মঁগরু জিজ্ঞেস করে — তুমি এখানে কখন এলে?

গৌরা — আমি তো তোমার সঙ্গে এখানে এসেছি, সেই থেকেই এখানে আছি।

মঁগরু — সাহেবের বাংলোতে কি জায়গা নেই?

গৌরা — বাংলোয় থাকার ইচ্ছে যদি থাকত তাহলে কি সাত সমুদ্র পেরিয়ে তোমার কাছে আসতাম?

মঁগরু — এখানে এসে এ কেমন সুখ দিলে আমায়? এই যদি তোমার করবার ছিল, তাহলে আমাকে মরতে যেতে দিলে না কেন?

গৌরা রেগে বলে — এ ধরনের কথা তুমি আমার কাছে বোলো না। এসব কথায় আমার গায়ে আগুন ধরে যায়। মঁগরু মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন গৌরার কথায় ওর বিশ্বাস হয় না। সারাটা

দিন গৌরা না খেয়েদেয়ে মঁগরুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। গৌরা কতবার ওকে ডাকে, কিন্তু মঁগরু চুপটি মেরে পড়ে থাকে। এই সন্দেহমিশ্রিত অবহেলা কোমলহৃদয়া গৌরার পক্ষে অসহ্য। যে পুরুষকে সে দেবতুল্য ভক্তি করে, তার প্রেমে বঞ্চিত হয়ে কী করে সে বেঁচে থাকবে? এই প্রেমই যে তার জীবনের অবলম্বন। তাকে হারিয়ে সে এখন তার সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছে।

রাত অর্ধেকের বেশি কেটে গেছে। মঁগরু অঘোরে ঘুমিয়ে আছে,বোধ হয় কোনও স্বপ্ন দেখছে। গৌরা ওর পায়ে মাথা ঠেকায়, তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ে। মঁগরু ওকে পরিত্যাগ করেছে। সেও আজ মঁগরুকে পরিত্যাগ করতে চলেছে।

হাসপাতালের পুব দিকে ফার্লং খানেক দূরে একটা ছোট্ট নদী বয়ে চলেছে। গৌরা ওর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায়। এই কদিন আগেও সে তার গাঁয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিল। ও কি জানত যে, যে বস্তু এত কষ্টে পাওয়া যায়, তা এত সহজে হারিয়েও যায়। মায়ের কথা, বাড়ির কথা, সইদের কথা, তার ছাগলের বাচ্চাগুলোর কথা মনে পড়ে। সেসব ছেড়ে কী এজন্যে সে এখানে এসেছিল? স্বামীর সেই কথাগুলো — 'সাহেবের বাংলোতে কি জায়গা নেই' ওর মর্মস্থলে বাণের মতো গিয়ে বিঁধে আছে। এ সব তো আমারই জন্যে হয়েছে? আমি না থাকলে ও আবার ভালোভাবে থাকবে। হঠাৎ ব্রাহ্মণীর কথা ওর মনে পড়ে। ওই দুঃখিনীর দিন এখানে কী করে কাটবে? ভাবে, গিয়ে সাহেবকে বলি যে, ওকে হয় ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিন কিংবা কোনও পাঠশালাতে কোনো কাজ পাইয়ে দিন।

সে ফিরতে যাচ্ছে এমন সময় কে ডেকে ওঠে — গৌরা! গৌরা!!

এ মঁগরুর করুণ কম্পিত ডাক। গৌরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে। মঁগরু আবার ডাকে — গৌরা! তুমি কোথায়? আমি ঈশ্বরের নামে বলছি.......গৌরা আর কিছু শোনে না। ঝপাং করে নদীতে ঝাঁপ দেয়। নিজের জীবনটাকে শেষ না করলে সে স্বামীর দুঃখের অবসান করতে পারবে না।

ঝপাৎ করে জলে পড়ার শব্দ শোনামাত্রই মঁগরু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভালো সাঁতারু সে। কিন্তু কয়েকবার ডুব দিয়েও গৌরাকে কোথাও সে খুঁজে পায় না।

প্রাতঃকালে দুটি দেহই পাশাপাশি নদীতে ভাসতে থাকে। জীবনের যাত্রাপথে এই চিরমিলন ওরা কখনও পায় নি। স্বর্গলোকের যাত্রাপথে দুজনেই আজ একসঙ্গে চলেছে!!

(শূদ্রা / ১৯২৬) অনুবাদ ননী শূর

মন্ত্র (১)

পণ্ডিত লীলাধর চৌবের কথায় জাদু আছে। যেই তিনি মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বাণীর সুধাবর্ষণ করেন, অমনি শ্রোতাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। অনুরাগে আচ্ছন্ন হয়। চৌবেজির বক্তব্যে তত্ত্ব খুব কম, শব্দযোজনাও খুব সুন্দর নয়, কিন্তু বার বার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও শ্রোতাদের উপর তার প্রভাব হ্রাস পায় না, বরং ঘন ঘন আঘাতের মতোই তা আরও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না, কিন্তু যাঁরা তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁরা বলেন, তিনি নাকি একটিই বক্তৃতা মুখস্থ করে রেখেছেন। প্রত্যেক সভায় সেই কথাগুলিই এক নতুন ভঙ্গিমায় পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বৈশিষ্ট্য — জাতীয় গৌরব-গাথা। মঞ্চে উঠেই তিনি ভারতের প্রাচীন গৌরব ও পূর্বপুরুষদের অমর কীর্তির রাগরাগিণী আলাপ করে সভাকে মুগ্ধ করে দেন। যথা :

—ভদ্রমহোদয়গণ! আমাদের অধঃপতনের কথা শ্রবণ করে কার চোখে অশ্রুধারা বেরিয়ে না আসবে! আমাদের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করলে সংশয় জাগে; আমরা কি সেই একই রকম রয়েছি, না বদলে গেছি! গতকাল যে সিংহের সঙ্গে লড়াই করেছে, আজ সে ইঁদুর দেখে গর্ত খোঁজে। এই অধঃপতনের কি কোনো সীমাপরিসীমা আছে! বেশি দূর যেতে হবে না, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আমলটাকেই ধরুন না। সুপ্রসিদ্ধ গ্রিক ঐতিহাসিক বলেছেন, সেযুগে এদেশে দরজায় তালা দেওয়া হত না, কোথাও কোনো চুরির কথা শোনা যেত না, ব্যাভিচারের নাম-নিশানা ছিল না কোথাও, দলিলপত্র আবিষ্কারই হয়নি, চিরকুটেই লাখ লাখ টাকার লেনদেন হত, যেসব কর্মচারী বিচারক-পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা বসে বসে মাছি মারতেন। ভদ্রমহোদয়গণ! সেকালে তরুণ বয়সে মারা যেত না কেউ। পিতার আগে পুত্রের মৃত্যু এক অভূতপূর্ব — এক অসম্ভব ঘটনা ছিল। আজ এরূপ কজন মাতাপিতা আছেন, যাঁদের হৃদয় যুবক পুত্রের বিয়োগব্যথায় জর্জরিত নয়? এখন আর সে ভারত নেই, ভারত গারত (ধ্বংস) হয়ে গেছে!

এই হল চৌবেজির ভাষণশৈলি। বর্তমানের এই সব অধঃপতন ও দুর্দশা এবং অতীতের সমৃদ্ধি ও সুব্যবস্থার রাগরাগিণী আলাপ করে লোকের মনে জাত্যভিমান জাগ্রত করে তোলেন। এই কৃতিত্বের জন্যেই তিনি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম বলে পরিগণিত হন। বিশেষ করে তিনি ছিলেন হিন্দুসভার একজন কর্ণধার। হিন্দুসভার ভক্তদের মধ্যে এরূপ উৎসাহী, দক্ষ ও নীতিবিশারদ আর কেউ নেই। বরং বলা যেতে পারে, হিন্দুসভার জন্যে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর তো আর ধনসম্পদ নেই, অন্তত লোকে তাই মনে করে, তবে সাহস-ধৈর্য-বুদ্ধির মতো যেসব অমূল্য সম্পদ তাঁর আছে, সবই তিনি হিন্দুসভাকে সমর্পণ করেছেন। 'শুদ্ধিকরণ'

যেন তাঁর প্রাণ। তাঁর মতে হিন্দু জাতির উত্থানপতন জীবনমরণ সবই এই 'শুদ্ধি'র ওপরই নির্ভরশীল। 'শুদ্ধি' ব্যতীত হিন্দু জাতির পুনর্জীবনের আর কোনো পথ নেই। জাতির সমস্ত নৈতিক, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় ব্যাধিসমূহের প্রতিষেধক এই আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে, তিনি মনপ্রাণ দিয়ে তারই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চাঁদা আদায় করতে চৌবেজি সিদ্ধহস্ত। ঈশ্বর তাঁকে এমন 'গুণ' দিয়েছেন যে পাথর নিংড়েও তেল নিষ্কাশন করতে পারেন তিনি। হাড়কিপটে লোকদের তিনি এমন রগড়ান যে ভদ্রলোকেরা চিরকালের মতো শিক্ষা পেয়ে যায়। এব্যাপারে পণ্ডিতজি সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ — এই চারটি নীতি প্রয়োগ করেই কাজ হাসিল করেন, এমন কী, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যে চুরিডাকাতিকেও তিনি ক্ষমার্হ বলে মনে করেন।

দুই

গ্রীষ্মকাল। লীলাধরজি কোনো ঠান্ডা পাহাড় অঞ্চলে বেড়াতে যাওয়ার আয়োজন করছেন। উদ্দেশ্য, বেড়ানোকে বেড়ানো হবে, আবার সে মওকায় কিছু চাঁদাও আদায় করা যাবে। তাঁর যখন বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে হয়, তখন তিনি ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে একটি ডেপুটেশনের আকারে বেরিয়ে পড়েন, হাজার টাকা আদায় করে যদি তার অর্ধেকটাও তিনি ঘোরাফেরাতে ব্যয় করে ফেলেন, তাতে কার কী ক্ষতি? হিন্দুসভারও তো কিছু-না-কিছু জুটে যায়। তিনি যদি উদ্যোগই না নেন, তাহলে সেটুকুও তো জুটবে না। এবারে পণ্ডিতজি সপরিবারে বেরবেন বলে মনস্থ করেছেন। যবে থেকে 'শুদ্ধি'-র উদয় হয়েছে তখন থেকে তাঁর আর্থিক অবস্থা, আগে যা নিতান্ত শোচনীয় ছিল, মোটামুটি ভালোর দিকে।

কিন্তু যাঁরা জাতির সেবক তাঁদের সে সৌভাগ্য কোথায় যে শান্তি-নিবাসের আনন্দ উপভোগ করবেন। তাঁদের জন্মই তো ঝামেলা পুইয়ে বেড়ানোর জন্য। খবর হল, তব্‌লিগের লোকেরা মাদ্রাজ অঞ্চল তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। হিন্দুদের গ্রাম-কে-গ্রাম মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। মোল্লারা দারুণ উৎসাহে তব্‌লিগের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, হিন্দুসভা যদি সে প্রবাহ রোধ করার কোনো ব্যবস্থা না করে তাহলে সেই প্রান্তে হিন্দুর নামগন্ধ থাকবে না — এমন কী, একটা টিকিওয়ালা চেহারাও চোখে পড়বে না।

হিন্দুসভায় শোরগোল পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ একটা বিশেষ অধিবেশন থেকে নেতাদের সামনে সমস্যাটা তুলে ধরা হল। বহু ভাবনাচিন্তার পর ঠিক হল, চৌবেজির ওপর একাজের ভার দেওয়া যাক। তাঁকে অনুরোধ করা হোক, তিনি যেন এই মুহূর্তে মাদ্রাজ গিয়ে ধর্মবিমুখ বন্ধুবর্গকে উদ্ধার করেন। বলতেই যা দেরি। চৌবেজি তো হিন্দুজাতির সেবার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে বসেই আছেন, পর্বত পর্যটনের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে মাদ্রাজ যাত্রার জন্যে তিনি প্রস্তুত হলেন। হিন্দুসভার সচিব ছলছল চোখে তাঁকে বললেন — মহারাজ, এ সংকট আপনিই দূর করতে পারেন। পরমাত্মা আপনাকেই সে ক্ষমতা দিয়েছেন। আপনি ছাড়া ভারতবর্ষে আর কে আছে যে, এই ঘোর বিপদ মোকাবিলা করতে পারে! জাতির এই শোচনীয় দুর্দশায় কৃপা করুন। চৌবেজি সে প্রার্থনা উপেক্ষা করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এক সেবকমণ্ডলী গঠিত হল, পণ্ডিতজির নেতৃত্বে তাঁরা রওনা

হয়ে গেলেন। তদুপলক্ষে হিন্দুসভা সাড়ম্বরে এক বিদায়-ভোজের আয়োজন করল। এক মহানুভব ধনী ব্যক্তি চৌবেজিকে একটি টাকার তোড়া উপহার দিলেন। স্টেশনে হাজার হাজার লোক সমবেত হল তাঁদের বিদায় সংবর্ধনা জানাতে।

যাত্রাপথের বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকটি বড়ো স্টেশনে সেবকদের সসম্মানে স্বাগত জানানো হল। কোথাও কোথাও টাকার তোড়া জুটল। রতলাম রাজ্যের পক্ষ থেকে একখানা শামিয়ানা উপহার দেওয়া হল। সেবকদের যাতে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে কষ্ট না হয়, সেজন্যে বরোদা একটা গাড়ি দিল। মাদ্রাজ পৌঁছতে পৌঁছতেই সেবাদলের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত হরেক রকম জিনিস এসে জড়ো হল। সেখানে লোকালয় থেকে দূরে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে হিন্দুসভার শিবির খাটানো হল। শামিয়ানার ওপর জাতীয় পতাকা উড়তে লাগল পতপত করে। সেবকরা নিজের নিজের উর্দি বের করলেন, স্থানীয় ধনকুবেররা আপ্যায়নের সামগ্রী পাঠালেন, তাঁবুর ছোটো ছোটো কক্ষ তৈরি হল। চারদিক এমন আনন্দমুখর হয়ে উঠল, ঠিক যেন কোনো রাজার শিবির।

তিন

রাত আটটা। অচ্ছুতদের একটা বস্তির কাছে সেবক-দলের শিবির গ্যাসের আলোয় ঝলমল করছে। কয়েক হাজার লোকের সমাবেশ, অধিকাংশ লোকই অচ্ছুত। তাদের জন্যে আলাদা করে চট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বসেছে গালিচায়। পণ্ডিত লীলাধরের অনর্গল বক্তৃতা চলেছে — তোমরা সেই সব ঋষিদের সন্তান, যাঁরা আকাশের নীচে এক নতুন সৃষ্টি গড়ে তুলতে সক্ষম ছিলেন। যাঁদের যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচারক্ষমতার সামনে আজ সারা বিশ্ব মাথা নত করছে।

হঠাৎ এক বৃদ্ধ হরিজন উঠে জিজ্ঞেস করল — আমারও সেই ঋষিদের সন্তান?

লীলাধর — নিঃসন্দেহে। তোমাদের ধমনীতেও সেই সব ঋষিদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। যদিও আজকের হৃদয়হীন, বিবেকহীন, কঠোর, সংকীর্ণ হিন্দুসমাজ তোমাদের অবজ্ঞার চোখে দেখছে, তবু তোমরা কোনো হিন্দু থেকেই নীচ নও, ওরা নিজেদের যত উন্নত বলেই ভাবুক না কেন।

বৃদ্ধ — তোমাদের সভা আমাদের জন্যে ভাবে না কেন?

লীলাধর — হিন্দুসভার জন্ম হয়েছে খুব অল্প দিন। কিন্তু এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে যা কাজ করেছে তা অবশ্যই গর্ব করার মতো। শতাব্দী কাল পরে হিন্দু জাতি গাঢ় ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। সে সময়ের আর খুব দেরি নেই যখন ভারতবর্ষে কোনো হিন্দু অন্য কোনো হিন্দুকে নীচ বলে ভাববে না, যখন সবাই পরস্পরকে ভাই বলে মনে করবে। শ্রীরামচন্দ্র নিষাদকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, শবরীর উচ্ছিষ্ট কুল খেয়েছিলেন....

বৃদ্ধ — আপনি যদি সেই মহাত্মাদের সন্তান, তাহলে আগের মতো উঁচু-নিচু ভেদাভেদ মানেন কেন?

লীলাধর — তার কারণ আমরা অধঃপতিত হয়েছি — অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে মহাপুরুষদের বিস্মৃত হয়েছি।

বৃদ্ধ — এখন তো আপনার ঘুম ভেঙেছে, আমাদের সঙ্গে ভোজন করবেন?

লীলাধর — আমার কোনো আপত্তি নেই।

বৃদ্ধ — আমার ছেলের সঙ্গে আপনি আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন?

লীলাধর — যতক্ষণ তোমাদের জন্মগত সংস্কার না বদলাচ্ছে, তোমাদের আহারে ও আচার-ব্যবহার পরিবর্তন না ঘটছে, ততক্ষণ আমরা তোমাদের সঙ্গে কোনো বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারিনা। মাংস খাওয়া ছাড়ো, মদ খাওয়া ছাড়ো, শিক্ষা লাভ করো, তবেই তোমরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে মিশতে পারবে।

বৃদ্ধ — আমরা এমন কত কুলীন বামুনকে চিনি, যারা রাতদিন নেশায় ডুবে থাকে, মাংস ছাড়া এক গ্রাসও মুখে তোলে না। আর এরকম তো কত লোক রয়েছে যারা একটি অক্ষরও পড়তে জানে না, অথচ তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতে দেখি আপনাদের। তাদের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করতেও আপনাদের আটকায় না। আপনি নিজেই যখন অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে আছেন, তখন আমাদের উদ্ধার করবেন কী করে? আপনার অন্তর এখনো অহংকারে পরিপূর্ণ। যান, আপনি এখন আরও কিছুদিন নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করুন। আপনাকে দিয়ে আমাদের উদ্ধার সম্ভব নয়। হিন্দুসমাজে বাস করে আমাদের কপাল থেকে নীচতার এ কলঙ্ক মুছবে না। আমরা যতই বিদ্বান, যতই আচারনিষ্ঠ হইনা কেন, আপনারা আমাদের এই রকম 'নীচ' বলেই ভাববেন। হিন্দুদের আত্মা মরে গেছে, তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে অহংকার। আমরা এখন এমন এক দেবতার শরণ নিতে চলেছি, সে দেবতাকে যারা মানে, তারা আজই আমাদের গলা জড়িয়ে ধরতে প্রস্তুত। ওরা একথা বলে না যে, তোমরা তোমাদের সংস্কার পরিবর্তন করে এসো। আমরা ভালো কিংবা মন্দ যাই হইনা কেন, এঅবস্থাতেই ওরা আমাদের ডেকে নিচ্ছে তাদের কাছে। আপনারা যদি উঁচু হন, উঁচু হয়েই থাকুন, আমাদের উড়ে গিয়ে আপনাদের নাগাল পাবার দরকার হবে না।

লীলাধর — একজন ঋষিসন্তানের মুখে এরকম কথা শুনে আমি বিস্মিত হচ্ছি। বর্ণভেদ তো মুনি-ঋষিরাই করে গেছেন, তা তোমরা কী করে মুছে ফেলবে?

বৃদ্ধ — মুনি-ঋষিদের নামে দুর্নাম রটাবেন না। এসব আপনাদের মতো পাষণ্ডেরাই তৈরি করেছে। আপনি বলছেন — তোমরা মদ খাও; কিন্তু আপনি মাতালদের জুতো চাটেন। মাংস খাওয়ার জন্যে আপনি আমাদের ঘেন্না করেন, কিন্তু যারা গো-মাংস খায়, আপনি তাদের সেলাম করেন। ওরা আপনাদের চেয়ে শক্তিশালী, সেজন্যেই নয় কী? আজ আমরা যদি রাজা হয়ে যাই, তাহলে আপনারা আমাদের সামনে এসে হাতে জোড় করে দাঁড়াবেন। আপনাদের ধর্মে যে শক্তিশালী সেই উঁচু, যে দুর্বল সেই নিচু। এটাই কি আপনাদের ধর্ম?

এই বলে বৃদ্ধ চলে গেল সেখান থেকে, তার সঙ্গে অন্য লোকজনেরাও। কেবল চৌবেজি আর তাঁর দলের লোকেরা মঞ্চের ওপর বসে রইলেন যেন মঞ্চে গান শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার প্রতিধ্বনি বাতাসে কাঁপছে তখনও।

চার

চৌবেজির আসার খবর শোনার পর থেকেই তব্‌লিগের লোকেরা ভাবছিল, যেকোনো উপায়ে ওঁদের এখান থেকে হটানো উচিত। চৌবেজির নাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ওঁরা একবার এখানে শেকড় গেড়ে বসলে তাদের প্রাণপাত মেহনত বিফলে যাবে, এটা তাদের জানা কথা। ওঁরা

যেন এখানে পাকাপোক্তভাবে ডেরা পাততে না পারে। মোল্লারা উপায় খুঁজতে শুরু করল। অনেক বাগবিতণ্ডা আর নানা যুক্তি-প্রমাণ হাজির করার পর সাব্যস্ত হল যে, এই কাফেরকে কোতল করে দেওয়াই সমীচীন। এমন পুণ্যি লুটেপুটে নেওয়ার লোকের কি আর অভাব আছে? তার জন্যে তো বেহেশতের দরজা খুলে যাবে, হুরিরা তাকে সাদর আবাহন জানাবে, ফেরেশতারা তার পদধূলি দিয়ে সুর্মা বানাবে, রসুল তার মাথায় সৌভাগ্যের হাত বুলিয়ে দেবেন, করুণাময় খোদা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলবেন — তুমি আমার প্রিয় বন্ধু। দুটি শক্ত সমর্থ যুবক তৎক্ষণাৎ সেকাজের দায়িত্ব তুলে নিল।

রাত বারোটা বেজে গেছে। হিন্দুসভার শিবিরে স্তব্ধতা। কেবল চৌবেজি তাঁর তাঁবু-কক্ষে বসে হিন্দুসভার সচিবকে চিঠি লিখছেন — এখন এখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন টাকার। টাকা! টাকা! টাকা! যতো পারেন, পাঠিয়ে দিন। ডেপুটেশন পাঠিয়ে আদায় করুন, বড়ো বড়ো মহাজনদের পকেট হাতড়ান, ভিক্ষে করুন! টাকাপয়সা ছাড়া এ হতভাগ্যদের উদ্ধার সম্ভব নয়। যতক্ষণ কোনো পাঠশালা খোলা না যায়, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা না হয়, পাঠাগারের ব্যবস্থা না হয়, ততক্ষণ ওদের কী করে বিশ্বাস হবে যে হিন্দুসভা ওদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তব্‌লীগওয়ালারা যা খরচ করছে, আমি যদি তার অর্ধেকও পাই, হিন্দুধর্মের পতাকা পতপত করে উড়তে শুরু করবে। শুধু ভাষণে কাজ হয় না, আশীর্বাদে কেউ বেঁচে থাকে না।

হঠাৎ একটা পদশব্দে চমকে উঠলেন তিনি। চোখ তুলে চাইতেই দেখলেন, দুজন লোক সামনে দাঁড়িয়ে। পণ্ডিতজি সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন — কে তোমরা? কী দরকার?

জবাব পেলেন — আমরা ইজরাইলের ফেরেশতা। তোমার জান কব্‌জ করতে এসেছি। ইজরাইল তোমাকে স্মরণ করেছেন।

পণ্ডিতজি বেশ বলিষ্ঠ পুরুষ, এক ধাক্কায় ওদের কুপোকাত করে দিতে পারেন। সকালে তিন পো মোহনভোগ আর দুসের দুধ দিয়ে জলযোগ সারেন। দুপুরে পোয়াটাক ঘি দিয়ে ডাল খান, বিকেলে দুধিয়া ভাঙ টানেন, তাতে সের খানেক মালাই আর আধ সের বাদাম মেশানো থাকে। রাতে উঠে নৈশভোজন করেন, কারণ প্রাতঃকাল পর্যন্ত তিনি আর কিছু খান না। তার ওপর এক কদমও পায়ে হাঁটেন না। পালকি ছুটে গেলে তো কথাই নেই, যেন বাড়ির খাটে বসেই উড়ে চলেছেন। কিছু না হোক, একা তো আছেই, যদিও কাশীতে দু-চারজন এমন একাওয়ালা রয়েছে, যারা তাঁকে দেখেই বলে দেয় — একা খালি নেই। পণ্ডিতজি হলেন সেরকম কুস্তিগীর যিনি আখড়ার নরম মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকেন, যাকে কোনো পালোয়ান চিৎ করতে পারে না, আবার বালির ওপর ছেড়ে দিলে যিনি কচ্ছপের মতো তরতর করে ঠিক পার হয়ে যাবেন।

পণ্ডিতজি একবার আড়চোখে দরজার দিকে তাকালেন। পালানোর কোনো সুযোগই নেই। তখন তাঁর মনে সাহস দেখা দিল। ভয়ের পরাকাষ্ঠাই তো সাহস। নিজের লাঠিটার দিকে হাত বাড়ালেন, হুঙ্কার দিয়ে বললেন — বেরিয়ে যাও এখান থেকে.....!

পুরো কথাটা মুখ দিয়ে বেরুলোই না, লাঠির ঘা পড়ল মাথায়। পণ্ডিতজি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। আততায়ীরা কাছে এসে দেখল, প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই। ভাবল, কাজ হাসিল হয়েছে। এমনিতে লুটপাট করার কোনো ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যখন আপত্তি জানাবার কেউ নেই, তখন এটা-ওটার দিকে হাত বাড়ালে ক্ষতি কী! হাতের কাছে যা পাওয়া গেল, তাই নিয়েই চম্পট দিল।

পাঁচ

ভোরবেলা বৃন্ধ যখন ওদিক দিয়ে এল, তখনও চারদিক নির্জন — কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। তাঁবুটাবুও গায়েব। তার মাথা ঘুরে গেল। এ আবার কী! রাতের মধ্যেই আলাদিনের অট্টালিকার মতো সব কিছু উধাও হয়ে গেল! রোজ যাদের প্রাতঃকালে মোহনভোগ সাবাড় করতে আর সন্ধেয় সিন্ধি ঘুঁটতে দেখা যেত, সেই সব মহাত্মাদের একজনকেও চোখে পড়ছে না। আর একটু কাছে গিয়ে সে পণ্ডিত লীলাধরের তাঁবুতে উঁকি মারল, উঁকি মারতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। পণ্ডিতজি মাটিতে মড়ার মতো পড়ে আছেন। মুখের ওপর মাছি ভনভন করছে। মাথার চুলে রক্ত এমন জমাট হয়ে আছে, যেন কোনো চিত্রকরের রঙ-মাখানো বুরুশ। সমস্ত কাপড়চোপড় রক্তে ছয়লাপ। ভাবল, পণ্ডিতজির স্যাঙাতরা ওঁকে খুন করে কেটে পড়েছে। হঠাৎ পণ্ডিতজির মুখ থেকে ককানোর আওয়াজ বেরুল। তাহলে ধড়ে প্রাণ রয়েছে এখনও! বৃন্ধ তৎক্ষণাৎ গাঁয়ে ছুটে গেল, কয়েকজন লোক ডেকে এনে পণ্ডিতজিকে তুলে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে।

মলম-পট্টি চলতে লাগল। বৃন্ধ সারা দিন সারা রাত পণ্ডিতজির পাশে বসে থাকে। বৃন্ধের স্ত্রী ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করে। গাঁয়ের লোকেরাও যথাসাধ্য সাহায্য করে। তারা ভাবে, ও বেচারির আপনার লোক কে আর আছে এখানে? আপনার বলতে আমরাই, পর বলতেও আমরাই। বেচারি তো আমাদেরই উন্ধার করতে এসেছিলেন, নইলে উনি আর এখানে আসতে যাবেন কেন? পণ্ডিতজি নিজের বাড়িতেও কয়েকবার অসুখে পড়েছেন, কিন্তু নিজের লোকজনও এমন একাগ্র হয়ে কখনও তাঁর সেবাযত্ন করেনি। সারা বাড়িটা, আর শুধু বাড়িই বা বলি কেন, সারা গাঁখানা যেন তাঁর ভৃত্যস্য ভৃত্য। অতিথি-সেবা ওদের ধর্মেরই অঙ্গবিশেষ। সভ্যতার নামে স্বার্থপরতা এখনও ওদের এই জীবনাদর্শকে গলা টিপে হত্যা করেনি। যে দেহাতি সাপের মন্ত্র জানে, এখনও সে অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে বনবাদার ভেঙে পাঁচ-দশ ক্রোশ রাস্তা পায়ে হেঁটে দৌড়ে যায় সাপের বিষ ঝাড়তে। তাকে ডবল ফি আর গাড়িভাড়া দেওয়ার দরকার হয় না। বৃন্ধ নিজের হাতে মলমূত্র সাফ করে, পণ্ডিতজির বকাঝকা সহ্য করে, সারা গাঁয়ের দুধ চেয়েচিন্তে এনে তাঁকে খাওয়ায়। তবু কখনও ভুরু কোঁচকায় না। নিজে কোথাও গেলে বাড়ির লোকজন যদি একটু অবহেলা দেখায়, তাহলে ফিরে এসে সবাইকে বকাবকি করে।

মাস খানেক কেটে গেলে পণ্ডিতজি একটু হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন। বুঝতে পারলেন, ওরা তাঁর কী উপকারটাই না করেছে! তাঁকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে ওরাই, নইলে মরতে কি আর বাকি ছিল? উপলব্ধি করলেন, যাদের তিনি নীচ বলে ভাবতেন, যাদের উন্ধার করার সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিলেন, তারাই তাঁর থেকে অনেক উন্নত। এরকম পরিস্থিতিতে তিনি হয়তো বড়জোর কাউকে কোনো হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েই নিজের কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে গর্ববোধ করতেন, ভাবতেন, আমি দধীচি ও হরিশ্চন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল করে দিলাম। তাঁর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে এই দেবতুল্য মানুষগুলোর প্রতি আশীর্বাদ ঝরে পড়তে লাগল।

ছয়

তিন মাস কেটে গেছে। না হিন্দুসভা পণ্ডিতজির কোনো খবর নিল, না তাঁর বাড়ির লোকজন। হিন্দুসভার মুখপত্রে তাঁর মৃত্যুতে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দেওয়া হল, তাঁর কাজের প্রশংসা

করা হল এবং তার স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার জন্যে চাঁদার আবেদন জানানো হল। আর বাড়ির লোকজন কান্নাকাটি করে চুপচাপ বসে রইল।

এদিকে পণ্ডিতজি দুধ-ঘি খেয়ে গোলগাল হয়ে উঠলেন। লাল হয়ে উঠল তাঁর চেহারা। মাখন আর মালাইয়ে যা না হয়েছিল, পল্লিগ্রামের জলবায়ুতে তার থেকে অনেক বেশি হল। আগের মতো শরীর-স্বাস্থ্য তখনো তৈরি হয়নি ঠিক, কিন্তু শরীরে ফুর্তি আর চনমনে ভাব দ্বিগুণ হয়ে উঠল। মেদবহুল দেহের আলস্য এখন নামমাত্রও নেই। তিনি যেন নতুন জীবন পেয়েছেন।

শীতকাল শুরু হয়েছে। পণ্ডিতজি বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। এমন সময় প্লেগ শুরু হল, গাঁয়ে তিন জন অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ চৌধুরির একজন। বাড়ির লোকেরা রুগি ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে লাগল। ওখানকার দস্তুরই তাই। যেসব ব্যাধিকে তারা দেবতার কোপ বলে মনে করে, সেই সব ব্যাধিতে আক্রান্ত রুগিদের ফেলে তারা পালিয়ে যায়। তাদের বাঁচাতে যাওয়া মানেই দেবতাদের কোপে পড়া আর দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতা করে যাবে কোথায়? দেবতা যাকে বেছে নিয়েছেন তাঁর হাত থেকে তাকে তারা কেড়ে নেওয়ার সাহস করবে কী করে? লোকগুলো পণ্ডিতজিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু পণ্ডিতজি গেলেন না। তিনি গাঁয়ে থেকে রুগিদের আরোগ্য করে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। যে তাঁকে মৃত্যুর থাবা থেকে উদ্ধার করেছে, তাকে এঅবস্থায় রেখে যাবেন কী করে? উপকারই তাঁর আত্মাকে চিন্ময় করে তুলেছে। তৃতীয় দিন জ্ঞান ফিরলে বৃদ্ধ চৌধুরি তাঁকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সে বলল — মহারাজ তুমি এখানে রয়েছ কেন? আমাদের জন্যে দেবতাদের আদেশ হয়েছে। আমাকে আর কোনোক্রমেই টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তুমি কেন নিজেকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছ। আমাকে দয়া করো, চলে যাও এখান থেকে।

কিন্তু বৃদ্ধের কথায় পণ্ডিতজির কোনো ভাবান্তর হল না। তিনি পালা করে তিন জন রুগির কাছেই যান, কখনো তাদের গুটিতে সেঁক দেন, কখনো তাদের পুরাণের কথা শোনান। ঘরে খাবার-দাবার হাঁড়ি-থালা যেমনকার তেমনিই পড়ে ছিল। পণ্ডিতজি পথ্য তৈরি করে রুগিদের খাওয়ান। রাত্রিবেলা যখন রুগিরাও ঘুমিয়ে পড়ে, সারা গাঁখানা থমথম করতে থাকে, তখন ভয়ঙ্কর সব জন্তুজানোয়ার দেখতে পান পণ্ডিতজি। বুক টিপটিপ করে তাঁর, কিন্তু সেখান থেকে নড়ার নাম করেন না। তিনি দিব্যি করেছেন, হয় এসব লোকদের তিনি বাঁচাবেনই নাহয় ওদের জন্যে নিজের জীবনটাই দিয়ে দেবেন!

কিন্তু তিন দিন ধরে সেঁকাসেঁকি আর বাঁধাবাঁধি করেও যখন রুগিদের অবস্থা একটুও ভালোর দিকে গেল না তখন পণ্ডিতজি বড়ো চিন্তায় পড়লেন। কুড়ি মাইল দূরে শহর। রেলের কথাই ওঠে না, রাস্তা বলতে জঙ্গল, ঝোপঝাড়, গাড়িঘোড়া কিছুই নেই। এদিকে আবার ভয়ও রয়েছে, রুগিদের একলা রেখে গেলে নাজানি কী দশা হয় তাদের। পণ্ডিতজি বড়ো সংকটে পড়লেন। অবশেষে, চতুর্থ দিন এক প্রহর রাত থাকতেই পণ্ডিতজি একা শহরের দিকে রওনা হলেন। দশটা বাজতে না বাজতেই পৌঁছে গেলেন সেখানে। হাসপাতালে ওষুধ নিতে গিয়েই বিপত্তি দেখা দিল। হাসপাতালের লোকেরা দেহাতিদের কাছ থেকে ওষুধের বেশ চড়া দাম আদায় করছে। পণ্ডিতজিকে মুফতে দেবে কেন? ডাক্তারবাবুর মুনশি বলল — ওষুধ তৈরি নেই।

পণ্ডিতজি কাকুতিমিনতি করে বললেন — অনেক দূর থেকে আসছি বাবু। কয়েকজন অসুখে পড়ে আছে, ওষুধ না পেলে সবাই মারা যাবে।

মুনশি রেগে গিয়ে বলল — কেন জ্বালিয়ে খাচ্ছ? বললাম তো ওষুধ তৈরি নেই। আর এত শিগগির তৈরি করাও যাবে না।

পণ্ডিতজি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন — হুজুর, আমি ব্রাহ্মণ। ঈশ্বরের কৃপায় আপনার সন্তানসন্ততি চিরজীবী হোক, দয়া করুন। আপনার নামযশ বাড়ুক।

ঘুষখোর কর্মচারীদের মনে দয়ামায়া কোথায়? ওরা তো টাকার গোলাম। পণ্ডিতজি যতই তার খোশামোদ করেন, ততোই তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। পণ্ডিতজি জীবনে কখনো নিজেকে এতো ছোটো করেননি। এসময়ে তাঁর কাছে একটা আধলাও নেই। যদি তিনি জানতেন যে ওষুধের জন্যে এমন ঝামেলা-ঝক্কি পোয়াতে হবে, তাহলে না হয়, গাঁয়ের লোকজনের কাছ থেকেই কিছু চেয়েচিন্তে নিয়ে আসতেন। বেচারা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন। এখন কী করা যায়! হঠাৎ দেখলেন, ডাক্তারবাবু বাংলো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। পণ্ডিতজি দৌড়ে গিয়ে তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন, করুণ কণ্ঠে বললেন — দীনবন্ধু, আমার বাড়িতে তিন জনের প্লেগ হয়েছে। খুব গরিব হুজুর, কিছু ওষুধপত্তর দিন।

ডাক্তারবাবুর কাছে এমন গরিব লোক রোজই আসে। পা জড়িয়ে ধরা, সামনে পড়ে পড়ে আর্তনাদ করা, এসব তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। যদি তিনি এভাবে দয়া বিলিয়ে যেতেন, তাহলে গাদাগাদা ওষুধই উড়ে যেত, এসব ঠাটবাট বজায় থাকত কী করে? কিন্তু মনের দিক দিয়ে তিনি যতই মন্দ হোন না কেন, কথা বলেন বেশ মিষ্টিমিষ্টি। পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন — রুগি কোথায়?

পণ্ডিতজি — হুজুর, রুগি তো ঘরে রয়েছে। এতদূর আনব কী করে?

ডাক্তার — রুগি ঘরে, আর তুমি এসেছ ওষুধ নিতে? কী মজার ব্যাপার! রুগি না দেখে ওষুধ দেব কী করে?

পণ্ডিতজি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। সত্যিই তো, রুগি না দেখে রোগ নির্ণয় করা যায় কী করে, কিন্তু তিন-তিনজন রুগিকে এতো দূর নিয়ে আসাও তো সোজা নয়। যদি গাঁয়ের লোক তাঁকে সাহায্য করত, তাহলে না হয় ডুলির ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু সেখানে তো যা কিছু করার, তাঁকে নিজ সামর্থ্যেই করতে হবে, এব্যাপারে গাঁয়ের লোকের কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। সাহায্য তো দূরের কথা, ওরা তো এখন তাঁর দুশমন হয়ে উঠেছে। ওদের ভয়, এই বদমাশটা দেবতাদের শত্রুতা করতে গিয়ে আমাদের ওপর না জানি আবার কী আপদবিপদ ডেকে নিয়ে আসে। অন্য কেউ হলে কবে তাকে মেরেই ফেলত। কিন্তু পণ্ডিতজির সঙ্গে ওদের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাই তাঁকে রেহাই দিয়েছে ওরা।

ডাক্তারবাবুর জবাব শুনে পণ্ডিতজির তো আর কিছু বলার ছিল না, তবু সাহস করে বললেন — হুজুর, কিছু করা যাবে না?

ডাক্তার — হাসপাতাল থেকে ওষুধপত্তর পাওয়া যাবে না। আমার কাছে আছে, দাম নিয়ে দিতে পারি।

পণ্ডিতজি — কত দাম দিতে হবে হুজুর?

ডাক্তারবাবু ওষুধের দাম বললেন দশ টাকা। আর একথাও বললেন যে, সে ওষুধে যা উপকার হবে, হাসপাতালের ওষুধে তা হবে না। বললেন — ওখানে পুরোনো ওষুধপত্তর থাকে। গরিব লোকেরা আসে, ওষুধ নিয়ে যায়, যে বাঁচার বাঁচে, যে মরার মরে, তাতে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তোমাকে যে ওষুধ দেব তা একেবারে খাঁটি ওষুধ।

দশ টাকা! — এসময়ে পণ্ডিতজির কাছে দশ টাকা দশ লাখ বলে মনে হল। ও টাকাটা তিনি একদিনে নেশাভাঙে উড়িয়ে দিতেন, কিন্তু এখন তো একটা আধলার জন্যেও তিনি অপরের মুখাপেক্ষী। কারো কাছে ধারকর্জ পাওয়ারও আশা নেই। তবে হ্যাঁ, ভিক্ষে করলে কিছু মিলতে পারে, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি দশ টাকা জোগাড় করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আধ ঘন্টা ধরে তিনি ওই রকম বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিক্ষে ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না, অথচ কখনো কারোর কাছে হাত পাতেননি তিনি। চাঁদা তুলেছেন, এক-একবারে হাজার হাজার টাকা আদায় করেছেন, কিন্তু সেকথা আলাদা। ধর্মরক্ষাকারী, জাতির সেবক, পতিতের উদ্ধারকর্তা হিসাবে চাঁদা নেওয়ার মধ্যে একটা গৌরব আছে, অর্থসাহায্যকারীদের চাঁদা গ্রহণ করে প্রকারান্তরে তাদের অনুগ্রহই করতেন তিনি। আর এখানে ভিখিরিদের মতো হাতপাতা, কাকুতিমিনতি করা, আর সেই সঙ্গে গালমন্দ হজম করাটা মেনে নিতেই হবে। কেউ বলবে — বেশ তো মোটাতাজা আছো, খাটতে পারো না? ভিক্ষে চাইতে লজ্জাও করে না তোমার? কেউ বলবে — ঘাস কেটে আনো, ভালো মজুরি দেব। তিনি যে ব্রাহ্মণ, সেকথা কেউ বিশ্বাসই করবে না। যদি এখানে তাঁর গরদের আচকান আর পাগড়িটা থাকত, গেরুয়া চাদরখানা জুটে যেত, তাহলে তিনি মজাটা দেখিয়ে দিতেন। গণকঠাকুর সেজে কোনো শাঁসালো শেঠকে ফাঁসাতে পারতেন আর ও বিদ্যেটায় তিনি ওস্তাদও বটে, কিন্তু এখানে সেসব কোথায় — কাপড়চোপড় সবই তো খোয়া গেছে। অনেক সময় বিপদকালে বুদ্ধিও নাশ হয়। তিনি যদি মাঠে দাঁড়িয়ে একটা হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়ে দিতেন, তাহলেই হয়তো তাঁর পাঁচ-দশজন ভক্ত জুটে যেত, কিন্তু সেটা তাঁর খেয়াল হল না আদৌ। তিনি সুসজ্জিত প্যান্ডেল, ফুল দিয়ে সাজানো টেবিলের সামনে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে কথার কেরামতি দেখাতে পারেন। এরকম দুরবস্থায় কে তাঁর বক্তৃতা শুনবে? লোকে ভাববে, কোনো পাগলে বকছে।

কিন্তু দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, বেশি চিন্তাভাবনার অবকাশ নেই। এখানেই যদি সন্ধে করে ফেলেন, তাহলে রাত্রে ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাছাড়া বুগিরা না জানি কী দুরবস্থায় আছে। এখন আর এমন দোমনা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তাতে যতই গালাগালি জোটে জুটবে, অপমান সইতে হয় হবে, কিন্তু ভিক্ষে ছাড়া আরে কোনো পথ নেই।

তিনি বাজারে একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু কিছু চাওয়ার সাহস হল না তাঁর।

দোকানদার জিজ্ঞেস করল — কী চাই?

পণ্ডিতজি বললেন — চালের দর কী চলছে?

কিন্তু দ্বিতীয় দোকানে পৌঁছে তিনি একটু বেশি সতর্ক হলেন। শেঠজি গদিতে বসে আছেন। পণ্ডিতজি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, গীতার একটি শ্লোক আউড়ে শোনালেন। তাঁর শুদ্ধ উচ্চারণ আর মধুর কণ্ঠস্বরে শেঠজি বিস্মিত হলেন, জিজ্ঞেস করলেন — মহাশয়ের নিবাস কোথায়?

পণ্ডিতজি — কাশী থেকে আসছি।

কথাটা বলেই পণ্ডিতজি শেঠজিকে ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা শোনালেন, শ্লোকের এমন চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন যে, তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন — মহাশয়, আসুন, আজ আমার বাড়ি পবিত্র করুন।

কোনো স্বার্থপর লোক হলে এ প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে যেত, কিন্তু পণ্ডিতজিকে ফিরতে হবে। বললেন — না শেঠজি, আমার অবকাশ নেই।

শেঠ — মহারাজ, আমার এটুকু সেবা আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।

পণ্ডিতজি যখন কিছুতেই থাকতে সম্মত হলেন না, তখন শেঠজি বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন — তাহলে আমি আপনার কী সেবা করতে পারি বলুন! কিছু একটা আদেশ করুন। আপনার বাণী শুনে তো আশ মেটেনি। আবার কখনো এদিকে এলে অবশ্যই দর্শন দেবেন।

পণ্ডিতজি — আপনার এতো ভক্তি যখন, তখন অবশ্যই আসব।

এ কথা বলে পণ্ডিতজি উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্কোচ এসে আবার তাঁর জিভ আড়ষ্ট করে তুলল। এই যে এত আদর-অভ্যর্থনা, সেটা তাঁর স্বার্থের মনোভাব প্রচ্ছন্ন আছে বলেই তো। মনের ইচ্ছেটা প্রকাশ হয়ে পড়লেই এখুনি শেঠজির চোখের চাউনি বদলে যাবে। কটকটে জবাব হয়তো না পেতে পারেন, শ্রদ্ধা থাকবে না। তিনি নীচে নেমে গেলেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ — এবার কোথায় যাব? এদিকে শীতের দিন কোনো বিলাসী ব্যক্তির ধন-ঐশ্বর্যের মতো হুহু করে চলে যাচ্ছে। নিজের ওপরেই ঝাল ঝাড়তে থাকেন তিনি — কারো কাছে না চাইলে লোকেই বা দিতে আসবে কেন? কেউ কি আমার মনের কথা জেনে বসে আছে? ধনীরা ব্রাহ্মণের পুজো করবে, সেদিন আর নেই। কোনো মহানুভব ব্যক্তি এসে তোমার হাতে টাকা গুঁজে দেবে, সে আশা ছাড়ো। তিনি ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন।

হঠাৎ শেঠজি পেছন থেকে ডাক দিলেন — পণ্ডিতজি, একটু দাঁড়ান।

পণ্ডিতজি দাঁড়ালেন। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আবার অনুরোধ করতে আসছে হয়তো! একটা টাকা এনে হাতে দেবে, তা তো নয় না-জানি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কী করবে!

কিন্তু যখন শেঠজি সত্যিসত্যিই একটা গিনি বের করে তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন, তখন কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। আছে! এখনও যথার্থ ধর্মাত্মা জীব সংসারে আছে, নইলে কি এই পৃথিবী রসাতলে যেত না? এই মুহূর্তে যদি শেঠজির মঙ্গলের জন্যে নিজের দেহ থেকে এক-আধ সের রক্ত দিতে হত তাঁকে, তাও তিনি খুশি হয়েই দিয়ে দিতেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন — এটার তো কোনো দরকার ছিল না, শেঠজি! আমি ভিক্ষুক নই, আপনার সেবক!

শেঠজি ভক্তি ও বিনয়ের সঙ্গে বললেন — ঠাকুর, নিতে অমত করবেন না। এটা দান নয়, উপহার। আমিও লোক চিনি। অনেক সাধুসন্ন্যাসী, দেশ ও ধর্মের বহু সেবকই তো আসেন, কিন্তু কেন জানিনা, কারোর প্রতিই আমার মনে ভক্তি জাগে না। তাদের হটানোর জন্যেই ব্যস্ত হতে হয় আমার। আপনার সঙ্কোচ দেখেই বুঝেছি যে, আপনার এটা পেশা নয়। আপনি বিদ্বান, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, কোনো সঙ্কটে পড়েছেন। এই তুচ্ছ উপহারটুকু গ্রহণ করে আমায় আশীর্বাদ করুন।

সাত

পণ্ডিতজি ওষুধপত্তর নিয়ে যখন গ্রামের দিকে রওনা হলেন, তখন এই জয়লাভে তাঁর মন থেকে আনন্দ-উল্লাস উপচে পড়ছে। সঞ্জীবনী-মূল সংগ্রহ করে এনে সম্ভবত হনুমানজিও অত খুশি হননি। এমন অকৃত্রিম আনন্দ তিনি জীবনে কখনো পাননি। এমন পবিত্র অনুভূতি আর কখনও সঞ্চারিত হয়নি তাঁর মনে।

সামান্য একটু বেলা রয়েছে। সূয্যিঠাকুর অবিরাম গতিতে পশ্চিমে ছুটে চলেছেন। তাঁরও কি কোনো রুগিকে ওষুধ দিতে হবে? দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে সূয্যিঠাকুর পর্বতের আড়ালে চলে গেলেন। পণ্ডিতজি আরো জোরে পা চালাতে লাগলেন, যেন তিনি সূয্যিঠাকুরকে ধরে ফেলার সংকল্প করেছেন।

দেখতে দেখতে চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। আকাশে দু-একটি নক্ষত্র চোখে পড়ছে। এখনও দশ মাইল পথ বাকি। মাথার ওপর কালো মেঘের ঘটা দেখে গৃহিণী যেমন দৌড়ঝাঁপ করে শুকনো কাপড়চোপড় গুটোতে শুরু করে, লীলাধরও তেমনি দৌড়তে শুরু করলেন। পথিমধ্যে একলা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিলনা, তাঁর ভয় ছিল অন্ধকারে পথ হারোনোর। ডাইনে-বাঁয়ে গ্রামগুলো ফেলে চলেছেন তিনি। পণ্ডিতজির কাছে এসব গ্রাম এখন বড়ো সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। লোকেরা অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে কীরকম তৃপ্তিসহকারে আগুন পোয়াচ্ছে!

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটা কুকর। কে জানে কোত্থেকে কুকুরটা এসে তাঁর সামনে সামনে পাকদণ্ডি ধরে চলতে শুরু করল। পণ্ডিতজি চমকে উঠলেন, মুহূর্তে কুকুরটিকে চিনতে পারলেন তিনি। ওটা বৃদ্ধ চৌধুরির কুকুর মোতি। গাঁ ছেড়ে আজ এত দূরে ওটা এসে পড়ল কী করে? ও কি বুঝতে পেরেছে যে পণ্ডিতজি ওষুধ নিয়ে ফিরছেন, হয়তো কোথাও পথ হারাতে পারেন? কে জানে! পণ্ডিতজি একবার 'মোতি' বলে ডাকলেন, অমনি কুকুরটা লেজ নাড়ল, কিন্তু দাঁড়াল না। এর চেয়ে বেশি পরিচয় দিতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না সে। পণ্ডিতজি বুঝতে পারলেন, ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, তিনিই রক্ষা করছেন তাঁকে। এতক্ষণে তাঁর বিশ্বাস হল যে, নিরাপদে বাড়ি পৌঁছোতে পারবেন।

তিনি যখন বাড়ি পৌঁছলেন তখন রাত দশটা।

ব্যাধি মারাত্মক ছিল না, কিন্তু যশ রয়েছে পণ্ডিতজির কপালে, সপ্তাহখানেক পরেই তিনজন রুগিই সুস্থ হয়ে উঠল। পণ্ডিতজির সুখ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তিনি যমদেবতার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে লোকগুলোর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে লড়াই করেও জেতেন তিনি — অসম্ভব সম্ভব করে চোখের সামনে দেখান। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তাঁকে দর্শন করার জন্যে দূর দূর থেকে লোক আসে — কিন্তু রুগিদের চলাফেরা করে বেড়াতে দেখে পণ্ডিতজির যেরকম আনন্দ, নিজের কীর্তির জন্যে ততটা নয়।

চৌধুরি বলে — ঠাকুর, তুমি সাক্ষাৎ ভগবান! তুমি যদি না এসে পড়ত, তাহলে আমরা বাঁচতাম না।

পণ্ডিতজি বলেন — আমি কিছুই করিনি। সবই ঈশ্বরের কৃপা!

চৌধুরি — আমরা তোমাকে আর কখনো যেতে দেব না। তুমি গিয়ে তোমার ছেলেপিলেদেরও এখানে নিয়ে এস।

পণ্ডিতজি — হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। তোমাদের ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে পারব না।

আট

ময়দান ফাঁকা পেয়ে মোল্লারা আশপাশের গ্রামগুলোয় খুব জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। গ্রাম-কে-গ্রাম মুসলমান হয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে হিন্দুসভা একেবারে চুপ মেরে গেছে। কারো হিম্মতই নেই যে এদিকে আসে। দূরে বসে বসে সবাই মুসলমানদের ওপর গোলাবারুদ ছুঁড়ছে। এই হত্যার কী করে বদলা নেওয়া যায়, সেটাই এখন তাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদনপত্র পাঠানো হচ্ছে যে এব্যাপারে একটা তদন্ত করা হোক অথচ সেই তরফ থেকে বারবার শুধু একই জবাব — হত্যাকারীদের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে পণ্ডিতজির স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্যে চাঁদা সংগ্রহের কাজ চলছে পুরোদমে।

কিন্তু এই নতুন দীপ্তি মোল্লাদের মুখচোখ বিবর্ণ করে দিল। সেখানে এমন এক দেবতা অবতীর্ণ হয়েছেন যিনি মরা লাশকেও বাঁচিয়ে দেন, যিনি তাঁর ভক্তদের মঙ্গলের জন্যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারেন। মোল্লাদের মধ্যে সেই সিদ্ধি, সেই মহিমা, সেই অলৌকিক ক্ষমতা কোথায়? এরূপ এক জ্বলন্ত উপকারের সামনে জান্নাত আর ভ্রাতৃত্বের আনকোরা যুক্তি-প্রমাণ কি দাঁড়াতে পারে? পণ্ডিতজি এখন আর নিজের ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে দর্প করার পণ্ডিতজি নন। তিনি শূদ্র আর ভিলদেরও ভালোবাসতে শিখেছেন। তাদের বুকে জড়িয়ে ধরতে পণ্ডিতজি আর ঘৃণা বোধ করেন না। নিজেদের ঘর অন্ধকার দেখেই তারা ইসলামি প্রদীপের দিকে ঝুঁকেছিল। এখন তাদের নিজেদের ঘর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, অন্যের দ্বারে যাওয়ার কী প্রয়োজন তাদের। সনাতন ধর্মের জয়-জয়কার ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। গাঁয়ে গাঁয়ে মন্দির তৈরি হয়, সকাল-সন্ধ্যে মন্দিরে শঙ্খ-ঘন্টার আওয়াজ শোনা যায়। লোকের আচারব্যবহার আপনা থেকেই মার্জিত হয়ে উঠতে থাকে। পণ্ডিতজি কাউকেই শুদ্ধ করেননি। এখন 'শুদ্ধি'-র নাম নিতেই লজ্জা বোধ করেন তিনি — আমি কেন ওদের শুদ্ধ করতে যাব বাপু, আগে নিজেকেই শুদ্ধ করে নিই। এমন নির্মল পবিত্র আত্মা যাদের, 'শুদ্ধি'-র ভণ্ডামিতে তাদের অপমান করতে পারি না।

এই সেই মন্ত্র, যা চণ্ডালেরাই তাঁকে শিখিয়েছে, আর তারই জোরে তিনি নিজের ধর্মকে সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

পণ্ডিতজি এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু এখন সপরিবারে সেখানেই, সেই ভিলদের সঙ্গেই থাকেন তিনি।

(মন্ত্র ১ / ১৯২৬) অনুবাদ আশরফ চৌধুরী

ডাকহরকরা

আমার বাল্যস্মৃতিতে 'কজ্জাকি' এমনই একজন মানুষ, যাকে আজও ভুলতে পারিনি। চল্লিশ বছর কেটে যাওয়ার পরেও কজ্জাকির মূর্তি এখনও আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় আমি আমার বাবার সঙ্গে আজমগড়ের একটা তহশিলে থাকতাম। কজ্জাকি জাতিতে ছিল 'পাসি' [অর্থাৎ তাল-খেজুরের রস কেটে পেড়ে আনাই ছিল তাদের জাত-ব্যাবসা।] মানুষটি ছিল হাসিখুশি, সাহসী আর প্রাণবন্ত। প্রতিদিন সন্ধেয় সে মেলব্যাগ নিয়ে আসত। সারা রাত থেকে আবার ভোরবেলায় ডাক নিয়ে চলে যেত। ফের সন্ধেয় আসত ওই দিকের ডাক নিয়ে। সারা দিন আমি তার আসবার পথের দিকে উদ্‌বিগ্ন হয়ে চেয়ে থাকতাম। বিকেল চারটে বাজলেই আমি ব্যাকুল হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়তাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়ত কাঁধে ঝুন্‌ঝুন্ শব্দওয়ালা বল্লম নিয়ে কজ্জাকি ছুটে আসছে দূর থেকে। কজ্জাকি ছিল শ্যামলা রঙের, মজবুত গড়নের লম্বাচওড়া জোয়ান। তার শরীর এমন সুন্দর ছাঁচে ঢেলে তৈরি যে কোনও নিপুণ ভাস্করও তার মধ্যে কোনো খুঁত বার করতে পারত না। তার সুঠাম চেহারায় ছোটো ছোটো গোঁফ দেখতে খুব সুন্দর লাগত। আমায় দেখতে পেয়েই সে আরও জোরে ছুটতে আরম্ভ করত। তার ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ বাজত আরও জোরে। আনন্দে আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে থাকত। খুশির উচ্ছ্বাসে আমি দৌড় লাগাতাম আর নিমেষের মধ্যে তার কাঁধ হয়ে যেত আমার সিংহাসন। সেই জায়গাটুকু ছিল আমার আকাঙ্ক্ষার স্বর্গ। কজ্জাকির বিশাল কাঁধে চেপে দোলার যে আনন্দ আমি পেতাম স্বর্গের বাসিন্দারাও বুঝি কখনো তা পায়নি। বিশ্বসংসার আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যেত, আর কজ্জাকি যখন আমায় কাঁধে চড়িয়ে দৌড়োত তখন তো মনে হত আমি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে উড়ে চলেছি।

কজ্জাকি ঘেমে নেয়ে পোস্টাপিসে পৌঁছোত। কিন্তু বিশ্রাম করার অভ্যাস ছিল না। ডাকের থলে নামিয়েই সে আমাদের নিয়ে বেড়িয়ে পড়ত মাঠে। কখনও আমাদের সঙ্গে খেলত। কখনও বা 'বিরহা' গান গেয়ে শোনাত। কখনও আবার গল্প শোনাত। চুরিডাকাতি, মারপিট, ভূতপ্রেতের শত শত গল্প তার মুখস্থ ছিল। তার গল্প শুনতে শুনতে আমি আনন্দে-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তাম। তার গল্পের চোর-ডাকাতেরা হত এমন সত্যিকারের বীর, যারা ধনী ব্যক্তিদের সম্পত্তি লুট করে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। তাদের প্রতি ঘৃণার বদলে আমার শ্রদ্ধাই হত।

দুই

একদিন ডাক নিয়ে আসতে কজ্জাকির দেরি হয়ে গেল। সূর্য ডুবে গেল, তবু তার দেখা নেই। আমি সব কিছু ভুলে রাস্তায় অনেক দূর পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছিলাম। কিন্তু সেই

পরিচিত মূর্তিটির কোনো উদ্দেশ নেই। কান পেতে রইলাম কিন্তু সেই মনোহারী ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার আশাও মিলিয়ে আসছিল। ওদিক থেকে কাউকে আসতে দেখলেই জিজ্ঞেস করছিলাম, কজাকি আসছে কি? কেউ হয়তো চলে যাচ্ছিল না শুনেই, কেউবা মাথাটা একটু নাড়ছিল শুধু।

এমন সময় হঠাৎ ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ কানে পৌঁছল। এমনিতে অন্ধকার নামলে চারপাশে শুধু ভূত দেখতাম। এমন কী মায়ের ঘরের তাকের উপর রাখা মিষ্টিও অন্ধকার হয়ে গেলে নিষিদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু সেই শব্দ কানে যেতে আমি সেদিকে ছুটলাম। হ্যাঁ, কজাকি ছাড়া আর কে। তাকে দেখতে পেয়ে আমার এতক্ষণের উতলা ভাব ক্রোধের রূপ নিল। আমি তাকে মারতে শুরু করলাম। তারপর অভিমান করে সরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কজাকি হেসে বলল — আমায় মারবে, এই তো? বেশ, একটা জিনিস এনেছি দেব না।

আমি সাহস দেখিয়ে বললাম — যাও দিতে হবে না। আমি নেবই না।

কজাকি — দেখালেই তো এখুনি দৌড়ে এসে কোলে তুলে নেবে।

আমি গলে গিয়ে বললাম — আচ্ছা দেখাও।

কজাকি — তাহলে এসে আমার কাঁধে বসো। দৌড়ে যাই। আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাবুজি খুব রেগে আছেন নিশ্চয়।

আমি গোঁ ধরে বললাম — আগে দেখাও।

আমারই জয় হল। যদি দেরি করে ফেলার জন্য কজাকির মনে ভয় না থাকত আর সে আরও এক মিনিট অপেক্ষা করতে পারত তাহলে পাশার চাল হত অন্য রকম। একহাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখা একটা জিনিস সে দেখাল। তার লম্বা মুখ আর চোখ দুটো চকচক করছিল।

আমি এক দৌড়ে কজাকির কোল থেকে সেটাকে ছিনিয়ে নিলাম। একটা হরিণের বাচ্চা! ওঃ, আমার তখনকার খুশি মাপতে পারে এমন সাধ্য কার? তারপর থেকে অনেক শক্ত শক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। ভালো ভালো পদকও পেয়েছি। রায়বাহাদুরও হয়েছি। কিন্তু সেদিনের সেই আনন্দ কোনোদিনও পাইনি। আমি ওটাকে কোলে তুলে তার কোমল স্পর্শের সুখ অনুভব করতে করতে বাড়ির দিকে ছুটলাম। কজাকির আসতে কেন যে এত দেরি হল সেদিকে খেয়ালই রইল না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম — কোথায় পেলে একে, কজাকি?

কজাকি — ভাই, এখান থেকে খানিক দূরে একটা ছোট্ট জঙ্গল আছে। সেখানে অনেক হরিণ। আমার খুব ইচ্ছে ছিল একটা বাচ্চা পেলে তোমাকে দিই। আজ হরিণের দলে এই বাচ্চাটা ছিল। আমি দলটাকে তাড়া করলাম। হরিণগুলো তো অনেক দূর দৌড়ে পালাল। এই বাচ্চাটাও দৌড়ল। আমিও তাকে ধাওয়া করতে ছাড়লাম না। তাই এত দেরি হয়ে গেল।

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমরা পোস্টাপিসে পৌঁছে গেলাম। বাবুজি আমাকে দেখতে পেলেন না, হরিণের বাচ্চাটাকেও না। তাঁর চোখ কজাকির ওপরেই পড়ল। রেগে বললেন — আজ এত দেরি কোথায় করলি? এখন ডাকের থলে আনলি। ওটা নিয়ে আমি এখন কী করব? ডাক তো চলে গেছে। বল্, কোথায় এত দেরি করলি?

কজাকির মুখ থেকে একটাও শব্দ বেরোল না।

বাবা বললেন — তোর বোধ হয় আর চাকরি করার দরকার নেই। ছোটোলোকের জাত। পেটে দানা পড়লেই মুটিয়ে যাস। যখন খিদের জ্বালায় মরবি তখন চোখ খুলবে।

কজাকি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবার রাগ আরও বেড়ে গেল, বললেন যা ঝোলা রাখ। রেখে নিজের বাড়ির পথ দ্যাখ। শুয়োর কোথাকার, এখন ডাক নিয়ে এসেছে। তোর আর কী ক্ষতি হবে। যেখানে যাবি কুলিমজুরি জুটিয়ে নিবি। মাথা তো আমার কাটা যাবে। কৈফিয়ত তো আমার কাছ থেকে তলব করা হবে।

কজাকি কান্নাভেজা গলায় বলল — হুজুর, আর কখনও এমন দেরি হবে না।

বাবা — আজ কেন দেরি হল তার জবাব দে?

কজাকির কাছে এর কোনো উত্তর ছিল না। আর আশ্চর্য যে, আমারও মুখ বন্ধ রইল। বাবা বড়ো রাগী ছিলেন। ওঁকে অনেক কাজ সামলাতে হত। তাই কথায় কথায় জ্বলে উঠতেন। আমি তো কখনও ওঁর কাছেপিঠে যেতাম না। উনিও কখনও আমায় আদর করতেন না। দিনে দুবার ঘন্টাখানেকের জন্যে বাড়িতে খেতে আসতেন। তাছাড়া সারাদিনই অফিসে লেখালেখি করতেন। উনি বারবার একজন সহকারী চেয়ে ওপরওয়ালার কাছে আর্জি পাঠিয়েছিন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। এমনকী ছুটির দিনেও বাবা অফিসে থাকতেন। একমাত্র মাই যা তাঁর রাগ কমাতে পারতেন। কিন্তু মা অফিসের ভেতর যান কী করে।

বেচারা কজাকিকে তখনই আমার চোখের সামনে ভাগিয়ে দেওযা হল। আর পোস্টাপিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নাদিরশাহি হুকুম জারি হল। তার বল্লম, চাপরাশ আর মাথার পাগড়ি কেড়ে নেওয়া হল। আর, সে সময় মনে হচ্ছিল আমি যদি স্বর্ণলংকার মালিক হতাম তো কজাকিকে তা দান করে দিয়ে বাবাকে দেখিয়ে দিতাম যে, কাজ থেকে সরিয়ে দিয়ে কজাকির কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি কেউ। যোদ্ধার যেমন তার নিজের তলোয়ারের সম্বন্ধে এক ধরনের গর্ববোধ থাকে কজাকির তেমনই গর্ব ছিল তার চাপরাশটাকে নিয়ে। সে যখন তার চাপরাশ খুলছিল তখন তার হাত কাঁপছিল আর চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছিল। সেই সময় এই সমস্ত উৎপাতের মূল, সেই ছোট্ট হরিণছানাটি আমার কোলের মধ্যে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ গুঁজে বসে ছিল যেন সে তার মায়ের কোলেই রয়েছে। কজাকি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি তার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। আমাদের বাড়ির দরজার কাছে এসে কজাকি বলল — ভাই, এবার বাড়ি যাও। সন্ধে হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে চোখের জল চাপছিলাম। কজাকি আবার বলল — ভাই, আমি কি অন্য কোথাও চলে যাব। আবার আসব তোমায় কাঁধে চড়িয়ে নাচাব। বাবুজি আমার চাকরি কেড়ে নিয়েছেন বলে কি এটুকুও করতে দেবেন না? তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না ভাই। মাকে গিয়ে বলো কজাকি চলে যাচ্ছে, তার সমস্ত দোষত্রুটি যেন মাপ করে দেন।

আমি দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলাম। কিন্তু মাকে কিছু বলার বদলে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলাম। মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন — কী হয়েছে, বাবা? কে মেরেছে? বাবা কিছু বলেছে তোমায়? আচ্ছা তুমি দাঁড়াও, বাবাকে বাড়ি আসতে দাও। ঠিক বলব, যখন-তখন আমার ছেলেটার গায়ে হাত তোলা হয়। চুপ করো, বাবা। আর কখনও ওঁর কাছে যেয়ো না।

আমি অতি কষ্টে গলা পরিষ্কার করে শুধু বললাম — কজাকি...। মা ভাবলেন কজাকি মেরেছে। বললেন — আচ্ছা! আসতে দাও কজাকিকে। দেখ না ওকে কাজ থেকে এক্ষুনি কেমন

তাড়িয়ে দিই। হরকরা হয়ে আমার সোনার চাঁদের গায়ে হাত। আজই বল্লম পাগড়ি সব কেড়ে নেওয়াব। দেখাচ্ছি!

আমি তখন তাড়াতাড়ি বললাম — না, কজাকি আমায় মারেনি। বাবা ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। ওর পাগড়ি, বল্লম কেড়ে নিয়েছেন। চাপরাশও কেড়ে নিয়েছেন।

মা — এ তোমার বাবা ভারি অন্যায় করেছেন। ও সে তো নিজের কাজে খুব চৌকশ। তবে শুধু শুধু ওকে কাজ থেকে কেন বার করে দিলেন?

আমি বললাম — আজ ওর দেরি হয়ে গেছিল। বলে হরিণের বাচ্চাটাকে কোল থেকে নীচে নামিয়ে দিলাম। মা এতক্ষণ ওটাকে দেখতে পাননি। ওকে হঠাৎ লাফাতে দেখে তিনি চমকে উঠলেন আর লাফিয়ে আমার হাত ধরে টান দিলেন যাতে সেই ভয়ংকর জীবটা আমায় কামড়ে টামড়ে না দেয়। কোথায় এতক্ষণ ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলাম, কিন্তু মায়ের ভয় দেখে খিলখিল করে হেসে ফেললাম।

মা — আরে! এটা তো হরিণের বাচ্চা! কোথায় পেলি?

আমি হরিণছানার পুরো বৃত্তান্ত আর তার নিদারুণ পরিণামের বিষয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাকে শোনালাম। বললাম — মা, এটা এত জোরে দৌড়োয় যে আর কেউ হলে একে ধরতে পারত না। শন্ শন্ শব্দে হাওয়ার বেগে ছুটছিল। পাঁচ-ছ ঘণ্টা এর পেছনে দৌড়ে তবে কজাকি এটাকে ধরতে পারে। জানো মা, দুনিয়ায় কজাকির মতো জোরে কেউ দৌড়োতে পারে না। এরই জন্যে কজাকির ফিরতে দেরি হয়েছিল। তাই বাবা বেচারাকে কাজ থেকে বার করে দিলেন। ওর চাপরাশ, বল্লম, পাগড়ি সব কিছু কেড়ে নিয়েছেন। এখন বেচারি কী করবে বলো? না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

মা জিজ্ঞেস করলেন — কোথায় রে কজাকি? ওকে একটু ডেকে আন্ তো।

আমি বললাম — বাইরে তো দাঁড়িয়েছিল। আমায় বলল, মাকে বলো, আমার দোষত্রুটি যেন মাপ করে দেন।

এতক্ষণ মা আমার কথাকে ঠাট্টা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। বোধ হয় বাবা কজাকিকে ধমক-টমক দিয়েছেন। কিন্তু আমার শেষ কথাটা শুনে তাঁর সন্দেহ হল সত্যিই কি তাহলে কজাকিকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মা বাইরে এসে বার বার কজাকির নাম ধরে জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু কজাকিকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। আমিও অনেক ডাকলাম। কিন্তু কজাকি কোথায়?

রাতের খাওয়া তো আমি খেয়েই নিয়েছিলাম। শোকতাপ পেলেও ছেলেমানুষ কি আর খাওয়া ভোলে? বিশেষ করে পাতে যখন রাবড়ি দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক রাত অবধি জেগে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম আমার যদি টাকা থাকত তো একলাখ টাকা কজাকিকে দিয়ে বলতাম — বাবাকে কখনও গোলো না। বেচারা না খেতে পেয়েই মরে যাবে। দেখি কাল আসে কি না। আর এখন এসেই বা কী করবে! কিন্তু আসবে তো বলে গেছে। কাল আমি ওকে আমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াব।

এই সব কল্পনার ফানুস বানাতে বানাতে কখন যেন আমার ঘুম এসে গেল।

তিন

তার পরের দিন সারাক্ষণই সেই হরিণশিশুর সেবাযত্নে ব্যস্ত রইলাম। প্রথমে হল ওর নামকরণ অনুষ্ঠান। ওর নাম রাখা হল 'মুন্নু'। তারপর আমার বন্ধুবান্ধব আর সহপাঠীদের সঙ্গে ওর পরিচয়

করানো হল। একদিনেই সে আমার এমন ন্যাওটা হয়ে পড়ল যে সারাটা ক্ষণ আমার পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল। এটুকু সময়ের মধ্যেই সে আমার জীবনের একটা মস্ত জায়গা জুড়ে বসল। ভবিষ্যতে আমার যে বিশাল বাড়ি তৈরি হবে সেখানে ওর জন্যেও একটা আলাদা ঘর বানিয়ে দেবার সংকল্প করে ফেললাম। ওর শোওয়ার জন্যে খাট আর বেড়ানোর জন্যে ফিটন গাড়িরও বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

কিন্তু সন্ধে হতেই সব কিছু ছেড়েছুড়ে আমি রাস্তায় এসে কজাকির পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যদিও জানতাম কজাকিকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন তার আসার আর দরকার নেই — তবুও কেন জানি না, আশা হচ্ছিল সে আসবে। হঠাৎ আমার মনে হল কজাকি হয়তো না খেয়ে মরতে বসেছে। আমি তক্ষুনি ঘরে এলাম। মা 'সন্ধ্যা' দিচ্ছেন। আমি চুপি চুপি একটা ঝুড়িতে আটা বার করলাম। হাতময় আটা মেখে ঝুড়ি থেকে ছড়িয়ে-পড়া আটার একটা রেখা তৈরি করতে করতে আমি দৌড় দিলাম। এসে রাস্তায় দাঁড়ানো মাত্র দেখতে পেলাম সামনের দিক থেকে কজাকি আসছে। তার হাতে বল্লম, কোমরে চাপরাশ, মাথায় পাগড়ি সবই মজুত। বল্লমে ডাকের ঝোলাও বাঁধা ছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে অবাক হয়ে বললাম — তুমি এই চাপরাশ, বল্লম এসব কোত্থেকে পেলে, কজাকি? কজাকি আমায় ওর কাঁধের ওপর বসাতে বসাতে বলল — ওই সব চাপরাশ, বল্লম কি কোনো কাজের ছিল ভাই? ওগুলো ছিল গোলামির। আর এই পুরানো চাপরাশ যা আমি এখন পরে আছি এগুলো হচ্ছে আমার নিজের খুশির। আগে ছিলাম সরকারি চাকর, এখন আমি তোমার চাকর। বলতে বলতে তার চোখ সামনে রাখা ঝুড়ির ওপর পড়ল। সে জিজ্ঞেস করল — ভাই, এই আটা কীসের?

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম — তোমার জনেই তো এনেছি। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আজ কী খেয়েছ বল।

কজাকির চোখ তো আমি দেখতে পেলাম না, কেন না আমি তার কাঁধে বসে ছিলাম। কিন্তু তার গলার স্বরে বোঝা গেল, কান্নায় তা বুজে আসছে। বলল — ভাই, আমি কি শুধু শুকনো রুটি খাব? ডাল, নুন, ঘি — এসব কই?

এরকম ভুলের জন্য আমি খুব লজ্জায় পড়লাম। সত্যিই তো বেচারা শুকনো রুটি কী করে খায়! কিন্তু নুন, ডাল, ঘি এসব বা আনি কী ভাবে? এখন তো মা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে এসে গেছেন। আটা নিয়ে তো কোনোরকমে পালিয়ে এসেছি (তখন তো জানতাম না যে, আমার চৌর্যবৃত্তি ধরা পড়ে গেছে, ছড়িয়ে পড়া আটার তৈরি রেখাই আমায় ধরিয়ে দিয়েছে) — এখন এই তিন-তিনটে জিনিস আনি কী করে? মার কাছে চাইলে কখনো দেবেন না। এক ঘন্টা কান্নাকাটির পর তো একটা পয়সা হাতে দেন। এতগুলো জিনিস কেন দিতে যাবেন? হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। বইয়ের ব্যাগে কয়েক আনা পয়সা আমি ফেলে রেখেছিলাম। পয়সা জমিয়ে আমি খুব আনন্দ পেতাম। জানি না সেই অভ্যেস কী করে বদলে গেল। সেই অভ্যোস বজায় থাকলে আজ আমার ভাঁড়ে মা ভবানীর দশা হত না।

বাবা এমনিতে কখনও আমায় আদর করতেন না, কিন্তু পয়সা বেশ দিতেন। বোধ হয় নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে আপদ বিদায়ের এটাই সহজ উপায় ভেবেছিলেন। পয়সা না দিতে চাইলে

আমার কান্নাকাটির ভয় ছিল। এই বিপত্তিকে তিন দূর থেকে ওইভাবে এড়িয়ে যেতেন। মায়ের স্বভাব ছিল একদম এর বিপরীত। আমার কান্নাকাটির জন্য ওঁর কোনো কাজ ভেস্তে যাওয়ার ভয় ছিল না। শুয়ে শুয়ে মানুষ সারাদিন কান্নাকাটি সহ্য করতে পারে। কিন্তু যাকে টাকাপয়সার হিসেব করতে হয় কান্নাকাটিতে তার একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। মা এমনিতে আমায় খুব ভালোবাসতেন, আদর করতেন কিন্তু পয়সা-টয়সার জন্যে বায়না শুনলেই ওঁর ভুরু কুঁচকে যেত। আমার বইপত্র ছিল না। তবে একটা ব্যাগ ছিল। আর ডাকঘরের দু-চারটে ফর্ম বইয়ের মতো ভাঁজ করে সেই ব্যাগে রাখা ছিল। আমি ভাবলাম নুন, ডাল, ঘি কি আর ওই পয়সায় হবে না? পয়সাগুলো তো আমার মুঠোতেই ধরে না। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আমি বললাম — আচ্ছা, আমায় নামিয়ে দাও। আমি তাহলে ডাল, নুন সব এনে দিই। কিন্তু রোজ আসবে তো?

কজাকি — ভাই, তুমি খেতে দেবে, আর আমি আসব না?

আমি বললাম — আমি রোজ খেতে দেব তোমাকে।

কজাকি বলল — তবে আমি রোজই আসব।

আমি কোল থেকে নেমে দৌড়ে সমস্ত পুঁজি এনে হাজির করলাম। কজাকিকে প্রতিদিন ডাকবার জন্যে যদি কোহিনুর হীরাও আমার কাছে থাকত তো সেটা নজরানা দিতেও আমার দ্বিধা হত না।

কজাকি অবাক হয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল — ভাই, এ পয়সা তুমি কোত্থেকে পেলে?

আমি সগর্বে জবাব দিলাম — এতো আমারই।

কজাকি বলল — তোমার মা তোমায় মারবেন। বলবেন, আমি ফুঁসলিয়ে তোমার কাছ থেকে নিয়েছি। ভাই, এ পয়সা দিয়ে তুমি মিষ্টি কিনে নিয়ো আর আটা রাখার পাত্রে এ আটা রেখে এস। আমি না খেতে পেয়ে মরব না, আমার দুটো হাত আছে। না খেয়ে কি আমি মরতে পারি?

আমি অনেক করে বোঝালাম এ পয়সা আমার। কিন্তু কজাকি তা নিল না। সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাকে কাঁধে চাপিয়ে এদিকে-ওদিক ঘুরিয়ে আমায় গান শোনাল। তারপর চলে গেল। আমাদের বাড়ির দরজার চৌকাঠে আটার ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে গেল।

আমি ঘরে পা দেওয়ামাত্র মা ধমকে উঠলেন — কী রে, চোর, আটা নিয়ে কোথায় গেছিলি? এবার চুরি করতে শিখেছিস? বল্ কাকে আটা দিয়ে এলি, নয়তো তোর গায়ের চামড়া তুলব।

ভয়ে তো আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেল। রাগ হলে মা একদম সিংহীর মতো ভয়ংকর হয়ে উঠত।

ঢোক গিলে বললাম — কাউকে তো দিই নি।

মা বললেন — তুই আটা বের করিস নি? দ্যাখ্ উঠোনময় কত আটা ছড়িয়ে।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মা যতই ধমক-ধামক দিন আমি একদম বোবা। ভবিষ্যৎ বিপত্তির কথা ভেবে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছিল। এমন কী এটা বলারও সাহস হচ্ছে না যে, রাগ করছ কেন, আটা তো দরজার বাইরেই রয়েছে। আবার সেটা তুলে ঘরে আনারও সাহস হচ্ছিল না। আমার সব শক্তিই এই যেন লোপ পেয়েছে। পা নড়াবার ক্ষমতাও উবে গেছে।

হঠাৎ কজাকি ডেকে বলল — মা, আটা দরজার গোড়াতেই রয়েছে। ভাইয়া আমায় দেওয়ার জন্যে নিয়ে গেছিল।

এই কথা শুনেই মা দরজার বাইরে এলেন। কজাকির সামনে উনি বের হতেন। কোনোরকম পর্দা ছিল না। মায়ের সঙ্গে কজাকির কোনো কথাবার্তা হয়েছিল কি না জানি না। কিন্তু মা খালি ঝুড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর ঘরের ভেতর গিয়ে সিন্দুক থেকে কিছু নিয়ে আবার দরজায় গেলেন। দেখলাম ওঁর হাত মুঠো করা। আর ওখানে থাকতে পারলাম না। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও গেলাম। মা সদরের বাইরে গিয়ে কয়েকবার কজাকিকে ডাকাডাকি করলেন কিন্তু সে আর ছিল না ওখানে।

আমি আস্তে করে মাকে জিজ্ঞেস করলাম — মা, আমি খুঁজে নিয়ে আসব? মা দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন — এই অন্ধকারে তুই কোথায় গিয়ে খুঁজবি? এই তো এখানেই দাঁড়িয়েছিল। আমি বললাম এখানেই থাকতে, আসছি এক্ষুনি। তা আমার আসতে আসতে কী জানি কোথায় পালাল! বড্ড মুখচোরা। আটা কিছুতেই নেবে না। আমি জোর করে ওর গামছায় বেঁধে দিলাম। ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। কী জানি বেচারার ঘরে খাবার-দাবার কিছু আছে কি না! সেই জন্যে টাকা আনলাম যে হাতে দেব। তো কোন ফাঁকে কী জানি কোথায় চলে গেল!

আমারও সাহস হল। আটা চুরির সব বৃত্তান্ত মাকে খুলে বললাম। বাচ্চাদের সঙ্গে বুঝদার বাচ্চার মতো হতে হবে মা-বাবাকে। তাহলে তারা বাচ্চাদের মনে যতটা দাগ কাটতে পারবে, যতটা শিক্ষা দিতে পারবে তাদের, বুড়ো মানুষ সেজে থাকলে ততটা পারবে না।

মা বললেন — তুই আমায় জিজ্ঞেস করে নিলি না কেন? আমি কি কজাকিকে একটু আটা দিতে পারতাম না?

আমি এর কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। মনে মনে বললাম, এখন তোমার কজাকির ওপর দয়া হয়েছে। যা ইচ্ছে দিতে পার। কিন্তু আমি যদি চাইতাম তো মারতে আসতে। তবে এটা ভেবে মন খুশিতে ভরে গেল যে, কজাকি আর খেতে না পেয়ে মরবে না। মা ওকে রোজ খেতে দেবেন আর ও আমায় রোজ কাঁধে করে বেড়িয়ে আসবে।

পরদিন সারাটা সময় আমি মুন্নার সঙ্গে খেলায় মেতে রইলাম। সন্ধেবেলায় রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরেও কজাকির চিহ্ন দেখা গেল না। সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে উঠল। রাস্তা নিঃঝুম হয়ে পড়ল। কিন্তু কজাকির দেখা নেই।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলাম। মা জিজ্ঞেস করলেন — কাঁদছ কেন, বাবা? কজাকি আসেনি? আমি প্রচণ্ড জোরে কাঁদতে লাগলাম। মা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার মনে হল ওঁর গলাও ভারি হয়ে গেছে। আমায় বললেন — বাবা, চুপ করো। কালই আমি কাউকে দিয়ে কজাকিকে ডেকে পাঠাব।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর বেলায় চোখ খুলেই মাকে বললাম — কজাকিকে ডেকে দাও।

মা বললেন — ওকে ডাকতে লোক চলে গেছে, বাবা। কজাকি এখুনি এসে পড়ল বলে।

আমি খুশি হয়ে খেলতে লেগে গেলাম। জানতাম মা যে কথা দেন, তা অবশ্যই রাখেন। তিনি ভোরবেলাতেই একজন হরকরাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সকাল দশটায় যখন মুন্নুকে নিয়ে বাড়ির ভেতর এলাম, শুনলাম কজাকিকে তার বাড়িতেও পাওয়া যায় নি। সে রাতেও বাড়ি ফেরেনি। তার

বউ কান্নাকাটি করছিল — কী জানি কোথায় চলে গেল। ওর বউয়ের আশঙ্কা কজাকি কোথাও পালিয়ে গেছে।

শিশুদের মন যে কত কোমল হয় তা অন্যে সহজে আন্দাজ করতে পারে না। তারা নিজেরাই বোঝে না কোন কথা তাদের দুঃখ দিচ্ছে, কোন কাঁটা তাদের বুকে খচখচ করে বিঁধছে, কেন তাদের বারবার কান্না পাচ্ছে, কেনই বা খেলতে মন লাগছে না, কেন এমন মনমরা হয়ে বসে আছে? আমার তখনকার অবস্থা অনেকটা ওইরকমই ছিল। কখনও ঘরে, কখনও বাইরে, কখনও আবার রাস্তায় — এই ভাবে ছটফট করে বেড়াচ্ছিলাম। দুচোখ কজাকিকে খুঁজছিল। কোথায় গেল সে? কোথাও পালিয়ে গেল না তো।

বেলা তৃতীয় প্রহরে আমি আনমনা হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা গলির মধ্যে কজাকিকে দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, কজাকিই, আর কেউ নয়। আমি চেঁচাতে চেঁচাতে গলির দিকে দৌড়ালাম। কিন্তু গলির মধ্যে তার হদিস পেলাম না। কী জানি কোথায় সে গায়েব হয়ে গেল? আমি গলির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত খুঁজলাম কিন্তু কোথাও কজাকির চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না।

বাড়ি গিয়ে আমি মাকে বললাম একথা। আমার মনে হল শুনে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

বাচ্চারা প্রথম প্রথম যতটা ভালোবাসে, পরে ততটাই নিষ্ঠুরও হয়ে পড়ে। যে খেলনাটা ছিল চোখের মণি, সেটাকেই দু-চার দিন পরে আছড়ে ভেঙে ফেলে।

এরপর আবার দু-তিন দিন কজাকিকে আর দেখা গেল না। আমি এবং মা এবার তাকে একটু করে ভুলতে শুরু করলাম। দশ-বারো দিন চলে গেছে। তখন দুপুরবেলা। বাবা খেতে বসেছিলেন। আমি মুন্নুর পায়ে ঘুঙুর পরাচ্ছিলাম, একজন স্ত্রীলোক মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়াল। জামাকাপড় ছেঁড়াখোঁড়া আর নোংরা, কিন্তু মেয়েটির গায়ের রঙ ছিল ফর্সা আর দেখতে সুন্দরী। সে আমায় জিজ্ঞেস করল — ভাইয়া, মাইজি কোথায়? আমি তার কাছে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম — তুমি কে? কী বিক্রি কর তুমি?

স্ত্রীলোক — আমি কিছু বিক্রি করি না। তোমার জন্যে এই পদ্মডাঁটিগুলো এনেছি। ভাইয়া, তুমি তো পদ্মডাঁটি খেতে খুব ভালোবাস, তাই না? তার হাতে ঝোলানো পুঁটলিটার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম — কোত্থেকে এনেছ দেখি।

স্ত্রীলোক — তোমার হরকরা এগুলো পাঠিয়েছে। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম — কে, কজাকি?

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে পুঁটলি খুলতে লাগল। ইতিমধ্যে মাও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। স্ত্রীলোকটি মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

মা জিজ্ঞেস করলেন — তুই কজাকির বউ?

স্ত্রীলোকটি মাথা নিচু করে ফেলল।

মা — আজকাল কজাকি কাজকর্ম কী করে?

স্ত্রীলোকটি কেঁদে ফেলে বলল — মাইজি, যেদিন আপনার কাছ থেকে আটা নিয়ে গেছে সেদিন থেকেই সে অসুখে পড়েছে। সব সময় খালি 'ভাইয়া' 'ভাইয়া' এই করছে। তার সমস্ত মন ভাইয়ার কাছেই পড়ে আছে। 'ভাইয়া' 'ভাইয়া' বলে চমকে উঠে দরজার দিকে দৌড়ে যায়। কী জানি ওর

কী হয়েছে, মাইজি। একদিন আমায় কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আর একটা গলির মধ্যে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইয়াকে দেখতে লাগল। যেই ভাইয়া ওকে দেখতে পেল তখনই ওখান থেকে ছুটে পালাল। আপনার সামনে আসতে লজ্জা পায়।

আমি বললাম — হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। তোমায় সেই যে সেদিন বললাম না, মা?

মা — বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার কিছু আছে?

স্ত্রীলোক — হ্যাঁ, মাইজি, তোমাদের আশীর্বাদ খাওয়াদাওয়ার কোনো দুঃখ নেই। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে পুকুরের দিকে চলে গেল। অনেক বারণ করলাম — বাইরে যেও না, ঠান্ডা লেগে যাবে। কিন্তু কোনো কথা শুনল না। এত দুর্বল যে পা কাঁপতে লাগল। কিন্তু তাও পুকুরে নেমে এই পদ্মডাঁটি তুলে এনে আমায় বলল — যা, ভাইয়াকে এগুলো দিয়ে আয়। ভাইয়া পদ্মডাঁটি খুব ভালোবাসে। সকলে কেমন আছে জেনে আসবি।

আমি পুঁটলির মধ্যে থেকে পদ্মডাঁটা বের করে মজাসে খাচ্ছিলাম। মা অনেক চোখ রাঙালেন। কিন্তু আমার তর সইলে তো।

মা বললেন — বলে দিয়ো সবাই কুশলে আছে।

আমি বললাম — আর এটাও বোলো ভাইয়া তোমায় ডেকেছে। না গেলে তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলবে না। বাবাও খাওয়াদাওয়া সেরে বাইরে এসে পড়েছিলেন। তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বললেন — হ্যাঁ, একথাও বলে দিও যে, সাহেব তোমায় আবার কাজে বহাল করে দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি যাও। নইলে অন্য লোক নিয়ে নেওয়া হবে।

স্ত্রীলোকটি পুঁটলির কাপড়টা তুলে নিয়ে চলে গেল। মা অনেক ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়াল না। মা বোধ হয় ওকে কিছু সিধে দিতে চাইছিলেন।

মা বললেন — সত্যিই কি ওকে আবার বহাল করা হয়েছে?

বাবা — তাহলে কি আমি মিছে বলছি? আমি তো পাঁচ দিনের দিনই ওর বহাল হওয়ার রিপোর্ট পাঠিয়েছি।

মা — এটা তুমি খুব ভালো কাজ করেছ।

বাবা — ওর অসুখের এটাই একমাত্র ওষুধ।

চার

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই আমি দেখলাম কজাকি লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে। ও অনেক রোগা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল যেন বুড়ো হয়ে গেছে। সবুজ গাছ যেন শুকিয়ে ন্যাড়া হয়ে গেছে। আমি দৌড়ে ওর কোমর জড়িয়ে ওর গায়ে লেপটে গেলাম। কজাকি আমার গালে চুমু খেয়ে আমায় তার কাঁধে চড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমি উঠতে পারলাম না। তখন সে পশুদের মত মাটিতে দুহাত-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। আমি তার পিঠে চড়ে ডাকঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। সে সময় আমার আর আনন্দের সীমা ছিল না। আর কজাকি বোধ হয় আমার থেকেও বেশি খুশি হয়েছিল।

বাবা বললেন — তোমায় আবার কাজে বহাল করা হল। আর কখনও দেরি করবে না।

কজাকি কাঁদতে কাঁদতে বাবার পায়ে পড়ল।

কিন্তু আমার ভাগ্যে বোধ হয় একসঙ্গে দুটো সুখ লেখা ছিল না। মুন্নুকে পেলাম যখন কজাকিকে হারাতে হল, আবার কজাকিকে যখন ফিরে পেলাম তখন মুন্নু একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। আর এমনই বাইরে চলে গেল যে, আজও আমার সে দুঃখ ঘুচল না। মুন্নু আমার সঙ্গে একই থালায় খেত। যতক্ষণ না আমি খেতে বলব, সেও কিছু খাবে না। মুন্নু ভাত খেতে খুব ভালোবাসত। কিন্তু তাতে প্রচুর ঘি না দেওয়া পর্যন্ত সে খুশি হত না। সে আমার সঙ্গেই ঘুমোত, আবার আমার সঙ্গেই উঠত। সে পরিচ্ছন্নতা এতই পছন্দ করত যে মলমূত্র ত্যাগ করার জন্যে বাইরের মাঠে চলে যেত। কুকুরের ওপর ওর খুব রাগ ছিল। কোনো কুকুরকে ঘরের চৌহদ্দির ভেতর আসতে দিত না। কুকুর দেখলে খেতে খেতেই থালা ছেড়ে কুকুরকে তাড়া করে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আসত।

কজাকিকে ডাকঘরে রেখে এসে আমি যখন খেতে বসলাম তখন মুন্নুও খেতে এল। মাত্র দু-চার গ্রাস ভাত খেয়েছে, উঠোনে এক বিরাট লোমশ কুকুর এসে হাজির। ওটাকে দেখেই মুন্নু তাড়া করে গেল। অন্যের বাড়িতে গিয়ে কুকুর ইঁদুরের মত হয়ে যায়। লোমশ কুকুরটা ওকে দেখেই দে-ছুট্। মুন্নুর এবার ফিরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু ওই কুকুরটা তো স্বয়ং যমদূত। মুন্নু ওটাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েই সন্তুষ্ট হল না। সে ওটাকে বাড়ির বাইরে মাঠে দৌড় করাতে লাগল। মুন্নু বোধ হয় খেয়াল করেনি যে, এখানে তার জারিজুরি খাটবে না। এমন সীমানার মধ্যে সে ঢুকে পড়েছিল, যেখানে লোমওয়ালা আর মুন্নু — দুজনেরই সমান অধিকার। রোজ কুকুর তাড়া করতে করতে মুন্নুর নিজের বাহুবলের ওপর খুব অহংকার হয়েছিল। সে এটা বোঝেনি যে, ওকে যে ওরা ভয় করছে, তার পেছনে আছে বাড়ির মালিকের ভয়। মাঠের সীমানায় ঢুকেই লোমওয়ালা কুকুর ঘুরে দাঁড়িয়ে মুন্নুর ঘাড় কামড়ে ধরল। বেচারা মুন্নু মুখ দিয়ে টুঁ-শব্দটিও করতে পারল না। প্রতিবেশীদের চেঁচামেচি শুনে আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি মুন্নু মরে পড়ে আছে আর লোমশ কুকুরটার পাত্তা নেই।

(কজাকী/১৯২৬) অনুবাদ মীনা রায়চৌধুরী

টাঙাওয়ালার গালগল্প

একবার এলাহাবাদে টাঙায় চড়ে অনেকটা পথ যাওয়ার সুয়োগ হয়েছিল এ লেখকের। টাঙাওয়ালা জুম্মন মিঞা ছিল বড়ো গল্পবাজ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস। ওর বকবকানি শুনতে শুনতে রাস্তাটা এত সুন্দর কেটে গিয়েছিল যে কিচ্ছুটি টের পাইনি। পাঠকদের আনন্দের জন্যে ওর জীবনবৃত্তান্ত আর গালগল্পগুলো তুলে ধরছি।

এক

জুম্মন — এই যে বাবুজি, টাঙা..... আরে, উনি যে এদিকে তাকাচ্ছেনই না, হয়তো এক্কা নেবেন। ভালো ভালো। সস্তার পক্ষে ভালো তবে কোমরটা ধরে যাবে বাবুজি, রাস্তা খারাপ, এক্কাতে তকলিফ হবে। পড়েছেন বোধ হয় কাগজে কাল চার চারটে এক্কা এ রাস্তাতেই কুপোকাত হয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটি বেঁচে থাক, এক্কাগুলো বিলকুল বন্ধ হয়ে যাবে। যত মোটর আর লরিতে রাস্তা ভেঙে দেবে আর মারা পড়ব আমরা এই গরিব এক্কাওয়ালারা। আর কিছুদিনের মধ্যে উড়োজাহাজে করে যখন লোকে যাওয়া আসা করবে, তখন আমাদের এক্কাওয়ালাদের রাস্তা জুটবে। দেখব তখন এসব লরিকে কে পোঁছে, জাদুঘরে হয়তো তাদের দেখা মিললেও মিলতে পারে। এখন তো ওদের দেমাকের থই মেলে না। আরে সাব, রাস্তায় বেরুনো মুশকিল যেন সব রাস্তাটাই ওদের ওয়াস্তে, আর আমাদের ওয়াস্তে শুধু দুপাশের মেটে রাস্তা আর ধুলোবালি। এখন গুমর করছে, উড়োজাহাজকে আসতে দিন। আচ্ছা হুজুর, এসব মোটরওয়ালাদের আধাআধি রোজগার আদায় করে সরকার, রাস্তা মেরামতিতে কেন খরচ করে না? কিংবা পেট্রোলের উপর চারগুণ ট্যাকসো বসিয়ে দিক না। নিজেদের তো এরা ট্যাক্সি বলে, তার মানে তো ট্যাক্স দেনেওয়ালা। ও হুজুর, আমার বুড়ি আমায় বলে কিনা এক্কা ছেড়ে টাঙা নিলি, কিন্তু টাঙাতেও যে আজকাল কিছুই হচ্ছে না, মোটর নে। আমি বললাম, এমন বাহন রাখব যা আমার হাতের মুঠোয় থাকবে, অন্যের ভরসায় নয়। ব্যস, হুজুর ও চুপ হয়ে গেল। তারপর শুনুন, এই তো সেদিনের কথা। কল্লনটা মোটর চালিয়ে গেল। তা মিঞা গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ব্যস ওখানেই শহিদ। এক বিধবা আর দশ দশটা বাচ্চাকে অনাথ রেখে গেল। হুজুর, আমি গরিব, বাচ্চাকাচ্চার খাওয়াপরা জুটে যায়, আবার কী চাই। আজ বছর চল্লিশেক ধরে এক্কা চালিয়ে আসছি। অল্প যে কটা দিন আর বাকি আছে তাও এমনি করেই চাবুক হাতে কেটে যাবে। তাছাড়া হুজুর দেখবেন, এক্কা-টাঙা আর ঘোড়া পড়ে গেলেও কিছু না কিছু দিয়েই যায়। ওদিকে কিন্তু মোটরটা অকেজো হয়ে গেল তো হুজুর মোটরের লোহালক্কড়গুলোকে দুটাকা দিয়েও কেউ নেবে না। হুজুর, ঘোড়া হল গিয়ে ঘোড়া, যে কোনও হালতে আপনাকে ঠিক

মঞ্জিলে পৌঁছে দেবেই। আর ওদিকে যখনই দেখবেন মোটর রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সওয়ারেরা সবাই হেঁটে যাচ্ছে, কিংবা হাতির লাশ টানছে। হুজুর, ঘোড়া সব সময় নাগালের মধ্যে থাকে, সব দিক দিয়ে লাভ। মোটরে কোনও আরাম আছে নাকি। টাঙাতে সওয়ারও ঘুমুচ্ছে, আমিও ঘুমুচ্ছি আর আমার ঘোড়াও ঘুমুচ্ছে অথচ মঞ্জিলে ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে। মোটরের ওই হট্টগোলে তো কানের পর্দা ফেটে যায়, আর গাড়ি যে হাঁকাচ্ছে তাকে যেন জাঁতা পিষতে হয়।

দুই

হুজুর, আওরতরা এক্কা-টাঙাগুলোকে বড়ো বেদরদির মতো এস্তেমাল করে থাকে। এই তো সেদিন, সাত-আটজন আওরত এসে পুছতে লাগল ত্রিবেণী কত নেবে? হুজুর, আমাদের হিসেব তো বাঁধা, এ তো আর হোয়াইটওয়েের দোকান নয় যে, বছরে চার বার সেল হবে, হিসেবমতন আমাদের ভাড়াটা চুকিয়ে দাও, দিয়ে দোয়া নাও। এমনিতে তো হুজুর হলেন গিয়ে মালিক, চাই কি একবার নাই বা দিলেন, তবে হুজুর, এই আওরতরা এক রুপিয়ার কাম হলে দেবে মোটে আট আনা। হুজুর, আমি তো সাহেবসুবোদের কাজ করি। শরিফ যাঁরা তাঁরা হামেশাই শরিফ, তবে হুজুর, আওরতরা সবখানেই আওরত। প্রথমে তো পরদার বাহানা করে আমাদের হাটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এক্কা-টাঙায় ডজনে ডজনে আওরত আর বাচ্চা চেপে বসে। একবার এক্কার কামানি যখন ভেঙে পড়ল তখন এক্কা থেকে একজন নয়, দুজন নয় সবসুদ্ধু তেরো তেরোজন আওরত বেরিয়ে এল। আমি গরিব আদমি মারা পড়লাম। হুজুর, সবাই তাজ্জব বনে যায় যে কেমন করে উপরে নীচে করে, যেন, কাঁচি মেরে বসে। টাঙার হাল খারাপ হয়ে যায়। দু হাঁটুর উপরে এক একটা বাচ্চাকে বসিয়ে নেবে তারপর ঐ বাচ্চাগুলোর উপরে আরও এক একটা, এর পরেও আবার একটা কচি বাচ্চাকেও নিয়ে নেবে। এমনি করে হুজুর টাঙার ভেতরটা যেন একটা সার্কাসের মতো দেখতে হয়। এত সব সত্ত্বেও পুরো ভাড়া কিন্তু এরা দিতে জানে না। আগে তো পরদার জোর ছিল। মরদদের সঙ্গে বাতচিত হত আর ভাড়াও মিলে যেত। যেদিন থেকে মুখ দেখানো শুরু হল, পরদা হটে গেল, আর আওরতরা বাইরে যাওয়া-আসা করতে লাগল, সেদিন থেকে আমরা গরিবরা সরাসরি মারা পড়ছি। তবে হুজুর, আমাদেরও মালিক আল্লা। বছর শেষে আমার পুষিয়ে যায়। সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা। এই তো গেল মাসেই দু ঘণ্টা টাঙা চড়ার পর আট আনা পয়সা ধরিয়ে দিয়ে এক বিবিজি তো অন্দরে ভাগলেন। আমার নজর যখন টাঙার উপর পড়ল তখন দেখি কী, একটা সোনার ঝুমকো পড়ে আছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মাইজি এটা কী? উনি বললেন, আর একটা কানাকড়িও মিলবে না, বলেই দরজা বন্ধ। আমি তো মিনিট দু-চার তাকিয়ে রইলাম তারপরে চলে এলাম। আমার ভাড়া মাইজির কাছে পড়ে রইল, আর মাইজির ঝুমকো আমার কাছে।

তিন

এই তো সেদিন চারজন স্বদেশি এসে আমার টাঙা নিল, কাটরা থেকে স্টেশনে চলল, হুকুম হল জলদি চলো। সারাটা রাস্তা 'গান্ধিজিকি জয়। গান্ধিজিকি জয়।' চেঁচাতে চেঁচাতে গেল। কোনো এক সাহেব বাইরে থেকে আসছিলেন, বড্ড ভিড় আর মিছিল। কাঠের পুতুলের মতন সারাটা রাস্তা

তো লাফাতে লাফাতে গেল। স্টেশনে গিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চার আনা পয়সা দিল। আমি পুরো ভাড়া চাইলাম, কিন্তু 'গান্ধিজি কি জয়। গান্ধিজি কি জয়' ছাড়া ওদের কাছে আর কী ছিল। আমি চেঁচালাম, 'আমার পেট! আমার পেট!' আমার টাঙাটা কি থিয়েটারের স্টেজ, আপনারা নাচলেন, কুঁদলেন আর এখন মজুরি দিচ্ছেন না। কিন্তু আমি শুধু চেঁচামেচি করেই গেলাম, ওরা ভিড়ের মধ্যে গায়েব হয়ে গেল। আমার তো মনে হয় লোকগুলো সব পাগল হয়ে গেছে, স্বরাজ চাইছে, এসব ফন্দিবাজি করে স্বরাজ মিলবে। হুজুর, আজব হাওয়া চলছে। শোধরাবার নাম নেই, স্বরাজ মাঙছে। নিজেদের ক্রিয়াকলাপ তো আগে ঠিক করে নিক। আমার ছেলেটাকে মন্তর দিল, কাপড়জামা সব জড়ো করে এনে সে একদিন জেদ ধরল যে, আগুন ধরিয়ে দেবে। প্রথমে তো আমি অনেক করে বোঝালাম যে গরিব মানুষ আমি, কোত্থেকে আবার কাপড় আনব। তবুও যখন ও শুনল না তখন মাটিতে ফেলে আচ্ছা করে পিটুনি দিলাম। ব্যস আবার কী, হুঁশ নিজের ঠিকানায় ফিরে এল। হুজুর, যখন ওয়াক্ত হবে তখন আমরা এই টাঙাওয়ালা একাওয়ালারাই স্বরাজকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসব। মোটরে চড়ে স্বরাজ কোনোদিন আসবে না। আগে আমাদের পুরো মজুরি দে, তারপর স্বরাজ মাগ্। হুজুর, আওরত তো আওরত, ওরা যাই দেয়, নিতে হয়। তবে কোনও কোনও নকল শরিফ আদমি আওরতদেরও হার মানায়। গাড়িতে চড়বার আগে আমাদের নম্বর দেখবেন, যদি কোনও জিনিস নিজেদের ভুলেও রাস্তায় ফেলে যান, সে দোষও আমাদের কাঁধেই চাপিয়ে দেবেন। তার উপর মজা হল যে, যদি ভাড়াটা কমও দেন তাহলেও আমরা যেন টুঁশব্দটি না করি। একবার কী হল শুনুন, এক নকল সাহেব 'ওয়েল ওয়েল' করে তো লাটসাহেবের দপ্তরে গেলেন। আমাকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে বললেন যে, এক মিনিটের মধ্যে আসছি। সেদিন থেকে আজ অবধি তাঁরই এন্তেজার করছি। যদি কোনোখানে ওই মশায়ের একটিবার দেখা পাই তাহলে তো দিল খুলে বদলা নিয়ে নেব, তারপর যা হবার হোক।

চার

আজকাল না আছে আগের মতো মেহেরবান আদমি না আছে আগের মতো হালিত। শরাফত যে কোথায় গায়েব হয়ে গেছে তা সে খোদাই জানেন। মোটরের সঙ্গো হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। হুজুর, আপনারই মতো সাহেবরা আমাদের মতো একাওয়ালাদের কদর করেন, আমাদেরও ইজ্জত দিয়ে কথা বলেন। আজকাল জমানা এমন যে আমরা ছোটো আদমি, কথায় কথায় গালিগালাজ শুনতে হয়, গোঁসা সইতে হয়। কাল দুজন বাবুলোক যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম — টাঙা... শুনে একজন বললেন, না আমাদের তাড়া আছে। এও হয়তো একটা ঠাট্টা। তারপর অন্য সাহেবটি জিজ্ঞেস করলেন, ট্যাক্সি কোথায় মিলবে? আপনিই বলুন, ছোট্ট এই শহর, সবখানেই তাড়াতাড়ি করে আমরা পৌঁছে দিয়ে থাকি। তারপরও কিনা আমরাই বাতলে দেব ট্যাক্সি কোথায় মিলবে? মগের মুলুক সাহেব, মগের মুলুক। ভেবে দেখুন তো, বেচারা ঘোড়া, আমি আর আমার বালবাচ্চাগুলো আর এদিকে ভাড়া কিনা চৌদ্দ আনা ঘন্টা। হুজুর, চৌদ্দ আনায় যে ঘোড়ার পিঠে একটা কঞ্চির বাড়ি মারতেও দিল চায় না। হুজুর, আমাকে কেউ চব্বিশ ঘন্টার জন্য কিনে নিক। এক একজন সাহেব তো আমার সঙ্গো চালাকি করেন। চল্লিশ বছর ধরে হুজুর এই কাজই করে আসছি। সওয়ার দেখেই

ধরে ফেলি কী চায়। পয়সা মিলল তো আমার ঘোড়ারও পাখনা গজিয়ে গেল। এক সাহেব তো অনেক দরদস্তুর করে ঘন্টা হিসেবে টাঙা ঠিক করলেন আর তাও সরকারি রেট থেকে কম। আপনি দেখুন, রেট বেঁধে দেবার সময় মিউনিসিপ্যালিটি জান বার করে দিয়েছে, কিন্তু কিছু লোক তিল ছাড়াই তেল বের করতে চায়। যাক গে, আমিও বেকার বসে ছিলাম বলে কম রেটেই রাজি হয়ে গেলাম। তারপর জনাব কিছুটা গিয়ে টাঙাও জানাজার চালে টিকিস টিকিস করে চলতে লাগল। উনি বলেছিলেন, ভাই একটু জোরে চলো। আমি বললাম — রোজার দিন, ঘোড়ার দম না ফুরিয়ে যায়। শুনে তিনি বললেন, আমার আর কী, তোমারই ঘন্টা দেরি করে বাজবে। সরকার, আমি তো এতেই খুশি যে, আপনি আমার টাঙায় বসে থাকুন আর এই গোলাম আপনাকে নিয়ে বেড়াতে থাকুক।

পাঁচ

লাট সাহেবের দপ্তরে একজন বড়োবাবু ছিলেন। কাটরায় থাকতেন। খোদা ঝুট যেন না বলান, বাবুর কোমরখানা তিনটি গজের কম হবে না। ওঁকে দেখলে এক্কা-টাঙাওয়ালারা সব সরে পড়ে। কত কত যে এক্কা উনি ভেঙে সেরেছেন। এত ভারী হলে কী হবে, এমন কায়দায় লাফ মারতেন যে নিজে কোনও দিন চোট খাননি। এই গোলামেরই শুধু হিম্মত ছিল ওঁকে নিয়ে যাবার। খোদা যেন ওঁকে খুশি রাখেন, মজুরিটাও ভালোই দিতেন। আমি একবার ঈদুর এক্কা নিয়ে যাচ্ছিলাম, বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বাবু বললেন, দপ্তরে পৌঁছে দেবে? আজ দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার ঘোড়ার যে স্রেফ হাড্ডিই সার। বললাম, এ ঘোড়া আমার নয়। তা হুজুর তো ডবল মজুরি দেন, যদি হুকুম করেন তো দুখানা এক্কা একসাথে বেঁধে নিয়ে চালাব।

ছয়

আরও শুনুন, এক শেঠজি একদিন এক্কা ভাড়া করলেন। সবজি মন্ডি থেকে শাকসবজি কিনে তারপর ছোটাতে ছোটাতে স্টেশনে এলেন। বকশিশের লোভে আমিও ঘোড়াটাকে চাবকাতে চাবকাতে নিয়ে এলাম। খোদা জানেন, সেদিন জানোয়ারটার পিঠে বড্ড মার পড়েছিল। আমার হাত দুটোতে দরদ হচ্ছিল, রেলগাড়ির সময় সত্যি সত্যি বড্ড কম ছিল। স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোলে আমার ওয়াস্তে সেই শুধু একখান সিকি। বললাম, এটা কী? শেঠজি বললেন, দেখি বের কর তোমার ভাড়া-তক্তি। বললাম, দেরি করবেন আপনি আর ঘোড়াটা আমার শুধু শুধু পিটুনি খাবে। শেঠজি জবাব দিলেন, আরে ভাই, তুমিও তো জলদি জলদি ছাড়ান পেয়ে গেলে, আর চোট তো তুমি কিছু পাওনি। বললাম — মহারাজ, এই জানোয়ারটার উপরে তো একটু মেহেরবানি করবেন। শুনে শেঠজি নরম হয়ে বললেন, হ্যাঁ ঠিক, এই বেচারার কথাটাও খেয়াল করা উচিত। বলে তার টুকরি থেকে চারটে কপিপাতা বের করে ঘোড়াটাকে খাইয়ে দিয়ে হাঁটা দিলেন। এও হয়তো একটা ঠাট্টা। কিন্তু আমি বেচারা মিছি মিছি মারা পড়লাম। সেই থেকে ঘোড়ার পেটটাও খারাপ হয়ে গেছে।

আজব জমানা পড়েছে, পাব্লিকরা এখন তো আর কারও তোয়াক্কা করে না। রঙ-ঢং, রকমসকম সব কিছুই পালটে গেছে। ভাড়া চাইলে বলে, তোমাদেরই রাজত্ব নাকি দিনে ডাকাতি করবে।

নিজেদের কুকুর বেড়ালকেও শেঠজিরা হালুয়া-জিলিপি খাওয়াবেন, অথচ আমাদের বেলায় গর্দান কাটবেন। একটা জমানা ছিল যখন ভাড়া ছাড়াও আমরা মালপোয়াও পেতাম।

সাত

আজকাল, এই রদ্দি জমানাতেও কখনও কখনও শরিফ রইস আদমি ঠিকই নজরে পড়ে। একবার কী হয়েছে শুনুন, আমার টাঙায় সওয়ার চেপেছে। কাশ্মীরি হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকদূর গিয়েছি। কীটগঞ্জে পৌঁছে সামনের সওয়ারি চৌরাস্তা আসবার আগেই চোদ্দ আনা দিয়ে নেমে গেল। তারপর পেছনের আরেক সওয়ারি নেমে চোদ্দ আনা দিল। তারপর তেসরা সওয়ার আর নামছে না। বললাম, হুজুর চৌমাথায় এসে গেছি। কিন্তু কোনও জবাব নেই। যাঁরা নেমে গেলেন তাদের বললাম, ও বাবু, এঁকেও নামিয়ে নিয়ে যান। বাবু দেখলেন শুনলেন, কিন্তু সে আদমি যে নেশায় চুর চুর, নামবে কে? বাবু বললেন, কী করি এখন? বললাম, কী আর করবেন, এ তো একেবারে সিধে ব্যাপার। থানায় নিয়ে যান, আর যদি দশ মিনিটের মধ্যে কোনও ওয়ারিস পয়দা না হয় তো মাল আপনার।

তবে হুজুর, এই পেশাতেও নিত্যি নতুন তামাশা দেখতে পাই। এই চোখ দুটো দিয়ে কত কী যে দেখলাম হুজুর। পরদা খাটানো হত, জাজিম বাঁধা হত, ঘেরাটোপ লাগানো হর্ত, তবে গিয়ে জেনানা সওয়ার চড়ত। আজকাল হুজুর আজব সব হালত, পরদা উঠে গেছে হাওয়ার ছুতোয়। আমি তাই বাধ্য হয়ে এক্কা চালানো ছেড়ে দিলাম। তখন যাকেই দেখি সেই বলে কিনা, এক্কা নয়, টাঙা আনো। আরামের পরোয়া তাদের ছিল না। এখন জানটাকেও দেখে না, মোটর-মোটর ট্যাক্সি-ট্যাক্সি হাঁক পড়ে। হুজুর, আমার আর কি, আমি তো আর দুদিনের মেহমান, খোদা যা কিছু দেখাবেন, দেখব।

(তাঁগেবালে কী বড়/১৯২৬) অনুবাদ ননী শূর

রামলীলা

কতদিন যে হল রামলীলা দেখতে যাইনি। বাঁদরের বিচ্ছিরি যত মুখোশ এঁটে আধেক পা-ওয়ালা পায়জামা আর কালো রঙের খাটো পাঞ্জাবি পরে লোকজনদের ছুটোছুটি করতে, হু-হু করতে দেখলে এখন হাসি পায়, মজা হয় না। কাশীর লীলা জগদ্‌বিখ্যাত। শুনেছি অনেক দূর দূর থেকে লোকে দেখতে আসে। আমিও বড়ো শখ করে একবার গিয়েছিলাম; কিন্তু ওখানকার লীলা আর কোনও অজ পাড়াগাঁয়ের লীলায় কোনও প্রভেদ আমার চোখে পড়ল না। তবে হ্যাঁ, রামনগরের সাজপোশাক কিছুটা ভালো। রাক্ষস আর বানরের মুখোশগুলো সব পেতলের, গদাগুলোও পেতলের, হয়তো বনবাসী ভাই দুটির মুকুটগুলোও সত্যিকারের কাজ করা; তবে সাজপোশাক বাদ দিলে ওখানেও সেই হু-হু ছাড়া আর কিছু নেই। তবুও লাখ লাখ লোকের ভিড় লেগেই থাকে।

তবে একটা সময় ছিল যখন আমিও রামলীলায় আনন্দ পেতাম। আনন্দ কথাটা তো একেবারে হালকা। সে আনন্দ উন্মাদনার চেয়ে কম ছিল না। ঘটনাক্রমে তখন রামলীলার মাঠটা ছিল আমাদের বাড়ির একেবারে কাছে; আর যে বাড়িটাতে লীলার অভিনেতাদের সাজগোজ হত, সেটা তো আমাদের বাড়ির একদম লাগোয়া ছিল। বেলা দুটো থেকে গিয়ে বসতাম, আর যতটা উৎসাহে দৌড়ঝাঁপ করে টুকিটাকি কাজ করতাম, ততটা উৎসাহ নিয়ে তো আজকাল আমার পেনশন আনতেও যাই না। একটা ছোটো ঘরে রাজকুমারীর অঙ্গসজ্জা হত। পাউডার লাগানো হত আর পাউডারের উপর লাল, সবুজ, নীল রঙের গোল গোল সব ফোঁটা আঁকা হত। সারাটা কপাল, ভুরু, গাল, চিবুক ফোঁটায় রঞ্জিত হয়ে উঠত। একজনই এ কাজে সিদ্ধহস্ত ছিল। এক এক করে তিন জন অভিনেতারই অঙ্গসজ্জা সে করত। রঙের পেয়ালায় জল আনা, গেরিমাটি গুঁড়ো করা, পাখা নিয়ে হাওয়া করা এসব ছিল আমার কাজ।

এসব প্রস্তুতির পরে রথ যখন বের হত, তখন সে রথে রামচন্দ্রের পেছনে বসে যে উল্লাস, যে গর্ব, যে রোমাঞ্চ আমার হত, তা আজকাল লাটসাহেবের দরবারে চেয়ারে বসলেও হয় না। একবার হোম-মেম্বার সাহেব যখন ব্যবস্থাপক সভায় আমার একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন, সে সময় আমার খানিকটা ও ধরনেরই উল্লাস, গর্ব আর রোমাঞ্চ হয়েছিল। হ্যাঁ, আর একবার যখন আমার বড়ো ছেলের নাম নায়েব-তহশিলদারিতে তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তখনও এমনি উচ্ছ্বাস আমার মনে জেগেছিল। তবে এসব আনন্দে আর সেই শিশুসুলভ বিহ্বলতায় অনেক প্রভেদ। তখন আমার মনে হত যেন আমি স্বর্গে বসে আছি।

নিষাদ-নৌকা-লীলার দিন। আমি দু-চারটে ছেলের পাল্লায় পড়ে ডাংগুলি খেলায় মেতেছিলাম। সেদিন সাজসজ্জা দেখতে যাইনি। রথও বেরিয়ে পড়েছে, তবুও আমি খেলা ছাড়িনি। আমার দান

নেবার পালা ছিল। নিজের দান ছেড়ে যেতে হলে ওর চাইতেও অনেক বড়ো আত্মত্যাগের প্রয়োজন ছিল। সে আমি করতে পারতাম না; যদি দান দেবার হত তাহলে কখন আমি পালিয়ে যেতাম। কিন্তু ডাং পেটানো সে আলাদা ব্যাপার। যাক দান শেষ হল। ইচ্ছে করলে চোট্টামি করে পাঁচ-দশ মিনিট আরও ডাং পেটাতে পারতাম, তার যথেষ্ট সম্ভাবনাও ছিল; কিন্তু সেদিন তার সুযোগ ছিল না। আমি সোজা খালের দিকে ছুটলাম। রথ জলের ধারে পৌঁছে গেছে। আমি দূর থেকে দেখলাম মাঝি নৌকা নিয়ে আসছে। ছুটলাম, কিন্তু লোকজনের ভিড়ে ছোটা মুশকিল। শেষমেষ আমি যখন ভিড়ভাড় ঠেলেঠুলে প্রাণপণে এগিয়ে ঘাটে গিয়ে পৌঁছোলাম, ততক্ষণে নিষাদ তার নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল।

রামচন্দ্রের উপরে আমার কত ভক্তি! নিজের পড়াশোনার কথা না ভেবেও আমি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতাম, যাতে ও ফেলটেল না হয়ে যায়। বয়সে আমার চাইতে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও নীচের ক্লাসে পড়তেন। আর সেই রামচন্দ্রই নৌকায় চড়ে এমন ভাবে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন যেন আমার সঙ্গে ওর কোনও চেনা-পরিচয়ই নেই। নকলের মধ্যেও আসলের কিছু না কিছু গন্ধ তো থেকেই থাকে। ভক্তদের উপর যাঁর দৃষ্টি সব সময় তীক্ষ্ণ, উনি কেন আমাকে উদ্ধার করবেন? আমি অস্থির হয়ে প্রথম জোয়ালে জোতা বলদের মতো লাফালাফি করতে থাকি। কখনও লাফিয়ে খালের দিকে যাই, কখনও কোনও সহায়ের খোঁজে পেছনে ছুটি। তা সবাই তখন আপন আপন চিন্তায় মগ্ন, আমার চিৎকার-চেঁচামেচি কারুর কানে পৌঁছোয় না। তারপর থেকে অনেক অনেক বিপত্তি সয়েছি, কিন্তু সেদিন যতটা দুঃখ হয়েছিল, অত দুঃখ আর কখনও হয়নি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এরপর আর কোনোদিন রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলব না, কোনও খাবার জিনিসও ওকে দেব না; কিন্তু খাল পেরিয়ে যেই রামচন্দ্র পুলের দিকে মুখ করলেন, আমি ছুটে গিয়ে রথে চড়ে বসলাম, বসে এত খুশি হলাম যেন কিছু হয়নি।

দুই

রামলীলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। রাজপাট হবার কথা ছিল; তবে জানি না কেন দেরি হচ্ছিল। বোধ হয় চাঁদাটাদা কম উঠেছিল। ওই সময় কেউ রামচন্দ্রের কোনো খোঁজখবর নিত না। না মিলছিল তার বাড়ি যাবার ছুটি, না ছিল খাবারদাবারের কোনও ব্যবস্থা। জমিদারবাবুর বাড়ি থেকে একটা সিধা বেলা তিনটে নাগাদ জুটত। বাদবাকি সারাটা দিন কেউ জলটুকু নিয়েও পুছত না। আমার ভক্তিশ্রদ্ধা কিন্তু তখনো ঠিক আগের মতোই ছিল। আমার চোখে তিনি তখনও রামচন্দ্রই ছিলেন। বাড়িতে কোনও খাবার জিনিস পেলে গিয়ে রামচন্দ্রকে দিয়ে আসতাম। তাঁকে খাওয়াতে আমি যত আনন্দ পেতাম, তত আনন্দ আমি নিজে খেয়েও পেতাম না। কোনো মিষ্টি কি কোনো ফল পেলেই আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে মণ্ডপের দিকে ছুটতাম। রামচন্দ্রকে সেখানে না পেলে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করতাম, যতক্ষণে জিনিসটা ওকে খাওয়াতে না পারতাম, আমি শান্তি পেতাম না।

যাক শেষে রাজপাটের দিন এল। রামলীলা ময়দানে একটি বড়োসড় শামিয়ানা খাটানো হল। জায়গাটা ভালো করে সাজানো হল। বেশ্যাদের একটা দলও এসে পৌঁছাল। সন্ধ্যায় রামচন্দ্রের শোভাযাত্রা বের হল। প্রত্যেক বাড়ির দরজায় ওকে আরতি করে অভ্যর্থনা করা হল। ভক্তি অনুসারে কেউ টাকা দিল, কেউ বা দিল পয়সা। আমার বাবা পুলিশের লোক, তাই উনি কিছু না দিয়েই আরতি

করলেন। সে সময় আমার যে কী লজ্জা হয়েছিল তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। আমার কাছে তখন দৈবগতিকে একটা টাকা ছিল। আমার মামাবাবু দশহরার আগে এসেছিলেন। যাবার সময় আমায় একটা টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। টাকাটা আমি রেখে দিয়েছিলাম। দশহরার দিনও ওঠাকে খরচ করতে পারিনি। আমি তাড়াতাড়ি টাকাটাকে নিয়ে এসে আরতির থালায় দিলাম। বাবা আমার দিকে কটমট করে চাইলেন। মুখে উনি কিছু তো বলেন নি তবে মুখের এমন একটা ভাব করে রাখলেন যাতে মনে হচ্ছিল আমার এই ধৃষ্টতায় ওঁর মানসম্মানে কালিমা লেগেছে। রাত দশটা নাগাদ পরিক্রমাটি শেষ হল। আরতির থালাখানা টাকা আর পয়সায় ভরে গিয়েছিল। ঠিকঠাক তো বলতি পারি না ; তবে এখন অনুমান করছি শ-চার পাঁচেক টাকার কম ছিল না। জমিদারবাবু এর চেয়ে কিছু বেশিই খরচ করে ফেলেছিলেন। ওঁর বড়ো ভাবনা হল যে কোনো মতে কম করে অন্তত আরও শ-দুই টাকা যদি তোলা যেত! আর বেশ্যাদের মহফিল বসিয়ে টাকাতোলা যে সবচেয়ে ভালো ফন্দি এই টাকাতোলার এটা মনে হল। যখন লোকজন এসে বসবে আর মহফিলে রঙ বেশ জমে উঠবে, তখন আবাদিজান রসিকজনদের হাত ধরে ধরে এমন সব হাবভাব দেখাবে যাতে লোকেরা লজ্জা পেয়ে কিছু না কিছু দিয়েই ফেলবে। আবাদিজান আর জমিদারবাবুর মধ্যে এ নিয়ে সলাপরামর্শ চলছিল। আমি দৈবাৎ ওদের দুজনের কথা শুনছিলাম। জমিদারবাবু হয়তো ভেবেছিলেন, ছোঁড়াটা আর কী বুঝবে। কিন্তু এ শর্মা ঈশ্বরের কৃপায় বুদ্ধিশুদ্ধিতে বেশ সেয়ানা ছিল, সব ব্যাপারই মাথায় ঢুকত।

জমিদার — দেখো আবাদিজান, এ তোমার বাড়াবাড়ি। তোমার আমার এ তো প্রথম সম্পর্ক নয়। ভগবান যদি চান তো এ বাড়িতে হামেশা তোমার যাওয়াআসা লেগে থাকবে। এবারে চাঁদা বড়ো কম উঠেছে, তা নইলে আমি তোমাকে এত সাধাসাধি করতাম না।

আবাদি — আমার সঙ্গেও আপনি জমিদারি চাল চালছেন, তাই না? তবে এখানে আপনার জারিজুরি খাটবে না। বেশ কথা। টাকাটা তুলব আমি আর গোঁফে তা দেবেন আপনি! রোজগারের তো বেশ ভালো ফন্দি বের করেছেন। এমন রোজগারে তো আপনি সত্যি সত্যি কয়েকদিনের মধ্যে রাজা হয়ে যাবেন। তার কাছে জমিদারি তুচ্ছ হবে। আর কী, কাল থেকেই একটা বেশ্যাপাড়া খুলে বসুন। খোদার কসম, একেবারে মালামাল হয়ে যাবেন।

জমিদার — তুমি মশকরা করছ, আর এদিকে আমি পরেশান হচ্ছি।

আবাদি — তা আপনিও তো আমারই সাথে ওস্তাদি চাল চালছেন। অথচ আপনার মতো কত চালাককে আবাদি রোজ আঙুলের ইশারায় নাচায়।

জমিদার — বলে ফেলো তো তোমার ইচ্ছেটা কী?

আবাদি — যা কিছু আদায় করব, তার আধা আমার, আধা আপনার। আসুন হাতে হাত মেলান।

জমিদার — তাই সই।

আবাদি — বেশ, তাহলে আগে আমার টাকা একশোটা গুনে দিন। পরে আপনি আলসেমি করতে শুরু করবেন।

জমিদার — বাঃ! ওটাও নেবে আর এটাও।

আবাদি — আচ্ছা! আপনি বুঝি ভেবেছিলেন আমি মুজরোটা ছেড়ে দেব? বাঃ, বেশ তো আপনার বুদ্ধি! বহুত খুব, কেন হবে না। দিওয়ানা বকারে দরবেশ হুঁশিয়ার!

জমিদার — তুমি কি তাহলে দুগুণ টাকা নেবে ঠিক করেছ?
আবাদি — যদি আপনার একশো দফা গরজ থাকে তাহলে, নইলে আমার একশো টাকা তো কোথাও যায়নি। আমার তো মাথা খারাপ হয়নি যে, লোকেদের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেড়াব।

জমিদারবাবুর একটা কথাও খাটল না। আবাদির কাছে হার মানতে হল। নাচ শুরু হল। আবাদিজান বড় প্রগল্‌ভা। একেই তো কমবয়সি, তাতে সুন্দরী। ওর ঠাটঠমকও এমন মারাত্মক যে আমারই মনটা পাগল হয়ে উঠছিল। মানুষ চেনবার গুণও ওর কম ছিল না। যারই সামনে গিয়ে বসল তারই কাছ থেকে কিছু না কিছু আদায় করেই ছাড়ল। পাঁচ টাকার কমে বোধ হয় কেউই দেয়নি। বাবার সামনেও গিয়ে বসল সে। আমি লজ্জায় মরে গেলাম। বাবার হাতখানা যখন ও ধরল, তখন তো আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার বিশ্বাস ছিল বাবা ওর হাতখানাকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলবেন, হয়ত বকাবকিও করবেন। কিন্তু এ কী। ঈশ্বর। আমার চোখ দুটো ভুল দেখছে না তো। বাবা গোঁফের আড়ালে হাসছেন। এমন মৃদু হাসি ওঁর মুখে আমি কোনোদিন দেখিনি। ওঁর চোখ দুটো থেকে অনুরাগ ঝরে পড়ছিল। ওঁর রোমে রোমে পুলক জাগছিল। তবে ভগবান আমার মান বাঁচিয়েছেন। ওই যে উনি আস্তে আস্তে আবাদিজানের কোমল হাত দুটো থেকে নিজের মণিবন্ধ ছাড়িয়ে নিলেন। আরে! এ আবার কী হল? আবাদি যে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরছে। এবারে বাবা ঠিক ওকে মারবেন। পেত্নিটার একটুও লজ্জাশরম নেই। একজন ভদ্রলোক হেসে বললেন — এখানে তোমার জারিজুরি খাটবে না গো, আবাদিজান। অন্য দরজা দেখো।

কথাটা তো ভদ্রলোকটি আমার মনের মতো বলেছিলেন এবং খুব ঠিক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু না জানি কেন বাবা ওঁর দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে গোঁফে তা দিলেন। মুখে তো কিছু বলেননি; ওর মুখের আকৃতি যেন চিৎকার করে সরোষে বলছিল — তুই বেনে, কী ভেবেছিস আমাকে? এ শর্মা এমন সময় প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে প্রস্তুত। টাকা তো কোন ছার। তোর মুন চায় তো যাচাই করে দেখ। তোর দুগুণ টাকা যদি না দিই তো মুখ দেখাব না।

বিরাট আশ্চর্য। ঘোর অনর্থ। ধরিত্রী, তুই কেন দ্বিধা হোস না? আকাশ, তুই কেন ভেঙে পড়িস না? হায়।। আমার মৃত্যু কেন আসে না। বাবা পকেটে হাত ঢোকাচ্ছেন। উনি কী একটা জিনিস বের করে শেঠজিকে দেখিয়ে আবাদিজানকে দিয়ে দিলেন। ওঃ, এ যে আশরফি। চারদিকে হাততালি পড়তে লাগল। শেঠজি বুদ্ধু বনে গেলেন। বাবা হেরে গেছেন তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারব না। আমি শুধু দেখলাম যে বাবা একটা আশরফি আবাদিজানকে দিলেন। ওঁর দুচোখে তখন এত গর্ব মিশ্রিত উল্লাস যেন উনি দানশীলতায় হাতিমকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এই বাবাই, আমাকে আরতির থালায় একটা টাকা দিতে দেখে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যেন আমাকে ছিঁড়েই খেয়ে ফেলবেন। আমার সেই সময়োচিত আচারণে ওঁর সম্ভ্রমের হানি হয়েছিল, আর এই ঘৃণিত, কুৎসিত এবং নিন্দনীয় ব্যাপারে তাঁর গর্ব ও আনন্দের সীমা নেই।

আবাদিজান একটি মনভুলানো হাসি হেসে বাবাকে সেলাম করে এগিয়ে গেল; আমার কিন্তু আর সেখানে বসে থাকা হল না। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছিল; এ যদি আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা না হত তাহলে কখনও আমার এটা বিশ্বাস হত না। আমি বাইরে যা কিছু দেখতাম শুনতাম সব কিছুর রিপোর্ট অবশ্যই মাকে গিয়ে বলতাম, কিন্তু এ ব্যাপারটা ওঁর কাছে আমি চেপে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, এ কথা শুনলে ওঁর খুবই দুঃখ হবে।

সারা রাত ধরে গানবাজনা চলছিল। তবলার আওয়াজ আমার কানে আসছিল। ইচ্ছে করছিল গিয়ে দেখি; কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। আমি মুখ দেখাব কী করে? পাছে কেউ যদি বাবার কথা তুলে বসে তাহলে আমি কী করব? সকালবেলা রামচন্দ্রের বিদায়ি হবার কথা ছিল। আমি বিছানা থেকে উঠেই চোখ কচলাতে কচলাতে মণ্ডপের দিকে ছুটলাম। ভয় হচ্ছিল রামচন্দ্র আবার চলে যায়নি তো। গিয়ে দেখি — বেশ্যাদের যাবার জন্য গাড়িগুলো তৈরি হয়ে আছে। বহু বহু লোক ছোঁক ছোঁক মুখ করে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদিকে মুখ তুলেও চাইলাম না। সোজা রামচন্দ্রের কাছে চলে গেলাম। লক্ষ্মণ আর সীতা বসে বসে কাঁদছিল; রামচন্দ্র কাঁধে লোটা আর দড়ি নিয়ে ওদের বোঝাচ্ছিল। আমি ছাড়া ওখানে আর কেউ ছিল না। কুণ্ঠিতস্বরে রামচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলাম — তোমাদের কি বিদায়ি হয়ে গেছে?

রামচন্দ্র — হ্যাঁ, হয়ে তো গেছে। আমাদের আবার বিদায়িই বা কী? জমিদারবাবু বলে দিলেন — টাকা আর কাপড় কি পাওনি? — যা। চলে যাচ্ছি।

— এখনও পাইনি। জমিদার বাবু বলেছেন, এখন টাকাকড়ি কিছু বাঁচেনি। পরে এসে নিয়ে যাস।

— কিচ্ছু পাওনি?

— একটা পয়সাও না। বলেছেন, কিচ্ছু বাঁচেনি। ভেবেছিলাম কয়েকটা টাকা পেয়ে গেলে কিছু পড়ার বইটই কিনে নেব। তা কিচ্ছু জুটল না। রাহা খরচটা পর্যন্ত দিলেন না। বলেছেন, এমন কী আর দূর, হেঁটে চলে যা।

আমার এমন রাগ হয়েছিল যে, ইচ্ছে করছিল গিয়ে জমিদারবাবুকে একচোট শোনাই। বেশ্যাদের বেলায় গাড়ি, টাকা সব কিছু; আর বেচারা রামচন্দ্র আর তার সাথিদের বেলায় কিচ্ছু না! যারা রাতে আবাদিজানের পায়ে দশ দশ, বিশ বিশ টাকা উৎসর্গ করেছেন, ওঁদের কাছে কি এদের জন্য দু-দু চার-চার আনা পয়সাও নেই? বাবাও তো আবাদিজানকে একটা আশরফি দিয়েছেন। দেখি তো এদের নামে কী দেন? আমি ছুটতে ছুটতে বাবার কাছে গেলাম। উনি কোথায় যেন তদন্তে যাবার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন — কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? পড়ার সময় যত তোর ঘোরাঘুরির কথা মনে আসে, তাই না?

আমি বললাম — গিয়েছিলাম মণ্ডপে। রামচন্দ্র চলে যাচ্ছে। ওদের জমিদারবাবু কিছুই দেননি।

— তাতে তোমার কী এত মাথাব্যথা?

— ওরা যাবে কী করে? ওদের কাছে রাহাখরচও তো নেই।

— খরচের জন্য কিছু দেয়নি? এটা তো জমিদারবাবুর খুব অন্যায়।

— আপনি যদি দুটো টাকা দেন, তাহলে আমি গিয়ে ওদের দিয়ে আসি। ওদিয়ে ওরা বোধ হয় বাড়ি চলে যেতে পারবে।

বাবা তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন — যা, বই নিয়ে বোস গে যা, আমার কাছে টাকা নেই। বলে উনি ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন। সে দিন থেকে বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধাভক্তি সব চলে গেল। আমি এরপর কোনোদিন ওঁর ধমকধামকের পরোয়া করিনি। আমার মন বলত — আমাকে

উপদেশ দেবার ওঁর কোনো অধিকার নেই। ওঁকে দেখলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। উনি যা বলতেন আমি ঠিক তার উলটোটা করতাম। যদিও এতে আমার ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ তখন বিদ্রোহে ভরে গিয়েছিল।

আমার কাছে দুআনা পয়সা পড়ে ছিল। সে পয়সা নিয়ে এসে খুব সংকোচের সঙ্গে রামচন্দ্রের হাতে দিলাম। পয়সা কটা দেখে রামচন্দ্রের যে আনন্দ হল তা আমার কল্পনাতীত। এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেন তৃষ্ণার্ত জল দেখেছে। ওই দুআনা পয়সা নিয়ে তিনমূর্তি বিদেয় হল। একা আমিই ওদের সঙ্গে শহরের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। ওদের বিদেয় দিয়ে যখন ফিরে এলাম আমার চোখ দুটি তখনও সজল, কিন্তু হৃদয় আনন্দে উদ্‌বেল।

(রামলীলা/১৯২৬) অনুবাদ ননী শূর

নিমন্ত্রণ

পণ্ডিত মোটেরাম শাস্ত্রী বাড়ির ভেতরে এসে নিজের বিশাল উদরে হাত বোলাতে বোলাতে পঞ্চম স্বরে গেয়ে উঠলেন —

অজগর করে ন চাকরি, পঞ্ছি করে ন কাম।
দাস মলুকা কহ্ গয়ে সবকে দাতা রাম॥

পণ্ডিতনি সোনা খুশি হয়ে বলল — মিষ্টি কোনো খবর আছে মনে হচ্ছে? টাটকা খবর। শাস্ত্রীজি কথার ছাঁদ পালটে বললেন — আজ কেল্লাফতে করেছি। এমন ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছি যে ঝাড়কে ঝাড় ধরাশায়ী। বাড়ির সবার নেমন্তন্ন। সবারই। এমন বিরাট গ্রাস তুলে মুখে ঠাসব যে, যারা দেখবে হাঁ হয়ে যাবে। উদর মহারাজ তো এখন থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে।

সোনা — আগের মতো এবারও না বোকা বনতে হয়। একদম পাকাপাকি করে এসেছ তো?

মোটেরাম (গোঁফে তা দিতে দিতে) — এরকম অলক্ষুনে কথা মুখে এনো না। অনেক সাধ্যসাধনার পর এই শুভদিন এসেছে। দরকারি গোছগাছে লেগে যাও।

সোনা — তা তো লাগবই। সেটুকুও কি জানি না? জন্মে থেকে ঘাস কাটছি? তা, হ্যাঁ গা? সত্যিই পুরো বাড়ির নেমন্তন্ন?

মোটেরাম — না তো কী? কী ভাবে বলব যে পুরো বাড়িরই নেমন্তন্ন? এর মানেও যদি মাথায় না ঢোকে তো জিজ্ঞেস করো। বিদ্বানদের কথা বোঝা তো সবার কম্ম নয়। যদি সবাই বুঝেই ফেলল তবে তাদের বিদ্যাবত্তার গুরুত্ব রইল কোথায়? বলো, কী বুঝলে? আমি তো এখন খুব সরল ভাষায় বললাম। তা তুমি বুঝতে পারছ না। বল 'বিদ্যাবত্তা' কাকে বলে? 'গুরুত্ব' মানেই বা কী? বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করা সে কি 'চাট্টিখানি' কথা। আর এরকম সময়ে বিদ্বানেরা রাজনীতি দিয়ে কৌশলে কাজ হাসিল করে আর নিজের মনের মতো মানে করে নেয়। ব্যাপার হল, মুরাদাপুরের রানি সাতজন ব্রাহ্মণকে ইচ্ছাপূরণ ভোজন করাতে চান। কে কে আমার সঙ্গে যাবে সেটা ঠিক করার দায়িত্ব আমার। এখন বলো, যখন এতগুলো লোক — অলগুরাম শাস্ত্রী, বেণীরাম শাস্ত্রী, ছেদিরাম শাস্ত্রী, ভবানীরাম শাস্ত্রী, ফেকুরাম শাস্ত্রী, মোটেরাম শাস্ত্রী ইত্যাদি নিজেদের বাড়িতেই আছে তখন বাইরে ব্রাহ্মণের খোঁজে আর কে যায়?

সোনা — আর সাত নম্বরের কোন জন?

মোটে — মাথা খাটিয়ে বলো দেখি।

সোনা — একটা পাত ছাঁদা বেঁধে বাড়িতে এনো।

মোটে — আর আবার এমন কথা বলছ যাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ছিঃ ছিঃ, ছাঁদা বেধে ঘরে আনব? যজমানের বাড়িতে বসে খেলে যে স্বাদ, বয়ে-আনা খাবারে সেই স্বাদ কোথায়? এখন শোনো, সাত নম্বরের মহাশয়টি হলেন পণ্ডিত সোনারাম শাস্ত্রী।

সোনা — এমা! যাও, ঠাট্টা করছ। আমি কী করে যাব?

মোটে — এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতেই বিদ্যা কাজে লাগে। যে বিদ্বান সে সুযোগকে নিজের গোলাম বানায়, আর যারা বোকা তারা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে কপাল চাপড়ায়। সোনাদেবী আর সোনারাম শাস্ত্রীর মধ্যে ফারাকটা কী জান? শুধু পরিধানের। পরিধান কাকে বলে বোঝো তো? 'পোশাক'কে বলে পরিধান। শাড়িটা আমার ধুতির মতো করে পরো, আমার মেরজাইটা পরে নাও, তার ওপর দিয়ে চাদর গায়ে জড়াও। আরে পাগড়ি আমি বেঁধে দেব খন। তারপর কে তোমায় চিনতে পারবে? সোনা হেসে ফেলে বলল — যাঃ, আমার লজ্জা করবে না?

মোটে — আরে ভাই তোমায় করতেটা হচ্ছে কী? কথা তো বলব আমি।

সোনা মনে মনে ভোজ্য পদার্থের স্বাদ নিয়ে বলল — সে ভারী মজা হবে।

মোটে — নাও, আর দেরি কোরো না। তৈরি হয়ে নাও, যাও।

সোনা — কটা হজমিগুলি তৈরি করব?

মোটে — সে আমি জানি না। তবে এই আদর্শটা সামনে রেখো — যতটা সম্ভব বেশি সুযোগ নেওয়া যায়।

হঠাৎ সোনাদেবীর একটা কথা মনে এল। সে বলল — পায়ের এই মলগুলো কী করব?

মোটেরাম ভুরু কুঁচকে বলল — এগুলো উঁচু করে তুলে রাখবে। আবার কী করবে?

সোনা — হ্যাঁ হ্যাঁ, খুলেই রেখে দিই না কেন?

মোটে — আমি কি তোমার পায়ে মল ধারণের জোরে বেঁচে আছি? বেঁচে আছি পুষ্টিকর খাদ্য সেবন করে, তোমার পায়ের মলের পুণ্যির দৌলতে বেঁচে নেই।

সোনা — না বাবা, আমি পায়ের মল খুলব না। মোটেরাম খানিক চিন্তা করে বললেন — আচ্ছা পরেই চল। কোনো ক্ষতি নেই। গোবর্ধনধারী এই বাধাও কাটিয়ে দেবেন। পায়ে বেশ কিছু কাপড় জড়িয়ে নিও। বলব, এই পণ্ডিতজির পায়ে গোদ হয়েছে। কেমন? কী রকম বুদ্ধি দিচ্ছি? পণ্ডিতনি স্বামীর দিকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল — জীবনভর পড়াশোনাই করেছ না!

দুই

সন্ধ্যার সময় পণ্ডিতজি পাঁচ ছেলেকে ডেকে নিয়ে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। পুত্রগণ শোনো — কোনো কাজ করার আগে খুব ভালো করে ভেবে চিন্তে নেওয়া উচিত যে কীসে কী হয়। ধর, রানিজি তোমাদের ঠিকানা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলেন। তা, তোমরা কী উত্তর দেবে? তোমরা সবাই যদি আমার নাম করতে আরম্ভ কর তা হলে সেটা হবে মহামূর্খামি। ভাবো, কী ভীষণ কলঙ্ক আর লজ্জার কথা হবে যে, আমার মতো একজন বিদ্বান কেবল ভোজনের জন্যে এমন একটা ষড়যন্ত্র করেছে। সুতরাং তোমরা সবাই আপাতত ভুলে যাও যে তোমরা আমার ছেলে। কেউ আমার নাম

বোলো না। দুনিয়ায় নামের অভাব নেই। কোনো একটা ভালো নাম বেছে বলে দিয়ো। বাবার নাম পালটালে কোনো গাল পাড়া হয় না। এটা কোনো অপরাধ নয়।

অলগু — আপনিই বলে দিন না।

মোটে — ভালো, খুব ভালো কথা। হ্যাঁ, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমারই করা উচিত। আচ্ছা, এবার শোনো। অলগুরামের বাবার নাম পণ্ডিত কেশব পান্ডে। খুব ভালো করে মুখস্থ করে নাও। বেণীরামের বাবার নাম পণ্ডিত মংগরু ওঝা। ভালো করে মনে রেখো। ছেদিরামের বাবা হচ্ছেন পণ্ডিত দমড়ি তেওয়ারি। ভুলবে না। ভবানী, তুমি বলবে গংগু পান্ডে। বেশ করে মুখস্থ করে নাও। বাকি রইল ফেকুরাম। তুই বাবা সেতুরাম পাঠকের নাম বলিস। সব হয়ে গেছে তো? সবার নামকরণ? আচ্ছা, এবার আমি পরীক্ষা নেব। হুঁশিয়ার, বলো অলগু, তোমার বাবার নাম কী?

অলগু — পণ্ডিত কেশব পান্ডে।

— বেণীরাম, তুমি বলো।

— দমড়ি তেওয়ারি।

ছেদি — এটা তো আমার বাবার নাম।

বেণী -- আমি ভুলেই গেছি।

মোটে — ভুলে গেছি! পণ্ডিতের ছেলে হয়ে একটা নামও মনে রাখতে পারছ না? ভারী দুঃখের কথা। আমার পাঁচটা নামই মনে আছে। তোমাদের একটাও নাম মনে নেই? শোন, তোমার বাবার নাম মঙ্গরু ওঝা।

পণ্ডিতজি যখন নিজের ছেলেদের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তখন দরজায় তার পরম বন্ধু পণ্ডিত চিন্তামণিজির ডাক শোনা গেল। পণ্ডিত মোটেরাম এত ঘাবড়ে গেলেন যে, তাঁর বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেল। ছেলেদের ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার আগেই চিন্তামণিজি ভেতরে এসে পড়লেন। ছেলেবেলা থেকেই দুজনের গভীর বন্ধুত্ব। দুজনে প্রায়ই একসঙ্গে ব্রাহ্মণ ভোজনে যেতেন। খাওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিত মোটেরাম প্রথম স্থান অধিকার করলেও পণ্ডিত চিন্তামণিজির দ্বিতীয় স্থান ছিল বাঁধা। কিন্তু আজ পণ্ডিত মোটেরামের নিজের বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মন চাইছিল না। তাঁকে নিয়ে যাওয়া মানে নিজের বাড়ির কাউকে বাদ দেওয়া। আর এত মহৎ আত্মত্যাগ করতে মোটেরাম রাজি ছিলেন না। চিন্তামণি এই সমারোহ দেখে হৃষ্টচিত্তে বললেন — কী ভাই, একলা একলাই? মনে হচ্ছে আজ কোথাও ভালো দাঁও মেরেছ। মোটেরাম মুখভার করে বললেন — কীসের কথা বলছ বন্ধু। আমি কোনো সুযোগ পেলাম আর তোমায় খবর দিলাম না এমন কী হতে দেখেছ কখনও? হয় দিনকালই পালটে গেছে কিংবা গ্রহেরই ফের — ঠাট্টা করেও কেউ ডাকে না আজ।

পণ্ডিত চিন্তামণি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন — একটা কিছু ব্যাপার ভাই নিশ্চয়ই আছে, নইলে বাচ্চারা এখনে জড়ো হয়েছে কেন?

মোটে — তোমার এই কথাগুলোতেই রাগ ধরে যায়। ওদের পড়া ধরছিলাম। ব্রাহ্মণের ছেলে, দুপাতা না পড়লে এদের পুঁছবে কে?

চিন্তামণির বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, ছেলেদের কাছ থেকেই এ ব্যাপারে সঠিক খবরটা জানা যাবে। ফেকুরাম সবার ছোটো। তাকেই জিজ্ঞেস করলেন — কী পড়ছ বাবা? আমাকেও শোনাও দেখি।

মোটেরাম ফেকুকে বলার সুযোগ দিলেন না। ভয় হল পাছে ফেকু হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয়। বললেন — ও কী পড়বে? সারাটা দিন কেবল খেলে বেড়ায়।

ফেকুরাম এত বড়ো অপরাধের বোঝা নিজের কচি ঘাড়ে নেবে কেন? বালসুলভ অহংকারে সে বলে ওঠে — আমার তো মনে আছে। পণ্ডিত সেতুরাম পাঠক। আমি মনেও রাখব তবু বলবে যে সব সময় খেলে বেড়াই। এই বলে সে কাঁদতে শুরু করে।

চিন্তামণি বাচ্চাটাকে বুকে টেনে নেন। বলেন — না বাবা। তুমি তো তোমার পড়া শুনিয়ে দিয়েছ। তুমি খুব ভালো লেখাপড়া কর। এই সেতুরাম পাঠকটা কে বাবা?

মোটেরাম রেগে উঠে বলেন — তুমিও ছেলেদের কথায় বিশ্বাস কর? কার না কার নাম কানে এসে গেছে। (ফেকুকে) যা, বাইরে খেলগে যা।

চিন্তামণি বন্ধুকে ঘাবড়ে যেতে দেখে ধরে ফেলেছেন কোনো একটা রহস্য অবশ্যই আছে। অনেক মাথা ঘামিয়েও সেতুরাম পাঠকের ব্যাপারটা তার মগজে ঢুকল না। নিজের পরম মিত্রের এই কুটিলতায় মনে মনে ব্যথিত হয়ে বললেন — আচ্ছা, তুমি এদের পড়াও আর পরীক্ষা নাও। আমি চলি। আমার তো এতটুকুও ধারণা ছিল না যে, তুমি এমন স্বার্থপর। আজ তোমার বন্ধুত্বের পরীক্ষা হয়ে গেল।

পণ্ডিত চিন্তামণি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু বন্ধুর মানভঞ্জন করার মতো সময় পণ্ডিত মোটেরামের ছিল না। তিনি আবার ছেলেদের পরীক্ষা নিতে আরম্ভ করলেন।

সোনা বলল — ওগো, মান ভাঙাও। মান ভাঙাও। রাগ করে চলে যাচ্ছেন যে। ছেলেদের পরীক্ষা পরে নিয়ো।

মোটে — যখন দরকার পড়বে তখন মান ভাঙাব। নেমন্তন্নর খবর শুনলেই ওর সব রাগ জল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বাবা ভবানী, বলো তোমার বাবার নাম কী?

ভবানী — গংগু পাণ্ডে।

মোটে — আর ফেকু, তোমার বাবার নাম?

ফেকু — বলে তো দিয়েছি। তার ওপর আবার বল পড়ি না।

মোটে — আমাদেরও একবার শুনিয়ে দাও।

ফেকু — সেতুরাম পাঠক, আবার কী?

মোটে — একদম ঠিক। আমার রাজা ছেলে। আজ তোমায় আমার পাশে বসাব আর সবচে ভালো ভালো জিনিস তোমাকেই খাওয়াব।

সোনা — আমাকেও কোনো একটা নাম দাও।

মোটেরাম রসিকতা করে হালকা হেসে বলল — তোমার নাম পণ্ডিত মোহনস্বরূপ শুকুল।

সোনা দেবী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেন।

তিন

সোনা দেবী ছেলেদের জামাকাপড় পরাতে লাগলেন। এদিকে ফেকু আনন্দে ভাসতে ভাসতে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। পণ্ডিত চিন্তামণি রেগেমেগে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন বটে; কিন্তু কৌতূহলের

বশে দরজার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এতক্ষণে এই কথাবার্তায় ব্যাপারটা খানিক আঁচ করতে পারলেন। তিনি বুঝে ফেললেন, কোথাও নেমন্তন্ন আছে। কিন্তু কোথায়? নেমন্তন্ন পেল কে কে? এসব কিছুই তিনি জানতে পারলেন না। ফেকু বাইরে আসতেই তাকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন — কোথায় নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছিস, বাবা?

নিজের জ্ঞাতসারে তো চিন্তামণি খুব আস্তেই জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু কী ভাবে কে জানে পণ্ডিত মোটেরাম কথাটা শুনে ফেললেন। দেখতে পেলেন, চিন্তামণি ফেকুকে কোলে তুলে কিছু প্রশ্ন করছে। মোটে লাফিয়ে ছেলের হাত ধরলেন আর বন্ধুর কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে গেলেন। কিন্তু চিন্তামণি তো তাঁর প্রশ্নের উত্তর এখনও পাননি। অতএব তিনি বাবার হাত থেকে বাচ্চাটাকে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে দৌড় লাগালেন। মোটেরামও তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন — ওকে একা নিয়ে যাচ্ছ কেন? ধূর্ত কোথাকার, বজ্জাত। চিন্তামণি, এর ফল ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আর কখনও কিন্তু তোমায় কোনো নেমন্তন্নে নিয়ে যাব না। ভালো চাও তো ওকে নামিয়ে দাও।

কিন্তু চিন্তামণি কোনো কথাতেই কান না দিয়ে দৌড়ে চললেন। তার দেহ এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। দৌড়োতে পারতেন তিনি। কিন্তু মোটেরামের জোরে পা ফেলতেই কষ্ট হচ্ছিল। মোষের মত হাঁপাচ্ছিলেন আর নানান বিশেষণ নিক্ষেপ করতে করতে দুলকি চালে চলছিলেন। যদিও প্রতি মুহূর্তেই দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল, তবু তিনি হাল ছেড়ে দেন নি। ভালো রকমেরই ঘোড়দৌড় চলছিল। শহরের দুই মহাপুরুষ যখন দৌড়োচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল চিড়িয়াখানা থেকে দুটো গণ্ডার পালাচ্ছে। শত শত মানুষ তামাশা দেখতে লাগল। বেশ কিছু ছেলে তালি বাজাতে বাজাতে তাদের পিছু নিল। এই দৌড় হয়তো চিন্তামণির বাড়ি গিয়েই থামত। কিন্তু পণ্ডিত মোটেরামের কাপড় ঢিলে হয়ে যাওয়ায় পায়ে জড়িয়ে তিনি পড়ে গেলেন। চিন্তামণি পেছনে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখে থমকে গেলেন, ফেকুরামকে জিজ্ঞেস করলেন — কী বাবা, কীসের নেমন্তন্ন?

ফেকু — বলে দিলে মিষ্টি দেবে তো?

চিন্তা — হ্যাঁ দেব। বল।

ফেকু — রানির বাড়ি।

চিন্তা — কোথাকার রানি?

ফেকু — তা জানি না। তবে বড়ো রানি।

শহরে কয়েকজন বড়ো রানি ছিলেন। পণ্ডিতজি ভাবলেন সব রানির ফটকের সামনেই চক্কর লাগাব। যেখানে ভোজ হবে সেখানে কিছু ভিড়টিড় হবেই। তখন জানা যাবে। এই ঠিক করে তিনি ফিরে এলেন। মোটেরামকে সহানুভূতি জানাতে এখন তো আর কোনো বাধা নেই। মোটেরামের কাছে এসে দেখেন মাটিতে পড়ে সে কাতরাচ্ছে। ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। ঘাবড়ে গিয়ে চিন্তামণি প্রশ্ন করেন—কী করে পড়ে গেলে বন্ধু, এখানে কোনো গর্তটর্ত দেখছি না তো?

মোটে—তোমার কী দরকার? তুমি ছেলেকে নিয়ে যাও, যা কিছু জিজ্ঞেস করো।

চিন্তা—আমি এরকম কপট ব্যবহার করতাম না। ঠাট্টা করলাম। তুমি খারাপ ভাবলে। নাও, এখন রাম নাম নিয়ে উঠে বোসো। সত্যি বলছি, আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

মোটে—মিথ্যুক কোথাকার।

চিন্তা—পৈতে ছুঁয়ে বলছি।

মোটে—তোমার শপথে বিশ্বাস করা যায়?

চিন্তা—তুমি আমায় এত ধূর্ত ভাব?

মোটে—এর থেকেও বেশি। যদি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়েও শপথ কর তবু আমার বিশ্বাস হবে না।

চিন্তা—অন্য কেউ একথা বললে তার গোঁফ টেনে উপড়ে ফেলতাম।

মোটে—তাহলে এসো দেখি।

চিন্তা—আগে পণ্ডিতনিকে জিজ্ঞেস করে এসো।

মোটেরাম এই গা-জ্বালানো ব্যঙ্গ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি চট্ করে উঠে বসে চিন্তামণির হাত ধরে ফেললেন। দুই বন্ধুতে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দুইজনেই হনুমানজির স্তুতি করছিলেন আর এত জোরে গর্জন করছিলেন যেন সিংহ হুংকার দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল দুটো পিপেতে যেন আপসে টক্কর খাচ্ছে।

মোটে—মহাবলী বিক্রম বজরংগি।

চিন্তামণি—ভূতপিশাচ নিকট নহি আয়ে।

মোটে—জয় জয় জয় হনুমান গোঁসাই।

চিন্তা—প্রভু, রখিয়ে লাজ হমারি।

মোটে (রেগে গিয়ে)—এটা 'হনুমান চাল্লিশায়' (তুলসিদাস রচিত হনুমানস্তুতি কাব্য) নেই।

চিন্তা—এটা আমার রচনা। তোমার মতো কি আমার কেবল মুখস্থবিদ্যা? যা কিছু বলবে আমি রচনা করে দেব।

মোটে — আরে আমি রচনা করতে চাইলে এক্ষুনি লাখো স্তুতি রচনা করে ফেলতে পারি। কিন্তু অত সময় কার আছে?

দুই মহাপুরুষ আলাদা দাঁড়িয়ে নিজের নিজের রচনাকৌশলের বড়াই করছিলেন। মল্লযুদ্ধ শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের রূপ ধারণ করতে লাগল। বিদ্বানদের পক্ষে সেটাই তো সঙ্গত। এরই মধ্যে কোনো ব্যক্তি চিন্তামণির বাড়ি গিয়ে বলে এসেছে যে, পণ্ডিত মোটেরাম আর চিন্তামণির মধ্যে খুব লড়াই হচ্ছে। চিন্তামণিজি ছিলেন তিনটি মহিলার স্বামী। কুলীন ব্রাহ্মণ। পুরোদস্তর 'বিশ বিশ্বে'। কনৌজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মনে করে। তারা নিজেদের অভিহিত করে 'বিশ বিশ্বে' বলে। দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর যজমানি। এরকম পুরুষের সমস্ত কিছুর উপরেই অধিকার। আর কন্যার সঙ্গে যখন প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্তি ঘটে তখন বিবাহটা কি করে অস্বীকার করা যায়? যা হোক, গোটা এলাকা ছিল এই তিন মহিলার আতঙ্কে সন্ত্রস্ত। পণ্ডিতজি এদের বেশ সরস নাম রেখেছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম 'অমৃতি', দ্বিতীয়ার নাম 'গোলাপজাম' আর কনিষ্ঠকে 'মোহনভোগ' বলে ডাকতেন। তবে মহল্লার লোকের কাছে তারা ত্রিতাপের সমান ছিল। বাড়িতে সর্বদাই চোখের জলের নদী বইছে। রক্তের নদী অবশ্য পণ্ডিতজি কখনও বহাননি, বেশি হলে তিনি শব্দের নদী বইয়ে দিতেন। কিন্তু তারা নিজেরা যাই করুক না কেন বাইরের কেউ যে তাদের কাউকে কিছু বলে পার পেয়ে যাবে সে উপায় ছিল না। সংকটের সময় তারা তিনজন

এককাট্টা হয়ে যেত। পণ্ডিতজির চতুর কূটনীতির সাফল্যের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। যে মুহূর্তে তারা খবর পেল যে পণ্ডিত চিন্তামণিজি বিপন্ন তখনই তারা তিনজন ত্রিদোষের মত কুপিত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরুল। আর তিনজনের মধ্যে যে অন্য দুজনের চাইতে রোগা ছিল সে সবাইয়ের আগে রণক্ষেত্রে পৌঁছে গেল। পণ্ডিত মোটেরাম ওদের আসতে দেখেই ধরে নিলেন আর বাঁচোয়া নেই। নিজের হাত ছাড়িয়ে পড়ি কি মরি করে ছুট দিলেন। পেছন ফিরে তাকালেন না পর্যন্ত। চিন্তামণি তাকে অনেক ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো সত্ত্বেও মোটেরাম আর থামেননি।

চিন্তা — আর পালাচ্ছ কেন? দাঁড়াও, একটু মজা টের পেয়ে যাও!

মোটে — আমি হার মানছি ভাই, হার মানছি।

চিন্তা — আরে, কিছু দক্ষিণা তো নিয়ে যাও।

মোটেরাম দৌড়োতে দৌড়োতে বলল—দয়া করো ভাই, দয়া করো।

চার

আটটা বাজতে না বাজতে পণ্ডিত মোটেরাম স্নান ও পুজো শেষ করে বললেন—আর দেরি করা উচিত নয়। হজমিগুলি তৈরি হয়েছে তো?

সোনা—গুলি নিয়ে তো কখন থেকে বসে আছি। তোমার কোনো ব্যাপারেই হুঁশ থাকে না। রাতের বেলায় কে দেখতে যাচ্ছে তুমি কতক্ষণ পুজো করছ?

মোটে—আমি তোমায় একবার নয়, হাজার বার বলেছি আমার কোনো কাজে নাক গলাবে না। তুমি বুঝবে না যে, কেন এত দেরি করলাম। তোমাকে ঈশ্বর অতটা বুদ্ধি দেননি। তাড়াতাড়ি গেলে অপমান হয়। যজমান ভাবে লোভী—খাওয়ার কাঙাল। সেই জন্যে যারা চালাক তারা দেরি করে যাতে যজমান ভাবে পণ্ডিতজির কোনো খেয়ালই নেই, তিনি ভুলে গেছেন। ডাকতে লোক পাঠাবে। এইভাবে গেলে যে মানসম্মান, তা কী ওই রকম ভুখার মতো গেলে কখনও হতে পারে? আমি ডাকতে আসার প্রতীক্ষায় আছি। কেউ না কেউ ডাকতে আসছেই। দাও একটু গুলি। বাচ্চাদের খাইয়েছ তো?

সোনা—ওদের তো আমি সন্ধেবেলাতেই খাইয়ে দিয়েছি।

মোটে—কেউ ঘুমিয়ে পড়েনি তো?

সোনা—আজ কি কেউ ঘুমোবে? খিদে খিদে করে চেঁচাচ্ছিল। এক পয়সার ছোলাভাজা কিনে দিয়েছি। সবাই ওপরে বসে চিবোচ্ছে। শুনতে পাচ্ছ না মারপিট হচ্ছে।

মোটেরাম দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—ইচ্ছে করছে তোমার ঘাড় মটকে দিই। এখন ছোলাভাজা আনাবার দরকারটা কী ছিল? ছোলাভাজা খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেললে ওখানে গিয়ে কী তোমার মুণ্ডু চিবোবে? ছিঃ ছিঃ, একটুও বুদ্ধি নেই!

সোনা ত্রুটি স্বীকার করে বলে—হ্যাঁ, ভুল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সবাই এত চেঁচামেচি করছিল যে সহ্য করা যাচ্ছিল না।

মোটে—শুধু তো কাঁদছিলই। কাঁদতে দিতে। কাঁদলে তো পেট ভরত না বরং খিদে আরও বাড়ত।

সহসা এক ব্যক্তি বাইরে থেকে হেঁকে বলল—পণ্ডিতজি, মহারানি ডাকছেন। অন্য ব্রাহ্মণদের নিয়ে তাড়াতাড়ি চলুন।

পণ্ডিতজি স্ত্রীর দিকে সগর্বে তাকিয়ে বললেন—দেখ, একেই বলে নেমন্তন্ন। এবার তৈরি হয়ে নাও।

বাইরে এসে পণ্ডিতজি সেই লোকটাকে বললেন—তুমি আরেক দণ্ড দেরিতে এলে আমায় পেতে না। আমি কথকতা শুনতে চলে যাচ্ছিলাম। আমার একদম মনে ছিল না। তুমি এগোও। আমরা এখুনি আসছি।

পাঁচ

নটা বাজতে না বাজতে পণ্ডিত মোটেরাম বালগোপালদের নিয়ে রানিসাহেবার দরজায় হাজির হলেন। রানি বিশালবপু ও তেজস্বিনী। তখন তিনি নকশাকাটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। দুজন লোক করজোড়ে পেছনে দাঁড়িয়েছিল। বৈদ্যুতিক পাখা চলছিল। পণ্ডিতজিকে দেখতে পেয়ে রানিজি সিংহাসন থেকে নেমে এসে তার পাদস্পর্শ করে মৃদু হেসে বালমণ্ডলীকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—এই বাচ্চাদের আপনি কোত্থেকে ধরে আনলেন?

মোটে—কী করি বলুন? সমস্ত শহর চষে ফেললাম। কিন্তু কোনো পণ্ডিতই আসতে চাইল না। কারো এক জায়গায় তো কারো আর এক জায়গায় নেমন্তন্ন। ভেবে পেলাম না কী করা যায়। শেষকালে আমি তাঁদের বললাম, ঠিক আছে আপনারা না যেতে চান সে ঈশ্বরের অভিপ্রায়, কিন্তু আমায় যাতে লজ্জায় না পড়তে হয় সে ব্যবস্থা করুন। তখন জোর করে যার বাড়ি থেকে যেমন বাচ্চা পেয়েছি ধরে নিয়ে এসেছি। ফেকুরাম, তোমার বাবার নাম কী?

ফেকুরাম সগর্বে বলল—পণ্ডিত সেতুরাম পাঠক।

রানি—বালক তো বেশ বুদ্ধিমান।

অন্য ছেলেদেরও পরীক্ষা দেওয়ার উৎকণ্ঠা ছিল। কিন্তু যখন পণ্ডিতজি তাদের কোনো প্রশ্ন করলেন না অথচ রানি ফেকুরামের প্রশংসা করতে লাগলেন তখন তারা অধীর হয়ে উঠল। ভবানী বলল—আমার বাবার নাম গংগু পাণ্ডে। ছেদি বলল—আমার বাবার নাম দমড়ি তেওয়ারি। বেণীরাম বলল—আমার বাবার নাম পণ্ডিত মঙ্গরু ওঝা। অলগুরাম ছিল বুদ্ধিমান। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। রানি তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাবার নাম কী?

সে সময় তার বাবার জন্য রাখা নির্দিষ্ট নামটি অলগুরাম ভুলে গেছিল। আবার মাথায় তার এটাও ঢুকছিল না যে কোনো একটা নাম তো বলে দিই। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পণ্ডিত মোটেরাম যখন তার দিকে দাঁত কড়মড়িয়ে তাকালেন তখন সে সব গুলিয়ে ফেলল।

ফেকুরাম বলে উঠল—আমি বলে দিই। ভাই ভুলে গেছে।

রানি—নিজের বাবার নামও কেউ ভুলে যায়, এ তো দেখছি বিচিত্র ব্যাপার।

মোটেরাম অলগুর কাছে গিয়ে বললেন—কে বল।

অলগুরাম বলে উঠল—কেশব পাণ্ডে।

রানি—তাহলে এতক্ষণ চুপ করে ছিলে কেন?

মোটে—হুজুর, এদের বাচ্চা ভাববেন না। এর মধ্যে যেটা সবচে ছোটো সেটাও দুপাত খেয়ে উঠবে।

ছয়

সামনে পাতা দেওয়া হয়ে গেলে রাঁধুনিঠাকুর যখন রুপোর থালায় করে উত্তম ভোজ্যপদার্থ পরিবেশন করতে লাগল তখন মোটেরামের চোখ ছানাবড়া। তিনি প্রায়ই নেমন্তন্ন পেয়ে থাকেন। কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট খাদ্য কখনও পাননি। ঘিয়ের এমন সুন্দর সোঁদা গন্ধ আগে কখনও পাননি। প্রত্যেক ভোজ্য বস্তু থেকে কেওড়া আর গোলাপজলের সুবাস বেরোচ্ছিল। ঘি ঝরছিল টপটপ করে। পণ্ডিতজি মনে মনে ভাবলেন এমন জিনিস দিয়ে কি কখনও পেট ভরতে পারে। ইচ্ছে হয় মন মন খেয়ে ফেলি, তবুও যেন আশ মেটবে না। দেবতারা এর থেকে উত্তম আর কোন পদার্থ ভোজন করেন? এর থেকে উত্তম কিছু তো চিন্তাও করা যায় না।

এই সময়ে পণ্ডিতজির নিজের পরম বন্ধু পণ্ডিত চিন্তামণির কথা মনে পড়ল। সে থাকলে আসর জমে উঠত। তাকে ছাড়া তো সব ফিকে মনে হচ্ছে। এখানে দ্বিতীয় এমন কে আছে যার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। ছেলেরা তো দুপাত খেয়েই চিৎপাত হয়ে যাবে। সোনা কিছুক্ষণ সামলাবে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? চিন্তামণি ছাড়া আসর জমবে না। সে আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে। আমি করব তাকে। এই উত্তেজনায় কত পাতা যে সাফ হবে কে আর তা গুনতে যাচ্ছে। আমাদের দেখাদেখি ছেলেরাও আরও কিছু বেশি টানবে। নাঃ, খুব ভুল হয়ে গেছে। এ কথা আমার আগে মনে পড়ে নি। রানিসাহেবকে বলি। কিছু মনে করবেন না তো? উঁহু, যাই হোক গে, একবার চেষ্টা তো করে দেখি। তখনি দাঁড়িয়ে উঠে রানিসাহেবাকে বললেন— হুজুর, আজ্ঞা করেন তো কিছু নিবেদন করি।

রানি — বলুন, বলুন মহারাজ। কোনো জিনিসের ঘাটতি মনে হচ্ছে?

মোটে — না হুজুর, কোনো ঘাটতি নেই। এরকম উত্তম বস্তু তো কখনও চোখেই দেখিনি। সারা শহর আপনার কীর্তি ছড়িয়ে পড়বে। আমার এক পরম বন্ধু পণ্ডিত চিন্তামণি। আজ্ঞা হলে তাঁকে ডেকে আনি। অতি বিদ্বান কর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এই শহরে তাঁর জুড়ি নেই। আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছি। এখনই মনে পড়ল।

রানি — আপনার ইচ্ছে হলে ডেকে আনুন। কিন্তু যেতে আসতে তো দেরি হবে। এদিকে খাবারও বাড়া হয়ে গেছে।

মোটে — হুজুর, আমি এখুনি দৌড়ে যাচ্ছি।

রানি — আমার মোটর নিয়ে যান।

পণ্ডিতজি যখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তখন সোনা বলল — তোমার আজ কী হয়েছে গো? ওকে কেন ডাকছ?

মোটে — খাওয়ার সময় সঙ্গ দেওয়ার জন্যেও তো কাউকে চাই।

সোনা — তুমি কি আমায় দাবাতে পারবে?

পণ্ডিতজি মৃদু হাস্যে বললেন — তুমি বোঝ না, বাড়ির কথা আলাদা আর আখড়ার কথা আলাদা। পুরনো লড়িয়ে ময়দানে নেমে যত হাঁকডাক করতে পারবে নতুন রঙরুট তো তা পারবে

না। সেখানে শক্তির চেয়ে সাহসের দরকার বেশি। এখানেও জানবে এই একই কথা খাটে। জিত আমারই হবে। বুঝবে তখন!

সোনা — ছেলেরা যদি ঘুমিয়ে পড়ে?

মোটে — খিদে আরও বাড়বে। আমি তো জাগিয়ে নেব।

সোনা — দেখ আজ, ওই তোমায় কাত করবে। ওর পেটে তো শনির অধিষ্ঠান।

মোটে — সব জায়গাতেই বুদ্ধির দাপট থাকে। এটা ভেব না যে ভোজনের কোনো কৌশল নেই। এরও একটা শাস্ত্র আছে — মথুরার শনিচরানন্দ মহারাজের রচিত। চতুর ব্যক্তি গৃহের স্বল্প পরিসরে সব কিছু গুছিয়ে রাখতে পারে, আনাড়ি ব্যক্তি অনেকখানি জায়গা পেয়েও ভাবে কোন জিনিসটা কোথায় রাখি। গেঁয়োরা প্রথম থেকেই হুপ হাপ খেতে থাকে আর একটু পরেই এক ঘটি জল খেয়ে কেৎরে পরে। চতুর ব্যক্তি খুব সাবধানে খায়। তার গ্রাস নীচে নামাবার জন্যে জলের দরকার হয়না। অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে খেলে সেগুলো সুপাচ্যও হয়ে যায়। আমার সামনে চিন্তামণি কী করে দাঁড়াবে?

সাত

চিন্তামণি নিজের উঠোনে উদাসীন হয়ে বসেছিলেন। যে মানুষকে তিনি নিজের পরম হিতৈষী বলে জানতেন, যার জন্যে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জনেও প্রস্তুত থাকতেন, সেই কী না আজ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল! শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই করেনি, তাকে ধরে পিটেওছে। মোটেরাম যদি তাকেও নিজের সঙ্গে নিমন্ত্রণে নিয়ে যেত তাতে তার ঘর থেকে কিছু তো কমে যেত না, না কি রানি তাকে ছি ছি করত? স্বার্থের সামনে কেউ কারও নয়। সেই অমূল্য ভোজ্যবস্তুর কল্পনা করে চিন্তামণির মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছিল। এই সামনে পাত পড়ল .... আহ্! রাঁধুনিঠাকুর থালায় করে হয়তো অমৃতি নিয়ে এসেছে .... আহ্ কত সুন্দর, নরম, কুড়মুড়ে আর রসাল অমৃতিগুলো .... এই হয়তো ব্যাসনের লাড্ডু দিল .... আহ্ লাড্ডুগুলো কী সুন্দরগোল, মেওয়ায় ভরা, ঘি-চপচপে, মুখে দিলেই মিলিয়ে যাচ্ছে.... জিভ নাড়াতেও হচ্ছে না.... আহা, এবার হয়তো মোহনভোগ এল, হায়রে দুর্ভাগা! আমি এখানে পড়ে পচছি আর সেখানে কী বাহার! মোটেরাম, তুমি বড়ো নির্দয়, তোমার কাছ থেকে এমন নিষ্ঠুরতা আশা করিনি।

অমৃতি দেবী — তুমি এত মনমরা হয়ে পড়ছ কেন? এই তো পিতৃপক্ষ পড়ল বলে, তখন কত নেমন্তন্ন এমন পাবে।

চিন্তা — আজ সকালে কোন অভাগার মুখ দেখে উঠেছিলাম? পাঁজিটা নিয়ে এস তো, দেখি সময়টা কেমন। আর থাকতে পারছি না। সারা শহর চষে ফেলব। কোথাও না কোথাও সন্ধান পাব। নিশ্বাস তো ডানদিকের নাক দিয়ে বইছে। তার মানে সময়টা ভালোই।

হঠাৎ মোটরগাড়ির শব্দ। গাড়ির আলোয় পণ্ডিতজির পুরো বাড়ি ঝকমক করে উঠল। চিন্তামণি জানালা দিয়ে উঁকি মারতে গিয়ে মোটেরামকে মোটর থেকে নামতে দেখতে পেলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে খাটিয়ায় আছড়ে পড়লেন, মনে মনে বললেন — বজ্জাতটা খেয়ে দেয়ে এখন তার ফিরিস্তি দিতে এসেছে।

অমৃতি দেবী গালপেড়ে জিজ্ঞেস করল — কে রে বদমাস? এত রাতে কেন জাগাতে এসেছিস?

মোটে — আরে বাবা, আমি! গালাগাল দিয়ো না।

অমৃতি — দূর হ মুখপোড়া! তুই কে? শুধু বলে 'আমি' 'আমি'। কে জানে তুই কে?

মোটে — আরে আমার গলার আওয়াজ চিনতে পারছ না? ভাল করে চিনে নাও। আমি তোমার দেওর।

অমৃতি — দূর হ, তোর সঙ্গে কে লাগতে যাবে? তুই মরগে যা। আমার দেওর হতে এসেছে, বদমাশ।

মোটে — আরে আমি মোটেরাম শাস্ত্রী। একটুও চিনতে পারলে না? চিন্তামণি বাড়িতে আছেন?

অমৃতি দরজা খুলে ভর্ৎসনা করে বলে — আচ্ছা! তুমি! নাম বলছিলে না কেন? এতগুলো গালাগাল খেয়ে তবে মুখের বুলি ফুটল? কী, ব্যাপার কী?

মোটে — অন্য কোনো ব্যাপার নয়, চিন্তামণিকে শুভসংবাদ দিতে এসেছি। রানিসাহেবা তাকে স্মরণ করেছেন।

অমৃতি — খাওয়াদাওয়ার পর ডেকে আর কী হবে?

মোটে — কোথায় খাওয়াদাওয়া হল? আমি ওর বিদ্যা, কর্মনিষ্ঠা ও সদ্‌বিবেচনার প্রশংসা করতে রানি একেবারে মুগ্ধ। আমায় বললেন ওকে মোটরে করে নিয়ে যেতে। কী, ঘুমিয়ে পড়েছেন?

চিন্তামণি খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে সবই শুনছিলেন। মোটেরামের পা জড়িয়ে ধরতে তার ইচ্ছে করছিল। মোটেরামের সম্বন্ধে যে সব কুচিন্তা এতক্ষণ মাথায় ঘুরছিল সব মুছে গিয়ে এখন মনে গ্লানি এল। চিন্তামণি কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

— কী ভাই, আসবে না শুয়েই থাকবে? এই বলতে বলতে মোটে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

চিন্তা — তখন নিয়ে গেলে না কেন? আগে এত নাকাল করে এখন এসেছ। এখনও পিঠে ব্যথা হচ্ছে, জান?

মোটে — আরে দেখ না, এমন ঘি-এ চোবানো জিনিস সব খাওয়াব যে সব ব্যথা-ট্যাথা কোথায় উবে যাবে। তোমার যজমানেরা তো নিজেদের জন্যেও এমন জিনিস কল্পনা করতে পারবে না। আজ তোমায় আচ্ছা করে কুপোকাত করব।

চিন্তা — তুমি আমায় কী কুপোকাত করবে? সারা শহরে তো এমন কোনো মায়ের ব্যাটা নজরে পড়ে না। আমার ইষ্ট শনিঠাকুর।

মোটে — আরে ভাই, বছরের পর বছর তপস্যা করার পর এমন দিন এসেছে। পুরো ভাঁড়ার সাফ করে খেয়ে নেওয়ার পরেও ইচ্ছার নিবৃত্তি নেই। হ্যাঁ, এটা ধরে নাও যে, খাবার পর আমি আর সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। হাঁটা তো দূরের কথা, গাড়ি করে আসতে হয়।

চিন্তা — এটা আর এমন কী কথা! আমায় তো খাটিয়ায় বয়ে আনতে হয়। এমন এক একটা ঢেকুর তুলি মনে হয় যেন গোলা ছুটছে। একবার তো ঢেঁকুর শুনে পুলিশ ভেবেছিল গোলাগুলি চলছে। আর বোমা বা গোলা আছে সন্দেহ করে গোয়েন্দা পুলিশ বাড়ি তল্লাশিও করেছিল।

মোটে — মিথ্যে বলছ। কেউ ওভাবে ঢেঁকুর তুলতে পারে না।

চিন্তা — আচ্ছা, ফিরে এসে শুনো। তখন যেন ভয়ে পালিয়ে যেয়ো না। দিব্যি রইল।

দুই বন্ধু তক্ষুনি গাড়িতে উঠে বসল আর গাড়ি চলতে আরম্ভ করল।

রাস্তায় বেরিয়ে পণ্ডিত চিন্তামণির আশঙ্কা হল তাঁকে যদি কেউ পণ্ডিত মোটেরামের অনুগৃহীত ভেবে যথেষ্ট সম্মান না করে, আবার ওদিকে মোটেরামও শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, মহাশয় না আবার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বনে যায় আর রানিসাহেবার উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। দুজনেই নিজের নিজের কষি কষতে লাগলেন। মোটর রানির প্রাসাদে পৌঁছানো মাত্র দুজনে নেমে পড়লেন। মোটেরাম ভাবছিলেন রানির কাছে আগে তিনি পৌঁছে চিন্তামণিকে নিয়ে আসার সংবাদ দেবেন। আবার চিন্তামণির চিন্তা কী করে তিনি রানির কাছে আগে গিয়ে নিজের খাতির জমিয়ে নেবেন। দুজনেই পা বাড়ালেন। চিন্তামণির শরীরটা হালকা থাকায় তিনি কিছুটা এগিয়ে পড়লেন। তা দেখে পন্ডিত মোটেরাম দৌড়োতে আবম্ভ করলেন। চিন্তামণিও ছুট লাগালেন। যেন ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল দুটো গণ্ডার ছুটে চলেছে। শেষে মোটেরাম হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন — অমন দৌড়োতে দৌড়োতে রাজসভায় যাওয়া ঠিক নয়।

চিন্তা — তা, তুমি এস না ধীরে সুস্থে। কে তোমায় ছুটতে বলছে?

মোটে — একটু দাঁড়াও না। আমার পায়ে কাঁটা বিঁধেছে।

চিন্তা — বের করো, ততক্ষণ আমি এগোই।

মোটে — তোমার কথা আমি না বললে তো রানি তোমায় পুঁছতও না।

মোটেরাম অনেক ছুতো করলেন, কিন্তু চিন্তামণি কোনো কিছুতেই কান দিলেন না, প্রাসাদে পৌঁছে গেলেন। রানিজি বসে কিছু লিখছিলেন এবং থেকে থেকে দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ পন্ডিত চিন্তামণি তাঁর সামনে এসে হাজির হয়ে এভাবে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। — হে হে যশোদে, তুম বালকেশব, মুরারনামা....

রানি — কী মতলব? কী মনে করে?

চিন্তা — হুজুরকে আশীর্বাদ করছি। এই দাসকে নিমন্ত্রণ করে হুজুর যেভাবে অনুগ্রসিত (অনুগৃহীত) করেছেন শেষনাগ সহস্র জিহ্বা দিয়েও তার বর্ণনা করতে পারবেন না।

রানী — আপনারই নাম চিন্তামণি? সে কোথায়? পণ্ডিত মোটেরাম শাস্ত্রী?

চিন্তা — পেছনে আসছে হুজুর। আমার মতো কী তাড়াতড়ি আসতে পারে? আমার শিষ্য তো।

রানি — আছা। তাহলে মোটেরামই আপনার শিষ্য?

চিন্তা — আমি নিজের মুখে নিজের বড়াই করতে চাইনা হুজুর। বিদ্বানদের নম্র হওয়া উচিত। কিন্তু আসল ব্যাপার যে কি তা তো দুনিয়া জানে। হুজুর, আমি কারও সঙ্গে বাদবিবাদ পছন্দ করি না। এটা আমার অনুশীলনও (অভীষ্ট) নয়। অনেক সময় আমার শিষ্যই আমার গুরু বনে যায়। কিন্তু আমি কাউকেই কিছু বলি না। যা সত্যি সে তো সবাই জানে।

ইতিমধ্যে পণ্ডিত মোটেরামও পড়ি কি মরি করে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পৌঁছোলেন, আর চিন্তামণিকে ভদ্রতা ও সভ্যতার প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনিও দেবোপম প্রশান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রানি — পণ্ডিত চিন্তামণি খুবই সাধুপ্রকৃতির এবং বিদ্বান ব্যক্তি। আপনি ওঁর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও উনি আপনাকে নিজের শিষ্য বলেননি।

মোটে — হুজুর, আমি ওঁর দাসানুদাস।

চিন্তা — জগত্তারিণী, আমি ওঁর পদধূলির সমান।

মোটে — রিপুদলসংহারিণী, আমি ওঁর দরজার কুকুর।

রানি — আপনারা দুজনেই অতি সজ্জন ও পূজনীয় ব্যক্তি। আপনারা দুজনেই একে অপরের থেকে মহান। এখন চলুন, ভোজন করবেন।

নয়

সোনারানি পণ্ডিত মোটেরামের পথ চেয়ে বসেছিলেন। স্বামীর এরকম বন্ধুপ্রীতির জন্যে খুব রাগ হচ্ছিল। বড়ো ছেলেদের জন্যে কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু ছোটোগুলোর ঘুমিয়ে পড়ার ভয় ছিল। গল্পগাছা করে তাদের ভুলিয়ে রাখছিলেন। এমন সময় রাঁধুনিঠাকুর এসে বললেন — মহারাজ, আপনারা চলুন। দুজন পণ্ডিত আসন গ্রহণ করেছেন। বলামাত্রই বাচ্চারা লাফাতে লাফাতে খাওয়ার ঘরে গিয়ে পৌঁছোল। সেখানে গিয়ে দুই পণ্ডিতকে বীরের মতো মুখোমুখি বসে থাকতে দেখল। দুজনেই নিজের নিজের পুরুষকার দেখানোর জন্য অধীর হয়ে উঠছিল।

চিন্তা — ভাণ্ডারি, তুমি পরিবেশন করতে বড়ো দেরি কর। ভেতরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড় না কি?

ভাণ্ডারি — চুপ করে বসে থাক। যখন যা হবে তক্ষুনি এসে পড়বে। অত ভয় পাওয়ার দরকার নেই। তোমরা ছাড়া আর কেউ খাওয়ার নেই।

মোটে — ভাই, খাওয়ার আগে তো কিছুক্ষণ সুগন্ধের স্বাদ নাও।

চিন্তা — সুগন্ধ চুলোয় যাক। সুগন্ধ গ্রহণ করে দেবতারা। আমরা তো ভোজন করি।

মোটে — আচ্ছা, বল তো কোনটায় আগে হাত দেবে?

চিন্তা — আমি যাচ্ছি। ভেতর থেকে সব এক সঙ্গে নিয়ে আসছি।

মোটে — ধৈর্য ধর ভাই, সব কিছু আসতে দাও। ঠাকুরকে ভোগ তো দিতে হবে। চিন্তা — তা হলে বসে আছ কেন? ততক্ষণ না হয় ভোগ দেওয়াটাই চুকিয়ে ফেল। একটা বাধা তো দূর হোক। নয় তো দাও, আমি চটপট ভোগ দিয়ে দিই। শুধু শুধু তুমি দেরি করবে। ইতিমধ্যে রানি এসে পড়লেন। চিন্তামণি সতর্ক হয়ে গেলেন। তিনি রামায়ণের চৌপাই আওড়াতে শুরু করলেন।

'রহা একদিন অবধি অধারা। সমুঝত মন দুখ ভয়উ অপরা॥
কৌশলেশ দশরথ কে জায়ে। হম পিতু বচন মানি বন আয়ে॥
উলটি পলটি লংকা কপি জারি। কুদ পড়া তব্ সিন্ধু মঝারি॥
জোহি পর জাকর সত্য সনেহু। সো তেহি মিলে ন কছু সন্দেহু॥
জামবন্ত কে বচন সুহায়ে। সুনি হনুমান হৃদয় অতি ভায়ে॥'

পণ্ডিত মোটেরাম দেখলেন চিন্তামণিই আসর জমিয়ে দিচ্ছে। তখন তিনিও নিজের বিদ্যাবত্তা প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। অনেক মনে করার চেষ্টা করেও কোনো শ্লোক কোনো মন্ত্র বা কোনো কবিতা তাঁর মনে এলনা। তখন তিনি সোজাসুজি রামনাম জপতে শুরু করলেন —

'রাম ভজ রাম ভজ রাম ভজরে মন'

মোটেরাম এত জোরে জোরে জপ করতে আরম্ভ করলেন যে, চিন্তামণিকেও নিজের স্বরগ্রাম উঁচু করতে হল। মোটেরাম আরও জোরে গর্জন করতেশুরু করলেন। এর মধ্যে ভাণ্ডারি এসে বলল

— মহারাজ, এবার ভোগ লাগান। এই শোনার পর সেই বাক্‌যুদ্ধ শেষ হল। ভোগ দেওয়ার প্রস্তুতি হল। বালকবৃন্দ সজাগ হল। কেউ ঘন্টা, কেউ কাঁসি, কেউ শাঁখ, কেউ করতাল নিয়ে দাঁড়াল। চিন্তামণি আরতি আরম্ভ করলেন। মোটেরাম অভিমান ভরে দাঁড়িয়ে রইলেন। রানির সান্নিধ্যে আসার আরেকটা সুযোগ ফসকে গেল।

কিন্তু কে আর জানত বিধি বাম। ওদিকে সে কুটিল ক্রীড়া করছে। আরতি শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার ভোজন শুরু হবে। ঠিক সেই সময় কোত্থেকে একটা কুকুর এসে হাজির। পণ্ডিত চিন্তামণির হাত থেকে লাড্ডু থালায় পড়ে গেল। পণ্ডিত মোটেরাম হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সর্বনাশ! চিন্তামণি মোটেরামকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন — এখন কী করবে বন্ধু? উপায় একটা বার কর। কোমর তো ভেঙে যাচ্ছে।

মোটেরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন — এখন আর কী হবে? এই হতচ্ছাড়া এল কোত্থেকে?

রানি কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন — আরে, এই কুকুরটা এল কোত্থেকে? রোজ তো বাঁধা থাকে। আজ ছাড়া পেল কী করে? এখন তো সমস্ত রান্না নষ্ট হয়ে গেল।

চিন্তা — হুজুর, আচার্যেরা এ বিষয়ে ....

মোটে — কোনো ক্ষতি হয়নি, হুজুর, কোনো ক্ষতি হয়নি।

সোনা — কপাল পুড়ল। আশায় আশায় অর্ধেক রাত কাবার। এখন আবার এ কী বিপত্তিরে বাবা!

চিন্তা — হুজুর, সারমেয়র মুখে অমৃত ....

মোটে — তা হলে এখন যদি আজ্ঞা হয় ....

রানি — হ্যাঁ, আর কী? আমি বড়োই দুঃখিত যে এই কুকুরটা আজ এত বড়ো অনর্থ ঘটাল। টমি, তুমি খুব দুষ্টু হয়েছ। ভাণ্ডারি, পাতা তুলে মেথরদের দিয়ে দাও।

চিন্তা (সোনাকে) — বুক ফেটে যাচ্ছে।

বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে সোনার করুণা হল। বেচারারা এতক্ষণ দেবতার মত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করল। সম্ভব হলে সে কুকুরটার গলা টিপে মেরে ফেলত। সে বলল — বাচ্চাদের তো কোনো দোষ হয় না। এদের কেউ খাইয়ে দিচ্ছে না কেন?

চিন্তা — মোটেরাম মহা বজ্জাত। ওর বুদ্ধি নাশ হয়েছে।

সোনা — এমনিতে তো খুব বিদ্যা ফলায়। এখন বলছে না কেন? মুখে কি কুলুপ এঁটে আছে, মুখে কথা সরছে না?

চিন্তা — সত্যি বলছি, রানিকে ধোঁকা দিতে পারতাম। কিন্তু এই পাজিটার জন্যে সব বিগড়ে গেল। সমস্ত ইচ্ছাই মনে রয়ে গেল। এরকম খাবার আর কোথায় পাব?

সোনা — সমস্ত কেরামতিই বেরিয়ে গেল। বাড়িতেই তর্জনগর্জন!

রানি ভাণ্ডারিকে ডেকে বললেন — এই ছোটো ছোটো তিনটে বাচ্চাকে খাইয়ে দাও। এরা কেন খিদেয় মরে? কী ফেকুরাম, মিষ্টি খাবে?

ফেকু — এসেছিই তো সেই জন্য।

রানি — কতগুলো মিষ্টি খাবে?

ফেকু — অনেকগুলো। (হাত দেখিয়ে) এই এতগুলো।

রানি — ঠিক আছে। যতগুলো খেতে পারবে, ততগুলোই পাবে। কিন্তু আমি যা জিজ্ঞেস করব ঠিক ঠিক বলতে হবে। বলবে তো?

ফেকু — হ্যাঁ, বলব।

রানি — মিথ্যে বললে কিন্তু একটাও মিষ্টি পাবে না। বুঝেছ তো?

ফেকু — দেবেন না। আমি মিথ্যে কেন বলব?

রানি — তোমার বাবার নাম বল তো!

মোটে — বাচ্চাদের সব সময় সব কথা মনে থাকে না। ও তো এসেই আপনাকে বাবার নাম বলে দিয়েছিল।

রানি — আমি আবার জিজ্ঞেস করছি। এতে আপনার ক্ষতি কীসের?

চিন্তা — নাম জিজ্ঞেস করায় কোনো দোষ নেই।

মোটে — তুমি চুপ করো চিন্তামণি। নইলে ভালো হবে না। আমার রাগ তুমি এখনও দেখনি। যখন ঘাড় চেপে ধরব কাঁদতে কাঁদতে পালাবে।

রানি — আপনি তো শুধু শুধু এত রাগ করছেন! বল ফেকুরাম। চুপ করে আছ কেন? তা হলে মিষ্টি পাবে না।

চিন্তা — বলে দাও, বাবা! তোমার ওপর মহারানির এত কৃপাদৃষ্টি।

মোটে — চিন্তামণিজি, আমি দেখছি তোমার কুদিন উপস্থিত। ও বলবে না। খুব হিতৈষী হয়ে এসেছিলে। বড়ো আমার খয়ের খাঁ এলেন।

সোনা — হ্যাঁ বাবা! বাচ্চাদের সঙ্গে এই সব প্যাঁচ কষার মানে কী? তোমার ধর্মে বললে মিষ্টি দেবে, না বললে না দেবে। এ আবার কী কথা। বাবার নাম বলো তবে মিষ্টি দেব।

ফেকুরাম খুব আস্তে কোনো একটা নাম উচ্চারণ করলে তার বাবা তাকে এত জোরে ধমকে উঠল যে অর্ধেক কথা তার মুখেই রয়ে গেল।

রানি — বকছেন কেন? তাকে বলতে কেন দিচ্ছেন না? বল বাবা, বল।

মোটে — আপনি আমাদের বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করছেন।

চিন্তা — এতে অপমানের কী হল ভাই?

মোটে — আর এখানে কোনো দিনও আসব না। এখানে ভদ্রলোকদের অপমান করা হয়।

অলগু — তুমি বল, চিন্তামণিকে ধরে দিই এক পটকানি।

মোটে — না বাবা, দুষ্টুলোকদের ভগবান নিজে শাস্তি দেন। চলো এখান থেকে চলে যাই। ভুলেও এখানে আর আসব না। খাওয়ানো-দাওয়ানো কিছু না। বাড়ি ডেকে ব্রাহ্মণকে অপমান। এই জন্যেই তো দেশে আগুন লেগেছে।

চিন্তা — মহারানির সামনে তোমার কটু কথা বলা উচিত না।

মোট — ব্যস্! এবার চুপ কর নইলে সমস্ত রাগ তোমার ওপরেই পড়বে। মা-বাপের ঠিক নেই, ব্রাহ্মণ হতে চলেছেন! তোমায় কে ব্রাহ্মণ বলে?

চিন্তা — মনে যা ইচ্ছে বলে নাও। চাঁদে থুথু ফেললে সে থুথু নিজের মুখেই পড়ে। তুমি যখন ধর্মের কোনো লক্ষণই জান না তখন তোমাকে কীই বা আর বলব! ব্রাহ্মণের ধৈর্য থাকা উচিত।

মোটে — পেটের গোলাম! খোশামুদি করছ যাতে এক-আধ পাত খেতে পাও। আমরা মর্যাদা রক্ষাটাই বড়ো মনে করি।

চিন্তা — বলেই তো দিয়েছি ভাই, তুমি বড়ো, আমি ছোটো। আর কী বলব? তুমি হয়তো সত্যিই বলছ যে আমি ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র।

রানি — এমন কথা বলবেন না, চিন্তামণিজি।

— এর প্রতিশোধ যদি না তুলি তো দেখো। এই বলতে বলতে মোটেরাম ছেলেদের সঙ্গে করে বাইরে এসে নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি চললেন। বার বার তাঁর এই ভেবে অনুতাপ হচ্ছিল যে কেন চিন্তামণি শয়তানটাকে ডেকে আনতে গেছিলেন।

সোনা — হাটে হাঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বেঁচে গেছ। ফেকুরাম যদি নাম বলে দিত! কেন রে, নিজের বাপের নাম কেন বলতে যাচ্ছিলি?

ফেকু — কী করব? ও যে সত্যি সত্যি বলতে বলছিল।

মোটে — চিন্তামণি আসর জমিয়ে নিয়েছে। এবার মনের সুখে ভোজন করবে।

সোনা — তোমার কোনো বিদ্যাই কাজে লাগল না। বাজি তো ও-ই মেরে দিল।

মোটে — আমি জানি, রানি ইচ্ছে করে কুকুর ডেকেছিল।

সোনা — আমি তো ওর মুখ দেখেই বুঝে গেছিলাম ও আমায় ধরতে পেরে গেছে।

এদিকে এরা হা-হুতাশ করতে করতে যাচ্ছিল আর ওদিকে চিন্তামণি আসন গেড়ে কবজি ডুবিয়ে খাচ্ছিলেন। রানি নিজের হাতে মিষ্টি পরিবেশন করছিলেন, কথাবার্তাও হচ্ছিল।

রানি — চালাক বটে লোকটা! আমি তো ছেলেদের দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। নিজের বউকে ছেলে সাজিয়ে নিয়ে আসতে ওর লজ্জাও করল না।

চিন্তা — আমায় গালাগাল করছে হয়তো।

রানি — সাহস দ্যাখো, আমায় ঠকাতে এসেছিল। আমিও বলেছিলাম — দাঁড়াও, এমন শিক্ষা দেব যে, সারাজীবন মনে রাখবে। টমিকে ডেকে আনলাম।

চিন্তা — ধন্য হুজুরের বুদ্ধি!

(নিমন্ত্রণ/১৯২৬) অনুবাদ মীনা রায়চৌধুরি

হিংসা পরম ধর্ম

পৃথিবীতে এমন কিছু লোক থাকে যারা কারও চাকর না হয়েও সকলের চাকর; যারা নিজেদের কোনো কাজ না থাকা সত্ত্বেও মাথা তোলবার ফুরসত পায় না। জামিদ ছিল এই ধরনের মানুষ। একেবারে চিন্তাভাবনাহীন। কারও সঙ্গে বন্ধুতা নেই, কারও সঙ্গে শত্রুতাও নেই। কেউ একটু হেসে কথা বললেই সে তার বিনাপয়সার চাকর হয়ে যেত। অকাজের কাজ করতে সে আনন্দ পেত। গ্রামে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সে হাজির থাকত রোগীর শুশ্রূষার জন্য। কেউ বললে মাঝরাতে ডাক্তারের বাড়ি চলে যেত। কারও জন্য জড়িবুটি খুঁজতে সে দুনিয়া চষে ফেলত। কোনো গরিবের অত্যাচার হবে আর সে দাঁড়িয়ে দেখবে, তার কাছে এ ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তাকে যদি কেউ মেরেও ফেলে তবু অত্যাচারিতের পক্ষ নিতে সে পেছপা হত না। আর এরকম অজস্র সুযোগও তার জুটেছিল। প্রায় প্রতিদিনিই পুলিশের সঙ্গে তার ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকত। এসব কারণে লোকে তাকে ছিটিয়াল বলত। আর সত্যিই সে তাই ছিল। যে লোক অন্যের ভারী বোঝা দেখে সেই বোঝা টেনে নিয়ে নিজের মাথায় চাপায়; অন্যের ঘর বাঁধবার কিংবা আগুন নেভাবার জন্য মাইলের পর মাইল ছুটে যায়, তাকে কে আর বুদ্ধিমান বলবে? মোটকথা, এধরনের লোকের দ্বারা অন্যের যত উপকারই হোক না কেন, তার নিজের কোনো উপকার হত না। এমন কী, নিজের পেট চালাবার জন্যে তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হত। জামিদ ছিল পুরোপুরি খ্যাপাটে, তবে তার জন্য মাথাব্যথা ছিল অন্যদের।

দুই

শেষ পর্যন্ত সবাই তাকে ধিক্কার দিতে লাগল — কেন নিজের জীবন নষ্ট করছ? তুমি অন্যের জন্য জান দিচ্ছ; কিন্তু তোমার খবর নেবার কি কেউ আছে? যদি অসুস্থ হয়ে পড় কেউ এক আঁজলা জলও দেবে না। এখন অন্যের সেবা করে বেড়াচ্ছ তাই লোকে দয়া করে খেতে দিচ্ছে। তোমার দুঃসময়ে সবাই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। এসব কথা শুনে জামিদের চোখ খুলল। জিনিসপত্র তো কিছুই ছিল না। একদিন যে দিকে দুচোখে যায় চলে গেল। দুদিন পরে সে এক শহরে এসে পৌঁছোল। বিরাট শহর, আকাশছোঁয়া ঘরবাড়ি। সড়ক চওড়া আর আবর্জনাহীন। বাজার জমজমাট, মন্দির, মসজিদের সংখ্যা ঘরবাড়ির চেয়ে বেশি না হলেও কম ছিল না।

গ্রামে না ছিল কোনো মসজিদ, না ছিল কোনো মন্দির। মুসলমানরা এক চাতালের উপর নমাজ পড়ত আর হিন্দুরা এক গাছের গোড়ায় জল ঢেলে পুজো সারত। শহরে ধর্মের এই মাহাত্ম্য দেখে জামিদের কৌতূহল ও আনন্দ দুইই হল। তার চোখে ধর্মের যে মর্যাদা ছিল অন্য কোনো সাংসারিক

বস্তুর তা ছিল না। সে চিন্তা করতে লাগল — এসব লোক কত সৎ, কত সত্যবাদী! এদের কত দয়া, কত বিবেক, কত সহানুভূতি! তাই তো খোদা এদের এত দিয়েছেন। সে রাস্তার প্রত্যেকটি লোককে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে লাগল আর প্রত্যেকের সামনে বিনয়ের সঙ্গে মাথা নোয়াতে লাগল। এখানকার সব মানুষই তার কাছে দেবতুল্য মনে হত।

ঘুরতে ঘুরতে সন্ধে হয়ে গেল। সে এক মন্দিরের চাতালের উপর গিয়ে বসল। বিরাট মন্দির, মাথায় সোনার কলসি চকচক করছিল। মার্বেল পাথরে বাঁধানো,—তবে চত্বরে গোবর ও জঞ্জাল পড়ে ছিল। দুর্গন্ধ জামিদ সহ্য করতে পারত না। মন্দিরের এই দশা দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কোনো ঝাড়ু চোখে পড়ে কিনা, তাহলে পরিষ্কার করে দিতে পারত; কিন্তু কোনো ঝাড়ু চোখে পড়ল না। হতাশ হয়ে সে নিজের জামা দিয়ে চাতাল সাফ করতে শুরু করল।

কিছু পরেই ভক্ত সমাবেশ হতে আরম্ভ করল। তারা জামিদকে চাতাল পরিষ্কার করতে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল —

— লোকটা তো মুসলমান।

— মেথর হবে।

— না, মেথর নিজের জামা দিয়ে পরিষ্কার করে না। মনে হচ্ছে কোনো পাগল।

— ওদিককার গুপ্তচর নয় তো!

— না, চেহারা দেখে তো মনে হয় খুব গরিব।

— হসন নিজামির কোনো শিষ্য-টিষ্য হবে।

— না না, গোবরের লোভে পরিষ্কার করছে। কোনো আওয়ারা হবে। (জামিদকে উদ্দেশ করে) গোবর নিয়ে যাওয়া যাবে না কিন্তু, বুঝেছ? থাকো কোথায়?

আমি বিদেশি, সাহেব। গোবর নিয়ে আমি কী করব? দেবতার মন্দির দেখে এসে বসেছি। ময়লা জমে আছে দেখে ভাবলাম, ধর্মাত্মা মানুষ সব এসে বসবেন, তাই সাফ করছি।

— তুমি মুসলমান না?

— দেবতা তো সকলেরই দেবতা — হিন্দুই বা কী, মুসলমানই বা কী!

— তুমি দেবতা মান?

— দেবতাকে আবার কে না মানে, সাহেব? যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে মানব না তো কাকে মানব? ভক্তদের মধ্যে আলোচনা চলল—

— দেহাতি লোক।

— আটকে রাখতে হবে, যেন যেতে না পারে।

তিন

জামিদকে ধরে রাখা হল। তার যত্নআত্তি চলল। থাকবার জন্যে সে খোলামেলা বাড়ি পেল। দুবেলাই খাবার জন্যে ভালো ভালো জিনিস তার জুটতে লাগল। দু-চার জন লোক সর্বদাই তার পাশে থাকত। জামিদ খুব ভাল ভজন জানত। তার গলাও ছিল চমৎকার। রোজ মন্দিরে গিয়ে সে কীর্তন গাইত।

ভক্তির সঙ্গে যদি স্বরের লালিত্য যুক্ত হয় তাহলে বলার আর কিছু থাকে না। তাই মানুষের উপর তার কীর্তনের খুব প্রভাব পড়ত। কত লোক গান শোনার জন্যেই মন্দিরে আসতে লাগল। সকলেরই এই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, ভগবানই এই শিকার এখানে পাঠিয়েছেন।

একদিন মন্দিরে অনেক লোক জমা হল। উঠোনে ফরাস বিছানো হল; জামিদের মাথা ন্যাড়া করা হল; তাকে নতুন কাপড় পরানো হল; যজ্ঞ হল আর জামিদের হাত দিয়ে মিষ্টিও বিতরণ করা হল। সে তার আশ্রয়দাতাদের উদারতা আর ধর্মনিষ্ঠায় আরও বেশি করে অভিভূত হয়ে গেল। 'এঁরা কত সজ্জন, আমার মত চালচুলোহীন এক বিদেশির এত খাতির! এই হল যথার্থ ধর্ম।' জামিদ তার জীবনে কখনও এত সম্মান পায়নি। এখানে এসে সেই ভবঘুরে যুবক, সবাই যাকে ছিটগ্রস্ত বলত, সে আজ সকল ভক্তের মাথার মুকুট হয়ে গেল। শতশত লোক কেবল তাকে দেখতে আসত। তার অসাধারণ জ্ঞানের কত কথাই না রটে গিয়েছিল। খবরের কাগজে বেরুল যে, এক বড়ো জ্ঞানী মৌলবি সাহেবের শুদ্ধি হয়েছে।

সহজ সরল জামিদ এই সম্মানের রহস্য কিছু বুঝতে পারত না। এই সব ধর্মপরায়ণ সহৃদয় মানুষের জন্যে সে কী না করত? প্রতিদিন সে পুজো করত, ভজন গাইত। তার কাছে এটা কোনো নতুন ব্যাপার ছিল না। নিজের গ্রামে সে বরাবর সত্যনারায়ণের কথা শুনেছে, ভজন-কীর্তন করেছে। তফাত এই ছিল যে, গ্রামে তার কোনো সম্মান ছিল না, আর এখানে সবাই তার ভক্ত।

একদিন জামিদ কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে বসে পুরাণ পাঠ করছিল। এমন সময় সে দেখল, সামনের রাস্তায় কপালে তিলক, উপবীত শোভিত এক বলিষ্ঠ যুবক এক দুর্বল বৃদ্ধ লোককে ধরে মারছে। বৃদ্ধ কাঁদছে, কাকুতিমিনতি করছে আর পায়ে পড়ে বলছে : মহারাজ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কিন্তু তিলকধারী যুবকের তার উপর বিন্দুমাত্র দয়ারও উদয় হচ্ছিল না। জামিদের মাথায় রক্ত চড়ে গেল; ওই দৃশ্য দেখে সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। তৎক্ষণাৎ সে লাফিয়ে বাইরে এসে যুবকের সামনে গিয়ে বলল — বুড়োকে মারছ কেন, ভাই? এর উপর কি তোমার একটুও দয়া হচ্ছে না?

যুবক — আমি মেরে মেরে এর হাড় গুঁড়ো করে দেব।

জামিদ — কেন, এ কী অন্যায় করেছে? বলো তো শুনি?

যুবক — এর মুরগি আমার ঘরে ঢুকে সারা ঘর নোংরা করে দিয়েছে।

জামিদ — তা, এ কি মুরগিকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে তোমার ঘর নোংরা করে আসবে?

বৃদ্ধ — হুজুর, আমি তো সব সময়েই মুরগিকে খাঁচায় বন্ধ করে রাখি। আজ ভুল হয়ে গেছে। বলছি, মহারাজ অপরাধ মাপ করুন, তবু শুনছেন না। হুজুর, মেরে মেরে আধমরা করে দিয়েছে।

যুবক — এখনও মারা হয়নি, এবার মারব। মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেব।

জামিদ — মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখবে, ভাই সাহেব, তাহলে তুমিও এখানে খাড়া থাকবে না, বুঝেছ? আবার হাত তুললে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

যুবক তখন তার শক্তির নেশায় মত্ত। সে আবার বৃদ্ধের গায়ে হাত তুলল। কিন্তু হাত বৃদ্ধের গায়ে পড়ার আগেই জামিদ তার ঘাড় ধরে ফেলল। দুজনে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। জামিদ ছিল জবরদস্ত জোয়ান। সে যুবককে এক পটকান দিতেই সে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সে পড়ে যেতেই যেসব

ভক্ত মন্দিরে বসে তামাশা দেখছিলতারা ছুটে এসে জামিদকে চারদিক থেকে ঘিরে মারতে শুরু করল। জামিদ বুঝতেই পারছিল না লোকে কেন তাকে মারছে। কেউ কিছু বলছেও না। কথা নেই বার্তা নেই, যে আসছে সেই তার উপর হাত চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করল :

— আমাদের ধোঁকা দিয়েছে!

— ধেৎ! জাতে ম্লেচ্ছ তার কাছ থেকে ভালো আর কী আশা করা যায়! কাক তো কাকের সঙ্গেই মিলবে। নীচ যে সে নীচ কাজই তো করবে। একে তো কেউ পাত্তাই দিত না, মন্দিরে ঝাঁট দিত। গায়ে জামা পর্যন্ত ছিল না। আমরা একে সম্মান দিয়েছিলাম, পশু থেকে মানুষের পর্যায়ে তুলেছিলাম, তবু আমাদের হতে পারল না।

— এদের ধর্মের মূল কথাই তো এই।

জামিদ সারারাত রাস্তার পাশে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাল। মার খাবার জন্য তার দুঃখ হল না, কারণ এরকম যন্ত্রণা সে অনেকবার ভোগ করেছে। তার দুঃখ হল শুধু এই কথা ভেবে : এরা কেন একদিন আমায় এত সম্মান দিয়েছিল আর আজ কেনই বা অকারণে আমার এই দুর্গতি? এদের সেই ভদ্রতা আজ কোথায় গেল? আমি তো যা ছিলাম তাই আছি, আমি তো কোনো অন্যায়ও করি নি। সকলেরই একরকম অবস্থায় যা করা উচিত আমি তো শুধু তাই করেছি। তাহলে কেন এরা আমার উপর এই অত্যাচার করল? দেবতারা কেন রাক্ষস হয়ে গেল?

সারারাত সে এসব চিন্তাই করল। সকালে উঠে যে দিকে দুচোখ যায় সেদিকে রওনা দিল।

জামিদ কিছু দূর যেতেই সেই বৃদ্ধের সঙ্গে তার দেখা হল। তাকে দেখেই বৃদ্ধ বলল — খোদার কসম, তুমিই কাল আমার প্রাণ রক্ষা করেছ! শুনেছি শয়তানরা তোমাকে খুব মেরেছে। আমি তো সুযোগ পেয়েই পালিয়েছিলাম। এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এখানকার লোকেরা কাল রাত থেকেই তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। কাজি সাহেব রাত্রেই তোমার খোঁজে বেরিয়েছিলেন; কিন্তু তোমাকে পাওয়া গেল না। কাল আমরা দুজনেই একা পড়ে গিয়েছিলাম। দুশমনেরা আমাদের মেরেছে। নমাজের সময় ছিল; কাজেই সকলেই ছিল মসজিদে। যদি কোনো রকমে একটু খবর পৌঁছে যেত তাহলে হাজার লাঠি এসে হাজির হত,তখন কত ধানে কত চাল বোঝা যেত। খোদার কসম, আজ থেকে আমি তিন কুড়ি মুরগি রেখেছি। দেখি পণ্ডিতজি মহারাজ এখন কী করে। খোদার কসম, কাজি সাহবে বলেছেন, এখন ওই ছোকরা যদি আবার চোখ রাঙায় তবে তুমি খালি এসে একটু বলবে। হয় তাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে, নয়তো হাড় গুঁড়ো করে দেওয়া হবে।

সেই বৃদ্ধ জামিদকে নিয়ে কাজি জোরাবর হুসেনের বাড়ি গেল। কাজি সাহেব ওজু করছিলেন। জামিদকে দেখেই দৌড়ে এসে আকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন — হা, আল্লা! তোমারই পথ চেয়ে রয়েছি। তুমি একাই এতগুলো কাফেরের মোকাবিলা করেছ। হবেই বা না কেন, তোমার মধ্যে মোমিনের রক্ত রয়েছে না! কাফেরদের এত সাহস কোথায়! শুনলাম, সবাই নাকি তোমার শুদ্ধির জন্য তৈরি হয়েছিল আর তুমি ওদের সমস্ত ব্যাপারটাকেই ভেস্তে দিয়েছ। ইসলামে এরকম সেবকেরই তো প্রয়োজন! তোমার মতো ধর্মপ্রাণ লোকেরাই ইসলামের নাম উজ্জ্বল রেখেছে। একটা

ভুল তুমি করেছিলে, এক মাস সবুর করতে পারনি। শাদি হয়ে যেতে দিলে মজা জমত। এক সুন্দরী রমণী, সঙ্গে সম্পত্তি মুফত। ইয়া আল্লা। তুমি বড়ো তাড়াতাড়ি করে ফেললে।

সারাদিন ভক্তের ভিড় লেগে রইল। জামিদকে এক নজর দেখার জন্য সবাই ব্যস্ত। সবাই তার সাহস, শক্তি আর ধর্মতেজের প্রশংসা করতে লাগল।

চার

এক প্রহর রাত হয়ে গিয়েছে। যাত্রীদের আনাগোনাও কমে এসেছে। জামিদ কাজি সাহেবের কাছে ধর্মগ্রন্থ পড়তে শুরু করেছিল। কাজি সাহেব এই জন্য তার পাশের ঘর খালি করে দিয়েছিলেন। সে কাজি সাহেবের কাছ থেকে পাঠ নিয়ে এসে শুতে যাবে এমন সময় দরজার সামনে একটা টাঙ্গা এসে দাঁড়াবার আওয়াজ শুনতে পেল। কাজি সাহেবের শিষ্য প্রায় সবসময়ই আসাযাওয়া করত। জামিদ ভাবল, কোনো শিষ্য এসে থাকবে। নীচে নেমে দেখল একজন স্ত্রীলোক টাঙ্গা থেকে নেমে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আর টাঙ্গাওয়ালা তাঁর জিনিসপত্র নামিয়ে দিচ্ছে।

মহিলা বাড়ির এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললেন — না হে, আমার বেশ খেয়াল আছে, এ বাড়ি ওঁর বাড়ি নয়। বোধ হয় তোমার ভুল হয়েছে।

টাঙ্গাওয়ালা — আপনি তো বিশ্বাসই করছেন না, মাইজি। বললাম তো বাবুসাহেব বাড়ি পালটেছেন। ওপরে চলুন।

মহিলা একটু ইতস্তত গলায় বললেন — ডাকছ না কেন? আওয়াজ দাও।

টাঙ্গাওয়ালা — আরে বাবা! কেন ডাকতে যাব যখন জানি যে, এটাই সাহেবের বাড়ি? মিছিমিছি চিল্লাচিল্লি করে কী লাভ? উনি হয়তো একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। বিশ্রামে বাধা পড়বে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। চলুন, ওপরে চলুন।

মহিলা উপরে উঠতে লাগলেন। পিছনে পিছনে টাঙ্গাওয়ালা মালপত্র নিয়ে চলল। জামিদ চুপচাপ নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। এই রহস্য সে বুঝতে পারল না।

টাঙ্গাওয়ালার আওয়াজ শুনতে পেয়েই কাজি সাহেব ছাদের ধারে এলেন এবং একজন মহিলা সঙ্গে দেখে ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দেয়ালের একটা ঝুলন্ত তলোয়ার পেড়ে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

মহিলা সিঁড়ি ভেঙে দোতালায় পা রেখেই কাজি সাহেবকে দেখে দ্বিধায় পড়লেন। তাড়াতাড়ি পিছন ফেরার উপক্রম করতে কাজি সাহেব লাফ দিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেলেন। এরই মধ্যে জামিদ ও টাঙ্গাওয়ালা দুজনেই উপরে উঠে এল। জামিদ এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে উঠছে। এই বিদ্যার্ণব, এই ন্যায়ের ভাণ্ডার, এই নীতি-ধর্ম-দর্শনের আকর এই রাত্রে এক অপরিচিত মহিলার উপর ঘোর অত্যাচার করছে! টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে সেও কাজি সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাজি সাহেব মহিলার দুহাত ধরে রেখেছিলেন। টাঙ্গাওয়ালা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

মহিলা টাঙ্গাওয়ালাকে জ্বলন্ত চোখে দেখে নিয়ে বললেন — তুই আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছিস?

কাজি সাহেব তলোয়ার ঘুরিয়ে বললেন — আগে সুস্থির হয়ে বোসো। সবই জানতে পারবে।

মহিলা — তোমাকে দেখে তো কোনো মৌলবি বলে মনে হচ্ছে? তা, তুমি কি খোদার কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছ যে, পরস্ত্রীকে জবরদস্তি করে ঘরে বন্ধ করে তার ইজ্জত নষ্ট করতে হবে?

কাজি — হ্যাঁ, খোদার এই আদেশ যে, যেভাবেই হোক কাফেরদের ইসলামের পথে নিয়ে আসতে হবে। যদি আপসে না হয় তবে জবরদস্তি করে।

মহিলা — যদি তোমার স্ত্রী বা কন্যার ইজ্জত এরকম করে কেউ নষ্ট করে? তাহলে?

কাজি — করছেই তো। তোমরা আমাদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করবে আমরাও তোমাদের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করব। আর, আমি তো তোমার ইজ্জত নষ্ট করছি না, শুধুমাত্র তোমাকে আমার ধর্মে গ্রহণ করছি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে ইজ্জত বাড়ে, নষ্ট হয় না। হিন্দু জাতি তো আমাদের শেষ করে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। ওরা এই মুলুক থেকে আমাদের মুছে ফেলতে চাইছে। ধোঁকা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে, জোরজবরদস্তি করে মুসলমানের ধর্ম নষ্ট করছে, মুসলমানরা কি বসে বসে খালি দেখবে?

মহিলা — হিন্দুরা কখনও এরকম অত্যাচার করতে পারে না। হতে পারে, তোমাদের শয়তানিতে অধৈর্য হয়ে নিচু শ্রেণীর লোক বদলা নিতে শুরু করেছে। তবে এখনও কোনো খাঁটি হিন্দু এসব পছন্দ করে না।

কাজি সাহেব একটু ভেবে বললেন — নিঃসন্দেহে, এরকম বদমায়েসি প্রথমে কিছু চ্যাংড়া মুসলমানরা করত। তবে যারা ভদ্র তাঁরা এরকম কাজকে খারাপ চোখেই দেখতেন এবং নিজেদের শক্তি দিয়ে এসব বাধা দিতে চাইতেন। শিক্ষা ও সভ্যতা এগিয়ে গেলে কিছু সময়ের মধ্যে এই গুন্ডামি নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যেত; কিন্তু এখন তো গোটা হিন্দুজাতি আমাদের গিলে খাবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। আমাদের জন্য এখন আর আছেই বা কোন রাস্তা? আমাদের শক্তি কম, তাই বাধ্য হয়ে বাঁচবার জন্যে আমাদের ধোঁকার আশ্রয় নিতে হয়। তবে তুমি এত ঘাবড়াচ্ছই বা কেন? এখানে তোমার কোনো কিছুরই কষ্ট হবে না। নারীদের অধিকারকে ইসলাম যত মর্যাদা দেয়, তেমন আর কোনো ধর্ম দেয় না। আর মুসলমান মরদ তো নিজের স্ত্রীর জন্য জান পর্যন্ত দিয়ে দেয়। আমার এই নওজোয়ান দোস্ত (জামিদ) তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এর সঙ্গেই তোমার নিকা দিয়ে দেব। ব্যস, আরামে জীবন কাটাবে।

মহিলা — আমি তোমাকে আর তোমার ধর্মকে ঘেন্না করি। তুমি কুত্তা। এছাড়া তুমি আর কোনো কাজ খুঁজে পাও না। আমি বলছি, আমাকে যেতে দাও, নয়তো আমি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব। আর তোমারও মৌলবিগিরি বেরিয়ে যাবে।

কাজি — তুমি যদি মুখ খোল তাহলে আর প্রাণে বাঁচবে না। ব্যস, এইটুকুই খেয়াল রেখো।

মহিলা — ইজ্জত না থাকলে জীবনের কী দাম? তুমি আমার প্রাণ নিতে পার, কিন্তু ইজ্জত নষ্ট করতে পারবে না।

কাজি — কেন মিছিমিছি জেদ করছ?

মহিলা দরজার কাছে গিয়ে বলল — আমি বলছি দরজা খুলে দাও।

জামিদ এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। যেই মহিলা দরজার দিকে এগোলেন আর কাজি সাহেব তাঁর হাত ধরে টানতে লাগলেন, অমনি জামিদ দ্রুত দরজা খুলে দিয়ে কাজি সাহেবকে বলল — ছেড়ে দিন এঁকে।

কাজি — কী বকছ?

জামিদ — কিছু না। ভালো চান তো, এঁকে ছেড়ে দিন।

কাজি সাহেব কিন্তু তবুও মহিলার হাত ছাড়লেন না। টাঙ্গাওয়ালাও আবার তাঁকে ধরতে এগোল। সঙ্গে সঙ্গে জামিদ কাজি সাহেবকে এক ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল আর ওই মহিলার হাত ধরে তাঁকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এল। টাঙ্গাওয়ালা পিছু ধাওয়া করলে জামিদ তাকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে সে উবু হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যেই সেই মহিলা ও জামিদ রাস্তায় এসে উঠল।

জামিদ — আপনার বাড়ি কোন পাড়ায়?

মহিলা — আহিয়াগঞ্জে।

জামিদ — চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।

মহিলা — এর চেয়ে আর কী উপকার হতে পারে! আমি আপনার এই উপকারের কথা কোনো দিন ভুলব না। আজ আপনি আমার মান রক্ষা করেছেন, তা না হলে আমার আর উপায় ছিল না। আজ আমি বুঝতে পারলাম ভালোমন্দ সর্বত্রই রয়েছে। আমার স্বামীর নাম পণ্ডিত রাজকুমার।

সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা টাঙ্গা আসতে দেখা গেল। জামিদ মহিলাকে তাতে বসিয়ে দিল এবং নিজে যখন বসতে যাবে তখন উপর থেকে কাজি সাহেব লাঠি ছুঁড়ে মারলেন। সেই লাঠি টাঙ্গার উপর এসে লাগল। জামিদ টাঙ্গায় উঠে বসলে টাঙ্গাও রওনা হল।

আহিয়াগঞ্জে পণ্ডিত রাজকুমারকে খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধা হল না। জামিদ যেই ডাকল অমনি তিনি ছুটে বাইরে এসে স্ত্রীকে দেখে বললেন — তুমি কোথায় গিয়েছিলে, ইন্দিরা? আমি তো তোমাকে স্টেশনে কোথাও দেখলাম না। পৌঁছুতে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তোমার এত দেরি হল কেন?

ইন্দিরা ঘরে পা দিয়েই বললেন — সে অনেক কথা। একটু জিরোতে দাও, পরে বলব। তবে এটা জেনে রাখো যে, আজ যদি এই মুসলমান ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য না করতেন তাহলে আমার ইজ্জত চলে যেত।

পণ্ডিতজি সব কথা শোনবার জন্য আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ইন্দিরার সঙ্গে তিনিও ঘরে ঘিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই বাইরে এসে জামিদকে বললেন — ভাই সাহেব, আপনি ভুল বুঝবেন না, তবে আমি কিন্তু আপনার মধ্যেই আমার ইষ্টদেবতাকে দেখতে পাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ জানাব সেই ভাষা আমার নেই। আসুন, দয়া করে বসুন।

জামিদ — আজ্ঞে না, এখন যাবার অনুমতি দিন।

পণ্ডিত — আমি কী করে আপনার এই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করব?

জামিদ — আপনি যদি এই ঘটনার বদলা নেবার জন্য কোনো গরিব মুসলমানের উপর অত্যাচার না করেন তাহলেই এই ঋণ শোধ হবে। আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ।

এই কথা বলে জামিদ উঠে পড়ল আর সেই অন্ধকার রাত্রে শহরের বাইরে চলে গেল। শহরের বিষাক্ত বায়ুতে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সে দ্রুত শহর থেকে পালিয়ে তার নিজের গ্রামে পৌঁছুতে চাইল। সেখানে ধর্ম বলতে বোঝায় সহানুভূতি, প্রেম ও সৌহার্দ্য। ধর্ম ও ধার্মিক লোক তার কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(হিংসা পরমো ধর্মঃ / ১৯২৬) অনুবাদ অমলকুমার রায়

ভোগ

সেদিন রামধন আহিরের ঘরের দরজায় এক সাধুবাবা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কল্যাণ হোক, বৎস। সাধুকে সেবা কর।

রামধন গিয়ে তার বউকে বলল, দুয়োরে সাধুবাবা দাঁড়িয়ে, কিছু দিয়ে দে।

বাসন মাজতে মাজতে রামধনের বউ তখন ভাবছে আজ রান্নার কী হবে, ঘরে আনাজপাতির একটা টুকরো পর্যন্ত নেই, মাসটা চৈত্র হলেও এখন যেন রাত দুপুর। খামার থেকেই ফসলের অর্ধেক নিয়েছে মহাজন, বাকি অর্ধেক জমিদারের পেয়াদা কেড়ে নিয়েছে। ভুসি বেচে কোনো মতে গোবুর ব্যাপারির ধার শোধ করা গেছে। তারপর খোসা থেকে ঝেড়ে ঝুড়ে যে মন খানেক দানা পাওয়া গিয়েছিল তাতে চৈত্র মাসটা চলছে। তারপর কী হবে? বলদগুলো কী খাবে, আর ঘরের মানুষগুলোই বা কী খাবে, ভগবানই জানেন। এর ওপর আবার দুয়োরে সাধুবাবা — তেনাকেই বা ফেরাই কী করে? তিনি কী ভাববেন?

রামধনের বউ বলল, দেব কী, নেইতো কিছু?

— যা গিয়ে দেখনা, মটকা খুঁজে আটা-টাটা কিছু পেলে নিয়ে আয়।

— কাল তো মটকা ঝেড়ে খাওয়া হয়েছে, ওটা কি অফুরান?

— তা আমি তো আর সাধুবাবাকে বলতে পারব না 'বাবা, ঘবে কিছু নেই।' যা, কারও ঘর থেকে চেয়ে আন।

— যাদের কাছ থেকে নিয়েছি তাদেরটা তো দেবার সময়ই হল না। আবার কোন মুখে চাই?

— ঠাকুরের নবান্নের জন্য কিছু তোলা আছে না? ওগুলোই আন, দিয়ে আসি!

— তারপর ঠাকুরপুজো হবে কী করে?

— আরে দেবতা তো চাইতে আসবে না, কুলোয় হবে, না হলে হবে না।

— নবান্নের ফসলই কি আর পাঁচ-দশ সের আছে? খুব বেশি হলে আধ সের। এরপর কোনো সাধু এলে? তাঁকে তো ফেরাতেই হবে।

— এই বিপদ তো কাটুক তারপর দেখা যাবে।

রামধনের বউ রেগে গিয়ে একটা ছোট্ট হাঁড়ি নিয়ে এল। হাঁড়িটায় জোর আধসেরটাক আটা আছে। বড়ো যত্নে এই গমের আটা সে রেখে দিয়েছিল দেবতাদের জন্য। রামধন কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর একটা বাটিতে আটা নিয়ে বাইরে এসে সাধুর ঝুলিতে ঢেলে দিল।

মহাত্মা আটা নিলেন, বললেন, বৎস, সাধু আজ এখানেই থাকবে। খানিক ডাল দাও, ভোগ হবে। রামধন আবার ফিরে এসে বউকে বলল। বরাতজোরে ঘরে ডাল ছিল। রামধন ডাল দিল,

নুন দিল, ঘুঁটে জোগাড় করে এনে দিল, কুয়ো থেকে জল টেনে তুলে দিল। সাধু খুব শুদ্ধাচারে রুটি বানালেন, ডাল রাঁধলেন, ঝোলা থেকে আলু বের করে সেদ্ধ করলেন। তারপর সব তৈরি হয়ে গেলে বললেন, বৎস, ভগবানের ভোগের জন্য একটু.ঘি লাগবে, রান্না পবিত্র না হলে ভোগ হবে কেমন করে?

রামধন বলল, বাবাজি, ঘি তো নেই।

এমন কথা বলে না, ভগবান তোকে বহুৎ দিয়েছেন, সাধুবাবা উত্তর দিলেন।

রামধন বলল, মহারাজ আমার তো গোরু-মোষ কিছুই নেই, ঘি পাই কোথা?

— ভগবানের ভাণ্ডারে সব আছে, যাও গিন্নিকে গিয়ে বলো।

রামধন বউকে গিয়ে বলল, ঘি চায় যে? ভিখ মেঙে খাওয়া, ঘি ছাড়া গ্রাস ওঠে না।

— তাহলে এই ডাল খানিক বানিয়ার কাছে দিয়ে ঘি নিয়ে এসো। সবই যখন করলে তখন এটুকুর জন্য আর তাকে অসন্তুষ্ট করা কেন?

ঘি এসে গেল, সাধুবাবা ভোগের পিণ্ড বানালেন, ঘণ্টা বাজালেন, তারপর ভোগ চড়াতে বসলেন। খুব তৃপ্তি সহকারে খেলেন সাধুবাবা। তারপর পেটে হাত বুলোতে বুলোতে দরজার গোড়ায় শুয়ে পড়লেন। রামধন থালা-বাটি সব তুলে নিয়ে গেল মাজবার জন্যে। সেদিন রামধনের ঘরে উনুন জ্বলল না, খানিকটা ডাল বানিয়ে খেয়ে নিয়ে তারা শুয়ে পড়ল আর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল — বাবাজিরা তো আমাদের থেকেও ভালো আছে।

(বাবাজী কা ভোগ) অনুবাদ অনিরুদ্ধ মৈত্র

বিয়ের হেতু

লোকে কেন বিয়ে করে এ প্রশ্নটা প্যাঁচালো। প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষের পরস্পরকে প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমান যুগে সাধারণভাবে বিয়ের এটাই সত্যিকারের কারণ নয় বরং বিয়েটা সভ্য জীবনে যেন একটা রেওয়াজে এসে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, আমি অনেক বিবাহিত লোকের কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছি, প্রশ্ন শুনে তারা এত রকমারি সব উত্তর দিয়েছে যে আমি অবাক হয়ে গেছি। সেইসব উত্তর পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য নীচে লিখে দিলাম —

এক ভদ্রলোকের বয়ান হল, বিয়েটা তাঁর একেবারে কম বয়সে হয়েছে, তাই তাঁর বিয়ের দায়দায়িত্ব পুরোপুরি তাঁর বাবা-মায়ের। আর এক ভদ্রলোকের রূপের বড়ো দেমাক। তাঁর ধারণা বিয়েটা তাঁর ফুটফুটে চেহারার দৌলতেই হয়েছে। তৃতীয় ভদ্রলোক বলেছেন, আমার পাশের বাড়িতে এক কেরানি ভদ্রলোক থাকতেন, ভদ্রলোকের একটিই মেয়ে ছিল। সহানুভূতিবশত আমি নিজেই কথাবার্তা চালিয়ে বিয়েটা করে নিয়েছিলাম। এক ভদ্রলোকের উত্তরাধিকারী রূপে একটি ছেলের প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যে উনি বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু কপাল মন্দ আজ অবধি তাঁর সাত সাতটা মেয়ে হয়ে গেছে, অথচ ছেলের কোনো পাত্তা নেই। ভদ্রলোক বললেন — ওঁর ধারণা এই শয়তানিটা ওঁর স্ত্রীর, ওঁর স্ত্রী এইভাবে ওঁকে নাকাল করতে চাইছেন। আর এক ভদ্রলোক বেশ পয়সাওয়ালা, টাকাপয়সা খরচ করার কোনও উপায় বা পন্থা তাঁর জানা ছিল না, তাই তিনি বিয়ে করেছেন। আর এক ভদ্রলোক বললেন যে, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকত, তাই উনি বিয়ে করে বসলেন। আর বিয়ের ফল হল এই যে এখন উনি সুখেশান্তিতে আছেন। ওঁর বাড়িতে এখন আর কেউ আসে না। এক ভদ্রলোক সারাজীবন ধরে অন্যদের বিয়েশাদিতে লোকলৌকিকতা করতে করতে আর উপহার দিতে দিতে তিতিবিরক্ত হয়ে পড়লে, শেষ পর্যন্ত প্রতিদান পাবার আগ্রহে নিজেই বিয়ে করে বসলেন।

আর সব ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা এই কারণগুলো বলেছেন। ওঁদের উত্তরগুলো ওঁদেরই কথায় পরপর নীচে লিখে দিলাম —

১। আমার শ্বশুরমশাই একজন বড়োলোক, আর এটি ওঁর একমাত্র মেয়ে, তাই আমার বাবা এখানে আমাকে বিয়ে দিয়েছেন।

২। আমার বাপঠাকুরদারা সবাই তো বিয়েও করেছেন, তাই আমাকেও করতে হল।

৩। চিরকালই আমি চুপচাপ আর কম কথার মানুষ, না বলতে পারলাম না।

৪। আমার শ্বশুরমশাই প্রথম প্রথম নিজের পয়সাকড়ির খুব আড়ম্বর করেছেন, তাই আমার মা-বাবা তাড়াতাড়ি করে আমার বিয়েতে মত দিয়ে দিয়েছেন।

৫। চাকরবাকর ভালো পাওয়া যাচ্ছিল না, আর যদিও বা পাওয়া যেত তো টিকত না। বিশেষ করে রান্নার লোক ভালো পাওয়া যেত না। বিয়ের পর এই ঝামেলাটা থেকে রেহাই পাওয়া গেছে।

৬। আমি আমার জীবনবিমা করাতে চাইছিলাম, সে ফরম ভরতি করতে বিধবার নাম লেখানোর দরকার পড়েছিল।

৭। জেদাজেদি করেই আমার বিয়ে হয়েছে। আমার শ্বশুরমশাই বিয়েতে রাজি হচ্ছিলেন না, আমার বাবার রোখ চেপে গিয়েছিল, ফলে আমার বিয়ে করতে হল। শেষ পর্যন্ত আমার শ্বশুর মশাইকে বিয়েতে রাজি হতেই হল।

৮। আমার শ্বশুরবাড়ির বংশটি খুব কুলীন তাই আমার মা-বাবা চেষ্টা-চরিত্র করে আমার বিয়ে দিয়েছেন।

৯। আমার লেখাপড়া শেখার কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না, তাই আমাকে বিয়ে করতে হল।

১০। আমার আর আমার স্ত্রীর জন্মের আগে থেকেই আমাদের দুজনের মা-বাবার মধ্যে আমাদের বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল।

১১। সবার পীড়াপীড়িতে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন।

১২। বংশরক্ষার জন্য বিয়ে করেছি।

১৩। আমার মা মারা যাবার পর সংসার দেখাশোনা করার মতো কেউ ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে বিয়েটা করতে হল।

১৪। আমার বোনগুলো একা ছিল, এজন্য বিয়ে করে ফেললাম।

১৫। আমি একা মানুষ ছিলাম, অফিসে যাবার সময় ঘরে তালা লাগাতে হত, তাই বিয়ে করে ফেললাম।

১৬। আমার মা আমাকে দিব্যি দিয়েছিলেন, তাই বিয়ে করেছি।

১৭। আমার প্রথম পক্ষের সন্তানদের লালনপালনের দরকার ছিল, তাই বিয়ে করেছি।

১৮। আমার মায়ের ধারণা হয়েছিল উনি খুব শিগগিরই মারা যাবেন আর আমার বিয়েটা উনি বেঁচে থাকতে থাকতে দিয়ে যেতে চাইছিলেন, তাই আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমার বিয়ে হয়েছে আজ দশ বছর হতে চলেছে, তবে ভগবানের দয়ায় মায়ের আশীর্বাদ এখনও পেয়ে যাচ্ছি।

১৯। তালাক দিতে দিল চাইছিল, তাই শাদি করেছি।

২০। আমি অসুখে-বিসুখে ভুগি, এদিকে সেবাযত্ন করার মতো কোনো লোকজন নেই, তাই বিয়ে করে ফেললাম।

২১। নেহাত দৈবাৎই আমার বিয়েটা হয়ে গেল।

২২। যে বছর আমার বিয়ে হয়েছে সে বছর বিয়ের খুব বড়ো শুভযোগ ছিল। সবারই বিয়ে হচ্ছিল, আমারও হয়ে গেল।

২৩। বিয়ে না করলে আমার খবরাখবর কেউ নিত না।

২৪। বিয়ে তো করিনি, যেচে একটা ঝামেলা নিয়েছি।

২৫। পয়সাওয়ালা খুড়োর কথা ঠেলতে পারিনি।

২৬। বুড়ো হতে চলেছিলাম, এখন বিয়ে না করলে আর কবে করতাম।

২৭। লোকহিতের কথা ভেবেই বিয়েটা করেছি।

২৮। পাড়াপড়শিরা খারাপ ভাবত, তাই নিকেটা সেরে ফেললাম।

২৯। ডাক্তাররা বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলেন।

৩০। আমার কবিতার কেউ প্রশংসা করত না।

৩১। আমার দাঁত পড়তে শুরু করেছিল, চুলগুলো পেকে গিয়েছিল, তাই বিয়ে করে ফেললাম।

৩২। সেনা বিভাগে বিয়ে করা লোকেরা মাইনে বেশি পেত, তাই আমিও বিয়ে করে ফেললাম।

৩৩। কেউই আমার রাগ বরদাস্ত করত না, তাই আমি বিয়েটা করে নিয়েছি।

৩৪। বউয়ের চেয়ে বড়ো সমর্থক আর কেউ হয় না, তাই আমি বিয়ে করেছি।

৩৫। আমি নিজেই ভেবে অবাক হচ্ছি যে কেন বিয়েটা করলাম।

৩৬। বিয়ে কপালে লেখা ছিল, তাই হয়েছে।

এমনই সব শুনলাম। যত মুখ তত কথা।

(শাদী কী বজহ / ১৯২৭) অনুবাদ ননী শূর

মন্দির

মাতৃস্নেহ, ধন্য তুমি। সংসারে আর যা-কিছু আছে সব মিথ্যা, অসার। মাতৃস্নেহই সত্য, অক্ষয়, অব্যয়। তিনদিন থেকে সুখিয়া মুখে একদানা অন্ন তোলেনি, একবিন্দু জল পান করেনি। সামনে বিছানো খড়ের ওপর মায়ের আদরের ধন শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। আজ তিনদিন থেকে সে চোখ মেলে তাকায়নি। কখনও তাকে কোলে তুলে নেয়, কখনো আবার খড়ের ওপর শুইয়ে দেয়। হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে হঠাৎ যে বাছার কী হল, কেউ বলতে পারে না। এই অবস্থায় মায়ের কি খিদেতেষ্টা বলে কিছু থাকে? একবার মুখে এক ঢোক জল নিয়েছিল, কিন্তু তা আর গলা দিয়ে নাবেনি।

এই হতভাগিনী মেয়েটির দুঃখদুর্দশার অন্ত নেই। এক বছরের মধ্যে দুটি ছেলেকে গঙ্গায় সঁপে দিতে হয়েছে। পতিদেবতাটি তো অনেক আগেই বিদায় নিয়েছেন। এখন এই অভাগীর জীবনের আশ্রয় বলো, অবলম্বন বলো, যা-কিছু ওই ছেলে। হায়! ঈশ্বর কি সেটিকেও কোল থেকে কেড়ে নিতে চান? ভাবতে গিয়েই মায়ের চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ে। ছেলেটিকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করে না। ওকে সঙ্গে নিয়েই সে ঘাস তুলতে যায়। ঘাস বিক্রি করতে যায় বাজারে, তখনও ছেলেটি কোলেকাঁখে থাকে। ওর জন্যে সে ছোট্ট খুরপি আর ছোট্ট ঝুড়ি বানিয়ে দিয়েছে। জিয়াবন মায়ের সঙ্গে ঘাস তোলে আর বাহাদুরি দেখিয়ে বলে — মা, আমাকেও বড়ো খুরপি বানিয়ে দিও, আমি অনেক ঘাস তুলব। তুমি শুধু দরজার কাছে মাচায় বসে থাকবে মা। আমি ঘাস বিক্রি করে আসব। মা জিজ্ঞেস করে — আমার জন্যে কী কী আনবে বাছা? জিয়াবন লাল লাল শাড়ি কিনে আনার কথা দেয়। আর নিজের জন্যে অনেক গুড় কিনতে চায় সে। এখন ওর সেইসব ছেলেমানুষি কথাগুলো মনে পড়তেই মায়ের হৃদয়ে যেন শেল বিঁধতে লাগল।

ছেলেটিকে যে দেখত, সেই বলত — কারও নিশ্চয়ই নজর লেগেছে। কিন্তু কার নজর লাগবে? সংসারে এই বিধবারও শত্রু আছে কি কেউ? যদি তার নাম জানতে পারে সুখিয়া, তাহলে সে গিয়ে তার পায়ে পড়বে, তার কোলে ছেলেকে তুলে দেবে। তার হৃদয় কি করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠবে না এতটুকু? কিন্তু কেউ তার নাম বলে না। হায়! সে এখন কী করবে, কাকে শুধোবে?

দুই

রাতের তৃতীয় প্রহর কেটে গেছে। সুখিয়ার চিন্তাক্লিষ্ট চঞ্চল মন কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছিল। কোন দেবীর শরণাপন্ন হবে সে, কোন দেবতার মানত করবে, ভাবতে ভাবতে তার চোখে তন্দ্রা নেমে এল। তখন দেখল কী তার স্বামী এসে ছেলের শিয়রে দাঁড়িয়েছে, ছেলের মাথায় হাত রেখে বলছে — কাঁদিস নে, সুখিয়া। তোর ছেলের অসুখ সেরে যাবে। কাল ঠাকুরের পুজো

দিয়ে আয়, তাতেই মঙ্গল হবে তোর। একথা বলেই সে চলে গেল। সুখিয়া চোখ মেলে তাকাল। নিশ্চয়ই তার পতিদেবতা এসেছিলেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। উনি এখনও আমাকে ভোলেননি, এই ভেবে তার হৃদয় আশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে এল। সে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলল — ভগবান! আমার ছেলে সেরে উঠুক, আমি তোমার পুজো দেব। অনাথ বিধবার প্রতি দয়া করো।

ঠিক সেই সময় জিয়াবন চোখ মেলে তাকাল। জল চাইল সে। মা দৌড়ে গিয়ে বাটিতে করে জল নিয়ে এল। ছেলেকে জল খাওয়াল।

জিয়াবন জল খেয়ে জিজ্ঞেস করল — মা, এখন রাত না দিন?

সুখিয়া — এখন তো রাত, বাছা। তোমার কেমন লাগছে?

জিয়াবন — ভালো, মা। এখন আমি ভালো হয়ে গেছি।

সুখিয়া — তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাছা। ভাগবান করুন, তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে?

জিয়াবন — হ্যাঁ মা, একটু গুড় দাও না!

সুখিয়া — গুড় খেও না সোনা, অপকার হবে। বলো তো খিচুড়ি রেঁধে দি?

জিয়াবন — না, মা। একটুখানি গুড় দাও, তোমার পায়ে পড়ছি।

মা ছেলের এই একান্ত ইচ্ছেটাকে অগ্রাহ্য করতে পারল না। একটুখানি গুড় বার করে সে জিয়াবনের হাতে দিল। তারপর সে হাঁড়ির ঢাকনা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় কে যেন বাইরে থেকে সাড়া দিল। ওখানেই হাঁড়ি রেখে দরজা খুলে দিতে গেল সে। অমনি জিয়াবন আরও দুমুঠো গুড় বার করে নিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলল।

তিন

সারাদিন জিয়াবন ভালই থাকল। অল্প একটু খিচুড়ি খেয়েছিল। দু-এক বার আস্তে আস্তে হেঁটে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পারল না সে, তবু তাদের খেলা দেখে তার মন ভরে উঠল। সুখিয়া মনে করল, ছেলের অসুখ সেরে গেছে। দু-একদিনের মধ্যে হাতে পয়সা এলেই সে ঠাকুরের পুজো দিতে যাবে। শীতের দিন। ঘর ঝাড়পোঁছ, নাওয়া-ধোওয়া, খাওয়াদাওয়া সারতেই দিনটা কেটে গেল। কিন্তু বিকেলের দিকে আবার যখন জিয়াবনের শরীর খারাপ হয়ে পড়ল, তখন সুখিয়ার ভীষণ ভয় হল। তৎক্ষণাৎ তার মনে আশঙ্কা দেখা দিল, পুজো দিতে দেরি হচ্ছে বলেই ছেলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল বুঝি! তখনও সন্ধে হতে একটু দেরি আছে। ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে সে পুজোর সামগ্রী জোগাড় করতে শুরু করল। জমিদারের বাগানেই ফুল পেয়ে গেল। তুলসীপাতা ছিল দরজার কাছেই। কিন্তু ঠাকুরের ভোগের জন্যে কিছু মিষ্টি দরকার, নইলে পাড়া-পড়শিদের বিতরণ করবে কী! ঠাকুরের থানে প্রণামী দেওয়ার জন্যেও কম করে এক আনা চাই। সারা গ্রাম সে তন্নতন্ন করে খুঁজে এল, কোথাও ধার পেল না। একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল সে। হায় রে দুর্দিন! চার আনা পয়সাও কেউ দিল না! অবশেষে হাতের রুপোর বালা খুলে নিয়ে সে দৌড়ে মুদির দোকানে গেল। বালা দুটো রেখে বাতাসা নিয়ে দৌড়তে দৌড়তেই বাড়ি ফিরে এল। এখন

পুজোর সামগ্রী প্রস্তুত। সে এক হাতে ছেলেকে কোলে তুলে নিল, অন্যহাতে পুজোর থালা নিয়ে মন্দিরের দিকে পা বাড়াল।

মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। পাঁচ-দশজন ভক্ত দাঁড়িয়ে স্তব পাঠ করছে। এমন সময় সুখিয়া মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন — কী ব্যাপার রে? তুই কেন এসেছিস?

সুখিয়া চাতালে উঠে এসে বলল — ঠাকুরের কাছে মানত ছিল হুজুর। তাই পুজো দিতে এসেছি।

পুরুত মশাই দিনভর জমিদারের প্রজাদের পূজোআচ্চা করে থাকেন, সকাল-সন্ধে পুজো করেন ঠাকুরের। রাতে মন্দিরেই ঘুমোন। রান্না-খাওয়া মন্দিরেই সেরে নেন। ফলে মন্দিরের সারা দেয়াল জুড়ে কালি পড়েছে। স্বভাবের দিক থেকে বড়ো দয়ালু। এমন নিষ্ঠাবান যে, যতই শীত পড়ুক, যত ঠান্ডা হাওয়াই দিক না কেন, স্নান না করে মুখে জলটুকুও তোলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁর হাত-পায়ে পুরু হয়ে ময়লা জমেছে, কিন্তু তাতে তাঁর নিজের কোনো দোষ নেই। বললেন — তা, ভেতরে চলে আসবি নাকী? পুজো তো হল। আবার ভেতরে এসে ছুত করবি সব?

একজন ভক্ত বলল — ঠাকুরকে পবিত্র করতে এসেছিস?

সুখিয়া বিনম্র কণ্ঠে বলল — ঠাকুরের চরণ ছুঁতে এসেছি, হুজুর। পুজোর সব সামগ্রী এনেছি।

পুরোহিত — কী অবুঝ কথা বলে রে, পাগল-টাগল হয়ে যাসনি তো? আচ্ছা, ঠাকুরকে তুই ছুঁবি কী করে?

এপর্যন্ত সুখিয়ার মন্দিরে আসার অবকাশ হয়নি। আশ্চর্য হয়ে বলল — হুজুর, তিনি তো জগতের প্রভু। তাঁকে দর্শন করলে পাপীও তরে যায়, আমি ছুঁলে তাঁর ছুত হবে কেন?

পুরোহিত — ওরে, তুই চামারনি কি না, বল?

সুখিয়া — তাহলে ভগবান কি চামারদের সৃষ্টি করেননি? চামারদের ভগবান কি আলাদা? এই ছেলের জন্যেই মানত হুজুর!

তখন স্তবপাঠ শেষ হয়েছে। ভক্ত মহোদয়রা ধমক দিয়ে বলল — পেতনিটাকে মেরে তাড়াও। অপবিত্র করতে এসেছে সব। ছুঁড়ে ফেলে দাও থালা-টালা। সংসারে এমনিতেই আগুন জ্বলছে, চামারও যদি ঠাকুরের পুজো করতে শুরু করে, তাহলে পৃথিবীটা থাকবে, না রসাতলে যাবে?

জনৈক ভক্ত মহাশয় বলল — এখন দেখছি ঠাকুর বেচারাকেও চামারের হাতে ভোজন করতে হবে। প্রলয়ের আর বাকি নেই।

শীত বাড়ছে। সুখিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আর ওদিকে ধর্মের ঠিকেদাররা সময়ের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছে। ছেলেটি ঠান্ডার চোটে মায়ের বুকের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু সুখিয়া সেখান থেকে নড়তে চাইল না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, তার দুটি পা যেন মাটিতে বসে গেছে। থেকে থেকে তার ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ঠাকুর কি শুধু ওদেরই, তাদের মতো গরিবদের সঙ্গে কি তার কোনো সম্পর্ক নেই? ওরা তাকে বাধা দেওয়ার কে? কিন্তু সেইসঙ্গে তার এটাও ভয় হচ্ছিল যে ওরা আবার সত্যি সত্যি থালা-টালা ছুঁড়ে ফেলে না দেয়! মনটাকে শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল সে। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সেখান থেকে সে কিছুদূর এসে এক গাছের তলায় অন্ধকারে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভক্তদের চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকল সে।

চার

আরতি আর স্তবপাঠের পর ভক্তরা অনেকক্ষণ শ্রীমদভাগবত পাঠ করল। ওদিকে পুরুত মশাই উনুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না শুরু করেছেন। উনুনের সামনে বসে তিনি হুঁ-হাঁ দিয়ে যান আর মাঝে মাঝে টীকা-টিপ্পনী কাটেন। রাত দশটা পর্যন্ত ওদের আলাপ-সালাপ চলল, আর এদিকে সুখিয়া গাছের তলায় ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর ভক্তরা সবাই একে একে নিজের নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল। শুধু পুরুত মশাই থাকলেন সেখানে। তখন সুখিয়া গিয়ে মন্দিরের দাওয়ায় দাঁড়াল। সেখানে পুরোহিত আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ভাতের হাঁড়ির ক্ষুধাবর্ধক মধুর সঙ্গীত শুনছেন তন্ময় হয়ে। পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাতেই সুখিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। বিদ্রূপের গলায় বললেন — কী রে, তুই এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস?

সুখিয়া থালাখানি নীচে নামিয়ে রাখল। ভিক্ষা চাওয়ার মতো হাত পেতে বলল — মহারাজ, আমি অভাগিনী। এই ছেলেই আমার জীবনের সবকিছু, আমায় দয়া করো। তিনদিন থেকে ও মাথা তোলেনি। তোমার খুব নামযশ হবে।

বলতে বলতে সুখিয়া কাঁদতে শুরু করল। পুরোহিত এমনিতে দয়ালু, কিন্তু চামারনিকে ঠাকুরের কাছে যেতে দেওয়ার মতো অশ্রুতপূর্ব মহাপাপ তিনি কীভাবে করতে পারেন? না জানি সেজন্যে ঠাকুর অবার কী শাস্তি বিধান করেন। তাছাড়া তাঁর নিজেরও তো ছেলেপিলে আছে। হঠাৎ যদি ঠাকুর ক্রুদ্ধ হয়ে গ্রামের সর্বনাশ করেন, তাহলে? বললেন — ঘরে গিয়ে ভগবানের নাম নে, তোর ছেলে ভালো হয়ে যাবে। আমি এই তুলসীপাতা দিচ্ছি, ছেলেকে খাইয়ে দিস, আর চরণামৃত ওর চোখে লাগিয়ে দিবি। ভগবান চাইলে সব সেরে যাবে।

সুখিয়া — ঠাকুরের পায়ে পড়তে দেবে না, মহারাজ? বড়ো দুঃখিনি আমি। ধার-ধোর করে পুজোর জিনিসপত্তর জোগাড় করেছি। কাল স্বপ্ন দেখেছিলাম, ঠাকুরের পুজো দে, তোর ছেলে সেরে যাবে। তাই ছুটে এসেছি। আমার কাছে একটাকা রয়েছে। টাকাটা নাও তুমি। আমায় শুধু একটু ঠাকুরের পায়ে পড়তে দাও।

এই প্রলোভন মুহূর্তের জন্য পণ্ডিতজিকে বিচলিত করে তুলল। কিন্তু মূর্খতাবশত তাঁর মনে তখনো এক-আধটু ঈশ্বরের ভয় ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন — আরে পাগলি, ঠাকুর ভক্তের মনের ভাব লক্ষ্য করেন, না পায়ে পড়া দেখেন? শুনিসনি — 'মন চাঙ্গা তো কঠৌতি মে গঙ্গা।' মনে ভক্তি না থাকলে লক্ষবার ভগবানের পায়ে পড়লেও কিছু হবে না। আমার কাছে একটা মাদুলি আছে। দাম তো অনেক। তা তুই আমাকে ওই একটাকাই দিবি। ছেলের গলায় বেঁধে দিতে হবে। ব্যস, কালকেই ছেলে খেলাধুলো শুরু করবে।

সুখিয়া — ঠাকুরকে পুজো দিতে দেবে না?

পুরোহিত — তোর জন্যে এটুকু পুজোই যথেষ্ট। যা কখনও হয়নি, আজ যদি আমি তাই করি, আর তাতে গাঁয়ের ওপর যদি কোনো আপদ-বিপদ এসে পড়ে, তখন কী হবে? এদিকটাও তো ভেবে দেখবি? তুই এই মাদুলি নিয়ে যা। ভগবান যদি চান, রাতের মধ্যেই তোর ছেলের কষ্ট দূর হয়ে যাবে। কারও নজর পড়েছে, বুঝলি। ছটফটে বাচ্চা তো, বোধ হয় গায়ে ক্ষত্রিয়ের রক্ত আছে।

সুখিয়া — যখন থেকে ওর জ্বর হয়েছে, তখন থেকেই আমার প্রাণ অস্থির হয়ে রয়েছে।

পুরোহিত— ভারী সুলক্ষণ ছেলে। ভগবান বাঁচিয়ে রাখুন, ও তোর সব দুঃখ দূর করবে। এখানে তো প্রায়ই খেলতে আসে। এই দিন দু-তিনেক থেকেই দেখছিনে।

সুখিয়া — মাদুলিটা কেমন করে বাঁধব মহারাজ?

পুরোহিত — আমি কাপড়ে বেঁধে দিচ্ছি, তুই শুধু ওর গলায় পরিয়ে দিবি। এখন এই রাত্রিবেলা নতুন কাপড় কোথায় খুঁজবি তুই।

সুখিয়া দুটি টাকা আঁচলের খুঁটে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল। একটাকা তো আগেই খরচ হয়েছে। বাকি টাকাটি পুরোহিতকে দক্ষিণা দিল সে। তারপর মাদুলি নিয়ে নিজের মনকে বোঝাতে বোঝাতে বাড়ি ফিরল।

পাঁচ

সুখিয়া ঘরে ফিরে ছেলের গলায় মাদুলি বেঁধে দিল। কিন্তু যেমন যেমন রাত বাড়তে থাকল, ছেলের জ্বরও বেড়ে চলল তেমনি। এমন কী, রাত তিনটে বাজতে না বাজতেই তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে লাগল। সুখিয়া ভয় পেয়ে ভাবতে শুরু করল — হায়! আমি খামোখা সঙ্কোচ করে ঠাকুর-দর্শন না করেই চলে এলাম! যদি মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়তাম, তাহলে কে কী করত আমার? না হয় ওরা আমায় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিত, মারতও হয়তো; কিন্তু আমার মনোবাসনা তো পূর্ণ হত! যদি আমি ঠাকুরের পা চোখের জলে ভিজিয়ে দিতাম, তাঁর পায়ে বাছাকে শুইয়ে দিতাম, তাহলে কি দয়া হত না তাঁর? তিনি তো দয়াময় ভগবান, গরিব-দুঃখীকে রক্ষা করেন তিনি, আমায় কি দয়া করতেন না? ভাবতে ভাবতে সুখিয়ার মন অস্থির হয়ে উঠল। না, আর দেরি করার সময় নেই। সে নিশ্চয়ই যাবে, ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে। তিনি ছাড়া এই অবলার ভীতিবিহ্বল হৃদয়ের আর কোনো অবলম্বন নেই, আশ্রয় নেই। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও সে তালা ভেঙে ফেলবে। ঠাকুর কি কারও কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন যে তাঁকে কেউ ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখবে!

রাত তিনটে বেজে গেছে। সুখিয়া ছেলেকে কম্বলে জড়িয়ে কোলে তুলে নিল। একহাতে থালা নিয়ে মন্দিরের দিকে চলল। ঘর থেকে বাইরে পা দিতেই ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে তার বুকের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। ঠান্ডায় পা দুটো অবশ হয়ে আসছে। তারপর চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাস্তা সিকি মাইলের কম নয়। গাছের তলা দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে। ডানদিকে কিছুদূর পর্যন্ত একটা পুকুর, তারপর ঘন বাঁশঝাড়। পুকুরে এক ধোপা ডুবে মরেছিল, আর বাঁশঝাড়ে রয়েছে পেতনিদের এক আস্তানা। বাঁদিকে সবুজ ফসল-ভরা খেত। চারদিক খাঁখাঁ করছে, অন্ধকার হিসহিস করছে যেন। হঠাৎ একদল শেয়াল কর্কশ গলায় 'হুক্কা হুয়া' ডাকতে শুরু করল। হায়! যদি কেউ তাকে লাখ টাকাও দিত, তবু সে এসময় এখানে আসত না। কিন্তু ছেলের প্রতি মমতার জন্যেই সে তার সমস্ত ভয়-ডর দমন করেছে। 'হে ভগবান! এখন একমাত্র তুমিই ভরসা!' — এই কথা জপতে জপতে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল সে।

মন্দিরের দরজায় পৌঁছে সে শেকলে হাত দিয়ে দেখল। তালা বন্ধ। পুরুত মশায় বারান্দাসংলগ্ন ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছেন। চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুখিয়া চাতালের নীচ থেকে একখানা ইট তুলে নিল। তারপর জোরে জোরে তালায় বাড়ি মারতে লাগল সে। না জানি তার হাতে এত শক্তি এল কোথা থেকে! দু-তিন ঘা মারতেই তালা আর ইট দুটোই একসঙ্গে ভেঙে পড়ল চৌকাঠের

ওপর। সুখিয়া দরজা খুলে মন্দিরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় পুরুত মশাই পাশের ঘরের দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন। তারপর 'চোর চোর' বলে চিৎকার করতে করতে গ্রামের দিকে ছুটলেন। শীতকালে এক প্রহর রাত থাকতে প্রায়ই লোকের ঘুম ভেঙে যায়। হল্লা শুনতেই কয়েকজন লণ্ঠন নিয়ে এদিক-ওদিক থেকে ছুটে এল। জিজ্ঞেস করতে লাগল — কোথায় চোর? কোথায়? কোনদিকে গেল?

পুরোহিত — মন্দিরের দরজা খোলা। আমি খটখট আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

সুখিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে চাতালে নেমে এল। বলল — চোর নয়, আমি। ঠাকুরের পুজো দিতে এসেছি। মন্দিরে ঢুকিইনি এখনও, পন্ডিতজি হইহল্লা শুরু করে দিয়েছে।

পুরোহিত বললেন — সব মাটি করেছে! সুখিয়া মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে ছুত করে দিয়েছে!

এর পর আর কী কথা! কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল সুখিয়ার ওপর। লাথি আর ঘুঁসি চলতে লাগল। সুখিয়া একহাতে ছেলেকে ধরে আছে, অন্যহাতে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ তাগড়া জোয়ান পুরুত মশাই তাকে এমন জোরে এক ধাক্কা মারলেন যে, ছেলেটি তার হাত থেকে ছিটকে মাটিতে গিয়ে পড়ল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না। কাঁদছে না, নিঃশ্বাসও ফেলছে না সে। সুখিয়াও পড়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ছেলেকে তুলে নিতে গেল, অমনি ছেলের মুখের দিকে চোখ পড়ল তার। এমনভাবে সে পড়ে রয়েছে যেন জলের মধ্যে প্রতিবিম্ব। সুখিয়ার মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখল, সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সে। তার চোখে জল নেই। রাগে, উত্তেজনায় তার সারা মুখ থমথম করছে। চোখ থেকে আগুন ঝরছে যেন। দুহাতে শক্ত মুঠি পাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল — পাপিষ্ঠের দল, আমার ছেলের প্রাণ নিয়ে এখন দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওর সঙ্গে আমাকেও মেরে ফেললে না কেন? আমার ছোঁয়ায় ঠাকুরজি ছুত হয়ে গেছেন, না! পরশপাথরের ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়, পরশপাথর কখনও লোহা হয়ে যায় না। আমার ছোঁয়া লেগে ঠাকুর অপবিত্র হয়ে যাবেন! আমায় সৃষ্টি করেছেন, তাতে ছুত হয়নি ওঁর? নাও, আর কখনও ঠাকুরজিকে ছুঁতে আসব না। তালা দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখো, দরজায় পাহারা বসিয়ে দাও। হায়! তোমাদের প্রাণে এতটুকু দয়ামায়া নেই! তোমরা এমনি নিষ্ঠুর! ছেলেমেয়ে নিয়ে তোমরা ঘর-সংসার কর, তবু এক অভাগী মায়ের ওপর তোমাদের একটু দয়া হল না? তোমরা আবার ধর্মের ঠিকেদার সেজেছ! সব কসাই তোমরা, একেবারে কসাই। ভয় নেই, আমি থানাপুলিশ করতে যাব না, আমার বিচার ভগবান করবেন, এখন তাঁরই দরবারে নালিশ জানাব আমি।

কেউ টুঁ শব্দ করল না। পাষাণমূর্তির মতো মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই।

এরই মধ্যে সারা গ্রামের লোক এসে জড়ো হয়েছে। সুখিয়া আর একবার ছেলের মুখের দিকে তাকাল। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল — হায়, আমার বাছা রে! তারপরই সে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল তার। ছেলের জন্যে প্রাণ দিল সে।

মা, তুমিই ধন্য! তোমার যেরূপ নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, দেবতাদের কাছেও তা দুর্লভ!

(মন্দির / ১৯২৭) অনুবাদ আশরফ চৌধুরী

সুজান ভগত

সাদাসিধে চাষিদের হাতে টাকা এলেই তাদের মনটা ঝোঁকে ধর্মকর্ম আর কিছু না কিছু কীর্তি স্থাপনের দিকে। অভিজাত সমাজের মতো তারা নিজেদের ভোগবিলাসের দিকে দৌড়ে যায় না। সুজানের খেতে কয়েক বছর ধরেই সোনা ফলছে। পরিশ্রম তো গ্রামের সব চাষিই করত, কিন্তু সুজানের এমনই কপালগুণ ছিল যে, সে শুকনো জায়গাতেও কিছু দানা ছড়িয়ে দিলে সেখানেও কিছু না কিছু ফলত। পর পর তিন বছর একনাগাড়ে আখের ফলন হল। ওদিকে বাজারে গুড়ের দামও বেশ চড়া। ফলে কম করেও দু-আড়াই হাজার টাকা হাতে এসে গেল। অমনি তার চিত্তবৃত্তি ধর্মকর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সাধুসন্তদের সেবা-সৎকার শুরু হল; দরজায় ধুনি জ্বলতে শুরু করল। আজকাল কানুনগো এই এলাকা সফরে এলে সুজান মাহাতোর বার-বাড়িতেই বিশ্রাম করে। এলাকার হেডকনস্টেবল, জমাদার, শিক্ষাবিভাগের অফিসার প্রভৃতি একজন না একজন সব সময়েই সেই আটচালা অলংকৃত করে রাখে। মাহাতোর আর আনন্দের সীমা নেই। ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন। তার বাড়িতে এখন বড়ো বড়ো হাকিমরাও পায়ের ধুলো দেন। যে সব হাকিমদের সামনে তার মুখ দিয়ে কথাই বেরোত না, সেই সব হাকিমরাই এখন দিনরাত মাহাতো মাহাতো করে। তার বাড়িতে এখন মাঝে মাঝেই নামগানের আসর বসে।

একজন সাধু এখানকার ব্যাপার-স্যাপার ভালো দেখে গ্রামে আস্তানা গেড়ে জাকিয়ে বসলেন। গাঁজা আর চরসের গন্ধে বাতাস ভরে উঠল। একটা ঢোলক এল; চেয়েচিন্তে একটা করতালও পাওয়া গেল এবং সৎসঙ্গ করার ধুম পড়ে গেল। এসব ধুমধামের পেছনে ছিল ধনসম্পদ। বাড়িতে সের সের দুধ হত। কিন্তু সুজানের গলায় এক ফোঁটাও পড়ত না। যেন দিব্যি দেওয়া আছে। তার সবটাই কখনও হাকিমরা খেতেন, কখনও সাধুসন্তদের ভোগে লাগত। চাষিরা দুধ-ঘি দিয়ে কী করবে? তাদের তো শুধু রুটি আর শাক দরকার। এখন সুজানের নম্রতার সীমা নেই। সকলের সামনে মাথা নিচু করেই আছে, পাছে কেউ বলতে শুরু করে যে, টাকাপয়সা পেয়ে গর্ব হয়েছে।

গ্রামে মোট তিনটি কুয়ো ছিল। বেশির ভাগ খেতেই জল পৌঁছত না, চাষ মার খেত। সুজান একটা পাকা কুয়ো বানিয়ে দিল। কুয়োর বিয়ে হল। যজ্ঞ হল। ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হল। যেদিন কুয়ো থেকে প্রথম জল তোলা হল সেদিন সুজানের মনে হল সে যেন চতুর্বর্গ লাভ করেছে। যে কাজ গ্রামের কেউ কখনও করেনি বাপদাদার পুণ্যের প্রভাবে সুজান সেই কাজ করে দেখিয়ে দিল।

একদিন গ্রামে কিছু গয়াযাত্রী এসে আশ্রয় নিল। সুজানের দেউড়িতে তাদের রান্নাবান্না হল। গয়ায় গিয়ে তীর্থ করার বাসনা সুজানের মনে অনেকদিন ধরেই ছিল। এমন একটা সুযোগ পেয়ে সেও যাত্রা করার জন্য তৈরি হল।

সুজানের বউ বুলাকি বলল, এখন থাক! আসছে বছর যাওয়া যাবে। সুজান একটু গম্ভীরভাবে বলল, আগামী বছর কী হবে কে জানে? ধর্মকর্মের ব্যাপারে অত বাছাবাছি ভালো নয়। জীবনের কোনো ভরসা নেই।

বুলাকি — হাত একদম খালি হয়ে যাবে যে!

সুজান — ভগবানের ইচ্ছে হলে আবার টাকাপয়সা আসবে। তাঁর কাছে কীসের অভাব?

বুলাকি একথার কী আর জবাব দেবে? সৎকার্যে বাধা দিয়ে নিজের মোক্ষের অন্তরায় সৃষ্টির কী দরকার! রাত পোহালে স্বামী-স্ত্রীতে গয়ায় চলল তীর্থ করতে। তীর্থ সেরে ফিরলে যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হল। সমস্ত স্বজনবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হল, এগারো খানা গাঁয়ের সকলকে সুপুরি বিলানো হল।* এত ধুমধামের সঙ্গে সব সমাধা হল যে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। সবাই বলতে লাগল যে, হ্যাঁ! ভগবান ধনদৌলত দিলে তার সঙ্গে যেন এমনি বিরাট হৃদয়ও দেন। দেমাক তো লোকটাকে ছুঁতেই পারেনি, বরং নিজের হাতে সে এঁটো পাতা উঠিয়ে নিচ্ছিল। বংশের নাম উজ্জ্বল করল সুজান। ছেলে যদি হয়, তাহলে যেন এমনিই হয়। বাপ যখন মারা যায় তখন তো ঘরে খুদকুঁড়োও ছিল না। আর এখন লক্ষ্মী অচলা হয়ে বসেছেন।

একজন হিংসুটে লোক বলল, দ্যাখো মাটিতে পোঁতা গুপ্তধন পেয়ে গেছে হয়তো।

শুনে সবাইতো চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে বলল— হ্যাঁ, তোমার বাপদাদাই হয়তো টাকা পয়সা লুকিয়ে রেখেছিল আর তাই হাতে পেয়েছ।

আরে ভাই! এ সব সৎপথে কামাই করা। তোমরাও তো হাড়ভাঙা খাটুনি খাট, কিন্তু তোমাদের খেতে কেন ওই রকম আখ হয় না? এত ফসলই বা ফলে না কেন? ভগবান মানুষের হৃদয় দেখেন। যে খরচা করতে জানে, দান করতে জানে, তাকেই উনি সব দেন।

দুই

এইভাবে সুজান মাহাতো সুজান ভগতে (ভক্ত সুজান) পরিণত হয়ে গেল। ভগতদের আচারবিচার কিছুটা আলাদা রকমের হয়। সে স্নান না করে কিছু খায় না। মা গঙ্গা যদি বাড়ি থেকে দূরে থাকেন, আর রোজ স্নান করে দুপুরের মধ্যে বাড়িতে ফেরা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত পুজোপার্বণের দিনে তাকে গঙ্গায় স্নান করতেই হবে। তার বাসায় নামগান অবশ্যই হতে হবে। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক বাছবিচার মানতে হয়। সব থেকে বড়ো কথা হল 'মিথ্যা'কে একেবারে ত্যাগ করতে হবে। ভক্ত কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না। অন্যান্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মিথ্যাচারের শাস্তি যদি এক হয়, তাহলে ভক্তের ক্ষেত্রে সে শাস্তি লাখের কম হবে না। অজ্ঞান অবস্থায় কৃত কত অপরাধের ক্ষমা হয়। কিন্তু জ্ঞানীর জন্য কোনো ক্ষমা নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই। আর যদি থাকেও তাহলে তা অতি কষ্টসাধ্য। সুজানকেও এখন থেকে ভক্ত নামের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। এতকাল তার জীবন ছিল একজন মজুরের জীবন। সে জীবনের সামনে কোনো আদর্শ, কোনো মর্যাদা ছিল না। এখন তার জীবনে বিচারবিবেচনার উদয় হয়েছে। জীবনের পথ কন্টকাকীর্ণ। আগে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ

---

* সুপুরি বিলিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতি এখানে।

করাই ছিল জীবনের লক্ষ্য এবং সেই মানদণ্ডেই পারিপার্শ্বিক সব কিছুর বিচার সে করত। কিন্তু এখন উচিত-অনুচিতের তুলাদণ্ডে সব বিচার করে। এক কথায় এখন বলা যায়, সে জড়জগতের খোলস থেকে বেরিয়ে চেতনার জগতে প্রবেশ করেছে। সে অল্পবিস্তর মহাজনি কারবার শুরু করেছিল। কিন্তু আজকাল সুদ নিতে গেলে আত্মগ্লানিতে ভোগে। এমনও হতে শুরু হল যে গোরুর দুধ দোয়ার সময় বাছুরের কথা মনে পড়ত — যেন বাছুরটা খিদেয় না কষ্ট পায়। তাহলে বাছুরের আত্মা দুঃখ পাবে। সে ছিল গাঁয়ের প্রধান। তখন কত শত মামলায় মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে। কতলোকের কাছ থেকে জরিমানা নিয়ে কত মামলা মিটিয়ে দিয়েছে। এখন ওই সব কাজে তার ঘেন্না হয়। মিথ্যাচার, চাতুরি থেকে সে এখন দূরে পালিয়ে যায়। আগে সে চেষ্টা করত কী করে মজুরদের কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশি কাজ আদায় করে নেওয়া যায়, আর তার বদলে মজুরি যতটা কম দিতে পারা যায়। পাছে কোনো বেচারা মজুরের হৃদয়ে দুঃখ হয় সেজন্য আজকাল মজুরদের কম খাটুনি এবং বেশি মজুরির কথাই ভাবে। 'কেউ যেন মনে ব্যথা না পায়'— এই কথাটা বলা তার মুদ্রাদোষের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। তার দুই জোয়ান ছেলে এখন কথায় কথায় এনিয়ে তাকে বিদ্রূপ করে। এমন কী, বুলাকি তাঁকে ষোলো আনা ভক্ত ভাবতে শুরু করেছে, যেন ঘরসংসারের ভালোমন্দে তার কিছু এসে যায় না। আধ্যাত্মিক জগতে পা দিয়ে সুজান সংসারে উদাসীন বৈরাগীতে পরিণত হয়ে গেল।

সুজানের হাত থেকে ধীরে ধীরে কর্তৃত্বের রাশ আলগা হতে লাগল। কোন খেতে কী বোনা হবে; কাকে কী দিতে হবে, কার কাছে কী পাওনা আছে, কী দামে কোন জিনিস বিক্রি হবে, এই রকম সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও কেউ আর ভগৎজির সঙ্গে আলোচনা করে না। ভগৎজির কাছে কেউ আর যেতেই পারে না। দুই ছেলে, নয় তো স্বয়ং বুলাকি, আগে থাকতেই সে সব ব্যাপার নিষ্পত্তি করে দেয়। সারা গ্রামে সুজানের মানসম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু নিজের বাড়িতে তার মনমর্যাদাও কমে আসছিল। ছেলেরা তার সেবাযত্ন যথেষ্টই করত। সুজানকে নিজে হাতে চারপাই উঠাতে দেখলে দৌড়ে এসে তারাই তুলে দেয়; তামাক খাওয়ার কলকেও তারাই সাজিয়ে দেয়। এমন কী, পরনের কাপড়খানাও পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য পেড়াপিড়ি করে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কর্তৃত্বের অধিকার তার হাতে ছিল না। এখন আর সে সংসারের প্রভু নয়; সে মন্দিরের বিগ্রহ।

তিন

একদিন বুলাকি উদুখলে ডাল ভাঙছিল। একজন ভিখারি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করল। বুলাকি ভাবল, আগে ডালটা কুটে নিই, তারপর একে কিছু দিলেই হবে। এতে তার বড়োছেলে ভোলা এসে বলল, ওমা! ওদিকে যে এক মহাত্মা দরজায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেন। যাহোক কিছু দাও, না হলে আবার তার আত্মা কষ্ট পাবে।

বুলাকি তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল, ভগতের পায়ে কি আলতা লাগানো আছে যে উঠে গিয়ে কিছু দিতে পারছেন না? আমার কি চারটে হাত না কী? আর কতলোকের আত্মাকে সুখী করব? সারা দিন লাইন তো লেগেই আছে।

ভোলা — তিনি তো সব কিছু উড়িয়ে দেওয়ার মতলবেই আছেন। এই তো এখনই মঙ্গু এসেছিল দাদনের ফসল ফেরত দিতে। হিসেবে সাত মন হয়। ওজনে দেখা গেল পৌনে সাত মন হয়েছে। আমি বললাম, বাকি দশ সের নিয়ে আয়। এতে বাবা বসে বসে হুকুম দিলেন, এখন আবার

অতদূরে কী যাবে? সব উশুল লিখে নাও, নাহলে ওর আত্মা আবার মিছিমিছি কষ্ট পাবে। আমি উশুল লিখিনি, — দশ সের বাকি আছে লিখে রেখেছি।

বুলাকি — খুব ভালো করেছিস। আপন মনে বকতে দে। কয়েকবার ওই রকম কথা গেরাহ্যি না করলেই নিজ থেকে এ সব বলা বন্ধ হয়ে যাবে।

ভোলা — দিনরাত একটা না একটা খুঁত বের করছেই। একশো বার বলে দিয়েছি যে, তুমি ঘরসংসারের ব্যাপারে কোনো কথা বলবে না, কিন্তু সে না বলে থাকতেই পারবে না।

বুলাকি — আগে যদি জানতাম যে এই দশা হবে তাহলে কখনোই গুরুমন্ত্র নিতে দিতাম না।

ভোলা — ভক্ত হওয়ার পর থেকে দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে গেছে। গোটা দিনটা তো পুজোপাঠেই কেটে যায়। এখনও এতটা বুড়ো হয়নি যে কোনো কাজ করতে পারবে না।

বুলাকি এবার আপত্তি জানাল। বলল, ভোলা, একথা বলা তোমার ঠিক হচ্ছে না, কোদাল বেলচা দিয়ে কোনো কাজ না করুক, কিছু না কিছু কাজ কিন্তু সে করেই যাচ্ছে। বলদগুলিকে খোলভুসি খেতে দেওয়া, গোরুর দুধ দোয়া থেকে শুরু করে যা কিছু করতে পারে, তা সবই করছে।

ভিখারিটা তখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ভিক্ষা চাইছিল। সুজান যখন ঘর থেকে কাউকে কিছু নিয়ে আসতে দেখল না, তখন উঠে গিয়ে কড়া গলায় বলল, ঘণ্টাখানেক ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে সেটা কি তোমাদের কানে যাচ্ছে না? নিজের কাজ তো সারাদিন ধরে করতেই হবে — ভগবানের কাজও কিছু কিছু করো।

বুলাকি — তুমিই তো বসে আছ ভগবানের কাজ করার জন্য। সংসারের সবাইকেই কি ভগবানের কাজ করতে হবে?

সুজান — কোথায় আটা রেখেছ বল, আমিই বের করে দিচ্ছি। তুমি মহারানি হয়ে বসে থাক।

বুলাকি — আহা! আটা আমি প্রাণপাত করে ভেঙে রেখেছি। ওকে খানিকটা গমটম দিলেই হবে। মাঝরাতে উঠে যে জাঁতা ঘোরাই, সে কি এই মুখপোড়াদের জন্যে?

সুজান ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে ছোটো একটা চুবড়িতে যব ভরে নিয়ে বাইরে আসে। যব তাতে সের খানেকের কম ছিল না। সুজান জেনেশুনেই ভিক্ষে দেওয়ার প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করছিল, কেবলমাত্র বুলাকি আর ভোলাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তার উপরে আবার চুবড়িতে খুব বেশি যব নেই দেখানোর জন্য দু আঙুলে আলগোছে ধরেছে সেটাকে। কিন্তু দু আঙুলে এতটা বোঝা সামলানো যায় না। হাত কাঁপতে শুরু করেছে। একটু দেরি করলে হাত ফসকে মাটিতে পড়ে যেতে পারে। সেজন্য সে দৌড়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ভোলা এসে হঠাৎ তার হাত থেকে চুবড়ি ছিনিয়ে নিয়ে রুক্ষ মেজাজে বলে উঠল, বিনিপয়সার মাল নয় যে বিলিয়ে দিতে যাচ্ছ। বুকের রক্ত জল করে কাজ করে তবেই ঘরে দানা জোটে।

সুজানও গলা চড়িয়ে বলল, আমিও তো বসে থাকি না।

ভোলা — ভিক্ষে ভিক্ষের মতোই দিতে হয়। হরির লুঠ করে দিতে হয় না। আমরা তো একবেলা খেয়েই দিন কাটাই যাতে ঠাটবাট বজায় থাকে। আর তোমার খালি উড়িয়ে দেওয়ার মতলব। সংসারে কী ঘটছে সে সম্পর্কে তোমার কি কোনো খেয়াল আছে?

সুজান এর কোনো জবাব দিল না। বাইরে এসে ভিখারিকে বলল, বাবা, এখন যাও, কারও হাতখালি নেই। তারপর সে গাছের নীচে বসে বসে ভাবতে লাগল: নিজের ঘরেই এতটা অনাদর!

এখনও সে অথর্ব হয়ে পড়েনি; হাত-পা অচল হয়নি; সংসারের কোনো না কোনো কাজ তো করছেই। তবুও তার এই হেনস্তা। নিজের হাতে গড়ে তোলা এই ঘর, এর সমস্ত শ্রীটুকু তো তারই শ্রমের ফসল। কিন্তু তবুও তার এই বাড়িতে আর কোনো অধিকার নেই। এখন সে যেন দরজায় কুকুরের মতো পড়ে আছে, আর গৃহস্থ যা একমুঠো শুকনো কিছু দেয় তাই খেয়ে পেট ভরায়। এমন জীবনে ধিক! সুজান এমন সংসারে থাকতে চায় না।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ভোলার ছোটোভাই শংকর হুঁকো সাজিয়ে নিয়ে এল। সুজান হুঁকোটা দরজায় ঠেকিয়ে রেখে দিল। ধীরে ধীরে তামাক পুড়ে শেষ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ভোলা দরজার কাছে চারপাই পেতে দিল। সুজান গাছতলা থেকে উঠল না।

আরও কিছুক্ষণ কাটল। ইতিমধ্যে রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেল। ভোলা এল ডাকতে, সুজান বলল, খিদে নেই। বারবার বলা সত্ত্বেও উঠল না। এবার বুলাকি এসে বলল — খেতে যাচ্ছ না কেন? শরীর ভালো আছে তো?

সুজানের সব থেকে বেশি রাগ বুলাকিরই উপর। সেও ছেলেদের দলে! ভোলা আমার হাত থেকে সব কেড়ে নিল আর সে বসে বসে দেখল। মুখ দিয়ে একথাটাও কি বেরোল না যে, নিয়ে যাচ্ছে তো যেতে দে না! ছেলেরা এটা না বুঝতে পারে যে আমি কতটা পরিশ্রম করে এই সংসার গড়ে তুলেছি, কিন্তু সে তো জানে। দিনকে দিন বলে আর রাতকে রাত বলে জানিনি। ভাদ্র মাসের অন্ধকারে রাতে মাচা বেঁধে জোয়ারের খেত পাহারা দিয়েছি। জ্যৈষ্ঠ-বৈশাখ মাসের দুপুরেও বিশ্রাম নিইনি। আর আজ আমার নিজের ঘরে ইচ্ছে করলে কাউকে ভিক্ষে দেওয়ার অধিকারটুকুও আমার নেই। মানলাম যে এতটা পরিমাণ ভিক্ষে কেউ দেয় না, কিন্তু এদের তো চুপ করে থাকাই উচিত ছিল। আমার ঘরে তো আমি আগুনও লাগিয়ে দিতে পারি, কার কী বলার আছে! তাছাড়া আইনেও তো আমার কিছুটা প্রাপ্য হয়। আমার ভাগেরটা আমি না খেয়ে যদি অন্যের পেট ভরাই — এতে কার বাপের কী? উনি এখন এসেছেন মানভঞ্জন করতে। তাকে আমি কোনোদিন ফুলের ডাঁটাও ছুঁড়ে মারিনি। বলুক তো সে, এই গ্রামে কজন এমন ঘরের বউ আছে যে স্বামীর লাথিঝাঁটা খায়নি। আমি তাকে কোনোদিন চোখ রাঙিয়ে পর্যন্ত কথা বলিনি। টাকাপয়সা খরচ-খরচা সবই তার হাতেই দিয়ে রেখেছিলাম আর এখন তার থেকে পুঁজি জমিয়ে আমাকেই দেমাক দেখাচ্ছে। এখন ছেলেরাই তার বেশি আদরের। আর আমি তো এখন অকম্মা, টাকা-ওড়ানো, পয়সা জলে-ফেলা গাধা একটা। তার জন্য আমি পরোয়া করি না। যখন তার শরীর খারাপ হয়েছিল, ছেলেরা তখন ছিল না। তখন তো আমিই কোলে করে তুলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি। এখন ছেলেরা আছে, আর তিনি আছেন, তাদের মা। আমি তো বাইরের লোক; ঘরসংসার দিয়ে আমার আর কী হবে? শেষে বলল, আমি এখন খাওয়াদাওয়া করে কী করব? এখন হালও ধরি না, কোদালও চালাই না। আমাকে খাইয়ে শুধু শুধু ভাত নষ্ট করে কী হবে? রেখে দাও, ছেলেরা দ্বিতীয়বার খাবে।

বুলাকি — তুমি খুব সামান্য সামান্য কথায় চটে যাও। লোকে ঠিকই বলে যে বুড়ো বয়সে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। ভোলা তো কেবলমাত্র এই কথাই বলেছিল যে, এতটা ভিক্ষে দিও না। নাকি আর কিছু বলেছে?

সুজান — হ্যাঁ, বেচারা শুধু ওইটুকু বলেই থেমে গেল। তার ওপর ঘা কতক বসিয়ে দিলে তবেই তো তোমার মজাটা জমত। তাই নয়কী? যদি ওই সাধই থেকে থাকে তো পূরণ করে নাও। ভোলার

খাওয়া নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে, ডেকে আনো, আর ভোলাকে ডেকেই বা কী হবে, তুমিই দু-চার ঘা লাগিয়ে দাও না। ওইটুকু বাকি আছে, তাও মিটে যাক।

বুলাকি — হ্যাঁ, এখন তো বলবেই যে সেটাই মেয়েদের ধর্ম। তোমার ভাগ্য খুব ভালো যে আমার মতো সাদাসিধে বউ পেয়েছিলে। যত চাপ দিতে পার দিয়ে যাচ্ছ। সে রকম মুখরা বউ হলে তোমার ঘরে একদিনও কাটাতে পারত না।

সুজান — হ্যাঁ! সে কথা তো আমিও বলছি যে তুমি দেবী ছিলে এবং এখনও আছ। আমি তখনও রাক্ষস ছিলাম, আর এখন তো দৈত্য হয়ে গেছি। ছেলেরা উপায় করে; তাদের পক্ষে কথা বলবে না তো কি আমার হয়ে কথা বলবে? আমার সঙ্গে তোমার আর কীসের সম্পর্ক।

বুলাকি — আমি তো লোক যাতে না হাসে তার জন্য কথা কাটাকাটি এড়িয়ে চলতে চাই আর তুমি ঝগড়া করার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছ। এখন উঠে ভালোয় ভালোয় খেয়ে নেবে তো নাও, নইলে আমি শুয়ে পড়ি গিয়ে।

সুজান — তুমি কেন না খেয়ে থাকবে? তোমার ছেলেদের উপার্জনের টাকা তো। হ্যাঁ, আমি বাইরের লোক।

বুলাকি — ছেলে তো তোমারও।

সুজান — না না! অমন ছেলে আমি চাই না। ওরা অন্য কারও ছেলে হবে হয়তো। নিজের ছেলে হলে কি আমার এ দুর্গতি হয়?

বুলাকি — যদি গালমন্দ দিতে থাক তাহলে কিন্তু আমিও মুখ খুলব। এতদিন শুনতাম পুরুষমানুষ বুদ্ধিমান হয়; কিন্তু তুমি তো দেখি সব থেকে অদ্ভুত। অবস্থা বুঝে কাজ করাই তো মানুষের উচিত। আর এখন যদি তুমি আমি নামে সংসারের কর্তা হয়ে থেকে ছেলেদের পছন্দমতো কাজ করি তাহলেই আমাদের ভালো হবে। আমি তো এটা বুঝতে পেরেছি, তুমি কেন বুঝতে চাইছ না? নিয়মই হল, যে উপায় করে সংসারে কর্তৃত্ব তারই। আমি ছেলেদের জিজ্ঞেস না করে কোনো কাজ করি না, তুমি কেন নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ কর। এতদিন তো সংসারে কর্তৃত্ব করতে, এখনও কেন মায়ায় জড়িয়ে থাকছ। যা জোটে খাও, ভগবানের নাম করো আর পড়ে থাকো। নাও, খেয়ে নেবে চলো।

সুজান — তাহলে কি আমি বাড়ির কুকুর?

বুলাকি — যা বলার ছিল বলে দিয়েছি, এখন তোমার যা মন চায় বুঝে নাও।

সুজান উঠল না। বুলাকি হার মেনে উঠে গেল।

চার

সুজান এখন একটা নতুন সমস্যার সম্মুখীন হল। সে দীর্ঘদিন ধরে সংসারের কর্তা ছিল এবং এখনও নিজেকে তাই মনে করে। পরিস্থিতির যে এতটা পরিবর্তন হয়ে গেছে সেকথা তার জানা ছিল না। ছেলেরা তার সেবাযত্ন এবং সম্মান করে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা তার ছিল। ছেলেরা তার সামনে তামাক খায় না, খাটে বসে না, এসব কি তার সংসারের উপর কর্তৃত্বের পরিচায়ক নয়? এতদিন পারে সে আজকে জানতে পারল যে সেগুলো তার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হতে পারে, কিন্তু সংসারের কর্তৃত্বের প্রমাণ নয়। সে কি শ্রদ্ধার বদলে তার কর্তৃত্বের অধিকার ছেড়ে দিতে পারে? কখনও নয়।

আজ পর্যন্ত যে সংসারে সে আধিপত্য করে এসেছে, সেখানে সে অধীন হয়ে থাকতে পারবে না। সে সেবাযত্নের কাঙাল নয়, অমন শ্রদ্ধাও তার চাই না। তাঁর অধিকারের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এই সংসারে অন্য কারও কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মন্দিরের পুরোহিত হয়ে জীবন কাটাতে সে পারবে না।

কে জানে রাত তখনও কতটা বাকি ছিল। সুজান উঠে বলদগুলোর জন্য দা দিয়ে খড় কুচোতে শুরু করল। গোটা গ্রাম তখন নিদ্রামগ্ন। কিন্তু সুজান বিচুলি কেটে চলেছে। জীবনে এতটা পরিশ্রম সে কখনও করেনি। যেদিন থেকে সে কাজ করা ছেড়েছে, সেদিন থেকেই গোরুর জাবনা কাটা নিয়ে খিটমিট লেগেই আছে। শংকর জাবনা কাটে, ভোলাও কাটে, তবুও জাবনা পুরো হয় না। আজ সে ছোঁড়া দুটোকে দেখিয়ে দেবে জাবনা কী করে কাটতে হয়। কাটতে কাটতে তার সামনে কাটা খড়ের পাহাড় জমে গেল। আর প্রতিটি টুকরোই এমন মিহি এবং সুগোল হল যে দেখে মনে হয় যেন একটা ছাঁচে ফেলে কাটা হয়েছে।

শুকনো মুখে বুলাকি ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে কাটা খড়ের স্তূপ দেখে অবাক হয়ে গেল। বলে উঠল, ভোলা কাল সারারাত ধরে খড় কেটেছে নাকি? কতবার বলেছি, বাবা, বেঁচে থাকলে তবেই তো ভোগ করতে পারবে। কিন্তু সে কিছুতেই শুনবে না। রাতে বোধহয় ঘুমোতেই যায়নি।

সুজান একটু ব্যঙ্গ করে বলল, ও আর কবেই বা ঘুমোয়? যখনই দেখি কাজই করছে। এতখানি কাজের লোক সংসারে আর কেই বা আছে?

এরই মধ্যে ভোলা চোখ কচলাতে কচলাতে বের হয়ে এল। সেও খড়ের স্তূপ দেখে অবাক হয়ে গেল। মাকে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, শংকর রাত থাকতেই উঠেছে নাকি, মা?

বুলাকি — ও তো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আমি তো ভাবলাম তুইই কেটে রেখেছিস।

ভোলা — আমি তো বাপু অত সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারি না। সারাদিন যতটা পরিশ্রম দরকার করতে পারি, কিন্তু রাতে উঠে কাজ করতে পারব না।

বুলাকি — তাহলে কি তোর বাবা কেটে রাখল?

ভোলা — হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। সারারাত শোয়নি পর্যন্ত। আমার কাল খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আরে! বাবাতো হাল নিয়ে চলেছে দেখছি। প্রাণটা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নাকি?

বুলাকি — এ রাগ তো তার বরাবরের। এখন আর কারও কথা শুনবেনা।

ভোলা — শংকরকে জাগিয়ে দাও। আমিও তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে হাল নিয়ে মাঠে যাই।

যখন অন্যান্য কিষানদের সঙ্গে ভোলা হাল নিয়ে মাঠে গিয়ে হাজির হল, সুজান ততক্ষণে অর্ধেক খেত চষে ফেলেছে। ভোলা চুপচাপ কাজ শুরু করে দেয়। সুজানকে কিছু বলতেও তার সাহসে কুলোয় না।

দুপুর হল। অন্য সব কিষান চাষ বন্ধ করে হাল ছাড়ল। কিন্তু সুজান নিজের কাজে মগ্ন হয়ে রইল। ভোলা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার বারবার ইচ্ছে হচ্ছিল যে বলদগুলোকে হাল থেকে খুলে দেয়, কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারল না। খালি ভাবতে লাগল, বাবা এত পরিশ্রম কী করে করছে। শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলল, বাবা, দুপুরতো হয়ে গেল। এবার হাল খুলে দিই?

সুজান — হ্যাঁ, খুলে দেওয়া যাক। তুমি বলদগুলো নিয়ে বাড়ির দিকে এগোও। আমি আলটা কেটেই আসছি।

ভোলা — আমি সন্ধেবেলায় আল কেটে দেব।

সুজান — তুমি কেটে দিলেই হয়েছে আর কী। এতদিন দেখোনি জমিটা কড়াইয়ের মতো গর্ত হয়ে গেছে। সেজন্য জমির মধ্যে জল জমে থাকছে। বাড়ির পাশের এই জমিটায় বিঘায় বিশ মন ফসল ফলার কথা। তোমরা তো সবাই মিলে এর সর্বনাশ করেছ।

বলদগুলোকে হাল থেকে খুলে দেওয়া হল। বলদ নিয়ে ভোলা বাড়ি গেল, কিন্তু সুজান আলগুলো কেটে বাঁধতে লাগল। আধঘণ্টা পরে আলটাল কেটে বাড়িতে ফিরল। কিন্তু ক্লান্তির কোনো নামগন্ধ নেই। স্নানখাওয়া করার পর বিশ্রাম করার বদলে সে বদলগুলোকে ডলাই মলাই করতে শুরু করল। তাদের পিঠ ডলে দিল, পা টিপে দিল এবং লেজ মলে দিল। আদর পেয়ে বলদগুলোর লেজ খাড়া হয়ে ওঠে। সুজানের কোলে মাথা রেখে তারা পরম সুখ উপভোগ করতে থাকে। অনেক অনেক দিন পর এই সুখের স্বাদ তারা পেল। ওদের চোখে উপচে পড়তে থাকল কৃতজ্ঞতা। মনে হচ্ছিল যেন ওরা বলছে, তোমার সঙ্গে আমরা রাতদিন কাজ করতে রাজি আছি।

অন্য কিষানদের মতো ভোলা একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল। সুজান ততক্ষণে আবার হাল তুলে নিয়ে জমির দিকে চলা শুরু করল। বলদদুটো উৎসাহ ভরে দৌড়ে খেতের দিকে যাচ্ছিল, যেন ওদের নিজেদেরই তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। ভোলা চালাঘরে শুয়ে দেখল যে তার বাবা হাল নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। কিন্তু সে উঠতে পারল না। তার আর ক্ষমতায কুলোচ্ছিল না। সে নিজে কখনও এত পরিশ্রম করেনি। সে তৈরি করে দেওয়া সংসার পেয়েছে। যেমন তেমন করে তাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এত দাম দিয়ে সংসারের কর্তা হওয়ার ইচ্ছে তার কখনওই ছিল না। জোয়ান ছেলেদের নানান ঝোঁক থাকে। হাসিঠাট্টা গানবাজনা করার জন্যও তো তার কিছু সময় দরকার। পাশের গ্রামে কুস্তির আসর বসেছে। এই বয়সে সে কী করে নিজেকে যেতে না দিয়ে ঘরে আটকে রাখবে। গ্রামে কোনো বরযাত্রী এসেছে, নাচগান হচ্ছে। কোনো যুবক কি সেই আনন্দ থেকে নিজে' বঞ্চিত করে রাখতে পারে! বুড়োদের তো এসব উৎপাত নেই। তাদের না আছে নাচগানের আগ্রহ, না আছে খেলাধুলার শখ, তারা কেবলমাত্র কাজই বোঝে।

বুলাকি ডেকে বলল, ভোলা! তোমার বাবা হাল নিয়ে মাঠে গেল।

ভোলা — যেতে দাও মা। আমার দ্বারা অত হবে না।

পাঁচ

সুজান ভগতের এই নতুন উৎসাহে গাঁয়ে সমালোচনার ঝড় উঠল — কী হল, ঘুচে গেল বৈরিগিপনা? যত লোকদেখানো ভড়ং। মায়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। ও তো মানুষ নয়, ভূত।

এদিকে কিন্তু ভগতজির দরজায় আবার সাধুসন্তদের ভিড় জমতে দেখা যায়। তাদের আবার আদরযত্ন হতে শুরু করেছে। আবার তার জমিতে সোনা উপচে উঠছে। গোলায় ফসল রাখার জায়গা পাওয়াই দায়। যে জমিতে অনেক কষ্ট করে পাঁচ মন ফসল পাওয়া যেত, সেই জমিতেই এখন দশ মনের থেকেও বেশি ফলন হচ্ছে।

তখন চৈত্রমাস। ফসলের খামারে সত্যযুগের সূচনা হয়েছে যেন। জায়গায় জায়গায় ফসল টাল দিয়ে রাখা আছে। এই একটা সময় যখন কৃষকেরা অল্পদিনের জন্য হলেও জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। গর্বে তাদের বুক ভরে ওঠে। সুজান ভগত টুকরিতে ফসল ভরে ভরে দিচ্ছিল, আর দুই ছেলে টুকরি নিয়ে ঘরের ভেতরে ফসল রেখে আসছিল। অনেক ভাট এবং ভিক্ষুক ভগতজিকে ঘিরে বসেছিল। এদের মধ্যে সেই ভিক্ষুকও ছিল, যাকে আজ থেকে আটমাস আগে সুজানের দরজা থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল।

হঠাৎ সেই ভিক্ষুককে দেখতে পেয়ে ভগত জিজ্ঞেস করল, কী বাবা, আজ কোথায় কোথায় ঘুরে এলে?

ভিক্ষুক — এখনও আর কোথাও যাইনি, ভগতজি। প্রথমে আপনার কাছেই এসেছি।

ভগত — আচ্ছা! তোমার সামনে যে ফসলের গাদা করা আছে, তা থেকে যতখানি উঠিয়ে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও।

ভিক্ষুক লুব্ধ চোখে টাল দেওয়া ফসলের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার হাত দিয়ে উঠিয়ে যতটা আমাকে দেবেন ততটাই নেব।

ভগত — না, তুমি যত নিতে পার উঠিয়ে নাও।

ভিক্ষুকের কাছে একটা চাদর ছিল। তার মধ্যে দশ সের মত শস্য বেঁধে তুলতে গেল। সংকোচের জন্য এর বেশি সে তুলতে পারেনি। ভগত ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, — ব্যস। এই শেষ? এ তো একজন বাচ্ছাও তুলে নিতে পারে।

ভিক্ষুক ভোলার দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বলল — এই আমার পক্ষে খুব বেশি।

ভগত — না না, তুমি সংকোচ করছ কেন? নাও নাও, আরও তোলো।

ভিক্ষুক আরও পাঁচ সের মতো তুলে নিয়ে আবার ভয়ে ভয়ে ভোলার দিকে তাকায়।

ভগত — ওর দিকে তাকিয়ে কী দেখছ, বাবাজি? আমি যা বলছি তাই করো। তুমি যতটা তুলে নিতে পার, তুলে নাও।

ভিক্ষুকের মনে একটা ভয় ছিল যে আরও বেশি নিলে ভোলা হয়ত গাঁঠরিটাই তুলতে দেবে না, আর সেটা খুব লজ্জার হবে। অন্য সব ভিক্ষুক হাসাহাসি করার সুযোগ পাবে। সবাই বলবে, ভিক্ষুকটা ভীষণ লোভী। এইসব ভেবে সে আর বেশি নিতে সাহস করল না। এবার সুজান নিজেই চাদর নিয়ে তাতে শস্য ভরতে শুরু করল। তারপর গাঁঠরি বেঁধে বলল, এটা তুলে নিয়ে যাও।

ভিক্ষুক — বাবা, আমিতো এতটা তুলতে পারব না।

ভগত — আরে, এটুকুও তুলতে পারবে না। খুব বেশি হলে এক মন হবে। আরেকবার জোরসে চেষ্টা করে দেখ তো পার কিনা।

ভিক্ষুক গাঁঠরি ধরে টানল। কিন্তু বেশ ভারি। নড়াতে পর্যন্ত পারল না। বলল, ভগতজি, এটা আমি তুলতেই পারব না।

ভগত — আচ্ছা বল, তুমি কোন গ্রামে থাক?

ভিক্ষুক — সে অনেক দূর হবে। আপনি আমোলা গ্রামের নাম বোধ হয় শুনেছেন?

ভগত — বেশ, তুমি এগিয়ে চল আমি পৌঁছে দেব।

এই বলে ভগত সর্বশক্তি দিয়ে গাঁঠরি উঠিয়ে মাথায় নিল এবং ভিক্ষুকের পিছনে পিছনে চলল। যে দেখল সেই ভগতের পৌরুষ দেখে অবাক হল। কেউ জানতে পারল না কোন নেশার প্রভাবে

ভগত তখন উজ্জীবিত। আটমাস ধরে অবিরল পরিশ্রমের ফল সে আজ পেয়েছে। ফিরে পেয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া অধিকার। যে ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কলাও কাটা যেত না, শান দেওয়ার পর তা দিয়েই আজ লোহা কাটা যাচ্ছে। মানুষের জীবনে নিষ্ঠা একটা মহৎ ব্যাপার। যার নিষ্ঠা আছে, সে বৃদ্ধ হলেও যুবকের মতো সজীব। যার মধ্যে নিষ্ঠা নেই, মর্যাদাবোধ নেই, সে যুবক হলেও মৃতপ্রায়। সুজান ভগতের নিষ্ঠা ছিল আর তা তাকে অমানুষিক শক্তি দান করেছিল। যাওয়ার সময় সে ভোলার দিকে গর্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এখানে ভাট আর ভিক্ষুক যারা এসেছে, তারা কেউ যেন খালি হাতে না ফেরে।

ভোলা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। 'হাঁ-না' কিছুই সে বলতে পারে না। বৃদ্ধ পিতার কাছে সে ভীষণভাবে হেরে গেছে।

(সুজান ভগত / ১৯২৭) অনুবাদ সৌরেন ভট্টাচার্য

অগ্নিসমাধি

সাধুসন্তদের সৎসঙ্গে খারাপ লোকও ভালো হয়ে যায়। কিন্তু পয়াগের বরাত মন্দ, তার ক্ষেত্রে এর ফল হল উলটো। গাঁজা, চরস আর ভাঙের খপ্পরে পড়ল সে। ফলে যে ছিল এক উদ্যমী, পরিশ্রমী যুবক, সে কুঁড়ের বাদশা হয়ে দাঁড়াল। জীবনসংগ্রামে আনন্দ কোথায়? বট গাছের নীচে ধুনি জ্বলছে, সেখানে বিরাজ করছিলেন এক জটাধারী মহাত্মা। তাঁকে ঘিরে ভক্তবৃন্দ বসে আছে, মুহুর্মুহু চলছে চরসের টান, মধ্যে মধ্যে ভজন গানের ব্যবস্থাও রয়েছে — খেটে খাওয়ার মধ্যে এই স্বর্গসুখ কোথায়? পয়াগের কাজ ছিলিম সাজার। অন্য ভক্তদের আশা পরলোকে গিয়ে পুণ্যফল ভোগের, কিন্তু পয়াগের বেলায় ফল একেবারে হাতে হাতে — প্রত্যেক ছিলিমের প্রথম হকদার সে-ই। সাধু-মহাত্মাদের শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবৎ-কথা শুনতে শুনতে সে একেবারে বিহ্বল হয়ে যায়, আত্মজ্ঞানশূন্য হয়ে সৌরভ, সংগীত ও উজ্জ্বলতায় ভরা যেন কোনো এক অন্য জগতে পৌঁছে যায়। সেইজন্যেই রাত দশটা-এগারোটা বেজে যাবার পর যখন তার স্ত্রী রুক্মিন ডাকতে আসে, কঠিন বাস্তবের নিষ্ঠুর উপলব্ধি হয় তার, সংসারকে মনে হয় কণ্টকে পরিপূর্ণ এক অরণ্যের মতো। বিশেষত যখন ঘরে ফিরে দেখে উনুনে আঁচ পড়েনি অথচ দানাপানির কিছু একটা বন্দোবস্ত না করলেই নয়।

সে জাতিতে ছিল ভর, কাজেই চৌকিদারি সে তার জাতিগত অধিকার হিসেবেই পেয়েছিল। এতে দুটাকা কয়েক আনা বেতন ছাড়াও ইউনিফর্ম এবং পাগড়ি মেলে। কাজের মধ্যে সপ্তাহে একদিন থানায় যাওয়া, অফিসারদের ঘরগুলো ঝাড়পোঁছ করা, আস্তাবল সাফ করা আর রান্নার কাঠ চেলা করা। দাঁতে দাঁত চেপে এসব কাজ করে সে, কেননা অবজ্ঞা — সে শারীরিকই হোক অথবা মানসিকই হোক — তার কাছে অসহ্য। নিজের মনকে সে নিজেই সান্ত্বনা দেয় — চৌকিদারির কাজ বলতে তো এইটুকুই; মাসে মাত্র চার দিন কাজ করে দুটাকা কয়েক আনা পয়সা তো নেহাৎ কম নয়। এছাড়াও গ্রামে বড়োলোকদের উপর না হলেও গরিবদের উপর বেশ দাপট আছে। বেতন-বৃত্তি যা পায় মহাত্মাদের সংসর্গে আসার পর তার সবই হাত খরচের বড়াই দেখাতেই উবে যায়। ফলে জীবিকার প্রশ্নটা দিন দিনই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

সৎসঙ্গে ভেড়বার আগে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই গ্রামে দিনমজুরি করত। রুক্মিন কাঠকুটো কেটে বাজারে বেচত। পয়াগ কখনও করাত টানত, কখনও হাল চষত, কখনও বা কুয়োর জল তুলে জমিতে জল সেচত। হাতের কাছে যে কাজই পেত লেগে পড়ত। হাসিখুশি, পরিশ্রমী, আমোদপ্রিয় এবং নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ পয়াগ। এ রকম লোকেরা কখনও অনাহারে মরে না। উপরন্তু সে এত বিনয়ী ছিল যে, কোনো কাজে 'না' বলত না। কেউ কিছু বললে 'আচ্ছা ভাই' বলে ছুটত সে কাজে। এইসব কারণেই গ্রামে ওর একটা সুনাম ছিল। সেই সুনামের জোরেই কুঁড়েমিতে ধরার দু-তিন বছর পর্যন্ত

বিশেষ কষ্টে পড়তে হয় নি। দুবেলার আহারের কথাই যদি বলতে হয়, বড়ো বড়ো লোক যাদের উঠোনে তিন-তিন জোড়া বলদ বাঁধা থাকে, তাদেরই প্রায় তা জোটানোর সামর্থ্য থাকে না, পয়াগ তো কোন ছার। তবে হ্যাঁ, একবেলার ডালরুটি নিয়ে বিশেষ সংশয় ছিল না। কিন্তু ইদানীং সেটাও দিনের পর দিন ভীষণ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সবকিছুর উপর মুশকিল হল, যে কোনো কারণেই হোক, রুক্মিনের সেই পতিভক্তি, সেবাপরায়ণতা এবং চটপটে স্বভাব আর চোখে পড়ে না। তার বদলে দিন দিন যেমন সে মুখরা হয়ে উঠছে তেমনি বকবকানিও বেড়ে চলেছে আশ্চর্যরকম। কাজে কাজেই পয়াগের এরকম কোনো সিদ্ধিলাভের দরকার হয়ে পড়েছে যা তাকে জীবিকার চিন্তা থেকে অব্যাহতি দেবে এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে ভগবানের আরাধনা ও সাধুসন্তদের সেবায় মনঃসংযোগের সুযোগ দেবে।

একদিন রুক্মিন কাঠকুটো বিক্রি করে বাজার থেকে ফিরলে পয়াগ তাকে বলল — এই, কয়েকটা পয়সা দে তো, একটু দম লাগিয়ে আসি।

রুক্মিন মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল — দম লাগাবার এতই যদি শখ তো কাজ করতে কী হয়! আজকাল কোনো বাবাজি-টাবাজি জুটছে না যে তার কাছে গিয়ে ছিলিম সাজবে?

ভ্রূ কুঁচকে বলল পয়াগ — ভালো চাস তো পয়সা দিয়ে দে। এমনি করে জ্বালাবি তো যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। তখন কেঁদে কূল পাবি না।

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উত্তর দিল রুক্মিন — কাঁদতে আমার বয়েই গেছে। তুমি থেকেই বা কি রাজভোগটা খাওয়াচ্ছ! এখনও খেটে মরছি, তখনও খেটে মরব।

— তাহলে এই তোর শেষ কথা?

— হ্যাঁ হ্যাঁ, বললাম তো আমার কাছে পয়সা নেই।

— গয়না গড়াবার সময় পয়সা জোটে আর আমি মাত্র চারটি পয়সা চাইছি, তার এই জবাব!

ঝাঁকিয়ে উঠল রুক্মিন — গয়নাই যদি গড়াই তো তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে কেন? তুমি তো কোনোদিন একটা পেতলের আংটিও কিনে দাও নি! পয়াগ সেদিন ঘরে ফিরল না।

রাত নটা বেজে গেলে পর রুক্মিন দরজায় খিল দিল। ভাবল, নিশ্চয়ই গ্রামেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। হয়তো ভাবছে — রুক্মিন আসবে, মান ভাঙাবে; কিন্তু আমার ফিরতে বয়েই গেছে।

দ্বিতীয় দিনও যখন পয়াগ এল না, তখন রুক্মিনের ভাবনা হল। সারা গাঁ-টা খুজে এল কিন্তু কোনো আড্ডাতেই পাখির পাত্তা পাওয়া গেল না। সেদিন আর রান্নাবান্নাও চড়াল না, রাত্রে শুয়েও বহুক্ষণ চোখে ঘুম এল না তার। ভয় হতে লাগল — সত্যি সত্যিই রাগ করে কোথাও চলে গেল না তো! ভাবল, কাল সকালে উঠেই সারাটা গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজবে, নিশ্চয়ই কোনো সাধুসন্তদের আড্ডায় ভিড়ে গেছে। না পেলে থানায় রিপোর্ট করে আসবে।

খুব ভোরে উঠে সে থানায় যাবার জন্যে তৈরি হল। দরজা বন্ধ করে বেরোবে এমন সময় দেখা গেল পয়াগ আসছে। কিন্তু সে একা নয়। পেছনে পেছনে একটি মেয়েও আসছে। তার রঙচঙে শাড়ি, রঙিন চাদর, লম্বা ঘোমটা, লাজুক লাজুক হাবভাব — এই সব দেখে রুক্মিনের বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এগিয়ে গিয়ে দুহাতে সতীনকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে নিয়ে চলল, দেখে মনে হল যেন কোনো রোগী জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে গলায় বিষ ঢালল।

পড়শিদের ভিড় হালকা হলে, পয়াগকে জিজ্ঞেস করল রুক্মিন — কোত্থেকে জোটালে এটাকে?

পয়াগ হেসে উত্তর দিল — বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। ভাবলাম, নিয়ে যাই বাড়িতে থাকবে, কাজকম্মো করবে।

— মনে হচ্ছে, আমাকে নিয়ে সব সাধ মিটে গেছে!

পয়াগ আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে বলল — দূর পাগলি! একে তো তোর যত্নআত্তি করার জন্যে নিয়ে এসেছি।

— নতুন পেলে পুরোনোকে কে আর পোঁছে!

— আরে না, যার সঙ্গে মনের মিল সেই নতুন, যার সঙ্গে তা থাকে না সেই পুরোনো। নে, কটা পয়সা দে তো, তিন দিন দম দেওয়া হয়নি। পা আর সোজা পড়ছে না। আর হ্যাঁ, দু-চার দিন এই বেচারিকে একটু খাওয়াদাওয়া, তারপর নিজে নিজেই কাজে লেগে যাবে।

রুক্মিন পুরো একটা টাকা এনে পয়াগের হাতে দিল। আজ আর দ্বিতীয়বার বলার দরকার হল না।

দুই

পয়াগের আর কোনো গুণ থাক বা না থাক, এটা মানতেই হবে যে, শাসনকার্যের মূল তত্ত্বটা সম্পর্কে সে বেশ ওয়াকিবহাল। বিভেদ-নীতিকেই সে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিল।

মাসখানেক পর্যন্ত কোনোরকম অঘটন ঘটল না। রুক্মিন তার নিজের হম্বিতম্বি সব ভুলে গেল। খুব ভোরে ওঠে — কখনও কাঠকুটো ভেঙে, কখনও ঘাসপাতা কেটে, কখনও বা ঘুঁটে নিয়ে বাজারে যায় এবং সে সব বিক্রিবাটা করে যা পায় তার অর্ধেক দেয় পয়াগের হাতে, বাকি অর্ধেকে সংসার চলায়। সতীনকে সে কোনো কাজই করতে দেয় না। পড়শিদের বলে — ভাই, সতীন তো হয়েছে কী? এখনও তো নতুন বউ। দু-চার মাসও যদি একটু আরাম না পায়, কী ভাববে বলো তো! কাজকম্মো করার জন্যে আমিই তো আছি।

গাঁ-জুড়ে সবাই রুক্মিনের এই উদার স্বভাবের প্রশংসা করে, কিন্তু সাধুসঙ্গী ফন্দিবাজ পয়াগ সমস্ত ব্যাপারটাকেই তার কূটনীতির সাফল্য ভেবে মনে মনে খুশি হয়।

একদিন নতুন বউ বলল — দিদি, ঘরে বসে বসে তো হাঁপিয়ে উঠছি; আমাকেও কিছু কাজ-কম্মো দেখে দাও না।

রুক্মিন সস্নেহে বলল — কেন রে, আমার মুখে চুনকালি দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিস নাকি? ঘরের কাজ যা তাই কর, বাইরের জন্যে তো আমিই আছি।

বউয়ের আসল নাম কৌশল্যা, অপভ্রংশে তা এখন দাঁড়িয়েছে 'সিলিয়া'তে। এ এব্যাপারে সিলিয়া কোনো জবাব দিল না। কিন্তু দাসীর মতো এই জীবন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সারাদিন ঘরের কাজে খেটে খেটে মরে, কেউ একবার জিজ্ঞেসও করে না। রুক্মিন বাইরে থেকে চারটে পয়সা আনে বলেই যেন ঘরের কর্ত্রী হয়ে গেছে। সিলিয়াও এবার দিনমজুরি করবে, রুক্মিনের কর্তৃত্বের গুমোর ভাঙবে। পয়সার প্রতি পয়াগের বেশ দুর্বলতা আছে — এখবর তার কাছে আর চাপা নেই। রুক্মিন যখন ঘাস নিয়ে বাজারে চলে গেল, সিলিয়াও তখন ঘরের দোর বন্ধ করে গ্রামের হালচাল দেখতে বেরিয়ে পড়ল। গ্রামে ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, কায়স্থ, বেনে সব সম্প্রদায়ের লোকজনই বাস

করে। সিলিয়া নম্র, শান্ত, লাজুক বধূর মতো এমন এক ভান করল যা দেখে সমস্ত মেয়ে মহল একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কেউ তাকে চাল দিল, কেউ ডাল, কেউ বা অন্য কিছু। নতুন বউকে কে না আদর-আপ্যায়ন করে। প্রথম বেরিয়েই সিলিয়া জানতে পারল গাঁয়ে একজন আটা পেষার লোক দরকার এবং এটা এমন এক দরকার যা মেটানো তার পক্ষেও সম্ভব। যখন সে ঘরে ফিরল দেখা গেল তার মাথায় এক ঝুড়ি গম।

এক প্রহর রাত বাকি থাকতেই আটা পেষার শব্দ শুনে পয়াগ রুক্মিনকে বলল — আজ তাহলে সিলিয়া এখন থেকেই পিষতে লেগেছে!

রুক্মিন বাজার থেকে আটা এনেছিল। গম এবং আটার দামের মধ্যে বিশেষ তফাত নেই। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবল রুক্মিন, এত ভোরে সিলিয়া তাহলে কী পিষছে? উঠে ঘরের মধ্যে গেল; দেখল সিলিয়া অন্ধকারের মধ্যে বসে বসে কী যেন পিষছে। সিলিয়ার হাত চেপে ধরল বুক্মিন। ঝুড়িটা তুলে নিয়ে বলল — কে তোকে পিষতে বলেছে এসব? কার গম পিষছিস?

বেশ দ্বিধাহীন ভাবেই উত্তর দিল সিলিয়া — তুমি গিয়ে আরাম করে ঘুমোও না। আমি পিষছি তো তোমার কী ক্ষতি হচ্ছে? জাঁতার ঘড় ঘড় শব্দ কি অসহ্য লাগছে? দাও, ঝুড়ি দিয়ে দাও। বসে বসে আর কদ্দিন খাব; দুমাস তো হয়ে গেল।

— আমি তো তোকে কিছু বলিনি।

— তুমি বলো আর না বলো, আমার নিজেরও তো ধম্মাধম্ম জ্ঞান আছে।

— তুই এখনও এখানকার লোকদের চিনিস না। আটা পিষতে দিতে সবারই ভালো লাগে, কিন্তু পয়সার বেলাতেই কান্না পায়। বলতো কার গম, সকালে গিয়েই তার মাথায় ঢেলে আসব।

সিলিয়া বুক্মিনের হাত থেকে ঝুড়ি ছিনিয়ে বলল — পয়সা দেবে না মানে? আমি কি বেগার খাটি নাকি?

— তাহলে কথা শুনবি না?

— না, তোমার দাসী হয়ে থাকব না।

এইসব বাগ্‌বিতন্ডা শুনে পয়াগও এসে হাজির হল। বুক্মিনকে বলল — কাজ করতে চাইছে তবু বাধা দিচ্ছিস কেন? জীবনভোর কি কনেবউ সেজে থাকবে নাকি? দুমাস তো হয়ে গেল।

— তোমার আর কী? নাক তো আমারই কাটা যাবে।

সিলিয়া বলে উঠল — কেন আমাকে কি কেউ বসিয়ে খাওয়াচ্ছে নাকি? ধোওয়া-মোছা, বাসন মাজা, ঝাঁটপাট, রান্নবান্না, জল তোলা, বাটনা বাটা, কুটনো কোটা — কে করে এসব? জল টানতে টানতে হাতে কড়া পড়ে গেছে। আমি পারব না আর এসব করতে।

পয়াগ — তা হলে তুইই বাজারে যাস্। ঘরের কাজ থাক, বুক্মিন করে নেবে।

বুক্মিন আপত্তি করল — এরকম কথা মুখে আনতে লজ্জা করল না তোমার। তিন দিনের বউ বাজারে ঘুরবে, লোকে কী বলবে?

আগ বাড়িয়ে উত্তর দিল সিলিয়া — কী বলবে লোকে! আমি কি কিছু খারাপ কাজ করতে যাচ্ছি নাকি?

ডিক্রি পেয়ে গেল সিলিয়া। কর্ত্রীত্ব হাতছাড়া হল বুক্মিনের।

সিলিয়াই হয়ে উঠল শাসনকর্ত্রী। জোয়ান মেয়ে। গম পেষা শেষ করেই দৌড়োয় ঘাস কাটতে। ঘাস কাটার বহর দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। বোঝা এত ভারী হয় যে তুলতেই কষ্ট হয়। যেসব পুরুষদের ঘাস কাটায় সুনাম ছিল তাদের সঙ্গেও বাজি ধরে হারিয়ে দিল সে। ঘাসের বোঝাটা বারো আনায় বিক্রি করে সিলিয়া তাই দিয়ে আটা, ডাল, তেল, নুন, তরিতরকারি, মশলাপাতি সব কিনেও চার আনা পয়সা বাঁচাল। বুব্বিন ভেবে রেখেছিল, সিলিয়া নিশ্চয়ই বাজার থেকে দু-চার আনা পয়সা আনবে। তখন সে তাকে খুব বকবে এবং পরের দিন থেকে নিজেই আবার বাজারে যাবে। আবার তার রাজ্য তার হাতে ফিরে আসবে। কিন্তু এত সব জিনিসপত্র দেখে তার চোখ কপালে উঠল। পয়াগও খেতে বসে নানারকম মশলাপাতি দিয়ে রান্না তরকারির খুব সুখ্যাতি করল। বলল, কয়েক মাসের মধ্যে এমন সুস্বাদু রান্না তার কপালে জোটে নি। খুব খুশি সে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে বাইরে আসতেই দেখল সিলিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করল — আজ কত পয়সা পেয়েছিস?

— বারো আনা।

— সবটাই খরচা করেছিস? কিছু বাঁচলে দে তো।

সিলিয়া বাড়তি চার আনা পয়সা পয়াগের হাতে দিল। পয়াগ পয়সাগুলো নাচাতে নাচাতে বলল — তুই তো আজ রাজা করে দিলি। বুব্বিন তো দু-চার পয়সা দিয়েই বিদেয় করে দিত।

— আমার তো আর পয়সা পুঁতে রাখার অভ্যেস নেই। পয়সা খাওয়াদাওয়ার জন্যেই, পুঁতে রাখার জন্যে নয়।

— এখন থেকে তুইই বাজারে যাবি। বুব্বিন ঘরের কাজকর্ম করবে।

তিন

সিলিয়া আর বুব্বিনের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে গেল। সিলিয়া পয়াগের উপর নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে লাগল। গভীর রাত থেকেই আটা পিষতে শুরু করে, সকাল হতে না হতেই ঘাস কাটতে ছোটে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বাজারের পথ ধরে। বাজার থেকে ফিরে এসেও শুয়েবসে থাকে না। কখনও দড়ি পাকায়, কখনও রান্নার কাঠ ভাঙে। বুব্বিন সব সময়েই সিলিয়ার কাজে খুঁত ধরে। অবসর সময়ে সেও গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয় এবং গাঁ-ঘরে তা বেচে। এতে পয়াগের হল পোয়াবারো। দুই স্ত্রীই স্বামীর ভালোবাসার সিংহভাগ পাবার জন্যে সবরকমেই চেষ্টা চালাতে লাগল। দুজনেই যথাসাধ্য বেশি বেশি করে পয়সা দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু সিলিয়া নিজের জায়গাটাকে এমন মজবুত করে নিয়েছে যে সেখান থেকে তাকে নড়ালেও নড়ে না। ফলে, শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে গেল।

একদিন সিলিয়া এক বোঝা ঘাস নিয়ে ঘেমে নেয়ে বাড়িতে ঢুকল। ফাল্গুন মাস। রোদের ভীষণ তাপ। সে ভাবল — একেবারে চানটান সেরে বাজারে যাব। ঘাসের বোঝাটা দরজার কাছে রেখেই পুকুরে গেল নাইতে। এই সুযোগে বুব্বিন কিছু ঘাস বের করে নিয়ে পাশের বাড়িতে লুকিয়ে রেখে এল এবং বোঝার দড়িটা আলগা করে আগের মতো সমান করে দিল। সিলিয়া নেয়েটেয়ে ফিরে এল, তার মনে হল ঘাস কিছু কম। বুব্বিনকে সে জিজ্ঞেস করল। বুব্বিন বলল — আমি জানি না। সিলিয়া তখন গালিগালাজ শুরু করে দিল — যে আমার ঘাস ছুঁয়েছে তার সারাগায়ে পোকা হোক,

তার বাপ-ভাই মরুক, তার চোখ অন্ধ হোক। বুক্সিন কিছুক্ষণ পর্যন্ত কথাগুলো হজম করল কিন্তু শেষে তার মাথায় খুন চড়ে গেল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দু-তিন থাপ্পড় কষিয়ে দিল সিলিয়াকে। সিলিয়া বুক চাপড়ে কান্না জুড়ে দিল। দেখতে দেখতে পাড়াপড়শি সব এসে জড়ো হয়ে গেল। সিলিয়ার বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মপটুতায় গাঁয়ের সকলের চোখ টাটাতো। কেন সিলিয়া সকলের চেয়ে বেশি ঘাস কাটে, কেন সকলের চেয়ে বেশি কাঠ আনে, কেন অত ভোরে ওঠে, কেন অত বেশি পয়সা কামায় — এই সব নানা কারণে সে প্রতিবেশীদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হল। সবাই তার নিন্দামন্দ করতে লাগল। একমুঠো ঘাসের জন্যে এত হাঙ্গামা, এই কটা ঘাস তো লোকে ঝেড়েই ফেলে দেয়। ঘাস তো নয় যেন সোনা! তোর তো এটুকু ভাবা উচিত ছিল, সত্যিই যদি কেউ নিয়ে থাকে সে তো তোর গাঁ-ঘরেরই লোক। বাইরে থেকে তো আর কেউ চুরি করতে আসে নি। এত যে গালাগালি দিলি, কাকে দিলি! তোর পড়শিদেরই তো দিলি!

ঘটনাচক্রে সেইদিনই পয়াগকে থানায় যেতে হয়েছিল। সন্ধেবেলা একেবারে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে সিলিয়াকে বলল — নে, কিছু পয়সা দেতো, একটু দম লাগিয়ে আসি, সারাদিনে দম একেবারে নিক্‌লে গেছে।

সিলিয়া পয়াগকে দেখেই মড়াকান্না জুড়ে দিল। পয়াগ ঘাবড়ে গিয়ে বলল — কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন? কেউ কি মারা-টারা গেছে? তোর বাড়ি থেকে কেউ এসেছিল না কী?

—আমি আর এখানে থাকব না,বাপের বাড়ি চলে যাব।

—আরে মুখ থেকে কিছু খসা। হয়েছেটা কী? গাঁয়ের কেউ কি তোকে গালমন্দ করেছে? কে করেছে বলতো। তার ঘর পুড়িয়ে দেব, এখান থেকে চালান দিয়ে দেব।

সিলিয়া কাঁদতে কাঁদতে সব কথাই বলল। পয়াগকে আজ থানায় ধরে পিটিয়েছিল বাবুরা। সিলিয়ার কথা শুনেই তার সারা গায়ে আগুন জ্বলে উঠল। বুক্সিন জল আনতে গিয়েছিল। ঘরে ফিরে ঘড়াটা তখনও মাটিতে রাখেনি, পয়াগ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। মারতে মারতে প্রায় দম বার করে ছাড়ল। বুক্সিন মারের জবাবে গালাগালি শুরু করে দিল আর পয়াগ প্রত্যেক গালির সঙ্গে সঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পেটাতে লাগল। বুক্সিনের হাঁটু ছড়ে গেল, চুড়ি ভেঙে গেল। সিলিয়া থেকে থেকে ফুট কাটতে লাগল — আহা, কী সুন্দর চাউনি, কী সুন্দর বচন। এমন মেয়েছেলে কোনোদিন দেখিনি। কে বলবে মেয়েছেলে। ডাইনি। মুখের যদি এতটুকুও লাগাম থাকে! বুক্সিনের কানে যেন এসব কথা ঢুকছেই না। ওর সমস্ত শক্তি যেন পয়াগকে শাপশাপান্ত করতে ব্যস্ত। পয়াগ ওকে পেটাতে পেটাতে হাঁপিয়ে উঠেছে, কিন্তু বুক্সিনের জিভে এতটুকুও ক্লান্তি নেই। কেবল একই কথা আওড়ে চলেছে — তুই মর, তুই গর্তে ঢোক, মা কালী তোর মুণ্ডু চিবোক, তোর মৃগী হোক। পয়াগ থেকে থেকে ক্রোধে জ্বলে উঠছে আর এসে দু-চার লাথি কষিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বুক্সিনের যেন কোনো আঘাতই লাগছে না। একই জায়গায় বসে আছে, একটু নড়ছে না পর্যন্ত। মাথার চুলগুলো আলুথালু করে মাটিতে বসে একই কথা মন্ত্রের মতো জপে চলছে। কণ্ঠস্বরে কোনো ক্রোধ নেই। কেবল উন্মত্ততার স্রোত বইছে। সমস্ত মনপ্রাণ যেন ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে।

চোখের জল যেমন নীরবে বেরিয়ে আসে, অন্ধকার নামলে বুক্সিনও তেমনি নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিলিয়া রান্না করছিল। সে ওকে যেতে দেখল, তবু কিছু বলল না। দরজার কাছে পয়াগ বসে গাঁজা টানছিল, সেও কিছু বলল না।

চার

ফসল পাকতে শুরু করলে দেড়-দু মাস পয়াগকে জোতের সব কিছু দেখাশোনা করতে হয়। কৃষকদের কাছ থেকে লাঙল পিছু কিছু ফসল সে পায়। মাঘ মাসেই জোতের মধ্যে কিছুটা জায়গা সাফসুফ করে কুঁড়ে তৈরি করে নেয়। রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে, আগুন-গাঁজা-তামাক-চরস ইত্যাদি সব নিয়ে গিয়ে কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। চৈত্রের শেষ পর্যন্ত প্রায় এইরকমই চলে। এখন সেই সময়। ফসল পেকে তৈরি হয়ে গেছে। দু-একদিনের মধ্যেই কাটা শুরু হবে। পয়াগ প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত বুদ্ধিনের জন্যে অপেক্ষা করল। শেষে ভাবল, নিশ্চয়ই গাঁ-ঘরের কারও বাড়িতে শুয়ে আছে। খাওয়াদাওয়া সেরে লাঠিটা হাতে নিয়ে যাবার সময় সিলিয়াকে বলল — দোরটা বন্ধ করে দে। বুদ্ধিন এলে খুলে দিস আর বুঝিয়েসুঝিয়ে কিছু খাওয়াস। তোর জন্যে আজ এতবড়ো একটা ঝড় বয়ে গেল। জানি না কেন যে আজ এত রেগে গেলাম। ওকে আমি কোনোদিন ফুল দিয়েও মারিনি। যদি আত্মঘাতী-টাতি হয় তো ঝঞ্ঝাট হবে।

সিলিয়া বলল — কে জানে আসবে কী না! আমি একা একা কী করে থাকব, আমার ভয় করছে।

—তাহলে ঘরে থাকবে কে? খালি ঘর পেয়ে কেউ যদি ঘটিবাটি চুরি করে নিয়ে যায়! ভয় কীসের? বুদ্ধিন তো ফিরে আসবেই।

সিলিয়া ভেতর থেকে দোর বন্ধ করে দিল। পয়াগও মাঠের দিকে পা বাড়াল। চরসের নেশায় দোল খেতে খেতে সে গান গাইতে শুরু করে দিল ঃ—

ঠগিনি। ক্যা নয়না ঝমকাওয়ে
কদ্দু কাট মৃদঙ্গা বনাওয়ে,
নিবু কাট মজিরা;
পাঞ্চ তরোই মঙ্গাল গাওয়ে,
নাচে বালম খিরা।
রূপা পহিরকে রূপ দিখাওয়ে,
সোনা পহির রিঝাওয়ে
গলে ডাল তুলসীকে মালা,
তিন লোক ভরমাওয়ে।
ঠগিনি!

সীমানার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ তার চোখে পড়ল সামনের দিকে কে যেন আগুন জ্বালিয়েছ। মাঝে মাঝে তার থেকে আগুনের হলকা উঠছে। সে চিৎকার করে উঠলো — কে, কে ওখানে? কে ওখানে আগুন জ্বালায়?

উপরে উঠতে উঠতে আগুন নিজেই তার লেলিহান জিহ্বা দিয়ে সে কথার উত্তর দিল।

পয়াগ যখন বুঝতে পারল আগুন তার কুঁড়েতেই লেগেছে, তার বুক টিপটিপ করতে লাগল। এই কুঁড়েতে আগুন লাগানো আর কোনো তুলোর গাদায় আগুন লাগানো একই কথা। হাওয়া বইছে। কুঁড়ের চারধারেই মাত্র হাতখানেক দূরত্বে পাকা ফসল চাদরের মতো বিছানো। রাতেও তার সোনালি রঙ ঝিলিক দিচ্ছে। আগুনের একটা ঝাপটা, এমন কী ছোট্ট একটা ফুলকিও সমস্ত

জোতটাকে ছাই করে দেবে। এই জোতের গায়ে অন্য গাঁয়ের জোত আছে। সেগুলোও সব জ্বলে পুড়ে যাবে। হায়! আগুনের দাপট ক্রমেই বাড়ছে। আর দেরি করার সময় নেই। পয়াগ ওখানেই টিকে-কলকে ছুঁড়ে ফেলে, লোহা বাঁধানো লাঠিটা কাঁধে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে কুঁড়ের দিকে দৌড় লাগাল। আল ধরে গেলে ঘুরপথ হয়ে যায়, তাই খেতের মধ্যে দিয়েই দৌড়চ্ছে। আগুন ক্রমে ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতর হয়ে উঠছে, সেই সঙ্গে পয়াগের পাও দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। কোনো তেজি ঘোড়াও এসময় তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। নিজের গতিতে সে নিজেই অবাক হল। পা যেন মাটিতে পড়ছেই না। চোখ দুটো কুঁড়ের দিকে একেবারে স্থির। ডাইনে-বাঁয়ে কিছুই নজরে আসছে না। একাগ্রতা যেন তার পায়ে ডানা লাগিয়ে দিয়েছে। না তার দম ফুরোচ্ছে, না তার ক্লান্তি আসছে। দু মিনিটেই সে তিন-চার ফারলং রাস্তা অতিক্রম করে কুঁড়ের কাছে এসে পৌঁছোল।

কুঁড়ের আশে পাশে কেউ নেই। কে একাজ করেছে, তা ভাববার সময় এটা নয়, খোঁজার কথা তো দূরের ব্যাপার। পয়াগের সন্দেহ হল বুদ্ধিনের উপর। কিন্তু এটা মাথাগরম করারও সময় নয়। আগুনের শিখাগুলি দুষ্টু ছেলেদের মতো তামাশা শুরু করেছে — কখনও এ ওর গায়ে ধাক্কা ধাক্কি করছে, কখনও ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আবার কখনও বাঁদিকে। মনে হচ্ছে এক ঝাপটায় যখন-তখন খেতের মধ্যে ঢুকে পড়বে। আগুন যেন প্রচণ্ড উদ্যমে খেতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, একবার ব্যর্থ হলে পুনর্বার দ্বিগুণ বেগে লাফ দিচ্ছে। কেমন করে নিবে এ আগুন! লাঠি দিয়ে পিটিয়ে নেবাবার মতো অবস্থায় নেই, সে চেষ্টা করাও বোকামি। তাহলে কী করা যায়! ফসল পুড়ে গেলে গ্রামের লোকের কাছে কেমন করে মুখ দেখাবে সে। ইস্, গাঁয়ে তা বদনাম রটে যাবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। এর বেশি আর ভাবতে পারল না সে। গোঁয়ার লোকের মাথায় বেশি ভাবনাচিন্তা আসে না। পয়াগ লাঠিটা বেশ শক্ত করে বাগিয়ে ধরে জোরসে এক লাফ মারলো আগুনের মধ্যে, একেবারে কুঁড়ের দরজার সামনে। জ্বলন্ত কুঁড়েটাকে লাঠির ডগা দিয়ে মাথার উপর তুলে ধরল। সবচেয়ে চওড়া আলটা ধরে গাঁ-মুখো ছুটতে শুরু করল। দেখে মনে হল যেন কোনো অগ্নিযান হাওয়ায় উড়তে উড়তে চলেছে। ফুলের পাপড়ির মতো আগুনের টুকরোগুলো গায়ের উপর পড়ছে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল পর্যন্ত নেই। একবার একমুঠো আগুন হাতের উপর খসে পড়ল। সারাটা হাত ঝলসে গেল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যেও পা থামল না, হাত কাঁপল না। হাত কেঁপে ওঠা মানেই খেতের সর্বনাশ। না, পয়াগের কাছ থেকে সেরকম কোনো ভয় নেই। ভয় একটাই, কুঁড়েটার ঠিক মাঝখানে যেখানে লাঠির ডগা দিয়ে কুঁড়েটাকে তুলে ধরেছে, সে জায়গাটা যদি পুড়ে যায়, আগুনের কবরে চাপা পড়বে পয়াগ। পয়াগ জানে সেটা। তাই সে হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে। চার ফারলং-এর দৌড়। মৃত্যু আগুনের রূপ নিয়ে খেলা করছে পয়াগের মাথার উপর, গাঁয়ের ফসলের উপর। পয়াগের গতি এত দ্রুত যে আগুনের মুখ এখন পিছন দিকে এবং তার দহন-শক্তির বেশির ভাগই ফুরিয়ে যাচ্ছে বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে। তা যদি না হত, এতক্ষণ কুঁড়ের মাঝখানটাতে আগুন পৌঁছে যেত এবং হাহাকার পড়ে যেত। এক ফারলং অতিক্রান্ত হয়েছে। পয়াগের পরাক্রম পরাজয় স্বীকার করেনি। দু ফারলংও শেষ হল। সাবধান পয়াগ, সামনের দু ফারলং আরও কষ্টের। পায়ে যেন মুহূর্তের জন্যেও শিথিলতা না আসে। আগুন লাঠির মাথায় গিয়ে পৌঁছেছে। এবার তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। মৃত্যুর পরেও তোমার বরাতে কু-কথা জুটবে। অনন্তকাল ধরে তুমি অভিশাপের আগুনে জ্বলতে থাকবে। ব্যস,

আর এক মিনিট। আর মাত্র দুটো খেত। সর্বনাশ। লাঠির ডগা উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কুঁড়ে নীচের দিকে হড়কাচ্ছে, আর কোনো আশা নেই। পয়াগ প্রাণ তুচ্ছ করে দৌড়োচ্ছে। শেষ খেতের ধারে পৌঁছে গেছে। আর মাত্র দু সেকেন্ডের ব্যাপার। বিজয় তোরণ আর মাত্র বিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। ওদিকে স্বর্গ, এদিকে নরক। কিন্তু না, কুঁড়েটা হড়কাতে হড়কাতে পয়াগের মাথার উপর এসে পড়ল। এখনও পয়াগ ইচ্ছে করলে ওটাকে ফেলে দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে। না; ওর কাছে এখন প্রাণের কোনো মায়া নেই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডটাকে নিয়েই ও দৌড়চ্ছে। কিন্তু আর পারল না, পা ভারসাম্য হারাল। এরপর আগুনের সেই নিষ্ঠুরতম খেলা আর চোখে দেখার মতো নয়।

হঠাৎ দেখা গেল একজন স্ত্রীলোক সামনের গাছতলা থেকে দৌড়তে দৌড়তে পয়াগের পাশে এসে দাঁড়াল। সে আর কেউ নয়, বুক্কিন। পলকের মধ্যে পয়াগের সামনে এসে মাথা হেঁট করে কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দুহাত দিয়ে কুঁড়েটাকে উঁচু করে ধরল। সেই মুহূর্তেই পয়াগ সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার সারাটা মুখ ঝলসে গিয়েছে। বুক্কিন পয়াগকে সরিয়ে নেবার জন্যে সেকেন্ডের মধ্যে খেতের ধারে এসে পৌঁছল। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই বুক্কিনের হাত পুড়ে গেল, মুখ পুড়ে গেল, কাপড়ে আগুন ধরে গেল। তখন কুঁড়ের বাইরে বেরিয়ে আসার কথা তার চিন্তাতেও এল না। কুঁড়েসমেত মাটিতে পড়ে গেল। তারপর কুঁড়েটা বেশ কিছুক্ষণ কাঁপতে থাকল। বুক্কিন হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, তবু আগুন এসে তাকে গ্রাস করে ফেলল। আগুনের সমাধির মধ্যে বুক্কিন আশ্রয় নিল।

কিছুক্ষণ পরেই পয়াগের জ্ঞান ফিরল। সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। দেখতে পেল, গাছের নীচে হিস্ হিস্ করে জ্বলছে একটা লাল আগুনের দ্যুতি। উঠে, দৌড়ে গিয়ে লাথি মেরে আগুনটা সরিয়ে দিতেই নজরে পড়ল, নীচে পড়ে রয়েছে বুক্কিনের অর্ধদগ্ধ শব। বসে পড়ে, দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল সে।

সকালবেলা গাঁয়ের লোকজন এসে পয়াগকে নিয়ে গেল তার ঘরে। সপ্তাহখানেক ধরে চিকিৎসা চলল, কিন্তু বাঁচানো গেল না। কিছুটা তো আগুনই পুড়িয়ে দিয়েছিল তার, যেটুকু বাকি ছিল শোকের আগুন নিঃশেষ করে দিল।

(অগ্নিসমাধি / ১৯২৮) অনুবাদ শচীন সরকার

শ্রীমোটেরাম শাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীমোটেরাম শাস্ত্রীকে কে না জানে। উনি সবসময় ওপরওয়ালাদের মেজাজ বুঝেই যে দিকে হাওয়া সেদিকে চলতেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি এই আন্দোলনের খুব বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এত দৌড়ঝাঁপের পরও যখন তাঁর ভাগ্য ঘুমিয়েই রইল, আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল না, আর পণ্ডিতগিরির কাজ থেকে রেহাই পেলেন না, তখন শেষকালে একটা নতুন উপায় ঠাওরালেন। বাড়ি গিয়ে ধর্মপত্নীকে বললেন,এই বুড়ো তোতাদের বুলি পড়াতে পড়াতে তো মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। এতদিন বিদ্যাদান করে কী অশ্বডিম্ব পেলুম যে ভবিষ্যতে আরও কিছু পাবার আশা থাকবে?

ধর্মপত্নী চিন্তিত হয়ে বললেন, খাওয়াপরার জন্যেও তো একটা কিছু সম্বল চাই।

মোটেরাম — তোমার দেখি পেটের চিন্তা ছাড়া কথা নেই। বলি এমন দিন আমাদের কটা আসে, যেদিন কোনো নেমন্তন্ন থাকে না? আর লোকে যত ইচ্ছে নিন্দে করুক, ছাঁদাটি আমি ঠিক বেঁধে নিয়ে আসি। আর আজকেই কি সব যজমান মরে যাচ্ছে নাকী! কিন্তু কথা হল, সারা জীবন ধরে যদি শুধু পেটের চিন্তাই করব, তাহলে অ্যাদ্দিন করলাম কী। সংসারের কিছু সুখও তো ভোগ করতে হবে। আমি ঠিক করেছি বৈদ্য হব।

বউ আশ্চর্য হয়ে বলল, বৈদ্য হবে কী করে? চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু পড়েছ নাকি?

মোটে — আয়ুর্বেদ পড়ে কচু হয়। সংসারে বিদ্যার অত মাহাত্ম্য নেই যত আছে বুদ্ধির। দু-চারটে সহজ সরল কায়দা আছে। ব্যস, আর কিছু চাই না। আজই আমার নামের আগে 'ভিষগাচার্য' কথাটা জুড়ে দেব, কে আর জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে আমি ভিষগাচার্য কী না। কার কী গরজ পড়েছে যে আমার বিদ্যে পরীক্ষা করবে। একটা বেশ বড়ো সাইনবোর্ড তৈরি করিয়ে নেব, তাতে লেখা থাকবে — 'এখানে স্ত্রী-পুরুষের গুপ্তরোগের চিকিৎসা বিশেষ যত্নের সঙ্গে করা হয়।' দু-চার পয়সার হরতুকি-বয়রা-আমলকি কুটে বেছে রেখে দেব। ব্যস, এই কাজের জন্য এটুকু মালমশলাই যথেষ্ট। হ্যাঁ, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব আর নোটিশ বিলি করব; তাতে লঙ্কা মাদ্রাজ রেঙ্গুন করাচি এইসব দূরের জায়গার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের চিঠিপত্র ছাপানো হবে। এঁরা সব আমার চিকিৎসা-কৌশলের সাক্ষী হবেন। জনতার কী দায় পড়েছে যে, তারা খোঁজখবর নিতে যাবে ওইসব জায়গায় ওইসব নামের লোক আদৌ থাকে কিনা? তারপরে দেখবে বৈদ্যগিরি কেমন চালাই।

স্ত্রী — কিন্তু না জেনে-বুঝে যে ওষুধ দেবে তাতে কোন উপকার হবে?

মোটে — কোনো উপকার যদি না হয় তো সেটা আমার দুর্ভাগ্য। বৈদ্যের কাজ ওষুধ দেওয়া। যমকে পরাস্ত করার ঠিকাদারি তো আর সে নেয়নি। আর ধরো, যত লোকের অসুখ করে সবাই তো আর মরে যায় না। আমি তো বলি যাকে কোনো ওষুধ দেওয়া হল না, বিকার শান্ত হয়ে গেলে সে নিজে নিজেই দিব্যি ভালো হয়ে যায়। আর না চাইতেই বৈদ্যও নাম-যশ পেয়ে যায়। পাঁচজন রোগীর মধ্যে একজনও যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে তার থেকে নিশ্চয়ই আমার নামডাক ছড়াবে। আর বাকি যে চারজন মারা যাবে তারা আমার নিন্দে করতে আসবে থোড়াই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এর থেকে ভালো কাজ আর নেই। লেখাটেখা তো আসেই আমার, কবিত্বও করতে পারি — কাগজে আয়ুর্বেদ মহত্ত্বের ওপর দু-চারটে প্রবন্ধ লিখে দেব আর তাতে এখানে সেখানে দু-চারটে কবিতা জুড়ে দেব। লিখবও একটু রসালো ভাষায়। তারপর দেখো কত পাখি এসে ফাঁদে ধরা দেয়। ভেবো না আমি এতদিন শুধু বুড়ো তোতাপাখিদের বুলি শিখিয়ে এসেছি। আমি শহরের সব সফল বৈদ্যদের কায়দা-কৌশল সব লক্ষ্য করে দেখেছি আর এতদিনে ওঁদের সফলতার মূলমন্ত্র কী, তাও জেনে নিয়েছি। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় তো একদিন তোমার পা থেকে মাথা অবধি সোনায় মুড়ে দিতে পারব।

স্ত্রী নিজের মনের উল্লাস মনে চেপে রেখে বললেন, আমি এই বয়সে আবার গয়না পরব কী গো। আর কি সে সব সাধ আছে আমার? কিন্তু আগে তো এটা বলো — তুমি ওষুধ তৈরি করতেও তো পার না। কী করে সেসব বানাবে, রসই বা কী করে তৈরি হবে — ওষুধপত্রও তো তোমার চেনা নেই।

মোটে—প্রিয়ে! তুমি বাস্তবিকই বড়ো মূর্খ। আ রে, এসব কথায় একজন বৈদ্যের কী দরকার? বৈদ্যের হাতের এক চিমটি ছাইই রস, ভস্ম, রসায়ন—যা দরকার, তা হল সামান্য ঠাটবাট, ব্যস। আর চাই একটা বেশ বড়ো ঘর; তাতে একটা মাদুর থাকবে, আর তাকের ওপর থাকবে পাঁচ-দশটা শিশিবোতল। এসব ছাড়া আর কোনো জিনিসের দরকারই নেই। আর সব কিছু বুদ্ধি নিজে নিজেই সামলে নেয়। তুমি দেখে নিও আমার সাহিত্য-মেশানো লেখার খুব প্রতিক্রিয়া হবে। তুমি তো জানই অলংকারে আমার কত জ্ঞান। আজ এই ভূমণ্ডলে তো এমন কাউকে দেখি না যে, অলংকারের বিষয় আমার সঙ্গে টক্কর লাগাতে পারে। আর এতদিন তো শুধু ঘাস কাটিনি। পাঁচ-দশজন লোক তো কাব্যচর্চা করার অছিলাতেই আমার এখানে আসা যাওয়া করবে। ব্যস, এরাই হবে আমার দালাল। ওদের মারফতই আমার কাছে রোগী আসবে। আমি আয়ুর্বেদ জ্ঞানের সাহায্যে নয়, কাব্যের নায়িকা-জ্ঞানের সাহায্যেই, অনর্গল ডাক্তারি করে যাব। তুমি খালি দেখে যাও।

স্ত্রী অবিশ্বাসের সুরে বলল, আমার তো ভয় লাগছে, এ ছাত্ররাও আবার তোমার হাত গলে পালিয়ে না যায়। তখন একূল ওকূল দুইই যাবে। তোমার কপালে এই ছেলে-ঠ্যাঙানোই লেখা আছে, চারদিক থেকে ঠোক্কর খেয়ে শেষে আবার ওই পাখি-পড়ানোই তোমায় করতে হবে।

মোটে — আর আমার যে কিছু যোগ্যতা আছে, তা তুমি বিশ্বাস করছ না কেন বলো তো?

স্ত্রী — করছি না, এইজন্যেই যে, তুমি আবার ওখানে ধূর্তামি করবে। তুমি যা নও, যা কোনোদিন হতে পারবে না, তা হতে চাও কেন? তুমি নেতা হতে পারলে না, শুধু মুখ থুবড়ে পড়ে

রইলে। তোমার ধূর্তামিই থাকে শেষ পর্যন্ত। আর এটাই আমার গায়ে জ্বালা ধরায়। আমার ইচ্ছে করে, তুমি ভালো মানুষ হয়ে থাকো। কপটতা ছেড়ে দিয়ে জীবন কাটাও। কিন্তু তুমি আমার কথা শোনই বা কবে।

মোটে — তাহলে আমার নায়িকা-জ্ঞানই আর কবে কাজে লাগাব?

স্ত্রী — কোনো জমিদারের মোসাহেবি করনা কেন? সেখানে দু-চারটে সুন্দর কবিতা শুনিয়ে দেবে আর তিনি খুশি হয়ে কিছু-না-কিছু দেবেন। এই বদ্দিগিরি করার ঢং কেন আবার।

মোটে — আমার সব এমন এমন প্যাঁচ জানা আছে যেসব বৈদ্যদের বাপঠাকুরদারাও জানে না। আর সমস্ত বৈদ্য এক-দুটাকার জন্যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়। আমি আমার ফিস্ পাঁচটাকা রাখব। তার ওপর সওয়ারিদের ভাড়া আলাদা। লোকে ভাববে নিশ্চয়ই কোনো বড়ো বৈদ্য। নাহলে এত টাকা ফিস্ হবে কেন।

মোটেরামের স্ত্রীর এবারে কিছুটা বিশ্বাস হল, বলল, এতক্ষণে তুমি একটা বুদ্ধির কথা বলছ, কিন্তু এটা জানবে, এখানে তোমার পসার জমবে না — অন্য কোনো শহরে যেতে হবে।

মোটে — (একটু হেসে) আমি কি এটুকুও বুঝি না? লখনউ-এ আড্ডা জমাব। এক বছরের মধ্যে এত পসার তৈরি করব যে, সব বৈদ্যরা ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে। আমার আরও অনেক মন্তর জানা আছে। রোগীকে দু-তিনবার না দেখে তার চিকিৎসাই করব না। আমি যতক্ষণ রোগীর ধাত ভালো করে না বুঝতে পারছি তার আগে ওষুধই দিতে পারব না। কেমন হবে বলো তো!

স্ত্রী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, হয়েছে ব'পু, এখন মানলাম তোমার কথা। আমার এখন আর কোনো সন্দেহ নেই — খুব চলবে তোমার ডাক্তারি। কিন্তু গরিবদের ওপর এই মন্তর খাটিয়ো না যেন, তাহলে কাঁচকলা জুটবে।

দুই

এক বছর পার হয়ে গেল।

ভিষগাচার্য শ্রীমোটেরাম শাস্ত্রীর জয়জয়কার পড়ে গেছে লখনউ শহরে। অলংকারের জ্ঞান তো ওঁর ছিলই। তার ওপর আবার একটু গানবাজনাও তাঁর আসত। তার ওপর আবার গুপ্ত-রোগের বিশেষজ্ঞ — রসিকের সমাদর সর্বত্র। পণ্ডিতজি রোগীদের কবিতা শোনাতেন, হাসাতেন আর বলকারক ওষুধপত্র খাওয়াতেন। আর সেইসব রইস জমিদার যাদের বলকারক ওষুধ না হলে চলত না তাঁরা পণ্ডিতজির প্রশংসার প্রাসাদ গেঁথে তুলতেন। এক বছরের মধ্যে বৈদ্যজির এমন পসার জমল যে, লখনউতে গুপ্তরোগের চিকিৎসক একমাত্র উনিই হয়ে দাঁড়ালেন। চিকিৎসাও হত গোপনে। বিলাসবতী সব বিধবা রানি আর অদূরদর্শী শৌখিন জমিদারদের মধ্যে তাঁর খুব পুজো হতে লাগল। পণ্ডিতজি কাউকে নিজের সমান ভাবতেন না।

কিন্তু ওঁর স্ত্রী ওকে বরাবর বুঝিয়ে এসেছেন যে, এইসব রানিদের ঝামেলায় পোড়ো না বাপু, শেষে কিন্তু পস্তাতে হবে।

কিন্তু হাজার বোঝালেই বা কী, যা হবার তা তো হবেই। পণ্ডিতজির উপাসক-মণ্ডলীর মধ্যে বিড়হল-এর রানিও ছিলেন। রাজাসাহেব তো স্বর্গে গেছেন, এদিকে রানিসাহেবার হয়েছিল কী

এক জীর্ণ রোগ। পণ্ডিতজি তাঁর ওখানে দিনে পাঁচ পাঁচ বার যেতেন। রানিসাহেবা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের কাছছাড়া করতে চাইতেন না। পণ্ডিতজির পৌঁছতে একটু দেরি হলে রানিসাহেবা একেবারে অস্থির হয়ে পড়তেন।

একটা মোটর সব সময়ই তাঁর দরজায় খাড়া থাকত। এখন কিন্তু পণ্ডিতজি একেবারে ভোল পালটে ফেলেছেন। আচকান পরেন, মাথায় বেনারসি পাগড়ি বাঁধেন আর পায়ে পরেন পাম্পশু। বন্ধুবান্ধবরাও তাঁর সঙ্গে মোটরগাড়িতে বসে ভোঁ ভোঁ আওয়াজে দৌড়োতেন। কয়েকজন বন্ধুকে রানিসাহেবা দরবারে চাকরিও দিয়েছিলেন। রানিসাহেবার কাছে সাক্ষাৎ ভগবানের মতো যিনি, তাঁর কথা না শুনেই বা তিনি পারেন কী করে।

বিশ্বাসঘাতক ভাগ্য আর এক ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল।

একদিন পণ্ডিতজি রানিসাহেবার ফরসা ফরসা কবজিতে এক হাত রেখে নাড়ি দেখতে দেখতে অন্য হাতে তাঁর হৃদয়ের গতি পরীক্ষা করছেন, এমন সময় কয়েকজন লোক হাতে লাঠিসোঁটা নিয়ে ঘরে ঢুকে এসে পণ্ডিতজিকে পেটাতে শুরু করল। রানিসাহেবা দৌড়ে পাশের ঘরে আশ্রয় নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন, পণ্ডিতজির ওপর লাঠি কিন্তু পড়তেই লাগল। এমনিতে পণ্ডিতজি বেশ শক্তিশালী লোক ছিলেন, সবসময় একটা গুপ্তিও রাখতেন সঙ্গে। কিন্তু যদি ভুল করে কিছু লোক তাঁকে ধরে মারতে থাকে তাহলে তিনি কী করবেন?

কখনও এর পায়ে ধরছেন কখনও ওর পায়ে ধরছেন। সবসময় মুখ দিয়ে 'হায় হায়' শব্দ বার হচ্ছে — কিন্তু সেই পাষাণহৃদয় লোকগুলোর তার ওপর বিন্দুমাত্র দয়া হচ্ছিল না। তাদের একজন একটা লাথি মেরে বলল, এই হতভাগাটার নাক কেটে নাও। আর একজন বলল, এর গালে চুনকালি লাগিয়ে ছেড়ে দাও।

তৃতীয় জন বলল, কী বৈদ্যজি মহারাজ! বলো কোনটা মঞ্জুর? নাক কাটব না মুখে চুনকালি লাগাব?

পণ্ডিত — হায় হায়, আমি শেষ হয়ে গেছি রে বাপ, আর যা ইচ্ছে করো, আমার নাকটা কেটে নিয়ো না, দোহাই।

একজন — এখন আর মরতে আসবে এখানে?

পণ্ডিত — ভুলেও আসব না, হুজুর। হায়! মরে গেলাম।

দ্বিতীয় জন — আজই লখনউ থেকে কেটে পড়ো। নইলে খুব খারাপ হবে।

পণ্ডিত — হুজুর, আমি আজই চলে যাব, এই আমি পৈতে ছুঁয়ে বলছি। আপনি আর এ শহরে আমার মুখই দেখতে পাবেন না।

তৃতীয় — আচ্ছা ভাই, তাহলে সবাই একে পাঁচটা-পাঁচটা করে লাথি কষিয়ে নাও, তারপর ছেড়ে দাও ব্যাটাকে।

পণ্ডিত — দোহাই। দয়া করুন হুজুর সব। একেবারে মরে যাব।

চতুর্থ জন — তোমার মতো পাষণ্ডদের মরে যাওয়াই তো ভালো হে। হ্যাঁ, তাহলে শুরু করো ভাইসব।

পাঁচটি করে লাথি পড়তে লাগল, সে লাথির দমাদম আওয়াজ উঠছিল। মনে হচ্ছিল যেন নাকাড়ায় ঘা পড়ছে। প্রত্যেকটা আওয়াজের সঙ্গে একবার করে 'হায়' শব্দটা শোনা যাচ্ছিল — যেন নাকাড়ার প্রতিধ্বনি।

এই পাঁচ-লাথির পূজা শেষ হলে সবাই মোটেরামকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে বের করে মোটরে চড়িয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। যাওয়ার সময় সাবধান করে দিল যেন কাল সকালের আগেই পালিয়ে যায়, নয় তো আরও এরকম চিকিৎসা জুটবে।

তিন

মোটেরামজি খোঁড়াতে খোঁড়াতে, কাতরাতে কাতরাতে লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ি পৌঁছে চারপাইয়ের ওপর ধড়াস করে পড়ে গেলেন। স্ত্রী ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, কী গো, কী হল? শরীর ভালো আছে তো! ওগো, তোমার এমন দশা কে করলে গো? হায় হায়, তোমার মুখটা কী হয়ে গেছে গো!

মোটে — হায় ভগবান! মারা গেলাম।

স্ত্রী — হ্যাঁগো, কোথায় ব্যথা করছে গো। এজন্যই বলেছিলুম বেশি বাড় বেড়ো না, বলিনি? ভাস্কর লবণ নিয়ে আসব গো?

মোটে — হায়রে! বদমাইশগুলো একদম শেষ করে দিয়েছে আমাকে। ওই চণ্ডালনির জন্যে আমার এই দুর্গতি। মারতে মারতে নাড়িভুঁড়ি বার করে দিয়েছে যে।

স্ত্রী — ও তাই বলো! পিটুনি খেয়ে এসেছ! হ্যাঁ, পিটুনিই তো দেখছি! বেশ হয়েছে। লাথি-ঝাঁটা তোমার জুটবে না তো কার জুটবে? রানির ওখানে যেতে বারণ করিনি? কিন্তু তুমি শোনার লোক কি না!

মোটে — হায় হায়! রাঁড়ি হারামজাদি, তুইও এই সময় গালাগাল শুরু করেছিস! আমার এইরকম খারাপ অবস্থা আর তুই মুখ ছোটাচ্ছিস। কাউকে বলে দে, ঠেলাটেলা নিয়ে আসুক — রাতারাতি লখনউ ছেড়ে পালাতে হবে। নয়তো সকালে আর প্রাণ বাঁচানো যাবে না।

স্ত্রী — ওমা, এখনই পেট ভরেছে নাকি তোমার! এখনও আর॰ কিছুদিন এখানকার হাওয়া খাও। দিব্যি ছেলে পড়াতে, তা নয়, বৈদ্য সাজার শখ জাগল বাপুর। চমৎকার হয়েছে, এ শিক্ষা জীবনে ভুলবে আর? সে রানি বেটি ছিল কোথায় শুনি? তুমি মার খাচ্ছিলে আর তোমায় বাঁচাতে এল না যে বড়ো?

পণ্ডিত — হায় হায়! সেই ডাইনিটা তো পালিয়ে গেছিল। এমন হবে যদি জানতাম, কে ওর চিকিচ্ছে করতে যেত?

স্ত্রী — দোষ তোমার নিজের কপালের। বৈদ্যগিরির মজা তো বুঝলে, কিন্তু যা করলে তাতে তো সর্বনাশ হয়ে গেল। শেষে আবার সেই ছেলে-ঠ্যাঙাতেই হবে। কী কপাল করেই না এসেছিলে!

সকাল বেলায় মোটেরামজির দরজায় ঠেলাগাড়ি এসে দাঁড়াল, আর তাতে সব মালপত্র বোঝাই হতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কোনো একজনেরও টিকি দেখা গেল না। পণ্ডিতজি খুব কাতরাচ্ছেন আর তার স্ত্রী মালপত্র বাঁধাছাঁদা করছেন, দেখা গেল।

(শ্রীমোটেরাম শাস্ত্রী / ১৯২৮) অনুবাদ দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

মন্ত্র (২)

সন্ধ্যাকাল। ডাক্তার চাড্ঢা গলফ খেলতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। মোটর গাড়ি দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় দেখা গেল, দুই কাহার এক ডুলি কাঁধে নিয়ে আসছে। ডুলির পিছনে লাঠি ঠকঠক করে আসছে এক বৃদ্ধ। ডুলি ডাক্তারখানার সামনে এসে থেমে গেল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চিক-ফেলা দরজার সামনে এসে চিক একটু তুলে দেখল। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা যে পা ফেলতে ভয় হয়, পাছে কেউ ধমকে ওঠে। ডাক্তার সাহেবকে টেবিলের সামনে দাঁড়াতে দেখেও তাঁকে কিছু বলতে তার সাহস হল না।

ডাক্তার সাহেব নিজেই চিকের ভিতর থেকে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন — কে ওখানে? কী চাই?

বৃদ্ধ হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলল — হুজুর, দোহাই আপনার, ছেলে আমার বাঁচবে না। হুজুর, আজ চার দিন সে চোখ...

ডাক্তার চাড্ঢা হাতঘড়ি দেখলেন। আর মাত্র দশ মিনিট আছে। খুঁটিতে ঝোলানো গল্‌ফ স্টিক খুলে নিতে নিতে বললেন — কাল সকালে এসো, কাল সকালে। এখন আমার খেলতে যাওয়ার সময়।

বৃদ্ধ মাথার পাগড়ি খুলে চৌকাঠের উপর রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল — হুজুর, এক নজর দেখুন। ব্যস, এক নজর। ছেলেকে আর ধরে রাখতে পারব না। সাত ছেলের মধ্যে এই একটিই বেঁচে আছে, হুজুর। আমরা দু'জনেই কাঁদতে কাঁদতে মরে যাব, মালিক। আপনার বাড়বাড়ন্ত হোক, গরিবের মা-বাপ।

এরকম উজবুক দেহাতি এখানে প্রায় রোজ আসে। ডাক্তার সাহেব এদের স্বভাব খুব ভালোই জানেন। যে যাই বলুক না কেন, সে তার নিজের কাঁদুনি গেয়েই যাবে। অন্যের কথায় কানই দেবে না। আস্তে চিক তুলে বাইরে এসে তিনি মোটরগাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। সরকার, আপনার অনেক পুণ্য হবে। হুজুর, দয়া করুন, আমি নিতান্ত দীনদুঃখী। সংসারে আর কেউ নেই, বাবুজি — এই বলতে বলতে বৃদ্ধ তার পেছন পেছন ছুটল।

কিন্তু ডাক্তার সাহেব তার দিকে মুখ ফিরিয়েও দেখলেন না। গাড়িতে বসে বললেন — কাল সকালে এসো।

গাড়ি চলে গেল। বৃদ্ধ কয়েক মিনিট পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। সংসারে এমন মানুষও হয় যে নিজের আমোদ-প্রমোদের কাছে অন্যের জীবনেরও কোনো মূল্য দেয় না। এটা হয়তো তার তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভদ্রলোকের জগৎ এত নির্মম, এত কঠোর — এই সত্যটা

এমন হৃদয়বিদারক রূপ নিয়ে আগে কখনও প্রকাশ পায়নি। সে ছিল সেই পুরনো আমলের লোক — যারা আগুন লাগলে আগুন নেবানো, মড়ায় কাঁধ দেওয়া, লোকের চালা ছেয়ে দেওয়া কিংবা কোনো ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেবার জন্য সবসময় এক পায়ে খাড়া। যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি দেখতে পাওয়া গেল বৃদ্ধ ততক্ষণই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের পলক না ফেলে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। হয়তো ডাক্তার সাহেব ফিরে আসবেন এই আশা তখনও তার ছিল। তারপর সে কাহারদের ডুলি তুলতে বলল। যেদিক থেকে ডুলি এসেছিল সেই দিকেই চলে গেল। সমস্ত দিক থেকে নিরাশ হয়েই সে ডাক্তার চাড্‌ঢার কাছে এসেছিল। তাঁর খুব সুনাম সে শুনেছিল। এখান থেকে ব্যর্থ হয়ে সে আর দ্বিতীয় কোন ডাক্তারের কাছে গেল না। কপাল চাপড়াতে লাগল।

সেই রাত্রেই তার হাসিখুশি সাত বছরের ছেলে আপনার বাল্যলীলা সমাপ্ত করে এই সংসার থেকে বিদায় নিল। বৃদ্ধ মা-বাপের জীবনের সেই ছিল একমাত্র অবলম্বন। তার মুখ দেখেই তারা বেঁচে ছিল। এই প্রদীপটি নিবে যেতেই তাদের জীবনের আঁধার রাত আরও অসহ্য হয়ে উঠল। বার্ধক্যের অগাধ মমতা ভাঙা হৃদয় থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে আর্তস্বরে কাঁদতে লাগল।

দুই

অনেক বছর চলে গেছে। ডাক্তার চাড্‌ঢা প্রচুর খ্যাতি ও ধন উপার্জন করেছিলেন। তবে এরই সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্যও রক্ষা করতে পেরেছিলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর নিয়মনিষ্ঠ জীবনে এটা ছিল আশীর্বাদের মতো। পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর চোস্ত চটপটে ভাব যুবকদেরও লজ্জা দিত। তাঁর সব কাজেরই একটা সময় বাঁধা ছিল। বাঁচামরার ঘটনাতেও নিয়মের এতটুকু নড়চড় হবার উপায় ছিল না। অনেক লোক আছে যারা কোনো রোগ ধরলেই স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে চলে। ডাক্তার সাহেব ভোগ ও সংযমের রহস্য ভালোভাবেই বুঝতেন। তাঁর সন্তান-সংখ্যাও ছিল এই নিয়মের অধীন। তাঁর ছিল মাত্র দুটি সন্তান — এক ছেলে, আর এক মেয়ে। তৃতীয় সন্তান হয়নি, এইজন্য শ্রীমতী চাড্‌ঢাকে তখনও যুবতী বলে মনে হত। মেয়ের বিবাহ হয়ে গিয়েছিল, ছেলে পড়ত কলেজে। সেই ছিল মা-বাবার জীবনের অবলম্বন, নম্রতা ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি, যুবক সমাজের অলংকার। তার মুখে-চোখে যৌবনের তেজ ঝলমল করত। আজ তার বিশ বছরের জন্মদিন।

তখন সন্ধেবেলা। সবুজ ঘাসের উপর অনেক চেয়ার পাতা ছিল। শহরের গণ্যমান্য লোকেরা একদিকে, কলেজের ছাত্ররা আর একদিকে খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত। বিদ্যুতের আলোয় সমস্ত জায়গাটা ঝলমল করছিল। আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও তৈরি ছিল। ছোটো একটা প্রহসন অভিনয়ের জন্য তৈরি ছিল। প্রহসনটি লিখেছিল স্বয়ং কৈলাসনাথ। সেই ছিল তার প্রধান অভিনেতা। এই উপলক্ষে সে সিল্কের একটা জামা পরেছিল। খালি মাথায় খালি পায়ে সে একবার এদিকে, একবার ওদিকে বন্ধুদের আদর-আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিল। কেউ বলছিল — কৈলাস, একটু এদিকে এসো, আবার কেউ অন্য দিক থেকে বলছিল — কৈলাস, তুমি কেবল ওদিকেই থাকবে? সবাই তাকে নিয়ে পড়েছিল, মজা করছিল। বেচারার একটু দম নেবারও ফুরসত ছিল না। হঠাৎ একটি তরুণী তার কাছে এসে বলল — কী কৈলাস, তোমার সাপ কোথায়? আমাকে দেখাবে না একবার?

কৈলাস তার সঙ্গে করমর্দন করে বলল — মৃণালিনী, আজ ক্ষমা করে দাও, কাল দেখিয়ে দেব।

মৃণালিনী আগ্রহ দেখিয়ে বলল — আজ্ঞে না, তোমাকে দেখাতে হবে। আমি আজ কোনো কথা শুনব না। তুমি রোজই 'কাল কাল' কর।

মৃণালিনী ও কৈলাস একই ক্লাসে পড়ে, দুজনে দুজনের প্রেমে পড়েছে। কৈলাসের শখ ছিল সাপ পোষা, সাপ নিয়ে খেলা, আর সাপ নাচানো। কত রকমের সাপই যে সে পুষত, তাদের স্বভাব ও চরিত্র সে পরীক্ষা করে করে দেখত! কিছু দিন আগে সে কলেজে সাপ নিয়ে এক দারুণ বক্তৃতা দিয়েছিল। সাপ নাচিয়ে দেখিয়েও ছিল। জীববিজ্ঞানের বড়ো বড়ো পণ্ডিতরাও তার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এই বিদ্যা সে এক বৃদ্ধ সাপুড়ের কাছ থেকে শিখেছিল। সাপের নানা ধরনের ওষুধ জমানোও ছিল তার এক বাতিক। যদি কোনো রকমে সে খবর পেত যে, অমুক লোকের কাছে কোনো ভালো জড়িবুটি আছে, তাহলে সে স্থির থাকতে পারত না। সেটা আদায় করেই সে ছাড়ত। এই ছিল তার নেশা। এই নেশার জন্য হাজার হাজার টাকা সে উড়িয়ে দিয়েছে। মৃণালিনী কত বার এসেছে, কিন্তু সাপদেখার জন্য কখনও এত উৎসুক হয় নি। বলা যায় না আজ তার ঔৎসুক্য সত্যিই জেগেছিল না কৈলাসের উপর নিজের অধিকার জাহির করতে চেয়েছিল। তবে আর আগ্রহটা ছিল অসময়ের আগ্রহ। ওই ঘরে কত ভিড় জমে যাবে, ভিড় দেখে সাপের কী প্রতিক্রিয়া হবে আর রাত্রে সাপগুলোকে বিরক্ত করা কতটা সঠিক — এই সব কথা সে একবার চিন্তাও করল না।

কৈলাস বলল — আজ নয়, কাল অবশ্যই দেখাব। এখন তো ভালো করে দেখাতেও পারব না। ঘরে তিল ধারণের জায়গা হবে না।

একজন খোঁচা দিয়ে বলল — দেখিয়ে দিচ্ছ না কেন? সাধারণ একটা ব্যাপার নিয়ে কত বাহানা করছ? মিস গোবিন্দ,আপনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। দেখি কী করে না দেখায়।

দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি আরও একটু উশকে দিয়ে বলল — মিস গোবিন্দ এত সোজা আর সরল মানুষ, তবু আপনি তাঁর সঙ্গে এত মেজাজ করছেন। অন্য কোনো সুন্দরী মহিলা হলে এই এক কথাতেই মুখ ভারী করত।

তৃতীয় আরেক ব্যক্তি ঠাট্টা করল, আরে শুধু মুখ ভারী! কথাই বন্ধ করে দিত! আরে এটা কী একটা কথা হল? আর তুমি কিনা দাবি করছ মৃণালিনীর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত!

মৃণালিনী দেখল, এইসব উটকো লোকেরা তাকে রাগিয়ে দিতে চাইছে। সে তাই বলল —আমার জন্য আপনাদের ওকালতি করতে হবে না, আমি নিজেই আমার ওকালতি করতে পারি। আমি এখন সাপের খেলা দেখতে আগ্রহী নই। ব্যস, এই আলোচনার এখানেই ইতি।

এ নিয়ে বন্ধুরা উচ্চহাস্য করতে লাগল। এক ভদ্রলোক বললেন — দেখতে তো সব কিছুই চাইতে পারেন, তবে দেখাচ্ছে আর কে?

কৈলাস মৃণালিনীর অন্ধকার মুখ দেখে ভাবল, তার আপত্তি তাকে সত্যি সত্যিই আঘাত করেছে। যেই মাত্র প্রীতিভোজ শেষ হয়ে গান শুরু হল, সেও মৃণালিনী ও অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে সাপের খাঁচার সামনে গিয়ে সাপুড়ের বাঁশি বাজাতে শুরু করল। তারপর একেকটা ঝাঁপি খুলে একটা একটা করে সাপ বের করতে লাগল। বাঃ! কী চমৎকার! দেখে মনে হচ্ছিল সাপগুলো তার প্রতিটি কথা, তার প্রতিটি ভাব বুঝতে পারছে। কোনোটাকে সে তুলে নিল, কোনোটাকে সে গলায় ঝুলিয়ে নিল, কোনোটাকে আবার হাতে জড়িয়ে নিল। মৃণালিনী বারে বারে বারণ করতে লাগল, সাপ গলায় ঝুলিয়ে নিও না। দূর থেকেই দেখিয়ে দাও। ব্যস, একটু নাচিয়ে দাও, যথেষ্ট। কৈলাসের ঘাড়ে সাপ

জড়িয়ে থাকতে দেখে মৃণালিনীর প্রাণ উড়ে যাবার মতো হল। সে পস্তাতে লাগল, কেনই বা সে অনর্থক সাপ দেখাতে বলল। কিন্তু কৈলাস কোনো কথাই শুনল না। প্রেমিকার সামনে নিজ সর্পকলা দেখাবার এরকম সুযোগ পেয়ে সে কী করে ঠিক থাকে! এক বন্ধু টিটকারি করে বলল, দাঁত আগে থেকেই ভেঙে রেখেছ?

কৈলাস হেসে বলল, দাঁত ভেঙে ফেলা তো সাপুড়েদের কাজ। একটিরও দাঁত ভাঙা হয়নি। বলো দেখিয়ে দিই। এই কথা বলে সে একটা বিষধর সাপ ধরে বলল, আমার কাছে এত বড়ো ও এত বিষধর সাপ আর নেই। যদি কাউকে ছোবল মারে তাহলে সে দেখতে না দেখতে মরে যাবে। শরীর একটু কাঁপবেও না। এর ছোবলের কোনো মন্ত্র নেই। এর দাঁত দেখিয়ে দেব?

মৃণালিনী তার হাত ধরে বলল, না না, কৈলাস, ভগবানের দোহাই, এটাকে ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ছি।

এতে আরেক বন্ধু বলল, আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না, তবে তুমি বলছ যখন মেনে নিচ্ছি।

কৈলাস সাপের মাথার কাছে চেপে ধরে বলল, তা হবে না সাহেব, তুমি নিজের চোখে দেখে নাও। দাঁত ভেঙে ফেলে বশ করলাম তো আর কী করলাম! সাপ খুব বুঝতে পারে। একবার যদি কারও প্রতি বিশ্বাস হয় যে, তার কোনো অনিষ্ট হবে না তাহলে তাকে সে কখনও ছোবল দেবে না।

মৃণালিনী যখন দেখল যে, কৈলাসের মাথায় ভূত চেপেছে তখন সে এব্যাপারটা বন্ধ করার জন্য বলল, আচ্ছা ভাই, চলো আমরা এখান থেকে যাই। দ্যাখো গান শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ আমিও দু-একটা ভালো কিছু গাইব। এই কথা বলে সে কৈলাসের কাঁধ ধরে তাকে ইশারা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কৈলাস কিন্তু বিরোধীদের সন্দেহের অবসান হবার আগে ছাড়তে চাইছিল না। সে সাপের গলা ধরে জোরে চাপ দিল। এত জোরে চাপ দিল যে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, শরীরের সব ধমনী টানটান হয়ে গেল। সাপ কখনও তার হাতে এরকম ব্যবহার পায়নি। সে বুঝতে পারছিল না তার কাছ থেকে কী চাওয়া হচ্ছে। তাই তার বোধ হয় বুঝতে ভুল হল, ভাবল তাকে মেরে ফেলতে চাইছে। অতএব সে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

কৈলাস তার গলা খুব জোরে চেপে মুখ খুলে ফেলল এবং তার বিষাক্ত দাঁত দেখাতে দেখাতে বলল, যাদের শখ আছে তারা এসে দেখে যাক। বিশ্বাস হল, না এখনও সন্দেহ আছে? বন্ধুরা এসে দাঁত দেখে ভয় পেয়ে গেল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সামনে সন্দেহের আর অবকাশ কোথায়? বন্ধুদের সন্দেহ নিরসন করে কৈলাস সাপের গলার চাপ ঢিলে করে তাকে মাটিতে রাখতে চাইল; কিন্তু সেই ভয়ানক গোখরো রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল। গলা আলগা পড়তেই সে ফণা তুলে কৈলাসের আঙুলে জোরে ছোবল মেরে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কৈলাসের আঙুল থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরতে লাগল। সে জোরে আঙুল চেপে ধরে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল। সেখানে টেবিলের দেরাজে একটা গাছের শিকড় রাখা ছিল। সেটা বেটে লাগিয়ে দিলে প্রাণঘাতী বিষাক্ত বিষও নষ্ট হয়ে যায়।

বন্ধুদের মধ্যে হইচই পড়ে গেল। বাইরে গানের আসরেও খবর পৌঁছে গেল। ডাক্তার সাহেব ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে এলেন। দ্রুত আঙুল বেঁধে ফেলে শিকড় বাটতে দিলেন। ডাক্তার সাহেব লতা-পাতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি আঙুলের যেখানে ছোবল দিয়েছে সেখানটা ছুরি দিয়ে কেটে দিতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু কৈলাসের শিকড়ের উপর বিশ্বাস ছিল পুরোমাত্রায়। মৃণালিনী পিয়ানোর কাছে বসে ছিল। সেও খবর শুনেই ছুটে গেল ও কৈলাসের আঙুল থেকে টপটপ করে যে রক্ত ঝরে পড়ছিল তা রুমাল দিয়ে মুছে দিতে লাগল।

শিকড় বাটা হচ্ছিল; কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যেই কৈলাসের চোখ বুজে আসতে লাগল। ঠোঁট ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে এল। এমন কী, সে আর দাঁড়াতে পারছিল না। মাটির উপর বসে পড়ল।

নিমন্ত্রিত অতিথিরা সব ঘরে এসে জমা হলেন। একেক জন এক এক রকম বলতে লাগলেন। এরই মধ্যে শিকড় বেটে আনা হলে মৃণালিনী সেটা দিয়ে আঙুলে প্রলেপ দিয়ে দিল। মিনিট খানেক আরও কাটল। কৈলাসের চোখ বন্ধ হয়ে গেল। সে শুয়ে পড়ে হাত দিয়ে ইশারা করে পাখার হাওয়া করতে বলল। তার মা ছুটে এসে তার মাথা কোলে নিয়ে টেবিল ফ্যান খুলে দিলেন।

ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কৈলাস, কেমন লাগছে?

কৈলাস আস্তে আস্তে হাত তুলল; কিন্তু কিছু বলতে পারল না। মৃণালিনী কাতর কণ্ঠে বলল, শিকড় বেটে লাগানোতে কি কিছুই কাজ হবে না? ডাক্তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, কী বলব, আমি যে এর কথা শুনে বসলাম। এখন তো অপারেশন করেও কোনো ফল হবে না।

আধ ঘন্টা এভাবেই চলল। কৈলাসের অবস্থা প্রতি মুহূর্তে খারাপ হতে লাগল। এমন কী, তার চোখ পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল; হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল; মুখের বর্ণ কালি হয়ে গেল; নাড়ি ডুবে গেল — অর্থাৎ মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। ঘরে হইচই পড়ে গেল। মৃণালিনী মাথা চাপড়াতে লাগল; কৈলাসের মা আছাড়ি-পিছাড়ি করতে লাগলেন; ডাক্তার চাড্‌ঢাকে বন্ধুরা ধরে রাখল, তা নাহলে তিনি ওই ছুরি তার গলাতেই বসিয়ে দিতেন।

এক ভদ্রলোক বললেন, কোনো ওঝা পাওয়া গেলে তো মনে হয় প্রাণটা এখনও বাঁচে।

এক মুসলমান ভদ্রলোক তাকে সমর্থন করে বললেন, আরে সাহেব, কবরে পুঁতে দেওয়া লাশ পর্যন্ত বেঁচে ওঠে। এরকম আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাবার লোকও আছে।

ডাক্তার চাড্‌ঢা বললেন, আমার বুদ্ধিনাশ হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি এর কথায় ভুলে গিয়েছিলাম। ছুরি লাগালে আর এই বিপদ কী আসত? বারে বারে বলেছি, বাবা, সাপ পুষবি না, কিন্তু কে শোনে? ডেকে আনুন, কোনো ওঝাকেই ডেকে আনুন। আমার সব কিছু নিয়ে নিক, আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি তার পায়ে সঁপে দেব। কৌপিন পরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাব, তবু যদি আমার কৈলাস, আমার প্রিয় কৈলাস বেঁচে ওঠে। ভগবানের দোহাই, কাউকে ডেকে আনুন।

এক ভদ্রলোকের একজন ওঝার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি দৌড়ে গিয়ে তাকে নিয়ে এলেন; কিন্তু কৈলাসের চেহারা দেখে সে আর মন্ত্র বলতে সাহস পেল না। সে বলল, এখন আর কী হবে বাবু, যা হবার হয়ে গেছে।

আরে মূর্খ, একথা কেন বলছিস না যে, যা হবার নয় তাই হয়ে গেছে! যা হবার ছিল তা হল কোথায়? মা-বাবা কি ছেলের বিয়ে দেখতে পারলেন? মৃণালিনীর বাসনা-তরু কি পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠল? মনের ওই স্বর্গ-স্বপ্ন যার জন্য তার জীবন আনন্দের স্রোত হয়ে বইছিল তা কি পূর্ণ হতে পারল? জীবনের নৃত্যমুখর তারকাখচিত সাগরে প্রমোদ-বসন্ত উপভোগ করার আগেই কি তার নৌকা জলমগ্ন হয়ে গেল না? যা হবে কথা ছিল না তাই হয়ে গেল।

সেই শ্যামল প্রান্তর, সেই সুন্দর জ্যোৎস্না একটা নিঃশব্দ সংগীতের মতো প্রকৃতিতে বিরাজমান। সেই বন্ধুবান্ধব, মনোরঞ্জনের সেই সব সামগ্রী সবই রয়েছে, কেবল যেখানে ছিল হাসি, সেখানে এখন করুণ ক্রন্দন আর অশ্রুপ্রবাহ।

তিন

শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে ছোটো একটা ঘরে এক বুড়ো ও এক বুড়ি আগুন সামনে নিয়ে বসে শীতের রাত কাটাচ্ছিল। বুড়ো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে কাশছিল আর বুড়ি দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে আগুনের দিকে চেয়ে বসেছিল। একটা কেরোসিনের কুপি তাকের উপর জ্বলছে। ঘরে তক্তপোষ, বিছানা কিছুই নেই। ঘরের এক কিনারে কিছু খড় পড়ে আছে। ঘরেই একটা উনান ছিল। বুড়ি সারা দিন ঘুঁটে ও শুকনো লাকড়ি বেচে ফিরত। বুড়ো দড়ি পাকিয়ে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচত। এই ছিল তাদের জীবিকা। কেউ তাদের কাঁদতে কিংবা হাসতে দেখেনি। তাদের সমস্ত সময় বেঁচে থাকার চিন্তাতেই কেটে যেত। মৃত্যু দরজায় দাঁড়িয়েই ছিল, কাঁদা-হাসার সময় কোথায়? বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, কালকের শণ তো নেই, তাহলে কাল কী করবে?

— ঝণ্ডু সাহুর কাছ থেকে দশ সের শণ ধার নেব।

— তার আগের পয়সাও তো দাও নি, তাহলে আর ধার দেবে কেন?

— না দেবে, দেবে না। ঘাস তো কোথাও চলে যায়নি। দুপুর পর্যন্ত কি দু আনার ঘাস কাটতে পারব না?

এমন সময় একজন তার ঘরের দরজায় ঠকঠক করে বলল — ভগত, ও ভগত, শুয়ে পড়লে নাকি? একটু দরজাটা খোলো।

ভগত উঠে দরজা খুলে দিল। একজন লোক ভিতরে ঢুকে বলল, কিছু শুনেছ? ডাক্তার চাড্ঢার ছেলেকে সাপে কেটেছে।

ভগত চমকে উঠে বলল, চাড্ঢা বাবুর ছেলেকে? ওই চাড্ঢা বাবু তো? যিনি ছাউনির বাংলোতে থাকেন?

— হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনিই। সারা শহরে হইচই পড়ে গেছে। যাবে তো যেতে পারো, লাল হয়ে যাবে।

বুড়ো মাথা দুলিয়ে খুব কঠোরভাবে বলল, আমি যাব না। আমার শত্তুর যাক। সে ওই চাড্ঢা। খুব চিনি। ছেলেকে নিয়ে ওর কাছেই তো গিয়েছিলাম। খেলতে যাচ্ছিল। পায়ে পড়ে বলেছিলাম, এক নজর দেখুন। কিন্তু ভালোভাবে কথাটা পর্যন্ত বলল না। ভগবান বসে বসে সব শুনছিলেন। এখন বুঝতে পারবে, পুত্রশোকে কী বস্তু! অনেক ছেলে আছে?

— না, নেই। ওই তো এক ছেলে। শুনছি সবাই জবাব দিয়ে দিয়েছে।

— ভগবানের অনেক লীলা। ওই দিন আমার চোখ থেকে জল পড়েছিল, কিন্তু একটুও দয়া হয়নি। আমি ওর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম না।

— তা হলে যাবে না? আমি যা শুনেছি, তা বলে গেলাম।

— ভালো করেছেন, ভালো করেছেন। আমার কলিজা ঠান্ডা হল, আমার চোখ ঠান্ডা হল। ছেলেও বোধ হয় এতক্ষণে ঠান্ডা হয়ে গিয়ে থাকবে। আপনি যান। আজ শান্তিতে ঘুমোব। (বুড়িকে)

একটু তামাক দে। আরও এক ছিলিম খাব। বাবু এখন বুঝবেন। সব সাহেবিয়ানা এবার বেরিয়ে যাবে। আমার কী এসে গেল? ছেলে মরে যাওয়ায় তো আর আমার রাজ্যপাট চলে যায়নি। যেখানে ছ-ছটা ছেলে মরে গিয়েছিল, সেখানে আরও একটা গেল। তোমার তো বাবা, রাজ্যপাটই ফাঁকা হয়ে যাবে। এর জন্যই না সবার গলা টিপে টিপে এত কমিয়েছিলে। এখন কী করবে? একবার দেখতে যাব, তবে কয়েকদিন পরে। তার মনের হাল কী রকম, জিজ্ঞাসা করব।

লোকটি চলে গেলে ভগত দরজা বন্ধ করে কলকেতে তামাক ভরে টানতে লাগল।

বুড়ি বলল, এত রাত হয়ে গেছে এখন এই ঠান্ডায় কে যাবে?

আরে, দুপুর হলেও আমি যেতাম না। ভুলে যাইনি তো। পান্নার চেহারা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। ওই পাষাণটা তার দিকে একবার চেয়েও দেখেনি। আমিও কি জানতাম না যে, সে বাঁচবে না? খুব জানতাম। চাড্ঢা তো আর ভগবান নয় যে, সে একবার দেখলেই অমৃত ঝরে পড়বে? না, কেবল মনের বাসনা। একটু সান্ত্বনা পেতাম। ব্যস, এই জন্যই তার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। এখন আর একদিন যাব,গিয়ে বলব,কী সাহেব, কেমন আছেন? এতে লোকে খারাপ বলবে? বলুক। কোনো পরোয়া নেই। ছোটোলোকের তো সবটাতেই দোষ। বড়োলোকের কোনো দোষ হয় না। তারা সবাই দেবতা।

এমন খবর পেয়েও বসে রইল, ভগতের জীবনে এ ঘটনা এই প্রথম ঘটল। আশি বছরের জীবনে কখনও এরকম হয়নি যে, সাপেকাটার খবর পেয়ে সে দৌড়ে যায়নি। পৌষমাসের অন্ধকার রাত, চৈত্র-বৈশাখের রোদ আর লু, শ্রাবণ-ভাদ্রের ভরা নদী-খাল, কোনো কিছুরই পরোয়া সে করেনি। সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ত—নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম। দেনাপাওনার বিচার কখনও মনে আসেনি। এটা কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। জীবনের দাম কে দিতে পারে? এ ছিল এক পুণ্য কর্ম। শত শত নিরাশ লোককে তার মন্ত্র জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। আজ কিন্তু সে ঘর থেকে পা ফেলে বাইরে বেরুতে পারল না। এই খবর শুনেও সে ঘুমোতে যাচ্ছে।

বুড়ি বলল, তামাক আগুনের পাশে রাখা আছে। তামাকের আড়াই পয়সা বাকী পড়েছে। দিতেই চাইছিল না।

এই কথা বলে বুড়ি শুয়ে পড়ল। বুড়ো কুপি নিবিয়ে দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বসে পড়ল। শেষ পর্যন্ত শুয়ে পড়ল। কিন্তু হলে হবে কী, ওই সংবাদ তার মনে বোঝার মতো চেপে বসেছে। তার মনে হচ্ছিল যেন তার কোনো জিনিস হারিয়ে গেছে, কিংবা যেন তার জামাকাপড় ভিজে গেছে, বা যেন তার পায়ে কাদা লেগে আছে; কেউ যেন তার মনের ভিতর বসে তাকে ঘর থেকে বেরুবার জন্য তাড়া লাগাচ্ছে। একটু পরেই বুড়ি নাক ডাকতে লাগল। বুড়োরা বিড়বিড় করতে করতে ঘুমোয় বটে, কিন্তু আবার একটু খুটখাট আওয়াজেই জেগে ওঠে। ভগত উঠে পড়ল, নিজের লাঠিটা হাতে নিল তারপর আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলল।

বুড়ি জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

— কোথাও না। দেখছি রাত কত বাকি?

— এখনও অনেক রাত্তি বাকি। শুয়ে পড়ো।

— ঘুম আসছে না।

— ঘুম আসবে কী করে? মন তো চাড্ঢার বাড়িতে পড়ে আছে।

— চাড্ঢা আমার কোন ভালোটা করেছে যে তার বাড়ি যাব? সে এসে আমার পায়ে পড়লেও যাব না।

— উঠেছিলে তো তুমি এই ইচ্ছেতেই।

— আরে না। আমি এত পাগল না যে, যে আমাকে কেটে পুঁতে ফ্যালে তার জন্য আমি ফুলের গাছ লাগিয়ে বেড়াব।

বুড়ি আবার শুয়ে পড়ল। ভগত দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসল। তবে, ব্যাদ্যভাণ্ডের আওয়াজ কানে এলে ধর্মকথার আসরের লোকেদের মনের যে অবস্থা হয়, বুড়োর মনেরও সেই অবস্থা হল। চোখ হয়তো কথকের দিকেই আটকে রয়েছে, কিন্তু কান বাজনার দিকে। মনেও সেই বাজনার ধ্বনিই বেজে চলে। লজ্জার জন্য জায়গা ছেড়ে উঠতে পারছে না। নিষ্ঠুর প্রতিশোধের ইচ্ছা এখানে কথকের কাজ করছিল সত্য, কিন্তু মন চলে গিয়েছিল সেই অভাগা যুবকের কাছে যে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে,এক এক মুহূর্ত বিলম্ব যার পক্ষে মারাত্মক।

সে আবার দরজা খুলল। এত আস্তে খুলল যে বুড়ি টেরই পেল না। বাইরে বেরিয়ে এল। ঠিক সেই সময় গ্রামের চৌকিদার টহল দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, ভগত উঠে এলে যে? আজ এত ঠান্ডা, কোথাও যাচ্ছ নাকি?

ভগত বলল, না না, যাব কোথায়? দেখছিলাম, এখন রাত কত বাকি? বলো তো কটা বাজে?

চৌকিদার বলল, একটা বাজে, আর কী! এই থানা থেকে আসছিলাম। তা দেখি ডাক্তার চাড্ঢাবাবুর বাংলোর ওখানে কী ভিড়! তার ছেলের কথা তুমি হয়তো শুনেছো। সাপে কেটেছে। হয়তো মরেও গেছে। তুমি চলে যাও, কী জানি যদি বাঁচে। শুনেছি, দশহাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি।

ভগত—আমি যাওয়ার লোক নই। তা সে দশ লাখই দিক না কেন। দশ হাজার কি দশ লাখ টাকা নিয়ে আমি কী করব? কাল মরে যাব আমি; ভোগ করার জন্য কে বসে আছে?

চৌকিদার চলে গেল। ভগতও পা বাড়িয়ে দিল। নেশাগ্রস্ত লোক যেমন নিজেকে সামলাতে পারে না, পা এক জায়গায় রাখে তো আরেক জায়গায় পড়ে, এক কথা বলতে চাইলে মুখ দিয়ে অন্য কথা বেরোয়, ভগতের অবস্থাও তাই হয়েছে। প্রতিশোধের ইচ্ছা মনে ছিল, তবে কাজটা মনের অধীন ছিল না। যে কোনোদিন তরোয়াল চালায়নি সে ইচ্ছা করলেও তরোয়াল চালাতে পারে না। তার হাত কাঁপতে থাকে, হাত ওঠেই না।

ভগত লাঠি ঠকঠক করে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। সচেতন মন চাইছিল তাকে বাধা দিতে, অবচেতন মন চাইছিল ঠেলে নিয়ে যেতে। চাকর মনিবের উপর হুকুম করছে যেন।

অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে এসে ভগত হঠাৎ থেমে পড়ল। হিংসা কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করল : আমি এমনিই এতদূর চলে এলাম। এই ঠান্ডার মধ্যে কে আমায় মরতে সেধেছিল? কেন আরামে শুয়ে থাকলাম না? ঘুম আসছিল না তো আসত না। দু-চারটে ভজনই গাইতে পারতাম। মিছিমিছি এতদূর ছুটে এলাম। চাড্ঢার ছেলে বাঁচুক আর মুরুক তাতে আমার কী! আমার সঙ্গে সে কী এমন ব্যবহার করছিল যে তার জন্য আমাকে মরতে হবে? দুনিয়াতে হাজার হাজার লোক মরছে, হাজার হাজার লোক বেঁচে থাকছে। কারুর বাঁচা-মরায় আমার কী এসে যায়!

কিন্তু অবচেতনা এক নতুন রূপ ধারণ করল। এই রূপের সঙ্গে হিংসার বেশ কিছু মিল দেখা যাবে ঃ ঝাড়ফুঁক করতে সে যাচ্ছে না, সে গিয়ে দেখবে লোকে কী করছে। ডাক্তার সাহেব কীভাবে কান্নাকাটি করছে, কীভাবে মাথা চাপড়াচ্ছে, কীভাবে আছাড়পিছাড় খাচ্ছে — এসব সে দাঁড়িয়ে দেখবে। সে দেখবে ধনী লোকেরা গরিবদের মতোই কাঁদে, না সহ্য করে থাকে। এইসব লোক তো বিদ্বান, তাই বোধ হয় ধৈর্য ধরে থাকে। হিংসাকে এভাবে সান্ত্বনা দিয়ে সে আবার এগিয়ে চলল।

এরই মধ্যে দুজন লোক আসছে দেখা গেল। দুজনে কথা বলতে বলতে আসছিল ঃ চাড্ঢা বাবুর বাড়ি শ্মশান হয়ে গেল। ওই তো একমাত্র ছেলে। ভগতের কানে এই কথা গেল। তার গতি আরও দ্রুত হল।

ক্লান্তিতে তার পা উঠতে চাইছিল না। মাথাটা সামনের দিকে এতটা ঝুঁকে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল এখনই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। এইভাবে আন্দাজ মিনিট দশেক চলার পর ডাক্তার সাহেবের বাংলো চোখে পড়ল। বিজলিবাতি জ্বলছে, কিন্তু চর্তুদিক নিস্তব্ধ। কান্নাকাটির আওয়াজ পর্যন্ত আসছে না। ভগতের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আসতে খুব দেরি হয়ে যায় নি তো? সে ছুটতে লাগল। জীবনে সে কোনোদিন এত জোরে দৌড়োয়নি। মনে হচ্ছিল ঠিক যেন মৃত্যু তাকে পেছন থেকে তাড়া করছে।

চার

রাত দুটো। অভ্যাগতরা চলে গিয়েছিল। কাঁদবার জন্যে শুধু আকাশের তারাগুলিই রয়ে গিয়েছিল। আর সবাই কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত। যারা ছিল তারা মাঝে মাঝেই আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিল — ভোর হলেই লাশ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসবে।

হঠাৎ ভগত দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিল। ডাক্তার সাহেব ভাবলেন, কোনো রুগি এসেছে। অন্য কোনো দিন হলে তিনি তাকে তাড়িয়ে দিতেন, কিন্তু আজ বাইরে এলেন। দেখলেন এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। কোমর তার বাঁকা, ফোকলা মুখ, ভুরু পর্যন্ত সব সাদা হয়ে গেছে। লাঠি ধরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। তিনি তখন বিনম্রভাবে বললেন, কী ব্যাপার ভাই। আজ আমার এমন বিপদ যে আমি কিছু বলতে পারছি না। অন্য কোনো একদিন আসবে। বোধ হয় মাসখানেক পর্যন্ত আমি কোনো রুগি দেখতে পারব না।

ভগত বলল, শুনেছি বাবুজি। এই জন্যেই এসেছি। ছেলে কোথায়? আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। ভগবান অনেক কারসাজি দেখাতে পারেন, মৃতকেও তিনি বাঁচাতে পারেন। কে জানে, এখনও তাঁর দয়া হতে পারে।

চাড্ঢা ব্যথিত স্বরে বললেন, চলো, দেখে নাও। তবে তিন-চার ঘণ্টা কেটে গেল। যা কিছু হবার ছিল হয়ে গেছে। অনেক ঝাড়ফুঁকওয়ালা এসে দেখে-টেখে চলে গেছে।

ডাক্তার সাহেবের আশা আর কী করে হবে। তবে, হ্যাঁ, বুড়োকে দেখে তাঁর দয়া হল। ভিতরে নিয়ে গেলেন। ভগত মিনিট খানিক ধরে লাশ দেখল। তারপর মৃদু হেসে বলল, এখনও কোনো ক্ষতি হয়নি, বাবুজি। নারায়ণ কৃপা করলে আধ ঘন্টার মধ্যে আপনার ছেলে উঠে বসবে। আপনি মিছিমিছি মন খারাপ করছেন। কাহারদের বলুন জল আনতে।

কাহাররা জল এনে কৈলাসকে স্নান করাতে লাগল। কলের জল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর কাহারের সংখ্যাও বেশি ছিল না। তাই উপস্থিত অতিথিরা বাড়ির বাইরের কুয়ো থেকে জল ভরে কাহারদের হাতে দিচ্ছিলেন। মৃণালিনীও কলসি নিয়ে জল বয়ে আনছিল। বুড়ো ভগত দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে মন্ত্র উচ্চারণ করছিল, যেন জয় তার করায়ত্ত। একেক বার মন্ত্র শেষ হয় আর সে একটা শেকড় কৈলাসের নাকের কাছে ধরে শোঁকায়। এভাবে কতবার যে কত কলসি জল কৈলাসের মাথায় ঢালা হল আর কতবার যে ভগত তার মন্ত্র উচ্চারণ করল তা বলা কঠিন। শেষ পর্যন্ত উষার রাঙা আলোর সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসেরও রাঙা চোখ উন্মোচিত হল। এক মুহূর্তের মধ্যে সে আড়মোড়া ভেঙে জল খেতে চাইল। ডাক্তার চাড্ঢা দৌড়ে গিয়ে ভগতের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন আর মৃণালিনী জলভরা চোখে কৈলাসের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এখন তোমার কেমন লাগছে?

মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। বন্ধুরা অভিনন্দন জানাবার জন্য আসতে শুরু করলেন। ডাক্তার সাহেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলের কাছে ভগতের গুণগান করতে লাগলেন। সকলেই ভগতকে দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন; কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখা গেল ভগত নেই। ভৃত্যরা বলল, এই তো এখানে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। আমরা তামাক দিতে চাইলাম, নিলেন না। নিজের কাছ থেকে তামাক বের করে খেলেন।

ভগতের জন্যে চারদিকে খোঁজ পড়ে গেল। ভগৎ লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে তখন ছুটছে, কারণ বুড়ি ঘুম থেকে ওঠার আগেই তাকে বাড়ি পৌঁছুতে হবে।

অতিথিরা চলে গেলে ডাক্তার সাহেব নারায়ণীকে বললেন, বুড়ো কোথায় চলে গেল কে জানে। এক ছিলিম তামাক পর্যন্ত খেল না।

নারায়ণী বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম ওকে অনেক টাকা দেব।

চাড্ঢা — রাত্রে আমি তাকে চিনতে পারি নি। তবে একটু ফর্সা হলে পরে চিনতে পেরেছিলাম। একবার সে এক রুগি নিয়ে এসেছিল। আমার এখন মনে পড়ছে, আমি খেলতে যাচ্ছিলাম তাই রুগি দেখতে রাজি হইনি। আজ ওইদিনের কথা মনে পড়ায় আমার যে গ্লানি হচ্ছে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আমি তাকে খুঁজে বের করর্ব ও তার পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেব। সে কিছু নেবে না জানি। অপরের উপকার করার জন্যই তার জন্ম হয়েছে। তার উদারতার এই শিক্ষা আমি আমৃত্যু মনে রাখব।

(মন্ত্র ২ / ১৯২৮)

অনুবাদ অমলকুমার রায়

জাঁতা-বুড়ির কুয়ো

মৃত্যশয্যায় শুয়ে শুয়ে চৌধুরি বিনায়ক সিংহকে গোমতী বলল, চৌধুরি, আমার জীবনের ওই একমাত্র বাসনা ছিল।

চৌধুরি গম্ভীর হয়ে বলল—কাকি, তুমি কিছু মাত্র চিন্তা করো না। তোমার বাসনা ভগবান পূরণ করবেন। আমি আজই মজুর ডেকে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। যদি ভগবান করেন, তাহলে নিজেই তুমি নিজের কুয়োর জল খেয়ে যেতে পারবে। কত টাকা আছে, তুমি গুনে রেখেছ তো?

গোমতী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চেষ্টা করল হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো এক জায়গায় ফিরিয়ে আনতে, তারপর বলল—কী জানি বাবা, কত টাকা আছে? যা আছে ওই হাঁড়িতেই আছে। যেটুকু আছে তাতেই কাজ চলে যায় এমন কিছু করো। নইলে আবার কার কাছে হাত পাততে যাবে?

চৌধুরি মুখবন্ধ হাঁড়িটাকে হাতে নিয়ে ওজনটা বোঝার চেষ্টা করতে করতে বলল—তাই তো করতে চাই, কাকি, না হলে দেবার লোক আর কই। এক মুঠো ভিক্ষেই কারুও ঘর থেকে বেরোতে চায় না, আর কুয়ো তৈরির জন্য দেবে! তুমিই ধন্য যে সারা জীবনের উপার্জন এই পুণ্য কাজের জন্য দিয়ে দিলে।

গোমতী আত্মতুষ্টির সুরে বলল—বাবা, তুমি তো তখন খুব ছোটো ছিলে। তোমার কাকা যখন মারা যায় তখন আমার হাতে এক কানাকড়িও ছিল না, কতদিন না খেয়ে থেকেছি। তাঁর কাছে যেটুকু ছিল, তা তাঁর রোগের চিকিৎসাতেই বেরিয়ে গেছে। সে ভগবানের খুব ভক্ত ছিল, তাই ভগবান তাঁকে তাড়াতাড়ি কাছে ডেকে নিলেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, তুমি তো দেখেছ, কী করে দিন কেটেছে। কোনো কোনো রাতে আমি মনখানেক গম, ডাল জাঁতায় পিষেছি, বাবা। যে দেখেছে সেই আশ্চর্য হয়েছে। না জানি কোথা থেকে এত শক্তি আমার এসে যেত। কিন্তু বাসনা আমার একটাই ছিল যে, ওঁর নামে একটা ছোটো দেখে কুয়ো আমি গ্রামে বসাব। বংশের নামটা তো থাকবে। লোকে তো এই জন্যেই ছেলেমেয়ের প্রত্যাশা করে।

এই ভাবে চৌধুরি বিনায়ক সিংহের হাতে সমস্ত অর্থ গচ্ছিত রেখে বুড়ি গোমতী সেই রাত্রেই পরলোকের পথে যাত্রা করল। মারা যাওয়ার সময় শেষ যে কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরোয় তা হল—দেখো বাবা, কুয়ো বানাতে যেন দেরি না হয়। তার কাছে টাকা ছিল এ কথা সবাই অনুমান করত, কিন্তু সেটা যে দুহাজার টাকা তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। নিজের দুষ্কৃতি যেমন লোকে গোপন রাখে, তেমনি করে টাকাটা সে লুকিয়ে রেখেছিল। চৌধুরি গ্রামের মোড়ল এবং সৎ চরিত্রের লোক। সেই জন্যই বুড়ি তার কাছে শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল।

দুই

গোমতীর শ্রাদ্ধশান্তিতে চৌধুরি বেশি টাকা খরচ করল না। এই সব পারলৌকিক কাজকর্ম চুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছেলে হরনাথ সিংহকে ডেকে ইট, পাথর এবং চুনের হিসাব করতে বসল। হরনাথ চালডালের ব্যবসা করত। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে বসে বসে শুনল, শেষে বলে উঠল— আচ্ছা, এখন যদি দু-চার মাস কুয়োটা না তৈরি হয়, তাহলে খুব একটা ক্ষতি হবে কি?

চৌধুরি বলল, হুঁ। তারপর একটু থেমে বলল, ক্ষতি আর কী হবে, কিন্তু দেরি করার দরকারটাই বা কী? টাকা তো সে দিয়েই গেছে, ফাঁকতালে আমার কিছু নামডাক হবে। তাছাড়া গোমতী মরতে মরতেও তাড়াতাড়ি কুয়ো তৈরির কথা বলতে ছাড়েনি।

হরনাথ — হ্যাঁ, তা তো বলেছিল ঠিকই। কিন্তু ব্যাবসার বাজারটা আজকাল যাচ্ছে বেশ ভালো। এখন যদি দু-তিন হাজার টাকার মাল কিনে ঘরে মজুত করা যায়, তাহলে অঘ্রান-পৌষ নাগাদ সওয়া গুণ দাম পাওয়া যেত। আমি না হয় আপনাকে কিছু সুদ ধরে দেব।

চৌধুরির মন ভয় এবং শঙ্কার দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। দু হাজার টাকা যদি আড়াই হাজার হয়, তাহলে কী আর বলার থাকে। ইঁদারার গায়ে কিছু লতাপাতার নকশা এঁকে দেওয়া যাবে না হয়। কিন্তু ভয়ের ব্যাপারও তো আছে। এই দুশ্চিন্তা সে চেপে রাখতে পারল না। বলল—যদি লোকসান হয় তাহলে কী হবে?

হরনাথ রাগতভাবে বলল, কেন? লোকসান হতে যাবে কেন? একি একটা কথা হল!

চৌধুরি — আচ্ছা ধরেই না হয় নাও যে লোকসান হল। তখন কী হবে?

হরনাথ এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল—আপনি টাকাটা দিতে চান না তাই বলুন? বড়ো ধর্মাত্মা হয়ে উঠেছেন দেখছি।

আর সব বৃদ্ধদের মতো চৌধুরিও নিজের ছেলেকে ভয় করত। কুণ্ঠিত হয়ে বলল, টাকা দেব না, একথা আমি কখন বললাম? তবে এতো পরের টাকা, একটু বুঝেশুনেই তো এতে হাত লাগানো উচিত। কারবারের কথা কে বলতে পারে। দাম যদি আরও পড়ে যায় তাহলে? ফসলে পোকা ধরতে পারে। কেউ শত্রুতা করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। এ সমস্ত কথাই একবার ভালো করে ভেবে নাও।

হরনাথ ব্যঙ্গ করে বলে উঠল—তা এতই যদি ভাবতে পারেন, তাহলে সব টাকা চোরে নিয়ে যেতে পারে সেটাই বা ভাবছেন না কেন? কিংবা ধরুন, পাকা গাঁথনির দেওয়াল বসে গেল। এমন তো হয়েই থাকে।

চৌধুরির ঝুলিতে আর কোনো যুক্তিই রইল না, দুর্বল সেপাইও তাল ঠোকে আর আখড়াতে নেমেও পড়ে কিন্তু তলোয়ারের ঝলকানি দেখলেই তার হাত পা সব ঠান্ডা। হাল ছেড়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চৌধুরি বলল—তা কত টাকা নেবে?

কুশলী যোদ্ধার মতো হরনাথ শত্রুকে পিছু হটতে দেখে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, একশো, দেড়শো টাকা নিয়ে কি ছেলেখেলা করব? দেবেন তো সবটাই দিন।

চৌধুরি রাজি হয়ে গেল। গোমতী যখন টাকা তাকে দিয়েছিল, তখন কেউ তা দেখেনি। লোকনিন্দার সম্ভাবনা ছিল না। হরনাথ মাল কিনতে শুরু করল। বাড়িতে চাল-গমের বস্তার স্তূপ

লেগে গেল। আরামপ্রিয়, ঘুমকাতুরে চৌধুরি এরপর সারা রাত ধরে এমনভাবে বস্তা পাহারা দিতে শুরু করল যে, একটা ইঁদুরেরও সাধ্য ছিল না বস্তার ভেতরে ঢোকে। চৌধুরি এমনভাবে তাড়া করত যে বিড়ালও হার মানত। এইভাবে ছ মাস কেটে গেল। পৌষ মাসে সে সব বিক্রি হল এবং পুরো পাঁচশো টাকা লাভ হল।

হরনাথ বলল—এর থেকে আপনি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নিন। চৌধুরি তেতে উঠে বলল—পঞ্চাশ টাকা কি ভিক্ষে দিচ্ছ? কোনো মহাজনের কাছ থেকে যদি টাকা নিতে তাহলে কম করেও দুশো টাকা সুদ গুণতে হত, আমাকে বড়ো জোর তুমি তার থেকে দু-চার টাকা কম দিতে পার। আবার কী করবে?

হরনাথ বেশি কথা বাড়াল না। চৌধুরিকে দেড়শো টাকা দিয়ে গেল। চৌধুরির আত্মা কোনো দিন এতটা তৃপ্তি পায় নি। রাত্রে যখন নিজের ঘরে ঘুমোতে গেল, তখন তার মনে হল যেন বুড়ি গোমতী দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। চৌধুরির বুক ধড়ফড় করতে লাগল। সে ঘুমিয়ে ছিল, কোনো নেশাটেশা করেনি। গোমতী সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। সেই শুকিয়ে যাওয়া মুখেও একটা বিচিত্র উল্লাস ফুটে উঠেছিল।

তিন

এইভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। চৌধুরি হরনাথের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করার ফন্দি আঁটত সব সময়, কিন্তু হরনাথ সর্বদাই গড়িমসি করে এড়িয়ে যেত। সে প্রতি বছরই খানিকটা করে সুদ দিয়ে দিত, আর আসলের কতা উঠলেই হাজারটা মিথ্যে বলত। কখনো ব্যাবসা ভালো চলছে না বলে কান্নাকাটি করত, কখনও বা চুক্তির কথা তুলত। তবে কারবারের উন্নতি ঘটছিল, সেটা ঠিক। শেষ পর্যন্ত চৌধুরি একদিন হরনাথকে পরিষ্কারভাবে বলে দিল, তোমার ব্যাবসা বাঁচুক আর ডুবুক আমার কিছু আসে যায় না। এই মাসের ভেতরেই আমার টাকা তোমাকে চুকিয়ে দিতে হবে। হরনাথ নানান বাহানা তুলল, কিন্তু চৌধুরি নিজের সংকল্পে অটল রইল।

হরনাথ প্রচণ্ড রাগে ঝেঁঝে উঠে বলল—বলছি, আর দু-এক মাস অপেক্ষা করুন না কেন, মাল বিক্রি হয়ে গেলেই টাকাটা দিয়ে দেব।

চৌধুরি দৃঢ়ভাবে বলল—তোমার মালতো কোনো দিন বিক্রি হবে না, আর তোমার দু মাসও কোনো দিন পূর্ণ হবে না। আমি আজই টাকা চাই।

হরনাথ এর ফলে প্রচণ্ড রেগে উঠে গেল এবং দুহাজার টাকা নিয়ে এসে চৌধুরির সামনে ছুঁড়ে দিল।

চৌধুরি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল—টাকা তো তাহলে তোমার কাছে ছিলই।

— না হলে কি শুধু মুখের কথায় রোজগার হয়?

—তাহলে তুমি আজ আমাকে কেবল ৫০০ টাকা দাও। বাকিটা দুমাসের মধ্যে দেবে। সব তো আর আজকেই খরচ হবে না।

হরনাথ রাগ দেখিয়ে বলল—আপনার টাকা আপনি ইচ্ছে করলে খরচ করবেন। ইচ্ছে করলে জমিয়ে রাখবেন। ও টাকায় আমার দরকার নেই। দুনিয়ায় মহাজনেরা তো আর মরে হেজে যায় নি যে শুধু শুধু আপনার গঞ্জনা সহ্য করব।

চৌধুরি টাকা উঠিয়ে একটা তাকের উপর রেখে দিল। কুয়ো খোঁড়ার মাপজোক করার উৎসাহটা কিন্তু নিবে গেল।

হরনাথ টাকাটা ফেরত দিল বটে, কিন্তু মনে মনে আরেকটা ফন্দি আঁটল। মাঝরাতে যখন সারা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তখন হরনাথ চৌধুরির ঘরের দরজা আস্তে আস্তে আলগা করে ভেতরে ঢুকল। চৌধুরি অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছিল। হরনাথ ঠিক করেছিল যে সে টাকার থলি দুটো তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু হাত বাড়াতেই দেখল সামনে গোমতী দাঁড়িয়ে। দু হাত দিয়ে থলি দুটোকে আঁকড়ে ধরে আগলে রেখেছে। হরনাথ ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। চোখে হয়তো ভুল দেখেছে মনে মনে এই কথা ভেবে সে যেই আবার হাত বাড়িয়েছে অমনি দেখল যে সেই মূর্তি এমন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে যে হরনাথ এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে পালাল, কিন্তু বারান্দায় এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

চার

হরনাথ ব্যাপারীদের দেওয়ার জন্য চারিদিক থেকে নিজের প্রাপ্য সব টাকা তুলে এনেছিল। চৌধুরি চোখ গরম করতে সে সব টাকাই এনে সামনে ফেলে দিয়েছিল। আর মনে মনে ফন্দি এঁটে রেখেছিল যে রাতের বেলায় টাকাটা মেরে দেবে। তারপর মিছিমিছি চোর চোর বলে শোরগোল তুলে দেবে, তার ফলে ওর ওপর সন্দেহটা হবে না। কিন্তু পরিকল্পনাটা ঠিক ঠিক ভাবে কার্যকর না হওয়ার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই ব্যাপারীদের তাগাদা শুরু হয়ে গেল। যত রকমের অজুহাত খাড়া করা যায় তা সবই সে করল, কিন্তু মিথ্যে স্তোক দিয়ে আর কতদিন লোক ঠেকানো যায়? শেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে লোকে আদালতে নালিশ করবে বলে ভয় দেখাল। একজন তো তিনশো টাকার জন্য নালিশ ঠুকেই দিল। মুশকিলে পড়ল বেচারা চৌধুরি। দোকানে হরনাথই বসত এবং এনিয়ে চৌধুরির কোনো মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু হরনাথের যা কিছু সুনাম তা ছিল চৌধুরির জন্যই। লোকেরা চৌধুরিকে সৎ এবং লেনদেনের ব্যাপারে খাঁটি মানুষ বলে জানত। যদিও তখনও পর্যন্ত কেউ তার কাছে তাগাদা করেনি, কিন্তু তিনি নিজেই লজ্জায় সকলের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখতেন। যে অবস্থার সম্মুখীনই তিনি হন না কেন, কুয়োর টাকা তিনি ছোঁবেন না—এটা তিনি এক রকম ঠিকই করে নিয়েছিলেন।

একদিন রাত্রে এক ব্যাপারীর মুসলমান চাপরাশি এসে চৌধুরির বাড়ি বয়ে হাজারটা গালাগালি করে গেল। শুনতে শুনতে চৌধুরির মাঝে মাঝে এমন রাগ হচ্ছিল যে, ভাবছিলেন বাইরে বেরিয়ে লোকটার গোঁফ উপড়ে নেন, কিন্তু মনকে এই বলে প্রবোধ দিলেন যে. এতে আমার কী? ছেলের ঋণ শোধ করা বাপের কর্তব্য নয়।

খেতে বসার সময় গিন্নি বললেন—এসব কী উপদ্রব শুরু করেছ বলো তো?

চৌধুরি কঠিনভাবে বললেন—আমি শুরু করেছি?

— তুমি ছাড়া আর কে? ছেলেটা দিব্যি করে বলছে যে তার কাছে বেশি মাল নেই, টাকা তো তুমি সব চেয়ে নিয়ে নিয়েছ।

চৌধুরি—চেয়ে নেব না তো কী করব? অন্যের টাকা নিয়ে নিজের ফুটানি করা আমার পছন্দ নয়।

স্ত্রী—আর এই যে নাক কাটা যাচ্ছে, সেটা খুব ভালো লাগছে?

চৌধুরি—এতে আমার করার কী আছে? পাঁচ বছর হয়ে গেল কুয়োটা আর করাই যাবে না নাকি?

স্ত্রী—ছেলেটা এখনও কিছু খেল না। সকালে সামান্য একটু মুখে তুলেছিল মাত্র।

চৌধুরি—তুমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাওয়ালে না কেন? খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিলে তো আর টাকা মিলবে না।

স্ত্রী—তুমি নিজে গিয়ে বুঝিয়ে দ্যাখো না কেন?

চৌধুরি—সে তো আমাকে এখন শত্রু বলে মনে করছে।

স্ত্রী—আমি টাকাটা নিয়ে গিয়ে ছেলেকে দিয়ে আসছি। যখন হাতে টাকা আসবে তখন কুয়ো বানিয়ে দিও।

চৌধুরি—আরে না না! এমন কাণ্ড করো না। আমি এত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। এতে আমার ঘরসংসার যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাও স্বীকার।

কিন্তু চৌধুরি গিন্নি এসব কথায় কান দিলেন না। তিনি দৌড়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে টাকার থলির দিকে হাত বাড়াতে গিয়েই একটা চিৎকার করে পিছু হটে এলেন। তাঁর সারা শরীর সেতারের তারের মতো কাঁপতে লাগল।

চৌধুরি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আরে, কী হল কী? তোমার মাথা ঘুরে গেল না তো? চৌধুরির স্ত্রী তাকের দিকে ভীত চোখে তাকিয়ে বললেন—ওই যে, ওই যে, পেতনিটা ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে।

চৌধুরি তাকের দিকে তাকিয়ে বলল, —পেতনি কই? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

স্ত্রী—আমার বুক তো ধ্বক ধ্বক করছে। আমার মনে হল যেন বুড়িটা আমার হাত টেনে ধরল।

চৌধুরি—এ সব তোমার মনের ভুল। বুড়ি তো মারা গেছে সেই পাঁচ বছর আগে, সে কি এখনও এখানে বসে আছে?

স্ত্রী—আমি স্পষ্ট দেখলাম, সেই বুড়ি! ছেলেটাও বলছিল বুড়িটাকে দেখেছে রাত্রে টাকার থলিতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে।

চৌধুরি—ও রাতের বেলা আমার ঘরে আবার কবে গেল?

স্ত্রী—তোমার সঙ্গে টাকাপয়সার ব্যাপারেই কিছু কথা বলতে গিয়েছিল। বুড়িকে দেখতে পেয়েই পালিয়ে এসেছে।

চৌধুরি—আচ্ছা। আবার ভেতরে যাও তো—আমি তাকিয়ে আছি। গিন্নি দুকানে হাত দিয়ে বললেন,—রক্ষে কর বাবা। আমি আর ও ঘরে পা দিচ্ছি না।

চৌধুরি—ঠিক আছে আমিই গিয়ে দেখছি।

চৌধুরি তখন ঘরে গিয়ে দুটো থলিই তাক থেকে তুললেন। ভয়ের কোনো কিছুই হল না। গোমতীর ছায়াও কোথাও ছিল না। গিন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলেন। চৌধুরি এসে বেশ জাঁক করেই বললেন—কই, আমি তো কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। ওখানে থাকলে এর মধ্যে কোথায় চলে যাবে?

স্ত্রী—কী জানি, তোমাকে কেন দেখা দিল না? তোমাকে তো স্নেহ করত, তাই হয়তো সরে গেছে।

চৌধুরি—ও তোমার চোখের ভুল, আর কিছু নয়।

স্ত্রী—ঠিক আছে। ছেলেকে ডেকে ভজিয়ে দিচ্ছি।

চৌধুরি—আমি তো দাঁড়িয়েই আছি। এসে একবার ভালো করে দ্যাখো না কেন?

চৌধুরি গিন্নি একথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। ঘরের ভেতরে এসে তাকের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে হাত বাড়ালেন এবং তারপরেই প্রচণ্ড চিৎকার করে এক ছুটে একেবারে উঠোনে এসে তবে দম নিলেন। চৌধুরিও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠোনে নেমে এসে অত্যন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী ছিল? শুধু শুধু পালিয়ে এলে যে। আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না।

চৌধুরি গিন্নি হাঁফাতে হাঁফাতেই ধমকে উঠলেন, যাও যাও। তুমি তো আরেকটু হলেই আমাকে মেরে ফেলতে। না জানি তোমার চোখের কী হয়েছে? ডাইনিটা তো এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

এরই মধ্যে হরনাথও সেখানে এসে পড়ল। মাকে উঠোনে দেখে জিজ্ঞেস করল, কী হল মা? শরীর ভালো আছে তো?

হবনাথের মা বলল, ওই পেত্নিটা আজ দুবার দেখা দিয়েছে। আমি ভাবলাম—যাক গে, টাকাটা তোকে দিয়েই দি। আবার যখন হাতে টাকা আসবে, তখন কুয়োটা বানালেই হবে। কিন্তু যেইনা থলি দুটোতে হাত দিয়েছি অমনি ওই পেত্নিটা আমার হাত টেনে ধরল। প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়।

হরনাথ বলল, কোনো একটা ভলো ওঝা ডাকতে হয়। ওটাকে ঝেঁটিয়ে তাড়াবে।

চৌধুরি—সেদিন রাতে নাকি তোমাকেও দেখা দিয়েছিল?

হরনাথ—হ্যাঁ। আমি তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছিলাম। ভেতরে যেই না পা দিয়েছি, দেখি যে পেত্নিটা তাকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে গেলাম।

চৌধুরি—আচ্ছা ঠিক আছে। আবার যাও তো দেখি।

স্ত্রী—সে কী? এবার তো ওকে আমিই যেতে দেব না। যদি কেউ লাখ টাকাও দেয়, তবুও না।

হরনাথ—সে তো আমি নিজেই যাব না।

চৌধুরি—কিন্তু আমাকে তো দেখা দিচ্ছে না। ব্যাপারটা কী?

হরনাথ—কী জানি, আপনাকে হয়তো ভয় পায়। আজ কোনো ওঝা ডাকতে হবে।

চৌধুরি—আসল ব্যাপারটা যে কী তা মাথাতেই ঢুকছে না। যাক গে। বৈজু পাঁড়ের ডিক্রির কী হল?

হরনাথ ইদানীং চৌধুরির উপর এতটাই চটেছিল যে, নিজের দোকানের বিষয়ে কোনো কথাই তার কাছে বলত না। উঠোনের দিকে তাকিয়ে যেন হাওয়াকে উদ্দেশ করে বলল, যা ভাগ্যে আছে তাই হবে। আমার প্রাণটুকু নেওয়া ছাড়া আর নেওয়ার আছেই বা কী? একবার যা গিলে ফেলেছি তাতো আর উগরে দিতে পারব না।

চৌধুরি—সে যদি ডিক্রি জারি করে দেয়, তাহলে কী হবে?

হরনাথ—বেশি আর কী হবে? দোকানে চার-পাঁচশো টাকার মাল আছে, নিলামে বিক্রি হয়ে যাবে।

চৌধুরি—তাহলে তো কারবার সব লোপাট হয়ে যাবে।

হরনাথ—কারবারের জন্য আর কত সহ্য করব। আর যদি আগে জানতাম যে কুয়ো তৈরির এতটা তাড়া, তাহলে এ কাজে নিজেকে জড়াতামই না। ডালরুটির অভাব তো হচ্ছিল না। যাক্‌গে। বড় জোর দু-চার মাস হাজতে থাকতে হবে, এ ছাড়া আর বেশি কী হবে?

তার মা বললেন—আমি বেঁচে থাকতেই তোকে হাজতে নিয়ে যাবে? যে তোকে হাজতে নিয়ে যেতে আসবে তার মুখে ছ্যাঁকা দিয়ে দেব না!

হরনাথ হঠাৎ দার্শনিক হয়ে গেল। বলে উঠল—মা-বাবা তো জন্মের জন্য দায়ি, কারও কর্মের দায়িত্ব তাদের নয়।

চৌধুরি ছেলেকে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর ভাবনা ছিল যে হরনাথ বোধহয় টাকাটা মেরে দেওয়ার জন্য টালবাহানা শুরু করেছে। এইজন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে টাকাটা ফেরত নিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারলেন যে, হরনাথ সত্যি সত্যি সংকটে পড়েছে। মনে মনে চিন্তা হল যদি হরনাথকে জেলে নিয়ে যায়, কিংবা দোকান ক্রোক করে, তাহলে তো কুলমর্যাদা ধুলোয় মিশে যাবে। গোমতীর টাকাটা যদি এখন ওকে দিয়ে দিই তাহলে কী আর বেশি ক্ষতি হবে? দোকান তো চালু আছেই, একদিন না একদিন টাকা হাতে আসবেই।

ঠিক এমনি সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাকল—হরনাথ সিং। হরনাথের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চৌধুরি জিজ্ঞেস করলেন, কে ডাকছে?

— ক্রোকের জন্য আমিন এসেছে।

— কেন, দোকান ক্রোক করবে নাকি?

— তাই তো মনে হচ্ছে।

— কত টাকার ডিক্রি?

— বারোশো টাকার।

— ক্রোকের আমিনকে কিছু দিয়ে দিলে কি শুনবে না?

— শুনবে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু মহাজনও ওর সঙ্গে আছে বোধহয়। ওর টাকা যা খাওয়ার তা ওদিক থেকেই খেয়েছে আগেই।

— তাহলে না-হয় বারোশো টাকা গোমতীর টাকা থেকে দিয়ে দাও।

— ও টাকা কে ছোঁবে? না জানি, ঘরে আবার কী বিপদ ডেকে আনব।

— আমরা তো ওর টাকাটা মেরে দেওয়ার জন্য নিচ্ছি না। চলো আমিই দিচ্ছি বার করে।

চৌধুরির এই সময় ভয়ও হল, গোমতী ওকেও আবার দেখা দেবে না তো? কিন্তু সে আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না। তিনি একটা থলি থেকে দুশো কুড়ি টাকা বের করে আরেকটি থলিতে রেখে হরনাথকে দিলেন। এই ভাবে সন্ধ্যার আগেই আর দুহাজার টাকার এক টাকাও অবশিষ্ট রইল না।

পাঁচ

এরপর বারোটা বছর কেটে গেছে। চৌধুরি এবং হরনাথ কেউই আর এই সংসারে বেঁচে নেই। চৌধুরি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তার মাথায় কুয়োর চিন্তাই ঘুরে বেরিয়েছে। এমন কী, মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও তার মুখে বারবার কুয়োর কথাই উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু দোকানের ভাগ্যে টাকার অভাব লেগেই ছিল। চৌধুরি মারা যেতেই কারবার লাটে উঠল। হরনাথ টাকাটা-সিকেটা লাভে সন্তুষ্ট না হয়ে দুই-তিন গুণ লাভের দিকে হাত বাড়াল। জুয়ো খেলা ধরল। একটা বছর কাটল না, দোকান উঠে গেল। গয়নাগাঁটি, বাসনকোশন, সংসারের যথাসর্বস্ব শেষ হয়ে গেল। চৌধুরির মৃত্যুর ঠিক এক বছর পরেই হরনাথ লাভক্ষতির হিসেব ছেড়ে এই সংসার থেকে বিদায় নিল। হরনাথের মায়ের জীবনে আর কোনো অবলম্বন থাকল না। রোগে পড়লেন, কিন্তু ওষুধপথ্য জুটল না। তিন-চার মাস নানারকম দুর্ভোগে ভুগে ভুগে তিনিও একদিন চোখ বুজলেন। বেঁচে রইল একমাত্র হরনাথের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। সে বেচারার জন্য আর কোনো আশ্রয়, কোনো সম্বল রইল না। শরীরের ওই অবস্থায় কুলিকামিনের কাজ করাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পড়শিদের কাঁথাকাপড় সেলাই করে কোনো রকমে চার-পাঁচ মাস কাটল। সবাই বলল— লক্ষণ তো সব ছেলের মতোই। তোর ছেলেই হবে। সেটাই তার সামনে একমাত্র আশার আলো। কিন্তু যখন মেয়ে হল তখন আশাভরসা শেষ হয়ে গেল। এর ফলে মায়ের মন এতটা পাষাণে পরিণত হল যে, নবজাত শিশুকে একবারের জন্যও বুকে নিল না। পড়শিরা অনেক করে বোঝানোর পর মেয়েকে বুকে নিল বটে, কিন্তু সে বুকে এক ফোঁটা দুধও অবশিষ্ট ছিল না। সেই সময় হতভাগী মায়ের হৃদয়ে করুণা, বাৎসল্য আর মোহের এক আবর্তের সৃষ্টি হল। যদি কোনো উপায়ে তার স্তনে এক ফোঁটা দুধও আসত তাহলেও মায়ের জীবন ধন্য হত।

মেয়েটার নিষ্পাপ, করুণ, আকুতিপূর্ণ এবং সতৃষ্ণ মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মাতৃহৃদয়ের বুকফাটা কান্না যেন সহস্র ধারায় বর্ষিত হতে থাকল। জননী-হৃদয়ের অন্তহীন কল্যাণকামনা, সমস্ত মাধুর্য, অপরিমেয় মমত্ব তার সিক্ত চোখের দৃষ্টি বেয়ে তেমনি করেই নিষিক্ত করে তুলত যেমন ভাবে চন্দ্রালোকের শীতল স্নিগ্ধতা ধরার পুষ্পকে স্নপিত করে তোলে। কিন্তু হতভাগিনী মেয়েটার ভাগ্যে মাতৃস্নেহের সুখটাও টিকল না। মা তার বুকের দুধ তো নয়, যেন বুকের রক্ত খাইয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করল, কিন্তু নিজের শরীর দিন দিন জীর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

একদিন গ্রামের লোকেরা এসে দেখল যে হরনাথের বউ মাটিতে পড়ে আছে আর অবুঝ মেয়েটা তার বুকের কাছে বসে স্তন চুষছে। শোক এবং দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট শরীরে রক্ত কোথায় যে বুকে দুধ আসবে?

তবু মেয়েটি পাড়াপড়শির দয়ায় দোরে দোরে ভিক্ষা করেই বড়ো হয়ে গেল। একদিন সেই মেয়ে ঘাস কাটতে কাটতে বুড়ি গোমতীর যেখানে ঘর ছিল সেখানে গিয়ে পৌঁছল। ঘরের ছাদ কবেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। কেবলমাত্র কোথাও কোথাও দালানের চিহ্নটুকু ছিল। কোথাও বা আধখানা দেওয়াল খাড়া ছিল। মেয়েটা কী জানি কী ভেবে খুরপি দিয়ে মাটিতে গর্ত করতে শুরু করল। দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে গর্ত খুঁড়ে চলল। খিদে-তৃষ্ণার কোনো খেয়ালই তার ছিল না। ভয়ডর বলতেও কিছু ছিল না। আঁধার হয়ে গেল, কিন্তু সে যেমনকার তেমনই গর্ত খুঁড়ে যেতে

লাগল। সে সময় কিষানরা ভুলেও ওই জায়গা দিয়ে যাতায়াত করে না, কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি নির্ভয় চিত্তে গর্ত থেকে মাটি তুলতে থাকল। শেষে যখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল তখন উঠে চলে গেল।

পরের দিন খুব সকালে উঠে এত ঘাস কাটল যা সে সারাদিনেও কাটতে পারে না। দুপুরের পরেই নিজের কাস্তে খুরপি নিয়ে ফের সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু আজ আর সে একলা ছিল না, সঙ্গে আরও দুটো ছেলে। তিনজনে মিলে সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুয়ো কুয়ো খেলতে খেলতে মাটি খুঁড়ল। মেয়েটি গর্তের ভেতর মাটি কাটছিল আর ছেলে দুটো সেই মাটি নিয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছিল।

তৃতীয় দিনে আরও দুজন ছেলে এসে ওই খেলায় যোগ দিল। বিকেল অবধি খেলা চলল। সেদিন গর্তটা প্রায় দুহাত গভীর হয়ে গেল। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অদ্ভুত খেলায় অভূতপূর্ব উৎসাহের জোয়ার এল।

চতুর্থ দিনে আরও কিছু বালক এসে যোগ দিল। পরামর্শ করে ঠিক হল কে ভেতরে নামবে, কে মাটি ওঠাবে, কে মাটি ফেলবে। গর্তটা এতদিনে চার হাত গভীর হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ তার খবর পায়নি।

একদিন রত্রিবেলা এক কিষান তার হারিয়ে যাওয়া মোষ খুঁজতে খুঁজতে ওই ভাঙা চালায় এসে হাজির হল। খুঁড়ে রাখা মাটির উঁচু স্তূপ, একটা বড়ো গর্ত আর একটা টিমটিমে প্রদীপের আলো দেখে ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেল। তারপর অন্যদের ডেকে আনল। তারা কয়েকজন ছিল একসঙ্গে, অতএব এবার আর ভয় পাওয়ার ব্যাপার ছিল না। কাছাকাছি এসে দেখা গেল যে মেয়েটি সেখানে বসে আছে। একজন জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, এই গর্তটা তুই খুঁড়েছিস?

সে বলল, হ্যাঁ।

— গর্ত খুঁড়ে কী করবি?

— ওখানে কুয়ো বানাব।

— কী করে কুয়ো বানাবি?

— এতটা যেমন করে খুঁড়েছি, ওইভাবে বাকিটাও খুঁড়ব। গাঁয়ের সব ছেলেরা এখানে খেলতে আসে।

— মনে হচ্ছে তুই নিজে তো মরবিই, সেই সঙ্গে আরও কটা ছেলেকেও মারবি। খবরদার কাল থেকে গর্ত খুঁড়বি না।

পরের দিন আরে কোনো ছেলে এল না। মেয়েটিও সারাদিন মজুরি খেটে কাটাল, কিন্তু সন্ধে বেলায় ঠিক সেখানে প্রদীপ জ্বলল এবং ওকেও খুরপি হাতে বসে থাকতে দেখা গেল। গ্রামের লোক ওকে মারধোর করল, ঘরে বন্ধ করে রাখল, কিন্তু সে ফাঁক পেলেই সেখানে ছুটে যায়। গাঁয়ের লোকেরা প্রায়শই সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। বালিকার এমন অলৌকিক একাগ্রতা ক্রমশ তাদের মধ্যেও উৎসাহের সঞ্চার করল। তারাও কুয়ো খোঁড়ায় হাত লাগাল।

এদিকে কুয়ো খোঁড়া চলেছে, আর ওদিকে মেয়েটা সেই মাটি দিয়ে ইট তৈরি শুরু করল। এই খেলায় সারা গ্রামের ছেলেরা অংশ নিল। জোছনা রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখনও ওকে

ইট বানাতে দেখা যেত। কে জানে এত অধ্যবসায় ওর কোথা থেকে আসত। সাত বছর বয়সটা কি আর একটা বলার মতো বয়স হল? কিন্তু সাত বছরের এই মেয়েটা বুদ্ধি আর কথাবার্তায় ওর তিনগুণ বয়সের লোকেরও কান কেটে দেয়।

শেষ পর্যন্ত সেই একদিন এল যেদিন কুয়ো বাঁধা সম্পূর্ণ হল আর তার চাতাল পাকা করে বাঁধানো হল। সেদিন রাতে মেয়েটি সেই চাতালে ঘুমোল। সারাদিন তার আনন্দের সীমা ছিল না। নাচেগানে একেবারে ঝলমল করছে।

পরদিন সকালে, ইঁদারার চাতালে তার প্রাণহীন দেহটা পাওয়া গেল। সেদিন থেকে লোকে বলতে শুরু করল, বুড়ি গোমতীই এই মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছিল। তখন থেকেই ওই কুয়োটার নাম হল — জাঁতা-বুড়ির কুয়ো।

(পিসনহারী কা কুআঁ / ১৯২৮) অনুবাদ সৌরেন ভট্টাচার্য

অভিলাষ

কাল বাড়ির পাশে হঠাৎ একটা ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হল। দেখলাম এক পানওয়ালা তার বউকে পেটাচ্ছে। বেচারি বউটা কাঁদছে। তবু পাষণ্ড পানওয়ালাটার হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়া হচ্ছে না। মেরেই চলেছে। শেষমেষ বউটাই রুখে দাঁড়িয়ে বলল—খবরদার, আর গায়ে হাত তুললে ভালো হবে না বলছি। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ভিক্ষে করে খাব তবু তোমার ঘরে আর ফিরে আসব না। এই বলে ঘর থেকে একটা পুরোনো শাড়ি নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল। পানওয়ালাটা আকাট বুদ্ধুর মতো তাই দেখতে লাগল। বউটা কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এল। দোকানের পয়সার বাক্স থেকে কিছু পয়সা বার করল। সম্ভবত তখন পর্যন্ত তার মধ্যে কিছু মমতা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর লোকটা অত্যন্ত দ্রুত এসে তার হাত চেপে ধরল, পয়সাগুলো কেড়ে নিল। কী নিদারুণ হৃদয়হীনতা, অসহায় নারীর উপর পুরুষের কী অত্যাচার! একদিন হয়তো ওই মুখ দেখার জন্য কত না প্রতীক্ষা করত, ওই স্ত্রীর জন্যেই হয়তো প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত, আর আজ এত নির্দয় হয়ে উঠেছে যেন মনে হচ্ছে দুজনের মধ্যে কোনোকালেই ভাব-ভালোবাসার চিহ্নমাত্রও ছিল না। বউটা পয়সা না নিয়ে এবং একটাও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কে জানে কোথায় গেল। আমি আমার জানলা থেকে ব্যাপারটা দেখছিলাম। ভাবলাম, হয়তো বউটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে অথবা লোকটাই শেষে যাবে, বুঝিয়ে-শুনিয়ে বউকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু দুটোর কোনোটাই হল না। জীবনে এই প্রথম একটা মেয়ের এইরকম দুর্দশার সঙ্গে আমার সত্যিকারের পরিচয় ঘটল। দোকানটা দুজনেরই ছিল। লোকটা তো প্রায় ঘুরেই বেড়াত। বউটাই দিনরাত দোকানে বসে থাকত পরম সতীর মতো। রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত আমি ওকে দোকানে বসে থাকতে দেখতাম, আবার সকালে ঘুম থেকে উঠেও দেখতাম বসে আছে। সংসারের অন্য পাঁচটা কাজও লোকটার চেয়ে বউটাই বোধহয় বেশি করত। তবু পুরুষই সব কিছু, সংসারে স্ত্রী যেন কিছু নয়। পুরুষ যখন খুশি চাইলেই, ইচ্ছে করলেই স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে।

এই ব্যাপারটা হঠাৎই আমাকে এমন ভাবিয়ে তুলেছিল যে, আমার চোখ থেকে ঘুম যেন উবে গেল। রাত বারোটা বেজে গেল তবুও আমি বসেই রইলাম। কিছুতেই ঘুম এল না। চারিদিকে ধবধবে সাদা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। অহংকারী নিশাকর যেন তার রত্নখচিত সিংহাসনে বসে রয়েছেন। টুকরো টুকরো মেঘগুলো ধীরে ধীরে তার সামনে এসে বিবর্ণ হয়ে আলাদা আলাদা ভেসে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন শুভ্রবসনা সুন্দরীরা তার হাতে দলিত অপমানিত হয়ে অশ্রুভরা চোখে নীরবে মন্থর পায়ে চলে যাচ্ছে। ওই দৃশ্য আমাকে এত বিহ্বল করে তুলল যে, আমি আর পারলাম না। জানলা বন্ধ করে খাটের উপর বসলাম। পাশে আমার স্বামী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওর উজ্জ্বল

মুখমণ্ডলের মধ্যে আমি যেন আকাশের চাঁদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। এই তো সেই হাসিভরা মুখ যা দেখে একদিন আমার দুচোখ পরম তৃপ্তিতে ভরে উঠত, এই সেই বিশাল বক্ষ যার উপর মাথা রেখে একদিন আমি আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে এক কোমল মধুর স্পন্দন অনুভব করতাম, এই সেই নির্ভর দুটো হাত যা একদিন আমাকে আলিঙ্গন করলে হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ উঠত। কিন্তু আজ কতদিন হয়ে গেল। আমি ওই মুখে আর সেই উজ্জ্বল রেখা দেখতে পাই না, যার জন্য মাঝে মাঝে সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কতদিন হল আমি ওই বুকে মাথা রাখিনি কিংবা ও ওর দুটো হাত দিয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেনি। কিন্তু কেন? আমি কি অন্যরকম কিছু হয়ে গেছি? নাকি ওরই কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

এমন কিছু বেশিদিন তো হয়নি। পাঁচ বছর—মাত্র পাঁচ বছর, যেদিন ও ওর বিশাল দুটো চোখ এবং স্ফুরিত অধরে আমায় প্রথম স্বাগত জানিয়েছিল, আমি লজ্জায় যেন তাকাতে পারিনি। অথচ হৃদয়ে কি প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা হচ্ছিল ওর সম্পূর্ণ মুখখানা দেখার, কিন্তু পারিনি। লজ্জায় আমি মুখ তুলতে পারিনি। শেষে একবার ভীষণ সাহসে চোখ তুলে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। দৃষ্টি ফিরে এল। তবু সেই দেখা না দেখার অপার আনন্দ আমি আজও ভুলতে পারিনি। আজও সেই ছবি আমার হৃদয়ে আঁকা আছে। আজও সেই ছবি মনে এলে সমস্ত সত্তা জুড়ে কেমন যেন একটা ডেউ খেলে যায়। মধুর স্মৃতিতে সারা শরীরে শিহরণ বয়ে যায়। রোমাঞ্চ জাগে। কিন্তু এখন দিনরাত সেই মুখই দেখছি—সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, গভীর রাতে। অষ্টপ্রহরই দেখছি কিন্তু কই মনের মধ্যে সেই ঢেউ তো ওঠে না। ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে আর আমি হয়তো চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে থাকি। অথচ একদিন ছিল যখন ও বাড়ি থেকে বেরোত আর আমি দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম। পিছু ফিরে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও যখন মৃদু হাসত মনে হত, আহা কী না স্বর্গসুখ! বিকেল হতে না হতেই ছাতে গিয়ে ওর ফেরার পথের দিকে চেয়ে থাকতাম। দূর থেকে আসতে দেখলে পাগলের মতো নীচে ছুটে আসতাম। বাইরের দরজা পর্যন্ত এসে ওকে সাগ্রহে স্বাগত জানাতাম। কিন্তু আজ আমি জানিও না, কখন যে যায় আর কখন আসে। বাইরে দরজা বন্ধ হলে বুঝতে পারি সে চলে গেছে আবার যখন দরজা খোলার শব্দ শুনি তখন বুঝি ফিরে এসেছে। কিছুতেই বুঝতে পারিনা কেন? আমি কি অন্যরকম কিছু হয়ে গেছি? নাকি ওরই কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

তখন ও আমার ঘরে যখন তখন আসত না। ওর পায়ের শব্দ হঠাৎ কানে এলে সমস্ত শরীর মন যেন কেমন করে উঠত। ওর সামান্য কথায়, ছোট্ট ছোট্ট কাজে আমি কেমন মুগ্ধ হয়ে যেতাম, বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম। যখন বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আদর করত কিংবা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলে মাথ চাপড়িয়ে ঘুম পাড়াত, বুড়ি ঠাকুমাকে অকারণে রাগিয়ে দিয়ে পালাত, বালতি করে জল নিয়ে ছোটো ছোটো চারাগাছের গোড়ায় ঢালত, তখন আমার চোখদুটো যেন বিমুগ্ধ হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকত কিন্তু আজ সারাদিন দুজনে একই ঘরে থাকি। ও হাসে, কথা বলে, তবু আমার যেন খেয়ালই থাকে না। জানি না, কেন?

প্রথম যেদিন ও আমার হাতে একটা ফুলের তোড়া দিয়ে মিষ্টি চোখে মৃদু হেসেছিল সোহাগের সেই উপহার পেয়ে আমার গর্ব আর ধরে না। সামান্য কিছু ফুল আর কয়েকটা পাতা। অথচ বার বার দেখেও কিছুতেই আর আশ মিটছিল না। বেশ কিছুক্ষণ তোড়াটাকে নাড়াচাড়া করে তারপরে

টেবিলের ফুলদানিতে রেখে দিলাম। যে কোনো কাজ করছিলাম আর ফাঁকে ফাঁকে বারবার সেটাকে দেখে যাচ্ছিলাম। বার বার ফুলগুলোকে চোখেমুখে লাগাচ্ছিলাম, চুমু খাচ্ছিলাম। লক্ষ টাকার বদলেও সেই তোড়াটাকে আমি কাউকে দিতে পারতাম না। এক-একটা পাঁপড়ি আমার কাছে যেন এক-একটা মুক্তোর মত। ফুলগুলো সব যখন শুকিয়ে গেল আমি সযত্নে তোড়াটাকে সিন্দুকে তুলে রাখলাম। তারপর থেকে ও আমাকে হাজার রকমের উপহার দিয়েছে। অনেক রত্নময় মূল্যবান অলঙ্কার, অনেক দামি দামি শাড়ি, আর ফুলের তোড়াতো প্রায় রোজই নিয়ে আসে। কিন্তু এত পেয়েও সেরকম আনন্দ, সেরকম আবেশ আর কিছুতেই আসে না। ওই সমস্ত বহুমূল্য আভরণে ভূষিত হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে নিজেই গর্বে ফুলে উঠি। সাথিদের দেখিয়ে নিজের অহং এবং তাদের অসূয়া বাড়াই।

মাত্র কয়েকদিন হল ও আমাকে একটা চন্দ্রহার এনে দিয়েছে। এত সুন্দর, যে দেখে সেই মোহিত হয়ে যায়। হারটা দেখে আমিও মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমি সিন্দুক খুললাম কিন্তু বার করলাম শুকনো ফুলের সেই তোড়াটাকে। আহা! সেটার গায়ে হাত দিয়েই প্রতিটি স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। শরীরের সমস্ত তন্ত্রীগুলো কেঁপে উঠল। মনে হল, ফুলের পাঁপড়িগুলো, যা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, যেন খুশিতে ডগমগ করছে, কথা বলছে। ওদের নীরস, শুকনো মুখে অস্ফুট কম্পিত অনুরাগে ডুবে-থাকা কথা যেন ভীষণ বেগে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু ওই বহুমূল্য রত্নখচিত হার, আপন সৌন্দর্যে উদ্ধত হার—সোনা আর পাথরের একটা নীরব সমাবেশ মাত্র—যাতে প্রাণ নেই, মন নেই, হৃদয় নেই। আমি ফুলের তোড়াটাকে বার বার চুম্বন করলাম, বুকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখ থেকে ফোঁটা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার উপর। আবার সযত্নে সিন্দুকে তুলে রাখলাম। বহুমূল্য গহনায় ভরা সমস্ত সিন্দুকটাই যেন অর্থহীন অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হল ওই অমূল্য শুকনো ফুলের কাছে। ওটা কী রহস্য? কী মায়া!

ওর লেখা একটা পুরোনো চিঠির কথা আজ মনে পড়ছে। কলেজ থেকে লিখেছিল। সে চিঠি পড়ে আমার দারুণ আনন্দ হয়েছিল। বুকে যে তুফান উঠেছিল, চোখ থেকে যে খুশির নদী বয়েছিল তা কি কখনও ভুলতে পারি। চিঠিটাকে আমি আমার সোহাগের ঝাঁপিতে সযত্নে রেখে দিয়েছি। মাঝে মাঝেই সে চিঠিটা পড়তে কী প্রচণ্ড ইচ্ছাই না করে। ঝাঁপি থেকে চিঠিটা বের করে স্পর্শ করতেই হাতটা কেঁপে ওঠে। বুকের মধ্যে স্পন্দন অনুভূত হয়। কতক্ষণ পর্যন্ত চিঠিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বলতে পারি না। হঠাৎ মনে হয়, চিঠিটা পাওয়ার দিন যেমন উচ্ছল ছিলাম আবার যেন সেইরকম হয়ে গেছি। চিঠিতে কি ভালোবাসার কবিত্বময় বহিঃপ্রকাশ আছে? প্রেমের কোনো সাহিত্যিক মূল্যায়ন? কিংবা বিয়োগব্যথায় কাতর কোনো করুণ ক্রন্দন! ওতে তো প্রেমের একটা শব্দও নেই। লেখা আছে—কামিনী, আট দিন হল তুমি কোনো চিঠি লেখনি। কেন লেখনি? তুমি যদি চিঠি না দাও, আমি হোলির ছুটিতে বাড়ি যাব না, এটা মনে রেখো। যাই হোক, সারাদিন তুমি কেমন করে কাটাও? আমার উপন্যাসের আলমারি খুলেছ নাকি? তুমি আমার আলমারি কেন খুলেছ? ভাবছ বুঝি তুমি চিঠি না দিলে আমি খুব কাঁদব আর হয়রান হব। এখানে তার পরোয়া নেই। রাত নটায় শুয়ে পড়ি আবার সকাল আটটায় উঠি। চিন্তা শুধু, যেন ফেল না করে যাই। তবে যদি ফেল করি তার কারণ জেনো একটাই—সে তুমি।

কত প্রাঞ্জল, সহজ, সরল হৃদয়ের অভিব্যক্তি। অকপট, অভিমানী আগ্রহ আর উদ্বেগে ভরা চিঠি; আর তার উত্তর দেবার সমস্ত দায়িত্ব যেন আমার ওপর ন্যস্ত। এমন ধমক কি এখন সে আমায় দিতে পারে? না, কিছুতেই না। এমন ধমক সেই দিতে পারে যে বিরহীর ব্যথা কী তা জানে, তাকে অনুভব করতে পারে। আজ আমার স্বামীও জানে যে তার কোনো ধমক আর আমার ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। আমি হয়তো একটু হাসব তারপর নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ব। কারণ আমি জানি যে, ও অবশ্যই ফিরে আসবে কেন না অন্য কোথাও থাকবার জায়গা কোথায়? আর যেতেই বা পারবে কোথায়?

তারপর থেকে ও কত না চিঠি লিখেছে। দুদিনের জন্যেও বাইরে কোথাও গেলে অবশ্যই একটা চিঠি দেয়। আর পাঁচ-দশ দিনের জন্য গেলে তো প্রায় রোজই একটা করে চিঠি আসে। চিঠি বাছাই করা করা ভালোবাসার কথায়, বাছাই করা সম্বোধনে ভরা থাকে। আর আমি ওই চিঠিগুলো পড়ে একটা শীতল দীর্ঘশ্বাস ফেলি মাত্র। হায়! কোথায় গেল সে হৃদয়। প্রেমের এই নির্জীব, ভাবশূন্য কথাগুলোর মধ্যে কোথায় সেই আন্তরিকতা, কোথায় সেই মাধুর্য, কোথায়ই বা সেই উন্মাদনা, অভিমান কিংবা মধুর কলহ। মন কি যেন খুঁজে পেতে চায় চিঠির মধ্যে—কিছু অজ্ঞাত, অব্যক্ত এবং অদেখা— কিন্তু তা আর মেলে না। পত্রে আতর দেওয়া থাকে, কাগজও এতো সুন্দর যে আর্ট পেপারকেও হার মানায় এবং সযত্ন অঙ্গসজ্জার বাহার আমার কাছে বিগতযৌবনা কোনো রমণীর সযত্ন প্রসাধনের মতো মনে হয়। কখনও কখনও আমি চিঠি খুলেও দেখি না, কারণ আমি জানি ওতে কী লেখা আছে।

সেই তো সেদিনের কথা। আমি তৃতীয়া তিথির ব্রত করেছিলাম। দেবীর সামনে করজোড়ে বলেছিলাম—হে মা! আমি তোমার কাছে একটি মাত্র বর চাই—আমরা দুজনে যেন কোনোদিন ছাড়াছাড়ি না হই। আর কোনো অভিলাষ আমার নেই। এই বিশাল সংসারে আমি আর কিছুই চাই না। আমি তো একটাই বর চেয়েচিলাম। দেবীও সেদিন তাঁর বরদানের ভাণ্ডার আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। আজ যদি আবার তাঁর দর্শন পাই আমি তাঁকে বলব— হে মা, তুমি তোমার বর ফিরিয়ে নাও। কোনো বরই আমি চাই না। আমি আমার সেই দিন ফিরে পেতে পাই যে দিন আমার হৃদয়ে শুধু প্রেমের অভিলাষ ছিল। তুমি আমায় সব কিছু দিয়েও আমার সেই অতুল সুখ থেকে বঞ্চিত করেছ—যার অভিলাষ হৃদয়ের গভীরে এখনও উঁকি দেয়। আজও আমি দেবীর কাছে প্রার্থনা করি সেই দিন ফিরে পাবার আশায়। আজও নির্জন নদীতটে কিংবা গহিন অরণ্যে আমি আমার প্রিয়তমকে খুঁজে ফিরি। নদীর তরঙ্গকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি আমার মনের মানুষকে দেখেছ? বৃক্ষকে প্রশ্ন করি—কোথায় আমার সেই জন? আমি কি সেই মুখ আর কোনোদিন ফিরে পাব না? এমন সময় প্রাণজুড়োনো ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করে দিল। মনে হল আমার প্রিয়তম যেন বাতাসের সেই উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইলাম। চাঁদের আলোয় ছোটো ছোটো রুপোর টুকরোর মতো ঝকঝকে তারাগুলো যেন আমার চোখের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল। চোখ বন্ধ করলেই ওরা সামনে ভেসে উঠছিল আবার চোখ খুললেই হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় মানসচক্ষে দেখলাম—আমার প্রিয়তম ওই উজ্জ্বল ঝিকমিক

করা নক্ষত্রের আসনে বসে আমার দিকে নেমে আসছে। এমন সময় কে যেন গেয়ে উঠল :

সুন্দরের বুক থেকে প্রেম যদি নেয় গো বিদায়
জীবনের নীড়ে তবে যন্ত্রণা বাঁধে তার বাসা।
কোথা তুমি প্রিয়তম হয়ে গেছ আজ নিরুদ্দেশ
চুরি করে নিয়ে সেই আমার সোনার ভালোবাসা।

'চুরি করে নিয়ে সেই আমার সোনার ভালোবাসা'—এই কথাগুলো তিরের মতো এসে আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করে কোথায় চলে গেল জানি না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি কেঁদে ফেললাম। চোখের জলে ঝরনা বয়ে গেল। মনে হল, যেন আমার প্রিয়তম আমার হৃদয় ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম। সে চিৎকারে আমার স্বামীর ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে আমার পাশে এসে বলল—তুমি চিৎকার করলে? আরে! তুমি কাঁদছ? কী ব্যাপার, কোনো দুঃস্বপ্ন দেখোনি তো?

আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম—কাঁদব না তো হাসব?

ও আমার হাত ধরে বলল—কেন, কাঁদবার কী কারণ ঘটল, কাঁদছ কেন?

—তুমি জান না কেন কাঁদছি?

—তোমার মনের কথা কেমন করে জানব?

—তুমি কি কখনও জানার চেষ্টা করেছ?

—তার জন্যে আমি কি অহংকারে পাষাণ হয়ে গেছি যে তোমার কান্নার কারণ হব?

—তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছ, তুমি এমন কথা বলতে পারলে? আমার কথায় বেশ একটু বিস্ময় প্রকশে করেই উত্তর দিল—তুমি কি আমার সঙ্গে হেঁয়ালি করছ?

—কেন, তুমি কি কখনও কাঁদ না নাকি?

—আমি কাঁদতে যাব কেন?

—তোমার কোনো অভিলাষ নেই?

—আমার সবচেয়ে বড়ো অভিলাষ পূরণ হয়ে গেছে। আর আমি কিছু চাই না।

এই বলে হাসতে হাসতে আমাকে ওর বুকের উপর টেনে নেবার জন্যে হাত বাড়াল।

ওর হৃদয়হীনতা আমার অত্যন্ত খারাপ লাগল। আমি ওর হাত দুটো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম—আমি এই পশুর মতো প্রেম চাই না। যার চোখে কখনও জল আসে না সে কখনও ভালোবাসতে পারে না। কান্না আর প্রেম একই স্রোত থেকে বেরিয়ে আসে।

সেই সময় আবার সেই গানের সুর কানে ভেসে এল—

সুন্দরের বুক থেকে প্রেম যদি নেয় গো বিদায়
জীবনের নীড়ে তবে যন্ত্রণা বাঁধে তার বাসা।
কোথা তুমি প্রিয়তম হয়ে গেছ আজ নিরুদ্দেশ
চুরি করে নিয়ে সেই আমার সোনার ভালোবাসা।

ওর মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। দেখলাম, একটু যেন কেঁপে উঠল। একটু রোমাঞ্চিতও মনে হল। ডান হাতটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমি স্পষ্ট দেখলাম,

চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। অনুভব করলাম সেই সুখ যার জন্যে এতদিন আমার হৃদয় যন্ত্রণায় উথাল-পাথাল করছিল। আজ আবার ওর হৃদয়ের স্পন্দন কানে শুনলাম। আবার তার স্পর্শ পেয়ে সমস্ত সত্তা আনন্দে ভরে উঠল।

তখন পর্যন্ত সেই কথাগুলো অনুভূতির গভীরে ধ্বনিত হতে লাগল :

কোথা তুমি প্রিয়তম হয়ে গেছ আজ নিরুদ্দেশ
চুরি করে নিয়ে সেই আমার সোনার ভালোবাসা।

(কবিতাংশ হিন্দি কবি শ্রীমতী মহেশ্বরী বর্মার)

(অভিলাষ / ১৯২৮)

অনুবাদ শচীন সরকার

ইস্তফা

অফিসের বাবুরা এক প্রকারের মূক জীব। মজুরদের চোখ গরম করলে তারা কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়বে। কুলিকে মেজাজ দেখালে সে মাথার বোঝা ফেলে দিয়ে চলে যাবে। কোনো ভিখিরিকে দূর দূর করলে সেও রাগত চোখে তাকিয়ে তার রাস্তা নেবে। এমনকী, গাধাকেও যদি যন্ত্রণা দেওয়া হল তাহলে সে মাঝেমধ্যে দু-চার লাথি দিতে ছাড়ে না। কিন্তু বেচারা অফিসের বাবুকে আপনি যতই মেজাজ দেখান, তার প্রতি যতই হম্বিতম্বি করুন, তাকে যতই দূর-দূর করুন কিংবা টিটকিরি দিন, সে মুখটি বুজে থাকবে। নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর তার যতটা সংযম, ততটা বোধ হয় কোনো জিতেন্দ্রিয় সাধুরও নেই। সে হল তুষ্টির প্রতিমা, ধৈর্যের বিগ্রহ এবং একজন যথার্থ হুকুম পালক। প্রয়োজন তার মধ্যে সমস্ত মানবিক গুণগুলো মজুত করে রেখেছে। পাণ্ডববর্জিত জায়গারও এক দিন ভাগ্য খোলে। দীপাবলি উৎসবে সেখানেও প্রদীপ জ্বলে, বর্ষায় সেখানেও সবুজের সমারোহ দেখা দেয়, প্রকৃতির আনন্দে তারও অংশ থাকে। অথচ বেচারা এই অফিসের বাবুর কপাল কখনও ফেরে না। তার অন্ধকার ভাগ্যে কোনোদিন আলোর রোশনাই দেখা দেয় না। তার পাঁশুটে চেহারায় কখনও খুশির আলো ঠিকরে পড়ে না। এদের হাল যেন শুষ্ক শ্রাবণ, ভরা ভাদ্র কখনও নয়। লালা ফতেচাঁদ ছিলেন এরকমই একজন মূক জীব।

লোকে বলে, মানুষের উপর তার নামের প্রভাব কিছু না কিছু পড়ে। তবে ফতেচাঁদের যা অবস্থা তাতে এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হতে পারেনি। তাকে যদি 'হারচাঁদ' বলা যায় তাহলেও তা কখনই অত্যুক্তি হবে না। অফিসে হার, জীবনে হার, বন্ধুভাগ্যে হার—জীবনে তার চারদিকে কেবল পরাজয় আর নিরাশা। তার পুত্রসন্তান একটিও ছিল না, কন্যা ছিল তিনটি। কোনো ভাই জীবিত ছিল না, দুই ভ্রাতৃবধূ জীবিত ছিল। পকেটে পয়সা ছিল না, কিন্তু মনে দয়া ছিল, উদারতা ছিল। যথার্থ বন্ধু একজনও ছিল না। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফতেচাঁদের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। বত্রিশ বছর বয়েসেই চুলে পাক ধরে গিয়েছিল, চোখের দৃষ্টিও কমে এসেছিল, হজমশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, চেহারা হয়ে পড়েছিল বিবর্ণ, গাল ভেঙে গিয়েছিল আর কোমর গিয়েছিল বেঁকে। না ছিল মনে সাহস, না বুকের পাটা। সকাল নটায় অফিস যেতেন আর সন্ধ্যা ছটায় বাড়ি ফিরে আসতেন। তারপর আর ঘর থেকে বাইরে বেরোবার সাহস হত না। পৃথিবীতে কী হচ্ছে তার কোনো খবর তিনি রাখতেন না। তাঁর জগৎসংসার, তাঁর ইহলোক-পরলোক, সবই ছিল তাঁর অফিস। মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতেন আর এই করেই জীবনের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতেন। ধর্মের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না, ছিল না গরিবের প্রতি দয়া। খেলাধুলো ইত্যাদি মনোরঞ্জনের প্রয়োজন তাঁর ছিল না। তাস খেলেও কত লোকের সময় কাটে, তাও তাঁর ছিলনা।

দুই

সময়টা ছিল বর্ষার। আকাশে কিছু কিছু মেঘও ছিল। ফতেচাঁদ সাড়ে পাঁচটা নাগাদ যখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন তখন আলো জ্বলে গেছে। অফিস থেকে ফিরে তিনি কারুর সঙ্গে কোনো কথা বলতেন না। চুপচাপ খাটিয়ায় শুয়ে পড়তেন এবং পনেরো-বিশ মিনিট নড়াচড়া না করে পড়ে থাকতেন। তারপর তাঁর মুখে কথা শোনা যেত। সেদিনও প্রতিদিনের মত চুপচাপ শুয়ে ছিলেন। এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাকল। ছোটো মেয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারা গেল অফিসের চাপরাশি। শারদা স্বামীর মুখ-হাত ধোবার ঘটি-গ্লাস পরিষ্কার করছিল। সে বলল, ওকে জিজ্ঞেস কর কী কাজ। এখনই তো অফিস থেকে এসেছেন আর এখনই আবার ডাক এসে গেল?

চাপরাশি — সাহেব বললেন, এখনই ডেকে নিয়ে আয়। হয়তো খুব জরুরি কোনো কাজ আছে।

ফতোচাঁদের নীরবতা ভেঙে গেল। তিনি মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?

শারদা — কিছু না, অফিসের চাপরাশি।

ফতেচাঁদ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অফিসের চাপরাশি। সাহেব কি ডেকে পাঠিয়েছেন?

শারদা — হ্যাঁ, বলছে সাহেব পাঠিয়েছে। এ তোমার কেমন সাহেব — এভাবে ডেকে পাঠাচ্ছে? সেই সকালে গিয়ে এই মাত্র ফিরলে আর এরই মধ্যে ডাক এসে গেল!

ফতেচাঁদ একটু ভেবে বললেন, একটু গিয়ে দেখে নিই কী জন্য ডেকেছে। আমি সব কাজ শেষ করে এসেছি। এখনই আসছি।

শারদা — একটু জলখাবার তো খেয়ে যাবে। চাপরাশির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে তো তোমার ভিতরে আসার কথাও আর মনে থাকবে না।

এই কথা বলে সে একটা ছোটো থালায় কিছু ডালমুট ও লাড্ডু নিয়ে এল। ফতেচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু খাবার দেখে আবার খাটিয়ায় বসে পড়লেন। থালার দিকে ভালো করে দেখে ভয়ে ভয়ে বললেন, মেয়েদের দিয়েছ তো?

শারদা ঝামটা মেরে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছি। তুমি খাও তো।

এর মধ্যে ছোটো মেয়েটা এসে সামনে দাঁড়াল। শারদা তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুই কী জন্যে এসে আবার সামনে দাঁড়িয়ে গেলি? যা বাইরে গিয়ে খেল।

ফতেচাঁদ — থাক না, বকছ কেন? এদিকে আয়, চুন্নি। এই নে, ডালমুট নিয়ে যা।

চুন্নি মার দিকে ভয়ে ভয়ে দেখে বাইরে পালিয়ে গেল।

ফতেচাঁদ — কেন বেচারাকে তাড়িয়ে দিলে? একটু দিলেই তো খুশি হয়ে যেত।

শারদা — কেন বলে দিচ্ছি না যে এখন যেতে পারবে না?

ফতেচাঁদ — তা কী করে বলব, এক দিনের ব্যাপার তো নয়।

শারদা — তা বলে কাজ করতে করতে মরে যেতে হবে? তোমার চেহারার দিকে বোধ হয় তাকিয়ে দ্যাখো না। মনে হচ্ছে ছমাস ধরে অসুখে ভুগছ।

ফতেচাঁদ কোনো রকমে একটু ডালমুট মুখে দিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে প্রায় দৌড়ে বাইরে গেলেন। শারদার পানসাজা শেষ হল না।

চাপরাশি বলল, বাবুজি, আপনি বড়ো দেরি করে ফেললেন। এখন একটু তাড়াতাড়ি চলুন, তা না হলে যেতেই মেজাজ দেখাতে শুরু করে দেবে।

ফতেচাঁদ কয়েক পা দৌড়ে বললেন, চলব মানুষের মতো হেঁটে। তাতে মেজাজই দেখাক আর দাঁতই খিচুক। আমি দৌড়াতে পারব না। বাংলোতেই তো রয়েছে?

চাপরাশি — তাই তো থাকবে। সে অফিসে যাবে কেন? রাজার জাত, চালাকি নয়।

চাপরাশির ইচ্ছা ছিল, তাড়াতাড়ি হেঁটে যায়। বেচারা ফতেচাঁদ বাবু চলছিলেন আস্তে আস্তে। একটু গিয়েই হাঁপিয়ে উঠলেন। তবে তিনিও তো পুরুষমানুষ, কী করে আর চাপরাশিকে বলেন যে ভাই আর একটু আস্তে চল। সাহস করে কোনো রকমে চলতে লাগলেন, তবে একটু পরেই কুঁচকিতে যন্ত্রণা হতে লাগল এবং অর্ধেক রাস্তা যেতে না যেতেই পা আর চলতে চাইল না। ফতেচাঁদের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল, মাথা ঘুরতে লাগল, তিনি চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলেন।

চাপরাশি তাগাদা দিল, আর একটু জোরে চলুন, বাবু।

ফতেচাঁদ অনেক কষ্টে উত্তর দিলেন, তুমি যাও, আমি আসছি।

তিনি রাস্তার এক পাশে বসে পড়ে দুহাতে মাথা ধরে কোনোরকমে দম নিতে লাগলেন। চাপরাশি তার এই অবস্থা দেখে অপেক্ষা না করে চলে গেল। ফতেচাঁদের ভয় হল, এই শয়তান গিয়ে না জানি সাহেবকে আবার কী বলে দেয়। তার জন্য হয়তো কিছু একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আবার রওনা দিলেন। তবে শরীর দুর্বল বলে হাঁপ ধরেছিল। তখন কোনো বাচ্চা ছেলেও তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারত। বেচারা কোনোরকমে পড়তে পড়তে গিয়ে সাহেবের বাংলোর দরজায় উপস্থিত হলেন।

সাহেব বাংলোয় পায়চারি করছিলেন। বারেবারে গেটের দিকে চেয়ে দেখছিলেন আর কাউকে আসতে না দেখে নিজের মনেই জ্বলছিলেন।

চাপরাশিকে দেখেই চোখ গরম করে বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

চাপরাশি বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই বলল, হুজুর, উনি এলে তবে তো; আমি দৌড়ে চলে এসেছি।

সাহেব মাটিতে লাথি মেরে বললেন, বাবু কী বলল?

চাপরাশি — উনি আসছেন হুজুর। এক ঘন্টা তো ঘর থেকে বেরোতেই লেগেছে।

এরই মধ্যে ফতেচাঁদ বাংলোর তারের বেড়া পার হয়ে সাহেবের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে মাথা নত করে নমস্কার জানালেন।

সাহেব কড়া মেজাজে জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

সাহেবের গরম মেজাজ দেখে ফতেচাঁদের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বললেন, হুজুর, এই একটু আগেই অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছি। চাপরাশি ডাকামাত্রই চলে এসেছি।

সাহেব — মিথ্যা কথা বলছ। আমি এক ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

ফতেচাঁদ — হুজুর, আমি মিথ্যা কথা বলছি না। আসতে গিয়েই যা দেরি হয়েছে, বাড়ি থেকে বেরোতে আমার কোনো দেরি হয় নি।

সাহেব — চুপ কর্, শুয়ার। আমি বলছি, তুই তোর কান ধর্।

ফতেচাঁদ — আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?

সাহেব — চাপরাশি, এই শুয়ারের কান ধর্।

চাপরাশি ধরা গলায় বলল, হুজুর, ইনি আমার অফিসার। আমি কী করে এঁর কান ধরব?

সাহেব — আমি বলছি, এর কান ধর্। তা নয় তো আমি হান্টার দিয়ে তোকে পেটাব।

চাপরাশি — হুজুর, আমি এখানে চাকরি করতে এসেছি, মার খেতে আসি নি। আমারও ইজ্জত আছে। হুজুর আমার চাকরি আপনি নিয়ে নিন। আপনি যে হুকুম দেবেন তা তামিল করতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু কারও ইজ্জত আমি নষ্ট করতে পারব না। চাকরি আর কদিনের? এই কদিনের জন্যে সারা জীবনের ক্ষতি করব?

সাহেব আর তার ক্রোধ চাপতে পারলেন না। হান্টার নিয়ে তেড়ে গেলেন। চাপরাশি দেখল, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সমূহ বিপদ। তাই সে সেখান থেকে ছুটে পালাল। এতক্ষণ পর্যন্ত ফতেচাঁদ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। সাহেব চাপরাশিকে না পেয়ে তার কাছে গিয়ে তার দুই কান ধরে টেনে দিয়ে বললেন, তুই শুয়ার। বেয়াদপি করছিস? যা, অফিস থেকে গিয়ে ফাইল নিয়ে আয়।

ফতেচাঁদ কানে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কোন ফাইল আনব, হুজুর?

সাহবে — ফাইল ফাইল। কোন্ ফাইল আবার? তুই কালা, শুনতে পাস না? আমি ফাইল চাইছি।

ফতেচাঁদ কোনোরকমে বেপরোয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন্ ফাইল চাইছেন?

সাহেব — সেই ফাইল যা আমি চাইছি। সেই ফাইল নিয়ে আয়। এখনই নিয়ে আয়।

বেচারা ফতেচাঁদের আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। একে সাহেব বাহাদুরের মেজাজ ছিল তিরিক্ষি তায় ক্ষমতার দম্ভ আর তারও উপর ছিল মদের নেশা। হান্টার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনি কী করবেন। ফতেচাঁদ আর কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে অফিসের দিকে রওনা দিলেন।

সাহেব বললেন, দৌড়ে যা — দৌড়ো।

ফতেচাঁদ বললেন, হুজুর, আমি দৌড়োতে পারব না।

সাহেব — আচ্ছা! তুই খুব বেয়াদপ হয়ে পড়েছিস। আমি তোকে দৌড় শেখাব। দৌড়ো (পেছন থেকে ধাক্কা মেরে), তুই এখনও দৌড়োবি না?

এই কথা বলে সাহেব হান্টার আনতে গেলেন। ফতেচাঁদ অফিসের বাবু হলেও মানুষ তো! গায়ে যদি শক্তি থাকত তাহলে তিনি ওই বদমাশের রক্ত পান করতেন। যদি তাঁর কাছে কোনো হাতিয়ার থাকত, তাহলেও তা নিয়ে তিনি তার মোকাবিলা করতে পারতেন। তবে এই অবস্থায় তো মার খাওয়াই ওর ভাগ্যে লেখা। তাই ফতেচাঁদ বেহুঁশের মতো ছুটে বাড়ির গেটের বাইরে গিয়ে রাস্তায় এসে পড়লেন।

তিন

ফতেচাঁদ অফিসে গেলেন না। সেখানে গিয়ে করারই বা কী ছিল। সাহেব তো ফাইলের নাম পর্যন্ত বললেন না। হয়তো মদের নেশায় ভুলে গিয়েছিলেন। ফতেচাঁদ ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চললেন। কিন্তু অপমান তাঁর পায়ে বেড়ির মতো জড়িয়ে রইল। আচ্ছা, শারীরিক ক্ষমতায় তিনি সাহেবের সমকক্ষ ছিলেন না, তাঁর হাতে কোনো হতিয়ারও ছিল না, কিন্তু তাই বলে কি তিনি সাহবের কথার জবাবও দিতে পারতেন না? তাঁর পায়ে জুতো তো ছিল। তিনি কি জুতো দিয়ে কাজ সারতে পারতেন না? তবু তিনি কেন এত অপমান সহ্য করলেন?

তবে উপায়ই বা কী ছিল? যদি সাহেব ক্রোধের বশে তাকে গুলি করে মেরে ফেলতেন তাহলেই বা কী? সাহেবের হয়তো দু-এক মাসের সাধারণ কয়েদ হত, কিংবা দু-চারশো টাকা জরিমানা হত। কিন্তু ফতেচাঁদের হলে তো তাঁর পরিবার ধুলোয় মিশে যেত। সংসারে কেই বা তাঁর আছে যে তার স্ত্রী ও মেয়েদের খবর নেবে? তারা কার দরজায় গিয়ে হাত বাড়াবে? যদি তাঁর কাছে প্রচুর টাকা থাকত যা দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ হতে কোনো অসুবিধা হবে না, তাহলে তিনি আজ এত অপমান সহ্য করতেন না। তাঁর মৃত্যু হলেও তিনি এই শয়তানকে কিছু শিক্ষা দিয়ে দিতেন। নিজের প্রাণের কোনো ভয় তাঁর ছিল না। জীবনে তাঁর কীই বা এমন সুখ আছে যে তিনি ভয় পাবেন। একমাত্র চিন্তা ছিল, পরিবারটা না ভেসে যায়।

নিজের শারীরিক দুর্বলতার জন্য ফতেচাঁদের আজ যত দুঃখ হল তেমন আর কোনো দিন হয়নি। যদি জীবনের প্রথম থেকেই শরীরের প্রতি নজর দিতেন, যদি কিছু ব্যায়াম-ট্যায়াম করতেন, লাঠি চালাতে জানতেন, তাহলে কি এই শয়তানের এত সাহস হত যে তার কানে হাত দেয়? তার চোখ উপড়ে ফেলতে পারতেন। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা ছুরি অন্তত নিয়ে বেরোতে পারতেন। আর কিছু হোক না হোক, দু-চার ঘা তো দেওয়া যেত, পরে দেখা যেত কী হয়। জেল হলে হত — আর তো কিছু হত না।

ফতেচাঁদ যতই বাড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন ততই তাঁর নিজের ভীরুতা ও কাপুরুষতা তাকে পীড়া দিচ্ছিল। যদি তিনি হঠাৎ তাকে দু-চার থাপ্পড় লাগিয়েই দিতেন তা হলেই বা কী হত। হয়তো সাহেবের খানসামা, চাকর সব তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মারতে মারতে তাঁর দম বের করে ফেলত। স্ত্রী ও মেয়েদের ভাগ্যে যা হবার হত, সাহেব তো অন্তত এটা বুঝত যে, কোনো গরিবের উপর অত্যাচার করে পার পাওয়া যায় না। আজ যদি মৃত্যু হয় তো কী হবে? কে তাঁর মেয়েদের দেখবে? কাজেই যা হবে তা এখন হলেই বা ক্ষতি কী ছিল?

এইভাবে চূড়ান্ত বিচার করে ফতেচাঁদের মনে এত উৎসাহের সঞ্চার হল যে, তিনি ফিরে গিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এই উদ্দেশ্যে কয়েক পা এগিয়েও গেলেন। কিন্তু তারপরেই আবার মনে হল — যা দুর্ভোগ ভোগার ছিল তা তো ভুগতে হলই। কে জানে সাহেব এখনও বাংলোয় আছে না ক্লাবে গেছে। তখনই আবার তাঁর শারদার বৈধব্য ও মেয়েদের পিতৃহীন হবার কথা মনে এল। আবার ফিরে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

চার

বাড়ি পৌঁছুতেই শারদা জিজ্ঞেস করল, কী জন্যে ডেকেছিল, এত দেরি হল যে?

ফতেচাঁদ খাটিয়ায় শুতে শুতে বললেন, নেশার ঘোরে ছিল, আবার কী। শয়তান আমাকে গালিগালাজ করল, অপমান করল। সেই একই কথা বলতে লাগল — কেন দেরি করলাম। ব্যাটা নিষ্ঠুর, তার চাপরাশিকে বলল আমার কান ধরতে।

শারদা রেগে বলল, তুমি জুতো খুলে শুয়োরকে মারলে না?

ফতেচাঁদ — চাপরাশি খুব ভদ্র। সে সোজাসুজি বলে দিল, হুজুর, আমার দ্বারা একাজ হবে না। আমি মানী লোকের ইজ্জত নষ্ট করার জন্য চাকরি করতে আসি নি। সেই চাপরাশি তখনই নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল।

শারদা — এই তোমার বাহাদুরি! তুমি সেই সাহেবকে কেন মারতে পারলে না?

ফতেচাঁদ — মারিনি তবে মুখের উপর অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছি। সাহেব লাঠি নিয়ে তেড়ে এলে আমিও জুতো খুলেছিলাম। তিনি আমাকে লাঠি দিয়ে কয়েক ঘা দিলে আমিও তাকে জুতো দিয়ে মারি।

শারদা খুশি হয়ে বলল, ঠিক বলছ? তখন নিশ্চয়ই তার মুখ এতটুকু হয়ে গিয়েছিল?

ফতেচাঁদ — মুখে যেন কে কালি লেপে দিয়েছিল।

শারদা — খুব ভালো করেছ তুমি। আরও মারা উচিত ছিল। আমি হলে ওকে শেষ না করে ছাড়তাম না।

ফতেচাঁদ — মেরে এসেছি তো। তবে এতেই শেষ হবে না। দেখ, পরিণামে কী দাঁড়ায়। চাকরি তো যাবেই, হয়তো জেলও খাটতে হবে।

শারদা — জেল খাটতে হবে কেন? ঠিক বিচার করার মতো কি কেউ নেই? কেন সে গলিগলাজ করল, কেনই বা লাঠি দিয়ে মারল?

ফতেচাঁদ — ওর সামনে আমার কথা কে বিশ্বাস করবে? আদালতও ওর দিকেই যাবে।

শারদা — যাবে তো যাবে। তবে দেখবে, কোনো বাবুকে এরকম গালিগালাজ করার এই সাহস আর কোনো সাহেবের হবে না। যেই ওর মুখ থেকে একটা গালি বেরোল আর অমনি তুমিও এক পাটি জুতো ছুঁড়ে মারলে — এরকম করলেই ভালো হত।

ফতেচাঁদ — তা হলে আর জীবন্ত ফিরে আসতে হত না। নিশ্চয়ই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলত।

শারদা — সে দেখা যেত।

ফতেচাঁদ মুচকি হেসে বললেন, তাহলে তোমাদের কী হত?

শারদা — ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হত। মানুষের সবচেয়ে বড়ো জিনিস হল তার ইজ্জত। ইজ্জত নষ্ট করে ছেলেপুলেদের মানুষ করা যায় না। তুমি যদি সেই শয়তানকে মেরে চলে আসতে তাহলে আমার আনন্দ রাখার আর জায়গা হত না। আর যদি মার খেয়ে আসতে তাহলে তোমার মুখ দেখতে আমার ঘেন্না হত। হয়তো মুখে কিছু বলতাম না, তবে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর থাকত না। এখন যাই ঘটুক না কেন, হাসিমুখে তার মোকাবিলা করব।... আরে, যাচ্ছ কোথায়? শোনো, শোনো, কোথায় যাচ্ছ?

ফতেচাঁদ কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শারদা ডেকেই গেল। ফতেচাঁদ আবার সাহেবের বাংলোর দিকে রওনা দিলেন। ভয়ে ভীত হয়ে নয়, বরং বুক চিতিয়ে। তাঁর মুখে দৃঢ় সংকল্প ফুটে উঠেছিল। এখন আর তাঁর হাঁটায় কোনো দুর্বলতা নেই, নেই চোখে সেই কাতর চাউনি। তাঁর চেহারাই যেন পালটে গিয়েছিল। ক্ষীণ শরীর, বিবর্ণ মুখ, অশক্ত এক অফিসের বাবুর পরিবর্তে, তিনি এখন যেন শক্তিশালী, সাহসে ভরপুর, শক্তসমর্থ এক জোয়ান। তিনি প্রথমে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তার কাছ থেকে একটা লাঠি জোগাড় করে দৃপ্ত ভঙ্গিতে সাহেবের বাংলোয় গিয়ে হাজির হলেন।

তখন নটা বাজে। সাহেব খাবার টেবিলে বসেছিলেন। তবে ফতেচাঁদ কিন্তু তাকে খাবার টেবিল থেকে তুলে দেবার কোনো চেষ্টা করলেন না। খানসামা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলে ফতেচাঁদ চিক তুলে ঘরে ঢুকলেন। ঘর আলোয় ঝলমল করছিল। মেঝেতে এত দামি কার্পেট বিছানো ছিল যে, ফতেচাঁদের বিয়েতেও সে রকম হয়নি। সাহেব বাহাদুর তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে বললেন, তুমি কেন এসেছ? বাইরে যাও, ভিতরে চলে এসেছ কেন?

ফতেচাঁদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠি ঠিক করতে করতে বললেন, তুমি আমাকে তক্ষুনি ফাইল নিয়ে আসতে বলেছিলে, আমি সেই ফাইল নিয়ে এসেছি। খাওয়া শেষ কর, দেখাচ্ছি। সে পর্যন্ত আমি বসে থাকব। প্রাণভরে খাও, এ তোমার শেষ খাওয়াও হতে পারে। তাই বলছি, খুব পেট ভরে খাও।

সাহেব বড়ো ধাঁধায় পড়লেন। ফতেচাঁদের দিকে ভয় এবং ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে তাঁর বুক কেঁপে উঠল। ফতেচাঁদের চেহারায় একটা দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠেছিল। সাহেব বুঝতে পারলেন, এ লোক হয় মরতে না হয় মারতে তৈরি হয়ে এসেছে। শারীরিক ক্ষমতার দিক থেকে ফতেচাঁদ তাঁর ধারে কাছেও ছিলেন না। তবে এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি ইটের জবাব পাথরে নয়, একেবারে লোহায় দিতে প্রস্তুত। ফতেচাঁদকে অনেক খারাপ খারাপ কথা তিনি বলেছেন, তাই সে যে একেবারে লাঠি নিয়ে এসে হাজির হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে! লড়ে গেলে তিনি যে জিততে পারবেন তাতে তাঁর তিলমাত্র সন্দেহও ছিল না। তাই বসে বসে মার খাবার মধ্যে কোনো বুদ্ধির পরিচয় তিনি খুঁজে পেলেন না। কুকুরকে আপনি লাঠি দিয়ে মারুন, লাথি চালান, যা খুশি করুন, তবে ততক্ষণই পারবেন যতক্ষণ না সে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে। একবার যদি সে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে তাহলে আর দেখতে হবে না। সাহসের পরিচয় তখনই পাওয়া যাবে। সাহেব বাহাদুরের তখন এই অবস্থাই হয়েছিল। যতক্ষণ তিনি জানতেন যে, ফতেচাঁদ তার ধমক, গালিগালাজ, হান্টার, লাথি সব কিছুই নীরবে সহ্য করবে, ততক্ষণ তাঁর আচার-আচারণ ছিল বাঘের মতো। যেই ফতেচাঁদ তাঁর মূর্তি পালটে হাতে লাঠি নিয়ে এসেছেন অমনি তিনিও বিড়ালের মতো সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গেলেন। মুখ থেকে কোনো খারাপ শব্দ বেরোলেই ফতেচাঁদ লাঠি চালাবেন। তিনি বড়োজোর তাঁকে বরখাস্ত করবেন। আর যদি মারেন তো পালটা মার খাবার ভয়। তার উপর আবার ফৌজদারি মামলা দায়ের হবারও সম্ভাবনা থেকে যায়। ধরা যাক, তিনি তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে ফতেচাঁদকে জেলে ঢুকিয়ে দিলেন, কিন্তু তাহলেও তো ঝামেলা ও বদনামের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই। তাই তিনি একজন বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মতো ফতেচাঁদকে বললেন, ও, আমি বুঝতে

পেরেছি। আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তা, আমি আপনাকে কিছু বলেছি? আপনি কেন আমার উপর বিরক্ত হলেন?

ফতেচাঁদ মেজাজ চড়িয়ে বললেন, এই আধ ঘন্টা আগে তুমি আমার কান ধরেছিল। তার উপর অনেক গালিগালাজও করেছিলে। তা, এত অল্প সময়েই সব ভুলে গেলে?

সাহেব — আমি আপনার কান ধরেছিলাম?—আহা, আহা! আমি আপনার কান ধরেছিলাম? আহা, আহা, আহা! কী অদ্ভুত কথা। আমি কি পাগল না বদখেয়ালি?

ফতেচাঁদ—তাহলে আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? চাপরাশি সাক্ষী রয়েছে, তোমার চাকর-বাকররাও দেখেছে।

সাহেব — কবেকার কথা বলছেন?

ফতেঁচাদ — এখনকার, এখনকার কথা বলছি। আধঘন্টাখানেক হবে।

তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে আর বিনা কারণে আমার কান ধরেছিল, আমাকে ধাক্কা মেরেছিল।

সাহেব — আরে বাবুজি, তখন আমি নেশা করেছিলাম। ব্যাটা বেয়ারা আমাকে অনেক দিয়ে দিয়েছিল। হে ভগবান! আমার কোনো খেয়ালই নেই কী হয়েছিল, আমার কোনো খেয়াল নেই।

ফতেচাঁদ — নেশার ঘোরে তুমি যদি আমায় গুলি করতে তা হলে কি আমি মরতাম না? তুমি নেশার ঘোরে ছিলে এই জন্যে যদি সব কিছুই মাপ হয়ে যায়, তাহলে আমিও নেশার ঘোরে রয়েছি। আমার সাফ কথা শোন — হয় তোমাকে তোমার কান ধরে বলতে হবে যে, তুমি আর কোনোদিন কোনো ভদ্রলোককে এভাবে অপমান করবে না, নয়তো আমি তোমার কান ধরব। বুঝেছ তো? এদিক ওদিক করবে না। জায়গা থেকে নড়েছে কি আমার এই লাঠি তোমার উপর পড়বে। আর তাতে যদি তোমার মাথা ফেটেও যায় আমার কোনো অপরাধ হবে না। আমি যা বলছি তাই করো — কান ধরো।

সাহেব কোনো রকমে মুখে হাসি এনে বললেন, বাবুজি, আপনি ভীষণ মজা করতে পারেন। আমি যদি আপনাকে খারাপ কথা কিছু বলেই থাকি তো ক্ষমা চাইছি।

ফতেচাঁদ (লাঠি তুলে) — না, কান ধরো।

সাহেবের পক্ষে এতটা জুলুম সহ্য করা সহজ ছিল না। লাফ দিয়ে উঠে ফতেচাঁদের হাত থেকে লাঠিটা তিনি নিয়ে নিতে চাইলেন, কিন্তু ফতেচাঁদও ছিলেন প্রস্তুত। সাহেব টেবিল থেকে ওঠার আগেই ফতেচাঁদের হাতের লাঠি তার উপর পড়ল। সাহেবের মাথা ছিল খালি, বাড়ি গিয়ে মাথাতেই পড়ল। মাথা গেল ফেটে। মিনিট খানেক মাথা চেপে ধরে থেকে বললেন — আমি তোমাকে বরখাস্ত করব।

ফতেচাঁদ — বরখাস্তের পরোয়া আমি করি না। তবে আজ আমি তোমাকে দিয়ে কান না ধরিয়ে এখান থেকে নড়ছি না। কান ধরে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনও কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে এরকম বেয়াদপি করবে না। যদি না কর, আমার হাত উঠে আছে তোমার মাথায় আবার পড়বে বলে।

এই কথা বলে ফতেচাঁদ আবার লাঠি তুললেন। সাহেব তখন পর্যন্ত প্রথম আঘাতের চোট সামলে উঠতে পারেন নি। আবার যদি দ্বিতীয়বার আঘাত লাগে তাহলে হয়তো খুলিই উড়ে যাবে। কানে হাত রেখে বললেন, — আপনি এখন খুশি হয়েছেন?

— আবার কখনও কাউকে গালি দেবে না তো?

— কখনও না।

— আবার যদি কখনও এ রকম কর তো মনে রেখ আমি খুব বেশি দূরে থাকি না।

— আর কখনও কাউকে গালি দেব না।

— ভালো কথা। আমি এখন যাচ্ছি। আজ থেকেই আমি কাজে ইস্তফা দিচ্ছি। কাল আমি আমার ইস্তফার দরখাস্তে একথা লিখে দেব যে, তুমি আমাকে গালিগালাজ করেছ আর এজন্যই আমি চাকরি করতে চাইছি না, বুঝতে পেরেছ?

সাহেব — আপনি ইস্তফা দিচ্ছেন কেন? আমি তো আপনাকে বরখাস্ত করছি না।

ফতেচাঁদ — এখন আর আমি তোমার মতো পাজি লোকের অধীনে কাজ করব না।

এই কথা বলতে বলতে ফতেচাঁদ সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আজ তাঁর যথার্থ জয়লাভের অনুভূতি হল। কোনো দিন তিনি এত খুশি আর হননি।

জীবনে এই হল তাঁর প্রথম জয়।

(ইস্তীফা / ১৯২৮) অনুবাদ অমলকুমার রায়

বোঝাপড়া

বাবু কুন্দনলাল কাছারি থেকে ফিরে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী এক সবজিওয়ালির কাছ থেকে কিছু শাকসবজি কিনছেন। সবজিওয়ালি এক সের পালং শাক দু পয়সা চাইছিল আর তিনি বলছিলেন দেড় পয়সা। এ নিয়ে কিছুক্ষণ দরকষাকষির পর শেষ পর্যন্ত সবজিওয়ালি দেড় পয়সাতেই এক সের দিতে রাজি হয়ে গেল। তারপর পাল্লা ও ওজনের প্রশ্ন নিয়ে লাগল। দু দিকের পাল্লা সমান ছিল না, এক দিকে ঝুল ছিল। বাটখারাও পুরোপুরি উতরোতে পারল না। এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে একসেরি বাটখারা এল। শাক ওজন করার পর ফাউ-এর কথা উঠল। মহিলা আরও চাইছিলেন আর সবজিওয়ালির বক্তব্য হল : বউদি, তুমি সের-দুসের ফাউ বলেই নিয়ে নেবে! যাই হোক, আধ ঘন্টায় সওদা শেষ হলে সবজিওয়ালি আর কোনোদিন আসবে না বলে ভয় দেখিয়ে বিদায় হল। কুন্দনলাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই তামাশা দেখছিলেন। সবজিওয়ালি চলে গেলে স্ত্রী ঘটিতে করে জল নিয়ে এলে কুন্দনলাল বললেন, তুমি তো আজ একটু শাক কিনতেই পুরো আধ ঘন্টা লাগিয়ে দিলে। এই সময়ের মধ্যে পাঁচশো-হাজার টাকার সওদা করে ফেলা যায়। অল্প একটু শাকের জন্যে এত হইচই করলে, তোমার মাথাব্যথা করছে না?

— রামেশ্বরী কিছুটা লজ্জিত হয়ে বললেন, পয়সা তো এমনিতে আসে না।

— তা ঠিক, তবে সময়েরও তো কিছু মূল্য রয়েছে। এত সময় নষ্ট করে, কত ঝামেলা করে তুমি একটা আধলা বাঁচালে। সবজিওয়ালাও মনে মনে নিশ্চয় বলেছে, কোথাকার গাঁইয়া। আর ভুল করেও এদিকে আসবে না।

— তা বলে আধলার জিনিস এক পয়সায় কিনে বসে থাকব সেটা আমার দ্বারা হবে না।

— এই সময়ের মধ্যে তুমি কম করে হলেও বিশ পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতে পারতে। কাল মহুরির সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা বাদানুবাদ করলে। জীবনটা কি কেবল এসব কাজে শেষ করে দেবার জন্যই?

কুন্দনলাল প্রায় প্রতিদিনই স্ত্রীকে সদুপদেশ দিতেন। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ। রামেশ্বরী এসেছেন এই দুই কি তিন মাস। সেদিন পর্যন্ত বড়ো ননদই সব কিছু করতেন। রামেশ্বরীর সঙ্গে তার পটেনি। তার মনে হতো তিনি তার সর্বস্ব লুটে নিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি চলে গেলেন। তখন থেকে রামেশ্বরী গৃহকর্ত্রী। তিনি খুবই চাইতেন যে, স্বামীকে প্রসন্ন রাখবেন। স্বামীর ইশারায় চলতেন। একবার যা শুনতেন তা একেবারে মনে গেঁথে রাখতেন। তবু রোজই কোনো নতুন কিছু একটা হত আর কুন্দনলালের সুযোগ জুটে যেত তাঁকে উপদেশ দেবার।

দুই

একদিন বেড়াল দুধ খেয়ে গেল। রামেশ্বরী দুধ গরম করে এনে স্বামীর মাথার কাছে রেখে পান সাজছিলেন, এমন সময় বেড়াল দুধের উপর তার ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ করল। রামেশ্বরী এই চৌর্যবৃত্তি মেনে নিতে না পেরে একটা বুল নিয়ে বেড়ালকে এত জোরে মারলেন যে, বেড়ালটা দু-তিন বার গড়াগড়ি খেল।

কুন্দনলাল শুয়ে শুয়ে পত্রিকা পড়ছিলেন। বললেন, যদি মরে যেত?

রামেশ্বরী উগ্ধতভাবে জবাব দিলেন, তা আমার দুধ খেল কেন?

— ওকে মেরে তো আর দুধ পাওয়া গেল না?

— যখন কেউ কোনো ক্ষতি করে তখন তার উপর ক্রোধ তো হবেই।

— হওয়া উচিত নয়। পশুর সঙ্গে মানুষও কেন পশু হয়ে যাবে? মানুষ ও পশুর মধ্যে এছাড়া আর কোনো পার্থক্য রয়েছে?

কুন্দনলাল কিছুক্ষণ ধরে তাকে দয়া, বিবেক ও শান্তির এমন শিক্ষা দিতে থাকলেন যে, অপমানে রামেশ্বরী কাঁদতে লাগলেন।

এরকম ভাবেই রামেশ্বরী এক দিন এক ভিক্ষুককে দূর করে দিয়েছিলেন বলে বাবু সাহেব আবার উপদেশ দিতে শুরু করলেন। বললেন, তোমার হাতে যদি না ওঠে তাহলে নিয়ে এস আমি দিয়ে আসছি। গরিবকে এভাবে দূর দূর করা উচিত নয়।

রামেশ্বরী গলা চড়িয়ে বলেন, সারা দিন তো লাইন লেগে রয়েছে। কে আর কত দৌড়তে পারে? সারা দেশ মনে হয় ভিখিরিতেই ভরে গেছে।

কুন্দনলাল উপেক্ষার ঢঙে মুচকি হেসে বললেন, সেই দেশে তুমিও বাস করছ।

— এত ভিখিরি আসছে কোথা থেকে? এরা সব কাজ করে না কেন?

— কাজ পাওয়া গেলেও ভিক্ষে করবে, কোনো মানুষ এতটা নীচ হয় না। হ্যাঁ, পঙ্গু হলে আলাদা কথা। ভিক্ষে ছাড়া পঙ্গুর আর কী উপায় আছে?

— এদের জন্যে সরকার অনাথ আশ্রম খুলছে না কেন?

— যখন দেশ স্বাধীন হবে, তখন হয়তো খুলবে। এখন কোনো আশা নেই। তবে স্বাধীনতাও ধর্মের পথেই আসবে।

— লক্ষ লক্ষ সাধুসন্ন্যাসী, পান্ডা-পূজারি বিনা পয়সাতে জীবন কাটাচ্ছে; এই ধর্ম কি যথেষ্ট নয়? তবে এই ধর্মাচরণে যদি স্বাধীনতা পাওয়া যেত তবে কবেই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত।

— এই পুণ্যের ফলেই হিন্দুজাতি এখনও টিকে আছে, নয়তো কবেই রসাতলে চলে যেত। রোম, গ্রিস, ইরান, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি কারুরই এখন আর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কালের কুটিল আবর্তকে মোকাবিলা করে হিন্দু জাতিই এখনও এগিয়ে যাচ্ছে।

— হয়তো বসে আছ যে, হিন্দুজাতি জীবিত, তাই না? আমি তো একে সেদিন থেকেই মৃত বলে মনে করি যেদিন থেকে দেশ পরাধীন হয়েছে। স্বাধীনতাই জীবন, পরাধীনতা মৃত্যু।

কুন্দনলাল স্ত্রীকে চকিত নয়নে দেখে ভাবলেন, এই বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গি এর মধ্যে কী করে এল? দেখতে তো একেবারে সাদাসিধে। প্রত্যয় হল, কোথাও কোনো পরামর্শ পেয়ে থাকবে।

কঠিন স্বরে বললেন, কেন মিছিমিছি তর্ক করছ? লজ্জা তো পাচ্ছ না বরং আরও বকবক করছ। এই ভর্ৎসনা শুনে রামেশ্বরী চুপ করে গিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তারপর আস্তে আস্তে ঘরে চলে গেলেন।

তিন

একদিন কুন্দনলাল কয়েকজন বন্ধুকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। রামেশ্বরী সকাল থেকে সেই যে রান্না ঘরে ঢুকেছিলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর মাথা তুলতে পারেননি। এই বেগার তার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। বন্ধুদের যদি খাওয়াতেই হবে তবে রান্না করার কোনো ব্যবস্থা করা হল না কেন? সমস্ত বোঝা তারই মাথায় কেন চাপিয়ে দেওয়া হল? তাকে তো একবার জিজ্ঞাসা করাও উচিত ছিল যে, নিমন্ত্রণ করব কি করব না।এখন যা হচ্ছে তখনও তাই হত, তবে সেক্ষেত্রে নিমন্ত্রণের প্রস্তাব তিনি আনন্দের সঙ্গে অনুমোদন করতে পারতেন। তাহলে তিনি ভাবতেন, তিনিই নিমন্ত্রণ করেছেন। এখন তার মনে হচ্ছিল তাকে দিয়ে বেগার খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যাই হোক, খাবার তৈরি হল; নিমন্ত্রিতরা খেলেন এবং খেয়ে চলেও গেলেন। কিন্তু কুন্দনলাল মুখভার করে বসে থাকলেন। রামেশ্বরী বললেন, তুমি খেয়ে নিচ্ছ না কেন? এখনও কি বেলা হয় নি?

বাবু সাহেব চোখ খুলে বললেন, কী খেয়ে নেব, এ কি কোনো খাবার, না গোরুর জাবনা?

রামেশ্বরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন আগুন লেগে গেল। সারা দিন উনোনের সামনে বসে জ্বলার এই পুরস্কার! তিনি বললেন, আমার দ্বারা যা সম্ভব তাই করেছি। যা আমার ক্ষমতার বাইরে আমি তার কী করতে পারি?

— পুরি সব আধ-ভাজা।

— হবে!

— কচুরিতে এত নুন ছিল যে, কেউ ছোঁয়নি পর্যন্ত।

— হবে!

— হালুয়া ভালো করে ভাজা হয়নি, কাঁচা কাঁচা গন্ধ লাগছিল।

— হবে হয়তো!

— সুরুয়া এত পাতলা ছিল যেন চা।

— হবে!

— স্ত্রীলোকের প্রথম গুণ হল এই যে, তাকে রান্নার কাজে দক্ষ হতে হবে।

তারপর উপদেশের এমন বন্যা বইল যে রামেশ্বরী উঠে চলে গেলেন।

চার

পাঁচ-ছ মাস পরের কথা। এক দিন কুন্দনলালের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। খবর পেয়েই রামেশ্বরী জলখাবারের মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন আর মহরিকে দিয়ে বলে পাঠালেন, আজ এখানেই খাবেন। শুনে ভদ্রলোকের আনন্দ আর ধরে না। তিনি বিছানাপত্তর

নিয়ে এসে ডেরা গাড়লেন। এক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু তিনি নড়বার নামও করেন না। আদর-যত্ন কম হলে হয়তো তাঁর কিছু চিন্তা হত; কিন্তু রামেশ্বরী তো জানপ্রাণ দিয়ে তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। কাজেই তিনি চলে যাবেন কী জন্যে?

একদিন কুন্দনলাল বললেন, তুমি তো এই বাজে ব্যারাম পুষে রাখছ।

রামেশ্বরী চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ব্যারাম?

— এ লোকটাকে চলে যেতে বলছ না কেন?

— এ আমার কী ক্ষতি করছে?

— কম সে কম রোজ এক টাকা করে তো যাচ্ছে। আর যদি এ রকম আদরযত্ন চলে তাহলে বোধ হয় বেঁচে থাকতে আর নড়বেই না।

— কেউ দু-চার দিনের জন্যে এলে তার পেছনে লাগতে আমি পারব না। যত দিন থাকতে চান থাকবেন।

— এরকম বিনা পয়সায় অন্যের ঘাড়ে চেপে যারা থাকতে চায় তাদের আতিথ্য দেওয়া পাপ। তুমি যদি একে এতটা মাথায় না তুলতে তাহলে এত দিনে পালাত। যেখানে দিনে তিন বার খাওয়া আর পঞ্চাশ বার পান পাওয়া যাচ্ছে সেখান থেকে নিজের বাড়ি ফিরে যাবার কী আর এমন গরজ হবে?

— খেতে না দেওয়া তো ঠিক নয়?

— কুপাত্র ও সুপাত্রের বিচার পরে নেওয়া উচিত। এ রকম আলস্যপরায়ণ লোককে খাওয়ানো-পরানো মানে তাকে বিষ দেওয়া। বিষে কেবল প্রাণই যায় কিন্তু এই আদরযত্ন তো ওর আত্মার সর্বনাশ করে দেবে। এই বাবু যদি মাসাবধি এখানে থেকে যান তাহলে পরে তো সারা জীবনের জন্যেই নিষ্কর্মা হয়ে যাবেন। তাঁর দ্বারা আর কিছু হবে না, আর এর সমস্ত দোষ এসে পড়বে তোমার ঘাড়ে।

উত্তপ্ত বাগবিতণ্ডা চলল। নানা ধরনের বাক্যধারাবর্ষণ হতে লাগল। রামেশ্বরী বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। কুন্দনলাল কোনোদিন তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন কিনা, তাঁর উপদেশের ধারাবর্ষণ কখনও বন্ধ হবে কিনা, এসব প্রশ্ন বারবার তাঁর মনে আসতে লাগল।

পাঁচ

একদিন গ্রাম থেকে টাটকা ভয়সা ঘি এল। এদিকে মাসের পর মাস বাজারের ঘি খেতে খেতে অরুচি ধরে গিয়েছিল। রামেশ্বরী ঘি জ্বাল দিয়ে তাতে লবঙ্গ দিয়ে কড়া থেকে নামিয়ে বয়েমে রেখে দিলেন। ঘির সুগন্ধে ঘর ম-ম করতে লাগল। মহরি উনোন পরিষ্কার করতে এসে ভাবল বয়েম উনান থেকে উঠিয়ে শিকেয় অথবা তাকে রেখে দেবে। কিন্তু কী হল, সে বয়েম তুলতেই তা হাত থেকে ফসকে পড়ে গেল। সমস্ত ঘি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। শব্দ শুনে রামেশ্বরী দৌড়ে এসে দেখেন, মহরি কাঁদছে আর বয়েম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। রামেশ্বরী রেগে বললেন, বয়েম কী করে ভাঙল? আমি তোর বেতন থেকে কেটে নেব। হা ভগবান, সমস্ত ঘি মাটিতে ঢেলে দিয়েছে! তোর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল না হাত নুলো হয়ে গিয়েছিল? এত দূর থেকে আনানো

হল, এত কষ্ট করে জ্বাল দেওয়া হল অথচ এক ফোঁটাও মুখ তোলা গেল না। এখন দাঁড়িয়ে কী করছিস? যা, গিয়ে নিজের কাজ কর।

মহরি চোখের জল মুছে বলল, বউদি, অন্যায় তো করেই ফেলেছি। এখন বেতনই কাটো, আর প্রাণেই মারো। ভেবেছিলাম, উঠিয়ে তাকে রেখে দেব। তার পর উনান পরিষ্কার করব। কী করে জানব, কপালে এই লেখা ছিল? কে জানে কোন হতভাগার মুখ দেখে সকালে বিছানা থেকে উঠেছিলাম।

রামেশ্বরী — আমি ওসব জানি না। সব টাকা তোর মাইনে থেকে আদায় করব। এক টাকা জরিমানা না করেছি তো বলবি।

মহরি — মরে যাব, বউদি। এক পয়সা দেবারও ক্ষমতা নেই।

রামেশ্বরী — মরে যা কি বেঁচে থাক, আমি কিছু জানি না।

মহরি মিনিটখানেক কি ভেবে বলল, ঠিক আছে, কেটে নেবে। তোমার সবুর সইছে না, আমার সইবে। এতেও না হবে তো না খেয়ে মরে যাব। বেঁচে থেকেই বা কোন সুখ ভোগ করছি যে মরতে ভয় পাব? মনে করব, এক মাস কোনো কাজ করিনি। মানুষের কত বড়ো বড়ো ক্ষতি হয়ে যায় আর এ তো ঘি।

মুহূর্তের মধ্যেই মহরির উপর রামেশ্বরীর করুণা হল। বললেন, তুই না খেয়ে মরলে আমার কাজ কে করবে?

মহরি — কাজ করাতে হলে খেতে দেবে, কাজ করাতে না হলে, না খেতে দিয়ে মারবে। আজ থেকে তোমারই দরজায় এসে শুয়ে থাকব।

রামেশ্বরী — সত্যি বলছি, তুই আজ ক্ষতি করে দিয়েছিস।

মহরি — আমি তো নিজেই পস্তাচ্ছি, বউদি।

রামেশ্বরী — যা, গোবর দিয়ে উনান লেপে দে। বয়েমের ভাঙা টুকরো দূরে ফেলে দিয়ে বাজার থেকে ঘি নিয়ে আয়।

মহরি খুশি হয়ে গোবর দিয়ে উনান লেপে বয়েমের টুকরো তুলছে এমন সময় কুন্দনলাল এসে পড়লেন এবং ভাঙা বয়েম দেখে বললেন, এ বয়েম ভাঙল কী করে?

রামেশ্বরী বললেন, মহরি তুলে উপরে রাখছিল, হাত থেকে পড়ে গেছে।

কুন্দনলাল চিৎকার করে বললেন, তা, সমস্ত ঘি পড়ে গেল?

— তা নয়তো কি কিছু বেঁচে গেছে বলব?

— তুমি মহরিকে কিছু বলনি?

— কী বলছ! সে তো আর বুঝেশুনে ফেলে দেয়নি।

— কে এই ক্ষতি পূরণ করবে?

— আমরাই করব, আর কে করবে? যদি আমার হাত থেকেই পড়ে যেত, তাহলে কি হাত কেটে নিতে?

কুন্দনলাল বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার কোনো কথা বুঝতে পারা যায় না। যে ক্ষতি করেছে সেই ক্ষতি পূরণ করবে। এটাই ভগবানের নিয়ম। চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ, — ঈশা-মুসার মতো মহাপুরুষদের এই বিধান। দণ্ড দেবার ব্যবস্থা যদি সংসার থেকে উঠে যায় তাহলে কে আর সংসারে বাস করতে পারবে? সমস্ত পৃথিবী রক্তে লাল হয়ে যাবে, খুনিরা দিনেদুপুরে লোকের গলা কাটতে শুরু করে দেবে। দণ্ডবিধান রয়েছে বলেই সমাজের মর্যাদা রয়েছে। যে দিন দণ্ড থাকবে না, সেদিন সমাজ-সংসারও থাকবে না। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা তো বেকুব ছিলেন না যে, নিরর্থক তাঁরা দণ্ডবিধানের উপর এত গুরুত্ব দেবেন! অন্য কিছুর জন্যে না হোক, মর্যাদার স্বার্থে দণ্ড অবশ্যই দিতে হবে। এ টাকা মহরিকে দিতে হবে। ওর বেতন কেটে নিতে হবে, তা নয় তো আজ ঘির বয়েম ফেলে দিয়েছে, কাল আবার অন্য একটা ক্ষতি করে বসবে।

রামেশ্বরী ভয়ে ভয়ে বললেন, আমি তো ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

কুন্দনলাল চোখ বড়ো করে বললেন, কিন্তু আমি তো ক্ষমা করতে পারছি না।

মহরি দরজায় দাঁড়িয়ে এই বিবাদ শুনছিল। যখন সে দেখল কুন্দনলালের ক্রোধ বেড়ে যাচ্ছে আর তারই জন্যে রামেশ্বরীকে কথা শুনতে হচ্ছে তখন সে সামনে এসে বলল, বাবুজি, আমার তো অপরাধ হয়ে গেছে। সমস্ত টাকা আপনি আমার বেতন থেকে কেটে নেবেন। টাকা নেই, নয়তো এখনই এনে আপনার হাতে দিয়ে দিতাম।

রামেশ্বরী রেগে গিয়ে বললেন, যা, ভাগ এখান থেকে। তুই কী করতে এসেছিস? খুব টাকাওয়ালি হয়ে গেছিস।

কুন্দনলাল স্ত্রীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তুমি কেন ওর হয়ে ওকালতি করছ? এ তো সোজা কথা আর একটা বাচ্চাও একথা বোঝে যে, ক্ষতি যে করে তার দণ্ডও তাকে ভোগ করতে হয়। কেন আমি পাঁচ টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে যাব? কোন কারণে? কেন সে বয়েম সাবধানে ধরেনি? কেন এত হুড়বড় করেছিল? কেন ডেকে সাহায্য নেয়নি? এটা স্রেফ ওর অমনোযোগিতা।

এই কথা বলতে বলতে কুন্দনলাল বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ছয়

এই অপমানে রামেশ্বরী ব্যথিত হলেন। তিরস্কার যদি করতেই হবে তবে ঘরে ডেকে একান্তে করলেই হত। মহরির সামনে তাকে এভাবে তুলোর মতো ধোনা হল। তাঁর বুদ্ধিতেই আসছিল না, এ কী রকম স্বভাবের লোক। আজ এক কথা বলছে তো আবার কাল বলছে তার বিপরীত, যেন কোনো মাথা খারাপ লোক। কখনও দয়া ও উদারতার অবতার, আবার কখনও পাঁচ টাকার জন্যে প্রাণ নিচ্ছে। মজা দেখা যাবে যদি কাল মহরি না আসে। কোনো দিন তো মুখ থেকে খুশির কোনো কথা বের হয় না। এখন আমাকেও স্বভাব পালটাতে হবে। এ সবই আমার সরলতার ফল। যত আমি সহ্য করছি তত সে তার স্বরূপ প্রকাশ করছে। এর চিকিৎসাই হল যে, একটা কথা বললে দশটা কথা শুনিয়ে দিতে হবে। যাই হোক, কত দিন সহ্য করব? কতদূর সহ্য করব?

একটা সীমা তো আছে! যখনই হোক মেজাজ দেখাবে। যার মেজাজের কোনো ঠিকঠিকানাই নেই তাকে কে খুশি করতে পারে? সেদিন বেড়ালকে একটু মেরেছি, তা উনি দয়া সম্পর্কে উপদেশ দিতে লাগলেন। এখন সেই দয়া কোথায় গেল? একে টিট করার উপায় হল, কিছু বললে মনে করতে হবে কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। না, তাই বা কেন করব? নিজে থেকে কোনো কিছুই করব না। যা সে বলবে তাই করব, এক চুল বেশিও নয়, এক চুল কমও নয়। যখন আমার কোনো কাজই তার পছন্দ নয় তখন আমার কী এমন দায় পড়েছে যে, গা-জোরি করব! ব্যস্, এভাবেই চলব।

সে রাত এরকম চিন্তাভাবনাতেই গেল। সকালে কুন্দনলাল নদীতে স্নান করতে গেলেন। যখন ফিরে এলেন তখন নটা বাজে। ঘরে গিয়ে দেখলেন, উনান ধরানো হয় নি। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলেন, কি, মহরি আসে নি?

রামে — না।

কুন্দন — তা হলে?

রামে — আপনি যা বলবেন।

কুন্দন — এ তো বড়ো মুশকিলের কথা।

রামে — হাঁ, তা তো ঠিকই।

কুন্দন — পাশের বাড়ির মহরিকে বললে না কেন?

রামে — কার হুকুমে বলব? এখন হুকুম হল, ডেকে আনছি।

কুন্দন — এখন বলবে তবে খাবার কখন তৈরি হবে? নটা বেজে গেছে। এটুকু তো তোমার নিজের বুদ্ধিতে করা উচিত ছিল যে, মহরি যখন এল না তখন প্রতিবেশী কারুর বাড়ি থেকে ডেকে আনি।

রামে — তবে তখন যদি বলতেন, কেন অন্য মহরি এনেছি, তার কী জবাব দিতাম? নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছি। এখন আপনার বুদ্ধিতেই কাজ করব। আমি চাই না, কেউ আমাকে চোখ রাঙাক।

কুন্দন — আচ্ছা, তা হলে এ বেলা কী হবে?

রামে — যা হুজুরের হুকুম তাই হবে।

কুন্দন — তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে চাইছ না কি।

রামে — আমার এত সাহস যে আমি আপনাকে শিক্ষা দেব। আমি তো হুজুরের কেনা বাঁদি যা বলবেন, তাই করব।

কুন্দন — আমি যাচ্ছি; তোমার যা ইচ্ছা কর।

রামে — যান। আমি কিছুই চাইব না আর কিছু করবও না।

কুন্দন — তা হলে কী খাবে?

রামে — যা আপনি দেবেন, তাই খাব।

কুন্দন — দাও, বাজার থেকে পুরি আনিয়ে দিচ্ছি।

রামেশ্বরী টাকা বের করে নিয়ে এলেন। কুন্দনলাল পুরি আনিয়ে দিলেন, সে সময়ের মতো কাজ চলল। তারপর অফিসে গেলেন। যখন ফিরে এলেন তখন দেরি হয়ে গিয়েছিল। আসতে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, মহরি এসেছিল?

রামে — না।

কুন্দন — আমি তো বলেছিলাম, পাশের বাড়ির মহরিকে ডেকে নেবে।

রামে — ডেকেছিলাম। সে পাঁচ টাকা চাইছিল।

কুন্দন — এক টাকারই তো ফারাক ছিল, রাখলে না কেন?

রামে — সে হুকুম আমি পাই নি। এক টাকা কেন বেশি খরচ করেছি তা নিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা হত, যদি খরচের ব্যাপারে মিতব্যয়িতার উপদেশ বর্ষণ শুরু হত, তা হলে কী করতাম?

কুন্দন — তুমি একেবারেই মূর্খ।

রামে — একেবারেই।

কুন্দন — তা, এবেলা কি রান্না হবে না?

রামে — আমি কী করব!

কুন্দনলাল মাথায় হাত দিয়ে খাটিয়ার উপর বসে পড়লেন। এতো নতুন বিপদ এসে জুটল! পুরি খেতে তার ভালো লাগত না। মনে মনে অনেক ভাবলেন। রামেশ্বরীকে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন; কিন্তু মনে হল, তিনি কিছুই শোনেননি। যখন কিছুতেই কিছু হল না, তখন মহরির খোঁজে বেরোলেন। গিয়ে দেখেন, মহরি কাজ করে চলে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক কাহারকে পাওয়া গেলে তাকে ডেকে নিয়ে এলেন। কাহার দু আনা নিয়ে বাসন ধুয়ে চলে গেল।

রামেশ্বরী বললেন, কী রান্না হবে?

কুন্দন — রুটি তরকারি বানিয়ে নাও। না, এতেও কোনো আপত্তি আছে?

রামে — ঘরে তরকারি নেই।

কুন্দন — দিন ভর ঘরে বসে থাকলে তরকারিটাও এনে রাখলে না? এখন এত রাতে কোথায় তরকারি পাওয়া যাবে?

রামে — তরকারি কিনে রাখার হুকুম আমার ছিল না। আমি বেশি পয়সা দিয়ে দিই তো!

কুন্দনলাল অসহায় ভাবে দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, আচ্ছা, তুমি কী চাইছ বল তো?

রামেশ্বরী শান্তভাবে জবাব দিলেন, কিছুই না। কেবল অপমান চাই না।

কুন্দন — কে তোমার অপমান করে?

রামে — আপনি করেন।

কুন্দন — তার মানে বাড়ির কোনো কিছুতে আমি কিছু বলতে পারব না?

রামে — আপনি না বললে কে বলবে? আমি তো শুধু হুকুমের চাকর।

রাত্রিটা ডালরুটির উপর দিয়েই কাটল। দুজনেই শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই রামেশ্বরীর ঘুম এসে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত কুন্দনলাল এপাশ-ওপাশ করে ভাবতে লাগলেন, রামেশ্বরী যদি এরকম অসহযোগ করে তা হলে তো একদিনও চলবে না। আজই তো কত ঝামেলা করে

খাবার জুটেছে। উদ্ভট বুদ্ধি এর। আমার তো মনে হয় সে ভাবছে, তার ওপর আমি মেজাজ দেখাচ্ছি। কিছু না বলে তো আমি থাকতেই পারব না। তবে কিছু বলার পরিণাম যদি এই হয়, তা হলে তো বলা অর্থহীন। ক্ষতি হবে, তবে অফিস থেকে ফিরে বাজারে ছুটতে হবে না। বুঝতে পারছি মহরির কাছ থেকে টাকা আদায় করার কথা ওর ভাল লাগেনি। অবশ্য আমার তা বলা উচিতও হয় নি। টাকা তো পাওয়াই গেল না, উলটে মহরি কাজ ছেড়ে দিল।

রামেশ্বরীকে জাগিয়ে বললেন, কত ঘুমুচ্ছ?

রামে — মজুরদের ঘুম খুব গাঢ় হয়।

কুন্দন — তেরচা কথা বলো ন। মহরির কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে না।

রামে — সে তো বোধহয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

কুন্দন — সে যদি জানতে পারে তাহলে কাজ করতে আসবে।

রামে — ভালো কথা, খবর পাঠাব।

কুন্দন — আজ থেকে কান ধরছি, তোমার কাজে বাধা দেব না।

রামে — আর যদি ঘরের জিনিস আমি সব বিলিয়ে দেই, তা হলে?

কুন্দন — বিলিয়ে দাও আর যাই করো, রাগারাগি কোরো না। যদি কোনো ব্যাপারে তুমি আমার পরামর্শ চাও তো দেব। তা না হলে মুখ খুলব না।

রামে — আমি অপমান সহ্য করতে পারি না।

কুন্দন — এ ভুল ক্ষমা করো।

রামে — মনে থাকবে তো?

কুন্দন — থাকবে।

(খুচড় / ১৯২৯) অনুবাদ অমলকুমার রায়।

ফাতিহা

সরকারি অনাথাশ্রম থেকে বেরিয়ে আমি সোজা ফউজে ভরতি হয়েছিলাম। আমার শরীরটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ। সাধারণ মানুষের চেয়ে আমার হাত-পা অনেক বেশি দীর্ঘ এবং পেশীবহুল। লম্বায় আমি পুরো ছ ফুট ন ইঞ্চি। পলটনে ভীম বলে বিখ্যাত। যেদিন থেকে ফউজে ঢুকেছি সেদিন থেকে আমার কপালও ফিরতে শুরু হয়েছে, আর আমার হাত দিয়ে এমন কয়েকটি কাজ হয়েছে যাতে সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার আয়ও বাড়তে শুরু করেছে। পলটনের প্রতিটি জওয়ান আমাকে চেনে। মেজর সর্দার হিম্মত সিংহেরও আমার উপর খুব কৃপাদৃষ্টি; কারণ আমি একবার তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। এছাড়াও কেন জানিনা ওঁকে দেখলে আমার হৃদয়ে শ্রধা-ভক্তির উদ্রেক হয়। আমার মনে হয় উনি আমার শ্রধাভাজন। সর্দার সাহেবের ব্যবহারও আমার প্রতি স্নেহময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

আমি জানি না কে আমার বাবা, কে মা। মা-বাবার কোনোও স্মৃতিচিহ্নও আমার কাছে নেই। কখনও-সখনও আমি যখন এসব কথা ভাবতে বসি, তখন একটা আবছা ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে — ছবিটা উঁচু উঁচু পাহাড়ের দেশের একটি সংসারের, আর একটি মহিলার মুখের, যে মুখখানি হয়তো আমার মায়ের হবে। পাহাড়ের কোলেই তো আমি বড়ো হয়েছি। পেশোয়ার থেকে আশি মাইল দূরে একখানি গাঁ, সে গাঁয়ের নাম 'কুলাহা'। ওখানেই সরকারি অনাথাশ্রম। ওই অনাথাশ্রমেই আমি বড়ো হয়েছি। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা ফউজে এসে ঢুকেছি। হিমালয়ের জল-হাওয়াতে আমার শরীর গড়া। আফ্রিদি, গিলজই, মহসুদি এসব সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়ি গোষ্ঠীর মানুষগুলো যেমন হয়ে থাকে, আমিও তেমনি দীর্ঘদেহী ও বর্বর। ওদের আর আমার জীবনে কোনোও পার্থক্য যদি থেকে থাকে তবে তা হল সভ্যতার। আমি খানিকটা লেখাপড়া জানি, কথাবার্তা বলতে পারি, আদবকায়দা জানি, ছোটো-বড়ো মান্য করি, কিন্তু আমার আকৃতি অমনি, যেমনটি সীমান্তের যে কোনও পুরুষের হয়ে থাকে।

স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবার একটা ইচ্ছা আমার মনে মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে; তবে জীবিকার প্রশ্ন সে ইচ্ছটাকে দাবিয়ে দেয়। এই রুক্ষ শুষ্ক দেশে খাবারের কোনোও ঠিক-ঠিকানা নেই। এখানকার লোকজন একখানা রুটির জন্য মানুষ খুন করে বসে, একখানা কাপড়ের জন্য মৃতদেহকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে, আর একটা বন্দুকের জন্য সরকারি সেনাদের উপর হামলা করে। আর তাছাড়া ওই জংলি জাতিগুলোর প্রতিটি মানুষ আমাকে চেনে এবং তারা আমার রক্তপিপাসু। ওরা আমাকে পেলে দুনিয়া থেকে আমার নাম-নিশানা মুছে যাবে। না-জানি

কত কত আফ্রিদি আর কত কত গিলজইকে আমি খতম করেছি, কতজনকে যে ধরে ধরে এনে সরকারি জেলখানায় পুরে দিয়েছি, আর না জানি ওদের কত গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি। তাই আমি খুবই সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি, আর যতদূর সম্ভব এক সপ্তাহের বেশি কখনও এক জায়গায় থাকি না।

দুই

মেজর সর্দার হিম্মত সিংহের বাড়ির দিকে যাচ্ছি আমি। বেলা দুটো বাজে। এখন একরকম ছুটি, কারণ এই কদিন আগেই ওদের কয়েকখানা গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং শিগগির ওদের দিক থেকে কোনো আশঙ্কা নেই। আমরা চিন্চিন্তমনে গল্পসল্প করে আর হেসেখেলে দিন কাটাচ্ছি। বসে বসে মেজাজ বিগড়ে গেছে। শুধু মনটাকে চাঙা করার জন্যে সর্দার সাহেবের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এক বুড়ো আফ্রিদি, যে বুড়োটা এখনও একজন হিন্দুস্তানি জওয়ানের ঘাড় মটকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, একজন ফউজি সেপাইর সঙ্গে লড়ছিল। দেখতে না দেখতে কোমর থেকে একটি তীক্ষ্ণ ছোরা বের করে সে সেপাইটার বুকে বসিয়ে দেয়। জওয়ানটির কাছে ছিল একটি কার্তুজের বন্দুক, আর ওই বন্দুকটার জন্যই এতসব লড়াই। চোখের পলক পড়তে না পড়তে সেপাইটি খতম, আর বুড়ো বন্দুকটা নিয়ে ছুট দিল। আমি বুড়োর পেছন পেছন দৌড়োই; কিন্তু এত দ্রুত সে ছোটে যে, মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়ালে চলে যায়। আমিও দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বুড়োর পেছন পেছন ছুটছি। শেষ পর্যন্ত সীমান্তে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওর কাছ থেকে হাত বিশেক পিছিয়ে পড়ি। লোকটা পেছনে তাকিয়ে দেখে যে, আমি একা ওর পেছনে ছুটছি। সে বন্দুক তুলে আমার দিকে তাক করে। আমি ঝটিতি মাটিতে শুয়ে পড়ি। বন্দুকের গুলি এসে সামনে পাথরে লাগে। বুড়োটা ভাবে আমার গুলি লেগেছে। সে আস্তে আস্তে সতর্ক পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমি শ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকি। একেবারে আমার কাছে আসামাত্র বাঘের মতো লাফ দিয়ে আমি ওর ঘাড় ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে ছোরা বের করে ওর বুকে বিঁধিয়ে দিই। আফ্রিদির জীবনলীলা শেষ। তখনই আমার পলটনের কয়েকজন লোকও এসে পড়ে। চারদিক থেকে লোকে আমার প্রশংসা করতে থাকে। এতক্ষণ আমি আমাতে ছিলাম না; তবে এবারে আমার সম্বিৎ ফিরে আসে। না জানি কেন ওই বুড়োটাকে দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত কত কত আফ্রিদিকে যে মেরেছি কিন্তু কখনও আমার মন এত বিচলিত হয়নি। আমি মাটিতে বসে পড়ে বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকি। পলটনের জওয়ানরাও এসে পড়ে। আমাকে আহত মনে করে নানারকম প্রশ্ন করতে থাকে। আস্তে আস্তে উঠে চুপচাপ শহরের দিকে আমি হাঁটতে থাকি। আমার পেছনে পেছনে সেপাইরা বুড়োর লাশটাকে টানতে টানতে আনে। শহরের লোকেরা আমার জয়জয়কার করে চলেছে। আমি চুপচাপ গিয়ে মেজর হিম্মত সিংহের বাড়িতে ঢুকে পড়ি।

সর্দার সাহেব তাঁর খাস কামরায় বসে বসে কী লিখছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন — কী! ওই আফ্রিদিটাকে খতম করে এলে?

বসতে বসতে বলি — আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু সর্দার সাহেব, কেন জানিনা আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেছি।

সর্দার সাহেব অবাক হয়ে বলেন — আসাদ খাঁ আর ভয়! এ দুটির যে এক জায়গায় থাকা অসম্ভব।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলি — সর্দার সাহেব, এখানে ভালো লাগছে না, চলুন উঠে বাইরে বারান্দায় বসুন। কেন জানিনা আমার মনটা বড়ো মুষড়ে পড়েছে।

আমার কাছে উঠে এসে স্নেহভরে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সর্দার সাহেব বলেন — আসাদ, তুমি ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, আর কিছু না। বেশ তো, চলো বারান্দায় গিয়ে বসছি। বিকেলের ঠান্ডা হাওয়া তোমাকে চাঙ্গা করে তুলবে।

সর্দার সাহেব আর আমি, দুজনেই বারান্দায় গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ি। শহরের চৌমাথায় ওই বৃদ্ধের মৃতদেহটাকে রেখেছে, মৃতদেহের চারপাশে ভিড় জমে গেছে। বারান্দায় আমাকে বসে থাকতে দেখে লোকেরা আঙুল দিয়ে আমাকে দেখাচ্ছে। সর্দার সাহেব তা দেখে বলেন — আসাদ খাঁ, দেখলে তো লোকের চোখে তুমি কত বড়ো! তোমার বীরত্বের প্রশংসা এখানে প্রতিটি শিশু পর্যন্ত করে । অথচ তুমি বলছ তুমি ভয় পাচ্ছ!

হেসে বলি — যখন থেকে ওই বুড়োটাকে মেরেছি, সেই থেকে আমার বিবেক আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে।

সর্দার সাহেব হেসে বলেন — তার কারণ তুমি তোমার চাইতে দুর্বলকে মেরেছ!

আমি আমার মনকে প্রবোধ দিয়ে বলি — হয়তো তাই হবে।

ঠিক তখন এক আফ্রিদি রমণী ধীরে ধীরে সর্দার সাহেবের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটিকে দেখেই সর্দার সাহেবের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাঁর ভয়ভীত দৃষ্টি স্ত্রীলোকটির দিক থেকে ঘুরে আমার দিকে আসে। আমিও অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ওই রমণীর সুঠাম শরীরের মতো সুঠাম শরীর পুরুষদের মধ্যেও কম দেখা যায়। খাকি রঙের মোটা কাপড়ের পায়জামা আর নীল রঙের মোটা পাঞ্জাবি পরনে। বেলুচি মেয়েদের মতো মাথায় রুমাল বাঁধা। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রঙ, যৌবনের আভা যেন ফেটে পড়ছে। তার চোখের চাউনিতে এমন ভীষণতা যা যে কোনও লোকের মনেই ভয়ের সঞ্চার করে। রমণীর চোখ দুটি সর্দার সাহেবের দিক থেকে ঘুরে এসে আমার উপর পড়ে। সে এমনভাবে চোখ পাকিয়ে আমাকে দেখতে থাকে যে, আমি ভয় পেয়ে যাই। সর্দার সাহেবের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি মাটিতে থুতু ফেলে, তারপর আমার দিকে তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে অন্য দিকে চলে যায়।

রমণীটিকে চলে যেতে দেখে সর্দার সাহেবের দেহে যেন প্রাণ ফিরে আসে। আমার মাথা থেকেও যেন একটা বোঝা নেমে যায়।

সর্দার সাহেবকে জিজ্ঞেস করি — ওকে চেনেন নাকি?

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্দার সাহেব বলেন — হ্যাঁ, খুব চিনি। একটা সময় ছিল যখন মেয়েটি আমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিত, আর সত্যিই নিজের প্রাণ সংকট করে আমার জীবন রক্ষাও করেছিল; কিন্তু আজকাল ও আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। ওই মেয়েটিই আমার স্ত্রীকে খুন করেছে। মেয়েটিকে দেখলেই আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় আর সেদিনকার সেই দৃশ্যটাই আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

ভয়বিহ্বল কণ্ঠে আমি বলি — সর্দার সাহেব, ও তো আমার দিকেও বড়ো ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। কেন জানি না আমারও গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

মাথা নেড়ে বড়ো গম্ভীরভাবে সর্দার সাহেব বলেন — আসাদ খাঁ, তুমিও হুঁশিয়ার থেকো। এই বুড়ো আফ্রিদিটার সঙ্গে হয়তো মেয়েটির কোনো আত্মীয়তা আছে। হয়তো বা বুড়োটা ওর ভাই কিংবা বাবা। তোমার দিকে ওর তাকানোর কিছু একটা মানে থাকতে পারে। খুব সাংঘাতিক মেয়ে!

সর্দার সাহেবের কথা শুনে আমার শিরায় শিরায় কাঁপুনি ধরে। আলোচনাটাকে অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য প্রশ্ন করি — সর্দার সাহেব, আপনি ওকে পুলিশের হাতে কেন তুলে দিচ্ছেন না? ওর ফাঁসি হয়ে যাবে।

সর্দার সাহেব বলেন — ভাই আসাদ খাঁ, মেয়েটি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আর হয়তো এখনও আমাকে ভালোবাসে। ওর কাহিনি অনেক লম্বা। কখনও যদি সময় পাই তো বলব।

সর্দারের কথায় আমার কৌতূহল বেড়ে যায়। সে কাহিনি শোনাবার জন্য আমি ওঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকি।

উনি প্রথমে তো এড়িয়ে যেতে চান; কিন্তু যখন খুব করে আমি চেপে ধরি তখন বাধ্য হয়ে বলেন — আসাদ, তোমাকে আমি আমার ছোটো ভাইয়ের মতো দেখি, তাই তোমার কাছে কিছু রেখে ঢেকে বলব না। তাহলে শোনো

তিন

আসাদ, এখন যতটা বুড়ো দেখছ আমাকে, পাঁচ বছর আগে আমি এতটা বুড়ো ছিলাম না। আমার বয়স তখন বছর চল্লিশের কম না। একটা চুলও পাকেনি, আর দেহে আমার তখন এত শক্তি ছিল যে, দু-দুটো জওয়ানের সঙ্গে আমি লড়তে পারতাম। জার্মানদের সঙ্গে আমি সামনা-সামনি লড়েছি, আর না জানি কতজনকেই যমালয়ের রাস্তা বাত[illegible] দিয়েছি। জার্মান-যুদ্ধের পরে এখানে এই সীমান্ত প্রদেশে কালো পলটনের মেজর করে আমাকে পাঠানো হয়েছে। প্রথম যখন এখানে এলাম তখন অনেক সমস্যা এসেছিল আমার সামনে, কিন্তু আমি সেসবের আদৌ পরোয়া করিনি। একে একে আমি সব সমস্যারই মোকাবেলা করেছি। এখানে এসে সবার আগে আমি পস্তু ভাষা শিখতে শুরু করেছিলাম। পস্তু শেখার পর আরও অনেক ভাষা শিখলাম। সে সব ভাষা আমি অনর্গল বলতে পারতাম প্রবাদ-প্রবচনসুদ্ধ। তারপর কয়েকজন করে ছোটো ছোটো দল বানিয়ে দেশের ভেতরটাও আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছিলাম। এই খোঁজাখুঁজিতে কয়েকবারই মরতে মরতে আমি বেঁচে গেছি — তবে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে আমি এখানে স্বচ্ছন্দেই বাস করছিলাম। আমার হাত দিয়ে সে সময় এমন এমন সব কাজ হয়েছে — যার ফলে সরকারে আমার খুব নামযশ এবং প্রতিষ্ঠাও হল। একবার কর্নেল হ্যামিল্টনের মেমসাহেবকে আমি একা উদ্ধার করে আনি, এছাড়াও আরও কত কত দেশি মেয়ে-পুরুষের প্রাণ আমি বাঁচিয়েছি। এখান আসার তিন বছর পরে আমার এ কাহিনির শুরু।

একদিন রাতে আমার ক্যাম্পে শুয়েছিলাম। আফ্রিদিদের সঙ্গে লড়াই চলছিল। সারাদিনের শ্রান্ত ক্লান্ত সৈনিকেরা অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। ক্যাম্পে নীরবতা। শুয়ে শুয়ে আমারও ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙতে দেখি আমার বুকের উপর এক আফ্রিদি। বয়েসটা আমার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। বুকের উপর চেপে বসে সে আমার বুকে ছোরা বসাতে যাচ্ছে। আমি সম্পূর্ণ ওর আয়ত্তে, বাঁচার কোনও উপায়ই ছিল না। তবে সে সময় আমি ঠান্ডা মাথায় একটা কাজ করলাম। পস্তু ভাষায় বললাম — আমাকে মেরো না, আমি সরকারি ফউজি অফিসার। আমাকে ধরে নিয়ে চলো, সরকার তোমাকে টাকা দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নেবেন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার কথাটা ওর মনে ধরল। কোমর থেকে দড়ি বের করে আমার হাত-পা বেঁধে আমাকে বোঝার মত কাঁধে ফেলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে তখন মারামারি কাটাকাটির বাজার বেশ গরম। অদ্ভুতভাবে একটা হাঁক দিয়ে কিছু বলে সে আমাকে কাঁধে ফেলে বনের দিকে ছুট দিল। আমার শরীরের ভার যে ওর কাছে কিছুই মনে হচ্ছিল না এ আমি খুব বলতে পারি। সে ছুটে যাচ্ছিল খুব দ্রুত। পেছন পেছনে ওর দলের কয়েকজন লোক লুটের মাল নিয়ে ছুটে আসছিল।

সকালবেলা একটা হ্রদের ধারে এসে পৌছলাম আমরা। হ্রদটা বড়ো বড়ো সব পাহাড় দিয়ে ঘেরা। হ্রদের জল টলটলে আর এদিকে ওদিকে জংলা গাছপালা। সরোবরের কাছে পৌছে আমরা সবাই থামলাম। বুড়োটাই ছিল দলের সর্দার। বুড়ো আমাকে পাথরের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। কোমরে বড়ো চোট লেগেছিল, আমার মনে হল যেন হাড়গোড় ভেঙে গেছে, তবে ঈশ্বরের দয়ায় হাড় সত্যিই ভাঙেনি। মাটিতে ফেলে দিয়ে সর্দার আমাকে জিজ্ঞেস করল — কী রে, কত টাকা পাইয়ে দিবি?

যন্ত্রণা চেপে বললাম — পাঁচশো টাকা।

সর্দার মুখ বেঁকিয়ে বলল — উহুঁ, এত কমে হবে না। দু হাজারের একটি পয়সাও যদি কম মেলে তাহলে তোর রক্ষা নেই।

আমি একটু ভেবে বললাম — সরকার কালা আদমির জন্য এত টাকা খরচ করবে না।

ছোরা বের করে সর্দার বলল — তবে কেন বলেছিলি যে সরকার ইনাম দেবে? নে, তবে এখানেই মর।

ছোরা হাতে সর্দার এগিয়ে এল।

আমি ভয় পেয়ে বললাম — আচ্ছা সর্দার, তোমাকে আমি দু হাজার পাইয়ে দেব।

থেমে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে সর্দার হেসে উঠল। ওর সেই অট্টহাসির প্রতিধ্বনি নির্জীব পাহাড়গুলোকেও কাঁপিয়ে তুলল। আমার মনে হল — বড়ো সাংঘাতিক লোক এই সর্দার!

দলের আর সব লোকেরা নিজের নিজের লুটের মাল এনে সর্দারের সামনে রাখতে লাগল। লুটের মালের মধ্যে ছিল গোটাকয়েক বন্দুক, কার্তুজ, বুটি আর কাপড়। আমার দেহও তল্লাশি করে দেখা হল। আমার কাছে একটা ছ-ঘরা পিস্তল ছিল। পিস্তল পেয়ে সর্দার আনন্দে লাফিয়ে উঠে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তখন তখনই ওখানেই ভাগবাঁটোয়ারা শুরু হয়ে গেল। সমান সমান ভাগ হল, শুধু আমার রিভলবারটাকে ওর মধ্যে ধরা হল না। ওটি হল সর্দার সাহেবের খাস জিনিস।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আবার যাত্রা শুরু হল। এবারে আমার পা দুটোকে খুলে দিয়ে ওদের সঙ্গে হাঁটতে বলল। আমার দু-চোখে পট্টিও বেঁধে দেওয়া হল, যাতে আমি রাস্তা না দেখতে পারি। হাত দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা আর সে দড়ির একটা প্রান্ত একজন আফ্রিদির হাতে ধরা।

হাঁটতে হাঁটতে পা দুটো আমার টনটন করতে লাগল, তবুও ওদের গন্তব্যস্থলের হদিশ নেই। মাথার উপর জ্যৈষ্ঠের সূর্য জ্বলছে, পা দুটোয় ব্যথা, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ, তবু ওরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ওরা হাঁটছিল, ওদের একটা কথাও আমি বুঝতে পারছিলাম না। এক-আধটা শব্দ মাঝে-মধ্যে বুঝতে পারছিলাম বটে; কিন্তু বেশিরভাগই আমার মাথায় ঢুকছিল না। নিজেদের জয়ে ওরা তখন খুশি। একজন আফ্রিদি তার আপন ভাষায় একখানি গান গাইতে শুরু করল। গানটা খুবই সুন্দর।

আসাদ খাঁ জিজ্ঞেস করে — সর্দার সাহেব, গানটা কী ছিল?

সর্দার সাহেব বলেন — গানের ভাবটা মনে আছে। ভাবটা ছিল এরকম — এক আফ্রিদি বেরোতে যাচ্ছে, ওর বউ ওকে জিজ্ঞেস করছে — কোথায় যাচ্ছ গো?

যুবক উত্তরে বলে — যাচ্ছি তোমার জন্য বুটি আর কাপড় আনতে।

বউ জিজ্ঞেস করে — তোমার খোকাদের জন্য কিছু আনবে না?

যুবক বলে — খোকাদের জন্য বন্দুক আনব, যাতে বড়ো হয়ে ওরাও লড়াই করে ওদের প্রেমিকার জন্য বুটি কাপড় আনতে পারে।

বউ বলে — বেশ, বলে যাও কবে ফিরবে?

যুবক উত্তর দেয় — ফিরব সেদিন যেদিন কিছু জয় করে আনতে পারব, তা নইলে ওখানেই প্রাণ দিয়ে দেব।

বউ বলে — সাবাস! যাও, তুমি বীর, তোমার জয় হবেই হবে!

গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। গান শেষ হতে না হতে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার দু-চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। সামনে বিরাট এক সমতল ভূমি আর তার চারপাশে গুহা, জায়গাটা ছিল ওদের আস্তানা।

আমার শরীর আবার তল্লাশি করে দেখা হল। এবারে পায়জামা বাদে সমস্ত জামাকাপড় খুলে নেওয়া হল। সামনে বিরাট একখানি পাথরের চাঁই পড়ে ছিল। সবাই মিলে পাথরখানাকে সরিয়ে আমাকে সেদিকে নিয়ে চলল। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এ যে জ্যান্ত কবরে ফেলে দেবে। বড়োই বেদানাকাতর দৃষ্টিতে সর্দারের দিকে তাকিয়ে বললাম — সর্দার, সরকার তোমাকে টাকা দেবে। আমাকে মেরো না।

সর্দার হেসে বলল — তোকে মারছে কে? কয়েদ করে রাখা হচ্ছে। এ ঘরে আটকে থাকবি। টাকা এলে তবে ছেড়ে দেওয়া হবে। সর্দারের কথা শুনে আমার দেহে প্রাণ ফিরে এল। আমার পকেট বুক আর পেন্সিলটাকে সামনে এগিয়ে ধরে সর্দার বলল — নে, এ কাগজটাতে লিখে দে। একটা পয়সাও যদি কম আসে তো তোর জীবনের আশা নেই।

কমিশনার সাহেবের কাছে আমি একখানা চিঠি লিখে দিলাম। ওরা আমাকে সেই অন্ধকূপে নামিয়ে দিয়ে দড়িটা টেনে তুলে নিল।

চার

সর্দার সাহেব একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আবার বলতে শুরু করেন — আসাদ খাঁ, আমাকে যখন ওই কুয়োতে নামানো হচ্ছিল ভয়ে তখন আমার অন্তরাত্মা কাঁপছিল। নীচে ঘনঘোর অন্ধকারের বদলে চাঁদের আলো পড়ছিল। গুহার ভেতরটা একেবারে ছোটো না, আবার খুব বড়োও না। মেঝেটা ছিল খরখরে, মনে হচ্ছিল যেন বছরের পর বছর জলধারা পড়ে পড়ে এই গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। পাথরের মোটা দেওয়ালে ঘেরা কূপটি, সে দেওয়ালে এখানে ওখানে ফুটো। ওসব ফুটোর ভেতর দিয়ে আসছিল আলো আর বাতাস। নীচে পৌঁছে আমি আমার ভাগ্যের ফের নিয়ে ভাবতে লাগলাম। মনটা খুব দমে গিয়েছিল। অন্ধকূপের যন্ত্রণাভোগও বিধাতা কপালে লিখেছিলেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হল। লোকগুলো তখন পর্যন্ত আমার কোনও খোঁজখবর নেয়নি। খিদেয় প্রাণটা ছটফট করছে। বারে বারে বিধাতাকে আর নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি। মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়ে তখনই বিধাতাকে দোষ দিয়ে থাকে।

শেষে একটা ফুটো দিয়ে চারখানা বড়ো বড়ো রুটি কে যেন বাইরে থেকে ছুঁড়ে দিল। কুকুর যেমন করে এক টুকরো রুটির দিকে ছুটে যায় আমিও তেমনি ছুটলাম। আর রুটিগুলো তুলে নিয়ে সেই ফুটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম; কিন্তু আর কেউ কিছু ছুঁড়ল না, কিছু হুকুমও মিলল না। আমি বসে বসে রুটি খেতে লাগলাম। খানিক বাদে ওই ফুটোটার উপরে একটা লোহার মগ রেখে দেওয়া হল, জলভর্তি মগ। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে জল নিয়ে খেলাম। প্রাণটা একটু জুড়োলে বললাম — আর একটু জল চাই।

শুনে দেওয়ালের ওপাশ থেকে ভয়ংকর একটা হাসির প্রতিধ্বনি শোনা গেল, আর কে যেন খনখনে গলায় বলল — জল আবার কাল পাবে। মগ ফেরত দিয়ে দাও, নইলে কালও জল পাবে না।

কী করি, বাধ্য হয়ে মগটা ওখানেই রেখে দিলাম।

এভাবেই আরও কয়েকটা দিন কাটল। রোজ দু বেলা চারখানা করে রুটি আর এক কৌটো জল পেতাম। ক্রমে ক্রমে আমিও এই শুষ্ক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। নিঃসঙ্গতা আর অতটা অসহ্য বলে মনে হত না। মাঝে মাঝে আমি নিজের ভাষায়, আবার কখনো বা পস্তু ভাষায় গান গাইতাম। এতে মনটা আমার কিছুটা ভুলে থাকত আর বুকটাও শান্ত হত।

একদিন রাতে আমি একখানি পস্তু গান গাইছিলাম। সব কিছু ঝলসে দেয় যে লু, তাকে ডেকে মজনু বলছে — তোমার মাঝে কি সেই তীব্রতা নেই যা কাফিলাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়? তাহলে সেই তাপ আমাকে কেন পুড়িয়ে ফেলে না? সে কি শুধু এজন্য যে আমার নিজের ভেতরেই একটা আগ্নেয়গিরি জ্বলছে?

—শোনো, লায়লা যখন আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌঁছোবে, তখন তুমি আমার এ দেহখানিকে বালুকা দিয়ে ঢেকে দিও, তা নইলে কাচের মতো লায়লার বুকখানি ভেঙে যাবে।

গান বন্ধ করলাম। ঠিক তখনই ছিদ্রপথে কে একজন বলে উঠল — বন্দী, গানটা আবার গাও না।

আমি চমকে উঠলাম। একটু আনন্দও হল, কিছুটা অবাকও হয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি?

ছিদ্রপথে উত্তর পেলাম — আমি তুরিয়া, সর্দারের মেয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম — গানটা তোমার ভালো লেগেছে?

তুরিয়া বলল — হ্যাঁ বন্দী, গাও, আমি আবার গানটা শুনতে চাই। আমি সানন্দে গাইতে শুরু করলাম। গান শেষ হলে তুরিয়া বলল — তুমি রোজ আমাকে এই গানটা শোনাবে। এর বদলে আমি তোমাকে আরও রুটি, আরও জল দেব।

তুরিয়া চলে গেল। সেদিন থেকে প্রতি রাতে আমি ওই গানটা গাইতাম আর তুরিয়া দেওয়ালের পাশে এসে বসে শুনত।

মনোরঞ্জনের এই একটি উপায় আমি পেলাম।

ধীরে ধীরে এক মাস কেটে গেল, কিন্তু তখন পর্যন্ত কেউ আমাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য টাকা পাঠালো না। যতই দিন কাটতে লাগল, জীবন সম্বন্ধে ততই আমি হতাশ হয়ে পড়তে লাগলাম। ঠিক একমাস বাদে সর্দার এসে আমাকে বলল — কয়েদি, কালকের মধ্যে যদি টাকা না আসে তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে। আমি আর রুটি খাওয়াতে পারব না।

জীবনের আর কোনো আশা রইল না। সেদিন আমি না পারলাম খাবার খেতে, না পারলাম জল খেতে। রাত হলে রুটি ছুঁড়ে দেওয়া হল; কিন্তু আমার খেতে ইচ্ছে হল না।

যথাসময়ে তুরিয়া এসে বলল — বন্দী, গানটা গাও।

আমার তখন কিছুই ভালো লাগছিল না। আমি চুপ করে রইলাম। তুরিয়া আবার জিজ্ঞেস করল — বন্দী, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি? ম্লান কণ্ঠে আমি বললাম — না, আজ ঘুমিয়ে কী হবে, কাল এমন ঘুমুব যে আর জাগতে হবে না।

তুরিয়া প্রশ্ন করল — কেন, সরকার কি টাকা পাঠাবে না?

আমি উত্তর দিলাম — পাঠাবে তো, কিন্তু কাল তো আমাকে মেরে ফেলা হবে। আমি ঘরে গেলে টাকা যদি আসেও বা তবে সেটা আমার কোন কাজে লাগবে?

তুরিয়া সান্ত্বনা দিয়ে বলে — বেশ, তুমি গাও, আমি কাল তোমাকে মরতে দেব না।

আমি গান শুরু করলাম। যাবার সময় তুরিয়া জিজ্ঞেস করল — বন্দী, তুমি কাঠের খাঁচায় থাকা পছন্দ কর?

সানন্দে উত্তর দিলাম — হ্যাঁ, কোনও মতে যদি এই নরক থেকে উদ্ধার পেতাম!

তুরিয়া বলল — আচ্ছা, কাল আব্বাকে বলব।

পরদিনই আমাকে অন্ধকূপ থেকে বের করা হল, আমার পা দুটোকে মোটা কাঠের গুঁড়ির ছিদ্রে আটকে দেওয়া হল, তারপর কাঠেরই খুঁটি দিয়ে প্রাকৃতিক গর্তে কষে এঁটে দেওয়া হল।

সর্দার আমার কাছে এসে বলল — বন্দী, আরও পনেরো দিন সময় দেওয়া হচ্ছে, তারপর তোমার ধড় থেকে গর্দান আলাদা করে দেওয়া হবে। আর একটা চিঠি আজ তোমার বাড়িতে

লেখো। ইদের মধ্যে যদি টাকা না আসে, তাহলে তোমাকেই সেদিন হালাল করা হবে।

আর একখানা চিঠি লিখে দিলাম আমি।

সর্দার চলে যাবার পর তুরিয়া এল। এই সেই রমণী যে এইমাত্র চলে গেল। এই সেই সর্দারের মেয়ে। এই আমার গান শুনত আর সুপারিশ করে এই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

তুরিয়া এসে আমাকে দেখতে লাগল। আমিও ওকে দেখতে লাগলাম।

তুরিয়া জানতে চাইল — বন্দী, বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

বড়োই কাতরকণ্ঠে আমি বললাম — দুটি ছোটো ছোটো ছেলে, আর কেউ নেই।

আমি জানতাম আফ্রিদিরা বাচ্চাদের খুব ভালোবাসে।

তুরিয়া জিজ্ঞেস করল — ওদের মা নেই?

শুধু দয়ার উদ্রেক করার উদ্দেশ্যে আমি বললাম — না, ওদের মা মারা গেছে। ওরা একা। কী জানি, বেঁচে আছে না মরে গেছে, কারণ আমি ছাড়া ওদের দেখাশোনা করার আর কেউ নেই।

বলতে বলতে আমার দুচোখ জলে ভরে এল। তুরিয়ার চোখ দুটোও শুকনো রইল না। আপন আবেগকে সংযত করে তুরিয়া বলল — তাহলে তোমার আর কেউ নেই? বাচ্চাগুলো একা? ওরা হয়তো খুব কাঁদছে।

মনে মনে খুশি হয়ে বললাম — হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খুব কাঁদছে। কে জানে হয়তো মরেই গেছে?

তুরিয়া বাধা দিয়ে বলল — না, এখনও হয়তো মরেনি। আচ্ছা, তোমরা থাক কোথায়? আমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব।

আমার বাড়ির ঠিকানাটা বলে দিলাম। তুরিয়া বলল — ও জায়গায় আমি তো কতবার ঘুরে এসেছি। বাজার থেকে সওদা আনতে প্রায়ই ওখানে যাই, এবারে গেলে তোমার ছেলেদের খোঁজখবর নিয়ে আসব।

আমি শঙ্কিত মনে জিজ্ঞেস করলাম — কবে যাবে?

একটু ভেবে নিয়ে বলল — আসছে জুমেরাতে যাব। বেশ, তুমি ওই গানটা গাও।

সেদিন খুব আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে গান শুরু করলাম। দেখলাম গানটার প্রভাব তুরিয়ার উপর কেমন পড়ে।

তুরিয়ার শরীরটা কাঁপতে লাগল, দুচোখে জল ভরে এল, কপোল পাণ্ডুর হয়ে উঠল, থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়ল। ওর অবস্থা দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে আমি গাইতে শুরু করলাম। শেষে বললাম — তুরিয়া, আমাকে যদি মেরে ফেলা হয় তাহলে আমার মৃত্যুর খবরটা আমাদের ছেলেদের পৌঁছে দিও। আমার কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া যা হবে ভেবেছিলাম তাই হল। তুরিয়া ধরাগলায় বলল — বন্দী, তুমি মরবে না। তোমার ছেলেদের মুখ চেয়ে তোমাকে আমি ছেড়ে দেব।

হতাশ হয়ে বললাম — তুরিয়া তুমি মুক্তি দিলেও আমি বাঁচতে পারব না। এই বনে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মরে যাব, তার উপর তোমার উপরও বিপদ আসতে পারে। আমার প্রাণের জন্য তোমাকে আমি বিপদে ফেলব না।

তুরিয়া বলল — আমার জন্যে ভেবো না। আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। সর্দারের মেয়ে আমি, যা বলব তাই সবাই মেনে নেবে, কিন্তু তুমি গিয়ে কি টাকাটা পাঠিয়ে দেবে?

খুশি হয়ে বললাম — হ্যাঁ, তুরিয়া, টাকা আমি পাঠিয়ে দেব।

তুরিয়া যেতে যেতে বলল — তাহলে আমিও তোমাকে মুক্তি পাইয়ে দেব।

এ ঘটনার পর তুরিয়া সব সময় আমার ছেলেদের নিয়ে কথা বলত। আসাদ খাঁ, সত্যি সত্যিই এই আফ্রিদিদের কাছে শিশুরা খুবই প্রিয়। বিধাতা যদি ওদের বর্বর হিংস্র পশু করেও থাকেন, মানবোচিত প্রকৃতি থেকেও একেবারে বঞ্চিত করেননি ওদের। শেষ পর্যন্ত জুমেরাত এল, কিন্তু তখনও সর্দার ফিরে এল না। সর্দারের দলের কোনো লোকও ফিরে এল না। সেদিন সন্ধ্যায় তুরিয়া এসে বলল — বন্দী, আজ তো আমি যেতে পারছি না; কারণ আব্বা এখনও আসেননি। কালও উনি যদি না আসেন তাহলে তোমাকে আমি রাতে ছেড়ে দেব। তোমার ছেলেদের কাছে তুমি ফিরে যেও, তবে দেখবে টাকা পাঠাতে যেন ভুলো না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।

সেদিন আমি খুব উৎসাহ নিয়ে গান গাইলাম। মাঝরাত অবধি তুরিয়া গান শুনল, তারপর শুতে চলে গেল। আমিও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম কাল যেন আর সর্দার না আসে। কাঠে বাঁধা থেকে থেকে আমার পা দুটো একেবারে অসাড় হয়ে পড়েছিল। সারা শরীরে ব্যথা। এর চাইতে তো অন্ধকূপেই ভালো ছিলাম, কেননা ওখানে তো হাত-পাগুলো নাড়াচাড়া করতে পেতাম।

পরদিনও দলটা ফিরে এল না, তুরিয়া সেদিন খুবই চিন্তান্বিত ছিল। সন্ধ্যাবেলা তুরিয়া এসে আমার পা দুটোকে খুলে দিয়ে বলল — বন্দী, এবার তুমি যাও। চলো, তোমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।

কিছুক্ষণ আমি অবশ হয়ে শুয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে আমার পা দুটো ঠিক হল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি তুরিয়ার সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম।

তুরিয়াকে আনন্দ দেবার জন্য সারাটা রাস্তা আমি গান গাইতে গাইতে গেলাম। তুরিয়া গান শুনছিল আর শুধু কাঁদছিল। প্রায় মাঝরাতে আমরা হ্রদটার কাছে পৌঁছুলাম। সেখানে পৌঁছে তুরিয়া বলল — এবার সোজা চলে যাও, তুমি পেশোয়ারে পৌঁছে যাবে। দেখো, সাবধানে যেও, নইলে কেউ তোমাকে গুলি মেরে দেবে। এই নাও তোমার জামাকাপড়, টাকা কিন্তু অবশ্যই পাঠিয়ে দিও। তোমার জামিন রইলাম আমি। যদি টাকা না আসে আমার প্রাণ যাবে, তোমারও যাবে। যদি টাকা আসে তাহলে কোনো আফ্রিদি তোমার গায়ে হাত তুলবে না। এমনকী, তুমি যদি কাউকে মেরেও ফেল, তবুও না। যাও, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, আর তোমার ছেলেদের সঙ্গে তোমার মিলন ঘটান। তুরিয়া এরপর আর দাঁড়ায়নি। গুন গুন করতে করতে ফিরে গিয়েছে। রাত দুপুর কেটে গেছে। চারদিকে ভয়ানক নিস্তব্ধতা, শুধু বাতাস শোঁ শোঁ করে বইছে, আকাশের মাঝখানে পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছিল। সরোবরের তীরে দাঁড়ানো নিরাপদ ছিল না। ধীরে ধীরে আমি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলাম। বারে বারে চারদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় সকাল হতে হতে আমি পেশোয়ার সীমান্তে পৌঁছে গেলাম। সীমান্তে সেপাইরা পাহারায় ছিল। আমাকে দেখামাত্রই সমস্ত সেনাদলে হই চই পড়ে গেল। সবাই আমাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিল। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দেখে সবাই খুশি। কর্নেল হ্যামিল্টন সাহেবও খবর পেয়ে তখনই দেখতে

এলেন, সব খবরাখবর জিজ্ঞেস করে বললেন — মেজর সাহেব, আপনাকে আমি মৃত বলে ধরে নিয়েছিলাম। আপনার দুখানা চিঠি আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু স্বপ্নেও আমার বিশ্বাস হয়নি যে, ওগুলো আপনার লেখা। আমি তো ওগুলোকে জাল চিঠি ভেবেছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন।

কর্নেল সাহেবকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। মনে মনে বললাম — কালা আদমির লেখা বলে জাল ভেবেছিলে, আর যদি কোন গোরা সাহেব লিখতেন, তাহলে দু-হাজার কেন চার হাজার টাকা পৌঁছে যেত। কত কত গ্রাম যে জ্বালিয়ে দেওয়া হত, আরও না জানি কত কী করা হত।

আমি চুপচাপ আমার বাড়িতে গেলাম। ছেলেদের দেখে মনটা শান্ত হল। সেদিনই একজন বিশ্বস্ত অনুচরের হাত দিয়ে হাজার টাকা তুরিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

পাঁচ

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্দার বলতে থাকেন — আসাদ খাঁ, এখনও আমার কাহিনি শেষ হয়নি। বিয়োগান্ত অংশটা এখনও বাকি রয়েছে। এখানে এসে ধীরে ধীরে আমার সব কষ্ট ভুলে গেলাম। শুধু পারিনি তুরিয়াকে ভুলতে। তুরিয়ার দয়াতেই স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে আমি মিলতে পেরেছি, শুধু তাই নয়, প্রাণও ফিরে পেয়েছি। তাহলে তুমিই বল তো একে আমি কী করে ভুলি।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। তুরিয়াকেও দেখিনি, ওর বাপকেও দেখিনি।

তুরিয়া আসবে বলেছিল; ও কিন্তু আসেনি। ওখান থেকে এসে আমি স্ত্রীকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কেননা ভেবেছিলাম তুরিয়া যদি আসে তাহলে আমি মিথ্যাবাদী বনে যাব। কিন্তু তিন-তিনটে বছর কেটে যাবার পরও যখন তুরিয়া এল না, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এলাম। সুখে আমাদের দিন কাটছিল, এমন সময় হঠাৎ আবার দুর্দশার মুহূর্ত এল।

একদিন সন্ধেবেলা এই বারান্দায় বসে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছিলাম, এমন সময় কে একজন বাইরের দরজায় কড়া নাড়ল। চাকর দরজা খুলে দিলে এক কাবুলি স্ত্রীলোক নিঃসংকোচে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল। বারান্দায় এসে বিশুদ্ধ পস্তু ভাষায় জিজ্ঞেস করল — সর্দার সাহেব কোথায়? আমি কামরার ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করলাম — কে তুমি, কী চাও?

স্ত্রীলোকটি কিছু পলা পাথর বের করে বলল — এই পলাগুলো আমি বেচতে এসেছি, কিনবেন?

বলে সে বড়ো বড়ো পলা বের করে টেবিলের উপর রাখল। আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে কামরার ভেতরে এসেছিল। পলাগুলোকে হাতে নিয়ে সে দেখতে লাগল। কাবুলি স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল — সর্দার সাহেব, ইনি আপনার কে হন? বললাম — আমার স্ত্রী, আবার কে?

কাবুলি স্ত্রীলোকটি বলল — আপনার স্ত্রী তো মারা গেছেন। আপনি কি আবার বিয়ে করেছেন?

ক্রুদ্ধকণ্ঠে আমি বলে উঠলাম — চুপ, বেকুব কোথাকার, মারা গেছিস তুই। আমার স্ত্রী পস্তু জানত না। সে তন্ময় হয়ে পলাগুলো দেখছিল। কিন্তু আমার কথা শুনে না জানি কেন কাবুলি স্ত্রীলোকটির চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। তীব্রকণ্ঠে সে বলে উঠল — হ্যাঁ, বেকুবই যদি না হব,

তাহলে কি তোকে ছেড়ে দিই? দোজখের কুত্তার বাচ্চা! আমার কাছে তুই ঝুঠ বলেছিস! এই নে, স্ত্রী যদি তোর নাই মরে থাকে, তো আজ মরল।

বলতে বলতে বাঘিনীর মত লাফ দিয়ে এসে একখানি তীক্ষ্ণ ছোরা সে আমার স্ত্রীর বুকে বিঁধিয়ে দিল। ওকে বাধা দিতে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু একলাফে ও উঠোনে চলে গেল, বলল — এবারে শোন, আমি তুরিয়া। তোর ঘরে আজ আমি থাকতে এসেছিলাম। তোকে বিয়ে করে তোর হয়ে থাকতাম। তোর জন্য বাপ, ঘরসংসার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছি। কিন্তু তুই মিথ্যুক, তুই ঠগ! তুই এখন তোর বিবির নাম করে কাঁদ, আর আমি আজ থেকে তোর নাম করে কাঁদব। এই বলে সে দ্রুত নীচে চলে গেল।

স্ত্রীর কাছে ছুটে গেলাম আমি। ছোরাটা একেবারে হৃদপিণ্ডকে বিদ্ধ করেছে। এক আঘাতেই সব শেষ। ডাক্তার ডাকিয়েছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে ও মারা গেছে।

বলতে বলতে সর্দার সাহেবের দু-চোখ জলে ভরে আসে। ভেজা চোখ দুটিকে মুছে উনি বলেন — আসাদ খাঁ, স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারিনি যে তুরিয়ার প্রাণ এত পিশাচের মতো হবে। ওকে যদি আগে আমি চিনতে পারতাম তাহলে এই বিপদটা হতে পারত না; কিন্তু একে ঘরটাতে অন্ধকার ছিল, আর তাছাড়া আমি তো ওর ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর আর কোনোদিন তুরিয়া আসেনি। আজকাল আমাকে দেখলেই আমার দিকে তাকিয়ে নাগিনীর মতো ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলে যায়। দেখে আমার বুকটা কাঁপতে থাকে আর আমি অবশ হয়ে পড়ি। কয়েকবার চেষ্টা করেছি ওকে ধরিয়ে দিতে, কিন্তু ওকে দেখলেই আমি একেবারে নিথর হয়ে যাই। হাত-পাগুলো আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আমার সমস্ত সাহস উবে যায়।

শুধু তাই নয়, এখনও আমার উপরে তুরিয়ার মোহ রয়েছে। আমার ছেলেগুলোকে সব সময় কিছু না কিছু দামি জিনিস সে দিয়ে যায়। বাচ্চাগুলোর সঙ্গে যেদিন দেখা হয় না সেদিন দরজার ভেতর দিয়ে গলিয়ে ফেলে দিয়ে যায়। ওতে একটুকরো কাগজ বাঁধা থাকে, তাতে লেখা থাকে — সর্দার সাহেবের ছেলেদের জন্য। এই স্ত্রীলোকটিকে আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝতে যতই চেষ্টা করি ততই তা কঠিন হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি না ও মানবী না দানবী!

ঠিক তখনই সর্দার সাহেবের ছেলে এসে বলে — এই দেখুন, ওই মহিলা এই সোনার তাবিজ দিয়ে গেছে।

আমার দিকে তাকিয়ে সর্দার সাহেব বলেন — দেখলে আসাদ খাঁ, তোমাকে বলেছিলাম না। এই দেখো, আজও এই তাবিজটা দিয়ে গেছে। জানিনা কত যে তাবিজ আর কত যে আরও সব জিনিস অর্জুন আর নিহালকে দিয়ে গেছে। তাই বলি তুরিয়া বড়োই বিচিত্র নারী!

ছয়

সর্দার সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলেছি। চৌমাথা থেকে বুড়োর লাশটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবুও ও জায়গাটায় আসতেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আপনা থেকে মিনিটখানেক আমি ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ি। হঠাৎ পেছনে তাকাই। একটি স্ত্রীলোক ছায়ার মতো আমার পেছন

পেছন আসছে। আমাকে দাঁড়াতে দেখে স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে পড়ে একটা দোকান থেকে কিছু কিনতে থাকে।

আমার মনকে আমি প্রশ্ন করি — ও কি তুরিয়া?

মন বলে — হ্যাঁ, বোধ হয় সেই।

তুরিয়া কেন আমার পিছু নিয়েছে ভাবতে ভাবতে আমি বাড়ি আসি। তারপর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি। তবে আজকের ঘটনাগুলো আমার মনটাকে এমনভাবে ছেয়ে রয়েছে যে কিছুতেই ঘুম আসছে না। ঘুমোবার যতই চেষ্টা আমি করছি, ঘুম ততই আমার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। ফউজি ছাউনির পেটা ঘড়িওয়ালা রাত বারোটার ঘণ্টা দেয়, একটার ঘণ্টা দেয়, দুটোর ঘণ্টা দেয়, কিন্তু চোখে আমার ঘুম আসে না। এপাশ-ওপাশ করতে করতে আমি ঘুমোবার চেষ্টা করছি। এভাবে চেষ্টা করতে করতে কখন যে ঘুম আমার চোখে নেমে এসেছে একটুও টের পাইনি।

ঘুমুলেও আমার বোধ সজাগ ছিল। মনে হল একটি স্ত্রীলোক, যার আকৃতি তুরিয়ার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তুরিয়ার চেয়েও অনেক বেশি সে ভয়ংকরী, যেন দেওয়াল ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। হাতে ওর তীক্ষ্ণ ছোরা, লণ্ঠনের আলোয় ছোরাটা ঝকঝক করছে। পা টিপে টিপে সতর্ক চোখে তাকাতে তাকাতে ধীরে ধীরে আমার দিকে সে এগিয়ে আসছে। ওকে দেখে আমি উঠতে যাই, কিন্তু হাত-পাগুলো আমার আয়ত্তে নেই। হাতে-পায়ে যেন কোনোও সাড়ই নেই। স্ত্রীলোকটি আমার কাছে এসে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ছোরাধরা হাতখানাকে ওপরে তোলে। আমি চিৎকার করার চেষ্টা করি, কিন্তু গলা বুদ্ধ। কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দই বের হয় না। আমার হাত দুটোকে তার দু হাঁটুর নীচে চেপে ধরে আমার বুকের উপর চেপে বসে সে। আমি ছটফট করে উঠি, আমার চোখ খুলে যায়। সত্যিসত্যি একটি কাবুলি স্ত্রীলোক আমার বুকে চেপে বসেছে, তার হাতে ছোড়া। সে ছোরা মারবার জন্য বাগিয়ে ধরেছে।

আমি বললাম — কে, তুরিয়া?

সত্যি সত্যিই সে তুরিয়া, আমাকে জোরে চেপে ধরে সে বলে — হ্যাঁ, আমি তুরিয়া। তুই আজ আমার বাবাকে খুন করেছিস, তার বদলে আজ তোর জান নেব।

বলেই সে ছোরা ওঠায়। আমার সামনে তখন মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। প্রাণের আকুলতা আমার মাঝে সাহসের সঞ্চার করে। মরতে আমি প্রস্তুত নই। আমার সাধআহ্লাদ এখনও অপূর্ণ। প্রচণ্ড শক্তিতে আমার ডানহাতখানাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করি, এক ঝটকাতেই আমার হাত মুক্ত হয়। দেহের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে তুরিয়ার ছোরাসুদ্ধ হাতখানাকে ধরে ফেলি। কেন জানি না, তুরিয়া কোনোও বাধা দেয় না। আমার হাতখানার দিকে তাকাতে তাকাতে আমার বুকের উপর থেকে সে নেমে আসে। চোখ দুটো ওর নিশ্চল, একদৃষ্টে আমার হাতখানার দিকে ও তাকিয়ে রয়েছে।

হেসে বলি —"তুরিয়া, এবারে তো পাশা উলটে গেছে। এবারে তোর মরার পালা। তোর বাপকে শেষ করেছি, তোকেও এবার শেষ করব।

তুরিয়া তখনও একদৃষ্টে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে। মুখে কোনোও কথা নেই।

ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলি — কথা বলছিস না যে? তোর জানটা তো এখন আমার হাতের মুঠোয়।

তুরিয়ার মোহ ভঙ্গ হয়। গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে সে বলে — তুই আমার ভাই। তুই তোর বাবাকে আজ মেরেছিস!

তুরিয়ার কথা শুনে এ অবস্থাতেও আমার হাসি পেয়ে যায়।

হাসতে হাসতে আমি বলি — আফ্রিদিরাও প্রতারক হয়, এটা আমি আজই টের পেলাম।

তুরিয়া শান্তগলায় বলে — তুই আমার হারানো দাদা নাজির। ওই যে তোর হাতে উল্কি রয়েছে, ওই উল্কিই বলে দিচ্ছে যে, তুই আমার হারানো দাদা।

ছেলেবেলা থেকেই আমার হাতে একটা সাপ আঁকা ছিল। এই বিশেষ চিহ্নটির কথা ফউজি রেজিস্টারেও লেখা আছে।

হেসে বলি — তুরিয়া, তুই আমাকে বোকা বানাতে পারবি না। তোকে এবার আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

হাত থেকে ছোরা ফেলে দিয়ে তুরিয়া বলে — সত্যি সত্যিই তুই আমার দাদা। তোর যদি বিশ্বাস না হয়, তবে এই দেখ, আমার ডান হাতেও অমন সাপ আঁকা।

একটু ভেবে নিয়ে বলি — তুরিয়া, তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না। এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার।

তুরিয়া বলে — আমার হাতটা ছেড়ে দে! আমি তোকে মারব না। আফ্রিদিরা মিথ্যেকথা বলে না।

ওর হাতখানা ছেড়ে দিই, ও মাটিতে বসে পড়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞেস করে — আচ্ছা, তোর মা-বাবার কথা তুই জানিস?

আমি মাথা নেড়ে বলি — না, আমি সরকারি অনাথাশ্রমে বড়ো হয়েছি।

আমার কথা শুনে তুরিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলে — তাহলে তুইই আমার হারানো দাদা নাজির। আমার জন্মের এক বছর আগে তুই হারিয়ে গিয়েছিলি। আমার মা-বাবা তখন সরকারি ফউজের উপর হামলা করতে গিয়েছিলেন আর তখন তুইও সঙ্গে ছিলি। আমার আম্মা লড়াইয়ে খুব পটু ছিলেন। তুই আম্মার পিঠে বাঁধা ছিলি আর আম্মা লড়াই করছিলেন। তক্ষুণি একটা গুলি এসে আম্মার পায়ে লেগেছিল, ফলে উনি পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। তখন কেউ তোকে খুলে নিয়ে গেছিল। আব্বা আম্মাকে কাঁধে করে তুলে এনেছিলেন; কিন্তু তোকে খুঁজতে পারেননি। পরে খুব খুঁজেছিলেন, কিন্তু কোখাও তোর খোঁজ পাননি। আম্মা প্রায়ই তোর কথা বলতেন। আম্মার হাতেও ওই উল্কি ছিল।

বলে সে আবার তার হাতখানা আমাকে দেখায়। ওর হাতের আর আমার হাতের সাপটাকে আমি মিলিয়ে দেখতে থাকি। সত্যিসত্যিই দুটো সাপই হুবহু একইরকম, একচুলও পার্থক্য নেই। বিভ্রান্ত হয়ে আমি চারপাইয়ের উপর বসে পড়ি।

কাছে বসে তুরিয়া স্নেহভরে আমার কপালের ঘাম মুছে দিতে থাকে। বলে — নাজির, আম্মা বলতেন যে তুই মরিসনি, বেঁচে আছিস। একদিন ঠিকই আমাদের সঙ্গে তোর দেখা হবে।

তুরিয়ার কথায় আমার বিশ্বাস হয়। কে যেন আমার মনে বসে বলছে যে, তুরিয়া যা বলছে সত্যিকথাই বলছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি — তাহলে তুরিয়া, আজ আমি যাঁকে মেরেছি, উনি কি আমাদের আব্বা?

তুরিয়ার মুখে বিষাদের একটা ছোটো মেঘ ঘনিয়ে আসে। খুবই বেদনার্ত কণ্ঠে সে বলে — নাজির, হতভাগ্য উনি আমাদেরই আব্বা। কে জানত উনি ওঁরই প্রিয় ছেলের হাতে খুন হবেন।

তারপর সান্ত্বনা দিয়ে বলে — নাজির, তুই তো না জেনেশুনে একাজ করেছিস। আব্বার মৃত্যুতে আমি একেবারে একা হয়ে গেছি, তবে এখন তোকে পেয়ে আব্বার শোক ভুলে যাব। নাজির, দুঃখ করসি না। তুই কি করে জানবি কে তোর আব্বা আর কে তোর আম্মা। দেখ আমিই তো তোকে খুন করতে এসেছিলাম, তোকে খুন করেও ফেলতাম, কিন্তু খোদার মেহেরবানিতে আমাদের খানদানি নিশানটা আমি দেখে ফেলেছি! খোদার সেরকমই মর্জি ছিল।

তুরিয়ার কাছে জানলাম, আমাদের বাবার নাম ছিল হায়দার খাঁ। উনি আফ্রিদিদের একটি দলের সর্দার ছিলেন। সর্দার হিম্মত সিংহের সম্বন্ধেও তুরিয়ার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে, তুরিয়া সর্দার সাহেবকে ভালোবাসাতে শুরু করেছে। বাবার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে তুরিয়া সর্দার সাহেবকে নিকে করতে এসেছিল। কিন্তু এসে ওঁর স্ত্রীকে দেখে ঈর্ষার ক্রোধে পাগল হয়ে গিয়ে ওঁর স্ত্রীকে হত্যা করে বসেছিল। কাবুলি স্ত্রীলোকের বেশ ধরে গিয়ে সে একটু মজা করতে চেয়েছিল; কিন্তু ঘটনাচক্র অন্যদিকে ঘুরে গেল।

সর্দার সাহেবের অবস্থার কথা আমি বলি। শুনে সে একটু ভেবে নিয়ে বলে — না, লোকটা মিথ্যুক, দাগাবাজ। আমি ওকে নিকে করব না। তবে তোর মুখ চেয়ে এখন সব ভুলে যাব। কাল ওঁর বাচ্চাদের নিয়ে আসিস আমি আদর করব।

সকালে তুরিয়াকে দেখে আমার চাকর অবাক হয়ে যায়; ওকে বলি — এ আমার বোন।

আমার কথায় চাকরের বিশ্বাস হয় না। তখন সব কথা ওকে খুলে বলি। তারপর তখনই ওকে আমার বাবার মৃতদেহের খবর নিতে পাঠাই। চাকর ফিরে এসে জানায় — মৃতদেহ এখনও থানায় রাখা আছে।

বড়ো সাহেবের কাছে একখানি চিঠি লিখে আমি সব কথা জানাই এবং মৃতদেহ পাবার জন্য দরখাস্ত করি। সাহেবের কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি এসে যায়। আর একটি চিঠি লিখে মেজর সাহেবকেও আসতে বলি। মেজর সাহেব এসে বলেন — কী ব্যাপার, আসাদ? কেন এত তাড়াতাড়ি আসতে লিখেছ?

আমি হেসে বলি — মেজর সাহেব, আমার নাম আসাদ নয়, আমার আসল নাম নাজির।

মেজর সাহেব অবাক চোখে আমাকে দেখতে দেখতে বলেন — এই একরাতে তুমি পাগল হয়ে যাওনি তো?

হেসে বলি — না সর্দার সাহেব, আরও শুনুন। তুরিয়া আমার সহোদর বোন, আর কাল আমি যাঁকে হত্যা করেছি, উনি আমাদের বাবা।

আমার কথা শুনে সর্দার সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়েন, ওঁর চোখদুটো কপালে ওঠে। উনি বলেন — আসাদ, তুমি কি আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে?

সর্দার সাহেবের হাত ধরে বলি — আসুন, তরিয়ার মুখ থেকেই সব কথা শুনুন। তুরিয়া আমার ঘরে বসে রয়েছে, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

সর্দার সাহেব বিমূঢ়ভাবে আমার পেছন পেছন আসেন। ওঁকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে তুরিয়া হেসে বলে — বন্দী, তুমি ওই গানটাই আবার গাও।

তুরিয়ার কথা শুনে আমি আর সর্দার সাহেব হেসে ফেলি।

সর্দার সাহেবকে বসিয়ে ওকে সব কথা খুলে বলি। গল্প শুনে সর্দার সাহেব আমাকে বলেন — নাজির, এখন থেকে তোমাকে নাজিরই বলব, তুরিয়াকে আমি তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে চাইছি। আমি ওকে বিয়ে করব।

হেসে বলি — কিন্তু আপনি যে হিন্দু, আর আমরা যে মুসলমান!

সর্দার সাহেব হেসে বলেন — পলটনিদের কোনোও জাতধর্ম নেই।

তুরিয়া বলে ওঠে — কিন্তু সর্দার সাহেব, আমি তোমাকে বিয়ে করব না। হ্যাঁ, তবে তুমি যদি তোমার ছেলে দুটোকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, তাহলে আমি ওদের মা হতে রাজি।

সর্দার সাহেব হাসতে হাসতে বিদায় নেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমি, সর্দার সাহেব, তুরিয়া আর অন্য সব পলটনিদের সঙ্গে গিয়ে বাবার দেহটাকে সমাধিস্থ করি।

সূর্য ডুবছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। তুরিয়া আর আমি আমরা দুজনে আমাদের বাবার কবরের পাশে বসে ফাতিহা পড়ছি।

(ফাতিহা / ১৯২৯) অনুবাদ ননী শূর

মা

আজ ছাড়া পেয়ে বন্দী বাড়ি ফিরছে। একদিন আগে থাকতেই করুণা ঘরদোর লেপেপুছে রেখেছে। এই তিন বছরের কঠোর সংযমে যে কটা টাকা জমাতে পেরেছিল সবটাই সে স্বামীর সন্তোষ আর অভ্যর্থনার আয়োজনে খরচ করেছে। তার জন্যে একজোড়া ধুতি কিনেছে, নতুন পাঞ্জাবি বানিয়েছে। ছেলের জন্যে কোট আর টুপিও জোগাড় হয়েছে। বার বার সে তার শিশুপুত্রকে বুকে টেনে নিচ্ছিল আর তার মন আনন্দে ভরে উঠছিল, এই শিশু যদি সূর্যের মতো উদিত হয়ে তার অন্ধকার জীবনকে প্রদীপ্ত না করে তুলত তা হলে হয়তো আঘাত পেতে পেতে তার জীবনটাই শেষ হয়ে যেত। স্বামীর জেলে যাওয়ার তিন মাস পরেই এই শিশুর জন্ম। ওরই মুখের দিকে তাকিয়ে করুণা এই তিনটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে।

সে ভেবেছে — আমি যখন এই ছেলেকে ওঁর কাছে নিয়ে যাব তখন উনি কত না খুশি হবেন। প্রথমে তিনি অবাক হয়ে যাবেন তারপর তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলবেন — এই রত্ন দিয়ে তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছ। শিশুর আধো-আধো বুলিতে জেলখানার সমস্ত কষ্ট তিনি ভুলে যাবেন। তার সরল, পবিত্র, মোহময় দৃষ্টি হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা-গ্লানি ধুয়ে মুছে দেবে। এই সব কল্পনা করে করুণা আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে যেত।

করুণা ভাবছিল আদিত্যের সঙ্গে অনেক লোকজন থাকবে। তাঁর বাড়ি ঢোকার সময় চারদিক জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে। কী রকম স্বর্গীয় হবে সেই দৃশ্য! সেই সমস্ত অভ্যাগতদের বসবার জন্য সে একটা পুরানো শতরঞ্জি বিছিয়ে রেখেছিল, পান সেজে রেখেছিল আর বারবার উৎসুক চোখে বাইরের দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। স্বামীর সুদৃঢ়, উদার, তেজোদ্দীপ্ত চেহারা বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। জেলে যাওয়ার সময় যে সব কথা তিনি বলেছিলেন সেই কথাগুলো ঘুরে ফিরেই তার মনে পড়ছিল। পুলিশের নির্যাতনের মুখেও তাঁর সেই ধৈর্য, অটল আত্মবিশ্বাস, সেই সময়েও তাঁর ঠোঁটের মৃদু হাসি, তাঁর মুখে উদ্ভাসিত আত্মগরিমা — করুণার হৃদয় কি কখনও সে সব ভুলতে পারে? সেই সব কথা মনে পড়তেই করুণার ম্লানমুখ আত্মগৌরবের লালিমায় ছেয়ে গেল। এগুলোই সেই সম্বল যা এই তিন বছরের নিদারুণ যাতনার মধ্যেও তার হৃদয়কে অশ্বাস দিয়ে এসেছে। রাতের পর রাত করুণা না খেয়ে কাটিয়েছে, প্রদীপ জ্বালাবার একটু তেলের অভাবে কত রাত অন্ধকারে কেটেছে। তবু দারিদ্র্যের জন্য তার চোখ দিয়ে এক বিন্দু জল কখনও ঝরে নি। আজ সেই সমস্ত সংকটের অবসান। স্বাধীন নিবিড় আলিঙ্গনে সব কিছুই সে হাসিমুখে সহ্য করতে পারবে। সেই অফুরন্ত সম্পদ পাওয়ার পর তার মনে আর অন্য কোনো অভিলাষই থাকবে না।

আকাশপথের চিরপথিক যখন বিশ্রামের জন্য দ্রুত ছুটে চলেছে, সন্ধ্যা তার সোনালি মেঝের ওপর উজ্জ্বল ফুলের শয্যা বিছিয়ে রেখেছে, সেই সময় করুণা এক কঙ্কালসার মানুষকে লাঠি ভর দিয়ে আসতে দেখল। সেই মূর্তি যেন কোনো জরাজীর্ণ মানুষের বিলাপ। প্রতিপদেই সে থেকে থেকে কাশছিল। তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। মুখ না দেখা গেলেও চলাফেরায় তাকে বুড়োমানুষ বলেই করুণার মনে হয়েছিল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে যখন কাছে পৌঁছল করুণা তাকে চিনতে পারল। এই তো তার প্রিয় স্বামী। কিন্তু হায়। চেহারা যে একেবারে পালটে গেছে। সেই যৌবন, তেজস্বিতা, চাঞ্চল্য, সেই সুন্দর গড়ন সব কিছুই উধাও , রয়ে গেছে কেবল হাড়ের একটা কাঠামো। তার সঙ্গে কোনো বন্ধুবান্ধব, সঙ্গীসাথি কেউই আসেনি। স্বামীকে চিনতে পেরেই করুণা বাইরে বেরিয়ে এলেও তাকে আলিঙ্গনাবন্ধ করার কামনা মনেই চেপে রইল। মনের সমস্ত কল্পনা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। মনের সমস্ত উল্লাস চোখের জলে ভেসে বিলীন হয়ে গেল।

বাড়িতে পা দিয়েই আদিত্য মৃদু হেসে করুণার দিকে তাকাল। কিন্তু সেই মৃদু হাসিতে রাজ্যের বেদনা জড়ো হয়ে ছিল। করুণা এত ঝিমিয়ে পড়েছিল যেন তার হৃৎস্পন্দনই থেমে গেছে। সে বিস্ফারিত চোখে স্বামীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল — নিজের চোখকে এখনও তার বিশ্বাস হচ্ছে না। অভ্যর্থনা বা বেদনার একটি শব্দও এযাবৎ তার মুখ থেকে বেরোয় নি। শিশুপুত্র মায়ের কোলে বসে সন্ত্রস্ত চোখে ওই কঙ্কালকে দেখছিল আর মায়ের কোলকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরছিল।

শেষ পর্যন্ত করুণা কাতরভাবে বলল — এ তোমার কী অবস্থা হয়েছে? তোমায় যে চেনাই যাচ্ছে না। তার দুর্ভাবনাকে শান্ত করার জন্য হাসবার চেষ্টা করে আদিত্য বলল — ও কিছু না। একটু রোগা হয়ে গেছি। তোমার হাতের রান্না খেয়ে আবার সেরে উঠব।

করুণা বলল — ছি ছি, শুকিয়ে যে কাঠি হয়ে গেছ। ওখানে কি পেট ভরে খেতেও দিত না? তুমি তো বলতে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করা হয়। আর তোমার সেই সঙ্গীসাথিরা কোথায় যারা অষ্টপ্রহর তোমায় ঘিরে রাখত, যারা তোমার ঘাম ঝরলে নিজেদের রক্ত ঝরাতে তৈরি থাকত?

আদিত্যের ভুরু কুঁচকে গেল। বলল — সে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা করুণা। আমি জানতাম না যে, জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা এমন ভাবে আমার থেকে মন সরিয়ে নেবে, মুখের কথাও জিজ্ঞেস করবে না। আমি জানতাম না যে, যারা দেশের সেবায় নিজের সব কিছু বিলিয়ে দেয় তাদের এই পুরস্কারই পাওনা। এটা আমি জানতাম যে, জনতা তার সেবকের কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। কিন্তু সহযোগী আর সমর্থকরা যে এমন বেইমান হয় সেটা আমি এই প্রথম অনুভব করলাম। কিন্তু কারও প্রতিই আমার কোনো অভিযোগ নেই। সেবা নিজেই তার নিজের পুরস্কার। সেবার জন্য নাম-যশের আশা করে আমিই ভুল করেছি।

করুণা — তা হলে কি ওখানে খেতেও দিত না?

আদিত্য — আর ও কথা জিজ্ঞেস কোরো না। সে বড়ো কষ্টের কথা। আমি যে বেঁচে ফিরেছি এটাই ভাগ্যের কথা। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া বরাতে ছিল তাই, নইলে এমন কষ্ট

সইতে হয়েছে যে, এখন আমার বেঁচে থাকার কথা নয়। আমি একটু শুয়ে নেব, আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। সারা দিন হেঁটে এইটুকু আসতে পেরেছি।

করুণা — এসো, কিছু খেয়ে নাও। তারপর আরাম করে শুয়ে পড়ো। ছেলেকে কোলে তুলে বলল — খোকা, ইনি তোমার বাবা। ওর কোলে যাও। আদর করবেন তোমায়।

আদিত্য সজল চোখে ছেলের দিকে তাকায়। তার গায়ের প্রতিটি রোম তাকে তিরস্কার করতে শুরু করে, নিজের জরাজীর্ণদশার জন্যে আর কখনও তার এমন দুঃখ হয়নি। ঈশ্বরের অসীম করুণায় যদি কখনও তার দেহ সুস্থ হয়, তবে জাতীয় আন্দোলনের ধারেকাছেও সে কখনও যাবে না। ফুলের মতো এই বাচ্চাটাকে দুনিয়ায় নিয়ে এসে এই দারিদ্র্যের আগুনে তাকে ঝলসানোর কী অধিকার তার ছিল? এখন থেকে সে লক্ষ্মীর উপাসনাই করবে আর নিজের ক্ষুদ্র জীবন কাটিয়ে দেবে এই সন্তানের লালনপালনে। এই মুহূর্তে তার মনে হল যে, শিশু যেন তার দিকে উপেক্ষার চোখে তাকিয়ে আছে, সে যেন বলতে চাইছে — আমার প্রতি কোন কর্তব্য তুমি পালন করেছ? তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা শিশুটিকে কোলে নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু হাত বাড়াতে সে পারল না। দুই হাতে কোনো শক্তিই আর অবশিষ্ট নেই।

করুণা শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে ভেতরে গিয়ে একটা থালায় কিছু খাবার এনে দিল। আদিত্য এমন ক্ষুধার্ত চোখে থালার দিকে তাকাল যেন কতকাল বাদে কোনো খাবার জিনিস তার সামনে এল। সে জানত যে, দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার পরে সদ্য আরোগ্য লাভ করা অবস্থায় খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে জিভকে সামলে রাখা উচিত। কিন্তু সে সবুর করতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ল থালার ওপর। আর চোখের পলকে তা নিঃশেষও করে ফেলল। করুণা আশঙ্কিত হয়ে পড়ল। কোনো কিছু নেওয়ার জন্য আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল না। থালা তুলে নিয়ে চলে গেল, কিন্তু তার মন হাহাকার করে উঠল এই বলে যে, আগে তিনি কোনোদিনও এত খাবার খেতেন না।

করুণা যখন বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছিল হঠাৎ শুনতে পেল তার নাম ধরে কেউ ডাকছে। সে এসে জিজ্ঞাসা করল — তুমি আমায় ডাকছ? আদিত্যের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে, জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। হাতে ভর দিয়ে সেই চাটাইয়ে শুয়ে পড়েছে সে। তার এই অবস্থা দেখে করুণা ঘাবড়ে গিয়ে বলল — কোবরেজ ডেকে আনব? হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে আদিত্য বলল — কোনো লাভ নেই করুণা। তোমার কাছে আর লুকিয়ে রাখা অর্থহীন। আমার যক্ষ্মা হয়েছে। কবারই মরতে মরতে বেঁচেছি। ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া লেখা ছিল, তাই প্রাণটা বার হয়নি। কেঁদো না তুমি। করুণা কান্না চেপে বলল — আমি এখনি কবিরাজ ডেকে আনছি। আদিত্য আবার ঘাড় নেড়ে বারণ করল — না করুণা, আমার কাছে এসে বসে থাকো। আর কারুরই কিছু করার নেই। ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছে। আমার অবাক লাগছে এই ভেবে যে, কী করে এখানে পৌঁছাতে পারলাম। কী জানি, কোন দৈবশক্তি ওখান থেকে আমায় এখানে টেনে আনল। বোধহয় প্রদীপ নেভার আগে এইটাই শেষবারের মতো জ্বলে ওঠা। ওহ্, তোমার ওপর আমি বড়ো অন্যায় করেছি। এ দুঃখ আমার চিরদিনই থাকবে। কোনো সুখ তোমায় দিতে পারি নি। কিছুই করতে

পারি নি তোমার জন্য। শুধু তোমার সিঁথিতে এয়োতির সিঁদুর দিয়েছি আর একটা বাচ্চা পালনের ভার তোমার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আহ্।

নিজের মনকে শক্ত করে করুণা বলল — তোমার কি কোথাও ব্যথা করছে? সেঁক দেওয়ার আগুন করে আনি — কিছু বলছ না কেন?

আদিত্য পাশ ফিরে বলল — আর কিছু দরকার নেই, প্রিয়ে। কোথাও ব্যথা নেই। খালি মনে হচ্ছে আমার দম ফুরিয়ে আসছে। গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছি। জীবনের লীলা শেষ হয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছি প্রদীপ নিভে আসছে। বলতে পারছি না কখন হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে যাবে। যা কিছু বলার আছে বলে ফেলতে চাই। মৃত্যুর সময় না-মেটা সাধ নিয়ে কেন মরব? একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। জবাব দেবে?

করুণার মনের সমস্ত দুর্বলতা, শোক, ব্যথা সব মুছে গিয়ে তার জায়গায় এমন এক শক্তি দেখা দিল যা মৃত্যুকে হেসে উড়িয়ে দেয়, বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করে। রত্নখচিত মখমলের খাপে যেমন ঝকঝকে তলোয়ার ঢাকা থাকে, জলের মৃদু প্রবাহে যেমন বিপুল শক্তি লুকিয়ে থাকে, ঠিক তেমন ভাবেই মেয়েদের কোমল হৃদয়ে ধৈর্য আর সাহস লুকোনো থাকে। ক্রোধ যেভাবে খাপে ঢাকা তলোয়ারকে টেনে বার করে, বিজ্ঞান যেমন জলের শক্তিকে বার করে আনে, ঠিক সে ভাবেই প্রেম নারীহৃদয়ের ধৈর্য আর সাহসকে উদ্ভাসিত করে।

স্বামীর কপালে হাত বোলাতে বোলাতে করুণা বলল — জিজ্ঞেস করছ না কেন স্বামী? আদিত্য করুণার হাতের কোমল ছোঁয়া অনুভব করতে করতে বলল — তোমার বিবেচনায় আমার জীবনের ধরনটা কেমন ছিল? সে ধরনটা কি অভিনন্দনের যোগ্য? কোনোদিন কিছু লুকোওনি আমার কাছে থেকে। এবারও স্পষ্ট উত্তর দেবে। নিজের জীবনের জন্য হাসব না কাঁদব — কোনটা আমার উচিত তোমার বিবেচনায়? করুণা উদ্ভাসিত হয়ে বলল — আমায় এ সব প্রশ্ন করছ কেন প্রিয়তম? কোনোদিন কি আমি তোমায় কোনোরকম উপেক্ষা করেছি? দেবতাদের মতো নিঃস্বার্থ নির্লিপ্ত আদর্শময় ছিল তোমার জীবন। নানান দুঃখকষ্টে বিরক্ত হয়ে যখন আমি তোমায় সংসারের দিকে টানতে চেষ্টা করেছি তখনও কিন্তু আমি মনে মনে জানতাম যে, আমি তোমাকে তোমার উঁচু আসন থেকে টেনে নামাচ্ছি। তুমি যদি সংসারের বন্ধনে নিজেকে জড়াতে তাহলে হয়তো আমার মন বেশি সন্তুষ্ট হত, কিন্তু এখন তোমার জন্য যে গর্ব আর আনন্দ সেটা হয়তো থাকত না। আমি যদি কাউকে সবচেয়ে বড়ো আশীর্বাদ করি তা এই হবে যে, তার জীবন যেন তোমার মতো হয়।

এই কথা বলতে বলতে করুণার নিষ্প্রভ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন সে দিব্যভাব লাভ করেছে। সগর্ব দৃষ্টিতে আদিত্য করুণার দিকে চেয়ে বলল — ব্যস্! আমার মন শান্ত হয়ে গেছে। এই বাচ্চা ছেলেটার জন্য আমার আর কোনো দুর্ভাবনা নেই। তোমার থেকে আর কোনো যোগ্যতর হাতে ওকে আমি ছেড়ে যেতে পারতাম না। আমার বিশ্বাস আছে জীবন সম্পর্কে এই উন্নত পবিত্র ধারণা সর্বদাই তোমার চোখের সামনে থাকবে। এখন আমি মরতে প্রস্তুত।

দুই

সাত বছর কেটে গেছে।

শিশু প্রকাশ এখন দশ বছরের সুন্দর, বলিষ্ঠ, অধ্যবসায়ী, হাসিখুশি সাহসী বালক। ভয়ভীতি তাকে ছুঁতেও পারে নি। তাকে দেখে করুণার দুঃখী হৃদয় শান্ত হত। লোকে হয়তো করুণাকে দুঃখী আর ভাগ্যহীনা মনে করত। কিন্তু সে নিজে তার ভাগ্যকে কখনও দোষারোপ করেনি। স্বামীর জীবিত অবস্থায় যে গয়নাগুলো করুণার প্রাণের প্রিয় ছিল সেগুলোকে বিক্রি করে সে কিছু গোরুমোষ কিনে ফেলল। সে ছিল কৃষি পরিবারের মেয়ে। তাই গোপালন তার কাছে নতুন কোনো ব্যাবসা নয় — একেই সে এখন জীবিকা বলে গ্রহণ করল। যেহেতু খাঁটি দুধ দুষ্প্রাপ্য তাই তার সমস্ত দুধই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যেত। এক প্রহর রাতে উঠে তাকে কাজে লাগতে হত আর গভীর রাতের আগে তার কাজ শেষ হত না। কিন্তু এ জন্য তার কোনো খেদ বা দুঃখ ছিল না। নৈরাশ্য আর দৈন্যের বদলে তার চোখেমুখে ছিল সংকল্প আর সাহসের দৃঢ়তা। তার সমস্ত শরীর থেকে যেন আত্মগৌরবের দীপ্তি প্রকাশ পেত। তার দৃষ্টিতে ছিল এক দিব্য জ্যোতি যা অতল, অসীম ও গভীর। সেই দিব্য জ্যোতির বিভায় তার জীবনের সমস্ত রকম যন্ত্রণা, বৈধব্যের শোক আর ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাত সব কিছু মুছে গিয়েছিল।

প্রকাশের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে করুণা প্রস্তুত ছিল। তার আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, তার সংসার, ধর্ম সব কিছুই ছিল প্রকাশকে ঘিরে। তবু এমন কখনও হওয়ার উপায় ছিল না যে প্রকাশ কোনো দুষ্টুমি করল আর করুণা চোখ বন্ধ করে তা এড়িয়ে গেল। প্রকাশের আচার-ব্যবহারের ওপর তার কঠোর দৃষ্টি ছিল। সে প্রকাশের শুধুমাত্র মা ছিল না, সে ছিল তার মা ও বাবা দুইই। তার পুত্রস্নেহে মায়ের মমতার সঙ্গে মিশে ছিল বাবার কঠোরতা। স্বামীর শেষ কথাগুলো আজও তার কানে বাজে। তার কথা শুনে আদিত্যের মুখে যে খুশির আলো জ্বলে উঠেছিল, দুচোখে গর্বের যে রক্তিম আভা ফুটে উঠেছিল সে ছবি আজও করুণার চোখের সামনে স্পষ্ট। সর্বদাই তার কথা চিন্তা করার জন্য করুণার কাছে তার স্বামী প্রত্যক্ষ রয়েছে — তার উপস্থিতি সে উপলব্ধি করে। তার মনে হয় যে আদিত্যের আত্মাই যেন তাকে সর্বদা আগলে রয়েছে। তার আন্তরিক কামনা প্রকাশ যেন বড়ো হয়ে বাবার পথই অনুসরণ করে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এক ভিখারিনি তার দরজায় এসে ভিক্ষা চাইছে। করুণা তখন গোরুদের খাওয়ার জন্য ঘাসজল দিতে ব্যস্ত। প্রকাশ বাইরে খেলছে। বাচ্চাই তো। তার হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি এল। ঘরের ভেতর গিয়ে একটা বাটিতে করে খানিকটা খড়কুটো নিয়ে বেরিয়ে এল। ভিখারিনি থলি পেতে ধরল। প্রকাশ সেই কুচানো খড় ভিখারিনির ঝোলার ভেতর ঢেলে দিয়ে জোরে জোরে হাততালি দিতে দিতে ছুটে পালাল।

ভিখারিনি দুচোখে আগুন ঢেলে বলল — বা রে ছেলে। আমার সঙ্গে মশকরা করছ? মা-বাবা এই শিক্ষা দিয়েছে বুঝি! তাহলে তো বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তার কথা শুনতে পেয়ে করুণা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল — কী হয়েছে মা? কাকে বলছ?

ভিখারিনি প্রকাশের দিকে দেখিয়ে বলল — ও তোমার ছেলে তো? দেখ, বাটিভরে খড়কুটো এনে আমার ঝোলায় ঢেলে দিল। এক চিমটি আটা ছিল ঝোলায়। সেটাও নষ্ট হল। দুঃখী মানুষকে এইভাবে কেউ জ্বালায়? সকলের দিন সমান যায় না। মানুষের অহংকার করা ঠিক নয়। কড়া গলায় করুণা ডাকল — প্রকাশ।

লজ্জিত হবার বদলে স্পর্ধিত ভাবে প্রকাশ মাথা উঁচু করে এল, বলল — ও কেন আমাদের বাড়ি এসে ভিক্ষা চাইল? কোনো কাজ করতে পারে না?

করুণা ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলল — এ কাজ করার জন্য কোথায় তোমার লজ্জা হবে, তা নয় উলটে চোখ পাকাচ্ছ?

প্রকাশ বলল — লজ্জা কেন হবে? ও রোজ কেন ভিক্ষা চাইতে আসে? আমাদের এখানে জিনিস কি মাগনা আসে?

করুণা — তোমার যদি কিছু দিতে অনিচ্ছাই থাকে তো সোজা তাকে চলে যেতে বললেই হত — এরকম দুষ্টুমি করলে কেন?

প্রকাশ — তা না হলে ওর স্বভাব বদলাবে কী করে?

করুণা রেগে বলল — তুমি এবার আমার হাতে মার খাবে।

প্রকাশ — কেন মার খাব? তুমি কি আমায় খামোখা মারবে? অন্য কোনো দেশে যদি কেউ ভিক্ষা চায় তাহলে তার জেল হয়ে যায়। এখানে তো উলটে ভিখিরিদের আশকরা দেওয়া হয়।

করুণা — যে অন্ধ, সে কাজ করবে কী করে?

প্রকাশ — তা হলে ডুবে মরুক। বেঁচে থাকার দরকার কী?

করুণা চুপ করে গেল। বুড়িকে আটা-ডাল দিয়ে তো বিদায় করল, কিন্তু প্রকাশের কুযুক্তি বুকে কাঁটার মতো জেগে রইল। কোথা থেকে তার ছেলে এই ধৃষ্টতা, এই অবিনয় শিখল? রাতেও এই দুশ্চিন্তা তাকে বারবার ব্যাকুল করে তুলছিল।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙতে প্রকাশ দেখল লণ্ঠন জ্বলছে আর তার মা বসে বসে কাঁদছে। সে উঠে বসে মাকে জিজ্ঞাসা করল — মা, এখনও তুমি ঘুমোওনি?

করুণা মুখ ঘুরিয়ে বলল — ঘুম এল না। তুমি কেন জেগে উঠলে? জল খাবে নাকি?

প্রকাশ — না মা, কী জানি কেন ঘুম ভেঙে গেল। আজ আমি খুব অন্যায় করেছি মা।

করুণা তার দিকে সস্নেহে তাকাল।

প্রকাশ বলল — বুড়ির সঙ্গে আজ আমি খুব দুষ্টুমি করেছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো। আর কখনও এমন শয়তানি করব না। প্রকাশের চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। করুণা স্নেহে বিগলিত হয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে গালে চুমু দিয়ে বলল — বাবা, আমায় খুশি করার জন্য একথা বলছিস, না সত্যিই এ তোর অনুতাপ?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে প্রকাশ বলল — না মা, সত্যি সত্যিই আমার খুব খারাপ লাগছে। এবার যখন বুড়ি আসবে তাকে অনেক পয়সা দেব।

করুণার অন্তর আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল। তার মনে হল যে আদিত্য যেন সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করেছে, আর করুণাকে বলছে — দুঃখ করো না তুমি। প্রকাশ তার বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে। তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হবে।

তিন

কিন্তু তার যে কাজে আর কথায় কোনো মিল নেই — দিন দিন প্রকাশের চরিত্রের এই দিকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সে প্রতিভাবান ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জলপানি পেত। করুণাও তাকে সাহায্য করত যথেষ্ট। তবু তার খরচে কুলোত না। মিতব্যয়িতা আর সরল জীবনের ওপর সে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতে পারত, ব্যাখ্যাও করতে পারত কিন্তু তার নিজের চালচলন বা পোশাক-আশাক অন্ধ ফ্যাশনভক্তদের চেয়ে এক তিলও আলাদা ছিল না। সব সময়ই সব কিছু নিয়ে জাঁক করার দিকেই তার মন থাকত। তার হৃদয় ও বুদ্ধির মধ্যে সর্বদা একটা দ্বন্দ্ব ছিল। তার হৃদয় ছিল দেশ ও মানুষের পক্ষে, কিন্তু বুদ্ধি ছিল নিজের দিকে। বুদ্ধি হৃদয়কে সব সময়েই দাবিয়ে রাখত, হৃদয়ের কোনো জারিজুরিই খাটত না। তার মতে দেশসেবার ক্ষেত্র হল এক নিষ্ফলা জমি। সেখানে যশ আর গৌরবের চেয়ে বাড়তি কিছুই মেলে না আর সেই পাওয়াটাও ক্ষণস্থায়ী। এতই ক্ষণস্থায়ী যে, সামান্য ব্যাপারেই সারা জীবনের অর্জিত ফল মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে। ফলে অনিবার্যভাবে তার মন বিলাসবহুল জীবনের দিকেই ঝুঁকে পড়ছিল। এমনকী, ক্রমশ সে ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনকে ঘৃণা করতে শুরু করল। দুরবস্থা আর দারিদ্র্য তার চোখে অবজ্ঞার জিনিস। তার মন ও হৃদয় কিছুই ছিল না, ছিল কেবল মস্তিষ্ক যেখানে ব্যথা-বেদনা-দয়ার স্থান নেই। সেখানে তর্ক, দুঃসাহস, আর ফন্দিফিকির বাসা বেঁধেছে।

সিন্ধুপ্রদেশে বন্যা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশ হয়েছে। কলেজের পক্ষ থেকে সেখানে একটি সেবকদল পাঠানো হয়েছে। প্রকাশের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হল — সেখানে যাবে কী যাবে না। ওখানে যাওয়ার বদলে সেই সময়টা পরীক্ষার পড়া তৈরি করলে প্রথম শ্রেণিতে পাশ হওয়া যায়। যাওয়ার সময় অসুখের ছুতো করে সে এড়িয়ে গেল। করুণা চিঠি লিখল — তোমার সিন্ধুপ্রদেশে না যাওয়ায় আমি দুঃখিত। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তুমি যেতে পারতে, কারণ সেবকের দলে ডাক্তারও তো ছিলেন। প্রকাশ সে চিঠির উত্তর দিল না।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ। সেখানে মশামাছির মতো মানুষ মরছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পীড়িতদের সেবার জন্য একটা মিশন তৈরি হল। ঠিক সেই সময়েই বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রীলংকায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য ইতিহাসের ছাত্রদের একটা দল পাঠানো হচ্ছিল। করুণা উড়িষ্যায় যাবার জন্য লিখে পাঠাল। কিন্তু প্রকাশ লালায়িত হয়ে উঠল শ্রীলংকায় যাবার জন্য। কয়েকটা দিন দ্বিধায় কাটল। তারপর শ্রীলংকাই উড়িষ্যার উপর জয়ী হল। এবার আর করুণা তাকে কিছু লিখল না। চুপচাপ চোখের জল ফেলতে লাগল।

শ্রীলংকা থেকে ফিরে এসে বাড়ি এলে করুণা ছেলেকে একটু এড়িয়ে চলতে লাগল। প্রকাশ মনে মনে লজ্জিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করল, এবার যদি কোনো সুযোগ পাই তো মাকে খুশি করব। এই ঠিক করে সে ফিরে এল বিদ্যালয়ে। কিন্তু এখানে আসতেই আবার তার পরীক্ষার চিন্তা শুরু হল। পরীক্ষার দিনও এসে গেল। কিন্তু পরীক্ষার পরেও সে বাড়ি ফিরল না। কলেজের একজন শিক্ষক কাশ্মীর যাচ্ছিলেন বেড়াতে — সেখানেই চলে গেল। পরীক্ষার ফল বের হল। প্রকাশ প্রথম হয়েছে। তখন তার মনে পড়ল বাড়ির কথা। সঙ্গে সঙ্গে সে মাকে বাড়ি যাওয়ার কথা জানিয়ে চিঠি দিল। মাকে খুশি করার জন্য দু-চারটে দেশসেবার কথাও লিখল — এবার আমি তোমার

নির্দেশ পালন করতে তৈরি। আমি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো কাজ করব ঠিক করেছি — এই কথা ভেবেছি বলেই আমি ওই বিষয়ে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছি। আমাদের নেতারাও তো বিদ্যালয়ের আচার্যদের সম্মান করেন। তাঁরাও এ সব ডিগ্রির মোহ থেকে মুক্ত নন। এই ডিগ্রিটা পেয়ে বাস্তবে আমি সেবার পথ নেওয়ার দিকে একটা বাধা হটাতে পেরেছি। আমাদের নেতারাও যোগ্যতা, সদুৎসাহ, নিষ্ঠা এই সব গুণের ততটা কদর করেন না, যতটা কদর করেন ডিগ্রির। এখন প্রত্যেকেই আমায় সম্মান করবেন আর সেইসব দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও দিতে আপত্তি করবেন না যা আগে চাইলেও পেতাম না।

করুণা আবার আশায় বুক বাঁধল।

চার

কলেজ খুলতেই প্রকাশের কাছে রেজিস্ট্রারের একটা চিঠি এল। চিঠিতে প্রকাশকে জানানো হয়েছে যে, বিলেতে গিয়ে পড়ার জন্য সে সরকারি স্কলারশিপ পেয়েছে। প্রকাশ চিঠি হাতে নিয়ে নাচতে নাচতে ছুটে গিয়ে মাকে বলল, — মা, বিলেতে গিয়ে পড়ার জন্য সরকারি বৃত্তি জুটে গেছে।

নিস্পৃহভাবে করুণা জিজ্ঞাসা করল — কী ঠিক করলে?

প্রকাশ বলল — আমি আবার কী ঠিক করব? এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে না কি?

করুণা — তুমি তো স্বেচ্ছাসেবকদের দলে নাম লেখাচ্ছিলে!

প্রকাশ — ও, তুমি মনে কর স্বেচ্ছাসেবক বললেই দেশসেবা হয়ে গেল? বিলেত থেকে ফিরে এসেও তো দেশের সেবা করতে পারি। আর মা, সত্যি যদি বল তো একজন ম্যাজিস্ট্রেট দেশের যত সেবা করতে পারে হাজার স্বেচ্ছাসেবকও একসঙ্গে তা পারে না। আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসব আর নিশ্চয়ই তাতে সফল হব।

করুণা সচকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল — তুমি তা হলে ম্যাজিস্ট্রেট হবে?

প্রকাশ — যে ম্যাজিস্ট্রেট জনসাধারণের সেবার কথা ভাবে সে ম্যাজিস্ট্রেট কংগ্রেসের এক হাজার জন সভাপতির চেয়েও অনেক বেশি উপকার করতে পারে। কাগজে তার লম্বা লম্বা প্রশংসা বেরোবে না, তার বক্তৃতায় কেউ হাততালি দেবে না, জনগণ তার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে না, স্কুলের ছাত্ররা তাকে মানপত্র দেবে না। কিন্তু একজন ম্যাজিস্ট্রেট সত্যিকারের দেশসেবা করতে পারে।

করুণা আপত্তির সুরে বলল — কিন্তু এই ম্যাজিস্ট্রেট তো দেশসেবকদের সাজা দেয়, গুলি চালায় তাদের ওপর?

প্রকাশ — ম্যাজিস্ট্রেটের মানসিকতা যদি পরোপকারীর হয় তা হলে কঠোর না হয়েও সে সেই কাজটাই করতে পারে অন্যে যেটা গুলি চালিয়েও করতে পারে না।

করুণা — আমার কিন্তু তা মনে হয় না বাবা। সরকার তার চাকরদের এত স্বাধীনতা দেয় না। সরকার একটা নীতি তৈরি করে দেয় এবং প্রত্যেক সরকারি চাকুরেকে তা মানতে হয়। সরকারের প্রধান নীতি হচ্ছে যে, তার নিয়ম ক্রমে বেশি বেশি সংগঠিত আর দৃঢ় হবে, এর জন্য

তার স্বাধীনতার চিন্তাভাবনা দমন করা জরুরি হয়ে পড়ে। যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এই নীতির বিরুধে যায় তো সে আর ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে না। তোমার বাবাকে যে সামান্য অপরাধে তিন বছরের সাজা দিয়েছিল সে ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। সেই সাজাই তাঁর মৃত্যুর কারণ এটা মনে রেখো। বাবা, আমার এই কথাটায় কান দে। সরকারি পদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়িস না। তুমি হাকিম হয়ে ঠাটঠমকে থাকো, এর থেকে আমি চাইব মোটা খেয়ে মোটা পরে তুমি দেশের সেবা করো। এটা জেনে রেখো যে, হাকিমের চেয়ারে যেদিন থেকে তুমি বসবে সেদিন থেকেই তোমার মেজাজও হাকিমের মতোই হয়ে যাবে। তুমি চাইবে অফিসারদের মধ্যে তোমার নামডাক আর উন্নতি বেশি হোক। একটা গেঁয়ো নমুনা ধরো। জান তো, মেয়ে যতদিন কুমারী থাকে বাপের বাড়িকেই সে নিজের বাড়ি মনে করে। কিন্তু যেদিন সে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় সেদিন থেকে সে বাপের বাড়িকে পরের বাড়ি বলে মনে করে। মা-বাপ-ভাই-বন্ধু সেই একই থাকে। তবু সে বাড়ি আর তার নিজের নয়। দুনিয়ার নিয়মই এই।

প্রকাশ বিরক্ত হয়ে বলল — তা হলে তুমি কি এটাই চাও যে, সারাটা জীবন আমি এদিক-ওদিক ধাক্কা খেয়ে মরি?

করুণা কঠোরভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল — ধাক্কা খেওে যদি আত্মার স্বাধীনতা থাকে তো আমি মনে করি ধাক্কা খাওয়াই ভালো।

প্রকাশ তার মায়ের কথা নিশ্চিত ভাবে জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল — তা হলে এই তোমার ইচ্ছে? করুণা ঠিক একই ভাবে বলল — হ্যাঁ, এই আমার ইচ্ছে।

প্রকাশ কিছু বলল না। উঠে বাইরে চলে গেল। তক্ষুনি রেজিস্ট্রারকে চিঠি লিখল যে, স্কলারশিপ সে নেবে না। কিন্তু পরের মুহূর্ত থেকেই তার মনে ভয়ানক অশান্তি শুরু হল। বিরক্ত ও বিষণ্ণ হয়ে সে নিজের ঘরে বন্দী হয়ে থাকত। কোথাও বেড়াতে যেত না। দেখা করত না কারও সঙ্গে। মুখ গোমড়া করে বাড়ির অন্দরে ঢুকত। দুটি খেয়ে আবার বেরিয়ে যেত। এইভাবে এক মাস কেটে গেল। তার মুখ শুকিয়ে গেল। মুখের সেই উজ্জ্বলতা ম্লান। চোখ দুটো অনাথ-আতুরের মতো কী যেন ভিক্ষা করছে। মুখের হাসি মুছে গেছে। সেই প্রত্যাখ্যানপত্রের সঙ্গে যেন তার জীবনের সবটুকু সজীবতা, চাঞ্চল্য, সরলতা সবই বিদায় নিয়েছে। করুণা ছেলের মনোভাব বুঝতে পারত, নানা ভাবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু রুষ্ট দেবতা প্রসন্ন হতেন না।

শেষ পর্যন্ত সে একদিন ছেলেকে বলল — বাবা, তুমি যদি বিলেত যাওয়ার সংকল্প করে থাকো তো চলেই যাও। আমি বারণ করব না। আমি তোমায় যেতে মানা করেছিলাম বলে দুঃখিত। যদি বুঝতে পারতাম যে, এটা তোমায় এমন কষ্ট দেবে তবে কখনই বারণ করতাম না। আমি শুধু এই কারণে যেতে দিতে চাইনি যে, তোমায় দেশসেবায় মগ্ন দেখলে তোমার বাবার আত্মা খুশি হত। এই ছিল তাঁর অন্তিম ইচ্ছা।

প্রকাশ রুক্ষস্বরে উত্তর দিল — এখন আর কী যাব। প্রত্যাখ্যান করে চিঠি লিখে দিয়েছি। আমার জন্য কেউ কি বসে আছে? এতদিনে অন্য কোনো ছেলেকে বেছে নিয়েছে। এখন আর কীই বা করবার আছে। তোমার যখন ইচ্ছে গ্রামে গিয়ে আস্তাকুঁড় সাফ করি তো তাই সই।

করুণার গর্ব চুরমার হয়ে গেল। সে ভেবেছিল তার এই অনুমতিদানে প্রকাশের মনোভাব বদলে যাবে। কিন্তু তার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। সে বলল — এখনও হয়তো আর কোনো ছেলেকে

ঠিক করা হয়নি। তুমি লিখে দাও যে যেতে প্রস্তুত। প্রকাশ ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল — এখন আর কিছু হতে পারে না। সবাই ঠাট্টা করবে। আমি মনস্থির করে ফেলেছি যে, এখন থেকে তোমার ইচ্ছে মতোই জীবন গড়ে তুলব।

করুণা বলল — তুমি যদি এটা আন্তরিকভাবে স্থির করতে তা হলে এভাবে আচরণ করতে না। আমার বিরুদ্ধে এ তোমার সত্যাগ্রহ। নিজের মনকে দাবিয়ে রেখে আমায় পথের কাঁটা ভেবে আমার ইচ্ছাপূরণ করলে কী লাভ? তোমার মনে যদি আপনা থেকেই সেবার ভাব আসত তবে বুঝতাম। আজই তুমি রেজিস্ট্রার সাহেবকে লিখে দাও।

প্রকাশ — আর আমি লিখতে পারব না।

করুণা — তা হলে এই দুঃখেই তুমি এভাবে গুম হয়ে বসে থাকবে?

প্রকাশ — উপায় কী?

করুণা আর কথা বাড়াল না। খানিক পরেই প্রকাশ দেখতে পেল মা কোথাও যাচ্ছে। সে কিছু বলল না কারণ করুণার বাইরে যাওয়া-আসা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল। করুণা ফিরল না। প্রকাশের তখন দুশ্চিন্তা হতে লাগল। মা কোথায় গেলেন — এই প্রশ্ন বার বার তার মনে জাগতে লাগল।

প্রকাশ সমস্ত রাত দরজার গোড়ায় বসে থাকল। নানা রকম আশঙ্কা তার মন তোলপাড় করছিল। এখন তার মনে হল যে, যাওয়ার সময় করুণার মুখ ছিল খুবই বিষণ্ণ। চোখ দুটো ছিল লাল। এসব তার চোখ এড়িয়ে গেল কী ভাবে? সে কেন স্বার্থপরের মতো অন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ! এবার প্রকাশের মনে পড়ছে যে, মা বেরোনোর সময় পরিষ্কার জামাকাপড় পরে ছিল। হাতে ছাতাও ছিল। তাহলে কি মা অনেক দূরে কোথাও গেছে? এখন জিজ্ঞাসা করবে কাকে? মায়ের অনিষ্ট আশঙ্কায় প্রকাশ কেঁদে ফেলল।

শ্রাবণের ঘোর অন্ধকার রাত্রি। ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো কালো মেঘের দল আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। থেকে থেকেই প্রকাশ আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল যেন করুণা ওই মেঘের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। সে মনস্থির করল যে, সকাল হলেই মায়ের খোঁজে বেরোবে। আর যদি...।

কেউ দরজায় আওয়াজ করল। প্রকাশ দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখতে পেল করুণা দাঁড়িয়ে। তার সারা মুখ এত বিষণ্ণ এত করুণ যে, দেখে মনে হচ্ছে আজই তার বৈধব্য ঘটেছে, সংসার যেন তার কাছে মূল্যহীন, সে যেন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নিজের ভরতি নৌকা ডুবে যেতে দেখছে, কিন্তু কিছু করতে পারছে না।

প্রকাশ অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করল — কোথায় চলে গিয়েছিলে মা? এত দেরি করে এলে?

করুণা মাটির দিকে চোখ রেখে উত্তর দিল — একটা কাজে গিয়েছিলাম। দেরি হয়ে গেল। এই বলে মুখবন্ধ একটা খাম প্রকাশের সামনে সে ফেলে দিল। প্রকাশ উৎসুকভাবে সেই খাম তুলে নিল। খামের ওপরেই ছিল বিদ্যালয়ের মোহর। সঙ্গে সঙ্গে খাম খুলে পড়েই তার মুখে হালকা রক্তিম আভা ফুটে উঠল। সে প্রশ্ন করল — এটা তুমি কোথায় পেলে মা?

করুণা বলল — তোমাদের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নিয়ে এলাম।

প্রকাশ — তুমি ওখানে গিয়েছিলে?

করুণা — কী আর করব?

প্রকাশ — কাল তো তখন গাড়ির সময় ছিল না।

করুণা — মোটর ভাড়া করে গিয়েছিলাম।

ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ চুপ করে রইল। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলল — তোমার যখন ইচ্ছাই নেই তখন আমায় পাঠাচ্ছ কেন? করুণা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল — তোমার যাওয়ার ইচ্ছা আছে তাই। তোমার এই শুকনো গোমড়া ভাব আমার সহ্য হয় না। আমার জীবনের কুড়িটা বছর তোমার ভালো চেয়ে কাটিয়ে দিয়ে আজ তোমার উচ্চকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করতে পারি না। তোমার যাত্রা সফল হোক এই আমার আন্তরিক কামনা। করুণার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। আর কিছু সে বলতে পারল না।

সেদিন থেকেই প্রকাশ যাত্রার প্রস্তুতি করতে লাগল। করুণার কাছে যা কিছু ছিল সব খরচ হয়ে গেল। কিছু ধারদেনাও করতে হল। নতুন স্যুট তৈরি হল, সুটকেশ কেনা হল। প্রকাশ নিজের ঘোরে ছিল। কখনও এটা ফরমাশ করে, কখনও ওটা।

এই এক সপ্তাহে করুণা কত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার চুল কত পেকে গেছে। মুখে কত বলিরেখা পড়েছে। এইসব কিছুই প্রকাশের চোখে পড়েনি। তার চোখের সামনে বিলেতের ছবিই ভাসছে। উচ্চকাঙ্ক্ষা চোখের সামনে পর্দা ফেলে দেয়।

যাওয়ার দিন এসে গেল। কদিন বাদে সেদিন রোদ উঠেছিল। স্বামীর পুরোনো জামাকাপড় করুণা বাইরে বার করছিল। তার মোটা খদ্দরের চাদর, খদ্দরের পাঞ্জাবি-পাজামা, লেপ সবকিছু সিন্দুকে রাখা ছিল — ফি-বছরই এগুলো রোদে দিয়ে ঝেড়েপুঁছে তুলে রাখা হত। করুণা আজ সেই কাপড়চোপড় বার করছিল। এবার কিন্তু রোদ খাইয়ে সেগুলো তুলে রাখতে নয়, গরিবদের বিলিয়ে দেওয়ার জন্য। আজ করুণা স্বামীর প্রতি রুষ্ট। আদিত্যের চিরসঙ্গী ঘটি, দড়ি আর ঘড়ি যেগুলোকে কুড়ি বছর ধরে করুণা পুজো করে এসেছে আজ সেগুলোকে টেনে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলল। সেই ঝোলাটা যা বছরের পর বছর আদিত্যর কাঁধে ঝুলত তা আজ আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। সেই ছবি যার সামনে কুড়ি বছর ধরে করুণা মাথা নুইয়ে এসেছে তা মাটিতে নিষ্ঠুরভাবে ছুঁড়ে ফেলা হল। স্বামীর কোনো স্মৃতিচিহ্নই সে আর তার কাছে রাখতে নারাজ। তার হৃদয় আজ শোকে-নিরাশায় বিদীর্ণ, আর স্বামী ছাড়া কার কাছেই বা সে নিজের রাগ জানাবে? কে আর তার আপনজন আছে? নিজের বেদনার কথা আর কাকে বলবে? কাকে নিজের বুক চিরে দেখাবে? সে বেঁচে থাকলে কি প্রকাশ এই দাসত্বের বেড়ি পায়ে দিয়ে এমন গর্বিত হতে পারত? করুণাকে কে বোঝাবে যে আদিত্য বেঁচে থাকলে এই অবস্থায় তারও অনুশোচনা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকত না।

প্রকাশের বন্ধুরা আজ তাকে বিদায়-ভোজ দিয়েছিল। সেখান থেকে সন্ধ্যার সময় কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সে বাড়ি ফিরল মোটরে করে। তার জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দেওয়া হল। তারপর ভেতর গিয়ে সে বলল — মা, যাচ্ছি। বোম্বে গিয়ে চিঠি দেব। আমার দিব্যি রইল তুমি কাঁদবে না আর সব সময় চিঠির উত্তর দেবে।

শবদেহে বাইরে বার করার সময় যেমন আত্মীয়স্বজনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, রুদ্ধ অশ্রু বাধা মানে না, শোকের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে — করুণার অবস্থাও হল তেমন। দুর্বল আত্মার

প্রতিটি অণুকে কম্পিত করে তার হৃদয় হাহাকার করে উঠল। তার মনে হল পা পিছলে সে জলে পড়ে গেছে, সেই জলস্রোতের টানে সে ভেসে চলেছে। তার মুখ থেকে শোকের বা আশীর্বাদের কোনো শব্দই বেরোল না। প্রকাশ প্রণাম করতে গিয়ে চোখের জলে মায়ের পা ভিজিয়ে চলে গেল। করুণা পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

গোয়ালা এসে একসময় বলল — বহুজি, ভাইয়া তো অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। খুব কাঁদছিল সে। করুণার যেন সমাধি টুটে গেল। তাকিয়ে দেখল সামনে কেউ নেই। ঘরে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। তার হৃদয়ের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎই করুণার দৃষ্টি ওপরের দিকে গেল। সে দেখতে পেল আদিত্য প্রকাশের নির্জীব দেহ নিজের কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। করুণা আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

ছয়

করুণা বেঁচে রইল। কিন্তু সংসারের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক থাকল না। কল্পনা দিয়ে যে ছোট্ট সংসারটি সে হৃদয়ের মধ্যে তৈরি করেছিল স্বপ্নের মতোই তা অনন্তে বিলীন হয়ে গেছে। যে আলো সামনে রেখে জীবনের অন্ধকারময় রাতেও হৃদয়ে আশার ধন নিয়ে সে এগিয়ে চলেছিল, সেই আলো নিবে গেছে। তার হৃদয়ের ধন লুণ্ঠিত। এখন কোনোও আশ্রয় নেই আর তার দরকারও নেই। যে গোরুগুলোকে সে দুবেলা নিজের হাতে খেতে দিত, গা ডলে আদর করত তারা এখন খুঁটোয় বাঁধা অবস্থায় নিরাশ চোখে বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাছুরগুলোকে আদর করার জন্য এখন আর কেউ নেই। কার জন্যে সে দুধ দুইবে, মাঠা তুলবে? খাওয়ার তো কেউ নেই! করুণা নিজের জগৎকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই করুণার জীবনের রঙ পালটে গেল। তার সেই ছোট্ট সংসার ছড়িয়ে পড়ল বিশ্ব জুড়ে। যে নোঙর নৌকোকে তীরের এক বিশেষ বিন্দুতে আটকে রেখেছিল, সেই নোঙরটাই গেল উপড়ে। এখন এই নৌকো সাগরের সীমাহীন বিস্তারের মধ্যে ভেসে বেড়াবে, যদি তা উদ্দাম তরঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায় তাতেই বা ক্ষতি কী?

করুণা বাড়ির দরজায় এসে বসত আর মহল্লার সব ছেলেদের ডেকে ডেকে দুধ খাওয়াত। বেলা দুপুর অবধি মাখন তুলত। আর সেই মাখন পাড়ার ছেলেদের খাওয়াত। নানারকম ভালো ভালো রান্না করে কুকুরকে খাওয়াত। এখন এটাই তার নিত্য নিয়ম। পাখি, কুকুর, বেড়াল, পিঁপড়ে সবাই তার আপন। ভালোবাসার এই মুক্তদ্বার এখন সবার জন্যই অবারিত। ওইটুকু জায়গায় যেখানে প্রকাশেরই ভালোভাবে সংকুলান হত না সেখানে সবারই স্থান হয়ে গেছে।

একদিন প্রকাশের চিঠি এল। করুণা সে চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটু পরে উঠে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে পাখিদের দানা খাওয়াতে লাগল। কিন্তু যখন নিশা-যোগিনী তার ধুনি জ্বালাল আর জীবনের কামনাবাসনা তার কাছে বর প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে করুণার মনোবেদনাও প্রকট হয়ে উঠল। প্রকাশের চিঠিটা পড়ার জন্যে তার মন তখন ব্যাকুল। সে ভাবল — প্রকাশ আমার কে? তাকে আমার কী দরকার? হ্যাঁ, প্রকাশ আমার কে? তার হৃদয় উত্তর দিল — প্রকাশ তোর সর্বস্ব। যে প্রেম থেকে তুই চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়েছিস প্রকাশ সেই অমর

প্রেমেরই স্মৃতিচিহ্ন। সে তোর প্রাণের প্রাণ, জীবনদীপের আলো, তোর বঞ্চিত কামনার মাধুর্য, অশ্রুজলবিহারী মরাল। করুণা সেই ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলোকে জড়ো করতে লাগল যেন তার হৃদয়টাই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা টুকরো যেন তার বিস্মৃত প্রেমের একেকটি পদচিহ্ন। সবকটা টুকরো জড়ো হলে সেগুলো প্রদীপের আলোয় কাছে ধরে সে একেকটি জুড়তে লাগল যেন কোনো বিরহী হৃদয় ভালবাসার ছিন্নসূত্র জোড়া দিচ্ছে। হায় রে মমতা! সেই অভাগী সারা রাত ধরে ঐ ছেঁড়া টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে কাটাল। চিঠি দু পৃষ্ঠাতেই লেখা ছিল, তাই টুকরোগুলোকে ঠিকমতো জোড়া লাগানো আরও কঠিন। মাঝের থেকে হয়তো কোনো একটা শব্দ বা কথা নিখোঁজ। বেচারি আবার সেটা খুঁজতে শুরু করল। সমস্ত রাত কেটে গেলেও চিঠি সম্পূর্ণ জোড়া দেওয়া হয়ে উঠল না।

সকাল হয়ে গেল। মহল্লার ছেলেমেয়েরা মাখন আর দুধের আশায় হাজির। কুকুর-বেড়ালেরাও এসে পড়েছে। পাখিরা উঠোনে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনটা ঢেঁকির ওপর বসছে, কোনটা বা তুলসীমঞ্চে। কিন্তু করুণার চোখ তুলে দেখার সময় কোথায়? দুপুর গড়িয়ে গেল কিন্তু তখনও করুণা মাথা তোলার ফুরসত পেল না। তার ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুরই অনুভূতি নেই। আবার সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিন্তু সেই চিঠি তখনও সম্পূর্ণ হল না। চিঠির বিষয়বস্তু বোঝা যাচ্ছিল। প্রকাশের জাহাজ কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে তারই বর্ণনা। তার বুকে যেন কিছু আটকে আছে। কী আটকে আছে করুণা ভাবতে পারছিল না। পিপাসায় যে মানুষ ছটফট করছে শিশিরবিন্দু কি তাকে তৃপ্ত করতে পারে? করুণা ছেলের কলম থেকে বেরিয়ে আসা প্রত্যেকটি শব্দ পড়ে তার ছবি বুকে এঁকে নিতে চাইছিল।

এইভাবে তিনদিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। তিন দিনের রাতজাগা চোখের পাতা একটু বুজে এসেছিল। করুণা দেখতে পেল টেবিলচেয়ারে সাজানো একটা বিরাট ঘর। ঘরের মাঝখানে একজন বসে আছে। করুণা ভালো করে দেখল — সে প্রকাশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন কয়েদিকে এনে হাজির করা হল। তার হাতেপায়ে বেড়ি, ঝুঁকেপড়া কোমর। সে আদিত্য।

করুণার ঘুম ভেঙে গেল। তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। চিঠির টুকরোগুলোকে আবার জড়ো করে সে আগুন ধরিয়ে সেগুলো ছাই করে ফেলল। এক চিমটি ছাই ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। এই ছাইই সেই মমতার চিতাভস্ম যা তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে ফেলছিল। এই এক চিমটি ছাইয়ের মধ্যেই তার পুতুলখেলার শৈশব, তার সন্তপ্ত যৌবন, তৃষ্ণাময় বৈধব্যের সমাবেশ।

সকালবেলায় লোকজন আবিষ্কার করল করুণার দেহে আর প্রাণ নেই। আদিত্যের ছবি তার শূন্য বুকে ধরা। ভগ্ন হৃদয়ে সে স্বামীর স্নেহস্মৃতিতে বিশ্রাম নিয়েছে। ওদিকে প্রকাশের জাহাজ ইউরোপের দিকে এগিয়ে চলেছে'

(মাঁ / ১৯২৯) অনুবাদ মীনা রায়চৌধুরী

অভাবিত সমাধান

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভোলা মাহাতো দ্বিতীয় বার বউ ঘরে আনলে তার ছেলে রঘুর সময়টা খারাপ পড়ল। রঘুর বয়স তখন সবে দশ। নিশ্চিন্তে সে গ্রামে গুলিডান্ডা খেলে বেড়াত। মার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংসারের চাকায় জুড়ে দেওয়া হল। নতুন বউ পান্না ছিল রূপবতী আর কেনা জানে যে আর রূপের সঙ্গে অহংকারের গলাগলি থাকে। সে নিজে কোনো খাটুনির কাজে হাতই লাগাত না। রঘুই গোবর ফেলত; রঘুই বলদের খাবার দিত; রঘুই এঁটো বাসন মাজত। ভোলার চোখও এমন ঘুরে গিয়েছিল যে, তখন সব কিছুতেই রঘুর দোষ তার নজরে পড়ত। পান্নার কথা সে প্রাচীন প্রথা মেনে চোখ বুজেই বিশ্বাস করত। রঘুর অভিযোগ সে পাত্তাই দিত না। এর ফল হল এই যে, রঘু নালিশ করাই ছেড়ে দিল। কার কাছে কাঁদবে? কেবল বাবাই নয়, সারা গ্রাম তার শত্রু হয়ে দাঁড়াল। বড়ো জেদি ছেলে, পান্নাকে তো সে মানুষ বলেই গণ্য করে না। বেচারি তাকে আদর করে, তাকে খাওয়ায়পরায় আর তার ফল হল এই? অন্য কোনো মহিলা হলে আর দেখতে হত না। একটা কথা তো বলতে হবেই যে, পান্না এত সোজা-সরল বলেই চলে যাচ্ছে। সবলের অভিযোগ সবাই শোনে, দুর্বলের প্রার্থনাও কেউ শুনতে চায় না। রঘুর মন দিন দিন তার মার প্রতি বিষিয়ে উঠতে লাগল। এই ভাবে আট বছর পার হয়ে গেল। আর ভোলার নামেও এক দিন মৃত্যুর পরোয়ানা এসে হাজির হল।

পান্নার চার সন্তান — তিন ছেলে, এক মেয়ে। সংসারে খরচ অ ..ক, অথচ উপায় করার কেউ নেই। রঘু আর এখন কেন খবর নেবে? এটা তো জানা কথাই। নিজের বউ আনবে আর আলাদা হয়ে যাবে। বউ এসে আরও আগুন লাগাবে। পান্না চতুর্দিকে খালি অন্ধকার দেখতে লাগল। তবে ভাবল, যাই হোক না কেন, সে রঘুর আশ্রিত হয়ে থাকবে না। যে সংসারে সে ছিল রানি সেখানে আজ সে দাসী হয়ে থাকতে পারবে না। যে ছেলেকে সে চাকর ছাড়া আর কিছু ভাবেনি তার ভরসায় থাকবে কেন? সে সুন্দরী, বয়স এখনও তেমন বেশি হয়ে যায় নি, যৌবন এখনও পুরোপুরিই বজায় রয়েছে। কেন, সে কি আবার বিয়ে করতে পারে না? কী আর হবে, লোকে হাসবে। হাসুক গে। তাদের সমাজে কি এরকম হচ্ছে না? তারা তো বামুনও নয়, রাজপুতও নয় যে নাক কাটা যাবে! ওইসব উঁচু জাতের মধ্যে ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু হয় ঠিকই তবে বাইরের ঠাট বজায় থাকে। সে তো সারা দুনিয়াকে দেখিয়েই আবার ঘর করতে পারে। তবে রঘুর পায়ের নীচে কেন থাকবে?

ভোলার মৃত্যুর পর এক মাস পার হয়ে গেছে। তখন সন্ধ্যা। পান্না এই সব ভাবছিল, হঠাৎ তার খেয়াল হল যে ছেলেরা ঘরে নেই। এই সময়েই বলদগুলো মাঠ থেকে ফিরে আসে —

বাচ্চারা আবার কেউ না সামনে গিয়ে পড়ে। এখন আর দরজায় কে খাড়া থাকবে এসব দেখাশোনা করার? ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে সে দেখল, রঘু ডেরায় বসে আখ কেটে কেটে আঁটি করছে। তিন ছেলেই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর ছোটো মেয়েটা তার গলায় হাত দিয়ে তার পিঠে ওঠার চেষ্টা করছে। পান্না নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এতো আজ নতুন ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। হয়তো সে সবাইকে দেখাতে চাইছে যে, সে তার ভাইদের কত ভালোবাসে অথচ মনের মধ্যে ছুরি লুকিয়ে রেখেছে! সুযোগ পেলে বোধ হয় প্রাণই শেষ করে দেবে। কালসাপ, কালসাপ ছাড়া আর কিছু নয়। অত্যন্ত কঠোর স্বরে বলল — তোরা সবাই ওখানে কী করছিস? ঘরে আয়, সন্ধে হয়ে গেছে, এখন গোরু ফিরবে।

পান্নাকে দেখে রঘু বিনীতভাবে বলল — আমি তো রয়েছি, মা। ভয় কীসের?

বড়ো ছেলে কেদার বলল — মা, রঘুদা আমাদের জন্য দুটো গাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। এই দ্যাখো, একটায় আমি আর খুন্নু বসব, আরেকটায় লছমন আর ঝুনিয়া। দাদা দুই গাড়িই টানবে।

এই কথা বলে সে চালার এক কোনা থেকে দুটো ছোটো ছোটো গাড়ি বের করে নিয়ে এল। চারটে করে চাকা লাগানো ছিল। বসার জন্যে পাটা আর ধরবার জন্য দুই দিকে হাতল।

পান্না আশ্চর্য হয়ে বলল — এই গাড়ি কে বানিয়েছে?

কেদার বিরক্ত হয়ে বলল — রঘুদা বানিয়েছে, আবার কে?

ভগতদের বাড়ি থেকে বাইস আর বাটালি চেয়ে এনে চটপট বানিয়ে দিয়েছে। খুব জোরে চলে, মা। খুন্নু, উঠে বস, আমি টানি।

খুন্নু গাড়িতে বসলে কেদার টানতে লাগল। মর্মর আওয়াজ উঠল। মনে হল গাড়িও যেন এই খেলায় বাচ্চাদের সাথি।

লছমন দ্বিতীয় গাড়িতে উঠে এসে বলল — দাদা, টানো।

রঘু ঝুনিয়াকেও গাড়িতে বসিয়ে দিল আর গাড়ি টানতে টানতে ছুটল। তিন ছেলেই হাততালি দিতে লাগল। পান্না বিস্ফারিত চোখে এই দৃশ্য দেখছিল আর ভাবছিল, এ সেই রঘু না অন্য কেউ।

একটু বাদেই দুটো গাড়িই ফিরে এল; ছেলেরা ঘরে গিয়ে তাদের অভিযানের বর্ণনা দিতে লাগল। সবাই কত খুশি, যেন এরোপ্লেনে চড়ে ঘুরে এসেছে।

খুন্নু বলল — জানো মা, গাছগুলো সব ছুটছিল।

লছমন — বাছুরগুলো কেমন পালাচ্ছিল, সবাই ছুটছিল।

কেদার — মা, রঘুদা দুটো গাড়িই এক সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়।

ঝুনিয়া ছিল সবার ছোটো। তার ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা লাফালাফি আব চোখের চাউনিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে হাততালি দিতে দিতে নাচতে লাগল।

খুন্নু — এখুন আমাদের বাড়িতে একটা গোরুও আসবে মা। রঘুদা গিরিধারীকে একটা গোরু এনে দিতে বলেছে। গিরিধারী কাল এনে দেবে বলেছে।

কেদার — তিন সে দুধ দেয়, মা। পেট ভরে দুধ খাব।

এরই মধ্যে রঘুও ভেতরে এল। পান্না অবহেলার দৃষ্টিতে তাকে দেখে বলল — রঘু, তুমি নাকি গিরিধারীর কাছে গোরু চেয়েছ?

রঘু ক্ষমা প্রার্থনার মতো করে বলল — হ্যাঁ, চেয়েছি। কাল এনে দেবে।

পান্না — টাকা কোথা থেকে আসবে তা ভেবে দেখেছ?

রঘু — সবই ভেবেছি, মা। আমার এই মোহর আছে না, তা থেকে পঁচিশ টাকা পাওয়া যাবে, পাঁচ টাকা বাছুরের জন্য দিয়ে দেব। ব্যস, আমাদের হয়ে যাবে।

পান্না সংকটে পড়ে গেল। তার অবিশ্বাসী মনও রঘুর ভালোবাসা ও নম্রতা অস্বীকার করতে পারল না। সে বলল — মোহর বেচে দেবে কেন? গোরুর জন্যে তাড়া কীসের? হাতে পয়সা হলে কিনবে। খালি গলা দেখতে ভালো লাগে না। এত দিন গোরু নেই, তাই বলে কি এরা বাঁচেনি?

রঘু দার্শনিকের মতো বলল — বাচ্চাদের খাওয়াদাওয়ার এই তো সময়, মা। এই বয়সে না খেলে আর কখন খাবে? মোহর পরতে আমার ভালোও লাগে না। লোকে ভাববে, বাপ চলে গেছে আর এখন মোহর পরার সময় হয়েছে।

ভোলা মাহাতো গোরুর চিন্তাতেই মারা গেল। টাকারও জোগাড় হল না, গোরুও এল না। উপায় ছিল না। রঘু এই সমস্যা কত সহজে সমাধান করে ফেলল। জীবনে এই প্রথমবার রঘুর ওপর পান্নার বিশ্বাস জন্মাল। বলল — যখন গয়নাই বেচতে হবে তখন তোমার মোহর কেন? আমার হাঁসুলি নাও।

রঘু — না, মা। এটা তোমার গলায় খুব সুন্দর মানায়। বেটা ছেলের মোহর পরা-না-পরায় কিছু এসে যায় না।

পান্না — রাখো, আমি বুড়ি হয়ে গেছি। এখন আর হাঁসুলি পরে কী করব। তুমি এখনও ছেলে মানুষ, তোমার খালি গলা দেখতে ভালো লাগবে না।

রঘু হেসে বলল — তুমি এখনই কী করে বুড়ি হয়ে গেলে? গ্রামে তোমার মতো আর কে আছে?

রঘুর এই সহজ কথাবার্তায় পান্না লজ্জিত হল। তার ক্লিস্ট মুখে প্রসন্নতার লালিমা দেখা গেল।

দুই

পাঁচ বছর পরের কথা। রঘুর মতো পরিশ্রমী বিবেকবান ও কর্তব্যপরায়ণ দ্বিতীয় কোনো কৃষক আর গ্রামে ছিল না। পান্নার বিনা অনুমতিতে কোনো কাজ সে করত না। তার বয়স ২৩ বছর পার হয়ে গিয়েছিল। পান্না বার বার বলছিল, বাবা, এবার বউমাকে নিয়ে এস। কতদিন আর বাপের বাড়ি পড়ে থাকবে? সবাই তো আমার বদনাম করছে আর বলছে যে, আমি বাড়িতে বউ আনতে দিচ্ছি না। কিন্তু রঘু খালি ভারাচ্ছিল। তার বক্তব্য— এত তাড়াতাড়ি করার কী আছে। অন্য লোকের কাছে শুনে সে তার স্ত্রীর চাল-চলন সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়েছিল। এরকম মেয়েছেলে ঘরে এনে ঘরের শান্তি বিঘ্নিত করতে সে চাইছিল না।

শেষে পান্না একদিন জেদ ধরে বলল — তাহলে তুমি বউ আনবে না?

— আমি তো বলে দিয়েছি যে, এখনও তাড়াতাড়ি করার কিছু হয়নি।

— তোমার তাড়া না থাকলেও আমার তাড়া আছে। আমি আজই লোক পাঠাচ্ছি।

— পসতাতে হবে কিন্তু, ওর স্বভাব ভালো নয়।

— তুমি বললেই তো হবে না। আমি যদি তার কোনো কথাতেই না থাকি তবে সে কি হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? রান্নার কাজটা তো করতে পারবে। আমাকে দিয়ে ঘরের ও বাইরের সব কাজ চলবে না। আমি আজই লোক পাঠাব।

— আনতে চাইছ, নিয়ে এসো। তবে পরে একথা বলতে পারবে না যে, আমি বউকে সামলাতে পারছি না, তার চাকর হয়ে গেছি।

— না বলব না। যাও দুটো শাড়ি ও কিছু মিষ্টি নিয়ে এস।

তৃতীয় দিন মুলিয়া বাপের বাড়ি থেকে এসে গেল। দরজায় বাজনা বাজল, শানাইয়ের মধুর ধ্বনি আকাশে গুঞ্জন তুলল। নতুন বউয়ের মুখ দেখে লোকে টাকা দিল। মুলিয়ার আগমন মরুভূমির মধ্যে নির্মল জলধারার মতো প্রতিভাত হল। সোনালি তার গায়ের রং, তীক্ষ্ণ আঁখি পল্লব, দুই গণ্ডে গোলাপি আভা, চোখে প্রবল আকর্ষণ। রঘু তাকে দেখেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল।

সকালে যখন সে কলসি নিয়ে জল আনতে যেত তখন তার সোনালি রং সূর্যের সোনালি কিরণের সঙ্গে মিশে যেত। মনে হত উষা তার নিজের সমস্ত সুগন্ধ, সমস্ত প্রকাশ ও উচ্ছলতা নিয়ে মুচকি হেসে চলে যাচ্ছে।

তিন

মুলিয়া গায়ে জ্বালা নিয়েই এসে ছিল। তার স্বামী শরীরের রক্ত জল করে কাজ করবে আর পান্না রানির মতো বসে থাকবে, তার ছেলেরা রাজপুত্রের মতো ঘুরে বেড়াবে — এসব মুলিয়ার সহ্য হবার নয়। সে কারও দাসীগিরি করতে পারবে না। নিজের ছেলেই আপন হয় না আর ভাই! যত দিন পর্যন্ত বেরুতে পারছে না রঘুর চারদিকে ঘুর ঘুর করছে। যেই একটু সেয়ানা হবে, ঝেড়ে ফেলে চলে যাবে, জিজ্ঞেসও করবে না।

একদিন রঘুকে সে বলল — তুমি এভাবে গোলামি করতে চাও করো, আমার পোষাবে না।

রঘু — তাহলে কী করব তুইই বলে দে না। ঘরের কাজ করার মতো তো ছেলেরা বড়ো এখনও হয়নি।

মুলিয়া — ছেলেরা তো আর তোমার কেউ নয়। এই পান্নাই না তোমাকে তিল তিল করে দগ্ধাত! সব শুনেছি। আমি দাসী হয়ে থাকব না। টাকাপয়সার কোনো হিসাব আমি পাই না। কে জানে তুমি তাকে কী এনে দিচ্ছ আর সে তা দিয়ে কী করছে। তুমি তো জান যে, টাকা ঘরেই থাকে; কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো যদি একটা কানাকড়িও তোমার কপালে জোটে।

রঘু — তোর হাতে টাকাপয়সা দিলে লোকে কী বলবে সেটা ভেবে দেখ।

মুলিয়া — লোকে যা বলে বলুক। লোকের কাছে তো আর আমাকে বেচে দেয়নি। দেখে নিয়ো, হাঁড়ি মাজলে হাতে কালি লাগবেই। তুমি যদি তোমার ভাইদের জন্য মরতে চাও মরো, আমি কেন মরতে যাব?

রঘু কোনো উত্তর দিল না। সে যা ভয় করছিল তা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। যদি সে খুব হইচই করে তবে বড়োজোর আরও ছ মাস কী এক বছর চলতে পারে। ব্যস, তারপর আর চলবে বলে মনে হয় না। যা ভবিতব্য তাকে আর কী করে ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

একদিন পান্না মহুয়া শুকোতে দিয়েছিল। গোটা বর্ষার সময় গোলায় রাখা মহুয়া তাই নরম হয়ে গিয়েছিল। পান্না মুলিয়াকে বলল — বউমা, একটু দেখো। আমি পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছি।

মুলিয়া বেপরোয়া জবাব দিল — আমার ঘুম আসছে। তুমি বসে বসে দ্যাখো। একদিন স্নান না করলে আর কী হবে?

পান্না হাতের শাড়ি রেখে দিল, স্নান করতে গেল না। মুলিয়ার আক্রমণ বৃথা হয়ে গেল।

কদিন পর এক সন্ধ্যায় পান্না ধান লাগিয়ে ফিরেছে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সারা দিন খাওয়া হয়নি। তার আশা ছিল বউ রুটি বানিয়ে রেখে দেবে। কিন্তু এসে দেখল উনুন জ্বালানোই হয়নি আর ছেলেরা খিদের জ্বালায় ছটফট করছে। মুলিয়াকে সে আস্তে জিজ্ঞেস করল — আজ এখনও চুলা ধরাও নি?

কেদার বলল — আজ দুপুরেও চুলা জ্বলেনি, মা। বউদি রান্নাই করেনি।

পান্না — তা তোরা খেলি কী?

কেদার — কিছু খাইনি। রাত্রের রুটি ছিল, খুন্নু আর লছমন খেয়েছে। আমি ছাতু খেয়েছি।

পান্না — আর, বউমা?

কেদার — সে পড়ে শুয়েই আছে, কিছুই খায়নি।

পান্না তখনই উনুন জ্বালিয়ে খাবার তৈরি করতে বসে গেল — আটা মাখতে মাখতে সে কাঁদতে লাগল। কপাল! সারাদিন খেতেখামারে রোদে পুড়ে আবার বাড়িতে এসে উনুনের সামনে জ্বলতে হবে!

কেদারের বয়স হয়েছে চোদ্দ। বউদির চালচলন দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। বলল — মা, বউদি আর এখন তোমার সঙ্গে থাকতে চাইছে না।

পান্না চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল — কেন, কিছু বলছিল?

কেদার — বলেনি কিছু, তবে এটাই তার মনের কথা। তুমি কেন তাকে ছাড়ছ না? যেভাবে থাকতে চায় থাকুক, আমাদেরও ভগবান আছেন।

পান্না দাঁতে জিভ চেপে বলল — চুপ, এরকম কথা ভুলেও আমার সামনে বলবি না। রঘু তোর ভাই শুধু নয়, তোর বাপের মতন। মুলিয়াকে কোনো সময় যদি কিছু বলিস তো মনে থাকে যেন আমি বিষ খাব।

চার

দশহরা উৎসবের সময় এল। এই উপলক্ষে গ্রাম থেকে ক্রোশ খানেক দূরে এক মেলা বসে। গ্রামের সব ছেলেমেয়েরা মেলা দেখতে চলল। পান্নাও ছেলেদের নিয়ে মেলা দেখতে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পয়সা আসবে কোথা থেকে? চাবি তো মুলিয়ার কাছে।

রঘু এসে মুলিয়াকে বলল — ছেলেরা সব মেলা দেখতে যাচ্ছে, ওদের দুটো করে পয়সা দিয়ে দে।

মুলিয়া স্বর চড়িয়ে বলল — বাড়িতে পয়সা নেই।

রঘু — এই তো সর্ষে বিক্রি হল। এরই মধ্যে সব পয়সা শেষ হয়ে গেছে?

মুলিয়া — হাঁ, শেষ হয়ে গেছে।

রঘু — কী করে শেষ হল? একটু শোন, আজ উৎসবের দিন, ছেলেরা মেলা দেখতে যাবে না?

মুলিয়া — নিজের মাকে বল। পয়সা বের করুক, জমিয়ে রেখে কী করবে?

খুঁটির মাথায় চাবি ঝুলছিল। রঘু চাবি তুলে নিয়ে সিন্দুক খুলতে যাবে তখনই মুলিয়া তার হাত ধরে ফেলে বলল — চাবি আমাকে দিয়ে দাও তা না হলে ভালো হবে না বলছি। খাওয়া-পরা চাই, বই-খাতা চাই, তারপর আবার মেলা দেখতেও যাওয়া চাই। আমাদের রোজগার তো এই জন্য নয় যে অন্যে তা খাবে আর পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবে।

পান্না রঘুকে বলল — বাবা, পয়সা দিয়ে কী হবে? ছেলেরা মেলা দেখতে যাবে না।

রঘু রেগে বলল — কেন যাবে না মেলা দেখতে? গ্রামের সবাই যাচ্ছে আর আমাদের বাড়ির ছেলেরা যাবে না?

এই কথা বলে রঘু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পয়সা বের করে ছেলেদের দিয়ে দিল। তবে সেই চাবি যখন মুলিয়াকে দিল সে সেটা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল। ছেলেদের মেলা দেখতে যাওয়া হল না।

এরপর দুদিন গেল, মুলিয়া কিছুই খেল না। পান্নাও অভুক্ত থাকল। রঘু কখনও একে বোঝায়, কখনও ওকে, কিন্তু না মুলিয়া, না পান্না — কেউই উঠল না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে রঘু মুলিয়াকে বলল — আরে। মুখে কিছু বলবি তো? চাইছিস কী?

মুলিয়া মাটির দিকে চেয়ে বলল — আমি কিছু চাই না, আমাকে বাপের বাড়ি রেখে এস।

রঘু — ঠিক আছে, ওঠ, রান্না করে খা, দেব পৌঁছে।

মুলিয়া রঘুর দিকে চোখ তুলে তাকালে রঘু তার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। সেই মাধুর্য, সেই মুগ্ধতা, সেই লাবণ্য সব উধাও। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। আগনের মতো লাল চোখ নিয়ে সে বলল — আচ্ছা! তা হলে তোমার মা এই শলা দিয়েছে, এই মন্ত্র পড়িয়েছে? তা আমি অত কচি খুকি নই। তোমাদের দুজনের বুকে বসে পাথর ভাঙব। তোমার মতলব কী?

রঘু — ঠিক আছে, পাথরই ভাঙবি। কিছু খেয়েটেয়ে নে, তাহলেই তো পাথর ভাঙার ক্ষমতা হবে।

মুলিয়া — তখনই আমি মুখে জল তুলব যখন ঘর পৃথক হবে। অনেক ঝামেলা সয়েছি আর সইতে পারব না।

রঘু সংকটে পড়ে গেল। এক দিনের জন্যেও তার মুখ থেকে এসব কথা বেরোয়নি। পৃথক হবার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। গ্রামে দু-চারটে পরিবারকে সে ভিন্ন হতে দেখেছে। সে এটা ভালোভাবেই জানে যে, হাঁড়ি আলাদা হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও পৃথক হয়ে যায়। বরাবরের জন্য পর হয়ে যেতে হয়। গ্রামের অন্য লোকের সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে, পরিবারের লোকের

সঙ্গে তখন সেই সম্পর্ক হয়। রঘু মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল যে, তার বাড়িতে সে এই বিপদ আসতে দেবে না। তবে যা হবার তা সে কী করে আটকাবে। — আঃ, আমার মুখে কালি লাগবে। সবাই একথা বলবে যে, বাপ মরে যাবার পর দশটা বছরও এক সঙ্গে কাটল না। আর পৃথক হবই বা কেন? যাদের কোলে নিয়ে খাইয়েছি; যাদের নিজের ছেলের মতো করে বড়ো করেছি; যাদের জন্য কত রকম কষ্ট সহ্য করেছি, তাদের থেকে এখন পৃথক হয়ে যাব? নিজের স্নেহের দুলালদের ঘর থেকে বের করে দেব? তার গলা ধরে এল। কম্পিত স্বরে বলল — তুই কি চাইছিস যে, আমার ভাইদের থেকে আমি ভিন্ন হয়ে যাই? ভালো করে ভেবে দেখ, কোথাও আর মুখ দেখানো যাবে?

মুলিয়া — তা, আমার এইসব লোকের সঙ্গে পোষাবে না।

রঘু — তা হলে তুই পৃথক হয়ে যা। আমাকে তোর সঙ্গে টানছিস কেন?

মুলিয়া — তা, তোমাদের বাড়িতে আমার কোন সুখটা আছে? সংসারে আমার কি যাবার জায়গা নেই?

রঘু — তোর যা ইচ্ছে, যেখানে খুশি থাক। আমি আমার বাড়ির লোকদের সঙ্গে পৃথক হতে পারব না। যেদিন এই বাড়িতে দু হাঁড়ি হবে সেদিন আমার মনও ভেঙে যাবে। আমি এই আঘাত সইতে পারব না। তোর যা-যা কষ্ট সে সব আমি দূর করতে পারব। জিনিসপত্রের দেখাশোনার ভার তো তোরই; ভাঁড়ারও তো তোরই হাতে। আর বাকি থাকল কী! আর কাজকর্ম যদি কিছু করতে না চাস তো করিসনি। ভগবান যদি আমাকে সেই সুযোগ দিতেন তো তোকে আমি কুটোটুকুও নাড়তে দিতাম না। খেটে খাওয়ার জন্য তোর অমন সুন্দর হাত-পা তৈরি হয়নি। তবে কী আর করব, আমার হাতে তো আর কিছু নেই। তোর যদি কাজ করতে ইচ্ছে না থাকে, তুই কাজ করিসনি। তবু তুই আমাকে ভিন্ন হতে বলিস নি, তোর পায়ে পড়ছি।

মুলিয়া মাথার ঘোমটা সরিয়ে আর একটু কাছে এসে বলল — আমি কাজ করতে ভয় পাই না, বসে বসে খেতেও চাই না। তবে আমি কারও মেজাজ সহ্য করতে পারব না। তোমার মা ঘরের কাজ করে, তা সে নিজের জন্যেই করে, নিজের ছেলেপুলেদের জন্যেই করে। আমার তো কোনো কাজ করে দিচ্ছে না, তবে আবার মেজাজ কীসের? সে তার নিজের ছেলেপুলেদের ভালোবাসুক, কিন্তু আমার আশ্রয় তো তুমি। সবাই বসে আরাম করবে, এ জিনিস আমি নিজের চোখে দেখতে পারব না। ছেলেরা একটু পরে পরে দুধ খাবে আর যে মানুষটা শরীরের রক্ত জল করে সংসার চালাচ্ছে তার কপালে ঘোলও জুটবে না! কেউ তাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করার নেই। নিজের মুখ একবার তুমি দেখ কী চেহারা হয়েছে! চার বছরের মধ্যে তার নিজের লোক দাঁড়িয়ে যাবে, আর দশ বছরের মধ্যে তুমি বিছনায় পড়বে। বসো না, দাঁড়িয়ে আছ কেন? কী, মেরে পালাবে? আমি তোমাকে জবরদস্তি বেঁধে রাখব না, তোমার ঠাকরুনের হুকুম নেই বোধ হয়? সত্যি কথা বলব, তোমার মন বড়ো শক্ত। যদি আমি জানতাম যে, তোমার মতো পাষাণের হাতে পড়ব তাহলে ভুলেও এ ঘরে আসতাম না। এলেও মন লাগাতাম না, তবে এখন তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। বাড়ি ফিরে গেলেও মন এখানেই পড়ে থাকবে। আর তুমি যে কী, আমার খবর পর্যন্ত নাও না।

মুলিয়ার এসব মিষ্টি কথা রঘুর ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারল না। সে আগের মতো রুক্ষভাবেই বলল — মুলিয়া, আমার দ্বারা এ জিনিস হবে না। পৃথক হবার কথা চিন্তা করতেই আমার মন কীরকম হয়ে যায়। এ আঘাত সহ্য করতে পারব না।

মুলিয়া পরিহাস করে বলল — তবে চুড়ি পরে বাড়ির ভিতর বসে থাকো না! আর আমি গোঁফ লাগিয়ে নিই। আমি ভাবতাম তোমার কিছু ক্ষমতা-টমতা আছে। এখন দেখছি, তুমি কেবল মাটির ডেলা।

পান্না দালানে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনছিল। আর সে থাকতে পারল না। সামনে এসে রঘুকে বলল — সে যখন ভিন্ন হবার জন্যেই উঠেপড়ে লেগেছে তখন তুমি জোর করে কেন ধরে রাখতে চাইছ ? তুমি ওকে নিয়ে থাকো, ভগবান আমাকে দেখবেন। যখন তোমার বাবা মারা গেল একটা কোনো পাতার আশ্রয়ও ছিল না। তখন যদি ভগবান ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন তাহলে এখন আর কীসের ভয়? এখন তো ভগবানের দয়ায় তিন ছেলেই বড়ো হয়ে উঠেছে। এখন কোনো চিন্তা নেই।

রঘু জলভরা চোখে পান্নার দিকে চেয়ে বলল — মা, তুমিও পাগল হয়ে গেলে না কী? তুমি কি জানো না যে, হাঁড়ি আলাদা হলে মনও ভাগ হয়ে যায়?

পান্না — যখন কোনো কথাই সে শুনছে না তখন তুমি আর কী করবে? ভগবান যদি চান তবে কে কী করতে পারে? কপালে যত দিন এক সঙ্গে থাকা লেখা ছিল তত দিন এক সঙ্গে কেটেছে। এখন ভগবানের এই ইচ্ছা হলে তাই হবে। তুমি আমার ছেলেপুলের জন্য যা করেছ তা ভুলতে পারব না। তুমি যদি এদের না দেখতে তাহলে এদের কী গতি হত কে জানে। কে জানে কাদের দরজায় দরজায় ঘুরতে হত; কে জানে কোথায় কোথায় ভিক্ষে মেগে ফিরতে হত। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তোমার যশ গেয়ে বেড়াব। আমার শরীরের চামড়া যদি তোমার জুতো তৈরির কাজে লাগে আমি হাসি মুখে তা দেব। তোমার সঙ্গে ভিন্ন হলেও যখনই ডাকবে কুকুরের মতো ছুটে আসব। একথা ভুলেও ভেবো না যে, তোমার সঙ্গে পৃথক হলাম বলে তোমার অমঙ্গল কামনা করব। যেদিন তোমার অমঙ্গলের চিন্তা আমার মনে ঠাঁই পাবে সেদিন আমি বিষ খেয়ে মরব। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমি প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে এই আশীর্বাদই করে যাব যে, ভগবানের দয়ায় তোমার বাড়বাড়ন্ত হোক। আর ছেলেরা যদি তাদের বাবাকে অস্বীকার না করে তাহলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তোমাকে মেনে চলবে। এই কথা বলে পান্না কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে গেল। রঘু সেখানেই মূর্তির মতো বসে থাকল। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল আর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

পাঁচ

পান্নার কথা শুনে মুলিয়া বুঝতে পারল যে, তার পোয়াবারো। চটপট উঠে সে ঘর ঝাঁট দিল, উনুন জ্বালাল ও কুয়ো থেকে জল আনতে গেল। তার জেদ পুরো বজায় থাকল।

গ্রামে মেয়েদের দুটো দল থাকে — একটা বউদের আর অন্যটা শাশুড়িদের। পরামর্শ আর সহানুভূতির জন্যই তারা যার যার দলে যায়। দু দলের সভা পৃথক হয়। কুয়োর ওখানে মুলিয়ার

সঙ্গো দু-তিন জন বউয়ের দেখা হয়ে গেল। এক বউ বলল — তোমাদের বাড়ির বুড়ি আজ খুব কান্নাকাটি করছিল।

মুলিয়া বিজয়গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল — এত দিন ঘরের কর্ত্রী হয়ে ছিল, রাজপাট ছেড়ে যেতে কার আর ভালো লাগে? বোন, আমি তার খারাপ চাই না, তবে একজনের রোজগারে আর কজনের চলে? আমারও ত এই খাওয়াদাওয়া, আমোদ-ফূর্তির সময়। এখন তার পিছনে পিছনে থাকো, তারপর ছেলেপুলে হলে তাদের পিছনে-পিছনে চলো এভাবেই সারা জীবনে চোখের জলে কেটে যাক আর কী!

দ্বিতীয় বউ — বুড়িরা চায় কী বউরা সারা জীবন দাসী হয়ে থাকুক — মোটা ভাত খেয়ে পড়ে থাকুক।

তৃতীয় বউ — কার ভরসায় আর কে থাকে? নিজের ছেলেরাই জিজ্ঞেস করে না, অন্যের ছেলেদের আর কী বিশ্বাস! দুদিন বাদে যখন হাত-পা গজাবে তখন কি আর খবর নেবে? তখন তারা নিজেদের বউয়ের কথায় চলবে। প্রথমেই বলে দেওয়া ভালো তাহলে পরে আর কোনো ঝামেলা হবে না।

মলিয়া জল নিয়ে গিয়ে খাবার তৈরি করে রঘুকে বলল — যাও, চান করে এসো, খাবার তৈরি।

রঘু যেন শুনলই না। মাথায় হাত রেখে দরজার দিকে চেয়ে থাকল।

মুলিয়া — কী বলছি কিছু শুনতে পাচ্ছ? খাবার তৈরি, গিয়ে চান করে এস।

রঘু —- শুনব না কেন? আমি কি কালা? খাবার তৈরি হয়ে গেছে তো গিয়ে খেয়ে নে। আমার খিদে নেই।

মুলিয়া আর কিছু বলল না। সে গিয়ে উনুন নিবিয়ে দিল, রুটি তুলে শিকেয় রাখল, তারপর মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল।

একটু পরে পান্না এসে বলল — খাবার তৈরি, চান টান করে খেয়ে নাও। নইলে বউ তো না খেয়ে থাকবে।

রঘু রেগে গিয়ে বলল — মা, তুমি বাড়িতে থাকতে দেবে, না মুখে কালি মেখে কোথাও চলে যাব? খাবার তো খাবারই, আজ না খাই কাল খাব। তবে এখন আমি খেতে পারব না। কেদার কি এখনও স্কুল থেকে আসেনি?

পান্না — এখনও আসেনি, হয়তো আসছে।

পান্না বুঝতে পারল সে রান্না করে ছেলেদের না খাওয়ালে ও নিজে না খেলে রঘু খাবে না। শুধু তাই নয়, তাকে রঘুর সঙ্গো যুশ্ধ করতে হবে, তাকে কড়াকড়া কথা শোনাতে হবে। তাকে দেখাতে হবে যে, সেও পৃথক হতে চাইছে, তা না হলে সে এই চিন্তাতে চিন্তাতেই মরে যাব। এই কথা ভেবে সে আলাদা উনুন ধরিয়ে খাবার তৈরি করতে লাগল। এমন সময় কেদার ও খুন্নু স্কুল থেকে এসে পড়ল। পান্না বলল — আয়, খেয়ে নে, রুটি হয়ে গেছে।

কেদার জিজ্ঞেস করল — দাদাকে ডেকে নেবে না?

পান্না — তুই এসে খেয়ে নে। ওর রুটি বউ আলাদা করে করেছে।

খুন্নু — গিয়ে দাদাকে জিজ্ঞেস করে আসব না?

পান্না — যখন তার ইচ্ছে হবে, খাবে। তুই বসে খা। এসব কথায় তোর থাকা কেন? যার ইচ্ছে হয় সে খাবে, যার ইচ্ছা হবে না সে খাবে না। সে আর তার বউ যখন আলাদা হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তখন কে কী করবে?

কেদার — কেন মা, আমরা কি আলাদা বাড়িতে থাকব?

পান্না — তার যদি ইচ্ছে হয় তা হলে এক বাড়িতেই থাকবে, তা না হলে উঠোনে বেড়া দেবে।

খুন্নু দরজাব কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল সামনে একটা খড়ের ঘরে খাটিয়ায় পড়ে রঘু হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে।

খুন্নু — দাদা তো এখনও হুঁকো নিয়ে বসে আছে।

পান্না — যখন ইচ্ছে হয় খাবে।

কেদার — দাদা বউদিকে বকেনি?

মুলিয়া নিজের ঘরে শুয়ে সব শুনছিল। বাইরে এসে বলল — দাদা তো বকেনি, এখন তুমি এসে বকে যাও।

কেদারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আর কোনো কথা সে বলল না। তিন ছেলেই খেয়েদেয়ে বাইরে চলে গেল। লু বইছিল। আমের বাগানে গ্রামের ছেলেমেয়েরা বাতাসের ঝাপটায় পড়ে যাওয়া আম কুড়োচ্ছিল। কেদার বলল — আজ আমরাও আম কুড়োতে যাব, খুব আম পড়ছে।

খুন্নু — দাদা যে বসে আছে?

লছমন — আমি যাব না, দাদা রাগ করবে।

কেদার — সে তো এখন ভিন্ন হয়ে গেছে।

লছমন — তা, এখন যদি কেউ আমাদের মারে তাহলে কি দাদা কিছু বলবে না?

কেদার — বাঃ, তা হলে বলবে না কেন?

রঘু তিন ছেলেকেই দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও কিছু বলল না। আগে ঘরের বাইরে গেলেই ধমক দিত, আজ কিন্তু সে পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল বসে থাকল। তাই ছেলেদের কিছু সাহস হল। তারা আর একটু এগিয়ে গেল। রঘু তবু কিছু বলল না, কী করে বলবে? সে ভাবছিল, মা ছেলেদের খেতে দিল আমাকে জিজ্ঞেসও করল না। কেন, তারও কি চোখের পর্দা গেছে? আমি যদি ছেলেদের ডাকি আর তারা যদি আমার কথা না শোনে তাহলে? আমি তো ওদের মারপিট করতে পারব না? লুর মধ্যে সব ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। অসুখবিসুখ না করে। সে মনের দুঃখ মনে চেপে বসে থাকল, কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পেল না। ছেলেরা যখন দেখল সে কিছু বলছে না তখন তারা নির্ভয়ে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ মুলিয়া এসে বলল — এবার উঠবে তো, না কী? যার কথা বলে না খেয়ে বসে আছ সে বেশ ভালো করেই ছেলেদের খাইয়েছে আর নিজেও খেয়েছে। এখন আরাম করে শুয়ে আছে। যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। একবার তো বললও না যে, ওঠো খেয়ে নাও।

রঘুর নিদারুণ মর্মপীড়া হচ্ছিল। মুলিয়ার এই কঠোর বাক্যবর্ষণ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো লাগছিল। কাতর চোখে বলল — তোর যা ইচ্ছে ছিল তাই তো হয়েছে। এখন গিয়ে ঢোল বাজা।

মুলিয়া — না, তোমার জন্য ভাতের থালা নিয়ে বসে আছে।

রঘু — আমাকে রাগাবি না। তোর জন্য আমারও বদনাম হচ্ছে। তুই যখন কোনো কিছুতেই থাকতে রাজি হবি না তখন কার গরজ পড়েছে খোশামোদ করে থাকার? যা গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস কর — ছেলেরা আম কুড়োতে গেছে, গিয়ে ওদের নিয়ে আসব কি না।

মুলিয়া বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল — এই যাচ্ছি! তোমার ইচ্ছে থাকে একশোবার গিয়ে জিজ্ঞেস কর।

এরই মধ্যে পান্নাও ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে রঘু বলল — ছেলেরা বাগানে চলে গেছে, মা। এদিকে লু বইছে।

পান্না — আজ আর ওদের বলার কে আছে? তা বাগানেই যাক, গাছেই উঠুক আর জলেই ডুবুক? আমি একা আর কী করব?

রঘু — গিয়ে নিয়ে আসব?

পান্না — নিজে থেকে তুমি যদি যেতে না চাও তবে আমি যেতে বলব কেন? আটকাতে হলে তুমি কি আটকাতে পারতে না? তোমার সামনে দিয়েই তো গিয়ে থাকবে?

পান্নার কথা শেষ না হতেই রঘু ঘরের কোণে হুঁকো রেখে বাগানের দিকে রওনা হল।

ছয়

রঘু ছেলেদের নিয়ে বাগান থেকে ফিরে দেখল মুলিয়া তখনও দাঁড়িয়ে। সে মুলিয়াকে বলল — তুই গিয়ে খেয়ে নিচ্ছিস না কেন? এবেলা আমার খিদে নেই।

মুলিয়া রেগে বলল — হ্যাঁ, খিদে লাগবে কেন, ভাইরা খেয়েছে তো, সে খাওয়া পেটে গিয়ে থাকবে।

রঘু দাঁত কামড়ে বলল — আমাকে জ্বালাস নি মুলিয়া। ভালো হবে না। খাবার কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না। এক বেলা না খেলে মরেও যাব না। কী, তুই কি কিছু বুঝতে পারছিস বাড়িতে আজ কী কাণ্ডটা হয়ে গেল? তুই উনুন জ্বালালি না, কিন্তু আমার কলজেয় আগুন লাগিয়ে দিলি। আমার অহংকার ছিল, আর যাই হোক না কেন, আমার বাড়িতে এই ব্যারাম ঢুকতে পারবে না। তুই কিন্তু আমার সেই অহংকার চূর্ণ করে দিলি। সবই কর্মফল।

মুলিয়া বিরক্তির সঙ্গে বলল — সমস্ত হায় হায় তো দেখি শুধু তোমারই, আর কারুর তো দেখি না? আর কারুকে তো তোমার মতো আপশোশ করতে দেখছি না।

রঘু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল — মুলিয়া, কাটা ঘায়ের উপর নুনের ছিটে দিবি না। তোর জন্যেই আমার গায়ে কালি লাগছে। এই সংসারের ওপর আমার টান থাকবে না তো কার টান থাকবে? আমিই না কত কষ্ট করে একে ধরে রেখেছি। যাদের কোলে নিয়ে খাইয়েছি তারাই আজ আমার অংশীদার হবে। যে ছেলেদের আমি ধমকাতে পারতাম আজ তাদের দিকে ভালো করে

চাওয়া পর্যন্ত যাবে না। আমি যদি ওদের ভালোর জন্যও কিছু বলি সবাই বলবে আমি ভাইদের সর্বনাশ করছি। যা, আমাকে এখন ছেড়ে দে, আমার দ্বারা এখন কিছু খাওয়া হবে না।

মুলিয়া — আমি কিন্তু দিব্যি দেব, নয়তো চুপ করে আমার সঙ্গো চল।

রঘু — দেখ, এখনও কিছু ক্ষেপিনি। তোর জেদ ছাড়।

মুলিয়া — যে খেতে যাবে না সে আমার মাথা খায়।

রঘু কান চেপে ধরে বলল — তুই এ কী করলি, মুলিয়া? আমি তো উঠছিলাম। চল্, খেতে যাই। চান-টান আর কে করবে। তবে একথা বলতে পারি যে, চারটের জায়গায় ছটা রুটি খাই আর তুই ঘিয়ের হাঁড়িতেই ডুবিয়ে রাখ, এ দাগ আমার মন থেকে মিলিয়ে যাবে না।

মুলিয়া — দাগটাগ সব মিলিয়ে যাবে। প্রথম প্রথম সকলেরই এরকম লাগে। দেখছ না, ওদিকে কেমন সব শান্ত হয়ে গেছে। সে তো ঠিকই করে রেখেছিল, যে কোনো ওজরে পৃথক হয়ে যাবে। এখন আর আগের সেই মজা নেই যে, ঘরে যা আসবে সবই লোপাট। এখন কে আর আমাদের সঙ্গো থাকবে?

রঘু আহত স্বরে বলল — এর জন্যেই তো আমার দুঃখ। মার কাছ থেকে এ ব্যবহার আমি আশা করিনি।

রঘু খেতে বসল, একেকটা গ্রাস তার কাছে বিষ বলে মনে হচ্ছিল। মনে হতে লাগল — রুটি ভুসির রুটি; ডাল যেন ডাল নয় জল। জল গলার নীচে যাচ্ছিল না; দুধের দিকে সে চেয়েও দেখল না। দু-চার গ্রাস খেয়ে উঠে পড়ল — কোনো প্রিয়জনের শ্রাধের খাওয়ায় যেমন হয়।

রাত্রের খাওয়াও সে এভাবেই সারল। খাওয়া আর কী হবে, কোনো রকমে দিব্যি ঠেকাল। সারা রাত তার মন উতলা হয়ে রইল। এক অজ্ঞাত আশঙ্কা তার মন ছেয়ে থাকল। তার মনে হতে লাগল যেন ভোলা মাহাতো দরজায় বসে কাঁদছে। সে কতবার চমকে চমকে উঠল। তার এমন মনে হল যেন ভোলা তার দিকে তিরস্কারের চোখে তাকিয়ে আছে।

তারা দুজনে দুবেলা খেত ঠিকই, তবে খাচ্ছে যেন শত্রুর ঘরে — এই মনে হত তার।

ভোলার শোকমগ্ন মূর্তি তার চোখ থেকে কিছুতেই মুছে যাচ্ছিল না। রাত্রে তার ঘুম আসত না। গ্রামে সে মুখ ঘুরিয়ে, মাথা নিচু করে এমন ভবে চলাফেরা করত যেন সে গো-হত্যার অপরাধে অপরাধী।

সাত

পাঁচ বছর পার হয়ে গেল। রঘু এখন দুই ছেলের বাবা। উঠানে বেড়া দেওয়া, খেতে আল দেওয়া। গাই-বলদ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কেদারের বয়স এখন উনিশ। সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে খেতের কাজে লেগে গিয়েছিল। খুন্নু গোরু চরাত, কেবল লছমন এখন স্কুলে যাচ্ছিল। পান্না ও মুলিয়া একজন আরেক জনের চেহারা দেখলে জ্বলে উঠত। মুলিয়ার দুই ছেলে বেশির ভাগই পান্নার কাছে থাকত। সেই তাদের তেল মালিশ করত, কাজল লাগিয়ে দিত, কোলেকোলে নিয়ে ফিরত; তবু কিন্তু মুলিয়ার মুখ থেকে ভালো একটা শব্দও বেরুত না। পান্নাও অবশ্য তা শোনার জন্যে ইচ্ছুক ছিল না। সে যা করত নিরাসক্ত মনেই করত। তার দু-দুটো ছেলে রোজগেরে, মেয়ে রান্না

করতে পারত আর সে নিজে অন্য কাজ করে নিতে পারত। অন্য দিকে রঘু ছিল একা। আর ছিলও সে দুর্বল, অশক্ত ও যৌবনে বৃন্ধ। বয়স এখনও ত্রিশ বছরের বেশি না হওয়া সত্ত্বেও চুল সব কাঁচাপাকা হয়ে গিয়েছিল, কোমর পড়েছিল ঝুঁকে। কাশি তকে জব্দ করে ফেলেছিল, তাকে দেখলে দয়া হত। অথচ খেতের কাজ হল পরিশ্রমের কাজ। সে পরিশ্রম করার উপায় তার ছিল না। কাজেই ভালো ফসল কোথা থেকে আসবে? কিছু ঋণও হয়ে গিয়েছিল, সেই চিন্তা তাকে আরো শেষ করে ফেলছিল। সে চাইত যদি একটু বিশ্রাম মেলে! এত দিনের নিরন্তর পরিশ্রমের পর যদি এখন মাথার বোঝা একটু হালকা হয়। কিন্তু মুলিয়ার স্বার্থপরতা, তার অদূরদর্শিতা ঢেউ-খেলানো স্রোতকে উজাড় করে দিয়েছিল। সবাই যদি এক সঙ্গে থাকত তাহলে হয়তো সে এতদিনে পেনশন পেয়ে যেত, আরাম করে দরজায় বসে হুঁকো টানত। ভাই কাজ করত, সে পরামর্শ দিত। মাতব্বর হয়ে ঘুরে বেড়াত। কখনও কারুর ঝগড়া মিটিয়ে দিত কখনও বা সাধুসন্তদের সেবা করত। সে সুযোগ এখন হাতের বাইরে চলে গেছে। দিন দিন চিন্তা এখন বাড়ছে।

শেষ পর্যন্ত রঘুর ঘুসঘুসে জ্বর হতে আরম্ভ করল। মনের যন্ত্রণা, চিন্তা, কঠোর পরিশ্রম ও অভাবের এই হল ফল। প্রথম প্রথম কিছু পরোয়া করেনি সে। ভেবেছিল আপনা থেকেই ভালো হয়ে যাবে; কিন্তু দুর্বলতা যখন বাড়তে লাগল তখন ওষুধের কথা মনে হল। যে যা বলল তাই সে খেল। ডাক্তার-বেদ্যের কাছে যাবে সে সামর্থ্য কোথায়? আর সামর্থ্য হলেও টাকা খরচ ছাড়া আর কীই বা হত? ঘুসঘুসে জ্বরের ওষুধ হল বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য। তার না ছিল 'বসন্ত-মালতীর' মতো কোনো ওষুধ খাবার ক্ষমতা, না ছিল আরামে বসে বলবর্ধক ভোজন করার সুবিধা। দুর্বলতা বাড়তেই লাগল।

পান্নার সময় হলে সে এসে তাকে সান্ত্বনা দিত, তবে তার ছেলেদের সঙ্গে রঘুর কথাবার্তাও ছিল বন্ধ। ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা তো দূরের কথা, তার অবস্থা দেখে তার মজা করত — 'দাদা ভেবেছিল, আমাদের পৃথক করে দিয়ে সোনার তাল জমা করে যাবে। বউদিও ভাবত সোনার গয়নার শরীর ভরে রাখবে। এখন কে খবর নেয়? দগ্ধে দগ্ধে যদি না শেষ হয় তবে দেখব। বেশি 'হায়! হায়!'ও ভালো নয়। মানুষ ততটাই কাজ করবে যতটা তার পক্ষে সম্ভব। টাকার জন্য প্রাণই দিয়ে দিতে হবে, এটা ঠিক নয়।

পান্না বলত — রঘু বেচারার কী দোষ?

কেদার বলত — রাখ, আমি খুব বুঝি। দাদার জায়গায় আমি হলে লাঠি দিয়ে কথা বলতাম। মজা হল বউ নাকি জেদ ধরল। এসবই দাদার চাল, সবই আগে থেকে ঠিক করা।

শেষ পর্যন্ত রঘুর নিবু নিবু জীবন দীপ নিবে গেল। মৃত্যু সমস্ত চিন্তার অবসান করে দিল।

শেষ সময়ে সে কেদারকে ডেকে পাঠিয়েছিল। তবে কেদারের তখন আখ খেতে জল দেবার কথা। আসলে সে ভয় পেয়েছিল যদি না আবার ওষুধের জন্য পাঠায়। তাই অজুহাত দিয়েছিল।

আট

মুলিয়ার জীবন অন্ধকারময় হয়ে পড়ল। যে মাটিতে সে স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করেছিল তা নীচ থেকে ধসে পড়ল; যে খুঁটির জোরে সে নাচছিল তা উঠে এল। গ্রামের লোক বলতে শুরু করল, ভগবান

কেমন পাপের দণ্ড দিলেন। বেচারা লজ্জায় তার দুই ছেলেকে নিয়ে বসে কাঁদত। গ্রামের কাউকে মুখ দেখাবার সাহস তার ছিল না। প্রত্যেকেই যেন তাকে বলছে — অহংকারে মাটিতে পা রাখতিস না, শেষ পর্যন্ত শাস্তি পেলি তো! কী করে এখন তার সংসার চলে? সে কার সাহায্যে বেঁচে থাকবে? কার পরিশ্রমে চাষের কাজ হবে? বেচারা রঘু রোগগ্রস্ত ছিল, দুর্বল ছিল; কিন্তু জীবিত যতদিন ছিল ততদিন সে তার কাজটা করে যেত। দুর্বলতার জন্য সময় সময় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ত এবং একটু দম নিয়েই আবার হাত চালাত। ক্ষেতের ফসল তছনছ হয়ে যাচ্ছিল, কে সে সব সামলাবে? ফসল সব মাঠে পড়েছিল, আখ পড়ে পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল, সে একা আর কী করবে? আর সেচ দেওয়া তো একা মানুষের কাজ নয়। তিন জন করে মজুর সে কোথা থেকে আনবে? গ্রামে আর মজুর ছিলই বা কত! লোকের টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। সে যে কী করবে, আর কী না করবে — ভেবে পাগল হবার জোগাড়।

এইভাবে তেরো দিন পার হয়ে গেল। শ্রাদ্ধের কাজকর্ম শেষ হল। তারপর দিনই মুলিয়া দুই ছেলেকে কোলে নিয়ে খলিহানে ফসল মাড়াতে গেল। ওখানে গিয়ে একজনকে গাছের নরম ঘাসের বিছানায় শুইয়ে দিল আর অন্যজনকে বসিয়ে রেখেই ফসল মাড়াতে আরম্ভ করল। বলদ তাড়াতে তাড়াতে সে কাঁদতে লাগল। ভগবান কি এসবের জন্যই তার জন্ম দিয়েছিলেন? দেখতে দেখতে কী থেকে কী হয়ে গেল! গত বছরেও এই দিনে ফসল মাড়ানো হয়েছিল। সে রঘুর জন্য ঘটিতে করে শরবত ও মটরের ঘুঘনি নিয়ে গিয়েছিল। আজ তার আগে দাঁড়াবার কেউ নেই! তবে সে তো আর কারুর দাসী হয়ে নেই! পৃথক হয়ে গিয়েছিল বলে কোনো মনস্তাপ তার এখনও হল না।

হঠাৎ ছোটো ছেলের কান্না শুনে সে মুখ তুলে দেখল বড়ো ছেলে তাকে চুমু খেয়ে বলছে — বাই, তুপ্ কর, তুপ্ কর। আস্তে আস্তে তার মুখে হাত বুলাতে বুলাতে তাকে বারবার সে চুপ করতে বলছিল। যখন ছেলে থামল না তখন সে নিজে তার পাশে শুয়ে পড়ে তাকে বুকে নিয়ে আদর করতে লাগল। তাতেও যখন সফল হল না তখন সে কাঁদতে লাগল।

সেই সময় পান্না ছুটে এসে ছোটো ছেলেকে কোলে তুলে আদর করতে করতে বলল — বাচ্চাদের আমার কাছে রেখে এলে না কেন, বউ? হায়! হায়! বেচারা মাটিতে পড়ে কাঁদছে। আমি যখন মরব তখন যা খুশি করবে, এখনও তো বেঁচে আছি। আমরা পৃথক হলেও বাচ্চারা তো আর পৃথক হয়নি।

মুলিয়া বলল — তোমারও তো অবসর ছিল না, মা। তুমি কী করবে?

পান্না — তা এখানে আসার জন্য তোমার কী এত তাড়া ছিল। ফসল কি মাড়ানো যেত না? তিন-তিনটে ছেলে তো আছে, আর কখন তারা কাজে লাগবে? কেদার তো কালই ফসল মাড়াবার কথা বলেছিল, তা, আমি বললাম, আগে আখের খেতে জল দে পরে ফসল মাড়াবি। দশ দিন বাদেও মাড়াই করা যাবে, আখে জল না দিলে আখ শুকিয়ে যাবে। কাল থেকে জল দিতে শুরু করেছে, পরশু পর্যন্ত জল দেওয়া শেষ হবে। তারপর মাড়াই করতে পারব। বললে তোমার বিশ্বাস হবে না, তবে রঘু মারা যাবার পর থেকেই কেদারের চিন্তা হয়েছে। দিনের মধ্যে কতবার জিজ্ঞেস করছে বউদি খুব কাঁদছে না তো? দেখো, বাচ্চারা না খেয়ে থাকে না যেন। যখন কোনো

বাচ্চা কাঁদে তখনই দৌড়ে এসে বলে, দেখ মা কী হল, বাচ্চা কাঁদে কেন? কাল কেঁদে বলেছে, মা, আমি কি জানতাম যে, দাদা এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে, তা হলে তার কিছু সেবা করতে পারতাম। আগে কত দেরি করে করে ঘুম থেকে উঠত, এখন দেখছি এক প্রহর রাত থাকতেই উঠে কাজে লেগে যাচ্ছে। খুন্নু কাল একবার বলেছিল, প্রথমে আমাদের খেতে জল দিয়ে পরে দাদার খেতে দেব। তাতে তার উপর কেদার এত রাগ করেছিল যে, খুন্নু আর কথা বলতে পারেনি। সে তাকে বলল — কী তোর আখ আর তার আখ করছিস? দাদ না দেখলে এত দিনে হয় আমরা মরে যেতাম নয়তো কোথাও ভিক্ষে মেগে ফিরতাম। আজ তুই বড়ো আখওলা হয়ে গেছিস! এটা তারই পুণ্যের ফল যে, আমরা মানুষের মতো বেঁচে আছি। পরশু রুটি খাবার জন্যে ডাকতে গিয়ে দেখি মাড়াইয়ের ওপর বসে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন কাঁদছিস? সে বলল, মা, দাদা এই পৃথক হবার দুঃখেই মরে গেল, তা না হলে তার বয়স আর কী হয়েছিল! একথা তো আগে বুঝিনি, বুঝলে কি আর এরকম করতাম?

একথা বলে পান্না মুলিয়ার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল — তোমাকে সে পৃথক থাকতে দেবে না, বউ। বলছে, দাদা আমাদের জন্যেই তো মরেছে! আমিও তার ছেলেপুলের জন্যই মরব।

মুলিয়ার চোখ জলে ভরে এল। পান্নার কথায় আজ ছিল সত্যিকার বেদনা, যথার্থ সান্ত্বনা আর প্রকৃত শুভচিন্তা। মুলিয়ার মন তার প্রতি কোনো দিন এত আকর্ষণ অনুভব করেনি। যার প্রতি ছিল তার তাচ্ছিল্য ও অপকারের মনোবৃত্তি সেই আজ এত দয়ালু। এত হিতৈষী।

আজ এই প্রথম মুলিয়া তার নিজের স্বার্থপরতার জন্য লজ্জিত হল। এই প্রথম তার মন তার সংকীর্ণতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিল।

এরপর পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে। পান্না আজ বুড়ি। কেদার বাড়ির কর্তা, মুলিয়া বাড়ির কর্ত্রী। খুন্নু ও লছমনের বিয়ে হয়ে গেছে; কিন্তু কেদার আজও অবিবাহিত। সে বলল — আমি বিয়ে করব না। কত জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছে, কত কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু সে 'হাঁ' বলেনি। পান্না বুঝিয়েছে, কত জাল ফেলেছে, কিন্তু সে ধরা দেয়নি। সে বলে — মেয়েদের নিয়ে কোন সুখ? বউ ঘরে এলে তো লোকের স্বভাব পালটে যায়। তারপর যা কিছু সব বউ। মা-বাবা, ভাই-বন্ধু সব তখন পর। দাদার মতো লোকেরও যখন স্বভাব বদলে যায় তখন আর অন্যের কথা কী বলব? দুই ছেলে তো ভগবান দিয়েছেন আর কী চাই। বিয়ে না করেই তো দুই ছেলে পাওয়া গেছে। এর থেকে আর বেশি কী হবে! এদের নিজের মনে করলে নিজের, পরের মনে করলে পরের!

পান্না একদিন বলল — তোর বংশরক্ষা হবে কী করে?

কেদার — আমার বংশই তো চলছে। দুই ছেলেকে তো নিজেরই মনে করি।

পান্না — মনে করলেও পর। তুই কি মুলিয়াকেও তোর বউ মনে করতে পারবি?

কেদার লাফিয়ে উঠে বলল — তুমি কী যা-তা বলছ মা!

পান্না — যা-তা কেন হবে? তোর বউদিই তো।

কেদার — আমার মতো কাঠ-গোঁয়ারকে কেন সে পাত্তা দেবে?

পান্না — তুই রাজি থাকলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করব।

কেদার — না মা, হয়তো কান্নাকাটি শুরু করবে।

পান্না — তোর আপত্তি না হলে আমি কথায় কথায় তার মনের ইচ্ছা জেনে নেব।

কেদার — আমি কিছু জানি না। যা ভালো বোঝ করো।

পান্না কেদারের মনের কথা বুঝতে পারল। ছেলের মন মুলিয়ার দিকে ঝুঁকেছে, তবে ভয় আর সংকোচের জন্য কিছু বলছে না।

সেইদিনই পান্না মুলিয়াকে বলল — কী করব, বউ, মনের ইচ্ছা মনেই থেকে যাচ্ছে। কেদারকে সংসারী করতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

মুলিয়া — সে তো সংসার করতেই চাইছে না।

পান্না — সে বলছে, যদি এরকম মেয়ে পাওয়া যায় যে ঘরে মিলেমিশে থাকবে তাহলে করতে পারি।

মুলিয়া — এরকম মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে? খুঁজে দ্যাখো।

পান্না — আমার তো খোঁজা হয়ে গেছে।

মুলিয়া — সত্যি? কোথাকার মেয়ে?

পান্না — এখন বলব না। মোদ্দা কথা এই জানি যে, যদি তার সঙ্গে কেদারের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয় তাহলেই কেদারের সংসার হবে আর তার জীবন সফল হবে। কে জানে মেয়ে মানবে কী না।

মুলিয়া — মানবে না কেন, মা? এত ভালো, উপার্জনশীল, ভদ্র ছেলে আর কোথায় পাওয়া যাবে? আগের জন্মে বোধ হয় কোনো সাধু-মহাত্মা ছিলেন তা না হলে ঝগড়াঝাঁটির ভয়ে কে আর সংসারী হতে চায় না? মেয়ে কোথায় থাকে? আমি তাকে বলে রাজি করাব।

পান্না — তুমি যদি চাও তবে তাকে রাজি করাও। তোমার ওপরেই সব।

মুলিয়া — আমি আজই যাব, মা। তার পায়ে ধরে তাকে রাজি করাব।

পান্না — তার নাম বলব? সে তো তুমি!

মুলিয়া লজ্জিত হয়ে বলল — তুমি এসব কী যা-তা বলছ, মা!

পান্না — যা-তা হবে কেন? তোমার দেবরই তো?

মুলিয়া — আমার মতো বুড়িকে সে কেন নেবে?

পান্না — সে তো তোমার কথা মনে করেই বসে আছে। তুমি ছাড়া আর কাউকেই সে নেবে না। ভয়ে বলছে না, তবে তার মনের কথা আমি জানি।

বৈধব্যের শোকে মুহ্যমান মুলিয়ার বিবর্ণ মুখমণ্ডল পদ্মের মতো রক্তিম হয়ে উঠল। গত দশ বছরে সে যা হারিয়েছিল মনে হল আজ এক মুহূর্তে সে সব সুদে-আসলে ফিরে পেয়েছে — সেই লাবণ্য, সেই আভা, সেই আকর্ষণ, সেই চালচলন।

(অলোগ্যঝা / ১৯২৯)

অনুবাদ অমলকুমার রায়

ঘাসউলি

সবুজ ঘাসের বোঝা নিয়ে মুলিয়া যখন এল, তখন ওর বাদামি রঙের মুখখানায় উত্তেজনার আভা, ডাগর ডাগর মদির চোখ দুটি আশঙ্কায় ভরা। ওর থমথমে মুখ দেখে মহাবীর জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে মুলিয়া, মন-মেজাজ কেমন আজ?

মুলিয়া কোনোও উত্তর দেয় না। চোখ দুটো ওর ছল ছল করে ওঠে। কাছে এসে মহাবীর জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, কথা বলছিস না কেন? কেউ কি কিছু বলেছে? মা বকেছে, এত মনমরা কেন?

মুলিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, কিছু না, কী হবে বেশ তো আছি?

মুলিয়ার মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে মহাবীর বলে, চুপচাপ কাঁদবি, না কিছু বলবি?

কথা এড়িয়ে গিয়ে মুলিয়া বলে, কিছু হলে তো, কী বলব?

এই উষর ভূমিতে মুলিয়া যেন একটি গোলাপ ফুল। বাদামি রঙ, হরিণীর মত দুটি চোখ, নীচের দিকে টানা চিবুক, কপোলে ঈষৎ লালিমা, বড়ো বড়ো টানা টানা চোখের পলক, চোখে এক অদ্ভুত আর্দ্রতা যার মধ্য দিয়ে একটা সুস্পষ্ট বেদনা, একটা মূক ব্যথা প্রকাশ পাচ্ছে। জানি না চামারের ঘরে এই অপ্সরাটি কোথা থেকে এসেছে। ফুলের মতন কোমল ওর অঙ্গটি কি ঘাসের টুকরি মাথায় নিয়ে বেচতে যাওয়ার যোগ্য? এ গাঁয়েতেই এমন লোক আছে যারা ওর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে চায়। ওর চোখের একটা চাউনি জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করে! ও একটা কথা বললে কৃতার্থ হয়ে যায়। কিন্তু মুলিয়া এ গাঁয় এসেছে আজ এক বছরের ওপর হয়ে গেল, কেউ ওকে জোয়ান ছেলেছোকরাদের দিকে তাকাতে কিংবা কথা বলতে দেখেনি। ও যখন ঘাস নিয়ে বেরোয়, মনে হয় যেন সোনালি আভায় রঞ্জিত উষার আলো আপন ছটা বিকিরণ করতে করতে চলেছে। কেউ গজল গায়, কেউ বা হা-হুতাশ করে, সে কিন্তু চোখ নামিয়ে আপন পথে হেঁটে যায়। লোক অবাক হয়ে বলাবলি করে, এত দেমাক! মহাবীরের মধ্যে এমন কী গুণ আছে! এমন কিছু আহামরি জোয়ানমদ্দ নয়, কী জানি, মেয়েটা কী করে ওর ঘর করে!

তবে আজ এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে, যা এদের জাতের আর সব যুবতী মেয়েদের কাছে গোপনীয় খবর হলেও মুলিয়ার কাছে বক্ষশূল। সকাল বেলা, আমের মুকুলের গন্ধে মাতাল হাওয়া, আকাশ থেকে মাটির বুকে সোনা ঝরে পড়ছিল। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে মুলিয়া যাচ্ছিল ঘাস তুলতে। পাকা গমের মতো ওর রঙটা সকালের সোনালি আলোয় খাঁটি সোনার মতো ঝলমল করছিল। আচমকা যুবক চৈনসিংহকে সামনে থেকে আসতে দেখা গেল। মুলিয়া

চেয়েছিল পাশ কাটিয়ে চলে যেতে, কিন্তু চৈনসিংহ ওর হাতখানা ধরে ফেলে বলেছিল, মুলিয়া আমার ওপর কি তোর একটুও দয়া হয় না?

মুলিয়ার ফুলের মতো হাসিমুখখানি আগুনের মতো লাল হয়ে উঠেছিল। মোটেই ভয় পায়নি সে, একটুও সংকোচ করেনি, ঝুড়িটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলেছিল, ছেড়ে দাও আমাকে, নইলে চ্যাঁচাচ্ছি আমি।

জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা চৈনসিংহের। উঁচু জাতের মানুষের হাতের পুতুল হওয়া ছাড়া নিচু জাতের মধ্যে রূপমাধুরীর আর কাজই বা কী! অমন কতই না নিশানা সে জিতেছে, কিন্তু আজ মুলিয়ার মুখের রং, ওর ক্রোধ, ওর তেজ দেখে চৈনসিংহ একেবারে থ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেয়ে মুলিয়ার হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল। মুলিয়া ত্বরিতপদে চলে গিয়েছিল।

সংঘর্ষের উত্তেজনাতে আঘাতের বেদনাটা সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া যায় না, পরে ব্যথা হতে থাকে। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর রাগে, ভয়ে আর আপন অসহায় অবস্থার কথা ভেবে মুলিয়ার চোখে জল এসে পড়ল। নিজেকে সে কিছুক্ষণ সংযত করে রেখেছিল, তারপরই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। ও যদি এতটা গরিব না হত, তবে এভাবে ওকে অপমান করার সাধ্য কার ছিল। কাঁদতে কাঁদতে ঘাস কাটছিল ও। মহাবীরের রাগের কথা ও জানে। মহাবীরকে যদি এসব বলে দেয় তাহলে এই ঠাকুরের ওপর তার খুন চেপে যাবে। তারপর কী জানি কী হবে! এ কথা মনে হতেই ওর গায়ে কাঁটা দেয়। তাই সে মহাবীরের প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না।

দুই

পরদিন মুলিয়া ঘাস তুলতে গেল না। শাশুড়ি জিজ্ঞেস করে, তুই যাচ্ছিস না কেন, আর সবাই তো চলে গেছে?

মাথা হেঁট করে মুলিয়া বলে, আমি একা যাব না।

শাশুড়ি রেগে বলল, একা গেলে কি তোকে বাঘে খেয়ে নেবে?

আরও মাথা হেঁট করে মিনমিন করে মুলিয়া বলে, সবাই আমাকে জ্বালাতন করে।

শাশুড়ি মুখঝামটা দেয়, আর কারুর সঙ্গেও যাবি না, একাও যাবি না, তাহলে তুই যাবিটা কী ভাবে? সোজাসুজি একথা কেন বলছিস না যে, আমি যাব না? আমার বাড়িতে তাহলে রানি সেজে থাকা চলবে না। শুধু রূপ দিয়ে কী হবে, কাজও চাই। জানি তুই খুব রূপসি, তা আমি কি তোর রূপ ধুয়ে জল খাব? নে ঝুড়ি নে, ঘাস তুলে আন।

বাড়ির দরজায় নিমগাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে মহাবীর ঘোড়াকে দলাই-মলাই করছে। কাঁদো কাঁদো মুখে মুলিয়াকে যেতে দেখে সে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সাধ্যে কুলোলে মুলিয়াকে ও বুকে করে রাখত, চোখের মণির মধ্যে লুকিয়ে রাখত; কিন্তু ঘোড়ার পেট ভরানোও যে দরকার। ঘাস কিনে খাওয়াতে গেলে বারো আনা রোজের কম পড়বে না। এমনিতে মজুরিই বা আর কত জোটে! বড়ো জোর দেড়-দুটাকা মেলে। তাও কখনও মেলে কখনও মেলে না। যেদিন থেকে এই সর্বনাশা বাসগুলো চলতে শুরু করেছে, এক্কাওয়ালাদের বারোটা বেজে গেছে। কেউ মাগনাতেও

পৌঁছে না। মহাজনের কাছ থেকে দেড়শো টাকা ধার করে এক্কা আর ঘোড়া কিনেছিল, কিন্তু বাস থাকতে এক্কাকে কে পৌঁছে? মহাজনের সুদই কুলিয়ে উঠছে না, আসল তো দূরের কথা।

মহাবীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে, ইচ্ছে না করলে যেয়ো না, থাক, দেখা যাবে খন।

এই সহানুভূতিটুকুতেই মুলিয়া কৃতার্থ হয়ে যায়। বলে, ঘোড়া খাবে কী?

কালকের রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে মুলিয়া আজ জমির আল ধরে ধরে যাচ্ছে। বারে বারে সতর্ক চোখে এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখছে। দুপাশেই আখের খেত। একটুখানি খর খর শব্দ হলেই ওর মনটা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ওঠে। আখখেতের ভেতর কেউ আবার লুকিয়ে বসে নেই তো! কিন্তু কই, নতুন কোনও ঘটনা তো ঘটে না। আখের খেতগুলো পেরিয়ে যায়, আমের বাগান ছাড়িয়ে যায়, সেচ দেওয়া খেতগুলো নজরে পড়ে। দূরে কুয়োতে দুনি চলছে। খেতগুলোর আল সবুজ সবুজ ঘাসে ভরে রয়েছে। মুলিয়ার মনে লোভ জাগে। এখানে আধ ঘন্টায় যতটা ঘাস কাটতে পারবে, শুকনো মাঠে দুপুর অবধিও ততটা কাটতে পারবে না। কেই বা এখানে দেখছে? কেউ হাঁক দিলে চলে যাবে। বসে বসে ঘাস কাটতে শুরু করে সে, আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে ওর ঝুড়িটা অর্ধেকেরও বেশি ভরে ওঠে। আপন কাজে সে এত তন্ময় যে চৈনসিংহের আসাটা টেরই পায় না। হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে মাথা তুলে দেখে চৈনসিংহ দাঁড়িয়ে।

মুলিয়ার বুকটা ধক করে ওঠে। একবার ভাবে পালিয়ে যায়, ঝুড়ি উলটে দিয়ে খালি ঝুড়ি নিয়ে চলে যায়। কিন্তু চৈনসিংহ কয়েক গজ দূরেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, ভয় পাস নে, ভয় পাস নে। ভগবান জানেন আমি তোকে কিছু বলব না। যত ইচ্ছে ঘাস তুলে নে, এ জমি আমারই।

মুলিয়ার হাত দুটো অবশ হয়ে যায়, খুরপিটা যেন হাতে আটকে যায়, ঘাস চোখেই পড়ে না। মন চায়, মাটি যেন দু ফাঁক হয়ে যায় আর সে তাতে ঢুকে পড়ে। চোখের সামনে খেতগুলো দুলতে থাকে।

চৈনসিংহ আশ্বাস দিয়ে বলে, ঘাস কাটছিস না কেন? আমি তো তোকে মোটেই কিছু বলছি না। রোজই এখানে চলে আসিস, আমি ঘাস কেটে দেব।

চিত্রপুত্তলিকার মতো মুলিয়া বসে থাকে।

আরও এক পা এগিয়ে এসে চৈনসিংহ বলে, আমাকে তুই এত ভয় করিস কেন? তুই কি ভাবছিস আমি আজও তোকে জ্বালাতন করতে এসেছি? ঈশ্বর জানেন কালও তোকে জ্বালাতন করার জন্য তোর হাত ধরিনি। তোকে দেখে আপনা থেকেই হাতখানা এগিয়ে গিয়েছিল। আমার কোনও হুঁশই ছিল না। তুই চলে গেলি, তারপর আমি ওখানেই বসে বসে কয়েক ঘন্টা ধরে কেঁদেছি। ইচ্ছে হচ্ছিল, হাতটা কেটে ফেলি। কখনও মনে হচ্ছিল, বিষ খেয়ে নি। সেই থেকে তোকে খুঁজছি। তুই আজ এ রাস্তা দিয়ে এসেছিস। আমি সারাটা পথ খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছি। এখন তোর যেমন খুশি সাজা দে। আমার মাথাটাও যদি কেটে নিস আমি ঘাড় নাড়াব না। গুন্ডা ছিলাম, লুচ্চা ছিলাম, কিন্তু যেদিন থেকে তোকে দেখেছি, আমার মনের সমস্ত ময়লা দূর হয়ে গেছে। এখন তো এটাই মন চাইছে — আমি যদি তোর কুকুর হতে পারতাম তাহলে তোর পিছু পিছু চলতে পারতাম; তোর ঘোড়া যদি হতাম, তাহলে তো তুই নিজের হাতে আমার সামনে ঘাস

দিতি। আমার মনের সবচেয়ে বড়ো সাধ — কোনও ভাবে যদি এ দেহটা তোর কাজে লাগত। মনে যদি কোনো কুমতলব নিয়ে আমি এসব কথা বলি তাহলে আমার যৌবন যেন উচ্ছন্নে যায়। বড়ো ভাগ্যবান মহাবীর, তাই এমন দেবী সে পেয়েছে।

মুলিয়া চুপচাপ শুনে যায়, তারপর মাথা হেঁট করে সরল মনে জিজ্ঞেস করে, তা তুমি আমাকে কী করতে বল?

চৈনসিংহ আরও ঘনিয়ে এসে বলে, আমি শুধু তোর দয়া চাই।

মাথা তুলে মুলিয়া ওর দিকে তাকায়। লজ্জাশরম না জানি ওর কোথায় উবে যায়। কাটা কাটা কথায় বলে, তোমাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো? তোমার বে-থা হয়ে গেছে, না হয় নি? মৃদুকণ্ঠে চৈনসিংহ বলে, বিয়ে তো হয়ে গেছে; কিন্তু সেটা বিয়ে কোথায়, খেলা।

মুলিয়ার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে ওঠে, বলে, তবু আমার মরদ যদি তোমার বউয়ের সঙ্গে এভাবে কথা বলত, তাহলে তোমার কেমন লাগত? তুমি ওর গর্দান নিতে যেতে কিনা, বলো?কী ভাবছ, মহাবীর চামার, তাই ওর গায়ে রক্ত নেই, ওর লজ্জা নেই, ইজ্জতের ভাবনা নেই, না? আমার রূপ-রং তোমার ভালো লাগে। ঘাটের কাছে কি আমার চেয়েও সুন্দরী মেয়েরা ঘোরাফেরা করে না? আমি তো ওদের নখের যুগ্যিও নই। ওদের কারুর কাছে কেন তুমি দয়া ভিক্ষে চাও না? ওদের কাছে কি দয়া নেই? তুমি কিন্তু ওখানে যাবে না, কারণ ওখানে যেতে তোমার বুক কাঁপে। আমার কাছে দয়া চাইছ, সে তো এজন্য যে আমি চামারনি, নিচু জাত আর নিচু জাতের মেয়েছেলেগুলো একটুখানি ধমকধামক কিংবা একটুখানি লোভ দেখালেই তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। কত সস্তা সওদা! ঠাকুর (ক্ষত্রিয়, উঁচু জাত) যে, এত সস্তা সওদা কেন ছেড়ে দেবে?

চৈনসিংহ লজ্জা পেয়ে বলে, মুলা, ব্যাপারটা তা নয়। আমি সত্যি করে বলছি, এর মধ্যে উঁচুনিচুর ব্যাপার নেই। সব মানুষই সমান। আমি তো তোর চরণে মাথা রাখতে রাজি।

মুলিয়া — সে তো এজন্যেই যে জানো, আমি কিছু করতে পারব না। গিয়ে কোনও ক্ষত্রানির চরণে মাথাটা রাখো তো, তাহলে টেরটি পাবে যে চরণে মাথা রাখবার কী ফল মেলে! তারপর তোমার ওই মাথাটা আর ঘাড়ে থাকবে না।

চৈনসিংহ লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে। মুখখানা এমন শুকিয়ে গেছে যেন মাসের পর মাস অসুখে ভুগে উঠেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। মুলিয়া যে এত বাক্‌পটু, তা তার মোটেই জানা ছিল না।

মুলিয়া আবার বলে, আমিও রোজ হাটেবাজারে যাই। বড়ো বড়ো ঘরের হালচাল জানি। এমন একটা বড়ো ঘরের নাম বলো তো যে ঘরে কোনও সইস, কোনও কোচোয়ান, কোনও চাকর, কোনও পাণ্ডা, কিংবা কোনও পাচক বামুন ঢুকে না বসে আছে। এ সবই বড়ো ঘরের লীলা। আর ওসব মেয়েমানুষগুলোও যা করে, ঠিকই করে। ওদের পুরুষ মানুষগুলোও যে চামারনি কাহারনির জন্য পরান দিয়ে ফেরে। দেওয়ানেওয়া সমান সমান হয়ে যায়। বেচারা গরিব গুরবোদের ঘরে এসব ব্যাপার কোথায়? আমার মরদের কাছে দুনিয়াতে যা কিছু বলতে সে শুধু আমি। আর

কোনও বউ-ঝিয়ের দিকে সে চোখ তুলেও তাকায় না। দৈবগতিকে আমি একটু সুন্দরী, তবে আমি যদি কালোকুচ্ছিতও হতাম, ও আমাকে এমনি করেই রাখত, এ বিশ্বাস আমার আছে। চামারের মেয়ে হয়েও এতটা নীচ আমি নই যে, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব। হ্যাঁ, ও যদি যা খুশি তা করতে শুরু করে, আমার বুকে বাঁশ ডলে, তাহলে আমিও ওর বুকে বাঁশ ডলে দেব। তুমি আমার রূপেতেই পাগল, তাই না? আজ যদি আমার মায়ের দয়া হয়, আমি যদি কানি হয়ে যাই, তাহলে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। বলো, মিথ্যে বলছি কিনা?

চৈনসিংহ অস্বীকার করতে পারে না।

মুলিয়া একই রকম তেজালো গলায় বলে, কিন্তু আমার একটা কেন দুটো চোখও যদি গলে যায়, তবুও সে একই ভাবে আমাকে রাখবে। আমাকে ওঠাবে, বসাবে, খাওয়াবে। তুমি কি চাও, এমন লোকের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি? যাও, আর কোনো দিন আমাকে জ্বালাতন কোরো না, তাহলে ভালো হবে না।

তিন

উদ্দীপনা, শক্তি, দয়া, সাহস, আত্মবিশ্বাস, গৌরব এবং যে সব জিনিস জীবনকে পবিত্র, উজ্জ্বল এবং পূর্ণ করে তোলে তার নাম হল যৌবন। অহংকার, নির্দয়তা, স্বার্থ, দম্ভ, বিষয়বাসনা কটুতা এবং যে সব জিনিস জীবনকে পশুত্ব, বিকৃতি এবং পতনের দিকে নিয়ে যায় তা হল যৌবনের উন্মাদনা। চৈনসিংহের মধ্যে ছিল যৌবনের উন্মাদনা। উথলে ওঠা চিনির শিরায় জলের ছিটে পড়লে ফেনা যেমন মিলিয়ে যায়, গাদ কেটে যায় আর পরিষ্কার বিশুদ্ধ রস বেরিয়ে আসে মুলিয়ার কথায় চৈনসিংহের সে উন্মাদনা ছুটে গেল। যৌবনের উন্মাদনা কেটে যায় চৈনসিংহের, থেকে যায় যৌবন। কামিনীর কথা যত সহজে ধর্ম এবং বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে দিতে পারে, তত সহজেই আবার তাকে উদ্ধারও করতে পারে।

সেদিন থেকে চৈনসিংহ আরেক মানুষ হয়ে ওঠে। রাগ জ া চৈনসিংহের নাকের ডগায় থাকত। কথায় কথায় মজুরদের গালি দেওয়া, ধমকানো, মারধোর করা ওর স্বভাব ছিল। প্রজারা ওকে দেখলে থরহরি কাঁপত। মজুররা ওকে আসতে দেখলে কাজে তৎপর হয়ে উঠত। কিন্তু সে পেছন ফিরতেই তারা তামাক খেতে শুরু করত। সবাই মনে মনে ওকে হিংসে করত। ওকে গালাগালি দিত, কিন্তু সেদিন থেকে চৈনসিংহ এত দয়ালু, গম্ভীর, এত ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে যে লোকে অবাক হয়ে যায়।

কয়েকদিন কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা চৈনসিংহ খেত দেখতে যায়। কুয়োতে দুনি চলছে। গিয়ে দেখে এক জায়গায় নালি ভেঙে গিয়ে সমস্ত জল বেরিয়ে যাচ্ছে। কেয়ারিতে মোটেই জল যাচ্ছে না, ওদিকে কেয়ারি দেখাশোনা করে যে বুড়িটা সে চুপচাপ বসে আছে। জল কেন আসছে না তা নিয়ে ওর মোটেই মাথাব্যথা নেই। আগে এমন অবস্থা দেখলে চৈনসিংহ জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলত। বুড়ির সেদিনের পুরো মজুরি কেটে নিত আর দুনি চালানো লোকগুলোর উপরও চোটপাট করত; কিন্তু আজ ওর রাগ হয় না। মাটি নিয়ে নালিতে বাঁধ দেয় তারপর খেতে গিয়ে বুড়িকে বলে — তুই এখানে বসে আছিস আর ওদিকে জল সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

বুড়ি ঘাবড়ে গিয়ে বলে — এখনই হয়তো খুলে গিয়ে থাকবে রাজাবাবু! আমি এখুনিই গিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছি।

বলে সে থরথর করে কাঁপতে থাকে। চৈনসিংহ ওকে আশ্বস্ত করে বলে — যাসনে, যাসনে, নালি আমি বন্ধ করে দিয়েছি। বুড়োকে কদিন দেখছি না, কোথাও কাজে যাচ্ছে না কি?

বুড়ি গদগদ হয়ে বলে — আজকাল তো বেকার বসে আছে দাদাবাবু, কোথাও কাজ পাচ্ছে না।

চৈনসিংহ নরম গলায় বলে — তাহলে আমাদের এখানে লাগিয়ে দে। অল্প একটু শণ আছে, ওগুলো পাকিয়ে দড়ি বানিয়ে দিক।

বলেতে বলতে সে কুয়োর দিকে যায়। ওখানে চারটে দুনি চলছে; কিন্তু এখন মজুরদের দুজন কুল খেতে গেছে। চৈনসিংহকে দেখেই মজুরদের আক্কেল গুড়ুম। ঠাকুর সাহেব যদি জিজ্ঞেস করেন, দুজন কোথায় গেছে, তাহলে কী জবাব দেব? সব্বাই দাবড়ানি খাবে। বেচারারা মনে মনে ভয়ে পাচ্ছে। চৈনসিংহ জিজ্ঞেস করে — ওরা দুজন কোথায় গেছে?

কারও মুখ দিয়ে রা-টি বেরোয় না। হঠাৎ সামনে থেকে মজুর দুজনকে ধুতির খুঁটে করে কুল ভরে নিয়ে আসতে দেখা যায়। খুশিখুশি মনে কথা বলতে বলতে আসছে। চৈনসিংহের দিকে নজর পড়তেই দুজনের প্রাণ শুকিয়ে যায়। পা দুটো যেন মনখানেক ভারি হয়ে ওঠে। এখন না পারে আসতে, না পারে ফিরে যেতে। দুজনেই বুঝে ফেলে যে আজ ধমক খাবে, হয়ত মজুরিও কাটা যাবে। চলার গতি মন্দ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে চৈনসিংহ ডাকে — এসো এসো! কেমন কুল দেখি, দাও তো, আমাকেও কটা দাও, আমার গাছেরই তো, তাই না?

দুজনে আরও ভয় পেয়ে যায়। আজ কর্তাবাবু জ্যান্ত রাখবেন না। কেমন মিষ্টি মিষ্টি করে বলছেন। তেমনি আচ্ছা করে দেবেন। দুই বেচারা আরও কুঁকড়ে যায়। চৈনসিংহ আবার বলে — তাড়াতাড়ি করে এসো রে বাবা, পাকাপাকাগুলো সব আমি নেব। একজন একছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে একটু নুন নিয়ে এসো তো। (বাকি দুজনকে) তোমরা দুজনও এসে পড়। ওই গাছটার কুল মিষ্টি হয়ে থাকে। কুল খেয়ে নাও, কাজ তো আছেই।

কাজ-পালানো লোক দুটো এবারে ভরসা পায়। ওরা এসে সব কুল চৈনসিংহের সামনে ঢেলে দেয় আর পাকাপাকা কুলগুলো বেছে বেছে তাকে দিতে থাকে। একজন নুন আনতে ছোটে। আধ ঘন্টা চারটে দুনিই বন্ধ থাকে। সব কুল সাবাড় হয়ে গেলে ঠাকুরসাহেব যখন যাবার জন্য ওঠেন, তখন অপরাধী দুজন জোড়হাত করে বলে — আজকের দিনটা মাপ করে দিন। বড্ড খিদে পেয়েছিল নইলে কিছুতেই যেতাম না।

চৈনসিংহ নরম হয়ে বলে — তা এতে দোষ কী হয়েছে? আমিও তো কুল খেয়েছি, এক-আধ ঘন্টা কাজের ক্ষতি হয়েছে, এই তো? তা তোমরা ইচ্ছে করলে এক ঘন্টার কাজ আধ ঘন্টায় করে দেবে। না করতে চাইলে সারাদিনে এক ঘন্টার কাজও হবে না।

চৈনসিংহ চলে গেলে চারজনই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে।

একজন বলে — মালিক এমন হলে কাজ করতে মন লাগে। এমন নয় যে সব সময় বুকের ওপর চেপে বসে থাকবে।

দ্বিতীয় — আমি তো ভেবেছিলাম, আজ কাঁচাই খেয়ে ফেলবে।

তৃতীয় — কদিন ধরে দেখছি মেজাজ একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে।

চতুর্থ — সাঁঝবেলায় পুরো মজুরি যদি পাও তো বলো।

প্রথম — তুমি তো একটা গোবরগণেশ। মানুষ চেন না।

দ্বিতীয় — এবার খুব মন দিয়ে কাজ করব।

তৃতীয় — তা আর বলতে! উনি যখন আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমাদেরও ধর্ম হল দেখা যেন কোনো খুঁত না থাকে।

চতুর্থ — আমার তো ভাই ঠাকুরসাহেবের উপর এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

চার

একদিন কী কাজে চৈনসিংহের আদালতে যাবার দরকার ছিল। পাঁচ মাইল রাস্তা। এমনিতে তো সবসময় সে তার ঘোড়ায় চড়েই যেত; কিন্তু আজ রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, তাই ভাবে, এক্কায় করে চলে যাই। মহাবীরকে বলে পাঠায়, আমাকে নিয়ে যাস। নটা নাগাদ মহাবীর এসে ডাকে। চৈনসিংহ তৈরি হয়ে বসেছিল। চটপট এক্কায় গিয়ে বসে; কিন্তু ঘোড়াটা এত রোগাপটকা, এক্কার গদিটা এত ময়লা আর ছেঁড়া, সব জিনিস এত রদ্দি যে চৈনসিংহের তাতে বসতে লজ্জা হয়। জিজ্ঞেস করে — জিনিসপত্র কেন এত বিচ্ছিরি হয়ে আছে, মহাবীর? তোর ঘোড়াটা তো এতটা রোগা কোনও দিন ছিল না। আজকাল সওয়ারি কম নাকি?

মহাবীর বলে — না কর্তা, সওয়ারি কেন থাকবে না, তবে বাস থাকতে এক্কাকে কে পোঁছে? কোথায় দুই, আড়াই, তিন টাকা রোজগার করে বাড়ি আসতাম, আর কোথায় আজকাল পাঁচ সিকেও মেলে না। ঘোড়াকেই বা কী খাওয়াই, নিজেরাই বা কী খাই? বড়ো বিপদে পড়েছি। ভাবছি, এক্কা-ঘোড়া সব বেচেটেচে আপনাদের জনমজুরি খাটি; কিন্তু কোনও গাহক পাচ্ছি না। বেশি না হলেও অন্তত বারো আনা পয়সা তো ঘোড়ার চাই। তার উপর ঘাস। আজকাল নিজেদেরই পেট চলে না, ঘোড়াকে কে পোঁছে।

চৈনসিংহ ওর ছেঁড়া জামাটার দিকে তাকিয়ে বলে — দু-চার বিঘে জমি চাষবাস করিস না কেন?

মহাবীর মাথা হেঁট করে বলে — চাষ করতে অনেক ক্ষমতা থাকা দরকার। আমি তো এটাই ভেবে রেখেছি যে, কোনও গ্রাহক পেয়ে গেলে এক্কাটাকে কমেসমেই বেচে দেব; তারপর ঘাস কেটে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচব। আজকাল শাশুড়ি-বউ দুজনেই ঘাস তুলে আনে, তবে গিয়ে দশ-বারো আনা পয়সা কপালে জোটে।

চৈনসিংহ জিজ্ঞেস করে — বুড়ি বোধহয় ঘাস নিয়ে বাজারে যায়?

মহাবীর লজ্জা পেয়ে বলে — না দাদাবাবু, বুড়ি এতদূর কোথায় যেতে পারে? বউ নিয়ে যায়। দুপুর অবধি ঘাস কাটে, তারপর বাজারে যায়। ওখান থেকে সন্ধ্যায় ঘন্টাখানেক বাদে ফিরে আসে। নাকাল হয়ে পড়ে দাদাবাবু, কিন্তু কী করব, ভাগ্যের ওপর কীসের জোর।

চৈনসিংহ কাছারিতে গিয়ে পৌঁছায় আর মহাবীর সওয়ারির খোঁজে এদিকে ওদিকে এক্কাটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে শহরের দিকে যায়। চৈনসিংহ ওকে পাঁচটার সময় আসতে বলে দেয়।

প্রায় চারটে নাগাদ চৈনসিংহ কাছারির কাজ সেরে বাইরে আসে। কাছারির হাতায় পানের দোকান, আর একটুখানি এগিয়ে একটা ঘন বটগাছ। বটগাছের ছায়ায় কয়েক কুড়ি টাঙা, এক্কা, ফিটন দাঁড়িয়ে। ঘোড়াগুলো খুলে দেওয়া। উকিল, মোক্তার আর অফিসারদের গাড়িগুলো এখানে দাঁড়িয়ে। চৈনসিংহ জল খায়, পান খায় তারপর ভাবে একটা বাস পেয়ে গেলে একটু শহরে ঘুরে আসব। ঠিক তখনই ওর চোখ পড়ে এক ঘাসউলির উপর। সেজেগুজে, একখানি গোলাপি শাড়ি পরে কোচোয়ানদের সঙ্গে দরাদরি করছে। কয়েকজন কোচোয়ান এসে জড়ো হয়েছে। কেউ ওর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে; কেউ চোখ দিয়ে গিলছে, কেউ হাসাহাসি করছে।

কালোকেলো এক কোচোয়ান বলে — মুলা, ঘাস তো তোর বড়ো জোর ছ আনার।

মুলিয়া পাগল-করা চোখে তাকিয়ে বলে — ছ আনার নিতে হলে ওই যে সামনে ঘেসেড়ানি বসে রয়েছে, যাও দু-চার পয়সা কমেই পেয়ে যাবে, আমার ঘাস তো বারো আনাতেই বিকোবে।

আধবয়সি এক কোচোয়ান ফিটনের ওপর থেকে বলে — তোরই তো জমানা, বারো আনা কেন, এক টাকা হাঁক। যার নেবার বাধ্য হয়ে ঠিকই নেবে। বেরোতে দে উকিল বাবুদের। আর দেরি নেই।

গোলাপি পাগড়ি মাথায় এক টাঙাওয়ালা বলে — বুড়োর মুখেও জল এসে পড়ে, মুলিয়া কেন আর কারুর দিকে তাকাতে যাবে!

চৈনসিংহের এত রাগ হচ্ছে যে, ইচ্ছে করছে পাজি ব্যাটাদের জুতোপেটা করে। সবকটা ওর দিকে কী ভাবে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে যেন চোখ দিয়েই গিলে খাবে। আর মুলিয়াও এখানে কত হাসিখুশি! না আছে লজ্জাশরম, না সংকোচ, না ভয়ডর। কেমন হেসে হেসে, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে মাথার আঁচল খসিয়ে খসিয়ে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলছে। সেই মুলিয়া যে বাঘিনির মতো তড়পে উঠেছিল।

এর মধ্যে চারটে বেজে যায়। আমলা আর উকিল-মোক্তাররা বেরিয়ে আসে। যেন একটা মেলা লেগে গেল। আমলারা বাসের দিকে ছোটে, উকিল-মোক্তাররা ঐ গাড়িগুলোর দিকে যায়। কোচয়ানরাও চটপট ঘোড়া জোতে। কয়েকজন ভদ্রলোক মুলিয়াকে রসিক চোখে দেখে নিয়ে নিজেদের গাড়িতে গিয়ে বসে।

হঠাৎ মুলিয়া ঘাসের ঝুড়ি নিয়ে একটা ফিটনের পেছনে ছোটে। ফিটনে এক সাহেবি ফ্যাশনের অল্পবয়সি উকিল সাহেব বসে। পাদানির কাছে ঘাসগুলোকে উনি রাখিয়ে নেন, পকেট থেকে কিছু বের করে মুলিয়ার হাতে দেন। মুলিয়া মুচকি হাসে। দুজনের মধ্যে কিছু কথাও হয়। চৈনসিংহ তা শুনতে পায় না। পরক্ষণে মুলিয়া প্রসন্নমুখে বাড়ির দিকে রওনা হয়। চৈনসিংহ পানওয়ালার দোকানে আত্মবিস্মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পানওয়ালা দোকান গুটোয়, কাপড় পরে, তারপর তার কেবিনের দরজা বন্ধ করে যখন নীচে নামে, তখন চৈনসিংহের সমাধি টুটে যায়। জিজ্ঞেস করে— দোকান কি বন্ধ করে দিয়েছ?

পানওয়ালা সহানুভূতি ভরা গলায় বলে — এর চিকিচ্ছে করাও কর্তাবাবু, এ রোগ ভালো নয়।

চৈনসিংহ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে — কীসের রোগ?

পানওয়ালা বলে — কীসের রোগ! আধ ঘন্টা ধরে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ, যেন একটা মরা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সারা কাছারি খালি হয়ে গেল, সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল, মেথররা পর্যন্ত ঝাড়ু লাগিয়ে চলে গেল, তুমি কিছু টেরটি পেলে? এ খুব খারাপ ব্যামো, তাড়াতাড়ি চিকিচ্ছে করিয়ে নাও।

চৈনসিংহ ছড়িগাছি হাতে নিয়ে ফটকের দিকে এগোয় আর তখনই মহাবীরের একাটাকে সামনে থেকে আসতে দেখা যায়।

পাঁচ

খানিক দূর এক্কা এগিয়ে গেলে চৈনসিংহ জিজ্ঞেস করে — আজ কত পয়সা হল মহাবীর?

মহাবীর হেসে বলে — আজ তো কর্তা সারাটা দিন দাঁড়িয়েই কাটালাম। কেউ বেগার খাটতেও ডাকেনি। তার ওপর চার পয়সার বিড়ি খেয়ে ফেলেছি।

চৈনসিংহ একটু পরে বলে — আমার একটা পরামর্শ আছে। তুই আমার কাছ থেকে রোজ একটা করে টাকা নিস। ব্যস, শুধু আমি যেদিন ডাকব সেদিন এক্কা নিয়ে চলে আসিস। তাহলে তো তোর বউকে ঘাস নিয়ে বাজারে আসতে হবে না। বল, রাজি আছিস?

মহাবীর সজল চোখে তাকিয়ে বলে — কর্তা, আপনাদেরই তো খাচ্ছি। আপনার তালুকের প্রজা। যখন মরজি হবে, ধরে আনবেন। আপনার কাছ থেকে টাকা... ...

চৈনসিংহ বাধা দিয়ে বলে — না, আমি তোকে বেগার খাটাতে চাই না। তুই আমার কাছ থেকে একটা করে টাকা নিয়ে যাস। ঘাস নিয়ে বউকে আর বাজারে পাঠাস না। তোর ইজ্জত আমার ইজ্জত। আরও টাকাপয়সার যদি দরকার পড়ে, বিনা দ্বিধা চলে আসিস। হ্যাঁ, দেখিস, মুলিয়াকে ভুলেও এনিয়ে কোনোও কথা বলিস না। কী দরকার!

কয়েকদিন পরে সন্ধ্যার সময় মুলিয়া চৈনসিংহের সঙ্গে দেখা করে। চৈনসিংহ প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে বাড়ির দিকে হনহন করে ফিরছিল। এমন সময় ঠিক যেখানে সে মলিয়ার হাতখানা ধরেছিল, সেই একই জায়গায় মুলিয়ার ডাক তার কানে আসে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনে তাকিয়ে দেখে মুলিয়া ছুটতে ছুটতে আসছে। বলে — কী মুলিয়া! ছুটছ কেন? আমি তো দাঁড়িয়ে আছি।

মুলিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলে — কদিন ধরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। আজ তোমাকে আসতে দেখে ছুটলাম। আজকাল আমি ঘাস বেচতে যাই না।

চৈনসিংহ বলে — খুব ভালো কথা।

তুমি কি কোনো দিন আমাকে ঘাস বেচতে দেখেছিলে?

হ্যাঁ, একদিন দেখেছি। মহাবীর কি তোমাকে সব কিছু বলে দিয়েছে? আমি তো নিষেধ করে দিয়েছিলাম।

ও আমার কাছে কোনোও কথা লুকোয় না।

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কী বলবে কেউ ভেবে পায় না। হঠাৎ মুলিয়া হেসে বলে — এখানটায় তুমি আমার হাত ধরেছিলে।

চৈনসিংহ লজ্জিত হয়ে বলে — ওকথা ভুলে যাও, মুলা। আমার ঘাড়ে কি জানি কী ভূত চেপেছিল।

মুলিয়া গদ গদ কণ্ঠে বলে — কেন ভুলে যাব ওকথা? সেই হাতধরারই তো মান রাখছ। গরিব অবস্থা মানুষকে দিয়ে যা কিছু করায়। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।

দুজনেই চুপ করে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে মুলিয়া আবার বলে — তুমি হয়তো ভেবেছিলে আমি রং-তামাশায় মজে গিয়েছিলাম, তাই না?

চৈনসিংহ জোরগলায় বলে — না, মুলিয়া, এক মুহূর্তের জন্যও আমি সেকথা ভাবিনি।

মুলিয়া হেসে বলে — তোমার কাছ থেকে আমি এটাই আশা করেছিলাম আর আজও তাই আছে।

ভিজে খেতের ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে চলেছে, সূর্য রাতের কোলে বিশ্রাম করতে যাচ্ছে আর সেই ম্লান আলোকে মুলিয়ার অপসৃয়মান রেখাটিকে চৈনসিংহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখছে।

(ঘাসবালী / ১৯২৯) অনুবাদ ননী শূর

সুভাগি

এক

অন্য লোকদের বেলা যাই হোক না কেন, তুলসী মাহাতো ছেলে রামুর চেয়ে মেয়ে সুভাগিকে মনেপ্রাণে কম ভালোবাসে না। রামু জোয়ান হয়েও এখনও অকালকুষ্মান্ড। সুভাগি এগারো বছরের মেয়ে, কিন্তু ঘরের কাজে যেমন পাকাপোক্ত, চাষবাসের কাজেও তেমনি নিপুণ। ওর মা লছমির মনে সব সময়েই ভয়, মেয়ের ওপর দেবতাদের দৃষ্টি না পড়ে। ভালো ছেলেপিলেকে তো ভগবান নিজের কাছে টেনে নেন। কেউ যাতে সুভাগিকে না খোঁড়ে, সেজন্য সে তাকে উঠতে-বসতে বকাবকি করে। খুঁড়লে ছেলেপিলে বেচাল হয়ে যায়, সেভয় তো নয়—ভয় নজর পড়ার। সেই সুভাগি আজ এগারো বছর বয়সেই বিধবা হয়ে গেল।

ঘরে মড়াকান্না চলছে। লছমি আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। তুলসী মাথা চাপড়াচ্ছে। ওদের কাঁদতে দেখে সুভাগিও কাঁদছে। বারবার মাকে জিজ্ঞেস করে — কেন কাঁদছ মা? আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমরা কেন কাঁদছ? তার এই সরল শিশুর মতো কথা শুনে মায়ের প্রাণ আরও ফেটে যায়। সে ভাবে — ঈশ্বর, এই কি তোমার লীলা! অন্যকে দুঃখ দিয়ে তুমি নিজের খেলা খেলে থাকো! পাগলামি কর, তার কোনো শাস্তি নেই। এ কেমন খেলা যে তুমি হাস আর অন্যে কাঁদে! লোকে তোমায় দয়ালু বলে, এই কি তোমার দয়া!

আর সুভাগি কী ভাবছিল? তার যদি একঘর টাকা থাকত, তাহলে সবারই কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখত। তারপর একদিন চুপিচুপি বাজারে গিয়ে মায়ের জন্যে ভালো কাপড় কিনে আনত, বাবা ধার চাইলে চট করে টাকা বের করে দিত। বাপ-মা কত না খুশি হত।

দুই

সুভাগি যখন বড়ো হল, তখন লোকেরা তুলসী মাহাতোর ওপর চাপ দিতে লাগল — মেয়েকে কোথাও আবার ঘরসংসার করে দাও। যুবতী মেয়ের এভাবে থাকা ঠিক না। আমাদের সমাজে যখন এতে কোনো নিন্দে নেই, তখন এত ভাবনাচিন্তা করছ কেন?

তুলসী বলল — ভাই, আমি তো একপায়ে খাড়া। কিন্তু সুভাগিকে বলো। ও কিছুতেই রাজি হচ্ছে না যে।

হরিহর সুভাগিকে বুঝিয়ে বলল — মা, আমরা তোর ভালোর জন্যেই বলছি। বাপ-মা বুড়ো হয়েছে, ওদের ওপর কি আর ভরসা আছে? তুই এভাবে আর কদ্দিন বসে থাকবি?

সুভাগি মাথা নত করে বলল — কাকা, আমি তোমাদের কথা বুঝেছি। কিন্তু আমার মন ঘর-সংসার করতে চাইছে না। আরাম করার চিন্তা নেই আমার। তোমরা আর যা-কিছু বল, আমি মাথা পেতে মেনে নেব। সব সইতে রাজি আমি, কিন্তু ঘর করার কথা আমায় বোলো না। চাল-চলন খারাপ দেখলে আমার মাথা কেটে নিয়ো। আমি যদি যথার্থই বাপের বেটি হই, ঠিক কথা রাখব আমি। তবে ইজ্জত রাখার মালিক তো ভগবান, আমার কি সাধ্যি যে এখন থেকে কিছু বলি!

নিরেট রামু বলল — তুই যদি ভেবে থাকিস, দাদা কামাবে, আর আমি বসে বসে মজা করব, তাহলে সে আশা করিসনে। এখানে কেউ কারও জন্যে জীবনভর ঠিকে নেয়নি।

রামুর বউ রামুকে ছাপিয়ে যায়। সে অঙ্গা দুলিয়ে বলে — আমরা কি কারও ধার খেয়েছি যে, সারা জীবন ধরে ধার গুনতে হবে! এখানে তো ভালো খাবার চাই, মিহি সুতোর কাপড় চাই, এসব আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

সুভাগি গর্ব সহকারে বলল — বউদি, আমি তোমাদের গলগ্রহ নই। আর ভগবান করুন, যেন কখনও তা হতেও না হয়। তুমি নিজের দেখো, আমার চিন্তা কোরো না।

রামুর বউ যখন বেশ বুঝতে পারল যে সুভাগি ঘর করবে না, তখন তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। প্রায়ই সে এটা-ওটা নিয়ে ঝগড়া বাধায়। সুভাগিকে কাঁদিয়ে মজা পায় যেন। আর সুভাগি বেচারি এক পহর রাত থাকতে উঠে জাঁতা পেষা, হাঁড়িকুড়ি মাজা-ধোয়া, ঘুঁটে দেওয়া এসব সেরে, তারপর খেতের কাজকর্মের জন্যে মাঠে যায়। দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না সেরে সবাইকে খেতে দেয়। রাতে কখনো মায়ের চুলে তেল দিয়ে দেয়, কখনো গা টিপে দেয়। তুলসী ছিলিমের ভক্ত। তাকে ঘন ঘন ছিলিম খাওয়ায়। পারতপক্ষে সে বাপ-মাকে কোনো কাজে হাত দিতে দেয় না। তবে হ্যাঁ, দাদাকে বাধা দেয় না সে। ভাবে, ও তো জোয়ান ছেলে, কাজ না করলে সংসার চলবে কী করে!

কিন্তু রামুর সেটা ভালো লাগে না। বাপ-মাকে সে কুটোগাছটিও নাড়তে দেয় না, আমায় চায় পিষে মারতে! একদিন তার সেই মনের কথাটা বেরিয়ে পড়ল। সুভাগিকে বলল — যদি এতই ভক্তি, তবে ওদের নিয়ে পৃথক থাকলেই হয়। তখন সেবা করলেই বুঝবে সেবা করাটা তেতো না মিঠে। অন্যের ক্ষমতায় বাহবা কুড়নো সোজা। নিজের ক্ষমতায় কাজ করতে পারলেই জানি বাহাদুর।

সুভাগি কোনো জবাব দিল না। কথায় কথা বেড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। কিন্তু ওর বাপ-মাও বসে বসে শুনছিল সব। মাহাতো আর থাকতে পারল না। বলল — কী রে রামু, ও বেচারির সঙ্গে ঝগড়া করছিস কেন?

রামু কাছে এসে বলল — তুমি মাঝখানে লাফিয়ে পড়ছ কেন? আমি তো ওকে বলছি।

তুলসী — আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ওকে কিছু বলতে পারবিনে তুই। আমার অবর্তমানে যা খুশি করিস। বেচারির ঘরে থাকাটাও মুশকিল করে তুললি দেখছি।

রামু — তোমার মেয়ে যদি অত আদরের, তা ওকে গলায় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখো। আমার সইবে না।

তুলসী — ভালো কথা। তোর যদি সেটাই ইচ্ছে হয়, তবে তাই হবে। আমি কাল গাঁয়ের লোকজন ডেকে ভাগবাঁটোয়ারা করে দেব। তোকে ছাড়তে পারি, কিন্তু সুভাগিকে পারব না।

রাতে শুয়ে শুয়ে তুলসীর সেই পুরনো কথাগুলো মনে পড়ল। রামুর জন্ম উপলক্ষে টাকা ধার করে সে বাড়িতে উৎসব করেছিল, আর সুভাগি যখন হল, তখন ঘরে টাকা থাকতেও একটা কানাকড়িও খরচ করেনি। পুত্রকে রত্ন বলেই মনে করেছিল সে, আর মেয়েকে মনে করেছিল পূর্বজন্মের পাপের দণ্ড। সেই রত্ন এখন কত নিষ্ঠুর, আর সেই দণ্ডই এখন কত-না মঙ্গলময়।

তিন

পরদিন মাহাতো গাঁয়ের লোকদের ডেকে বলল — আপনারা পাঁচজন রয়েছেন, শুনুন। রামুর আর আমার মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না। আমি চাই, আপনারা বিচারবিবেচনা করে আমায় যা দেবেন, আমি তাই নিয়েই পৃথক হয়ে যাব। রাতদিন কিচকিচিনি ভালো নয়।

গাঁয়ের মালিক বাবু সজ্জনসিংহ খুব সজ্জন ব্যক্তি। তিনি রামুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন — বাবা রামু, তুমি নিজের বাপ-মার কাছে থেকে আলাদা থাকতে চাও? বউয়ের কথায় তুমি বাপ-মাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছ, তোমার লজ্জা করে না? রাম! রাম!

রামু উদ্ধত গলায় জবাব দিল — একসঙ্গে যখন থাকাই যাবে না, তখন পৃথক হয়ে যাওয়াই ভালো।

সজ্জনসিংহ — একসঙ্গে থাকতে কী অসুবিধে হচ্ছে তোমার?

রামু — একটা কথা হলে নাহয় বলা যায়।

সজ্জনসিংহ — তবু কিছু বলো না, শুনি।

রামু — বাবু, ওদের সঙ্গে এক অন্নে থাকা আমার পোষাবে না। ব্যস্, আমি আর কিছু জানিনে।

একথা বলেই রামু সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হল।

তুলসী — দেখলেন তো আপনারা ওর মেজাজ। আপনাদের যদি মত হয়, চার ভাগ করে তিন ভাগ ওকে দিয়ে দিন, তবু ওই পাজিটার সঙ্গে আমি আর থাকব না। ভগবান মেয়ের কপালে দুঃখু দিয়েছে, নইলে জমিজমা নিয়ে কী দরকার ছিল আমার! যেখানেই থাকতাম, সেখানেই রোজগারপাতি করে খেতাম। ভগবান আমার সাত দুশমনের দুশমনকেও যেন এমন ছেলে না দেয়। ছেলের চেয়ে মেয়ে ভালো যদি কুলবতী হয়।

হঠাৎ সুভাগি এসে বলল —বাবা, এসব ভাগবাঁটোয়ারা তো আমার জন্যেই হচ্ছে, তা আমাকেই পৃথক করে দাও না কেন? আমি গায়েগতরে খেটে নিজের পেট চালিয়ে নেব। নিজে থেকে যেটুকু পারব, তোমাদের সেবাযত্ন করব, কিন্তু আলাদাই থাকব। ঘরসংসারের এরকম ভাগ-ভিন্ন আমি দেখতে পারছিনে। নিজের কপালে একলঙ্কের দাগ নিতে চাইনে আমি।

তুলসী বলল — মা, আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না, তাতে সারা সংসার চলে যায়, যাক। রামুর মুখ দেখতে চাইনে আমি, একসঙ্গে বাস করা তো দূরের কথা।

রামুর বউ বলল — তুমি কারো মুখ দেখতে চাও না, তো আমরাই কি তোমার পুজো করার জন্যে হা-পিত্যেশ করে আছি।

মাহাতো দাঁতে দাঁতে ঘষতে ঘষতে বউমাকে মারতে গেল, কিন্তু গাঁয়ের পাঁচজন তাকে ধরে রাখল।

চার

ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে যেতেই মাহাতো আর লছমি যেন পেনশন পেয়ে গেল। প্রথম প্রথম সুভাগির নিষেধ সত্ত্বেও ওরা সারাদিনই কিছু-না-কিছু কাজ করত। কিন্তু এখন পূর্ণ বিশ্রাম। আগে একটু দুধ-ঘির জন্যে চেয়ে থাকত। সুভাগি কিছু টাকা বাঁচিয়ে একটা মোষ কিনেছে। বুড়ো মানুষের শরীর টিকে থাকে তো ভালো খাওয়াদাওয়ার ওপর নির্ভর করে। ভালো খাওয়াদাওয়া পেলে ভাবতে হয় না। কিন্তু মাহাতোর ভীষণ আপত্তি। বলে — ঘরের কাজকর্মটা কী কম যে তুই নতুন ঝামেলা বাড়াচ্ছিস। সুভাগি ওদের মন-বোঝানো কথা বলে — বাবা, একটু দুধ না হলে আমার খাওয়াদাওয়ায় রুচি আসে না।

লছমি হেসে বলে — তুই আবার কবে থেকে মিছে কথা বলতে শিখলি মা? কখনও তো দুধ একটু ছুঁয়ে দেখিসনি, খাওয়ার কথা না হয় বাদ দিলাম। সব দুধটুকুই তো আমাদের পেটে ঠেসে-ঠুসে ভরে দিস।

গাঁয়ে যেখানেই যাও না কেন, সবারই মুখে সুভাগির প্রশংসা। মেয়ে নয়, যেন দেবী। দুজন পুরুষের কাজ সে একাই করে, আবার বাপ-মায়ের সেবা-যত্ন করে যাচ্ছে। সজ্জনসিংহ তো বলেন, সে পূর্বজন্মে দেবী ছিল।

কিন্তু বেশিদিন এই সুখ ভোগ করা মাহাতোর কপালে লেখা ছিল না।

সাত-আট দিন থেকে মাহাতোর প্রবল জ্বর। গায়ে কাপড় ছুঁতে দেয় না। লছমি পাশে বসে কাঁদছে। সুভাগি জল নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই একটু আগে মাহাতো জল চেয়েছিল, কিন্তু যখন সে জল নিয়ে এল, তখন মাহাতোর শেষ অবস্থা। হাত-পা ঠান্ডা। তাই দেখে সুভাগি রামুর ঘরে গেল। বলল — দাদা, একবার গিয়ে দেখো, আজ বাবা যেন কীরকম হয়ে যাচ্ছে। সাতদিন থেকে জ্বর ছাড়েনি।

রামু খাটিয়ার ওপর শুয়ে শুয়েই বলল — তা আমি কি ডাক্তার-বদ্যি যে দেখতে যাব? যখন ভালো ছিল তখন তো তুই তার গলার হার হয়ে ছিলি। আজ যখন মরতে বসেছে তখন ডাকতে এসেছিস আমায়?

ঠিক সেই সময় তার বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুভাগিকে জিজ্ঞেস করল — বাবার কী হয়েছে দিদি?

সুভাগির জবাব দেওয়ার আগেই রামু বলে উঠল — হবে আবার কী, আরে দূর দূর, এখনই মরছে না।

সুভাগী তাকে আর কিছু বলল না, সেখান থেকে সোজা সজ্জনসিংহের কাছে গেল। সে চলে গেলে রামু হেসে স্ত্রীকে বলল — একেই বলে স্ত্রীচরিত্র।

স্ত্রী — এতে আবার স্ত্রীচরিত্রের কী আছে? যাও না কেন?

রামু — আমি যাচ্ছিনে। যাকে নিয়ে পৃথক হয়েছে, তাকে নিয়েই থাকুক। যদি মরেও যায় তবু যাব না।

স্ত্রী — (হেসে) মরে গেলে মুখে আগুন দিতে তো যাবে, তখন পালাবে কোথায়?

রামু — কক্ষনও না। সবকিছু ওর আদরের সুভাগি করুক।

স্ত্রী — তুমি থাকতে সে করবে কেন?

রামু — আমি থাকতে তাকে নিয়েই তো পৃথক হয়েছিল! আবার কেন?

স্ত্রী — না গো, এটা ভালো কথা নয়। চলো, গিয়ে দেখে আসি। হাজার হোক, বাবা তো! নইলে গাঁয়ে মুখ দেখাবে কী করে?

রামু — চুপ করো, আমায় উপদেশ শুনিয়ো না।

ওদিকে সজ্জনসিংহ যেই মাহাতোর অবস্থায় কথা শুনলেন, অমনি সুভাগির সঙ্গে চলে এলেন। এসে দেখলেন, মাহাতোর অবস্থা আরও খারাপের দিকে। নাড়ি দেখলেন, খুবই ক্ষীণ। বুঝতে পারলেন, পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। চোখে মৃত্যুর করাল ছায়া। সজল চোখে জিজ্ঞেস করলেন — মাহাতো ভাই, কেমন আছ?

মাহাতো যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বলল — খুব ভালো ভাই। এখন তো যাওয়ার সময়। এখন তুমিই সুভাগির বাবা। তোমার হাতেই ওকে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি।

সজ্জনসিংহ কাঁদতে কাঁদতে বললেন — ভাই মাহাতো, চিন্তা কোরো না। ভগবান করুন, তুমি ভালা হয়ে ওঠো। সুভাগিকে তো আমি সব সময় নিজের মেয়ে বলেই মনে করি। আর যতদিন বাঁচব, সেইভাবেই দেখব তাকে। তুমি নিশ্চিত থাকো, আমি থাকতে সুভাগি বা লছমির দিকে কেউ আড়চোখেও তাকাতে পারবে না। আর কিছু ইচ্ছে থাকলে তাও বলো।

মাহাতো কৃতজ্ঞ চোখে তাঁর দিকে চেয়ে বলল — আর কিছু বলার নেই ভাই। ভগবান তোমায় চিরকাল সুখে রাখুন।

সজ্জনসিংহ — রামুকে ডাকছি। ওর যা ভুলচুক হয়েছে, ক্ষমা করে দাও।

মাহাতো — না ভাই, ও পাপী কসাইটার মুখ দেখতে চাইনে আমি।

এরপর গোদানের আয়োজন শুরু হল।

পাঁচ

রামুকে গাঁয়ের সবাই বোঝাল, তবু সে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে রাজি হল না। বলল — যে বাবা মরার সময়েও আমার মুখ দেখতে চায়নি, সে আমার বাবাও নয়, আমি তার ছেলেও নই।

দাহক্রিয়া করল লছমি। এরপর কয়েকদিনের মধ্যেই যখন সুভাগি কোত্থেকে টাকা জোগাড় করে শ্রাদ্ধের আয়োজন শুরু করল, তখন গাঁয়ের লোকেদের চক্ষুস্থির। থালাবাসন, কাপড়-চোপড়, চিনি-ঘি সবকিছুই প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হল। রামু চেয়ে চেয়ে দেখে আর জ্বলেপুড়ে মরে। আর সুভাগিও তাকে জ্বালানোর জন্যে সবাইকে ডেকে ডেকে জিনিসপত্র দেখায়।

লছমি বলল — মা, সামর্থ্য বুঝে খরচ করো। এখন আর রোজগার করার লোক নেই কেউ। নিজেদেরই কুয়ো খুঁড়তে হবে, কুয়োর জল খেতে হবে।

সুভাগি বলল — বাবার কাজ ধুমধামেই হবে মা, তাতে সংসার থাক আর যাক। বাবা তো আর আসবে না কখনও। আমি দাদাকে দেখিয়ে দিতে চাই অবলা কী করতে পারে। ও ভাবছে, ও দুজনের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। ওর গুমোর ভেঙে দেব আমি।

লছমি চুপ করে থাকে। তেরো দিনের দিন আটখানা গ্রামের ব্রাহ্মণ ডেকে ভোজন করানো হল। সুভাগির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

রাত তিন প্রহর হল। লোকজন খাওয়াদাওয়া সেরে চলে গেছে। লছমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। সুভাগি তখনো বেঁচে-যাওয়া জিনিসপত্র সামলাচ্ছে, এমন সময় ঠাকুর সজ্জনসিংহ এসে বললেন — এখন তুমি একটু জিরিয়ে নাও মা। সকালে ওসব হবে।

সুভাগি বলল — আমি ক্লান্ত হয়ে পড়িনি খুড়ো। কতো খরচ হল, হিসেবটা করেছেন?

সজ্জনসিংহ — সেটা জিজ্ঞেস করে কী করবে মা?

— কিছু না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।

— এই শ তিনেক টাকার মতো হবে।

সুভাগি সলজ্জ কণ্ঠে বলল — আমি ওটাকার জন্যে ঋণী থাকলাম খুড়ো।

— তোমার কাছে তো আমি চাইনি মা। মাহাতো আমার বন্ধু ছিল, ভাই ছিল। তার ক্রিয়াকর্মে সাহায্য করাটা তো আমারও ধর্ম।

— আপনি আমায় এতখানি বিশ্বাস করেছেন, সেটাই কি আপনার কম দয়া খুড়ো! কে আমায় তিনশো টাকা দিত!

সজ্জনসিংহ ভাবতে লাগলেন, এই অবলা মেয়েটির ধর্মবুদ্ধির সীমাপরিসীমা আছে কী নেই!

ছয়

লছমি সেইসব মেয়েদের একজন, স্বামীকে হারালে যাদের জীবনযাত্রা বন্ধ হয়। পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে কাটিয়ে এখন তার এই নিঃসঙ্গ জীবন যেন এক দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে। তার ধারণা, এখন তার বুদ্ধি-বল-চিন্তাভাবনা কিছুই যেন আর নেই।

সে কতবার ঈশ্বরের কাছে মিনতি করে বলেছে, আমাকেও আমার স্বামীর কাছে নিয়ে চলো ভগবান। কিন্তু ঈশ্বর তার কথায় কর্ণপাত করেননি। মৃত্যু মানুষের হাতের মুঠোয় নেই, তাই বলে জীবনটাও কি নিজের বশীভূত নয়?

সেই লছমি, গাঁয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ দেওয়ার জন্যে যার এত নাম ছিল, সে এখন অন্যের করুণাপ্রার্থী। বুড়িয়ে গেছে সে। ভালোভাবে কথা বলারও ক্ষমতা নেই তার।

স্বামীর মৃত্যুর দিন থেকেই তার খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ। সুভাগি চেষ্টাচরিত্র করে খাওয়ায় তাকে, কিন্তু গ্রাস তার গলা দিয়ে নামতে চায় না। পঞ্চাশ বছরে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি যে, একমুঠো খুদকুঁড়ো সে খেয়েছে স্বামীকে বাদ দিয়ে। সে নিয়ম আজ কী করে ভাঙবে সে?

অবশেষে তার কাশি শুরু হল। দুর্বল শরীরে শিগগিরই শয্যা নিতে হল তাকে। সুভাগি এখন কী করবে! ঠাকুর মশাইয়ের টাকা শোধ করার জন্যে প্রাণমন দিয়ে কাজ করা দরকার। এদিকে মা অসুস্থ। কাজ করতে গেলে ঘরে মা একা থাকে। কাছে থাকলে কাজ করবে কে? মায়ের অবস্থা দেখে সুভাগি বুঝতে পারল যে, তারও ডাক এসেছে। বাবার জ্বরটাও তো ওইরকমই ছিল।

গাঁয়ে কার এত ফুরসত আছে যে ছুটোছুটি করবে! সজ্জনসিংহ দুবেলা আসেন, লছমিকে দেখেন, ওষুধপত্র খাওয়ান, সুভাগিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চলে যান। কিন্তু লছমির অবস্থা দিনদিন খারাপ হতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত পনেরো দিনের দিন সেও সংসার থেকে বিদায় নিল। অন্তিম মুহূর্তে রামু এসেছিল। সে মায়ের পা ছুঁতে চেয়েছিল। কিন্তু লছমি তাকে এমন ধমক দিল যে, সে তার কাছে আর এগিয়ে যেতে পারল না। লছমি সুভাগিকে আর্শীবাদ করল — তোমার মতো মেয়ে পেয়েছিলাম বলেই এযাত্রা উদ্ধার পেয়েছি; আমার ক্রিয়াকর্ম তুমি করবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি পরজন্মেও যেন তুমি আমার কোল পবিত্র করো।

সাত

মায়ের দেহত্যাগের পর সুভাগির জীবনের শুধু একটাই লক্ষ্য, সজ্জনসিংহের ঋণ শোধ করা। বাবার ক্রিয়াকার্য তিনশো টাকা লেগেছিল। মায়ের জন্যেও প্রায় দুশো টাকা। পাঁচশো টাকার ঋণ আর সে একা। কিন্তু সে সাহস হারাল না। তিন বছর ধরে সুভাগি রাতকে রাত দিনকে দিন বলে মনে করল না। লোকে তার কার্যক্ষমতা আর পৌরুষ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। দিনভর খেতে খামারে কাজ করে, রাতে কুড়ি সেরের মতো গম পেষে। প্রতিমাসের শেষ দিনে পনেরো টাকা নিয়ে সে সজ্জনসিংহের কাছে গিয়ে হাজির হয়। কখনো এর ব্যতিক্রম হতে দেয় না। এটা যেন প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম।

এখন চারদিক থেকে তার বিয়ের প্রস্তাব আসে। সবাই যেন হাঁ করে রয়েছে, তার জন্যে। যার ঘরে সুভাগি যাবে, তার ভাগ্য ফিরে যাবে। সুভাগির একটাই জবাব — এখনও সময় হয়নি।

যেদিন সুভাগি ঋণের শেষ কিস্তি শোধ করল, সেদিন তার আনন্দের সীমা নেই। জীবনের কঠোর ব্রত পূর্ণ হল যেন।

সে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই সজ্জনসিংহ বললেন — মা, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। বলো, বলব কি বলব না। কিন্তু যদি বলতে বল তাহলে কথা রাখতে হবে।

সুভাগি কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে বলল -- খুড়ো, আপনার কথা না মানলে আর কার কথা মানব? আমি তো আপনার দাসী।

সজ্জনসিংহ — তুমি যদি এমন ভাব তবে তোমায় বলব না। আমি এতদিন কথাটা বলিনি, কারণ তুমি আমার কাছে নিজেকে ঋণী মনে করতে। এখন তোমার টাকা শোধ হয়ে গেছে। এখন আর তুমি আমার ওপর এক রত্তিও কৃতজ্ঞ নও। বলো, বলব তাহলে কথাটা?

সুভাগি — আপনার আজ্ঞা।

সজ্জনসিংহ — দেখো, প্রত্যাখ্যান কোরো না। নইলে আমি তোমায় আর মুখ দেখাব না কোনোদিন।

সুভাগি — কী আদেশ বলুন।

সজ্জনসিংহ — আমার একান্ত ইচ্ছে, তুমি আমার বউমা হয়ে আমার ঘর পবিত্র করো। আমি, জাতপাত মেনে চলি, কিন্তু আমার সব বন্ধন একেবারে ভেঙে দিয়েছ তুমি। আমার ছেলে তোমার নামের পূজারি। তুমি তো তাকে ভালভাবেই জানো। বলো, তুমি রাজি?

সুভাগি — এই সম্মানে আমি পাগল হয়ে যাব খুড়ো।

সজ্জনসিংহ — তোমায় সম্মান দিচ্ছেন ভগবান। তুমি সাক্ষাৎ ভগবতী!

সুভাগি — আমি তো আপনাকে নিজের বাবার তুল্য মনে করি। আপনি যাকিছু করবেন, আমার মঙ্গলের জন্যেই করবেন। আপনার আদেশ কি আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি?

সজ্জনসিংহ তার মাথায় হাত রেখে বললেন — মা, তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক। তুমি আমার কথা রেখেছ। আমার চেয়ে ভাগ্যবান সংসারে আর কে আছে!

(সুভাগী / ১৯৩০) অনুবাদ আশরফ চৌধুরী

পৌষের রাত

হল্‌কু এসে বউকে বলল — সেই সহনা-টা এসেছে। দাও, যে কটা টাকা রেখেছিলাম, দিয়ে দিই ওকে। আপদ তো বিদেয় হোক।

মুন্নি ঝাঁট দিচ্ছিল। পেছন ফিরে বলল — তিনটে তো মাত্তর টাকা; দিয়ে দিলে কম্বল কোত্থেকে আসবে শুনি? পৌষ-মাঘ মাসের রাতে খেতের টঙে কী করে কাটাবে? ওকে বলে দাও, ফসল উঠলে টাকা চুকিয়ে দেব। এখন নেই।

হল্‌কু এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পৌষ মাস মাথার ওপর এসে গেছে। কম্বল ছাড়া মাচায় রাতে কিছুতেই সে শুতে পারবে না। কিন্তু সহনা যে শুনবে না, চোটপাট করবে, গালাগাল দেবে। মরুক গে, শীতে না হয় মরব, আপদটা তো এখন বিদেয় হবে। এই ভেবে সে তার মোটাসোটা গতরটা নিয়ে (যা ওর 'হল্‌কু' নামটাকে মিথ্যে বলে দাঁড় করিয়েছে) বউয়ের কাছে গিয়ে খোশামোদ করে বলল — যা, এনে দে, ঝামেলা তো মিটুক। কম্বলের কিছু একটা উপায় ভেবে বার করব। মুন্নি ওর কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলল — আর বার করেছ উপায়! শুনি তো একটু, কী উপায় বার করবে? কেউ খয়রাত দেবে নাকি কম্বল? জানি না আর কত বাকি আছে, এ যেন কিছুতেই শোধ হচ্ছে না। বলি, তুমি চাষবাস ছেড়ে দাও না কেন? মরতে মরতে কাজ করবে, তারপর যেই ফসল উঠবে অমনি বাকি বকেয়া চুকাবে, ব্যস শেষ। ধার শোধ করতেই যেন আমাদের জন্ম। পেট ভরাবার জন্য মজুরি করো। চুলোয় যাক অমন চাষবাস। দেব না আমি টাকা — কিছুতেই দেব না।

হল্‌কু হতাশ হয়ে বলল — তাহলে কি গালাগাল খাব?

মুন্নি তড়পে ওঠে — গালাগালি দেবে কেন? এ কি ওর রাজত্ব নাকি? কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই ওর কোঁচকানো ভুরু দুটো ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ে। হল্‌কুর ওই কথাগুলোর রূঢ় সত্য যেন একটা ভয়ানক জন্তুর মতো তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

গিয়ে তাকের ওপর থেকে টাকা কটা বার করে এনে সে হল্‌কুর হাতে তুলে দেয়। বলে — তুমি এবার চাষবাস ছেড়ে দাও। মজুরি করলে তবু শান্তিতে একখানা রুটি খেতে পাব। কারুর ধমকানি তো শুনতে হবে না। আচ্ছা চাষবাস যা হোক! জনমজুর খেটে রোজগার করো, তাও ওতেই উচ্ছগ্‌গু করে দাও, তার ওপর আবার চোখ রাঙানি। হল্‌কু টাকা কটা হাতে নিয়ে এমনভাবে বাইরে যায় যেন তার কলেজটাকেই ছিঁড়ে দিতে যাচ্ছে। মজুরির রোজগার থেকে একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে সে টাকা তিনটে জমিয়েছিল একটা কম্বল কিনবে বলে। এ

টাকা কটাও আজ বেরিয়ে যাচ্ছে। এক-একটা পা ফেলছে আর মাথাটা যেন তার নিজের দৈন্যের ভারে নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

দুই

পৌষের অন্ধকার রাত। আকাশের তারাগুলোও যেন শীতে থর থর করে কাঁপছে। হল্‌কু খেতের একপাশে আখের পাতার ছাউনির নীচে বাঁশের মাচার ওপর তার পুরানো মোটা সুতির চাদরখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে হি হি করে কাঁপছে। মাচার নীচে ওর সঙ্গী কুকুর জবরা মুখখানাকে পেটের মধ্যে গুঁজে শীতে কুঁই কুঁই করে চলেছে। দুজনের কারও চোখেই ঘুম নেই।

হাঁটু দুটোকে ঘাড়ের সঙ্গে চাপতে চাপতে হল্‌কু বলে, কী রে জবরা, শীত করছে? বলেছিলাম না, বাড়িতে খড়ের ওপর শুয়ে থাক, তা এখানে কী করতে এসেছিস? মর্ এখন ঠান্ডায়, আমি কী করব? ভেবেছিলি আমি এখানে হালুয়া-পুরি খেতে আসছি, তাই ছুটতে ছুটতে আগে আগে চলে এসেছিস। এখন কাঁদো ঠাকুমা দিদিমা বলে। জবরা শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়ে আর তার কুঁই কুঁই...শব্দটাকে দীর্ঘায়িত করতে করতে একটা হাই তুলে চুপ করে যায়। তার সারমেয় বুদ্ধি বোধ হয় আঁচ করে যে, ও কুঁই...কুঁই...করছে বলে প্রভুর ঘুম আসছে না। হাত বের করে জবরার ঠান্ডা পিঠটায় হাত বুলোতে বুলোতে হল্‌কু বলে — কাল থেকে আমার সঙ্গে আর আসবি না। এলে ঠান্ডায় জমে যাবি। এই শালার পশ্চিমা বাতাস না জানি কোত্থেকে বরফ বয়ে আনছে। দেখি, উঠে আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিই। কোনো মতে রাতটা তো কাটবে। আট-আটটা ছিলিম টানা তো শেষ। এই হল গে চাষবাসের মজা। আবার এক-একজন এমন ভাগ্যিমানও আছেন শীত যাঁদের কাছে গেলে গরম লাগার ভয়ে ছুটে পালাবে। মোটা মোটা তোশক, লেপ, কম্বল! সাধ্যি কী যে শীত পাত্তা পাবে। বরাতের জোর আর কী। খেটে মরব আমরা, মজা লুটবে অন্যে।

হল্‌কু ওঠে। গর্ত থেকে খানিকটা আগুন বের করে নিয়ে কলকে সাজায়। জবরা উঠে বসে।

তামাক খেতে খেতে হল্‌কু বলে—দিবি দু-একটা টান? শীত আর কমে কই। হ্যাঁ, একটু যা মনটাকেই বুঝ দেওয়া। জবরা ওর মুখের পানে স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে থাকে।

হল্‌কু — আজ একটু শীত সয়ে নে। কাল আমি এখানটায় খড় বিছিয়ে দেব। খড়ের ভেতর ঢুকে বসে থাকিস, তাহলে শীত লাগবে না। থাবা দুটোকে হল্‌কুর হাঁটুর উপর তুলে দিয়ে হল্‌কুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায় জবরা। হল্‌কুর গালে ওর গরম নিঃশ্বাস লাগে। তামাক খেয়ে হল্‌কু আবার শুয়ে পড়ে। এবার সংকল্প করে শোয় যে, যত যাই হোক না কেন এবার ঘুমুবই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর বুকের ভিতরে কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। একবার এপাশ ফিরে শোয়, আবার ওপাশ। কিন্তু শীত যেন পিশাচের মতো ওর বুকে চেপে বসে থাকে।

কিছুতেই আর থাকতে না পেরে সে জবরাকে আস্তে করে তুলে কোলে টেনে নেয়। জবরার মাথাটাকে আস্তে আস্তে চাপড়াতে থাকে। কুকুরটার গা থেকে না জানি কেমন একটা দুর্গন্ধ আসে, তবু হল্‌কু তাকে কোলে জাপটে ধরে এমন আরাম পায় যা সে ইদানীং কয়েকমাস পায়নি। জবরা বোধ হয় ভাবে, এই স্বর্গ। হল্‌কুর নিষ্পাপ মনে তো কুকুরটির প্রতি লেশমাত্র ঘৃণাও নেই। সে তার কোনো অভিন্নহৃদয় বন্ধু বা ভাইকেও এমনি আগ্রহের সঙ্গেই আলিঙ্গন করত। এই যে দারিদ্র্য

ওকে আজ এই অবস্থায় এনে ফেলেছে তা ওর মনকে মোটেই ছোটো করেনি। এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব তার হৃদয়ের সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছে আর তার প্রতিটি অণুকণাকে যেন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। হঠাৎ জবরা জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ পায়। অন্তরঙ্গ এই আত্মীয়তা তার মনে এক নতুন উন্মাদনা জাগিয়ে তুলছিল, যার কাছে ঠান্ডা হাওয়ার দাপটও তুচ্ছ হয়ে যায়। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সে ছাউনির বাইরে এসে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। হল্‌কু ওকে কয়েকবার তু তু করে ডাকে, তবু সে তার কাছে ফিরে আসে না। খেতের চারপাশে ছুটে ছুটে ডাকাডাকি করে চলে। কিছুক্ষণের জন্যে এলেও তাড়াতাড়ি আবার ছুটে যায়। কর্তব্যবোধ তার প্রাণে আকাঙ্ক্ষার মতোই উছলে উঠতে থাকে।

তিন

আরও একটা ঘন্টা কেটে যায়। রাত যেন শীতকে হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে দিয়ে আরও শানিয়ে তোলে। হল্‌কু উঠে বসে হাঁটু দুটোকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে দু হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা গুঁজে নেয়। তবুও শীত মানে না। মনে হয়, যেন সব রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। ধমনীতে রক্তের বদলে বরফ বইছে। সে ঝুঁকে আকাশের দিকে তাকায় — রাত এখনও অনেক বাকি! সপ্তর্ষি যে এখনও আকাশের অর্ধেকটাও ওঠেনি। উপরে উঠে এলেই তবে না ভোর হবে। এখনও পহরটাক রাত রয়েছে।

হল্‌কুর খেত থেকে একটু দূরে একটা আমবাগান। পাতাঝরা শুরু হয়ে গেছে। বাগানে রাশি রাশি শুকনো পাতা। হল্‌কু ভাবে, গিয়ে পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলে বেশ করে আগুন পোয়াবে। এত রাতে কেউ পাতা কুড়োতে দেখলে ভাববে ভূত। কে জানে কোনো জানোয়ার টানোয়ার কোথাও লুকিয়ে বসে আছে কি না; কিন্তু আর যে বসে থাকা যাচ্ছে না।

পাশের অড়হর খেতে গিয়ে কয়েকটা গাছ উপড়ে নিয়ে তা দিয়ে একটা ঝাড়ু বানিয়ে হাতে ঘুঁটে জ্বালিয়ে নিয়ে সে বাগানের দিকে যায়। জবরা তাকে দেখে কাছে এসে লেজ নাড়তে থাকে।

হল্‌কু বলে, আর তো থাকতে পারছি না রে জবরু। চল, বাগানে পাতা জড়ো করে আগুন পোয়াই। একটু গা গরম করে নিই, তারপর এসে শোব। এখনও অনেক রাত। জবরা কুঁই কুঁই করে সম্মতি জানিয়ে আগে আগে বাগানের দিকে এগিয়ে যায়।

বাগানে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। নির্দয় বাতাস পাতাগুলোকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। গাছ থেকে শিশির বিন্দু টুপ টুপ করে নীচে ঝরে ঝরে পড়ে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া মেহেদি ফুলের গন্ধ বয়ে আনে।

হল্‌কু বলে, কী মিষ্টি গন্ধ রে জবরু! তুইও সুগন্ধ পাচ্ছিস তো নাকে?

জবরু মাটিতে পড়ে-থাকা এক টুকরো হাড় খুঁজে পায়, দাঁত দিয়ে সেটাকে চিবোতে শুরু করে।

মাটিতে আগুনটাকে রেখে হল্‌কু পাতা জড়ো করতে লেগে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে একরাশ পাতা জমে ওঠে। ঠান্ডায় ওর হাত দুখানা কাঁপছে। খালি পা দুটো যেন অবশ হয়ে পড়ছে। আর সে পাতার পাহাড় খাড়া করছে। এই অগ্নিকুণ্ডে শীতকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে সে।

খানিক বাদেই আগুন জ্বলে ওঠে। আগুনের শিখা ওপরের গাছের পাতাগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। সেই চঞ্চল আলোয় বাগানের বিরাট বিরাট গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন অথই অন্ধকারকে মাথায় তুলে রেখেছে। অন্ধকারের অনন্ত সমুদ্রে এই আলো একখানি নৌকার মতো হেলতে হেলতে দুলতে থাকে।

হল্‌কু আগুনের সামনে বসে আগুন পোহায়। একটু পরেই গায়ের চাদর খুলে সে বগলদাবা করে। পা দুখানা মেলে দেয়, ভাবখানা যেন শীতকে ধমক দিয়ে বলছে, দেখি কর তোর যা খুশি। শীতের অসীম শক্তিকে হারিয়ে দিয়েছে সে। সেই বিজয়গর্ব সে আর হৃদয়ে ধরে রাখতে পারছে না।

জবরুকে বলে, কী রে জবরু, আর ঠান্ডা লাগছে না তো?

জবরু কুঁই কুঁই করে যেন বলে, আর কি শীত লাগতে পারে?

আগে থাকতে কথাটা মনে আসেনি, তাহলে কী আর এত শীত খেতাম?

জবরু লেজ নাড়ে।

—আচ্ছা এসো তো দেখি, এই আগুনটাকে টপকে পার হই। দেখি কে যেতে পারে? পুড়েটুড়ে গেলে বাবা আমি কিন্তু ওষুধ দেব না।

অগ্নিকুণ্ডটার দিকে কাতর নয়নে তাকিয়ে দেখে জবরু।

— মুন্নিকে কাল আবার বলে দিয়ো না যেন, তাহলে ঝগড়া করবে।

বলে সে লাফ দিয়ে আগুনটার ওপর দিয়ে টপকে যায়। পায়ে একটুখানি আঁচ লাগে বটে, তবে তা তেমন কিছু নয়। জবরু আগুনের পাশ দিয়ে ঘুরে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়।

হল্‌কু বলে, উহুঁ উহুঁ, এটা ঠিক হচ্ছে না। ওপর দিয়ে টপকে এসো। বলে সে আবার লাফ দিয়ে আগুনের এপাশে চলে আসে।

চার

পাতা সব পুড়ে ছাই। বাগানে আবার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। ছাইয়ের নীচে কিছু কিছু আগুন রয়েছে, যা বাতাসের ঝাপটা এলে একটুখানি জ্বলে উঠে পরক্ষণেই আবার নিভে যাচ্ছে।

হল্‌কু আবার চাদার গায়ে জড়িয়ে নিয়ে গরম ছাইয়ের পাশে বসে গুনগুন করে একটা গান করে। গাটা ওর গরম হয়েছে বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে আবার শীত যত বাড়ে তত আলসেমিতে পেয়ে বসে ওকে।

জোরে ঘেউ ঘেউ করে জবরু খেতের দিকে ছুটে যায়। হল্‌কুর যেন মনে হল এক পাল জানোয়ার ওর খেতে এসে ঢুকেছে। বোধ হয় নীল গাইয়ের পাল। ওদের দাপাদাপি, ছুটোছুটির আওয়াজও পরিষ্কার ওর কানে আসে। মনে হচ্ছে যেন ওরা খেতের ফসল খাচ্ছে। ওদের চিবানোর চর্ চর্ আওয়াজও শোনা যায়।

হল্‌কু মনে মনে বলে — নাঃ, জবরু থাকতে কোনো জানোয়ারের সাধ্যি নেই খেতে ঢুকবে। ও ছিঁড়েই ফেলবে তাকে। এ আমার মনের ভুল। কই, আর তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমিও কী যে ভুল শুনি!

জোরে হাঁক পাড়ে সে — জবরা, জবরা।

জবরার ঘেউ ঘেউ থামে না। ডাক শুনেও কাছে আসে না।

আবার খেতের ফসল খাবার আওয়াজ শোনা যায়। এবার নিজের মনকে সে আর ধোঁকা দিতে পারে না। কিন্তু জায়গা ছেড়ে উঠতে যেন বিষের মতো লাগে। জুত করে বেশ গরম হয়ে বসেছিল। এই কনকনে শীতে খেতে যাওয়া, জানোয়ারগুলোর পেছনে ছুটোছুটি করা বেকুবি মনে হচ্ছে। নিজের জায়গা থেকে সে একটুও নড়ে না।

জোরে হাঁক দিয়ে ওঠে সে — লিহো! লিহো!! লিহো!!!

জবরা আবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। জানোয়ারগুলো খেতটাকে শেষ করে ফেলেছে। ফসল পেকে উঠেছে। এবার কী সুন্দর ফসল হয়েছিল! কিন্তু নচ্ছার এই জানোয়ারগুলো সব বরবাদ করে ফেলছে।

দৃঢ়সংকল্প করে হল্‌কু উঠে দাঁড়ায়। দু-তিন পা এগিয়েও যায়। কিন্তু আচমকা একটা ঠান্ডা, ছুঁচ-বাঁকানো বিছের হুলের মতো বাতাসের ঝাপটা এসে ওর গায়ে লাগতেই ও আবার নিভু নিভু আগুনের কাছটাতে এসে বসে পড়ে। ছাইগুলোকে খুঁচিয়ে দিয়ে ঠান্ডা গাটাকে গরম করতে থাকে।

জবরা ওদিকে গলা ফাটিয়ে ফেলছে। নীলগাইগুলো খেতটাকে শেষ করে আনল। এদিকে হল্‌কু গরম ছাইয়ের পাশে শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে। আলস্য যেন দড়ির বাঁধনের মতো তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে।

সেই ছাইয়ের পাশেই গরম মাটির উপর চাদর মুড়ি দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ওর ঘুম ভাঙলে দেখে চারদিকে রোদ ঝলমলে করছে। আর মুন্নি ওকে বলছে, আজ কি তুমি শুয়েই থাকবে গো? এখানে এসে আরাম করে তুমি ঘুমিয়ে রয়েছ আর ওদিকে সারাটা খেত যে হতচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

হল্‌কু উঠে বলে — তুই কি খেত হয়ে আসছিস নাকি?

মুন্নি বলে —হ্যাঁ, সারাটা খেত ছারখার হয়ে গেছে। আ[illegible], এমন করেও কেউ ঘুমায় গো? তোমার তাহলে এখানে টং বানিয়ে কী লাভটা হল?

হল্‌কু ছুতো দেখায়। বলে, মরতে মরতে আমি কোনো মতে বেঁচেছি আর তুই আছিস তোর খেতের চিন্তা নিয়ে। পেটে আমার সে যে কী যন্ত্রণা, এমন অসহ্য যন্ত্রণা সে আমিই টের পেয়েছি।

দুজনে আবার খেতের আলে এসে দাঁড়ায়। দেখে, সারাটা খেত তছনছ হয়ে গেছে, জবরা মাচার নীচে চিত হয়ে শুয়ে, যেন তার ধড়ে প্রাণ নেই।

দুজনেই খেতের হাল দেখে। মুন্নির মুখে বেদনার ছায়া। হল্‌কু কিন্তু খুশি।

চিন্তিত হয়ে মুন্নি বলে — এখন জনমজুর খেটে জমির খাজনা শুধতে হবে।

খুশিমুখে হল্‌কু বলে, রাতে শীতের [illegible] তো আর এখানে শু[illegible] হবে না।

(পুস কী রাত / ১৯৩০) অনুবাদ ননী শুর

ম্যাকু

কাদের আর ম্যাকু শুঁড়িখানার কাছে পৌঁছে দেখে কংগ্রেসি ভলান্টিয়াররা ঝান্ডা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শুঁড়িখানার এধারে ওধারে হাজার হাজার দর্শক। সন্ধ্যাবেলা। মদখোররা ছাড়া আর কেউ এ সময়টায় এ গলি মাড়ায় না। ভদ্রলোকেরা এপথ দিয়ে হাঁটতে ইতস্তত করে। মাতালদের ছোটো ছোটো দল আসে, যায়। দুচারটে বেশ্যাকে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আজ এই ভিড়ভাড় দেখে ম্যাকু বলে, বড্ড ভিড় রে, শ-দু-তিনেক লোক হবে।

কাদের হেসে বলে, ভিড় দেখে ডর লাগছে? সব ভোঁ ভোঁ হয়ে যাবে, একটাও টিকবে না। এই লোকগুলো মজা দেখতে এসেছে, লাঠি খেতে আসেনি।

ম্যাকু সন্দিগ্ধ স্বরে বলে, কিন্তু পুলিশের সেপাইগুলোও যে বসে আছে! ঠিকেদার তো বলেছিল — পুলিশ কিছু বলবে না।

কাদের — হ্যাঁ রে হ্যাঁ, পুলিশ কিচ্ছু বলবে না। তুই মুখ শুকোচ্ছিস কেন? পুলিস মুখ খোলে সেখানেই যেখানে চারটে পয়সা আছে কিংবা যেখানে মেয়েছেলের মামলা। এসব বেফায়দা কাজে পুলিশ থাকে না। পুলিশ তো আরও উশকে দিচ্ছে। ঠিকেদারের কাছ থেকে বছরে শয়ে শয়ে টাকা হাতায়। এ সময় পুলিশ ওকে মদত দেবে না তো কখন দেবে?

ম্যাকু — চল্, আজ আমাদেরও পোয়াবারো মনে হচ্ছে। মুফতে মাল টানব, সে তো আছেই। তবে শুনেছি কংগ্রেসে নাকি সব বড়ো বড়ো মালদার লোক ঢুকে পড়েছে। ওরা আবার আমাদের ওপর শোধ না তোলে, তবে তো বেশ ঝামেলা হবে।

কাদের — আ রে, শোধটোধ কেউ তুলবে না। তোর দিলটা এত ঘাবড়াচ্ছে কেন? কংগ্রেসিরা কারও গায়ে হাত তোলে না, চাই কি কেউ তাকে মেরে ফেললেও না। নইলে এই তো সেদিন জুলুসে দশ-বারোটা পুলিশের কী ক্ষমতা ছিল যে, দশ হাজার আদমিকে পেটায়? চারজন তো ওখানেই ঠান্ডা হয়ে গেল। তবু একটা লোকও হাত তুলল না। ওদের যিনি মহাত্মা তিনি একজন মস্ত বড়ো ফকির। ওঁর হুকুম হল চুপচাপ মার খেয়ে যাবে, কিন্তু মারামারি করবে না।

বলতে বলতে ওরা দুজনে শুঁড়িখানার দরজার সামনে এসে পড়ে। একজন স্বেচ্ছাসেবক সামনে এগিয়ে এসে জোড়হাত করে বলে, ভাইসাব, আপনাদের ধর্মে মদ হারাম।

প্রচণ্ড এক চড় কষে ম্যাকু সে কথার জবাব দেয়। এমন চড় মারে যে স্বেচ্ছাসেবকটির চোখে রক্ত এসে জমে যায়। মনে হচ্ছিল যেন সে পড়েই যাবে। আর একজন স্বেচ্ছাসেবক ছুটে এসে তাকে সামলে নেয়। পাঁচ-পাঁচটা আঙুলের রক্তিম ছাপ ফুটে ওঠে।

চড় খেয়েও স্বেচ্ছাসেবকটি কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ম্যাকু বলে, সরবি, না আরও খাবি?

বিনম্রভাবে স্বেচ্ছাসেবকটি বলে, আপনার যদি তাই ইচ্ছে, তাহলে এই যে মাথা এগিয়ে দিচ্ছি। যত খুশি মারুন, তবু ভেতর যাবেন না।

বলতে বলতে সে ম্যাকুর সামনে বসে পড়ে।

স্বেচ্ছাসেবকের মুখের দিকে নজর দেয় ম্যাকু। ওর পাঁচ-পাঁচটি আঙুলের ছাপ বসে গেছে সেখানে। তারই লাঠির ঘায়ে চৌচির হওয়া মাথা ম্যাকু এর আগে দেখেছে; কিন্তু আজকের মতো আত্মগ্লানি তার কোনোদিন হয়নি। পাঁচ আঙুলের ওই দাগটা যেন একটা পঞ্চশূল হয়ে ওর হৃদয়কে বিঁধতে লাগল।

পুলিশগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাদের সিগারেট ফুঁকছে। সেখান থেকে বলে, কী রে, দাঁড়িয়ে কেন, মার্ কষে আরেকটা—

ম্যাকু স্বেচ্ছাসেবককে বলে, তুমি উঠে সরে দাঁড়াও, আমাকে ভেতরে যেতে দাও।

— আপনি আমার বুকে পা দিয়ে চলে যেতে পারেন।

— ওঠো বলছি, আমি ভেতরে গিয়ে তাড়ি খাব না। অন্য কাজ আছে।

কথাগুলো সে এমন দৃঢ়স্বরে বলে যে, স্বেচ্ছাসেবকটি উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তা ছেড়ে দেয়। ম্যাকু ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। জোড়হাত করে স্বেচ্ছাসেবকটি আবার বলে, আপনার ওয়াদা ভুলে যাবেন না কিন্তু। কথা দিয়েছেন।

একজন চৌকিদার মন্তব্য করে, কথায় আছে না লাথির চোটে ভূত পালায়। এক চড়েতেই সিধে হয়ে গেছে।

কাদের — থাবড়াখানা ছোঁড়াটার সারাজীবন মনে থাকবে। ম্যাকুর থাপ্পড় সহ্য করা যা তা কথা নয়।

পুলিশ — আজ সব কটাকে এমন ঠ্যাঙানি লাগাও যেন আর এমুখো হওয়ার নাম না করে।

কাদের — খোদার ইচ্ছে হলে আর এদিকে মাড়াবে না। [illegible] হ্যাঁ, হিম্মতওয়ালা বটে। জান হাতে নিয়ে ঘুরছে।

দুই

ম্যাকু ভেতরে ঢুকলে ঠিকেদার তাকে অভ্যর্থনা করে, এসো এসো, ম্যাকুমিঞা। শুধু একটা চড় মেরেই থেমে গেলে কেন? এক চড়ে ওদের কী হবে? বড়ো বেহায়া সব। যতই পেটাও কিচ্ছু হবে না। আজ সব ক-টার হাত-পা ভেঙে দাও তো, আর যেন এদিকে না আসে।

ম্যাকু — আর কি কেউ তাহলে আসবে না?

ঠিকেদার — এর পর কেউ আসে? প্রাণে ডর নেই?

ম্যাকু — এসব তামাশা দেখনেওয়ালারা যদি আমার উপর ডান্ডা চালায়, তখন?

ঠিকেদার — তাহলে পুলিশ ওদের মেরে খেদিয়ে দেবে। দেখবে এক দাবড়ানিতেই ময়দান সাফ হয়ে যাবে। নাও, ততক্ষণে এক-আধ বোতল টেনে নাও। আমি তো আজ মুফতে খাওয়াচ্ছি।

ম্যাকু — এসব খদ্দেররাও কি মুফতে খাচ্ছে?

ঠিকেদার — কী করব, কেউ আসছিলই না। যেই শুনলে মুফতে মিলবে অমনি হুড়মুড় করে সব ঢুকে পড়ল।

ম্যাকু — আমি আজ খাব না।

ঠিকেদার — কেন? কেন? তোমার জন্য তো আজ টাটকা মাল আনিয়ে রেখেছি।

ম্যাকু — এমনি এমনি। আজ খেতে ইচ্ছে করছে না। নাও, একটা লাঠিটাঠি নিকালো, হাত দিয়ে মারতে জুত লাগছে না।

ঠিকেদার একলাফে গিয়ে মোটা দেখে এক গাছা লাঠি এনে ম্যাকুর হাতে দিয়ে দেয়, দিয়ে লাঠিপেটার মজা দেখার জন্য দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ডান্ডাটাকে হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত সেটার ওজন পরখ করে নেয় ম্যাকু, তারপর এক লাফে গিয়ে ঠিকেদারকে এমন এক বাড়ি মারে যে, সে সেখানেই দরজার সামনে দুভাঁজ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তারপর নেশাখোরদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটাতে শুরু করে। না তাকায় সামনে, না পেছনে। ব্যস্, শুধু ডান্ডা চালিয়ে যায়।

তাড়িখোরদের নেশা ছুটে যায়। ভয়ে পেয়ে সবাই পালাতে শুরু করে, কিন্তু ওদিকে দরজার কপাট দুটোর মাঝখান জুড়ে পড়ে রয়েছে ঠিকেদারের দেহ। সেখান থেকে লাফ দিয়ে আবার লোকগুলো ভেতরে ফিরে আসে। ডান্ডার বাড়ি মেরে ম্যাকু আবার তাদের অভ্যর্থনা করে। শেষে ঠিকেদারের দেহটাকেই মাড়িয়ে মাড়িয়ে তারা পালায়। কারও ভাঙে হাত, কারও ফাটে মাথা, কারও বা কোমর। এমন হুড়োহুড়ি পড়ে যায় যে, মিনিটখানেকের মধ্যেই শুঁড়িখানার ভেতরে আর একটা লোকও থাকে না।

আচমকা মদের জালা ভাঙার আওয়াজ আসে। স্বেচ্ছাসেবকটি উঁকি মেরে দেখে ম্যাকু জালাগুলোকে ধ্বংস করতে লেগে গেছে। সে বলে, ভাইসাব, ও ভাইসাব, আপনি এ কী সর্বনাশ করছেন! এর চেয়ে তো আমাদের উপর রাগ ঝাড়াই ভালো ছিল।

দু-তিন বাড়ি মেরে বাকি বোতল আর জালাগুলোকে চুরমার করে দেয় ম্যাকু। তারপর যাবার সময় ঠিকেদারকে এক লাথি মেরে বাইরে বেরিয়ে আসে।

কাদের ওকে আটকে বলে, কী রে, তোর কি মাথা খারাপ হল না কী? কী করতে এলি, আর কী করছিস?

ম্যাকু লাল লাল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, আল্লার শুকরিয়া যে আমি যা করতে এসেছিলাম তা না করে আর কিছু করে বসেছি। তোদের হিম্মত থাকে তো ভলান্টিয়ারদের মার। আমার হিম্মত নেই। একটা যে চড় আমি মেরেছি তারই জ্বালা এখনো রয়েছে, হামেশা থাকবে এই জ্বালা। চড়টার দাগ আমার কলিজায় বসে গেছে। যারা নিজেদের জান দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে শুধু আর একজনকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে বলে তাদের গায়ে হাত তুলবে তারাই যারা পাজি, কমিনা, নামর্দ। ম্যাকু দাঙ্গাবাজ, লেঠেল, গুন্ডা হতে পারে, কিন্তু কমিনা, নামর্দ নয়। বলে দে পুলিশকে, ওরা যদি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চায় তো করুক এসে।

কয়েকজন তাড়িখোর দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ম্যাকুর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল। কিছু বলতে সাহস করছিল না। ওদের দিকে তাকিয়ে ম্যাকু শাসায় — কাল আবার আসব আমি। তোদের কাউকে যদি ফের এখানে দেখি তো কাঁচাই খেয়ে ফেলব। জেল-ফাঁসিকে আমি ডরাই না। ভালো চাসতো ভুলেও আর এদিকে আসবি না। এই কংগ্রেসিরা তোদের দুশমন নয়। তোদের আর তোদের ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্যই মদ খেতে ওরা বারণ করছে। ওই পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পরবরিশ কর্, ঘি-দুধ খা। ঘরে তো উপোস লেগেই আছে, তোদের বিবিরা তোদের নাম করে কাঁদছে, আর তোরা এখানে বসে বসে মদ গিলছিস? ঝাঁটা মার অমন নেশার মুখে।

লাঠিটা ওখানেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পা ফেলতে ফেলতে ম্যাকু বাড়ি যায়। হাজার হাজার লোক জমে গেছে ততক্ষণে। সবাই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর গর্বের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ম্যাকুকে।

(মৈকু / ১৯৩০) অনুবাদ ননী শুর

গুলিডাণ্ডা

আমাদের ইংরেজ বন্ধুরা স্বীকার করুন বা না করুন, আমি তো বলব গুলিডাণ্ডাই সব খেলার রাজা। আজও বাচ্চাদের ডাংগুলি খেলতে দেখলে ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলবার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করে। না আছে লনের দরকার, না কোর্টের, না নেটের, না ব্যাটের। গাছ থেকে মজাসে একটা ডাল কেটে নিলাম, গুলি বানিয়ে নিলাম, দুটো লোকও জুটে গেল তো ব্যস্ খেলা শুরু।

বিলিতি খেলাগুলোর সবচেয়ে বড়ো দোষ হল ওদের সাজসরঞ্জামগুলো বড্ড দামি। যতক্ষণ না কমসে কম শ-খানেক খরচ করবেন, খেলোয়াড় বলেই কেউ মনে করবে না। কিন্তু গুলিডাণ্ডা খেলায় খরচপত্তর কিছুই নেই অথচ মজা ঢের; তবু আমরা বিলিতি জিনিস বলতে এমন পাগল যে দিশি সবকিছুতেই অরুচি। স্কুলের সব কটা ছেলের কাছ থেকে বছরে তিনটে চারটে টাকা শুধু খেলার ফি বলে নেওয়া হয়। কারও মাথায় এটা আসে না যে স্বদেশি খেলাও খেলা, যা পয়সাকড়ি ছাড়াই খেলা যায়। বিলিতি খেলা তাদের জন্য, যাদের হাতে পয়সা আছে। গরিব ছেলেগুলোর ঘাড়ে এ বিলাসিতা চাপানো কেন? বেশ, গুলি লেগেই যদি চোখ ফুটো হবার ভয় থাকে, তাহলে কি. ক্রিকেটে মাথা ফুটো হবার, পিলে ফুটো হবার, ঠ্যাং খোঁড়া হবার ভয় থাকে না? আমাদের কপালে গুলির দাগ যদি আজও থেকে থাকে, তাহলে আমাদের এমন বন্ধু কিছু আছে যারা তাদের ব্যাটকে ক্রাচে বদলে বসে আছে। এটা হল তো আপন আপন রুচির ব্যাপার। আমার কাছে গুলিটাই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আর ছেলেবেলার মধুর সব স্মৃতির মধ্যে গুলিই সবচেয়ে মিষ্টি।

সেই সক্কালবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া, সেই গাছে চড়ে ডাল কাটা, ডাংগুলি বানানো, সেই উৎসাহ, সেই একাগ্রতা, খেলুড়েদের সেই জমায়েত, সেই গুলি লুফে নেওয়া, সেই ডাং পেটানো, সেই ঝগড়া মারামারি, সেই সরল স্বভাব যার কাছে ছুত-অচ্ছুত, ধনী-গরিবে কোনও ভেদাভেদ থাকত না, যাতে বড়োলোকি ঠাটঠমক, চালচলন বা দেমাক দেখাবার কোনো সুযোগই ছিল না, এসব তক্ষুনি ভুলব যখন...যখন...। বাড়ির সবাই রাগ করছে, বাবা রান্নাঘরে বসে বড়ো তাড়াতাড়ি রুটির ওপর গায়ের জ্বালা মেটাচ্ছেন, মার দৌড় তো শুধু দরজা অবধি। কিন্তু ওঁদের বিচারে আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ ফুটো নৌকোর মতোই হেলছে দুলছে; আর এদিকে আমি ডাং পেটাতে মশগুল, না আছে চানের চিন্তা, না আছে খাবার ভাবনা। ছোট্ট একটুখানি তো গুলি। কিন্তু ও যে সারা দুনিয়ার সব মেঠাইয়ের চেয়ে মিষ্টি আর খেলার মজাতে ভর্তি।

আমার বন্ধুদের মধ্যে একটি ছেলের নাম ছিল গয়া। আমার চাইতে বছর দু-তিনের বড়ো ছিল। পাতলা, লম্বাটে, বাঁদরের মতো লম্বা লম্বা পাতলা আঙুল, বাঁদরের মতোই চপলতা, তেমনি খিটখিটে ভাব। গুলি যেমনই হোক না কেন, ওর ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ত টিকটিকি যেমন পোকা

দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনে পড়ে না ওর বাবা মা ছিল কি না, কিংবা কোথায় সে থাকত, কী খেত। তবে ছেলেটি ছিল আমাদের গুলি ক্লাবের চ্যাম্পিয়ন। যে দলে সে খেলত সে দলের জয় ছিল অনিবার্য। আমার সবাই ওকে দূর থেকে আসতে দেখলে ছুটে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিজেদের দলে নিয়ে নিতাম।

একদিন আমি আর গয়াই শুধু খেলছিলাম। সে ডাং পেটাচ্ছিল, আমি গুলি লুফছিলাম। অদ্ভুত ব্যাপার হল আমরা সারাদিন ডাং পেটানোয় মশগুল থাকতে পারি, কিন্তু এক মিনিটের তরেও গুলি লুফতে ভালো লাগে না। আমি রেহাই পাবার জন্য সব চালই চেলেছিলাম যা এসব ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিহিত না হলেও মার্জনীয়। কিন্তু গয়াটা তার দান আদায় না করে আমাকে রেহাই দিচ্ছিল না।

আমি বাড়ির দিকে ছুট দিয়েছিলাম। অনুনয়-বিনয়ে কোনো কাজ হয়নি।

গয়া ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলে ডান্ডা তুলে বলেছিল—আমার দান দিয়ে যা। খুব তো বাহাদুরি করে আমাকে ডাং পেটালি, আর আমার ডাং পেটাবার বেলায় পালিয়ে যাচ্ছিস কেন?

—তুই সারাদিন ধরে ডাং পেটালে কি আমি সারাদিন ধরে খাটুনি দেব?

—হ্যাঁ, তোকে সারাদিনই খাটুনি দিতে হবে।

—খেতেটেতে যাব না?

—না, আমার দান না দিয়ে কোথাও যেতে পারবি না।

—আমি কি তোর গোলাম?

—হ্যাঁ, আমার গোলাম।

—আমি বাড়ি যাচ্ছি, দেখি আমার কী করতে পারিস!

—বাড়ি যাবি কী করে, ইয়ার্কি! দান দিয়েছি, দান আদায় করে তবে ছাড়ব।

—বেশ, কাল আমি পেয়ারা খাইয়েছিলাম, ওটা ফিরিয়ে দে।

—সে তো পেটে চলে গেছে।

—বের কর পেট থেকে। তুই খেলি কেন আমার পেয়ারা?

—পেয়ারা তুই দিয়েছিস তাই খেয়েছি। আমি তোর কাছে চাই... যাইনি।

—যতক্ষণ না আমার পেয়ারা দিচ্ছিস আমি দান দেব না।

আমি ভেবেছিলাম ন্যায় আমার দিকে। যতই হোক আমি একটা স্বার্থ নিয়ে ওকে পেয়ারা খাইয়েছিলাম। নিঃস্বার্থভাবে কে কার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। ভিক্ষে পর্যন্ত দেওয়া হয় স্বার্থেরই জন্য। গয়া যখন পেয়ারা খেয়েছে তখন আমার কাছ থেকে দান নেবার তার কী অধিকার? ঘুষ দিয়ে তো লোকে খুন পর্যন্ত হজম করে ফেলে। আমার পেয়ারাটাকে ও এমনি এমনি হজম করে ফেলবে! পেয়ারা ছিল পয়সায় পাঁচটি, যা গয়ার বাপের কপালেও জুটবে না। এ যে ডাহা অন্যায়!

গয়া আমার হাত ধরে টেনে বলেছিল—আমার দান দিয়ে যা, পেয়ারা-টেয়ারা আমি জানি না।

ন্যায় আমার পক্ষে। গয়া অন্যায়কে আঁকড়ে ধরে বসে ছিল। আমি হাত ছাড়িয়ে পালাতে চাইলাম। সে আমাকে যেতে দিচ্ছিল না। আমি ওকে গালাগালি দিয়েছিলাম, ও তার চাইতে কড়া গালি দিয়েছিল। শুধু গালিই নয়, একটা চাঁটিও মেরেছিল। আমি ওকে কামড়ে দিয়েছিলাম, ও আমার পিঠে ডান্ডা বসিয়ে দিয়েছিল। আমি কেঁদে উঠেছিলাম। গয়া আমার এই অস্ত্রের সামনে দাঁড়াতে পারেনি, পালিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলেছিলাম। ডান্ডার ঘা ভুলে

গিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম। আমি দারোগার ছেলে, একটা নিচু জাতের ছেলের হাতে মার খেয়েছি, এটা ওই বয়সেও আমার কাছে অপমানজনক মনে হয়েছিল; তবু বাড়িতে কারুর কাছে নালিশ করিনি।

দুই

সে সময় বাবা ওখান থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। নতুন জায়গা দেখার আনন্দে এতই মেতে উঠেছিলাম যে, খেলার সঙ্গীদের ছেড়ে যাবার দুঃখ মোটেই হয়নি। বাবা দুঃখিত। এটা প্রচুর পয়সা রোজগারের জায়গা ছিল। মাও দুঃখিত, এখানে সব জিনিস সস্তা, তাছাড়া পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার খুশির সীমা ছিল না। ছেলেদের কাছে বড়ো গলায় বলছিলাম, ওখানে এমন ঘরদোর মোটেই নেই। এমন সব উঁচু উঁচু বাড়ি— যেন আকাশের সঙ্গে কথা বলছে। ওখানকার ইংরেজি স্কুলে কোনও মাস্টারমশাই যদি কোনো ছেলেকে মারে তো তার জেল হয়ে যায়। বন্ধুদের ফ্যালফ্যাল করা চোখ আর বিস্ময়বিমূঢ় মুখ বলছিল, ওদের চোখে আমি কত উঁচুতে উঠে গেছি। মিথ্যাকে সত্যি করে ভাবার যে ক্ষমতা শিশুদের রয়েছে, তাকে আমরা, যারা সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে নিচ্ছি, কী করে বুঝব? ও বেচারাদের মনে আমার প্রতি না জানি কত ঈর্ষা হচ্ছিল। ওরা যেন বলছিল—তুমি ভাগ্যবান ভাই, যাও। আমাদের তো এই পোড়া গাঁয়েতেই জীবন কাটাতে হবে, মরতেও হবে।

বিশ বছর কেটে গেছে। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ওই জেলাতেই সফর করতে করতে ওই শহরেরই ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠেছি। জায়গাটা দেখেই নানান সব মধুর শৈশব-স্মৃতি মনে জেগে ওঠে, ছড়ি হাতে নিয়ে শহরে বেড়াতে বেরুই। চোখ দুটো যেন এক তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো ছেলেবেলার সে সব ক্রীড়াস্থল দেখতে ব্যাকুল হয়ে উঠছে। কিন্তু শুধু সেই পরিচিত নামখানি ছাড়া ওখানে আর কিছুই পরিচিত নেই। যেখানে ভগ্নস্তূপ ছিল সেখানে এখন পাকা বাড়ি দাঁড়িয়ে। পুরনো বটগাছটা যেখানে ছিল সেখানে এখন একটা সুন্দর বাগান। জায়গাটার চেহারাই পালটে গিয়েছে। যদি জায়গাটার নাম আর অবস্থান জানা না থাকত তাহলে ওকে চিনতেই পারতাম না। শৈশবের সঞ্চিত অমর সব স্মৃতি দুই হাত বাড়িয়ে তার সেই পুরোনো সব বন্ধুদের গলা জড়িয়ে ধরতে আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই দুনিয়া পালটে গেছে। মন চাইছে ওই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বলি, তুমি আমাকে ভুলে গেছ। আমি তো আজও তোমার সে রূপটাই দেখতে চাইছি।

হঠাৎ একটা খোলা জায়গায় আমি দু-তিনটে ছেলেকে গুলিডান্ডা খেলতে দেখি। তৎক্ষণাৎ আমি নিজেকে একেবারে ভুলে যাই। ভুলে যাই যে আমি একজন বড়ো অফিসার, সাহেবি পোশাক পরা, ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির আবরণে মোড়া।

একটি ছেলেকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি—বল তো বাবা, এখানে গয়া নামে কোনো লোক থাকে?

একটি ছেলে ডাংগুলি সামলে নিয়ে ভীরু বলায় বলল—কে, গয়া? চামার?

আমি বলে ফেলি—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই। গয়া নামের কোনও লোক আছে তো? বোধ হয় ওই লোকই।

—হ্যাঁ, আছে তো।

—একটু গিয়ে ওকে ডেকে আনতে পার?

ছেলেটি ছুটতে ছুটতে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি হাত পাঁচেকের কালাপাহাড়কে সঙ্গে নিয়ে আসে। আমি দূর থেকেই চিনে ফেলি। লাফিয়ে ওর দিকে ছুটে যেতে চাই। চাই ওর গলা জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু কী একটা ভেবে চুপ করে থাকি। বলি—কী গয়া, আমাকে চিনতে পারছ?

গয়া নুয়ে পড়ে নমস্কার করে—হ্যাঁ হুজুর, আর চিনব না কেন? আপনি ভালো আছেন তো?

—খুব ভালো আছি। তোমার কথা বলো।

—ডিপ্‌টি সাহেবের সহিস আমি।

— মতই মোহন, দুর্গা সব কোথায়? ওদের খবর জানো?

—মতই তো মরে গেছে, দুর্গা আর মোহন দু-জনেই ডাক পিওন হয়েছে। আপনি?

—আমি এই জেলার ইঞ্জিনিয়ার।

হুজুর তো ছোটোবেলা থেকেই পড়াশুনায় ভালো ছিলেন।

—এখন আর ডাংগুলি খেল?

—গয়া আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়—এখন আর ডাংগুলি কী খেলব হুজুর, এখন তো পেটের ধান্ধা থেকেই রেহাই পাওয়া যায় না।

—এসো আজ তুমি আর আমি খেলব। তুমি ডাং পেটাবে, আমি খাটুনি দেব। আমার কাছে তোমার একটা দান পাওনা আছে। আজ সেটা নিয়ে নাও।

অনেক কষ্টে গয়া রাজি হয়। ও এক টাকার মজুর। আমি বড়ো অফিসার। ওতে আমাতে মিল কই? বেচারা লজ্জা পাচ্ছে। আমারও কিন্তু কম লজ্জা হচ্ছে না; লজ্জা এজন্য নয় যে, আমি গয়ার সঙ্গে খেলতে যাচ্ছি। বরং লজ্জা এজন্য যে, লোকে এই খেলাটাকে আজব মনে করে মজা দেখবে আর বেশ ভালোমতো একটা ভিড় জমে যাবে। ওই ভিড়ে আনন্দ কোথায় থাকবে! কিন্তু না খেলেও তো থাকা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল দুজনেই শহর থেকে বহু দূরে নির্জন জায়গায় গিয়ে খেলব। ওখানে দেখবার লোক কে বসে থাকবে! মজাসে খেলব আর ছোটোবেলার সেই মিঠাইটাকে খুব রসিয়ে রসিয়ে খাব। আমি গয়াকে নিয়ে ডাকবাংলোয় এসে মোটরে চেপে দুজনে মাঠের দিকে যাই। সঙ্গে একখানা কুড়ুল নেই। আমি গম্ভীর হয়ে থাকি, গয়া ব্যাপারটাকে এখনো ঠাট্টা ভাবছে। তবুও ওর মুখে ঔৎসুক্য বা আনন্দের কোনো চিহ্ন নেই। বোধহয় আমাদের দুজনের মাঝে যে ফারাক হয়ে গেছে সেই ভাবনায় ও মগ্ন।

আমি জিজ্ঞেস করি—আমার কথা তোমার কখনো মনে পড়ত গয়া? সত্যি সত্যি বলবে।

গয়া লজ্জা পেয়ে বলে—আপনার কথা আমি ভাবব, আমি কি তার যুগ্যি? কপালে আপনার সঙ্গে কদিন খেলা লেখা ছিল তাই, নইলে আমি আবার কী?

আমি একটু দুঃখ পেয়ে বলি—আমার কিন্তু সব সময় তোমার কথা মনে পড়ত। তুমি যে আচ্ছা করে ডাণ্ডা মেরেছিলে—মনে পড়ে?

গয়া আপশোশ করে বলে—সেটা ছেলেবেলা ছিল হুজুর, ও কথা আর মনে করিয়ে দেবেন না।

—বাঃ, ওতো আমার বাল্যজীবনের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি। তোমার ওই ডাণ্ডার বাড়িতে যে রস ছিল, সে তো মানসম্মানেও পাই না, টাকাপয়সাতেও না। এমন একটি মাধুর্য তাতে ছিল যে আজও তা মন ভরিয়ে রাখে।

ততক্ষণে আমরা শহর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে এসে পড়েছি। চারদিক নিস্তব্ধ। পশ্চিম দিকে মাইলের পর মাইল বিশাল ঝিল পড়ে আছে, যেখানে এসে আমরা মাঝে মাঝে পদ্মফুল তুলে নিয়ে যেতাম, তার ঝুমকো বানিয়ে কানে পড়তাম। জৈষ্ঠ্যের সন্ধ্যা গেরুয়া রঙে ডুবে যাচ্ছে। আমি লাফ দিয়ে একটা ডাল কেটে আনি। চটপট গুলিডান্ডা তৈরি করি। খেলা শুরু হয়ে যায়। আমি গর্তে গুলি রেখে জোরে উপরে ছুঁড়ি। গুলিটা গয়ার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে হাত ছোড়ে যেন মাছ ধরছে। গুলিটা ওর পেছনে গিয়ে পড়ে। এই গয়া সেই গয়া যার হাতে গুলি যেন এসে ধরা দিত। তা ডাইনে-বাঁয়ে যেখানেই হোক, গুলি ওর হাতে এসে যেত। গুলিকে যেন সে বশীকরণ করে ফেলত। নতুন গুলি, পুরানো গুলি, ছোটো গুলি, বড়ো গুলি, ছুঁচোলো গুলি, ভোঁতা গুলি—সবই ওর হাতে এসে পড়ত। যেন ওর হাতে কোনো চুম্বক লাগানো, গুলিকে টেনে নিত। কিন্তু আজ গুলির সঙ্গে ওর সে ভালোবাসা নেই। যাক, আমি ডাং পেটাতে শুরু করি। নানারকম চোট্টামি করছি। অভ্যাসের অভাবটাকে বেইমানি করে পুষিয়ে নিচ্ছি। 'মোড়' হওয়া সত্ত্বেও ডাং পিটেই যাচ্ছি, যদিও নিয়মমতো গয়ার পালা আসা উচিত। গুলিতে একটু আস্তে আঘাত লেগে সেটা যদি অল্প একটু দূরে গিয়ে পড়ে, তাহলে আমি লাফিয়ে গিয়ে গুলি তুলে নিয়ে আবার হাঁকাই। গয়া বেনিয়ম দেখছে, কিন্তু কিছু বলছে না। যেন সে সব কায়দাকানুন ভুলে গেছে। ওর টিপ কত অভ্রান্ত ছিল। গুলি ওর হাত থেকে ছুটে এসে টন্ করে ডান্ডায় লাগত। গয়ার হাত থেকে ছুটে গুলির কাজ ছিল ডান্ডায় এসে লাগা। আর আজ লাগছেই না ওই গুলি ডান্ডায়। কখনও ডাইনে যাচ্ছে, কখনও বাঁয়ে, কখনও সামনে, কখনও পেছনে।

আধঘন্টা পেটানোর পর একবার গুলি ডান্ডায় এসে লাগে। আমি চোট্টামি করি—গুলি ডান্ডায় লাগেনি, একেবারে কাছ দিয়ে গেছে; কিন্তু লাগেনি। গয়া কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করে না।

—লাগেনি বোধ হয়।

—ডান্ডায় লাগলে কি আমি বেইমানি করতাম?

—না দাদা, আপনি কি আর বেইমানি করেন!

ছেলেবেলায় কি সাধ্যি ছিল অমন গোলমাল করে পার পাওয়া! এই গয়াই ঘাড়ে চড়ে বসত। আর আজ আমি কত সহজে ওকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছি। গাধাটা! সব কিছু ভুলে গেছে।

আচমকা গুলিটা আবার এসে ডান্ডায় লাগে, এবার এত জোরে লাগে যেন বন্দুক ছুঁড়েছে। এই প্রমাণের সামনে এবার কোনো চোট্টামি করার সাহস আমারও হয় না; তবুও একবার একে মিথ্যে বানাবার চেষ্টা করে দেখি না! আমার আর ক্ষতি কি? মেনে নিলে ভালো, নইলে দু-চার দান খাটুনি দিতে হবে। অন্ধকারের অজুহাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি ছাড়ান নিয়ে নেব। তারপর আবার কে আসছে খাটুনি দিতে!

গয়া বিজয়োল্লাসে বলে ওঠে—লেগেছে, লেগেছে; টং করে শব্দ হয়েছে।

আমি অজ্ঞতার ভান করে বলি—তুমি দেখেছ লাগতে? আমি কিন্তু দেখিনি।

—টং করে শব্দ হয়েছে, হুজুর।

—আর যদি কোনো ইটে লেগে থাকে?

আমার মুখ থেকে এই বাক্যটা ওসময় কী করে যে বেরুল, তাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হচ্ছি। এই সত্যটাকে মিথ্যে বলা মানে দিনকে রাত বলা। আমরা দুজনেই গুলিটাকে ডান্ডার সঙ্গে জোরে লাগতে দেখেছি; তা সত্ত্বেও গয়া আমার কথাটাকে মেনে নিল।

—হ্যাঁ, হয়তো ইটের সঙ্গেই লেগে থাকবে। ডান্ডায় লাগলে এতটা আওয়াজ হত না।

আমি আবার ডাং পেটাতে শুরু করি; কিন্তু এতটা খোলাখুলিভাবে জোচ্চুরির পরেও গয়ার সরলতায় আমার অনুকম্পা হতে থাকে; তাই যখন তিনবারের বার গুলি এসে ডান্ডায় লাগল আমি খুব উদারতার সঙ্গে দান দিতে রাজি হয়ে যাই।

গয়া বলে—এখন তো আঁধার নেমে গেছে দাদা, কালকের জন্য তোলা থাক।

আমি ভাবি, কাল অনেক সময় পাবে, জানি না ও কতক্ষণ ধরে পেটাবে, তাই এখনি মামলা সাফ করে ফেলা ভালো।

—না না। এখনও অনেক আলো আছে। তুমি তোমার দান নিয়ে নাও।

—গুলি দেখতে পাবেন না।

—কুছ পরোয়া নেই।

গয়া ডাং পেটাতে শুরু করে; কিন্তু তার একদম অভ্যাস নেই। সে দুবার গুলি হাঁকতে যায়, কিন্তু দুবারই ফসকে যায়। এক মিনিটেরও কম সময়ে সে দান শেষ করে ফেলে। বেচারা ঘণ্টাখানেক খেটে ছিল, কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই নিজের দান হারিয়ে বসে। আমি আমার হৃদয়ের বিশালতার পরিচয় দিই।

—আরও এক দান খেলে নাও। তুমি তো প্রথমবারেই ফসকে বসলে।

—না, এখন আঁধার হয়ে গেছে।

—তোমার আর অভ্যাস নেই দেখছি। আর খেল না বুঝি।

—খেলার সময় আর পাই কোথা, দাদা.

আমারা দুজনে মোটরে গিয়ে বসি। সন্ধ্যাবাতি জ্বলতে না জ্বলতে শহরে ফিরে আসি। গয়া যেতে যেতে বলে—কাল এখানে ডাংগুলি খেলা হবে। সব পুরানো খেলুড়েরা খেলবে। আপনিও আসবেন? যখন আপনার ফুরসত হবে, তখনি খেলুড়েদের ডাকব।

পরদিন ম্যাচ দেখতে যাই—এই জনা দশেকের এক [illegible]টা দল। ওদের মধ্যে কয়েকজন আমার খেলার সাথিও বেরুল। বেশির ভাগই যুবক, যাদের [illegible] চিনি না। খেলা শুরু হল। আমি গাড়িতে বসে বসে খেলা দেখি। আজ গয়ার খেলা দেখে. ওর নৈপুণ্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। ডান্ডার বাড়ি খেয়ে গুলি যেন আকাশ ছুঁয়ে আসে। কালকের মতো সেই সংকোচ, সেই কুণ্ঠা, সেই ঔদাসীন্য আজ নেই। ছেলেবেলার সেই গুণ আজ প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছে। কাল যদি ও আমার সঙ্গে এভাবে ডাং পেটাত, তাহলে আমি নিশ্চয় কেঁদে ফেলতাম। ওর ডান্ডার বাড়ি খেয়ে গুলি দুশো গজ দূরে গিয়ে পড়ছে।

গুলি লুফনেওয়ালাদের দলে একটি যুবক কিছু চোট্টামি করে। তার কথামতো সে গুলিটাকে লুফে নিয়েছে। গয়ার কথা হল—গুলি মাটিতে লেগে লাফিয়ে উঠেছিল। এনিয়ে দুজনের মধ্যে মারামারি হবার উপক্রম। যুবকটি চেপে [illegible]। গয়ার থমথমে মুখ দেখে ভয় পেয়ে যায়। যদি সে চুপ না করত তাহলে ঠিকই মারপিট হয়ে যেত। আমি খেলছিলাম না; কিন্তু ওদের সবার এই খেলায় আমি ছেলেবার সেই আনন্দ পাচ্ছিলাম, যখন আমরা সব কিছু ভুলে খেলায় মেতে উঠতাম। এবার আমি বুঝলাম যে কাল গয়া আমার সঙ্গে খেলেনি, কেবল খেলবার ভান

করেছে। সে আমাকে অনুকম্পার পাত্র মনে করেছে। আমি চোট্টামি করেছি, বেইমানি করেছি, কিন্তু তাতে ওর একটুও রাগ হয়নি। কারণ সে খেলছিল না, আমাকে খেলাচ্ছিল, আমার মন রাখছিল। সে আমাকে দৌড়ঝাঁপ করিয়ে আমাকে গলদঘর্ম করাতে চায়নি। আমি এখন অফিসার। এই অফিসারি আমার আর ওর মাঝখানে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এখন ওর খাতির পেতে পারি, সেলাম পেতে পারি, সাহচর্য পেতে পারি না। ছেলেবেলায় আমি তখন ওর সমকক্ষ ছিলাম। আমাদের মাঝে কোনো প্রভেদ ছিল না। এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এখন আমি শুধু ওর অনুকম্পার পাত্র। সে আমাকে তার জুড়ি মনে করে না। সে বড়ো হয়ে গেছে, আমি ছোটো রয়ে গেছি।

(গুল্লী-ডন্ডা / ১৯৩১) অনুবাদ ননী শূর

শেষ বাহানা

ইতিহাসের যে স্মরণীয় তারিখগুলো রাত জেগে মস্তিষ্কে ঢুকিয়েছিলাম সেগুলি বেমালুম ভুলে গেলেও আমার বিয়ের তারিখটা এই সমতল ভূমিতে এক স্তম্ভের ন্যায় অটল দাঁড়িয়ে আছে। না, তারিখটা ভুলিনি, ভুলতেও পারি না। বিয়ের আগের ও পরের সমস্ত ঘটনা মন থেকে মুছে গেছে, তার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সমস্ত ঘটনাগুলো এক হয়ে বিয়ের তারিখের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এই দিনটিকে ভুলে যাই; কিন্তু প্রতিদিনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যা জপ করে চলেছি তা কী করে ভুলব। যাদের কাছে ঈশ্বর ভজনা ছাড়া জীবনের উদ্ধারের আর কোনো বিকল্প নেই সেরকম বিপন্ন লোকদের জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন কেন আমি এভাবে জপ করে চলেছি।

কিন্তু বিস্মৃত জীবন থেকে কী এ জন্যই আমি পালিয়ে বেড়াতে চাই যে, আমার মনে রসবোধের বড়ো অভাব, কিংবা কোমলমতি মোহিনীশক্তির প্রতি আমার মন নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে, নাকি আমি অনাসক্তি অর্জন করেছি? কিন্তু আমি কি সত্যিই চাই না যে, যখন আমি বেড়াতে বের হব তখন আমার সঙ্গে আমার হৃদয়েশ্বরীও থাকবেন। তাকে নিয়ে দোকানে গিয়ে বিলাসদ্রব্য কেনাকাটা নিয়ে অল্পক্ষণের জন্য একটু রঙ্গরস, একটু আগ্রহ-আনন্দের আতিশয্য দেখাই। এর যে কতটা গর্ব, আনন্দ আর গুরুত্ব আছে তা আমি অনুভব করতে পারি। আমার অন্যান্য ভাইদের মতো আমার মনেও এ ব্যাপারে আলোড়ন ওঠে, কিন্তু সুখ আর ফুর্তি যে আমার ভাগ্যেই নেই।

কারণ ছবির বিপরীত দিকটাও আমি দেখতে পাই। একটা দিক যেমন মধুর ও আকর্ষণীয়, অন্য দিকটা তেমনই হৃদয়বিদারক ও ভয়ংকর। যেই না বিকেল হল, আপনি অভাগার মতো ছেলে কোলে করে তেল বা জ্বালানির দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন। আঁধার বেলায় আটার থলি বগলে পুরে গলি দিয়ে এমনভাবে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন যেন চুরি করে কিছু নিয়ে পালাচ্ছেন। সক্কাল বেলায় বাচ্চাদের কোলে নিয়ে হোমিপ্যাথি ডাক্তারের ভাঙা চেয়ারে আপনি মূর্তিমান বসে আছেন। কোনো ফেরিওয়ালার মিষ্টি ডাক শুনে ছোটোরা আকাশ ফাটানো চিৎকার জুড়লে, আপনার প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে। এমন বাপও আমি দেখেছি, অফিস থেকে ফিরতি পথে দু-চার পয়সার বাদাম বা তিলের নাড়ু কিনে লজ্জাজনক দ্রুততায় মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে চলেছেন যাতে বাড়ি পৌঁছে ছোটোদের আক্রমণের কবলে পড়ার আগেই জিনিসটি শেষ হয়ে যায়। কী ন্যক্কারজনক সেই দৃশ্য যখন মেলায় গিয়ে দেখি ছেলে কোনো খেলনার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বায়না জুড়েছে আর বাবা মহাশয় ঋষির মতো বিজ্ঞতার সঙ্গে খেলনার ক্ষণভঙ্গুরতার বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছেন।

ছবির প্রথম দিকটা আমার কাছে বেশ একটা মদির স্বপ্ন বিশেষ, কিন্তু অপর দিকটা এক নিরেট ভয়ংকর সত্য। এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালে আমার মনের সমস্ত রসবোধ উবে যায়। দাম্পত্য জীবনের এই ফাঁদে যাতে জড়িয়ে না পড়ি সেই উদ্দেশ্যে আমার সমস্ত উদ্‌ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছি। আমি জানি এ ফাঁদে পড়তে হয় আর ফাঁদটি যেমন রঙিন ও আকর্ষণীয়, পরিণামটি তেমনই ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত। এই ফাঁদে-পড়া পাখিগুলোকে পাখা ঝাপটাতে দেখেও আমি আবার সেই জালে গিয়ে পড়েছি।

কিন্তু ইদানীং কিছুদিন থেকে আমার শ্রীমতী ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছেন তাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। প্রথম প্রথম যখন ছুটিতে বাড়ি যেতাম তখন বলতাম, কোথায় যাবে? আমার এইকথা শুনেই তার মন শান্ত হয়ে যেত। তারপর অনেক ঝঞ্ঝাট আছে বলে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। এরপর তাকে সাংসারিক জীবনের ঝুটঝামেলার ভয় দেখাতাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার প্রতি তার অবিশ্বাস বেড়েছে। কাজেই ছুটি-ছাটাতেও বাড়ি যাওয়া ছেড়েছি পাছে আগ্রহের আতিশয্যে সে আমার সঙ্গেই না রওনা হয়ে পড়ে। ও যাতে আমার সঙ্গে কিছুতেই না আসে সেজন্য নানারকম অজুহাত দেখিয়ে তাকে ভয় পাইয়ে দিই।

পত্রিকার সম্পাদকের জীবন যে কী ঝামেলার সে কথাটাই বউয়ের কাছে আমার প্রথম বাহানা হিসাবে তুলে ধরলাম।

বউকে বোঝাতাম রাত বারোটায় শুতে যাই, সেও কখনও-কখনও। কোনোদিন তো প্রায় রাত কাবার হয়ে যায়। দিনভর এগলি-ওগলি বেড়াতে হয়, তবুও মাথার ওপর সব সময় খাঁড়া ঝুলেই আছে। কী জানি কবে গ্রেফতার হই বা মুচলেকা দিতে হয়। গোয়েন্দা বিভাগের একটা দল সবসময় পিছু লেগে থাকে। বাজারের মধ্যে দিয়ে যখন যাই লোকে আঙুল তুলে দেখায় — ওই দ্যাখো কাগজের লোক যাচ্ছে। যেন পৃথিবীতে যত দৈব, আধিদৈব, আর আধিভৌতিক বাধা-বিপত্তি, সবার জন্য আমিই দায়ি। আমার মাথাটা যেন মিথ্যে খবর বানানোর একটা দপ্তর। সারাটা দিন অফিসারদের সেলাম ঠুকে আর পুলিশের লোকেদের খোশামোদ করে কীভাবে যে কেটে যায় বোঝা দায়। পুলিশ কনেস্টবলদের দেখলেই বুকটা আমার শুকিয়ে ওঠে। আমার তো এই অবস্থা আর আমলারা আমাকে দেখলেই কাঁপতে থাকে। এই দ্যাখো না, সেদিন দুর্ভাগ্যবশত এক ইংরেজের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সাহেব আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী কাজ করা হয়? আমি গর্বের সঙ্গে বললাম, কাগজের সম্পাদক। সাহেব তক্ষুনি ভিতরে চলে গিয়ে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তাকিয়ে দেখি মেমসাহেব ও বাচ্চারা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে আমায় দেখছে। যেন আমি একটা ভয়ংকর কোনো জন্তু বিশেষ।

একবার ট্রেনে করে যাচ্ছি, সঙ্গে আরও দু-চারজন বন্ধুবান্ধব ছিল। পদগৌরবের সম্মানার্থে সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটেছিলাম। ট্রেনে চেপে বসেছি। এমন সময় এক সাহেব সুটকেশের গায়ে লেখা আমার নাম ও পেশাটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ নিজের বাক্স খুলে রিভলভার বের করে গুলি ভরতে লাগলেন। বোধ হয় বোঝাতে চাইলেন আমার সম্বন্ধে তিনি বেশ সতর্ক।

আমার শ্রীমতীর কাছে টাকাপয়সার অসচ্ছলতার কথা কখনও জানাইনি, কেননা মেয়ে মানুষের সঙ্গে এসব আলোচনা আমি মর্যাদাহানিকর বলে মনে করি। অবশ্যি যদি এ বিষয়ে আলোচনা করতাম তবে শ্রীমতীর চোখে নির্ঘাত আমি হতাম করুণার পাত্র।

আমার ধারণা ছিল এসবের পর শ্রীমতী আর এখানে আসার নামটি মুখে আনবে না। কিন্তু আমার অনুমান নিতান্তই মিথ্যে। তার আসার আগ্রহ কমল না।

এবার আমি আর একটি বাহানা বার করলাম। শহর হল রোগের ডিপো। খাবারদাবার যা পাওয়া যায় সবেতেই বিষের ভয়। দুধে বিষ, ঘিয়ে বিষ, ফলমূলে বিষ, শাক সবজিতে বিষ, হাওয়ায় বিষ, জলেতে বিষ। মানুষের জীবন যেন পদ্মপত্রে নীর। আজ যাকে দেখলাম বেশ আছে, কালই সে হাওয়া। এই দেখলাম দিব্যি বসে আছে, হঠাৎ বুকের ওঠা-নামাটা টুক করে বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি থেকে বেড়াতে বেরিয়ে মোটরের ধাক্কা খেয়ে স্বর্গে চলে গেল। সন্ধেবেলা কেউ যদি ঠিকমতো বাড়ি ফিরে আসে তো তাকে সৌভাগ্যবান মনে করতে হয়। কানে মশার পিনপিনানি শুনলেই বুক-হাত-পা যেন ফুলতে আরম্ভ করে। ইঁদুর দেখলে ভয়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। যেদিকে তাকাও যমরাজের রাজত্ব। যদিই বা মোটর বা ট্রামের হাত থেকে রক্ষা পাও তবে মশামাছির কবলে পড়তে হবে। ব্যস, ভেবে নিতে পারো শিয়রে মৃত্যু সব সময় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে সারাটা রাত মশার সঙ্গে যুদ্ধ, সারাদিন মাছির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। এই ছোটো প্রাণটাকে কতরকম শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ফিরি। নিশ্বাসটা পর্যন্ত কষ্ট করে টানতে হয়, পাছে ক্ষয়রোগের বীজাণু না ফুসফুসে ঢুকে পড়ে।

কিন্তু আমার কথায় শ্রীমতীর বিশ্বাস হল না। পরের চিঠিতেও সেই মিনতি ঃ তোমার চিঠি আমার চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার থেকে প্রতিদিন একটা করে চিঠি লিখো। নইলে আমি কোনো ওজরআপত্তি শুনব না। সোজা গিয়ে হাজির হব।

আমি মনে মনে ভাবলাম, খুব সস্তায় ছাড়া পেয়েছি।

কিন্তু মনে খটকা একটা রয়েই গেল। কী জানি বাবা কবে কোনদিন শহরে আসার পোকা মাথার মধ্যে ঢুকে পড়বে। তাই তৃতীয় একটা অজুহাত আমি ভেবে ঠিক করে ফেললাম। বন্ধুদের জ্বালায় নিশ্বাস নেবার সময় হয় না। সেই যে এসে বসে যাবার নামটি মুখে আনে না। যেন ঘর-দোর সব বেচে দিয়ে এসেছে। যদি নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই আরও ভালো। জাঁকিয়ে বসে চাকরকে দিয়ে ধারে ইচ্ছেমতো জিনিস কিনে আনাবে। ওদের আর কী? ধার তো আমাকেই শোধ দিতে হবে। কেউ কেউ তো এক এক সপ্তাহ পর্যন্ত পড়ে থাকে। যাবার কথা যেন তারা ভাবেই না। রোজ তাদের খাওয়াও দাওয়াও, রাত্তিরে সিনেমা থিয়েটার দেখাও; আবার সকাল পর্যন্ত তাস-পাশা খেল। বেশির ভাগ তো সব এমন যে মদ না হলে তাদের চলে না। বেশির ভাগই আসে অসুস্থ হয়ে। ডাক্তার ডেকে এনে তাদের দেখাও, সেবাযত্ন করো, প্রয়োজন হলে সারা রাত জেগে মাথায় পাখার বাতাস করো। তবু একথা শোনাতেও কেউ ছাড়ে না যে, তারা নাকি এখানে পাত্তা পায়না। আমার হাত ঘড়িটি মাসের পর মাস আমার কব্জিতে বাঁধা হয় না; বন্ধুদের হাতে হাতে নানান জলসায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আচকান কোনো এক বন্ধুর বাড়ি, কোট আর কারও কাছে, জুতো জোড়াটি আর এক বাবু এসে নিয়ে গেলেন। আমি সেই পুরোনো ছেঁড়া কোট আর ছেঁড়া চামড়ার সস্তা জুতো পরে অফিস করছি। আমি কী নতুন জিনিস আনি সেদিকে বন্ধুদের সবসময় নজর। তাই কোনো জিনিস কিনলে ভয়ে সিন্দুকে ভরে রাখি। কারও চোখ একবার পড়লে হল, অমনি সেটি পরে নেমন্তন্ন বাড়ি যাওয়ার ধুম পড়ে গেল। পয়লা তারিখে মাইনে পেলে চোরের মতো পা টিপে

বাড়িতে ঢুকি; কে জানে কোনো মহানুভব টাকার প্রতীক্ষায় দরজার গোড়াতেই ধর্না দিয়ে বসে আছে কী না? কী জানি তাদের সব দরকারগুলো এক তারিখের দিকে তাকিয়ে কেন বসে থাকে। একদিনের কথা বলি। রাত বারোটায় মাইনে নিয়ে বাড়ি ঢুকেছি, দেখি প্রায় আধডজন বন্ধু অত রাতে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছে। মাথা চাপড়ালাম। কত আর টালবাহানা করব? ওদের হাত থেকে নিস্তার আমার নেই। যদি বলি, বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, মা ভারী অসুস্থ। জবাবে বলে, বুড়োরা চট করে মরে না রে। মরবেই যদি তাহলে এতদিন বাঁচত না। দেখে নিয়ো দু-চার দিনেই ভালো হয়ে যাবে। আর যদি টেঁসেই যায় তা শোকের কী আছে, খুশিরই কথা। যদি বলি, খাজনা জমা দেওয়ার জন্য তাগাদা পেয়েছি তখন বলবে, আজকাল তো শোনা যাচ্ছে খাজনা দেওয়া উঠে যাবে, তাই যদি হয় টাকা জমা দেবার কোনো দরকারই নেই। পুজো বা মানত এইরকম কোনো উপলক্ষ যদি তুলি তাহলেও উপদেশ দেবে, ভারি আজব লোক তো তুমি। এইসব কুপ্রথাগুলো এখনও মান নাকি? মর্যাদায় বাধে না? যদি তোমাদের মতো লোকেরাই এর গোড়াটা কেটে বাদ না দেয় তাহলে কি আকাশ থেকে লোক পড়বে? আসলে কথা হল, আমার বাঁচার কোনো পথ নেই।

আমি ভেবেছিলাম, আমার এই চালটি ঠিক নিশানায় গিয়ে বিঁধবে। এমন বাড়ি, যে বাড়ি বলতে গেলে বন্ধুদের হাতেই চলে গিয়েছে, সেখানে কোন মহিলা থাকতে চাইবে। কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যে। জবাবে সেই একই আগ্রহ।

আবার আমি চতুর্থ বাহানা দেখাই। এখানকার বাড়িগুলো যেন এক-একটা পাখির খাঁচা। আলোবাতাস কিছু নেই। এমন দুর্গন্ধ চর্তুদিকে যে গা ঘিন ঘিন করে। না জানি কত লোকের এই দুর্গন্ধের জন্যে বিসূচিকা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা পর্যন্ত হয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়ল তো ব্যস, ঘর চুঁইতে আরম্ভ করল। বাইরে হয়তো এক ঘন্টা বৃষ্টি পড়ল, কিন্তু ঘরের ভেতরে বৃষ্টি পড়তে থাকবে সারারাত ধরে। এমন বাড়ি খুব কম আছে, যেখানে ভূতপ্রেতের উপদ্রব নেই। লোকেরা রাতে ভয়ের স্বপ্ন দেখে। কত লোক উন্মাদ রোগে ভুগছে। আজ নূতন বাড়িতে ঢুকে আগামীকালই তাদের বাড়ি বদলের চিন্তা করতে হয়। ঠেলাভর্তি আসবাবপত্র যাচ্ছে আর আসছে। যেদিকে তাকাও ঠেলা আর ঠেলা। শহরে চুরির উপদ্রব এত বেশি যে, ভালোয় ভালোয় রাত কাটলে দেবতার উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া হয়। অর্ধেক রাত হতে না হতেই চোর-চোর রব উঠবে। লোকেরা দরজার আড়ালে মোটা মোটা লাঠি, জুতো, চিমটে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; তবুও চোরেরা এমনই চৌকশ যে চোখে ধুলো দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। আমার এক অকৃত্রিম বন্ধু আছে। স্নেহবশত আমার কাছে তিনি অনেকক্ষণ থাকেন। একদিন রাতের বেলায় বাসনকোশনের আওয়াজ পেয়ে আমি যেই না আলো জ্বালিয়েছি দেখি সেই বন্ধু মহাশয় বাসনকোশন গোছাচ্ছেন। আমাকে দেখে একেবারে হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, আমি তোকে ঘাবড়ে দিয়ে মজা দেখব ভেবেছিলাম। মনে মনে আমি বুঝে নিলাম, নিঃসাড়ে যদি বেরিয়ে যেতে পারতে তাহলে বাসনগুলো হত তোমার, জেগে গেছি বলে ঘাবড়ে দিয়ে মজা করা হল। কিন্তু সে আমার ঘরে ঢুকল কী করে সেটা রহস্যই রয়ে গেল। হয়তো রাত্তিরে তাস খেলে ফিরে যাবার সময় বাইরে না গিয়ে নীচের তলায় অন্ধকার ঘরে ঘাপটি মেরে বসে ছিল।

একদিন এক মহাশয় ব্যক্তি আমাকে দিয়ে একটা চিঠি লেখাতে এলেন। ঘরে দোয়াত-কলম না থাকায় আমি ওপরের ঘরে তা আনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি বন্ধু উধাও আর সেই সঙ্গে আমার ফাউনটেন পেনটিও উধাও। আসল কথা হল নগরজীবন নরকজীবনের চেয়ে কিছু কম দুঃখজনক নয়।

কিন্তু আমার শ্রীমতী তখন শহরজীবনের জাদুর নেশায় একেবারে আচ্ছন্ন। আমার কোনো বাহানাই ধোপে টিকল না। এই চিঠির জবাবে তিনি জানালেন — একটার পর একটা বাহানা তুমি আমায় দেখিয়ে চলেছ। কিন্তু আর আমি কখনোই এসব মানছি না। এবার তুমি নিজে এসে আমায় নিয়ে যাও।

শেষ পর্যন্ত আমায় পঞ্চম বাহানাও খুঁজে বার করতে হল। এবার ফেরিওয়ালাদের নিয়ে পড়লাম। বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই বিচিত্র সব ডাক শুনতে পাবে। ব্যাবেলের মিনার তৈরির যুগেও এমন অর্থহীন শব্দ বোধহয় শোনা যেত না। কিন্তু এগুলো ফেরিওয়ালাদের কথার খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা যদি ঢোল, কত্তাল, মঞ্জিরা বাজিয়ে বাজিয়ে লোকজনকে নিজের জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট করত তবেই বেশ হত। কিন্তু উলটো বুদ্ধি লোকগুলোর মাথায় এত জোগাবে কী করে? এমন পৈশাচিক স্বরে চেঁচায় যে শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। বাচ্চারা ভয়ে মায়ের কোলো সিঁটিয়ে বসে থাকে। আমিও রাতে মাঝে মাঝে আঁতকে উঠি। একদিন তো আমাদের পাড়ায় একটা দুর্ঘটনাই ঘটে গেল। রাত তখন প্রায় এগারোটা। কোনো মহিলা রাত্রে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে উঠেছিলেন, এমন সময় ফেরিওআলার ভয়ংকর ডাক শুনে তিনি হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে অজ্ঞান হয়ে যান। কয়েকমাস ধরে ওষুধ খেয়ে তবে তিনি সেরে ওঠেন। আজকাল তিনি কানে তুলো গুঁজে ঘুমোন। এমন ঘটনা শহরে প্রায়ই ঘটে। আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যারা দেশের বাড়ি থেকে নিজেদের বউকে এনেছিল; কিন্তু বেচারিরা পরের দিনই ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাকের ভয় পেয়ে ফিরে গিয়েছে।

এর জবাবে শ্রীমতী লিখলেন — তুমি ভাবছ ফেরিওয়ালাদের ডাক শুনে আমি ভয় পাব? এখানে শেয়ালের হুক্কাহুয়া আর পেঁচার ডাকে আমি ভয় পাই না; আর কিনা ফেরিওয়ালাকে ডরাব?

সব শেষে আমি এমন একটা বাহানা বার করলাম যার আর মার নেই বলে বিশ্বাস হল। কিন্তু এ ব্যাপারটিতে আমার দুর্নামের একটু ভয় ছিল। কিন্তু ওই বিপদের তুলনায় এ দুর্নামের ভয় আমার কাছে কিছুই নয়।

আমি আবার লিখলাম — শহরজীবন ভদ্রঘরের মহিলাদের জন্য নয়। এখানে ঝি-চাকরানিরা এত কটু কথা বলে, কথার জবাব গালাগালিতে দেয়, আর তাদের সাজগোজের ঠাট যদি দেখ, ভালো ভালো ঘরের বউঝিরা লজ্জায় মরে যাবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সোনায় মোড়া। সামনে দিয়ে যখন হেঁটে যায় তখন ঝলকে ঝলকে সুগন্ধি ছড়িয়ে দিয়ে যায়। গিন্নিরা এত ঠাট পাবে কোথায়? তাদের তো আরো নানান চিন্তাভাবনা আছে। ঝিগুলোর তো সাজগোজ ও ঠাটঠমক ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। নিত্যনতুন ঢং, নিত্যনতুন ঠাট। এমন চটুল যেন শরীরে রক্তের বদলে পারা ভরা আছে। তাদের জাঁক, জমক আর মুখের মুচকি হাসি দেখলে বাড়ির গিন্নিরা

লজ্জা পাবেন। আর এমনই বেহায়ার বেহদ্দ যে জোরজবরদস্তি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। যেদিকে তাকাও দেখবে তাদের মেলা বসে গেছে। তাদের জ্বালায় ভালো লোকেরা ঘরে তিষ্ঠোতে পারে না। কেউ চিঠি লেখাবার ছল করে ঢোকে, কেউ বা চিঠি পড়ে শোনাবার অছিলা নিয়ে আসে। মোদ্দা কথা হল, বাড়ির গিন্নিদের দর কমিয়ে দেওয়ার মধ্যে ওরা বেশ আমোদ পায়। এই জন্যই গৃহস্থ ঘরের বউরা শহরে কমই আসে।

জানিনা এ চিঠিতে কোথায় আমার ভুল ছিল। চিঠি লেখার তিনদিনের দিন দেখি আমার শ্রীমতী বুড়ো বেহারাকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে তিনটে কাচ্চাবাচ্চা সমেত দুরারোগ্য এক ব্যাধির মতো বীরাঙ্গনার ভঙ্গিতে এসে পৌঁছাল।

আমি তো নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? সব ভালো তো? শ্রীমতী গায়ে-জড়ানো চাদরটা খুলতে খুলতে বলল, বাড়ির মধ্যে কোনো পেতনি ঢুকে বসে নেই তো? এখানে একটি পাও যদি কেউ বাড়াতে আসে আমি তবে তার নাক কেটে নেব। অবশ্য যদি তোমার তাতে আশকারা না থাকে, তবেই।

আচ্ছা, তাহলে রহস্য এতক্ষণে ধরা পড়ল। আমি মনে মনে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলাম। আমি কী জানতাম নিজের চড় আমার নিজেরই গালে পড়বে?

(আখিরী হীলা / ১৯৩১) অনুবাদ দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কেজরিওয়াল

নতুন বিয়ে

দেহটা আমাদের পুরোনো বটে, কিন্তু তাতে সব সময় নতুন রক্ত বইতে থাকে।

এই নবীন রক্তপ্রবাহের উপরই আমাদের জীবন নির্ভরশীল। জগৎ সংসারের এই চিরন্তন নিয়মে এই নবীনতা দেহের প্রতি অণুতে পরমাণুতে তারের ঝংকারের মতো ঝংকৃত হতে থাকে আর তাই একশো বছরের বুড়িও বিয়ের কনে বউ সেজে বসে।

লালা ডঙ্গামল যেদিন নতুন বিয়ে করেছেন সেদিন থেকে তাঁর যৌবন নতুন করে জেগে উঠেছে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিল, বাড়িতে উনি খুব কমই থাকতেন। সকাল থেকে বেলা দশটা-এগারোটা অবধি তো পূজা-অর্চনা নিয়েই কাটাতেন। তারপর খেয়েদেয়ে দোকানে চলে যেতেন। দোকান থেকে রাত একটা নাগাদ বাড়ি ফিরতেন। ফিরে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। লীলা যদি কোনোদিন আর একটু সকাল করে আসতে বলত তাহলে রেগেমেগে বলতেন—তোমার জন্যে কি দোকান-টোকান সব ছেড়েছুড়ে দেব, না রুজিরোজগার বন্ধ করে দেব? এখন আর সে দিনকাল নেই যে, একটি ঘট ভরে জল দিয়েই মা-লক্ষ্মীকে তুষ্ট করা যাবে। আজকাল ওঁর দোরে মাথা খুঁড়লেও ওঁর মন পাওয়া যায় না। শুনে লীলা বেচারি চুপ করে যেত।

ছ মাস আগেকার কথা। লীলার জ্বর হয়েছিল। লালাজি দোকানে যাবার সময় সে ভয়ে ভয়ে বলেছিল—শোনো, শরীরটা আমার আজ ভালো নেই। একটু তাড়াতাড়ি করে বাড়ি এসো।

ডঙ্গামল পাগড়িটা খুলে খুঁটিতে টাঙিয়ে রাখল, রেখে বলল—আমি বাড়িতে বসে থাকলে যদি তোমার শরীর ভালো হয়ে যায়, বেশ তাহলে আমি দোকানে যাব না।

লীলা হতাশ হয়ে বলল—দোকানে যেতে তো আমি বারণ করছি না। আমি শুধু একটু সকাল-সকাল বাড়ি আসতে বলছি।

— আমি কি তাহলে দোকানে বসে বসে মজা ওড়াই?

লীলা একথার কী উত্তর দেবে? স্বামীর এমন স্নেহহীন ব্যবহার ওর কাছে এই নতুন নয়। ইদানীং কয়েক বছর ধরে তার রূঢ় অভিজ্ঞতা হচ্ছিল যে, এ সংসারে তার কোনও কদর নেই। প্রায়ই এ সব কথা নিয়ে সে চিন্তাভাবনাও করে, কিন্তু নিজের কোনও অপরাধ খুঁজে পায় না। স্বামীর সেবাযত্ন আজকাল সে আগের চেয়ে অনেক বেশি করে, স্বামীর কাজকর্মের চাপকে হালকা করার জন্য সব সময় চেষ্টা করে থাকে। সব সময় হাসিখুশি থাকে, কোনওদিন স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে না। যৌবন যদি তার ঢলে পড়ে থাকে তো তাতে আর অপরাধটা কোথায়? কারই-বা যৌবন চিরকাল টিকে থাকে? আজকাল যদি তার স্বাস্থ্য ততটা ভালো না থাকে, তবে তাতেই বা তার দোষটা কোথায়? বিনা দোষে ওকে কেন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে?

বরং এটাই তো স্বাভাবিক যে, পঁচিশ বছরের সাহচর্য এতদিনে আত্মিক ও মানসিক সাযুজ্য সৃষ্টি একরবে যা দোষকেও গুণ করে তুলবে, যা পাকা ফলের মতো অনেক বেশি রসালো, অনেক বেশি মিষ্টি, অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে। কিন্তু লালাজির বণিক-হৃদয় প্রতিটি বস্তুকে বাণিজ্যের তুলাদণ্ডে মেপে দেখে। বুড়ো গাই যদি দুধই না দিতে পারে, বাচ্চা না দিতে পারে তাহলে তার জন্য পিঁজরাপোল তো সবচেয়ে প্রশস্ত স্থান। লালাজির মতে লীলার পক্ষে তো এই যথেষ্ট যে, সে সংসারের গৃহকর্ত্রী হয়ে বিরাজ করুক, আরামসে খাকদাক আর পড়ে থাক। যত খুশি ওর গয়না গড়াক, যত খুশি গঙ্গাস্নান করুক, পূজা-অর্চনা করুক, শুধু তার কাছ থেকে দূরে থাকুক।

মানবচরিত্রের জটিলতার একটা রহস্য এই যে, ডঙ্গামল যে আনন্দ থেকে লীলাকে বঞ্চিত রাখতে চাইছিলেন, লীলার বেলায় যে আনন্দের প্রয়োজন আছে বলেই মনে করতেন না, নিজে কিন্তু তাই পাবার জন্যে সদাসর্বদা চেষ্টা করে যেতেন। চল্লিশ বছরের লীলা হয়ে গেল বুড়ি, অথচ উনি নিজে তেতাল্লিশ বছর বয়সেও তরুণ, তারুণ্যের উন্মাদনায় আর উল্লাসে ভরপুর। লীলার প্রতি ছিল তাঁর এক ধরনের অরুচি, আর ওই দুঃখিনী যখন তার ত্রুটিগুলোকে উপলব্ধি করে প্রকৃতির নির্মম আঘাত থেকে রেহাই পাবার জন্য রঙ আর প্রসাধনের আশ্রয় নিত, তখন বেচারির বুড়ো বয়সের ওসব ন্যাকামি দেখে লালাজির আরও ঘেন্না ধরে যেত। বলতেন—হায় রে লালচ! সাত ছেলের মা হয়েছ, চুলে পাক ধরেছে, মুখখানা জলে-ধোওয়া ফ্লানেল কাপড়ের মত কুঁচকে গেছে, তবু এখনও আলতা, সিঁদুর, মেহেদি আর রূপটানের লালসা! মেয়েমানুষগুলোর স্বভাবটাই কী বিচিত্র! কেন যে সাজগোজের জন্য প্রাণ এত ছটফট করে! বলি, তোমার আর কী চাই? মনটাকে কেন বুঝতে দিচ্ছ না যে, যৌবন চলে গেছে, এসব জিনিস ব্যবহার করেও ওকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।—অথচ ওদিকে উনি নিজে কিন্তু যৌবনের স্বপ্নে মশগুল। যৌবনের কামনা-বাসনা ওঁর এখনও তৃপ্ত হয়নি। শীত পড়লে এখনও রসায়ন আর পাক সেবন করে থাকেন। হপ্তায় দুবার চুলে কলপ লাগান আর মাংকি গ্ল্যান্ড নিয়ে এক ডাক্তারের সঙ্গে আজকাল চিঠিচাপাটি চালাচ্ছেন।

ওঁকে ইতস্তত করতে দেখে লীলা কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—বলতে পার একটু, কটার সময় ফিরবে?

লালাজি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করেন—তোমার শরীর আজ কেমন?

লীলা একথার কী জবাব দেবে? যদি বলে খুব খারাপ, তাহলে এই ভদ্রলোকটি হয়তো এখনই বসে পড়ে ওকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে মনের ঝাল ঝাড়বে। আর যদি বলে যে ভালো আছি, তাহলে হয়তো নিশ্চিন্ত হয়ে রাত দুটোর সময় বাড়ি ফিরবে। এই দোটানায় পড়ে ভয়ে ভয়ে বলে—এতক্ষণ তো ভালোই ছিলাম, কিন্তু এখন কিছুটা খারাপ লাগছে। তুমি যাও, দোকানে লোকজন সবাই তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, তাই বলে দেখো, দোহাই ভগবান, রাত একটা-দুটো যেন বাজিয়ে দিয়ো না। ছেলেরা সব ঘুমিয়ে পড়ে, আমার একটুও ভালো লাগে না, ভয় করে।

গলায় ভালোবাসার মধু ঢেলে শেঠজি বলেন—বারোটা নাগাদ ঠিক এসে যাব।

লীলার মুখখানা মলিন হয়ে ওঠে। বলে—দশটার মধ্যে আসতে পারবে না?

সাড়ে এগারোটার আগে কিছুতেই নয়।

— না, সাড়ে দশটা।

— বেশ, এগারোটায়।

কথা দিয়ে তো লালাজি চলে গেলেন। কিন্তু রাত দশটায় ওঁর এক বন্ধু মুজরো শুনতে ডেকে পাঠাল। এই আমন্ত্রণ কেমন করে উনি প্রত্যাখ্যান করেন? কেউ যদি আপনাকে খুব খাতির করে ডাকে আর আপনি যদি তার সে আমন্ত্রণ অস্বীকার করেন তবে সেটা কেমনতর ভদ্রতা হবে?

লালাজি মুজরো শুনতে গেলেন। রাত দুটোর সময় বাড়ি ফিরলেন। চুপি চুপি এসে চাকরকে ডেকে তুলে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। লীলা ওঁর পথ চেয়ে থেকে থেকে প্রতি মুহূর্তে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে কী জানি কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওই অসুখটা শেষ পর্যন্ত বেচারি লীলার প্রাণটাকে নিয়ে তবে ছাড়ল। ওর মৃত্যুতে লালাজির খুব দুঃখ হল। বন্ধুবান্ধবেরা সমবেদনা জানিয়ে তারবার্তা পাঠাল। একটি দৈনিক কাগজ শোক প্রকাশ করে লীলার মানসিক এবং ধার্মিক সদ্‌গুণগুলোকে বেশ অতিশয়োক্তি সহকারে বর্ণনা করল। লালাজি বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন এবং লীলার নামে বালিকা বিদ্যালয়ে পাঁচটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং শ্রাদ্ধটা এমন ধুমধামের সঙ্গে করলেন যে, এই শহরের ইতিহাসে সে কথা অনেকদিন পর্যন্ত মনে থাকবে।

ওদিকে একটা মাসও কাটতে না কাটতে লালাজির বন্ধুবান্ধবেরা টোপ ফেলতে শুরু করে দিলেন আর তারই ফল হল এই যে, ছ মাসের বিপত্নীক-জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনার পরে উনি আর একটি বিয়ে করে বসলেন। এছাড়া বেচারা কীই বা আর করবেন? জীবনে একজন সহচরীর আবশ্যকতা তো রয়েছেই, আর এ বয়সে সেটা তো একান্তই অনিবার্য।

দুই

যেদিন থেকে নতুন গৃহিণী ঘরে এল, লালাজির জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। দোকানের দিকে ওঁর আজকাল অত টান নেই। পরপর কয়েক সপ্তাহ দোকানে না গেলেও ওঁর ব্যাবসার ক্ষতি হয় না। জীবনকে উপভোগ করার যে শক্তি দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে আসছিল তা এখন জলের ছিটে পেয়ে সজীব হয়ে উঠল, শুকনো গাছ সবুজ হয়ে উঠল, তাতে নতুন নতুন মুকুল আসতে লাগল। নতুন মোটর এল, নতুন সব আসবাব দিয়ে ঘর সাজানো হল। চাকরবাকরের সংখ্যাও বেড়ে গেল। রেডিও এল, আর নিত্যনতুন সব উপহার আসতে লাগল। লালাজির বার্ধক্যের যৌবন যুবা বয়সের যৌবনের চেয়েও প্রখর হয়ে উঠল। বিদ্যুতের আলো যেমন চাঁদের আলোর চেয়েও নির্মল আর মনোরম হয়ে থাকে, এ যেন ঠিক তেমনি। লালাজির বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর এই পরিবর্তনে অভিনন্দন জানাতে এলে উনি গর্বভরে বলেন—ভাই, চিরকালই আমি যুবা ছিলাম, চিরকালই যুবা হয়েই থাকব। বার্ধক্য এখানে এলে তার মুখে কালি মাখিয়ে উলটো গাধার পিঠে চড়িয়ে শহর থেকে বার করে দেব। যৌবন আর বার্ধক্যকে কেন যে লোকে বয়সের সঙ্গে জুড়ে থাকে। বয়সের সঙ্গে যৌবনের ঠিক ততটাই সম্পর্ক যতটুকু সম্পর্ক ধর্মের সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের, টাকাপয়সার সঙ্গে বিশ্বাসের, রূপের সঙ্গে প্রসাধনের। আজকালকার যুবকগুলোকে আপনারা যুবক বলেন? ওদের এক হাজারটা যৌবনের সঙ্গে আমি আমার এক ঘণ্টার যৌবনও বিনিময় করব না। দেখেশুনে

মনে হয় ওদের জীবনে যেন কোনো উৎসাহই নেই, কোনো সাধ নেই, আহ্লাদ নেই। জীবনটা যেন গলায় লটকানো একটা ঢোল।

এ কথাগুলোকেই বাড়িয়ে কমিয়ে উনি আশার হৃদয়পটে অঙ্কিত করতে থাকেন। সব সময় ওকে সিনেমায়, থিয়েটারে আর নৌকোয় বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য সাধাসাধি করেন। কিন্তু কী জানি কেন, এসব ব্যাপারে আশার লেশমাত্র উৎসাহই নেই। ও যায় বটে তবে অনেক টালবাহানা করে। একদিন লালাজি এসে বলেন—চলো আজ বজরায় চড়ে নদীতে বেড়িয়ে আসি।

বর্ষাকাল। নদী কানায় কানায় ভরা। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা আন্তর্জাতিক সেনাদলের মতো রঙ-বেরঙের উর্দি পরে আকাশে কুচকাওয়াজ করে চলেছে। রাস্তা দিয়ে লোকে মল্লার আর বারমাস্যা গাইতে গাইতে যাচ্ছে। বাগানে বাগানে দোলনা টাঙানো।

আশা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে—আমার তো ইচ্ছে করছে না।

মৃদু অনুযোগ করে লালাজি বলেন—তোমার মনটা কেমনতর যে আমোদ-আহ্লাদ ভালো লাগে না? চলো, নদীতে একটুখানি বেড়িয়ে দেখো। সত্যি বলছি বজরায় করে বেড়াতে খুব মজা লাগবে।

—আপনি যান, আমার কত কাজ পড়ে রয়েছে।

—কাজ করার জন্য লোক রয়েছে। তুমি কেন কাজ করবে?

—ঠাকুর ভালো তরকারি রাঁধতে পারে না, খেতে বসলে আপনি না খেয়ে উঠে যাবেন।

আশা তার অবসর সময়ের বেশির ভাগই লালাজির জন্যে রকমারি খাবার তৈরি করতে কাটিয়ে দেয়। সে শুনেছে একটি বিশেষ বয়স পেরিয়ে গেলে পুরুষমানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সুখ অবশিষ্ট থাকে শুধুমাত্র রসনার স্বাদে।

লালাজির মনটা খুশি হয়ে ওঠে। ভাবেন আশা ওকে কতখানি ভালোবাসে যে তাঁরই সেবার জন্যে নদীতে বেড়াতে যেতে পর্যন্ত চাইছে না। অথচ লীলা ছিল বলতে-না-বলতেই যাবার জন্য একপায়ে খাড়া। কোনও মতে ওর হাত থেকে মুক্তি পেতে হত, খামোখা ঘাড়ে চেপে বসে সব মজা বরবাদ করে দিত।

অনুরাগ-ভরা অনুযোগ করে লালাজি বলেন—তোমার মনটাও বিচিত্র। একদিন তরকারি না হয় বিস্বাদ হলই বা তাতে এমন কী অনর্থ হবে? তুমি তো আমাকে একেবারে নিষ্কর্মা করে তুলছ। তুমি না গেলে আমিও যাব না।

আশা যেন গলা থেকে ফাঁস ছাড়ানো মতো করে বলে—আপনিও তো এখানে ওখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার মেজাজটাকে বিগড়ে দিচ্ছেন। এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে সংসারের কাজকর্ম কে করবে?

সংসারের কাজকর্মের একরত্তি পরোয়াও আমি করি না—এক চুলও না। আমি চাই তোমার মেজাজটা বিগড়ে যাক আর তুমি সংসারের এই জাঁতাকল থেকে দূরে থাক। আর তুমি বারবার আমাকে আপনি আপনি করে বলছ কেন? আমি চাই তুমি আমাকে 'তুমি' বলবে, 'তুই' বলবে, বকুনি দেবে, দাপট দেখাবে। তুমি তো আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বলে দেবতার সিংহাসনে বসাচ্ছ। আমার ঘরে আমি দেবতা নয়, চঞ্চল বালক হয়ে থাকতে চাই।

আশা হাসবার চেষ্টা করে বলে—আমি আপনাকে 'তুমি' বলব? 'তুমি তো' বলে সমানে সমানে, বড়োদের বলা যায় নাকি?

মুনিম লাখ টাকা লোকসানের খবরও যদি শোনাত, তাতেও হয়তো লালাজির এতটা দুঃখ হত না, যত না দুঃখ হয় আশার এ কথাগুলো শুনে। সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত উল্লাস যেন এক নিমেষে নিবে যায়। মাথায় তেরছা করে বসানো ফুলের নকশাকাটা টুপি, গলার গেরুয়া রঙের চুনট করা সিল্কের চাদর, সোনার বোতাম লাগানো মলমলের জরিদার পাঞ্জাবি, এসব সাজগোজ তাঁর কাছে হাস্যকর ঠেকে, সব নেশা যেন কোন এক মন্ত্রবলে উবে যায়।

হতাশ হয়ে বলেন—তুমি তাহলে যাবে কি যাবে না?

—আমার ইচ্ছে করছে না।

—তাহলে আমিও কি যাব না?

—আপনাকে আমি তো যেতে নিষেধ করছি না।

—আবার 'আপনি'?

আশা যেন ভেতর থেকে জোর করে বলে, 'তুমি', বলেই ওর মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, এমনি করেই 'তুমি' বলবে। তুমি যাবে না? যদি বলি তোমাকে যেতে হবে, তাহলে?

—তাহলে যাব, আপনার আদেশ পালন করা আমার ধর্ম।

লালাজি আদেশ দিতে পারেন না। আদেশ এবং ধর্ম কথা দুটো ওঁর কানে যেন কাঁটার মতো বেঁধে। চটেমটে বেরিয়ে যান। দেখে আশার মায়া হয়। বলে—তাহলে কখন ফিরবে?

—আমি যাচ্ছি না।

—বেশ, চল, আমিও যাচ্ছি।

জেদি বালক যেমন কান্নাকাটি করে তার ঈপ্সিত বস্তুটিকে পেয়েও সেটাকে পা দিয়ে ঠেলে দেয়, ঠিক তেমনি করে মুখ গোমড়া করে লালাজি বলেন—তোমার ইচ্ছে না করেল যেও না, আমি জোর করছি না।

—আপনি........না, তুমি রাগ করবে।

আশা গেল বটে, তবে সানন্দে নয়। আটপৌরে যে শাড়ি-জ... পরনে ছিল তা পরেই যাবার জন্য তৈরি হল। না একখানা সুন্দর শাড়ি, না জড়োয়া গয়না, না কোনো প্রসাধন, যেন এক বিধবা।

এ সব দেখলেই লালাজি মনে মনে চটে যান। বিয়ে করেছেন জীবনের আনন্দ উপভোগের জন্য, টিমটিম করা বাতিতে তেল ঢেলে তাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলবার জন্য। প্রদীপের আলো যদি উজ্জ্বলই না হল তো তাতে তেল ঢেলে কী লাভ? কী জানি কেন যে এর মনটা এত শুষ্ক আর নীরস, যেন এক উষর বৃক্ষ, যতই তাতে জল ঢালো, সবুজ কিশলয়ের দর্শন মিলবে না। জড়োয়া গয়নায় ভর্তি সব বাক্স সামনে খোলা, কত কত না জায়গা থেকে আনানো—দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে, ফ্রান্স থেকে। কত কত দামি দামি সব শাড়ি। দু-একখানা নয়, শয়ে শয়ে। কিন্তু সেসব শুধুই সিন্দুকে পোকায় কাটার জন্যে। গরিব ঘরের মেয়েদের এই হল দোষ। ওদের দৃষ্টি সব সময় সংকীর্ণ, ছোটো। না পারে খেতে, না পারে পরতে, না পারে দিতে। গুপ্তধনও যদি ওরা পায়, তবু একথাটাই ভেবে মরবে যে, খরচ করব কী করে?

নদীতে বেড়ানো হয় বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ আনন্দ হয় না।

তিন

কয়েক মাস ধরে আশার মনের সাধ-আহ্লাদকে জাগিয়ে তোলার ব্যর্থ চেস্টা করে লালাজি বুঝে নেন যে, এর জন্মটাই শোকে ভরা। তবুও হাল ছাড়েন না। এমন কারবারে মোটা টাকা লাগানোর পরে উনি তা থেকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা করার ব্যাবসাবৃত্তিকে কেমন করে ত্যাগ করেন? আমোদ-প্রমোদের নতুন নতুন পরিকল্পনা করা হয়। গ্রামোফোন যদি বিগড়ে যায়, না গায় কিংবা সেটা থেকে যদি পরিষ্কার আওয়াজ না বের হয়, তাহলে ওটাকে মেরামত করা দরকার। ওটাকে তুলে রেখে দেওয়া তো বোকামি।

এদিকে রান্নার বুড়ো ঠাকুরটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছে, তার জায়গায় তার সতেরো-আঠারো বছরের জোয়ান ছেলেটি এসেছে। ছেলেটি একটু অদ্ভুত ধরনের গেঁয়ো, একেবারে ক্যাবলাকান্ত, হাঁদারাম, কিছুই জানে না। রুটি এক-এক খানা করে এক-এক রকম। হ্যাঁ একটা জায়গায় সবগুলি সমান। সব কটার মাঝখানটা মোটা, ধারগুলো পাতলা। ডাল কোনো দিন এত পাতলা যেন চা, আবার কোনো দিন এত ঘন, যেন দই। নুন কোনো দিন এত কম যে একদম পানসে আবার কোনো দিন এমন বেশি যে একেবারে নুনখর। আশা মুখহাত ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে আর এই হাঁদাকান্তকে রান্না শেখায়। একদিন সে বলে—তুমি কেমনতর অপদার্থ, যুগল! এতখানি বয়স পর্যন্ত তুমি কি ঘোড়ার ঘাস কেটেছ যে রুটিটা পর্যন্ত বানাতে পার না?

যুগল ছলছল চোখে বলে—বউঠাকরুন, আমার বয়সটাই বা কী হয়েছে? এই তো মোটে সতেরো পুরল।

ওর কথা শুনে আশার হাসি পেয়ে যায়। বলে—রুটি বানানো শিখতে কি পাঁচ-দশ বছর লাগে?

একটা মাস আপনি শিখিয়ে দিন বউঠাকরুন, তারপর দেখবেন আমি আপনাকে কেমন রুটি করে খাওয়াই, খেয়ে আপনার মনটা খুশি হয়ে যাবে। যেদিন আমি রুটি বানাতে পারব সেদিন কিন্তু আপনার কাছ থেকে একটা পুরস্কার নেব। তরকারি তো এখন আমি একটু একটু রাঁধতে পারি, তাই না?

আশা আশকারা দেওয়া হাসি হেসে বলে—তরকারি নয়, ছাই করতে পার। এই কালকেই তো নুন এত বেশি ছিল যে খাওয়াই গেল না। কাঁচা মশলার গন্ধ বেরুচ্ছিল।

— কাল আমি যখন তরকারি রাঁধছিলাম, তখন তো কই আপনি এখানে ছিলেন না?

— ও, আমি এখানে বসে থাকব, তাহলে গিয়ে তোমার তরকারি রান্না ভালো হবে?

— আপনি বসে থাকলে আমার মাথা ঠিক থাকে।

যুগলের সোজা-সরল কথা শুনে আশার খুব হাসি পায়। হাসি চেপে রাখতে চায় সে কিন্তু তা এমনভাবে বেরিয়ে আসে যেন ভরা বোতল উপুড় করে ধরেছে।

— আর আমি না থাকলে?

— আপনি না থাকলে মাথাটা আপনার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকে। ওখানে বসে বসে কপাল চাপড়ে কাঁদে।

আশা হাসি চেপে জিজ্ঞেস করে—কেন কপাল চাপড়ে কাঁদে কেন?

— ও কথা জানতে চাইবেন না বউঠাকরুন, ওসব কথা আপনি বুঝবেন না।

আশা ওর মুখের দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকায়। অর্থ কিছুটা তো বোঝে, তবু না বোঝার ভান করে।

— তোমার বাবা এলে তুমি তো চলে যাবে?

— তা নয় তো কী করব, বউঠাকরুন? এখানে যদি কোনো কাজ দেন তো থাকব। আমাকে মোটর চালাতে শিখিয়ে দিন। আপনাকে আমি মোটরে করে রোজ খুব বেড়িয়ে আনব। না না, বউঠাকরুন, আপনি সরে যান, কড়াই আমি নামিয়ে নেব। এমন সুন্দর শাড়িখানা আপনার, যদি কোথাও দাগ লেগে যায় তো কী হবে?

আশা কড়াই নামাচ্ছিল। যুগল ওর হাত থেকে সাঁড়াশিটা কেড়ে নিতে চায়।

— সরো, সরো। হাঁদারাম কোথাকার! কড়াইটা যদি পায়ে পড়ে তো মাসের পর মাস পড়ে পড়ে কাঁদবে।

যুগলের মুখখানা কালো হয়ে যায়।

মুচকি হেসে আশা বলে—আরে, মুখখানা কেন ব্যাজার হয়ে গেল বাবুর?

যুগল কাঁদো কাঁদো মুখে বলে—বউঠাকরুন, আপনি বকাবকি করলে বুকটা আমার ভেঙে যায়। হুজুর যতই ধমকধামক দেন না কেন আমার মোটেই দুঃখ হয় না। আপনি চোখ রাঙালেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

আশা সান্ত্বনা দিয়ে বলে—আমি তো তোমাকে বকিনি, শুধু তো বললাম যে, কড়াইটা যদি পায়ের উপর পড়ে তাহলে কী হবে?

— হাত তো আপনারও। আপনার হাত থেকে যদি ফসকে পড়ে তাহলে?

লালা ডঙ্গামল রান্নাঘরের দরজায় এসে বললেন—আশা, একটু এদিকে এসো তো। দেখে যাও তোমার জন্য কত সুন্দর সুন্দর টব এনেছি। তোমার ঘরের সামনে রাখা হবে। তুমি এখানে এই ধোঁয়া কালির মধ্যে কেন হয়রান হচ্ছ? ও ব্যাটাকে বলে দাও তাড়াতাড়ি করে ঠাকুরকে আসতে বলুক, তা নইলে আমি অন্য লোক দেখে নেব। ঠাকুরের অভাব নেই। কতদিন আর রেয়াত করব, গাধাটার একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই। শুনছিস রে যুগল, লিখে দে আজ তোর বাপকে!

উনুনে তাওয়া চাপানো। আশা রুটি বেলতে ব্যস্ত। যুগল তাওয়াতে রুটি সেঁকার জন্য বসে আছে। এমন অবস্থায় আশা কী করে টব দেখতে যায়?

বলে—যুগল রুটি বেলতে গেলে ত্যাড়াবাঁকা হয়ে যাবে।

লালাজি চটেমটে বলে—রুটি ত্যাড়াবাঁকা করলে ব্যাটাকে তাড়িয়ে দেব।

আশা ওকথা কানে না তুলে বলে—পাঁচ-দশ দিনের মধ্যে শিখে নেবে, তাড়াবার দরকার কী?

— এসে দেখিয়ে দিয়ে যাও টবগুলোকে কোথায় রাখবে।

— বলেছি তো, রুটিগুলো বেলেই আসছি।

— না, আমি বলছি, রুটি তুমি বেলবে না।

— আপনি তো খামোখা জেদ করছেন।

লালাজি থ মেরে যান। এমন রুক্ষ ভাষায় আশা কোনও দিন ওঁর সঙ্গে কথা বলেনি। ওর কথার মধ্যে শুধু রুক্ষতাই নয়, তিক্ততাও রয়েছে। লজ্জিত হয়ে চলে যান। ওঁর এত রাগ হয় যে, ইচ্ছে করে টবগুলোকে ভেঙে চুরমার করে ফেলেন, আর গাছগুলোকে উনুনে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

ভয়ে ভয়ে যুগল বলে—আপনি যান বউঠাকরুন, বাবু রেগে যাবেন।

— বক বক কোরো না, চটপট রুটি সেঁকো, নইলে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর আজ আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে জামাকাপড় কিনে এনো। ভিখিরির মতন ঘুরে বেড়াও কেন? চুলগুলো এত বড়ো বড়ো কেন রেখেছ? নাপিতও জোটে না তোমার?

যুগল পরিণামের কথা চিন্তা করে বলে—জামাকাপড় যদি বানাই তাহলে বাবাকে টাকা পয়সার কী হিসেব দেব?

— আরে পাগল! আমি মাইনের টাকা থেকে বানাবার কথা বলছি না। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিয়ো।

যুগল চালাকির হাসি হাসে।

— আপনি যদি দেন তো ভালো জামাকাপড় নেব। মলমলের পাঞ্জাবি, খদ্দরের ধুতি, সিল্কের চাদর, ভালো চপ্পল।

মিষ্টি হাসি হেসে আশা বলে — আর যদি নিজের পয়সা খরচ করে বানাতে হয়?

— তাহলে জামাকাপড় বানাতে যাব কেন?

— বড্ড চালাক তো তুমি!

যুগল তার বুদ্ধিমত্তা জাহির করে বলে—লোকে নিজের বাড়িতে শুকনো রুটি খেয়ে শুয়ে থাকে, কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে তো ভালো ভালো মিষ্টিই খায়। সেখানেও যদি শুকনো রুটি মেলে তাহলে সে নেমন্তন্ন খেতে যাবেই না।

— ওসব আমি জানি না। মোটা কাপড়ের একটা জামা বানিয়ে নিয়ো আর একটা টুপি বানিয়ে নিয়ো, আর চুল কাটানোর জন্য দুআনা পয়সা বাড়তি নিয়ে নিয়ো।

যুগল অভিমানভরে বলে—থাক, আমার চাই না। ভালো জামাকাপড় পরে বেরুলে আপনার কথা মনে পড়বে। বাজে জামাকাপড় পরলে তো মনটা আরও খারাপ হবে।

— তুমি তো বড্ড স্বার্থপর, মুফতে কাপড় নেবে আবার ভালোও নেবে।

— এখান থেকে যাবার সময় আপনার একখানা ফটো আমাকে দেবেন।

— আমার ফটো নিয়ে কী করবে?

— আমার ঘরে টাঙিয়ে রাখব, রোজ দেখব। ওই যে শাড়িটা, কাল যেটা পরেছিলেন ও শাড়িটাই পরে তুলবেন, আর ওই মুক্তোর মালাটাও পরবেন। খালি গলা দেখতে আমার ভালো লাগে না। আপনার কাছে তো অনেক গয়না আছে। পরেন না কেন ওগুলো?

— গয়না তোমার খুব ভালো লাগে?

— খুব।

লালাজি আবার এসে বিরক্ত কণ্ঠে বলেন—এখনও তোর রুটি হল না রে, যুগল? কাল থেকে ব্যাটা তুই নিজে যদি ভালো করে রুটি করতে না পারিস তাহলে তোকে আমি দূর করে দেব।

আশা তাড়াতাড়ি করে হাত মুখ ধুয়ে খুব খুশিমনে লালাজির সঙ্গে টব দেখতে যায়। মুখে এখন ওর খুশির জৌলুস, কথাতেও যেন মধুমাখানো। লালাজির সব রাগ জল হয়ে যায়।

লুব্ধ চোখে সে টবগুলোকে দেখে। বলে—এ টবগুলোর একটাও আমি ছাড়ব না। সব কটা আমার ঘরের সামনে থাকেব, সব! কী সুন্দর সুন্দর গাছ! বাঃ! এগুলোর নাম বলে দাও না।

লালাজি ঠাট্টা করেন—সব টব নিয়ে কী করবে? পাঁচ-দশটা পছন্দ করে নাও। বাকিগুলো আমি বাইরে রেখে দেব।

— না মশায়, না। আমি একটাও দেব না। সবকটা এখানেই থাকবে।

— বড্ড লোভী তো তুমি।

— লোভী তো লোভী। আপনাকে একটাও আমি দেব না।

— দুটো-চারটে তো অন্তত দিও। এত খেটেখুটে এনেছি।

— না মশায়, না, এর থেকে একটাও পাওয়া যাবে না।

চার

পরদিন গয়না-টয়না পরে ফিরোজা রঙের শাড়ি গায়ে খুব সেজেগুজে আশা যখন বের হয়, দেখে লালাজির চোখে চমক খেলে যায়। ভাবেন, তাঁর প্রেমের জাদু অবশ্যই আজকাল কিছু কিছু কাজ করতে শুরু করেছে। তা নইলে উনি বারবার আগ্রহ করা সত্ত্বেও, বারবার এত মিনতি করা সত্ত্বেও আশা কোনও দিন গয়না পরেনি। মাঝেসাঝে মুক্তোর মালাটা গলায় দেয় বটে, তাও নিরাসক্তভাবে। আজ অলংকারে নিজেকে সাজিয়ে ওর খুশির সীমা নেই। হাবেভাবে যেন বলছে, দেখো আমি কত সুন্দর : বধ কলি যেন প্রস্ফুটিত হয়েছে। গায় নেশা চাপে। উনি চাইছেন যেন ওঁর বন্ধুবান্ধবেরা এসে এই সোনার প্রতিমাকে দর্শন করে তাদের চক্ষু শীতল করে এবং দেখে উনি কতটা সুখী, সন্তুষ্ট এবং প্রসন্ন। যে বিরোধীরা বিয়ের সময় নানা রকমের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল ওরা আজ এসে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখুক ডঙ্গামল কত সুখী। বিশ্বাস, অনুরাগ এবং অভিজ্ঞতা কী অদ্ভুত কাজ করেছে!

লালাজি প্রস্তাব করেন—চলো না, কোথাও থেকে একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসি। বড়ো সুন্দর হাওয়া বইছে।

আশা এখন কী করে যায়? এখনই ওকে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে। সেখান থেকে প্রায় বারোটা-একটায় ছুটি মিলবে। তারপর ঘরকন্নার আর সব কাজ এসে ঘাড়ে চাপবে। বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ঘরসংসারের কাজের বারোটা বাজিয়ে দেবে নাকি?

শেঠজি ওর হাতখানা হাতে নিয়ে বলেন—না, তোমাকে আজ আমি রান্নাঘরে ঢুকতে দেব না।

— ঠাকুর রাঁধলে কিচ্ছু খেতে পারবে না।

—তাহলে আজ ওর বিপদ আছে।

আশার মুখ থেকে সেই প্রফুল্লতা মিলিয়ে যেতে থাকে। মনটাও উদাস হয়ে যায়। একটা সোফায় শুয়ে পড়ে বলে—আজ কি জানি কেন বুকটাতে একটু ব্যথা করছে। এমন ব্যথা আগে কোনও দিন হত না।

শেঠজি ভয় পেয়ে যান।

— কখন থেকে হচ্ছে ব্যথাটা?

— হচ্ছে তো কাল রাত থেকেই, তবে কিছুটা কমে গিয়েছিল, এখন আবার হচ্ছে। থেকে থেকে সুঁচের মতো বিঁধছে।

একটা কথা মনে হতে শেঠজি মনে মনে খুশি হয়ে ওঠেন। বড়িগুলো তাহলে আজকাল কাজ দিচ্ছে। রাজবৈদ্য মশায় বলেছিলেন বটে যে, একটু বুঝেশুনে এগুলো সেবন করবেন। হবেই বা না কেন। খানদানি বৈদ্য। ওঁর বাবা ছিলেন বেনারসের মহারাজার চিকিৎসক। পুরনো আর পরীক্ষিত সব ব্যবস্থাপত্র রয়েছে ওঁর কাছে। লালাজি জিজ্ঞেস করেন—তাহলে রাত থেকেই এই ব্যথাটা হচ্ছে? তুমি তো আগে বলনি আমাকে, বৈদ্যমশায়ের কাছ থেকে কিছু একটা ওষুধ তাহলে আনিয়ে দিতাম।

— ভেবেছিলাম আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এখন দেখছি বাড়ছে।

— কোথায় হচ্ছে ব্যথাটা? দেখি তো একটু। ফোলে-টোলেনি তো।

শেঠজি আশার আঁচলের দিকে হাত বাড়ান। আশা লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে। বলে—তোমার এসব ঠাট্টাতামাশা আমার ভাল লাগছে না। এদিকে আমার প্রাণ যাচ্ছে আর তোমার কিনা ঠাট্টা মনে আসছে। যাও, গিয়ে কিছু একটা ওষুধ-টষুধ এনে দাও।

রায়বাহাদুর উপাধি পেলে উনি যত না খুশি হতেন, আপন পুরুষত্বের এই ডিপ্লোমা পেয়ে শেঠজি তার চেয়েও অনেক বেশি খুশি হন। এই বিজয়ের ঢাকঢোল না পিটিয়ে উনি কী করে শান্তিতে থাকেন? ওঁর বিয়ে করা নিয়ে যারা বিরূপ সব মন্তব্য করেছিল তাদের দুকথা শুনিয়ে দেবার কত ভালো সুযোগ এসেছে, আর তাও এত তাড়াতাড়ি!

প্রথমে যান পণ্ডিত ভোলানাথের কাছে, গিয়ে কপাল চাপড়ে বলেন—ভাই, আমি তো বড়ো বিপদে পড়ে গেছি! কাল থেকে ওর বুকে ব্যথা হচ্ছে। আমারও কিছু মাথায় আসছে না। বলছে এমন ব্যথা নাকি আগে কোনও দিন হয়নি।

ভোলানাথ তেমন কিছু একটা সহানুভূতি দেখায় না।

ওর ওখান থেকে উঠে শেঠজি তাঁর আর এক বন্ধু লালা ফাগমলের কাছে যান। গিয়ে তাকেও প্রায় একইভাবে দুঃখের কথা শোনান।

ফাগমল বড়ো বদমাশ! মুচকি হেসে বলে—আমার তো মনে হচ্ছে এসব আপনার কীর্তি।

শেঠজি আহ্লাদে আটখানা! বলেন—আমি মরছি আমার জ্বালায় আর তুমি ঠাট্টা করছ। একটুও মনুষ্যত্ব নেই তোমার মধ্যে?

আমি ঠাট্টা করছি না। এতে ঠাট্টার কীই বা আছে? উনি হলেন কচি বউ, কোমলাঙ্গী, আর আপনি হলেন গিয়ে পাকা লেঠেল, কুস্তির পালোয়ান! একথা যদি সত্যি না হয় তো আমার গোঁফ ছেঁটে ফেলব।

শেঠজির চোখ দুটো ঝকমক করে ওঠে। মনে যৌবনের উচ্ছ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে মুখে যৌবনের আভা ফুটে ওঠে। বুকটা যেন বেড়ে ওঠে। চলতে গিয়ে ওঁর পদক্ষেপ আরও বেশি দৃঢ়ভাবে মাটিতে পড়তে থাকে। মাথার টুপিটাও কী জানি কেমন করে তেরছা হয়ে যায়। সারা শরীরে যেন যৌবন ছলছল করছে।

পাঁচ

আশার আপাদমস্তক ঝলমল করছে দেখে যুগল বলে—হ্যাঁ, বউঠাকরুন, আপনি এমনি করে সেজেগুজে থাকবেন। আপনাকে আজ আমি উনুনের কাছে আসতে দেব না।

নয়ন-বাণ হেনে আশা বলে—কেন, আজ এই নতুন হুকুম কেন? আগে তো কোনো দিন তুমি মানা করনি!

— আজকের ব্যাপার আলাদা।

— শুনি তো একটু কী ব্যাপার?

— আমার ভয় হচ্ছে আপনি না রাগ করেন?

— না না, বলো তুমি, রাগ করব না।

— আজ আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে!

লালা ডঙ্গামল বহুবার আশার রূপ-যৌবনের স্তুতি করেছেন, কিন্তু তাঁর সে প্রশংসার মধ্যে আশা একটি কৃত্রিমতার গন্ধ পেত। ওঁর মুখ থেকে কথাগুলো শুনলে মনে হত যেন একজন পঙ্গু দৌড়োবার চেস্টা করছে। যুগলের এই কথাগুলোর মাঝে রয়েছে একটা উন্মাদনা।, একটা নেশা, একটা আঘাত। আশার সারা দেহে শিহরণ জাগে!

— আমার ওপর তোমার নজর লেগে যাবে যুগল, অমন করে আমাকে কেন তাকিয়ে দেখছ?

— এখান থেকে যেদিন চলে যাব, আপনার কথা খুব করে মনে পড়বে।

— রান্নাবান্না সেরে তুমি সারাদিন কী কর? দেখাই মেলে না।

— বাবু থাকেন তাই যাই না। তাছাড়া আমাকে তো এবার জবাব দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখি ভগবান কোথায় নিয়ে যান।

আশার মুখভাব কঠোর হয়ে ওঠে। বলে— কে তোমাকে জবাব দিচ্ছে?

বাবুই তো বলেন, তোকে তাড়িয়ে দেব।

— তোমার কাজ তুমি করে যাও, কেউ তাড়াবে না। আজকাল তো তুমি রুটিও ভালো করতে পারছ।

— বাবুর বড়ো বদমেজাজ!

— দু-চারদিনের মধ্যে ওঁর মেজাজ ঠিক করে দিচ্ছি।

— আপনার পাশে যখন হাঁটেন, দেখে মনে হয় আপনার বাবা।

— তুমি তো বড্ড ঠোঁটকাটা। খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবে।

কিন্তু অপ্রসন্নতার এই পাতলা আবারণ ওর মনোরহস্যকে চেপে রাখতে পারে না। আলোর মতো তা ভেতর থেকে ফুটে বেরিয়ে পড়ে।

যুগল আগের মতো নির্ভীকভাবে বলে—আমার মুখটাকে না হয় বন্ধ করে দেবেন, কিন্তু এখানে তো সবাই তাই বলে। আমার বিয়েটা যদি কেউ পঞ্চাশ বছরের বুড়ির সঙ্গে দেয় তাহলে আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব। হয় নিজে বিষ খেয়ে মরব না হয় ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব। ফাঁসিই তো হবে!

আশা তার কৃত্রিম ক্রোধ বজায় রাখতে পারে না। যুগল তার হৃদয়বীণার তারগুলোয় মিজরাবের এমন আঘাত করেছে যে, অনেক চেস্টা করেও সে তার মনের বেদনাকে চেপে রাখতে পারে না, সে বেদনা বেরিয়েই আসে, বলে—কপাল বলে তো একটা কথা আছে।

— অমন কপাল চুলোয় যাক।

— দাঁড়াও তোমার বিয়েটা একটা বুড়ির সঙ্গেই দেব, দেখে নিয়ো।

— আমিও তাহলে বিষ খাব। দেখে নেবেন।

— কেন, বুড়ি তোমাকে জোয়ান বউয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসবে, বেশি আদর-যত্ন করবে। তোমাকে ঠিক পথে চালাবে।

— ওসব মায়ের কাজ। বউ যে কাজের জন্যে, সে কাজেরই জন্য।

— বউ তাহলে কী কাজের জন্যে?

মোটরের আওয়াজ শোনা যায়। কী জানি কেমন করে আশার মাথার আঁচলখানি খসে কাঁধে এসে পড়ে। তাড়াতাড়ি করে আঁচল টেনে সে মাথায় তুলে দেয়, দিয়ে তার ঘরের দিকে ছুটে যেতে যেতে বলে, লালাজি খেয়ে দেয়ে চলে গেলে এসো।

অনুবাদ ননী শূর

(নয়া বিবাহ / ১৯৩১)

সদ্‌গতি

দুখি চামার বাড়ির দরজায় ঝাড়ু দিচ্ছিল আর তার স্ত্রী ঝুরিয়া গোবর দিয়ে ঘর লেপছিল। দুজনের যার যার কাজ শেষ হলে চামারনি বলল—তুমি গিয়ে পণ্ডিত বাবাকে বলে এস না। পরে আবার কোথাও চলে না যান।

দুখি—হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে উনি বসবেন কীসের ওপর সেটা ভেবে রেখেছিস তো?

ঝুরিয়া—কোথা থেকে একটা খাটিয়া কি পাওয়া যাবে না? মুখিয়ার বউয়ের কাছ থেকে চেয়ে আনব।

দুখি—তুই মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস যে গা জ্বলে যায়। ঠাকুরানরা আমাকে খাটিয়া দেবে? ঘর থেকে তো আগুনটাও বের করে না, খাটিয়া দেবে? কুয়োর কাছে গিয়ে এক ঘটি জল চাইলেও পাওয়া যায় না। বলেছিস ভালো, খাটিয়া দেবে! নে, আমাদের খাটিয়া ধুয়ে রেখে দে। গরমের দিন, উনি আসতে আসতে শুকিয়ে যাবে।

ঝুরিয়া—উনি আমাদের খাটিয়ায় বসবেনই না। দ্যাখো না কত আচারবিচার মেনে চলেন।

দুখি কিছুটা চিন্তিতভাবে বলল—হ্যাঁ, এটাও একটা কথা। মহুয়া গাছের পাতা ছিঁড়ে একটা পাত্র করে নিলেই হয়ে যাবে। এরকম মহুয়ার পাত্রে বড়ো বড়ো লোকেরাও খাবার খান। মহুয়ার পাতা পবিত্র। দে, একটা লাঠি দে, পাতা পেড়ে আনি।

ঝুরিয়া—পাত্র আমি বানিয়ে নেব। তুমি যাও। তবে একটা কথা, পণ্ডিত বাবাকে একটা সিধাও তো দিতে হবে। আমাদের থালাতে রাখব?

দুখি—খবরদার একাজ করবি না। তা হলে সিধাও যাবে থালারও বারোটা বাজবে। বাবা থালা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। খুব তাড়াতাড়ি ওঁর মাথা গরম হয়ে যায়। মাথা গরম হলে স্ত্রীকে পর্যন্ত ছাড়েন না। ছেলেকে একবার এত পিটিয়ে ছিলেন যে, এখনও সে ভাঙা হাত নিয়ে চলাফেরা করছে। মহুয়ার পাত্রে সিধাও দিবি, বুঝলি? তবে তুই ছুঁবি না। ঝুরি গোন্ডের মেয়েকে নিয়ে মুদির দোকান থেকে সব জিনিস কিনে নিয়ে আসবি। সিধা যেন পুরো সিধা হয়। সের খানেক আটা, আধা সের চাল, পোয়া খানেক ডাল, আধ পোয়া ঘি, লবণ, হলুদ আর পাত্রের এক ধারে চার আনা পয়সা রেখে দিবি। গোন্ডের মেয়েকে না পেলে ওই যে ভাজাভুজি করে তাকে হাতেপায়ে ধরে নিয়ে যাবি। তুই কিছু ছুঁবি না, তা হলেই অশান্তি হয়ে যাবে।

এই সব কথা বুঝিয়ে দিয়ে দুখি লাঠি হাতে নিয়ে ঘাসের বেশ বড়ো একটা বোঝা তুলে পণ্ডিতজির কাছে তার প্রার্থনা জানাতে চলল। খালি হাতে পণ্ডিতজির কাছে সে কী করে যায়? আর,

ভেট দেবার মতো ঘাস ছাড়া আর কিই বা তার ছিল? খালি হাতে দেখলে দূর থেকেই তো বাবাজি তাকে গালমন্দ করবেন।

দুই

পণ্ডিত ঘাসিরাম ছিলেন ঈশ্বরের পরম ভক্ত। ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের উপাসনায় লেগে পড়তেন। মুখহাত ধুতে আটটা বাজত, তখন শুরু হত আসল পুজো। এই পুজোর প্রথম অংশ ছিল ভাঙ তৈরি করা। তারপর আধ ঘন্টা ধরে চন্দন পিষতেন। তারপর আয়নার সামনে বসে একটা কাঠির সাহায্যে তিলক লাগাতেন। চন্দনের দুটি রেখার মাঝখানে কুমকুমের লাল টিপ আঁকা হত। তারপর বুকের উপর, হাতের উপর আঁকা হত চন্দনের গোল গোল মুদ্রা। এসবের পর ঠাকুরের মূর্তি বের করে তাকে স্নান করাতেন, তাতে চন্দন লাগাতেন, তার উপর ফুল দিতেন, ঘন্টা বাজিয়ে তাকে আরতি করতেন। দশটা বাজতে বাজতে উনি পুজো সেরে উঠতেন ও ভাঙ ছেনে বেরিয়ে আসতেন। এরই মধ্যে দু-চারজন যজমানও এসে অপেক্ষা করতেন। ঈশ্বরোপাসনার তাৎক্ষণিক ফল পেয়ে যেতেন।

আজ পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন দুখি চামার ঘাসের এক বোঝা নিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই দুখি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে জোড় হাত করে দাঁড়াল। পণ্ডিতজির তেজস্বী মূর্তি দেখে তার মন শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কী দিব্য মূর্তি! ছোট গোল-গাল মানুষটি, চকচকে টাক, ভরা গাল, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত চোখ। কুমকুম আর চন্দন পণ্ডিতজিকে দেবতাদের দীপ্তি প্রদান করেছিল।

দুখিকে দেখে শ্রীমুখে বললেন—কী রে, দুখিয়া, আজ কী মনে করে?

দুখি মস্তক অবনত করে বলল—মেয়ের শাদি হবে মহারাজ। দিন-তারিখ বিচার করে দিতে হবে। কখন আপনার সময় হবে।?

ঘাসি—আজ আমার সময় হবে না। তবে সন্ধ্যা নাগাদ যেতে পারি।

দুখি—না, মহারাজ। দয়া করে যদি আগে যান। সব জিনিস ঠিক করে রেখে এসেছি। এই ঘাস কোথায় রাখব?

ঘাসি—এই গোরুটার সামনে দিয়ে দে আর একটা ঝাড়ু নিয়ে দরজার সামনেটা সাফ করে দে। এই বৈঠকখানাও কতদিন লেপা হয় না। একেও গোবর দিয়ে লেপে দে। ততক্ষণে আমি ভোজন করে নিই। তারপর একটু বিশ্রাম করে রওনা হব। আর শোন, এই কাঠটাও চিরে দিবি। গোলাবাড়ির ওখানে ভুসি পড়ে আছে। ওগুলোকে তুলে নিয়ে গোয়ালঘরে রেখে দিবি।

দুখি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করতে লেগে গেল। দরজার সামনেটা ঝাড়ু দিয়ে দিল, বৈঠকখানা গোবর দিয়ে লেপে ফেলল। ততক্ষণে বারোটা বেজে গেছে। পণ্ডিতজি ভোজন করতে চলে গিয়েছিলেন। দুখি সকাল থেকে কিছুই খায়নি। তারও খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু এখানে খাবার কোনো ব্যবস্থা তো ছিল না! তার বাড়িও ছিল মাইল খানেক দূর। সেখানে খেতে চলে গেলে পণ্ডিতজি বিরক্ত হবেন। বেচারা খিদে চেপে রেখে লকড়ি চিরতে শুরু করে দিল। কাঠটার একটা মোটা গাঁঠ ছিল। তার উপর এর আগে অনেক ভক্ত তাদের শক্তির প্রকাশ দেখিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু

সেই কাঠ যেন সব কিছু মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়েছিল। দুখি ঘাস কেটে বাজারে নিয়ে বিক্রি করত। লকড়ি চেরার অভ্যাস তার ছিল না। তার খুরপির সামনে ঘাস মাথা নুইয়ে দিত, কিন্তু এখানে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরা কুড়ুল সেই গাঁটের উপর পড়ছিল না। কুড়ুল উলটে যেতে লাগল। ঘেমে সে নেয়ে উঠল, হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়াল। হাত তুলতে গিয়ে তুলতে পারল না। পা কাঁপতে লাগল, কোমরও সোজা করতে পারছিল না। দুখির চোখে অন্ধকার নেমে এল। তার মাথা ঘুরতে লাগল, সে চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল। তবু সে তার কাজ করে যেতে থাকল। যদি এক ছিলিম তামাক খেতে পারত তাহলে হয় তো কিছু জোর পাওয়া যেত। সে ভাবল, এখানে কলকে, তামাক এসব কোথায় পাওয়া যাবে? ব্রাহ্মণের বাড়ি। ব্রাহ্মণরা আমাদের নীচ জাতির লোকের মতো এত তামাক খায়ও না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, গ্রামে এক ঘর গোন্ড তো বাস করে। তার ওখানে গেলে কলকে তামাক পাওয়া যাবে। দুখি দ্রুত দৌড়ে তার বাড়ি গেল। যাই হোক, তার পরিশ্রম ব্যর্থ হল না। সে তাকে তামাক ও কলকে দুইই দিল। তবে সেখানে আগুন ছিল না। দুখি বলল, আগুনের চিন্তা করতে হবে না, ভাই। আমি যাচ্ছি, পণ্ডিতজির বাড়ি থেকে চেয়ে নেব। সেখানে তো এখনও রান্না হচ্ছে।

এই কথা বলে দুখি তামাক, কলকে নিয়ে চলে এসে পণ্ডিতজির বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বলল—মালিক, যদি একটু আগুন দেন, তবে তামাক খেতে পারি।

পণ্ডিতজি ভোজনে রত ছিলেন। পণ্ডিতপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন—এ কে, আগুন চাইছে?

পণ্ডিত—আরে, ওই শালা দুখিয়া চামার। বলেছিলাম, কিছু লকড়ি চিরে দে। আগুন তো রয়েছে, দিয়ে দাও।

পণ্ডিতপত্নী ভ্রূকুটি করে বললেন—তুমি তো পুঁথিপত্রের জালে জড়িয়ে ধর্মকর্ম কোনো কিছুরই আর খেয়াল রাখছ না। চামার হোক, ধোপা হোক, ব্যাধ হোক মুখ তুলে ঘরে এসে ঢুকছে। হিন্দুর বাড়ি তো নয়, সরাইখানা হয়ে গেছে। বলে দাও, দাওয়া থেকে চলে যাক, নয়তো এই জ্বলন্ত চেলা দিয়ে মুখ ঝলসে দেব। আগুন চাইতে এসেছে!

পণ্ডিতজি স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললেন—ভিতরে এসেছে তো কী হয়েছে। তোমার কোনো জিনিস তো ছোঁয়নি। মাটি পবিত্র। একটু আগুন দিচ্ছ না কেন? আমাদের কাজই তো করে দিচ্ছে। কোনো কাঠ চেরার লোককে দিয়ে লকড়ি করালে কম করে হলেও চার আনা নিত।

পণ্ডিতপত্নী গর্জে উঠে বললেন—ও ঘরের মধ্যে এল কেন?

পণ্ডিত হার স্বীকার করে বললেন—ব্যাটার কপাল খারাপ তাই।

পণ্ডিতপত্নী—ঠিক আছে, এবারের মতো আগুন দিয়ে দিচ্ছি। তবে আবার যদি কেউ এভাবে ঘরে এসে ঢোকে তবে তার মুখই জ্বালিয়ে দেব।

এই সব কথার টুকরো দুখির কানে প্রবেশ করছিল। সে মনে মনে পস্তাতে লাগল, নাহক এলাম। সত্যিই তো বলছেন, ব্রাহ্মণের ঘরে চামার কী করে আসে? বড়ো পবিত্র হয় এই সব লোক। তাই তো সংসারে এদের এত আদর, তাই তো এত সম্মান। আমাদের মতো চামার তো নয়! এই গ্রামে থেকে বুড়ো হলাম অথচ এই কথাটা মাথায় এল না!

এই জন্য পণ্ডিতপত্নী যখন আগুন নিয়ে বেরুলেন দুখির মনে হল, স্বর্গের দেবী বর দিতে এসেছেন। হাত জোড় করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে বলল—পণ্ডিত-মা, বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে

আমি অত্যন্ত অন্যায় করেছি। তা, চামারের আক্কেল তো। এত মূর্খ না হলে লাথি খেতে হবে কেন?

পণ্ডিতপত্নী চিমটে দিয়ে ধরে আগুন নিয়ে এসেছিলেন। হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে তিনি দুখির দিকে আগুন ছুঁড়ে দিলেন। আগুনের একটা বড় ফুলকি দুখির মাথায় গিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে সে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। তার মন বলল—এক পবিত্র ব্রাহ্মণের ঘর অপবিত্র করার এই হল ফল। ভগবান কত তাড়াতাড়ি শাস্তি দিয়ে দিলেন! এই জন্যই তো সবাই ব্রাহ্মণদের ভয় করে। আর সকলের টাকা মারা যেতে পারে, ব্রাহ্মণের টাকা কেউ মারুক দেখি! সর্বনাশ হয়ে যাবে, গা খসে খসে পড়তে শুরু করবে।

বাইরে এসে তামাক খেয়ে দুখি কুড়ুল নিয়ে কাজে লেগে পড়ল। খটখট আওয়াজ উঠতে লাগল।

দুখির মাথায় আগুন পড়েছিল বলে তার ওপর পণ্ডিতপত্নীর কিছু দয়ার সঞ্চার হল। পণ্ডিতজি ভোজন সেরে উঠলে তিনি বললেন—এই চামারকেও কিছু খেতে দিয়ে দি, বেচারা কখন থেকে কাজ করছে। হয়তো না খেয়েই আছে।

পণ্ডিতজি এই প্রস্তাব ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করে বললেন—রুটি আছে?

পণ্ডিতপত্নী—দু-চারটে বেঁচে যাবে।

পণ্ডিত—দু-চারটে রুটিতে কী হবে? চামার তো, অন্তত সের খানেক আটা টেনে নেবে।

পণ্ডিতপত্নী কানে হাত রেখে বললেন—আরে, বাপরে, সেরখানেক? তাহলে থাকগে।

পণ্ডিতজি এবার খুব আস্থার সঙ্গে বললেন—কিছু ভুসি-টুসি থাকে তো আটার সঙ্গে মিশিয়ে দুটো দলা বানিয়ে দাও। শালার পেট ভরে যাবে। পাতলা রুটিতে এই সব নিচু জাতের লোকের পেট ভরে না। এদের জোয়ারের মোটা রুটি দরকার।

পণ্ডিতপত্নী বললেন—রেখে দাও তো, এই রোদে কে মরতে যাবে?

তিন

দুখি তামাক খেয়ে আবার কুড়ুল ধরল। দম নেওয়ায় হাতে জোরও এসেছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আবার কুড়ুল চালাল। তারপর আবার দম ফুরিয়ে গেলে মাথায় হাত দিয়ে ওখানেই বসে পড়ল।

এরই মধ্যে গোন্ড এসে হাজির হল। সে বলল—কেন জান দিয়ে দিচ্ছ, বুড়ো দাদা? তোমার কোপে এ গাঁট কাটবে না। মিছামিছি তুমি হয়রান হচ্ছ।

দুখি মাথার ঘাম মুছে নিয়ে বলল—এখনও এক গাড়ি ভুসি আনতে হবে, ভাই।

গোন্ড—কিছু খেতে দিয়েছে না খালি কাজই করাচ্ছে? গিয়ে খাবার চাইছ না কেন?

দুখি—কী যে বল না, চিখুরি। ব্রাহ্মণের রুটি আমার হজম হবে?

গোন্ড—হজম ঠিকই হবে, আগে পাও তবে তো! ভোজন শেষ করে এখন গোঁফে তা দিয়ে শুয়ে আছে, তোমাকে লকড়ি চিড়ে দিতে হুকুম দিয়েই খালাস। জমিদাররাও কিছু খেতে দেয়, হাকিমও বেগার খাটালে কিছু না কিছু দেয়। এই লোক তাদের চেয়েও বড়ো হয়ে গেল? তবু একে বলে ধর্মাত্মা!

দুখি—আস্তে বলো ভাই, কেউ শুনে ফেললে বিপদ হবে।

এই কথা বলে দুখি আবার কুড়ুল দিয়ে কোপাতে শুরু করল। দুখিকে দেখে চিখুরির মায়া হল। সে এসে দুখির হাত থেকে কুড়ুল ছিনিয়ে নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে খুব জোরে জোরে কোপ চালাল। তবু

সেই গাঁটে একটু চিড়ও ধরল না। তখন সে কুড়ুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'তোমার কোপে এ কাটবে না, মাঝ খান থেকে প্রাণটা যাবে'—এই কথা বলে চলে গেল।

দুখি চিন্তা করতে লাগল—পণ্ডিতবাবা এই গাঁট কোথায় ফেলে রেখেছিলেন যে কাটছে না। কোনো চিড় পর্যন্ত ধরছে না। আমি আর কতক্ষণ এ কাঠ কাটতে থাকব? বাড়িতে এখনও কত কাজ পড়ে আছে। আমাদের মতো লোকের বাড়িতে একটা-না-একটা কিছু লেগেই আছে, কিন্তু এদের আর কী চিন্তা? এখন গিয়ে বরং ভুসিটা তুলে নিয়ে আসি। বলে দেব, বাবা, আজ তো কাঠ কাটতে পারলাম না, কাল এসে চিরে দেব।

দুখি ঝোড়া তুলে নিয়ে ভুসি আনতে গেল।

যদি খুব চেপে চেপে ঝোড়া ভরতে পারত তাহলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যেত; কিন্তু তাহলে ঝোড়া মাথায় তুলে দেবে কে? ঠেসে ভর্তি করে ঝোড়া তার একার পক্ষে তোলা সম্ভব ছিল না। তাই সে অল্প অল্প করে আনতে লাগল। চারটে নাগাদ ভুসি আনা শেষ হল। পণ্ডিতজির ঘুমও তখন ভাঙল। মুখহাত ধুয়ে, পান খেয়ে বাইরে এসে দেখেন—ঝোড়ায় মাথা রেখে দুখি ঘুমিয়ে আছে। খুব জোরে বললেন—কিরে দুখিয়া, তুই ঘুমিয়ে আছিস? কাঠতো এখনও যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। তুই কেন এত দেরি করছিস? এক মুঠো ভুসি আনতেই সন্ধ্যা করে ফেললি। তারপর আবার ঘুমিয়ে আছিস। ওঠ, কুড়ুল নে, লকড়ি চিরে দে। তোর দ্বারা এই লকড়িটুকু চেরা হল না? তাহলে তোর মেয়ের দিনও কিন্তু সেরকমই হবে, আমাকে দোষ দিতে পারবি না। এই জন্যই বলে, ছোটোলোকের ঘরে খাওয়া থাকলে তাদের চালচলনই বদলে যায়।

দুখি আবার কুড়ুল তুলল। যে সব কথা আগে সে ভেবে রেখেছিল তা সব ভুলে গেল। তার পেট পিঠ এক হয়ে গিয়েছিল। সকালে মুখে কিছু দিতে পারেনি। সময়ই পায়নি। উঠে দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছিল। সাহস হচ্ছিল না তবু মনকে প্রবোধ দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। পণ্ডিত মানুষ, যদি দিনক্ষণ সঠিক বিচার না করে দেন সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেই জন্যই তো সংসারে এঁদের এত সম্মান। দিন-ক্ষণেরই তো সব খেলা। যাকে খুশি সর্বনাশ করে দিতে পারেন।

পণ্ডিতজি সেই কাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিতে শুরু করলেন—হ্যাঁ, মার কোপ জোরে—আরও মার্—জোরে মার্—আরও জোরে মার্—তোর হাতে তো দেখছি জোর নেই—লাগা জোরে—দাঁড়িয়ে ভাবছিস কী। হ্যাঁ, ঠিক আছে—ফাটাতে চাইছিস তো। লাগা কোপ ওই ফাটলটায়।

দুখির কোন হুঁশ ছিল না। কে জানে কোন গোপন শক্তি তার হাতকে সচল রেখেছিল। সেই ক্লান্তি, সেই ক্ষুধা, সেই দুর্বলতা সবই যেন পালিয়ে গিয়েছিল। তার নিজের বাহুবলে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। একেকটা কোপ যেন বাজ পড়ার মতো পড়ছিল। আধ ঘন্টা ধরে সে এই ভাবে উন্মাদের মতো হাত চালাতে থাকলে হঠাৎ সেই কাঠ মাঝ বরাবর ফেটে গেল আর দুখির হাত থেকে কুড়ুলও ছিটকে পড়ল। কুড়ুলের সঙ্গো সঙ্গো দুখিও মাথা ঘুরে পড়ে গেল। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে তার শরীর জবাব দিয়ে দিয়েছিল।

পণ্ডিতজি জোরে বললেন—উঠে আর দু-এক কোপ লাগিয়ে দে। পাতলা পাতলা চেলি কিছু হয়ে যাক।

দুখি উঠল না। পণ্ডিতজিও আর দুখিকে বিরক্ত করা উচিত মনে করলেন না। পণ্ডিতজি বাড়ির ভিতরে গিয়ে ভাঙের শরবৎ খেলেন, শৌচে গেলেন, স্নান করলেন এবং পণ্ডিতের উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাইরে এলেন। দুখি তখনও সেখানে পড়ে। জোরে ডাকলেন—আরে, তুই কি পড়েই থাকবি, দুখি? চল্, তোর বাড়িতেই যাচ্ছি। সব জিনিসপত্র ঠিক ঠাক আছে তো?

তবু দুখি উঠল না।

এবার পণ্ডিতজির কিছুটা ভয় হল। কাছে গিয়ে দেখলেন দুখি কাঠ হয়ে পড়ে আছে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন—দুখিয়া মনে হয় মরে গেছে।

পণ্ডিতপত্নী ঘাবড়ে গিয়ে বললেন—ও এই মাত্র লকড়ি চিরছিল না?

পণ্ডিত—হ্যাঁ, লকড়ি চিরতে চিরতেই মরে গেছে। এখন কী হবে?

পণ্ডিতপত্নী শান্ত হয়ে বললেন—হবে আবার কী, চামারদের খবর পাঠাও, ওরা এসে মড়া তুলে নিয়ে যাক।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ল। কেবল মাত্র এক ঘর গোন্ড ছাড়া পুরো গ্রামটাতেই ছিল ব্রাহ্মণের বাস। লোকজন ও দিকের রাস্তা ছেড়ে চলতে লাগল। কুয়োর রাস্তাও ছিল ওদিক দিয়েই। তা হলে কী করে জল ভরতে যাওয়া যাবে! চামারের মড়া পড়ে থাকলে জল আনতে কে যাবে। এক বুড়ি পণ্ডিতজিকে বলল—এখনও মড়া সরিয়ে দিচ্ছ না কেন? গ্রামের লোকেরা কি কেউ জল খাবে না?

এদিকে গোন্ড গিয়ে সব চামারদের খবর দিয়ে দিয়েছিল : খরবরদার, মড়া তুলতে কেউ যাবে না। এখনই পুলিশের ঝামেলা হবে। খুশিমতো একটা গরিব লোকের প্রাণ নিয়ে নিল। পণ্ডিত হয়েছে তো কী হয়েছে? মড়া তুলেছ কি তোমাদেরও ধরে নিয়ে যাবে।

এর একটু বাদেই পণ্ডিতজি গেলেন। কিন্তু চামারদের মধ্যে কেউই মড়া সরাতে রাজি হল না। তবে দুখির স্ত্রী ও তার মেয়ে হায় হায় করতে করতে গিয়ে পণ্ডিতজির দরজায় পড়ে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল। তাদের সঙ্গে দশ-বারোজন চামারনি ছিল। তারা কেউ কাঁদছিল, কেউ প্রবোধ দিচ্ছিল। কিন্তু কোনো চামার ছিল না। পণ্ডিতজি চামারদের অনেক ধমকালেন, বোঝালেন, মিনতি করলেন; কিন্তু তাদের মনে পুলিশের ভয় ঢুকে গিয়েছিল। তাদের একজনও রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন।

চার

অর্ধেক রাত পর্যন্ত কান্নাকাটি চলল। ব্রাহ্মণ দেবতারা ঘুমোতে পারছিলেন না। তবু মড়া সরাবার জন্য কোনো চামার এগিয়ে এল না। আর ব্রাহ্মণরাই বা কী করে চামারের মড়া সরান! আচ্ছা, এসব কি শাস্ত্রপুরাণে লেখা থাকে? থাকে তো দেখিয়ে দিলে ভালো হয়।

পণ্ডিতপত্নী বিরক্তি সহকারে বললেন—এই ডাইনিগুলো মিলে চিৎকার করে মাথার পোকা নাড়িয়ে দিয়েছে। এখনও চেঁচানো বন্ধ হল না।

পণ্ডিতজি বললেন—চেঁচাতে দাও তো এই শাঁখচুন্নিগুলোকে। কতক্ষণ আর কাঁদবে? যখন বেঁচে ছিল তখন কেউ কোনো খবর নিত না। এখন মরে গেছে—হল্লা করবার জন্য সবগুলো এসে জুটেছে।

পণ্ডিতপত্নী—চামারদের কান্না কিন্তু অশুভ।

পণ্ডিত—খুবই অশুভ।

পণ্ডিতপত্নী—এখন থেকেই তো দুর্গন্ধ উঠতে শুরু করেছে।

পণ্ডিত—বেজন্মাটা চামার ছিল না, কী? এদের খাদ্যাখাদ্যের কি কোনো বাছবিচার আছে?

পণ্ডিতপত্নী—এদের তো কোনো ঘেন্নাও নেই।

পণ্ডিত—ব্যাটারা সব পতিত।

রাত কোনোরকমে শেষ হল। কিন্তু ভোরেও কোনো চামার এল না। চামরানিগুলো কেঁদেকেটে চলে গিয়েছিল। কিছু কিছু দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছিল।

পণ্ডিতজি একটা দড়ি বের করে তাতে একটা ফাঁস লাগিয়ে মড়ার পায়ে গলিয়ে দিলেন। তারপর ফাঁস টেনে শক্ত করলেন। তখনও কিছু কিছু কুয়াশা ছিল। পণ্ডিতজি দড়ি ধরে মড়া টানতে শুরু করলেন এবং টানতে টানতেই গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে এসে তাড়াতাড়ি স্নান করে দুর্গামন্ত্র জপ করে ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন।

ওদিকে শকুন ও শেয়াল আর কুকুর ও কাক মিলে মাঠের মধ্যে দুখির লাশ ছিঁড়ে খেতে লাগল। আজীবন ভক্তি, সেবা আর নিষ্ঠার এই হল পুরস্কার।

(সদ্‌গতি / ১৯৩১) অনুবাদ অমলকুমার রায়

দুই বলদের কথা

জানোয়ারের মধ্যে গাধাকে সব থেকে বুদ্ধিহীন ধরা হয়। মানুষ যখন কাউকে প্রথম শ্রেণির বেকুব বলতে চায় তখন তাকে বলে গাধা। গাধা সত্যি বেকুব। গাধার সরলতার জন্য, না তার নিরাপদ সহিষ্ণুতার জন্য তাকে এই পদবি দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। গোরু শিং চালায় আর প্রসূতা গাভী তো অনায়াসেই সিংহীর রূপ ধারণ করে ফেলে। কুকুরও খুব অবহেলিত পশু, তবু কখনও কখনও তারও ক্রোধের সঞ্চার হয়। কিন্তু গাধা ক্রুদ্ধ হয়েছে, এমন কখনও শোনা যায়নি, দেখাও যায়নি। যত চাও বেচারাকে মারো, যত খারাপ পচা ঘাসই তার সামনে ধরে দাও, তার চেহারায় অসন্তোষের কোনো ছায়া পর্যন্ত দেখা দেবে না। আবার বৈশাখ মাসে এক-আধবার একটু লাফালাফি করলেও তাকে কখনও আমি খুশি হয়েছে এমন দেখিনি। তার চেহারায় একটা স্থায়ী বিষাদ পাকাপাকি ভাবে চেপে রয়েছে। সুখদুঃখ, লাভক্ষতি কোনো অবস্থাতেই তাকে আমি অন্য রকম দেখিনি। মুনি-ঋষিদের মধ্যে যেসব গুণের সমাবেশ দেখা যায় তার সবেরই পরাকাষ্ঠা ঘটেছে তার মধ্যে, তবু তাকে বলে বেকুব। সদ্‌গুণের এত অনাদর আমি তো কোথাও দেখিনি।

সরলতা সংসারে চলার পক্ষে কখনও উপযুক্ত গুণ নয়। দেখুন না, ভারতবাসীদের আফ্রিকায় কেন এত দুর্দশা হচ্ছে? কেন ওদের আমেরিকায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না? বেচারারা মদ খায় না, দুঃসময়ের জন্য দু-চার পয়সা জমায়, প্রাণ দিয়ে কাজ করে, কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে না, দু কথা শুনিয়ে দিলেও চুপ করে থাকে, তবু তাদের বদনাম। বলা হয়, ওরা জীবনের আদর্শ খাটো করে ফেলছে। তবে ওরাও যদি ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দিতে শিখে ফেলে, তাহলে বোধ হয় সভ্য বলে আখ্যাত হবে। জাপানের দৃষ্টান্ত সামনেই রয়েছে। একটা যুদ্ধে বিজয়ের ফলেই তাকে সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে গণনার যোগ্য বানিয়ে দিয়েছে।

তবে গাধার আর এক ছোটো ভাইও রয়েছে, যে তার থেকে কিছু কম গাধা, আর সে হল 'বলদ'। যে অর্থে আমরা 'গাধা' শব্দটার প্রয়োগ করি অনেকটা সেই অর্থেই আমরা 'বলদ' কথাটারও প্রয়োগ করি। কেউ কেউ সম্ভবত বলদকে বেকুবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যাত করবেন। তবে আমার বিচার অন্যরকম। কখনও কখনও বলদ মারেও। সময় সময় দুর্বিনীত বলদও দেখা যায়। অন্য উপায়েও সে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে। অতএব তার স্থান গাধার নীচে।

ঝুরি কাছির দুই বলদের নাম ছিল হীরা আর মোতি। দুটোই ছিল পশ্চিমা জাতের— দেখতে সুন্দর, কাজে চৌকশ, আকৃতিতে বড়ো। বহু দিন এক সঙ্গে থেকে থেকে দুনের মধ্যে ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল। মুখোমুখি অথবা পাশাপাশি বসে দুজনে তাদের মূক ভাষায় একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করত। একজন আর একজনের মনের কথা কী করে বুঝে ফেলত তা আমি বলতে

পারব না। নিশ্চয়ই ওদের এমন কোনো গোপন ক্ষমতা ছিল যা থেকে জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার মানুষ বঞ্চিত। দুজনেই একজন আর একজনকে চেটে গন্ধ শুঁকে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করত। কখনও কখনও আবার দুজনের শিং একসঙ্গে মিলিত হত— সংঘর্ষের ভাবে নয়, খেলার ছলে, আত্মীয়তার সুবাদে, যেমন হয় বন্ধুদের মধ্যে, ঘনিষ্ঠতা হলে খুনসুটি লেগে থাকে। এসব ছাড়া বন্ধুত্ব কিছুটা উপর-উপর, কিছুটা হালকা ধরনের হয়ে পড়ে— যার উপর যথেষ্ট আস্থা রাখা যায় না। যখন এই দুই বলদকে হালে বা গাড়িতে জোড়া হত আর তারা ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে চলতে থাকত তখন প্রত্যেকে তাদের এই চেষ্টাই থাকত যে, ভারী ভারী বোঝাগুলো যেন তারই ঘাড়ে থাকে। দিনান্তে, দুপুরে বা সন্ধ্যায় যখন দুজনকে খুলে দেওয়া হত তখন একজন অপরজনকে চেটে নিজেদের ক্লান্তি দূর করত। চাড়িতে খোল-ভুসি দেওয়া হলে দুজনই একসঙ্গে উঠে চাড়িতে মুখ দিত এবং বসলে একসঙ্গেই বসত। একজন মুখ সরিয়ে নিলে অপরজনও মুখ সরিয়ে নিত।

একবার কী হল, ঝুরি বলদদুটোকে তার শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিল। বলদরা আর কী করে বুঝবে তাদের কোথায় পাঠানো হচ্ছে। তারা বুঝল, মালিক তাদের বেচে দিয়েছে। এভাবে বিক্রি হয়ে যাওয়া তাদের ভালো লেগেছিল কী খারাপ লেগেছিল কে জানে। তবে বাড়ি পর্যন্ত বলদ নিয়ে যেতে ঝুরির শালা গয়ার কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। পেছন থেকে তাড়ালে দুজনই ডাইন-বাঁয়ে যেতে লাগে, দড়ি ধরে সামনে থেকে টানলে দুজনই পেছনের দিকে জোর করতে থাকে আর মারলে দুজনই শিং নিচু করে ঢুঁ মারতে আসে। যদি ভগবান ওদের মুখে ভাষা দিতেন তাহলে ওরা ঝুরিকে জিজ্ঞাসা করত— আমাদের মতো গরিবদের তুমি কেন তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমরা তো তোমার সেবা করতে কখনও কসুর করিনি। যদি এত করেও তোমার কাজে না লাগতে পেরে থাকি তাহলে আরও কাজ করিয়ে নিলেই পারতে। তোমার কাজে তো আমরা মৃত্যুও কবুল করতে প্রস্তুত ছিলাম। আমরা কখনও আমাদের খাবার নিয়ে অভিযোগ করিনি। তুমি যা খেতে দিয়েছ মাথা নিচু করে তাই খেয়ে নিয়েছি। তাহলে তুমি এই শত্রুর হাতে কেন আমাদের বেচে দিলে?

সন্ধ্যার সময় দুই বলদই তাদের নতুন জায়গায় গিয়ে পৌঁছোল। সারা দিন ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও যখন তাদের চাড়িতে বেঁধে দেওয়া হল তখন তারা কেউই তাতে মুখ পর্যন্ত দিল না। মন ভারী হয়ে গিয়েছিল। নিজের ঘর বলে তারা যা ভেবে নিয়েছিল আজ সেই ঘরই চলে গেল! এই নতুন বাড়ি, নতুন গ্রাম, নতুন মানুষজন এসব তাদের অচেনা লাগছে।

দুজনই তাদের মূক ভাষায় পরামর্শ করে একজন অপরজনকে আড়চোখে দেখে নিয়ে শুয়ে পড়ল। যখন গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন দুজনে সজোরে টান মেরে দড়ি ছিঁড়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। দড়ি খুবই মজবুত ছিল। ভাবাই যায় না যে, কোনো বলদ এই দড়িও ছিঁড়তে পারে। কিন্তু এই সময় দুজনেরই শক্তি দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল আর এক এক ঝটকা টানে দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ঝুরি সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে কী, দুই বলদই তাদের চাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। দুজনেরই গলা থেকে আধেকটা করে দড়ি ঝুলছে। দুজনেরই হাঁটু পর্যন্ত কাদামাখা আর দুজনের চোখেই ছিল বিদ্রোহপূর্ণ ভালোবাসা।

ঝুরি বলদদুটোকে দেখে আহ্লাদে গদগদ হয়ে দৌড়ে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল। প্রেমালিঙ্গন ও চুম্বনের ওই দৃশ্য ছিল বড়োই সুন্দর।

বাড়ির ও গ্রামের ছেলেরা জমা হয়ে তালি বাজিয়ে বাজিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করল। গ্রামের ইতিহাসে এই ঘটনা অভূতপূর্ব না হলেও মহত্ত্বপূর্ণ তো বটেই। বালক-সভা স্থির করল, দুই পশুবীরকে অভিনন্দনপত্র দিতে হবে। কেউ বাড়ি থেকে রুটি নিয়ে এল, কেউ আনল গুড়, কেউ নিয়ে এল ছোলা, কেউবা ভুসি।

একটা ছেলে বলল— এরকম বলদ কারও নেই।

দ্বিতীয় একজন সমর্থন করে বলল— এতদূর থেকে দুজনে চলে এল!

তৃতীয় আর-একজন— বলদ না, এরা অন্য জন্মে মানুষ ছিল।

এসব কথার প্রতিবাদ কেউ করতে পারল না।

ঝুরির স্ত্রী বলদদুটোকে দরজায় দেখেই জ্বলে উঠল, বলল— কী নিমকহারাম বলদ! একদিনও ওখানে কাজ করল না, পালিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

ঝুরি নিজের বলদ সম্পর্কে এই আক্ষেপ শুনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল— নিমকহারাম কেন হবে? হয়তো খেতে-টেতে দেয়নি, কী করবে?

ঝুরির স্ত্রী তেজের সঙ্গে জবাব দিল— হ্যাঁ, তুমিই খালি বলদকে খাওয়াতে জানো, আর সবাই শুধু জল খাইয়েই রাখে।

ঝুরি খিঁচিয়ে উঠে বলল— খেতে পেলে পালাবে কেন?

ঝুরির স্ত্রী রেগে বলল— এগুলো ভেগেছে এই জন্য যে, তুমি যেমন বুদ্ধুর মতো লাই দাও ওরা তা করেনি। খাওয়াবে যেমন কাজও করাবে তেমনি। এ দুটোই কামচোর, তাই পালিয়ে এসেছে। এখন দেখব কোথা থেকে খোল আর আটার ভুসি আসে। শুকনো ভুসি ছাড়া আর কিছু দেব না, খাক বা না খেয়ে মরুক।

তাই হল। চাকরকে কড়া হুকুম দেওয়া হল যেন বলদদুটোকে খালি শুকনো ভুসি দেওয়া হয়।

দুই বলদ চাড়িতে মুখ দিয়ে দেখল কেমন ভ্যাসভ্যাসে। না আছে কোনো স্বাদ, না কোনো রস। খাবে কী? আশাভরা দৃষ্টি নিয়ে দরজার দিকে দেখতে থাকল।

ঝুরি চাকরকে বলল— একটু খোল দিয়ে দিস না কেন?

— মালকিন আমাকে মেরেই ফেলবে।

— লুকিয়ে দিয়ে দিবি।

— না, বাবা, পরে তো তুমিও আমাকে বকবে।

দুই

পরের দিন ঝুরির শালা আবার এল আর বলদদুটোকে নিয়ে চলল। এবার সে দুটোকেই গাড়িতে জুতে নিল।

দু-চার বার মোতি চেষ্টা করেছিল গাড়ি রাস্তার ধারে গর্তে ফেলে দেবে, কিন্তু হীরা সামলে নিয়েছিল। হীরার সহ্যশক্তি ছিল বেশি।

সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছে গয়া দুটোকেই মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে আগের দিনের বদমাইশির মজা বুঝিয়ে দিল।

আবার সেই শুকনো ভুসিই দেওয়া হল। নিজের দুই বলদকে সব কিছু দিল— খোল, চানা।

দুই বলদের এমন অপমান কখনও হয়নি। ঝুরি ওদের ফুলের ঝাড়ু দিয়েও কখনও ছুঁয়ে দেখেনি। তার প্রশ্রয়ে তারা আর মাটিতে পা ফেলত না। এখানে জুটল মার। আহত সম্মানের ব্যথা তো ছিলই, তার উপর পেল শুকনো ভুসি। চাড়ির দিকে তারা চেয়ে পর্যন্ত দেখল না।

দ্বিতীয় দিন গয়া বলদদুটোকে হালে জুতল; কিন্তু দুজনেই পা তুলবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিল। গয়া মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল; কিন্তু ওরা পা আর তুলল না। একবার যখন ওই নিষ্ঠুর গয়া হীরার নাকে লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারল তখন মোতি আর রাগ সামলাতে পারল না, হাল নিয়েই ছুট দিল। হাল, দড়ি, জোয়াল, জোত সব ছিঁড়েছুড়ে একাকার। গলায় লম্বা দড়ি না থাকলে দুটোকে ধরাই যেত না।

হীরা মূক ভাষায় বলল— পালানো অর্থহীন।

মোতি উত্তর দিল— তোমার প্রাণটাই তো নিয়ে নিচ্ছিল।

— এখন খুব মার শুরু হবে।

— মারতে দাও, বলদের জন্ম যখন নিয়েছি তখন মার খাওয়া থেকে আর বাঁচব কী করে?

— গয়া দুটো লোক নিয়ে দৌড়ে আসছে, দুটোর হাতেই লাঠি।

মোতি বলল— লাঠি নিয়ে আসছে, বলো তো, আমিও কিছু খেলা দেখিয়ে দিই!

হীরা বুঝিয়ে বলল— না, ভাই। দাঁড়িয়ে যাও।

— আমাকে মারবে, তা আমিও কি দু-একটাকে ফেলে দেব না?

— না, আমাদের জাতের এটা ধর্ম নয়।

মোতি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে চুপ করে গেল। গয়া এসে দুজনকে ধরে নিয়ে চলল। একটা ভালো হল কী, এবার আর মার-পিট করল না, তা না হলে মোতিও দেখিয়ে দিত। তার আরক্ত চোখ দেখে গয়া ও তার সাথি বুঝল যে, এখন চুপ করে যাওসয়াই মঙ্গল।

আজ আবার দুজনের সামনে সেই শুকনো ভুসি এনে হাজির করা হল। দুজনই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ির লোকেদের খাওয়া শুরু হয়েছিল। সেই সময় একটি ছোট্ট মেয়ে দুটো রুটি নিয়ে বেরিয়ে এসে ওই দুজনের মুখে দিয়ে চলে গেল। ওই এক রুটিতে তো আর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, তবে ওদের মন ভরে গেল। এখানেও তাহলে ভালো লোক আছে। মেয়েটি ছিল ভৈরোঁর। ওর মা মরে গিয়েছিল। সৎমা ওকে খালি মারত। তাই এই বলদদুটোর সঙ্গে ওর একরকম আত্মীয়তা হয়ে গিয়েছিল।

দুটোই সারা দিন হালে জোতা থাকত, লাঠির বাড়ি খেত, জেদ করত। সন্ধ্যায় গোয়ালে এনে বেঁধে রাখা হত আর রাত্রে ওই মেয়েটি ওদের দুটো রুটি খাইয়ে যেত। ভালোবাসার এই প্রসাদের দৌলতে দুগাল শুকনো ভুসি খেয়েও ওরা দুর্বল হয়ে পড়েনি। তবে দুজনেরই চোখে, প্রতি রোমকূপে বিদ্রোহ জমা হয়েছিল।

একদিন মোতি মূক ভাষায় বলল— হীরা, আর তো সহ্য করা যাচ্ছে না।

— কী করতে চাও?

— দেব এক-আধটাকে শিং দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে।

— তবে জানো তো, ওই মেয়েটি, যে আমাদের রুটি খাওয়ায়, সে মালিকের মেয়ে। এতে যদি ও অনাথ হয়ে যায়?

— তাহলে কি মালকিনকে ছুঁড়ে ফেলে দেব? সেই তো ওকে মারে।

— কিন্তু স্ত্রীজাতির উপর শিং চালানো মানা— এটা তুমি ভুলে যাচ্ছ?

— তুমি তো কোনো কিছুই করতে দিতে চাইছে না। তাহলে কি আজ দড়ি ছিঁড়ে ভাগব?

— হ্যাঁ, এতে আমি রাজি। তবে এত মোটা দড়ি ছিঁড়বে কী করে?

— এর একটা উপায় আছে। প্রথমে দড়ি কিছুটা চিবিয়ে নিতে হবে। তারপর এক ঝটকায় কাজ হয়ে যাবে।

রাত্রে মেয়েটি রুটি খাইয়ে চলে গেলে দুজনে মিলে দড়ি চিবোতে লাগল। তবে মোটা দড়ি মুখে ঠিক আসছিল না। বেচারারা বারে বারে জোরে চিবোতে গিয়েও থেমে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে ওই মেয়েটি এসে ঢুকল। দুজনেই মাথা নিচু করে ওর হাত চাটতে লাগল। দুজনেরই লেজ দাঁড়িয়ে গেল। সে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল— খুলে দিচ্ছি। আস্তে করে পালিয়ে যাও। তা না হলে এখানকার লোকেরা তোমাদের মেরে ফেলবে। আজ ঘরে সলা হচ্ছিল তোমাদের নাকে নসি দিয়ে দেওয়া হবে।

মেয়েটি দড়ি খুলে দিল। তবু দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মোতি তার ভাষায় জিজ্ঞাসা করল— এখন যাচ্ছ না কেন?

হীরা বলল— ঠিক আছে, চলো, কিন্তু কাল এই অনাথের উপর অত্যাচার নেমে আসবে। সবাই একেই সন্দেহ করবে।

হঠাৎ মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল— পিসার দুই বলদ পালিয়ে যাচ্ছে। বাবা, ও বাবা, দুটো বলদই পালাচ্ছে। জলদি ছোটো।

গয়া হড়হড় করে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলদ ধরতে ছুটল। ওরা দুটোতেই পালিয়েছিল, গয়া ওদের পেছন পেছন দৌড়োল। ওরা আরও জোরে ছুটল। গয়া চেঁচাতে শুরু করল। তবে গ্রামের আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য সে ফিরে এল। তাই দুই বন্ধুর পালিয়ে যাবার সুযোগ এসে গেল। ওরা সোজা দৌড়াতে দৌড়াতে চলল। এমন ছুটল যে রাস্তায় এসেছিল তার কোনো পাত্তাই ছিল না। যখন নতুন নতুন গ্রাম পড়তে লাগল তখন তারা এক খেতের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল— এখন কী করা।

হীরা বলল— মনে হচ্ছে, রাস্তা ভুল হয়েছে।

— তুমি বেঁহুশের মতো পালালে, ওখানেই ওকে মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল।

— ওকে মেরে মাটিতে ফেললে দুনিয়ার লোক কী বলত?' সে তার ধর্ম ছেড়েছে বলে আমরাও আমাদের ধর্ম ছেড়ে দেব?

দুজনই ক্ষুধায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিল। মটর-কলাইয়ের খেত ছিল। খাওয়া শুরু করে দিল। থেকে থেকে খেয়াল রাখছিল কেউ এসে না পড়ে।

যখন পেট ভরে গেল তখন দুজনই মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে পারল। আনন্দে মত্ত হয়ে নাচানাচি শুরু করে দিল। প্রথম দুজনে 'হাম্বা হাম্বা' করল। তারপর একে অপরকে শিং দিয়ে ঠেলতে লাগল। মোতি হীরাকে কয়েক পা পিছে ঠেলে দিলে হীরা এক খাদে পড়ে গেল। তখন আরও রাগ হল। সামলে নিয়ে উঠে আবার মোতির সঙ্গে লেগে পড়ল। মোতি দেখল— খেলার ছলে ঝগড়া শুরু হয়ে যাচ্ছে। সে একপাশে সরে দাঁড়াল।

তিন

আরে! এটা কী? কোনো ষাঁড় চরতে চরতে এসে পড়েছে। হ্যাঁ, ষাঁড়ই তো। বলতে বলতে সামনেই এসে পড়েছে। দুই বন্ধু পা ছুঁড়ছিল। ষাঁড় তো না, আস্ত হাতি। এটার সামনে যাওয়া মানে প্রাণান্ত হওয়া। কিন্তু না গিয়েও তো প্রাণ বাঁচবে না মনে হচ্ছে। এদিকেই তো আসছে। কী ভয়ংকর চেহারা!

মোতি মূক ভাষায় বলল— নিজেদের অহংকারে ভুলে ছিলাম। অনুরোধ-উপরোধ কাজে আসবে না।

— পালালে কী হয়?

— পালানো তো কাপুরুষতা।

— তাহলে এখানেই মরো। আমি পালাই।

— আর যদি দৌড়ানো যায়?

— তাহলে তাড়াতাড়ি কোনো একটা উপায় ঠিক কর।

— উপায় হল আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে আঘাত করতে হবে। আমি সামনে থেকে ঢুঁ মারছি, তুমি পেছন থেকে মারো। দুদিক থেকে মার পড়লে পালাবে। যখন দেখবে আমার দিকে আসছে তখন তুমি পাশ থেকে ওর পেটে শিং ঢুকিয়ে দেবে। প্রাণ বিপন্ন, তবে অন্য উপায়ও নেই।'

দুই বন্ধু প্রাণ হাতে লড়াই শুরু করল। ষাঁড়ের তো আর সংগঠিত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা ছিল না। সে এক শত্রুর সঙ্গে মল্লযুখে অভ্যস্ত ছিল . ইে সে হীরাকে আক্রমণ করল অমনি মোতি পেছন থেকে তাড়া করল। ষাঁড় যখন মোতির দিকে ফিরল তখন হীরা ঢুঁ লাগাল। ষাঁড় চাইছিল কি এক এক করে দুজনকেই ফেলে দেয়, কিন্তু এই দুজনই তো ছিল ওস্তাদ। তারা তাকে সেই অবসরই দিচ্ছিল না। একবার ষাঁড় হীরাকে খতম করার জন্য এগিয়েছে কি মোতি পাশ থেকে এসে তার পেটে শিং ঢুকিয়ে দিল। ষাঁড় রেগে গিয়ে ফিরতেই হীরা অন্য পাশ থেকে এসে শিং ঢুকিয়ে দিল। শেষে বেচারা জখম হয়ে পালাল। দুই বন্ধুতে মিলে অনেক দূর পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করল। শেষে এমন হল যে, ষাঁড় বেদম হয়ে পড়ে গেল। তখন দুজনেই তাকে ছেড়ে দিল।

দুই বন্ধু বিজয়ের আনন্দে খোশ মেজাজে চলছিল।

মোতি তার সাংকেতিক ভাষায় বলল— ::ন তো চাইছিল ব্যাটাকে শেষ করে দিই।

হীরা তিরস্কার করে বলল— যে শত্রু মাটিতে পড়ে গেছে তার উপর শিং চালাতে নেই।

— এসব ঢং। শত্রুকে এমনভাবে মারতে হবে যাতে আর উঠতে না পারে।

— এখন কী করে ঘরে ফিরবে তার কথা চিন্তা কর।

— আগে কিছু খেয়ে পরে চিন্তা করা যাবে।

সামনে মটরের খেত ছিল। মোতি ওর মধ্যে ঢুকে পড়ল। হীরা মানা করছিল, কিন্তু সে কোনো কথা শুনল না। মাত্র দু-চার গ্রাস খেতেই দুটো লোক লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসে দুই বন্ধুকে ঘিরে ফেলল। হীরা আলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, বেরিয়ে গেল। মোতি ছিল জলসেচ করা খেতে। তার পা কাদায় বসে যেতে লাগল। সে পালাতে পারল না। তাকে ধরে ফেলল। হীরা তার সাথি সংকটে পড়েছে দেখে ফিরে এল। ফাঁসবে তো দুজন একসঙ্গেই ফাঁসবে। ওরা তাকেও ধরে ফেলল।

সকালে দুই বন্ধুকে খোঁয়াড়ে বন্ধ করে দেওয়া হল।

চার

দুই বন্ধুর জীবনে এই প্রথম এটা ঘটল যে সারা দিনে খাবার একটু কুটো ঘাসও তাদের জুটল না। তারা বুঝতেই পারছিল না এ কেমন গৃহস্বামী। এর থেকে তো গয়াই ভালো ছিল। এখানে ছিল কিছু মোষ, কয়েকটা ছাগল, কয়েকটা ঘোড়া আর দুটো গাধা। কিন্তু কোনোটার সামনেই কোনো খাবার নেই। সবাই মাটিতে মড়ার মতো পড়েছিল। কয়েকটা তো এমন কমজোরি হয়ে পড়েছিল যে দাঁড়াতেই পারছিল না। সারাদিন দুই বন্ধু দরজার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, কিন্তু খাবার নিয়ে আসছে এমন কাউকেই দেখতে পেল না। তখন দুজনই দেওয়ালের নোনা মাটি চাটতে শুরু করে দিল, কিন্তু তাতে কী আর তৃপ্তি হয়?

রাত্রে যখন কোনো খাবার পাওয়া গেল না তখন হীরার মনে বিদ্রোহের আগুন ঝলসে উঠল। মোতিকে সে বলল— আর তো পারা যাচ্ছে না, মোতি।

মোতি মাথা নিচু করে জবাব দিল— আমার তো মনে হচ্ছে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

— এত তাড়াতাড়ি সাহস হারালে তো চলবে না ভাই। এখান থেকে পালাবার কোনো উপায় বের করতে হবে।

— এসো দেয়াল ভেঙে ফেলি।

— আমার দ্বারা এখন কিছু হবে না।

— বাঃ, এই শক্তি নিয়ে তড়পাচ্ছ?

— সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

খোঁয়াড়ের দেয়াল ছিল কাঁচা। হীরার তো শক্তি ছিলই। সে তার ধারালো শিং দেয়ালে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই মাটির একটা চাবড়া খসে পড়ল। এতে তার সাহস বেড়ে গেল। সে ছুটে গিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঢুঁ মারতে লাগল আর প্রতি আঘাতেই কিছু কিছু মাটি খসে পড়তে লাগল।

সেই সময় খোঁয়াড়ের চৌকিদার লণ্ঠন হাতে নিয়ে জানোয়ারদের হাজিরা নিতে এসে উপস্থিত হল। হীরার এই মাতন দেখে সে তাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল।

মোতি পড়ে থেকে বলল— শেষ পর্যন্ত মার খেলে, কী লাভ হল?

— নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে তো মারতে পেরেছি।

— এত জোরে মেরে কী লাভ হল, উলটে বাঁধা পড়ে গেলে।

— জোরে তো মারতেই থাকব যতই বাঁধা পড়ি না কেন।

— তাহলে আর বাঁচার আশা করতে হবে না।

— তাতে পরোয়া নেই। এভাবে বাঁচাও তো মৃত্যু। ভাব যদি দেয়াল ভেঙে যেত তাহলে কত প্রাণীর প্রাণ বাঁচত। আমাদের এক ভাই সব এখানে বাঁধা পড়ে আছে। কারও দেহেই যেন প্রাণ নেই। আরও দু-চার দিন যদি এভাবে চলে তবে সবাই মারা পড়বে।

— হ্যাঁ, এটা তো ঠিকই। আচ্ছা, ঠিক আছে, আবার আমি জোর লাগাচ্ছি।

মোতিও দেয়ালের ওই জায়গায় শিং চালাল। অল্প কিছু মাটি খসে পড়লে সাহসও বাড়ল। আবার দেয়ালে শিং চালিয়ে এত জোরে চাপ দিতে লাগল যে যেন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ লড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঘণ্টা দুইয়ের বলপ্রয়োগের ফলে দেয়াল উপর থেকে হাতখানেকের মতো খসে পড়ল। সে দ্বিগুণ শক্তিতে দ্বিতীয় ধাক্কা লাগালে দেয়াল আধেক পড়ে গেল।

দেয়াল ভেঙে পড়তেই আধমরা সব জানোয়ার উঠে বসল। তিনটা ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে পালাল। এর পর বেরিয়ে গেল ছাগলগুলো। তারপর মোষগুলোও পালাল। তবে গাধাদুটো তখনও আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকল।

হীরা জিজ্ঞেস করল— তোমরা দুজন কেন পালাচ্ছ না? এক গাধা উত্তর দিল— যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়?

— তাতে কী ক্ষতি? এখনও তো পালানোর সুযোগ রয়েছে।

—আমাদের ভয় হচ্ছে। আমরা এখানেই পড়ে থাকব।

অর্ধেক রাত পার হয়ে গেছে। দুই গাধা তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে পালাবে কি পালাবে না। ওদিকে মোতি লেগে আছে বন্ধুর দড়ি ছিঁড়ে ফেলার কাজে। যখন সে আর পারল না তখন হীরা বলল— তুমি যাও, আমাকে এখানেই পড়ে থাকতে দাও। হয়তো আবার দেখা হবে।

জলভরা চোখে মোতি বলল— তুমি আমাকে এত স্বার্থপর মনে কর, হীরা? তুমি আর আমি একসঙ্গে এতদিন কাটালাম, আজ তুমি বিপদে পড়ে গেছ বলে তোমাকে ছেড়ে চলে যাব?

হীরা বলল— অনেক মার খেতে হবে। লোকে বুঝবে এসব তোমারই বদমাইশি।

মোতি গর্বের সঙ্গে বলল— যে অপরাধের জন্য তোমার গলায় বাঁধন পড়ল তার জন্য আমায় যদি মারে তো চিন্তা কীসের? একটা কাজ তো হয়েছে— ন-দশটা প্রাণীর প্রাণ তো বেঁচেছে। ওরা সবাই আশীর্বাদ করবে।

এই কথা বলতে বলতে মোতি দুই গাধাকে শিং দিয়ে গুঁতো গুঁতোতে বেড়ার বাইরে নিয়ে ফেলল আর তারপর বন্ধুর পাশে এসে শুয়ে পড়ল।

ভোর হতেই খোঁয়াড়ের মুনশি, চৌকিদার ও অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে এমন হইচই পড়ে গেল যে, তা আর লিখে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, মোতির পিঠে খুব একচোট পড়ল এবং তাকেও মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হল।

পাঁচ

এক সপ্তাহ পর্যন্ত দুই বন্ধু ওখানে বাঁধা পড়ে থাকল। কেউ ঘাসের একটা শিষও দিল না। হ্যাঁ, একবার জল দেওয়া হত। ওই ছিল তাদের অবলম্বন। দুজনই এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, দাঁড়ানো পর্যন্ত পারত না। হাড় বেরিয়ে পড়েছিল।

একদিন খোঁয়াড়ের সামনে ঢোল বাজতে শুরু করল আর দুপুর নাগাদ পঞ্চাশ-ষাট জন লোক জমা হয়ে গেল তখন দুই বন্ধুকে বের করা হল এবং তাদের পরীক্ষার কাজ আরম্ভ হল। লোক এসে ওদের চেহারা দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে লাগলে। এরকম মারা বলদ কেনার কি খরিদ্দার পাওয়া যায়?

হঠাৎ এক দাড়িওয়ালা ক্রেতা খরিদ্দার পাওয়া যায়। তার চোখ লাল আর মুখভাব অত্যন্ত কঠোর। সে দুই বন্ধুর পায়ের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে মুনশিজির সঙ্গো কথা বলতে শুরু করল। তার চেহারা দেখেই তাদের অন্তর্জ্ঞানের সুবাদে দুই বন্ধু মনে মনে কেঁপে উঠল। সে কে আর কী জন্য পরীক্ষা করছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। একজন অপরজনের দিকে ভিরু চোখে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিল।

হীরা বলল— গয়ার বাড়ি থেকে মিছিমিছি পালিয়েছিলাম। এখন প্রাণ বাঁচবে না।

মোতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গো উত্তর দিল— লোকে বলে, ভগবান সবার উপর দয়া করেন। তাঁর কি আমাদের উপর দয়া হয় না?

— ভগবানের কাছে আমাদের বাঁচা-মরা দুইই সমান। চলো, ভালোই হবে, কিছুদিন তাঁর কাছে থাকা যাবে। সেবার ভগবান ওই বাচ্ছা মেয়েটির রূপে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। এবার কি আর বাঁচাবেন না?

— এই লোক তো ছুরি চালাবে, দেখে নিও।

— এতে আর চিন্তার কী আছে। মাংস, ছাল, শিং, হাড়— সবই তো কোনো না কোনো কাজে লাগবে।

নিলাম হয়ে গেলে দুই বন্ধু সেই দাড়িওয়ালার সঙ্গো চলল। দুজনেরই শরীর কাঁপছিল। বেচারারা পা পর্যন্ত তুলতে পারছিল না। কিন্তু ভয় পেয়ে হোঁচট খেতে খেতে কোনো রকমে যাচ্ছিল, কারণ চলতে গিয়ে ঢিলে দিতেই জোরে লাঠির ঘা পড়ছিল।

রাস্তায় গোরু আর বলদের এক পাল সবুজ মাঠে চরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল। সবাই প্রসন্ন— মসৃণ, চঞ্চল সব জানোয়ার, কেউ উচ্ছল, কেউ আয়েশ করে বসে রোমন্থন করছে। কী সুখী জীবন এদের! অথচ কী স্বার্থপর! কারও একটু চিন্তা নেই যে তাদেরই দু ভাই এক কসাইয়ের হাতে পড়ে কত দুঃখী।

হঠাৎ তাদের মনে হল এ রাস্তা তাদের চেনা। হ্যাঁ, এই রাস্তা দিয়েই তো গয়া তাদের নিয়ে গিয়েছিল। সেই খেত, সেই বাগান, সেই গ্রাম। প্রতি মুহূর্তে তাদের গতি দ্রুততর হতে লাগল। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত দুর্বলতা কোথায় উবে গেল। আঃ, এই তো আমাদের সেই জায়গা, এই কুয়োর পাড়েই তো আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসতাম। হ্যাঁ, এই সেই কুয়ো।

মোতি বলল— আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়েছে।

হীরা বলল— ভগবানের দয়া

— আমি এখন পালিয়ে বাড়ি চলে যাব।

— এ যেতে দেবে?

— আমি একে মেরে মাটিতে ফেলে দিচ্ছি।

— না, না। দৌড়ে আমাদের গোয়ালে চল। সেখান থেকে আর নড়ব না।

দুজনই বাছুরের মতো আনন্দে লাফাতে লাফাতে উন্মাদের প্রায় বাড়ির দিকে ছুটল। নিজের গোয়াল, দুজনেই দৌড়ে গোয়ালে এসে দাঁড়িয়ে গেল। দাড়িওয়ালাও পেছন পেছন ছুটে আসছিল।

ঝুরি দরজায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। বলদ দেখেই ছুটে এসে বারে বারে ওদের গলায় গলা লাগিয়ে আদর করল। বন্ধু দুই বলদের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু গড়াতে লাগল। একজন ঝুরির হাত চাটতে শুরু করল।

দাড়িওলা গিয়ে বলদের দড়ি ধরল।

ঝুরি বলল— আমার বলদ।

— তোমার বলদ কীসে? আমি খোঁয়াড় থেকে নিলামে কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

— আমার তো মনে হচ্ছে তুমি চুরি করে নিয়ে এসেছ। চুপচাপ চলে যাও। আমার বলদ, আমি বেচলে তো বিক্রি হবে। আমার বলদ অন্য কেউ নিলাম করবে কোন্ অধিকারে?

— গিয়ে থানায় রিপোর্ট করে দেব।

— বলদ আমার। এর প্রমাণ এই যে এরা আমার দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

দাড়িওলা রেগেমেগে বলদদুটোকে জোর করে নিয়ে যাবার জন্য এগোতেই মোতি শিং চালিয়ে দিল। দাড়িওলা পেছিয়ে যেতেই মোতি তার পিছু নিল। দাড়িওলা পালাতেই মোতি তার পেছন পেছন দৌড়াল। সে গ্রামের বাইরে চলে গেলে মোতি থামল, তবে দাঁড়িয়ে থেকে দাড়িওলাকে খেয়াল রাখছিল। দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দাড়িওলা ভয় দেখাচ্ছিল, গালিগালাজ করছিল, পাথর ছুঁড়ে মারছিল আর মোতি বিজয়ী বীরের মতো তার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামের মানুষ এই তামাশা দেখে হাসছিল।

পরাজয় স্বীকার করে দাড়িওলা চলে গেলে মোতি ফিরে এল।

হীরা বলল— আমার ভয় হচ্ছিল রেগে গিয়ে তুমি না আবার মেরেই ফেল।

— তবে যদি আমাকে ধরতে চাইত, না মেরে আমি ছাড়তাম না।

— এখন আর আসবে না।

— আসে তো দূর থেকেই খেয়াল রাখব। দেখি, কী করে নিয়ে যায়।

— যদি গুলি মেরে দেয়?

— মরে যাব, তবু ওর কাজে তো আর লাগব না।

— আমাদের প্রাণকে তো আর কেউ প্রাণ বলে ধরে না।

— এর কারণ হল আমরা বড়ো সরল।

একটু পরে চাড়িতে খোল, ভুসি, দানা ও ছোলা দিলে দুই বন্ধুতে খেতে লাগল। ঝুরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনকেই আদর করছিল আর একগাদা ছেলে-ছোকরা জমা হয়ে তামাশা দেখছিল। মনে হচ্ছিল সারা গাঁয় উৎসব শুরু হয়ে গেছে।

এমন সময় ঝুরির স্ত্রী এসে দুজনের মস্তকে চুম্বন করে গেল।

(দো বৈলোঁ কী কথা / ১৯৩১) — অনুবাদ অমলকুমার রায়

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ

শেঠ রামনাথ রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে হতাশাক্লিষ্ট দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠলেন, বুঝলে শীলা, আমি বড়োই অভাগা। আমার সঙ্গে তোমাকেও সারাটাজীবন দুঃখভোগ করতে হল। অভাবের দিনগুলোতেও রাতদিনই সংসারের নানা কাজ এবং ছেলেপুলে সামলাতে গিয়ে তোমার প্রাণান্তকর অবস্থা হত। আর আজ, যখন সেই অবস্থা কিছুটা সামলে নিয়েছি, যখন তোমার আরাম করার মতো সামান্য একটু অবসর এল, ঠিক তখনই আমি তোমাদের ফেলে চলে যাচ্ছি। আজ সকাল পর্যন্তও যে আশা ছিল, এখন তাও ভেঙে গেল। এই দেখো,—শীলা, কেঁদো না,—শোনো, শোনো, সংসারে সবাইকেই একদিন না একদিন মরতে হবে। কেউ দুবছর আগে। কেউ বা দুবছর পরে। এখন সংসারের দায়দায়িত্ব সবই তোমার। আমি যদিও টাকাপয়সা কিছুই রেখে যেতে পারলাম না—কিন্তু এদিকে অল্পসল্প যা রইল, তাতে তোমার জীবন কোনোমতে কেটে যাবে।—একী? ওদিকে রাজা কাঁদছে কেন?

সুশীলা আঁচলে চোখের জল মুছে জবাব দিল, আর বোলোনা, ভীষণ জেদি হয়েছে। আজ সকাল থেকেই বায়না ধরেছে একটা মোটরগাড়ি কিনবে। তুমিই বলো, পাঁচ টাকার কমে কি মোটরগাড়ি পাওয়া যাবে?

ইদানীং রামনাথবাবুরও দুই ছেলেমেয়ের উপর স্নেহমমতা বেশ কিছুটা বেড়ে গেছিল। তিনি আদর করে ছেলেকে রাজা ও মেয়েকে রানি বলে ডাকতেন। বললেন, বেশ তো, একটা কিনেই দাও না, বেচারা কবে থেকেই চাইছে। আমারও তো অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল। সবই তো মাটি হয়ে গেল। শোনো, রানির জন্যেও একটা বিলেতি পুতুল আনিয়ে দাও। অন্যের খেলনা দেখে বায়না করে। বুঝলে, আসলে এতদিন যে টাকাকড়িকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেছি, সে তো আজ শেষকালে ডাক্তারের পেটেই গেল। ছেলেমেয়েরা আমার কথা মনে রাখবে কী ভাবে? অভাগা বাপ টাকাকড়িকেই সন্তানের চেয়েও প্রিয় ভাবত। কখনও এক পয়সার জিনিস ওদের হাতে এনে দিইনি। রামনাথের কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে আরও ক্ষীণ হয়ে এল।

জীবনের অন্তিমকালে যখন সংসারের অসারতা কঠিন সত্যরূপে চোখের সামনে এসে উদ্ভাসিত হয় তখন অসমাপ্ত কাজের জন্য আক্ষেপ এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাই মনকে আরও উদার এবং নিঃসংকোচ বানিয়ে তোলে।

স্বামীর এসব স্বগতোক্তি শুনে সুশীলা ছেলেকে কাছে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। এতদিন যে মাতৃস্নেহ স্বামীর ওই ধরনের কৃপণতা দেখে মনে মনে খুবই দুঃখ পেলেও চুপ করে থাকত, সেও যেন এসময় উথলে উঠল। কিন্তু মোটর কেনার টাকা কোথায়?

রামনাথবাবু ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, মোটরগাড়ি কিনবে সোনা? যাও, মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিদির সঙ্গে সাবধানে যাও। খুব সুন্দর দেখে মোটরগাড়ি আনবে, কেমন।

এদিকে রাজা কিছুটা হতবাক। মায়ের এ ধরনের কান্নাকাটি বা বাবার কাছ থেকে এ রকমের স্নেহ-মমতাপূর্ণ ব্যবহার সে ইতিপূর্বে দেখেনি। ফলে তার শিশুসুলভ আকাঙক্ষাও উবে গেছিল। সে ধীরে জবাব দিল, এখন আমার মোটরগাড়ি চাইনা, বাবা।

রামনাথবাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন রে?

— আগে আপনি ভালো হয়ে উঠুন, তারপরে নেব।

ছেলের উত্তর শুনে রামনাথবাবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

দুই

ওই ঘটনার পর তৃতীয় দিনে রামনাথবাবুর মৃত্যু হল।

প্রকৃতপক্ষে জগতে ধনীব্যক্তিদের মৃত্যুসংবাদে বেশিসংখ্যক মানুষই খুশি হয় এবং দু-পাঁচজনই দুঃখ পায়। কিন্তু অপরদিকে ধনীব্যক্তিদের দীর্ঘজীবনপ্রাপ্তির সংবাদে বহুসংখ্যক মানুষই মনোবেদনা অনুভব করে এবং মাত্র অল্প সংখ্যকই খুশি হয়।

তাই রামনাথবাবুর মৃত্যুসংবাদে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তো নিজেদের স্বার্থেই খুশি ছিলেন। পুরোহিতরাও মহাখুশি। জ্ঞাতিভাইরাও প্রসন্ন হলেন এই ভেবে যে, তাদের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দেওয়ার মতো একজন লোক কমল। বুক থেকে একটা কাঁটা দূর হল। অপরদিকে জমির শরিকদের কথা তো বলাই বাহুল্য। এখন তারা পুরোনো ঝগড়ার জের টেনে এক হাত দেখে নেবে। মনের ঝাল মেটাবার এমন সুবর্ণ সুযোগ বহুদিন বাদে পাওয়া গেছে।

আজ মাত্র পাঁচদিন হল রামনাথবাবু গত হয়েছেন। তার বিশাল বাড়িটা নিস্তব্ধতায় ডুবে গেছে। ছেলেটা না কাঁদে, না হাসে। সর্বদাই মায়ের কাছটিতে বসে আছে আর সদ্য বিধবা সুশীলাও ভবিষ্যৎ চিন্তা-সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে নিষ্প্রাণের মতো বসে আছে। স্বামীর চিকিৎসার পর ঘরে যে কটা টাকা ছিল তা তো দাহকার্যেই খরচ হয়ে গেছে। আর এখনও অনেক কাজ বাকি। ভগবান, শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদি যে কী ভাবে হবে, কে জানে? সুশীলা আর ভাবতে পারেনা।

এসময় হঠাৎ সদর দরজায় কার যেন গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ঝি এসে শেঠ ধনীরামের আগমনবার্তা জানাল। শোনামাত্রই দু-ভাইবোনও দৌড়ে বাইরে গেল।

সুশীলার মনটাও ক্ষণিকের তরে আশান্বিত হয়ে উঠল! শেঠ ধনীরাম জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধান। সুতরাং এহেন ব্যক্তির আগমনে অবলা নারীর অশান্ত হৃদয়ও সহানুভূতির আশায় পুলকিত হয়ে উঠল। আসলে জ্ঞাতিভাইদের মুখপাত্র বলে কথা! এঁরা যদি অনাথাদের খোঁজ না নেন তো কারা নেবেন! সত্যিই এঁরা মহানুভব। তাই এরা বিপদের দিনে আর্তের সেবা করে থাকেন। সত্যি সত্যিই এঁরা ধন্য! পুণ্যাত্মাও বটে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সুশীলা মাথায় ঘোমটা টেনে বৈঠকখানা ঘরের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়াল। সে দেখল শেঠ ধনীরাম শুধু একাই আসেননি, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তিও আছেন।

ধনীরাম বললেন, সত্যি কথা বলতে কি বউঠান, রামনাথ ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে যে আমরা কতখানি দুঃখ পেয়েছি তা শুধু আমাদের হৃদয়ই জানে। তার বয়সটাই বা কত হয়েছিল? কিন্তু সবই ভগবানের ইচ্ছা। শোনো, যা হবার তো হয়ে গেছে। এখন আমাদের কর্তব্য হল ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখা এবং জীবনের ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলো ভালোভাবে কাটাবার মতো পথ খুঁজে বার করা। সুতরাং কাজকর্ম এমনভাবেই করতে হবে যাতে পরিবারের সম্মানও বজায় থাকে আর ভাইয়ের আত্মাও সন্তুষ্ট হয়।

ধনীরামের সঙ্গী কুবের দাস মহাশয় এতক্ষণ আড়াচোখে চেয়ে চেয়ে সুশীলাকে দেখছিল। বলল, হ্যাঁ, তাই তো। কুলমর্যাদা ব্যাপারটা সাংঘাতিক। তাকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম। কিন্তু সামর্থ্যের বাইরে পা বাড়ানো ঠিক হবে না। তা তোমার কাছে টাকাপয়সা কত আছে বউঠান? ......কী বললে? ..... কিছুই নেই?

সুশীলা—ঘরে টাকাকড়ি কোথায় বড়দা? যা দু-চার পয়সা ছিল, তাও তো তাঁর চিকিৎসার জন্যেই খরচ হয়ে গেছে।

ধনীরাম— তাহলে তো আবার এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হল। ও কুবেরদাস, বলো তো ভাই, এ অবস্থায় কী করা যায়?

কুবেরদাস—তাই তো! কিন্তু শ্রাধশান্তি তো করতেই হবে এবং লোকজনও খাওয়াতে হবে। তবে হ্যাঁ, নিজের সামর্থ্য বুঝেই ব্যয় করতে হবে। আমি ধারদেনা করতে বলব না। ঘর থেকেই যাতে টাকার ব্যবস্থা করা যায়, সে চেস্টাই করতে হবে। আসলে মৃত ব্যক্তির প্রতিও আমাদের কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। যে গেছে সে তো আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না। চিরজীবনের মতোই তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। সে কারণেই তার সব কাজ সামর্থ্য অনুযায়ী করা উচিত। মর্যাদারক্ষার জন্য ব্রাহ্মণদের তো ডাকতেই হবে। তাই না?

ধনীরাম—তা, তোমার কাছে কি কিছুই নেই বউঠান? দু-চার হাজারও না?

সুশীলা—আমি আপনাদের কাছে সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বাস করুন, আমার কাছে কিছুই নেই। হা ভগবান! এ সময় কি মিথ্যা কথা বলব?

ধনীরাম ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি। জিজ্ঞাসু চোখে কুবের দাসের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তাহলে তো এ বাড়ি বিক্রি করতে হবে।

কুবেরদাস—এছাড়া আর কীই বা উপায় হতে পারে? মানমর্যাদা বিসর্জন দেওয়া তো চলে না! আমাদের রামনাথের কত নামডাক ছিল, জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে একটা স্তম্ভ বলে সবাই মানত... হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, এটাই ঠিক উপায়। বিশ হাজার টাকা তো আমারই পাওনা আছে। তা, সুদ-বাট্টা হিসেব কষে সেটা পঁচিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। বাদবাকি টাকা শ্রাধশান্তি এবং লোক খাওয়ানোতে খরচ হয়ে যাবে। আর, যদি কিছু থেকেই যায়, তা দিয়ে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। কী বলেন?

ধনীরাম—আপনার কাছে কতো টাকায় বাড়ি বন্ধক রেখেছিল?

কুবের—বিশ হাজার টাকায়। শতকরা এক টাকা সুদে।

ধনী—কিন্তু, আমি তো আরও কিছু কমই শুনেছিলাম।

কুবের—তা কী করে হবে! আমার কাছে বন্ধকিদলিল আছে! মুখের কথার কী দাম? আমি সামান্য দু-চার হাজার টাকার জন্য কি মিথ্যা বলব?

ধনী—না না, সে কথা আমি বলছি না কি? তা বউঠান শুনলে তো সব। সুতরাং পঞ্চায়েতের মত হচ্ছে এ বাড়ি বিক্রি করার পক্ষেই।

এই সময়ে সুশীলার ছোটোভাই সন্তলালও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। পঞ্চায়েতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথাটা তার কানে যেতেই সে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, কেন? বাড়ি বিক্রি করতে হবে কেন? জ্ঞাতিগুষ্ঠি খাওয়াবার জন্যে? জ্ঞাতিরা তো খেয়েদেয়ে যে যার পথে চলে যাবে। তারপর? এই অসহায় অনাথদের কে দেখবে? কে রক্ষা করবে? এদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে না?

ধনীরাম চোখ কটমট করে সন্তলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখুন, এ ব্যাপারে আপনার নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই। শুধুমাত্র মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্যও কিছু প্রতিকারের কাজ করতে হয়, বুঝলেন। না করলে আপনার আর কী আসে যায়? লোকে তো আমাদেরই উপহাস করবে। কেননা, জগতে মানমর্যাদার জন্য মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দেয়। যদি মানসম্মানই না থাকল, তবে আর থাকলটা কী? যদি আমাদের পরামর্শ চাওয়া হয়, তাহলে আমরা এই কথাই বলব। এখন বউঠান যা ভালো বুঝবে, তাই করবে। তবে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। চলুন কুবেরদাসভাই, এগোন যাক।

সুশীলা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, আপনারা আমার গুরুজন, ঘরের অবস্থা তো সবই আপনারা জানেন। তাছাড়া আমি আমার স্বামীর আত্মাকেও দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু এদিকে তাঁর সন্তানেরা যখন বিপদে পড়বে, তখন তাঁর আত্মা দুঃখ পাবে না? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতেও হবে। সুতরাং আপনারা ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থাই করুন, কারণ জ্ঞাতিভাইদের খাওয়াবার মতো সামর্থ্য আমার আর নেই।

উপস্থিত দুই মহানুভবের যেন এ কথায় চড় খাওয়ার মতো উপক্রম। —কী? এত বড়ো অধর্ম! সর্বনাশ, এমন কথা কেউ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে? পঞ্চায়েতের লোকেরা তো নিজেদের মুখে চুনকালি মাখাতে দিতে পারে না! এই বিধবা মহিলাকে তো কেউ উপহাস করবে না, উপহাস করবে পঞ্চায়েত প্রধানের নামে। দুনিয়ার মানুষকে হাসাবার মতো এই নির্লজ্জ ব্যবস্থা কীভাবে সহ্য করা যায়! ছিঃ, ছিঃ, এমন পরিবারের বাড়ির ভিতরে দূরস্থান, দরজায় উঁকি দেওয়াও পাপ!

সুশীলা ধরা গলায় বলল, আমি অনাথা, আমি বুঝিই বা কী! দয়া করে আমার উপর রাগ করবেন না। আপনারা যদি আমাকে ত্যাগ করে চলে যান তবে আমার চলবে কী করে? দয়া করে আমার অবস্থাটা একটু বুঝুন।

ইতিমধ্যে আরও জনা দুই ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত। একজন ভীষণ মোটা অপরজন তেমনি রোগা। নামও তাদের চেহারা অনুসারেই—ভীমচন্দ্র ও দুর্বলদাস। ধনীরাম তাদের সংক্ষেপে সমগ্র পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেন। সব শুনে দুর্বলদাস সহানুভূতির সঙ্গে বলে উঠল, তা হলে এক কাজ করুন না কেন, এখন আমরা সবাই মিলে এদের কিছু কিছু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করি। পরে যখন ওর ছেলে উপযুক্ত হবে, ফেরত দিয়ে দেবে। আর যদি নিতান্তই না ফেরত দিতে পারে, ধরে নিতে হবে যে এক বন্ধুর জন্য কিছু খরচ হয়েছে। এ আর এমন বড় কথা কী?

সন্তলাল এ প্রস্তাবে খুবই খুশি হয়ে বলে উঠল, আপনি যদি আমাদের এই বিপদে দয়া করে সাহায্যই করেন, তবে আর বলার কী থাকতে পারে।

কুবেরদাস চোখ পাকিয়ে দুর্বলদাসকে বলল, কী আলতু-ফালতু বকছ দুর্বল দাস? এই দুর্মূল্যের বাজারে কার কাছে এত টাকা আছে যে দেবে?

ভীমচন্দ্র ব্যাপারটাকে মীমাংসা করার জন্য বলল, ঠিক কথাই তো! এমন মন্দা বাজার তো আগে কোনোদিন দেখিনি। কিন্তু কাজটাও তো নামিয়ে দিতে হবে।

এদিকে কুবেরদাস খেপে লাল। সে তো প্রথম থেকেই সুশীলাদের বাড়ির উপরই থাবা তুলে রেখেছে। কিন্তু নানাজনের নানা কথায় তার স্বার্থে ক্রমাগতই ব্যাঘাত ঘটতে শুরু করেছে। নাঃ, সে আর ছাড়বে না। নিজের পাওনাগণ্ডা এবার আদায় করেই নেবে। না না, মহিলাদের সঙ্গে এসব ঝামেলায় কে যায়?

ভীমচন্দ্রও তাকে নানাভাবে বোঝাতে লাগল। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, জ্ঞাতিভোজন করাতেই হবে। মৃতের প্রতি এটুকু কর্তব্য না পালন করলে সমাজের নাক কাটা যাবে।

দুর্বলদাসের কথাবার্তায় সুশীলা সহৃদয়তার আভাস দেখতে পেয়েছিল। তাই তার মুখের দিকে করুণভাবে চেয়ে বলল, আমি তো আপনাদের সঙ্গেই আছি। আপনারাই গ্রামের কর্তা। কাজেই যা ভালো বিবেচনা করেন, তাই করুন।

দুর্বলদাস— তোমার কাছে তো অল্পসল্প গয়নাগাঁটিও আছে, তাই না বউঠান?

—হ্যাঁ, গয়না কিছু আছে। তবে যা ছিল তার অর্ধেক অসুখের পিছনেই বিক্রি হয়ে গেছে। সামান্য কয়েকটি আছে। এরপর সুশীলা তার সব গয়নাগাঁটি বের করে এনে পঞ্চায়েত প্রধানের সামনে রেখে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। গয়নাগুলো দেখে মনে হল সবগুলো বিক্রি করে সর্বসাকুল্যে তিন হাজার টাকা পাওয়া যাবে মাত্র।

দুর্বলদাস সেই গয়নার পুঁটলিটা হাতে তুলে ওজন করার মতো দেখে বলল, তিন হাজারে কেন দেবে? আমি সাড়ে তিন হাজার এনে দেব।

অনুরূপভাবে ভীমচন্দ্রও গয়নার পুঁটলিটা হাতে তুলে ওজন বোঝার চেষ্টা করে বলে উঠল, আমি চার হাজার দেব।

কুবেরদাস এতক্ষণ বাড়ি বিক্রির কথা তুলতে পারছিল না। কিন্তু গয়নার দর ওঠানামায় সে পুনরায় সুযোগ পেল। বলল, আরে ভাই, শুনুন। চার হাজার টাকায়ই বা কী হবে? জ্ঞাতি ভোজনেই কমপক্ষে দশ হাজার টাকা খরচ। সুতরাং বাড়ি বিক্রি করতেই হবে।

সন্তলাল রাগে ঠোঁট কামড়ে বললে, শুনুন, শুনুন আপনারা, এতটা নির্দয় হচ্ছেন কেন? আপনাদের কি এই ছোট্ট দুটো অনাথ শিশুর উপরও দয়া হয় না? এদের কি রাস্তার ভিখিরি বানিয়ে তবে ছাড়বেন?

কিন্তু দুর্ভাগ্য! সন্তলালের এই করুণ আবেদনে কেউ কর্ণপাত করল না। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এড়ানোও গেল না। এদিকে বাজারও খুবই মন্দা। মাত্র তিরিশ হাজারের বেশি টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। এ থেকে পঁচিশ হাজার তো কুবেরদাসেরই প্রাপ্য। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা থাকবে।

এছাড়া গয়নাগাঁটি বিক্রি করে চার হাজার আসবে। অতএব, নয় হাজারে কোনোমতে ব্রাহ্মণভোজন ও জ্ঞাতিভোজনরে ব্যাপারটা সেরে ফেলতে হবে।

জ্ঞাতিভাইদের এই চূড়ান্ত বন্দোবস্ত শুনে সুশীলা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না। দুই ছেলেমেয়েকে ওদের সামনে এনে দাঁড়া করিয়ে নিজে দুই হাত জোড় করে ধরা গলায় বলল, বড়দা, দয়া করে আপনারা আমার ছেলেমেয়ের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন। আমার ঘরে আর যা যা আছে, আপনারা সবই নিয়ে যান, কিন্তু অনুগ্রহ করে বাড়িটা ছেড়ে দিন। আমার অন্য কোথাও এক রাত্রিও থাকার জায়গা নেই, কেউ ঠাঁইও দেবেনা। আমি আপনাদের পায়ে পড়ছি। দয়া করে বাড়িটা এসময় বিক্রি করবেন না।

এই মূর্খতার কি কোনো জবাব হয়? আরে বোকা, পঞ্চায়েত সদস্যরাও তো চাইছেন না যে এই বাড়ি বিক্রি হোক। তাদের সঙ্গে তো আর এই অনাথা বিধবার কোনো শত্রুতা নেই। কিন্তু জ্ঞাতি-ভোজনই বা অন্য কি উপায়ে করানো যাবে? তাছাড়া, যদি সুশীলা নিদেনপক্ষে আরও পাঁচহাজার টাকা জোগায় করতে পারে, তবে বাড়ি বিক্রি না করেও চলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে, তা যখন সে পারছে না, তখন বাড়ি বিক্রি করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? অবশেষে কুবেরদাস মোক্ষম কোপ দিল। বললে, বুঝলে বৌঠান, বাজারের অবস্থা এসময় খুবই খারাপ। কারও কাছেই টাকা ধার পাওয়া যাবে না। ছেলেমেয়ের ভাগ্যে যদি সুখ লেখা থাকে ভগবান ঠিকই অন্য কোনোভাবে ব্যবস্থা করবেন। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হবে। সুতরাং ছেলেমেয়ের জন্য চিন্তা কোরো না। ভগবান মানুষের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের বাঁচার উপায়ও ঠিক করেই দেন। তিনিই সব। মানুষ নিমিত্ত মাত্র। হ্যাঁ, দেখো বাপু, আমরা আর তোমাকে বোঝাতে পারছি না। এখন তুমি যদি তোমার জেদ থেকে না সরো, তাহলে আমাদের আর কিছুই বলার নেই। কিন্তু, বুঝে দেখো, এখানে তোমাদের থাকা মুশকিল হয়ে পড়বে। শত্রুরা তোমার পিছনে লাগবে।

অনাথিনী বিধবা আর কীই বা করবে? পঞ্চায়েতের লোকদের সঙ্গে অবনিবনা হলে সে এখানে কীভাবে বাস করবে? জলে বাস করে কি কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা যায়? সুশীলা বাড়ির ভেতরে চলে যাবে বলে উঠতে গিয়েছিল, কিন্তু পারেনি। ওই খানেই মূর্ছি‌ত হয়ে পড়ে গেল। এতদিন সে মনে মনে আশা করেছিল যে, ছেলেমেয়েকে লালনপালন করার মধ্যেই সে তার নিজের বৈধব্য যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারবে। কিন্তু এখন তার চোখের সামনে গোটা দুনিয়াই অন্ধকার হয়ে গেল।

তিন

শেঠ রামনাথের বন্ধুদেরও এই পরিবারের ওপর খুব জোর ছিল। আসলে বন্ধুদের জোর থাকবে না তো কাদের থাকবে? স্ত্রী কে? তার উপর যখন সে এই মোটা কথাটারও মানে বোঝেনা যে জ্ঞাতি-ভোজন এবং তাও বিশেষ প্রাণ খুলে করানোটাই এখন অত্যন্ত জরুরি কাজ! তবে আর তাকে কিছু বলাই বৃথা। আর গয়না কে কিনতে চায়? ভীমচন্দ্র তো প্রথমে চার হাজার টাকা দর দিয়েছিল, কিন্তু সেও এখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পেরেছে যে, সে ভুলই করেছে। দুর্বলদাস তিন হাজার দর দিয়েছিল তাই গয়না তার ঘরেই গেল। যদিও ঐ নিয়ে দুর্বলদাস ও ভীমচন্দ্রের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে গেল। কিন্তু অবশেষে ভীমচন্দ্রকেই হার মানতে হল। কারণ, ন্যায়বিধানদাতারা দুর্বলদাসের পক্ষেই দাঁড়াল।

ধনীরাম একটু কটাক্ষ করে বলল, দেখো দুর্বলদাস, গয়নাপত্র তো নিয়ে চললে, কিন্তু জেনো, এর দাম তিন হাজারের বেশিই। আমি বাবা, উচিত কথা বলতে ছাড়ব না।

কুবেরদাস ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলল, বুঝলেন দাদা, মালটা তো নিজেদের মধ্যেই রইল, অন্য কারও ঘরে গেল না। ঠিক আছে, একদিন সবাই মিলে ফিস্টি খাওয়া যাবে?

এ প্রস্তাবে উপস্থিত চারজন মহানুভবই উল্লসিত হয়ে হেসে উঠল। ইত্যবসরে সুযোগ পেয়ে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা আবার উঠল। কুবেরদাস তিরিশ হাজার টাকায় কিনতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বিক্রি করার মতো নিয়মমাফিক কাজ না করলে মানুষের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকে। এরা সে অবকাশের সুযোগ দেবেন কেন? তাই একজন দালালকে ডাকা হল। বেঁটেখাটো লোক তায় দন্তহীন ফোকলা মুখ। বয়স প্রায় সত্তরের মতো। নামও মাননসই, চোখেলাল। কুবেরদাস তার দিকে চেয়ে বলল, এই চোখেলালবাবুর সঙ্গে আমার প্রায় তিন বছরের বন্ধুত্ব। চমৎকার মানুষ ইনি।

ভীমচন্দ্র—দেখো চোখেলাল, এই বাড়িটা আমাদের বিক্রি করতে হবে। এর জন্য তুমি একজন ভালো খরিদ্দার নিয়ে এসো। তোমার দালালি একেবারেই পাকা।

কুবেরদাস— যদিও এদিকে বাজারের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, কিন্তু আমাদের তো এটাও দেখতে হবে যে, রামনাথের বাচ্চাকাচ্চারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, (চোখেলালের কানে মুখ লাগিয়ে) —তিরিশ হাজারের বেশি যাবেন না কিন্তু।

ভীমচন্দ্র কুবেরের এই মনোভাবে বিরক্ত হয়ে বলল, দেখুন কুবেরদাসবাবু, এটা মোটেই ভালো হচ্ছে না।

কুবেরদাস আমতা আমতা করে বলল, তা আমি আবার কী করলাম? আমি তো একথাই বলছিলাম যে ভালো দরের খরিদ্দার এনো।

চোখেলাল—না না, আমাকে এত বলার কোনো প্রয়োজনই নেই। আমি এ ব্যাপারটা বুঝি। আমি এটাও বুঝতে পারছি যে, এক লাখের এক পয়সা কমেও এ বাড়ি বানানো যায়নি। কিন্তু বর্তমান বাজারের হাল কি আপনাদের অজানা? এসময় এ বাড়ি পঁচিশ হাজারের বেশি দরে বিকোবেই না। তবে যদি সুবিধামতো কোনো ভালো খরিদ্দার পাই, তাহলে আরও পাঁচ-দশ হাজার পাওয়া যেতেও পারে। কিন্তু এক্ষুনি তো পঁচিশ হাজারও পাওয়া খুব মুশকিল। খরিদ্দার তো আর বাড়ি বয়ে আসছে না, যে ডাকলেই কিনে নেবে।

ধনীরাম—পঁচিশ হাজার তো খুবই কম ভাই। আর কিছু না হলেও তিরিশ হাজার তো করিয়ে দাও।

চোখেলাল—তিরিশ কেন? আমি পারলে চল্লিশ করিয়ে দেব। কিন্তু খরিদ্দার পেলে তো? ঠিক আছে, আপনারা যখন সবাই বলছেন, তখন আমি তিরিশ হাজারেই কথাবার্তা শুরু করি। কী বলেন?

ধনীরাম—যদি তিরিশ হাজারেই দেবে, তবে কুবেরদাসই বা নিচ্ছেন না কেন? এত সস্তামাল অন্যকে কেন দেবেন?

কুবেরদাস তো হাতে স্বর্গ পেল। বলল, তা আপনারা সবাই যদি একমত হয়ে রায় দেন, তবে তাই হোক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলে ধনীরামও একথায় সায় দিলেন। এতক্ষণে বাড়ি বিক্রির বন্দোবস্তটা পাকা হল। সেদিনই উকিল দিয়ে বায়না লেখানো হল। তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রি হল। সুশীলার সামনে যখন সেই বায়না আনা হল, তখন সে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সজল নয়নে কোনোক্রমে তাতে সই দিল। এখন তার একাজ করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। অকৃতজ্ঞ বন্ধুর মতো এই বাড়িও সুখের দিনে সঙ্গো থেকে দুঃখের দিনে এদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

এ ঘটনায় কিন্তু ভীমচন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল।

পঞ্চায়েতের মোড়লেরা এরপর সুশীলার উঠোনে বসে জ্ঞাতিভাইয়ের জন্য দলিল লিখতে ব্যস্ত হল আর ওদিকে সুশীলা ওপরের ঘরের এক ছোট্ট জানলার ধারে বসে নিজের এই দুর্ভাগ্যের জন্য নীরবে কাঁদতে লাগল। দলিল তৈরি হওয়ার পর হঠাৎ সুশীলার এক ফোঁটা চোখর জল নীচে সেই দলিলের উপর পড়ল। ধনীরাম উপরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললে, একী? জলের ছিটে এল কোথা থেকে?

সন্তলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল, দিদি ওপরে জানলায় বসে কাঁদছে, এইভাবেই ও নিঃশব্দে দলিলের উপর চোখের জলের রক্তাক্ত সিলমোহর এঁকে দিল।

ধনীরাম চেঁচিয়ে বলে উঠল, একী, তুমি কাঁদছ কেন বউঠান? এখন কি কান্নার সময়! তোমার তো এই ভেবে এখন খুশি হওয়া উচিত যে, পঞ্চায়েতের লোকেরা আজ এই শুভকাজ সম্পন্ন করার জন্য তোমার ঘরে উপস্থিত হয়েছে। যে ব্যক্তির সঙ্গো এতদিন সুখে ঘর করেছ তার শেষকাজটুকু করতে গিয়ে চোখের জল ফেলছ কেন?

দলিল লেখা সম্পূর্ণ হবার পর জ্ঞাতিদের সবাইকে তা দেখানো হল। এদিকে এই মোড়লরা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে কী কী রান্না হবে তার বন্দোবস্ততেই তিন-চার দিন কাটিয়ে দিল। ঘি এল ধনীরামের আড়ত থেকেই। ময়দা-চিনির আড়তও তারই ছিল। সুতরাং জিনিসপত্র কিনতে কোনো অসুবিধেই হয়নি। দশ দিনের দিন সকালে ব্রাহ্মণভোজনের কাজ সমাধা হল। ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় জ্ঞাতি-ভাই ভোজনের পালা। সুশীলাদের বাড়ির সামনে ঘোড়ার গাড়ি ও মোটর গাড়ির মিছিল পড়ে গেল। ভিতরে আমন্ত্রিতদের সারি সারি খাওয়ার ব্যবস্থা। উঠোন, দালান, বৈঠকখানা ঘর, উপরের ছাদ, উপরে নীচে সব জায়গাতেই সন্ধ্যাবেলায় অতিথিবৃন্দের ভিড়। নিমন্ত্রিতেরাও সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন করতে করতে এই কর্মকাণ্ডের উদ্যোক্তাদের কাজের তারিফ করছিলেন।

একজন বললেন, খরচা তো অনেকেই করে, কিন্তু সুবন্দোবস্ত করার কর্মকুশলতা তো থাকা চাই। খুব কম বাড়িতেই এত সুস্বাদু খাবারের দেখা পাওয়া যায়। কী বলো হে?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, শেঠ চম্পারামের শ্রাদ্ধের পর এই রামনাথেরই কাজে এত ভালো ব্যবস্থা হল।

—দেখুন, অমৃতিগুলো কি সুন্দর কুরকুরে!

—রসগোল্লাগুলোতে মেওয়া একেবারে ঠাসা। দেখুন, তাই না?

—সত্যি, পঞ্চায়েতের লোকেরা ধন্য। সব কিছুই তারা করেছে।

ধনীরাম অত্যন্ত বিনয়ীভাবে বললেন, না না, আপনারা মহানুভব, তাই এমন বলছেন, আসলে রামনাথ আমার ভাইয়ের মতোই ছিল। তাই, তার কাজ আমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে করব না তো কে করবে? আজ চারদিন একবারের তরেও বিছানায় গা লাগাতে পর্যন্ত পারিনি।

—সত্যিই আপনি ধন্য। বন্ধু যদি হতেই হয় তবে এই রকমই হওয়া উচিত।

—এ কি চাট্টিখানি কথা? আপনি রামনাথের নামোজ্জ্বল করেছেন। জ্ঞাতিরা তো এই খাওয়া-দাওয়াই দেখে। তারা তো আর টাকাপয়সা দেখতে আসে না।

আমন্ত্রিতেরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই নিমেষে শেষ করে ফেলছিল। আর ওদিকে বাড়ির ভেতরে সুশীলা বসে ভাবছিল, জগতে এই ধরনের স্বার্থপর মানুষও জন্মায়। আজ সারা দুনিয়াটাই তার কাছে স্বার্থময়। সবাই ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে খাচ্ছে। সামান্য এই প্রশ্নটুকুও কেউ করছে না যে, অনাথাদের জন্য কিছু রইল কি না? তাদের ভবিষ্যতের দিনগুলো কীভাবে চলবে? কেউ না—কেউ না!

চার

দেখতে দেখতে একটা মাস পার হয়ে গেল। সুশীলারও এক এক করে সব কটি সঞ্চিত পয়সা খরচ হতে লাগল। নগদ টাকা তো ছিলই না, গয়নাও বিকিয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র কয়েকটা বাসন-কোশনই সম্বল। আবার ওদিকে বেশ কিছু ছোটো ছোটো বিলের টাকাও মেটানো বাকি। কিছু টাকা পাবে ডাক্তার, কিছু পাবে দরজি ও কিছু পাবে বেনে দোকানদার। ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করেই সুশীলাকে এই সব দেনা মেটাতে হল। মাস শেষ হতে না হতেই তার হাত একেবারে শূন্য। বেচারি সন্তলাল এক দোকানে মহাজনের হিসেব লেখার কাজ করে। কখনো-সখনো সে এসে এক-আধটা টাকা দিয়ে যেত। এদিকে একটা সংসারের খরচ তো আর কম নয়। তবে সুশীলার ছেলে পরিস্থিতি কিছুটা বোঝে। সে আর আগের মতো মাকে বিরক্ত করেনা। বাড়ির সামনে দিয়ে যখন কোনো খেলনা বিক্রেতা চলে যায় অথবা অন্য কোনো ছেলেকে ফল কিংবা মিষ্টি খেতে দেখে তখন তার জিভে জল আসে না, কিন্তু দুচোখ জলে ভরে যায়। এমন করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে যে মায়া লাগে। এই বাচ্চারাই কিছুদিন আগেও মণ্ডামেঠাইর দিকে ফিরেও তাকাত না। আজ তারাই এক-এক পয়সা দামের জিনিসের জন্য লালায়িত হতে থাকে। আর সেই সজ্জন ব্যক্তিরা, যারা জ্ঞাতিভোজন করিয়েছিল, বাড়ির সামনের পথ দিয়ে হেঁটে গেলেও একবারের তরেও উঁকি দেয় না।

সন্ধে হয়ে গেছে। সুশীলা উনুন ধরিয়ে রুটি সেঁকার আয়োজন করছে আর দুই ছেলে মেয়েই উনুনের পাশে বসে ক্ষুধার্ত নয়নে রুটির দিকে চেয়ে রয়েছে। উনুনের অপর পিঠে ডাল ফুটছিল। সেদ্ধ হতে এখনও বেশ কিছু সময় লাগবে। মেয়ে রেবতীর বয়স বছর এগারো, আর ছেলে মোহনের সবে আট।

মোহন খিদেতে অস্থির হয়ে বলল, মা, আমায় শুধু রুটিই দাও। খুব খিদে পেয়েছে।

সুশীলা— এখনও ডাল সেদ্ধ হয়নি বাবা, একটু বোস।

রেবতী—মা, আমার কাছে একটা পয়সা আছে, আমি তা দিয়ে দই নিয়ে আসছি।

সুশীলা—এক পয়সা? কোথায় পেলি?

রেবতী—কালকে আমার একটা পুতুলের পেটের মধ্যে পেয়েছিলাম।

সুশীলা—ঠিক আছে যা, তাড়াতাড়ি আসবি।

রেবতী দৌড়ে বাইরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট্ট পাতায় করে সামান্য একটু দই নিয়ে ফিরে এল। ইতিমধ্যে মা রুটি সেঁকে ছেলেকে দিয়ে দিয়েছে। মোহনও আগ্রহভরে দই দিয়ে রুটি

শেষ করতে লাগল। সাধারণ আর পাঁচটা বালকের মতো সেও একাই সবটা খেয়ে নিল। দিদিকে একবারও জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না।

সুশীলা চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, কী রে? দিদিকে একটু দে। সবটা একাই খাবি?

মোহন এ ঘটনায় খুব লজ্জা পেল। তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

রেবতী—না না, আমায় দিতে হবে না। দিয়েছেই বা কতটুকুন। তুই খা, মোহন। তোর তো আবার তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যায়! আমি ডাল রান্না হলেই খাব।

ঠিক সেই সময় বাইরে দুজন আগন্তুকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রেবতী বাইরে এসে সাড়া দিল। এরা সেই কুবেরদাসের কর্মচারী। সুশীলাকে বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য বলতে এসেছে। ব্যাপারটা বুঝে সুশীলার চোখমুখ রাগে লাল হয়ে গেল। সে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল, সে কী? আজ একটা মাসও পুরো হল না আমার স্বামী গত হয়েছেন, আর এর মধ্যেই বাড়ি খালি করার হুকুম চলে এসেছে? আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার বাড়ি মাত্র তিরিশ হাজারে নিয়ে নিল, তার উপর পাঁচ হাজার সুদ চাপাল, এতেও কি আশ মেটেনি? যাও, বলে দাও গে, বাড়ি এখন আমি ছাড়ব না।

কর্মচারীটি নম্রভাবে বলল, তা গিন্নিমা, আমার উপর রাগ করছেন কেন? আমি তো কেবল খবরটা দিতে এসেছি। তবে কী, জিনিস যখন অপরের হয়ে গেছে তখন তো আপনাকে ছাড়তেই হবে। ঝামেলা করে কি কিছু লাভ হবে?

সুশীলাও বুঝল যে কর্মচারীটির যুক্তি ঠিক। ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। তারপর নিচু স্বরে বলল, কুবেরবাবুকে বোলো, আমাকে যেন পাঁচ-দশটা দিন সময় দেন।...থাক, কিছু বলতে হবে না, কেনই বা তার কাছ থেকে পাঁচ-দশ দিনের উপকার নিতে যাই? আমার ভাগ্যে যদি এ বাড়িতে বাস করা লেখাই থাকত, তাহলে কী আর কেউ বার করতে পারত?

কর্মচারীটি জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কাল সকালে নিশ্চয়ই খালি হয়ে যাবে?

সুশীলা—হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে বলছি টা কী? আচ্ছা, করে দিচ্ছি। আমার ঘরে কি আর এমন জিনিসপত্রই বা আছে? নাহলে তোমার কর্তাবাবুর রাত্রের বাড়িভাড়াটা মাঠে মারা যাবে। যাও, গিয়ে তালাচাবি নিয়ে এসো, নাকি একেবারে সঙ্গেই এনেছ?

কর্মচারী—না না, গিন্নিমা, এমন কিছু তাড়া নেই। কাল দেখেশুনেই খালি করে দেবেনখন, কেমন!

সুশীলা—আবার কালকের জন্য ঝামেলা কেন রাখব? যাও ভাই, এক্ষুনি গিয়ে তালা নিয়ে এসো।

এই বলে সুশীলা বাড়ির ভিতর ঢুকে বাচ্চাদের খাইয়ে, নিজে একটা রুটি অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করে বাসনপত্র ধুয়ে একটা এক্কাগাড়ি ডেকে তার মধ্যে নিজেদের অবশিষ্ট জিনিসপত্রকটা চাপিয়ে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিরকালের মতো বাড়ি থেকে বিদায় নিল।

সে যে সময় এবাড়ি বানিয়েছিল, মনে মনে তখন কত আশাআকাঙ্ক্ষাই না ছিল। গৃহপ্রবেশের দিন কয়েক শত ব্রাহ্মণভোজন করানো হয়েছিল। সে সময়টা তাকে এত পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে পরে সে একমাস বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া এ বাড়িতেই তো তার অন্য দুই ছেলেও মারা গেছে। স্বামীও এখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এদের স্মৃতি এবাড়ির প্রত্যেকটি

ইটকে পবিত্র করে তুলেছিল। বাড়ির প্রতিটি ইটকাঠ যেন তাদের সুখে সুখী এবং তাদের দুঃখে দুঃখী। আর আজ? সেই বাড়িই তার হাতছাড়া হয়ে গেল!

সেই অভিশপ্ত রাতটা সুশীলারা একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে কাটিয়ে পরের দিন দশটাকা মাসিক ভাড়াতে গলির মধ্যেই একটা বাড়ির একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে উঠল।

পাঁচ

নতুন ভাড়াবাড়ির ছোট্ট পরিবারে এই অভাগিনীদের তিনটি মাস যে কী দুঃখকষ্টেই কাটল তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই অনুভব করতে পারেন। বর্তমানে একমাত্র সন্তলালই এদের ভরসা। সে প্রতিমাসেই পাঁচ-দশটাকা দিয়ে যায়। আসলে, সুশীলা যদি দরিদ্র ঘরের মেয়ে হত, তবে কিছু কিছু কাজ করেই সে তাদের জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করতে পারত, যেমন, জাঁতা পেষা, কাপড় সেলাই করা, কারও বাড়িতে ঠিকে কাজ করা ইত্যাদি। কিন্তু এসব কাজ তো জ্ঞাতিরা নিন্দে করে। তাই এ কাজের সাহায্যই বা সুশীলা নেয় কী করে? লোকে তো বলবে যে, এই দ্যাখো, রামনাথবাবুর স্ত্রীর কী অবস্থা! তার সুনামের প্রতি মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারটাও তো আছে। সুতরাং সমাজেরএই চক্রব্যূহ থেকে কোনোমতেই বেরিয়ে আসা সুশীলার পক্ষে সম্ভব হল না। মেয়ের যে দু-একটা গয়নাগাঁটি ছিল, তাও বিক্রি হয়ে গেল। এখন তো রোজ রুটির বন্দোবস্ত হওয়াই মুশকিল, তার উপর ঘরের ভাড়া মেটাবে কী ভাবে?

এইভাবে মাস তিনেক পার হবার পর ওই বাড়ির মালিক, যে সুশীলাদেরই বিশেষ পরিচিত এক জ্ঞাতিভাই, যে ওই শ্রাদ্ধশান্তির কাজে খুব অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, ভাড়া আদায় না হওয়াতে অধীর হয়ে উঠল। বেচারা আর কত ধৈর্য ধরতে পারে! এত আর আট আনার ব্যাপার নয়! তিরিশ টাকার মামলা। এতোগুলো টাকা কি অমনি অমনি ছাড়া যায়!

অবশেষে সেই বাড়িওয়ালা একদিন সুশীলাদের দরজায় এসে রাগত স্বরে বললে, দেখো বাপু, তোমরা যদি বাড়ি ভাড়া নাই দিতে পার, তবে আমার ঘর খালি করে দাও। জ্ঞাতি বলেই আমি এতদিন তোমাদের সঙ্গো ভালো ব্যবহার করেছি। আর আমার পক্ষে সহানুভূতি দেখানো সম্ভব নয়।

সুশীলা— হ্যাঁ, আমিও বুঝি। তবে আমার কাছে যদি টাকা থাকত, আমি আগে আপনার ভাড়া মিটিয়েই তার পর জল খেতাম। জানি আপনি আমাদের দুর্দিনে সাহায্য করেছেন সে কারণে আমরাও কৃতজ্ঞ। মাথা নিচু করেই আছি। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, এখন আমার হাত একেবারেই খালি। বেশ তো। মনে করুন না কেন এক ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের কিছুদিন প্রতিপালন করছেন, এর বেশি আর কী বলব।

বাড়িওয়ালা— রাখো রাখো, এ ধরনের কথা অনেক শুনেছি। জ্ঞাতি বলেই এভাবে সুযোগ নিতে পারছ। যদি কোনো মুসলমান হত তবে চুপি চুপি তাকে মাসে মাসে টাকা দিয়ে দিতে। না হলে বাইরে বার করে দিত। বেশ মজা পেয়েছ, না? যেহেতু আমি জ্ঞাতিভাই, অর কী? ভাড়া দেবার আর প্রয়োজন নেই। আমার তাগাদা করাও অন্যায়। বেশ বেশ, এরকম ব্যবহারই তো জ্ঞাতির প্রাপ্য। তাই না?

ঠিক এই ঝগড়ার সময় রেবতী সেখানে উপস্থিত হল। বাড়িওয়ালা তাকে আপাদমস্তক খুব ভালো করে দেখল এবং কী যেন একটা ভেবে বলে উঠল, শোনো, তোমার এ মেয়ে তো দেখছি বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। এর বিয়ের ব্যাপারে কোথাও কথাবার্তা বলেছ কি?

লজ্জা পেয়ে রেবতী দৌড়ে পালিয়ে গেল। সুশীলাও এ কথাকটির মধ্যে আত্মীয়তার সুর অনুভব করে আশান্বিত হয়ে বলল, আজ্ঞে না, দাদা, এখনও পর্যন্ত কোথাও কথাবার্তা বলিনি। এদিকে ঘরের ভাড়াই জোগাড় করতে পারছি না, বিয়ের কথা আর ভাবব কী করে। আর আসলে, এখনও তো ও খুব ছোটো।

বাড়িওয়ালা তাড়াতাড়ি শাস্ত্রের বিধান দিতে আরম্ভ করল, না না, মেয়েদের ছোটো বয়সেই বিয়ে দেওয়া উচিত। না দিলে অধর্ম হবে যে। ঠিক আছে, ঘরের ভাড়ার জন্য চিন্তা করতে হবে না। তোমাদের সংসারের যে এই হাল, আমি বুঝতে পারিনি, ঠিক আছে।

সুশীলা—তা, আপনার খোঁজে কি কোনো ভালো পাত্র আছে? তাছাড়া আপনি তো আমার অবস্থা সবই জানেন। দিতেথুতে কিছুই পারব না।

ঝাবরমল (বাড়িওয়ালার নাম)— না না, দেনাপাওনা নিয়ে তোমার কোনো সমস্যা হবে না। এ এমন পরিবার যে তোমার মেয়ে সারাটা জীবন সুখে থাকবে। তোমার ছেলেও সেখানে বোনের সঙ্গে থাকতে পারবে। কুলমর্যাদাশালী তো বটেই, অন্যান্য সব দিক দিয়েও অবস্থাসম্পন্ন পরিবার। তবে হ্যাঁ, পাত্র কিন্তু দোজবর।

সুশীলা—দোজবর হলে কী হয়েছে। বয়সটা অল্প হওয়া চাই।

ঝাবরমল—না না, বয়স মোটেই বেশি নয়। বছর চল্লিশেক মাত্র। কিন্তু দেখতে ভীষণ হৃষ্টপুষ্ট। আরে, পুরুষের চেহারা তো থাকে খাওয়াদাওয়াতে। ব্যস্, শুধু এটুকু বুঝে নাও যে গোটা পরিবার উদ্ধার হয়ে যাবে।

সুশীলা নিরুৎসাহভাবে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ভেবেচিন্তে জানাবোখন। তবে একবার যদি আমায় দেখাতে পারেন।

ঝাবরমল—দেখার জন্য তোমাকে অন্য কোথাও যেতে হবে না, বউঠান। পাত্র তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে।

একথা শুনে ঘৃণায় সুশীলার গা রিরি করে উঠল। ঝাবরমলের দিকে একবার চেয়ে মনে মনে ভাবল, মরণ, এই পঞ্চাশ বছরের বুড়োর কী আকাঙ্ক্ষা! বুকের চামড়া ঝুলে এসে নাভিতে ঠেকছে। এর পরেও বিয়ের বাসনা! খুব শয়তান, ভেবেছে প্রলোভনে পড়ে আমি আমার মেয়েকে এর গলায় ঝুলিয়ে দেব! না,, দরকার হয় মেয়ে আমর সারাজীবন কুমারী থাকবে, তবুও এই মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার জীবন নষ্ট হতে দেব না। সুশীলা ধীরে ধীরে নিজেকে শান্ত করল। সময়ের ফের নচেৎ এই ধরনের লোক কী এই প্রস্তাব দিতে সাহস পেত। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনার এই আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু, আমি আপনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না। আমায় মাপ করে দেবেন।

ঝাবরমল— তা, তুমি কি ভেবেছ যে মেয়ের জন্য জাতের মধ্যে কোনো কুমার পাত্র পাবে?

সুশীলা—আমার মেয়ে কুমারী থাকবে।

এতেও ঝাবরমল দমবার পাত্র নয়। বলল, হ্যাঁ, তা না হলে রামনাথের নামে কলঙ্ক চাপানো যাবে কী ভাবে?

সুশীলা—আচ্ছা, আপনাদের কি এ ধরনের কথা বলতে এতটুকু লজ্জাও করে না? এই নাম নাম করে তো বাড়ি গেল, সম্পত্তি গেল। কিন্তু তা বলে তো আর মেয়েটাকে এখন কুয়োতে ডুবিয়ে মারতে পারি না।

ঝাবরমল—ঠিক আছে। তবে আমার ভাড়াটা চুকিয়ে দাও।

সুশীলা—এখন আমার কাছে টাকা নেই।

তৎক্ষণাৎ ঝাবরমল ভীমবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে গৃহস্থালীর এক একটি বস্তু টেনে টেনে বাইরে গলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কলসি তুবড়ে গেল, মাটির ছোটো জালাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। বাক্সের কাপড়চোপড় ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। সুশীলা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর খেলা দেখতে লাগল।

সংসারের অবশিষ্ট জিনিসপত্র নষ্ট করে তবে ঝাবরমল ঘরে তালা লাগাল এবং আদালত থেকে সে তার ভাড়ার টাকা আদায় করে নেবার হুমকি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ছয়

বড়োলোকদের কাছে ধনদৌলত থাকে কিন্তু গরিবদের সম্বল শুধু হৃদয়। ধনদৌলতের সাহায্যে জগতে বহু কিছু হয়, বিরাট অট্টালিকা তৈরি হয়, বাড়িতে চাকরবাকর রেখে আরাম করা যায়, ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যাওয়া যায়। কিন্তু হৃদয় থাকলে সমবেদনা বোধ থাকে, পরের দুঃখে মানুষ কাতর হয়।

ঝাবরমলের ওই বাড়িরই লাগোয়া একটা আনাজ বিক্রেতার দোকান ছিল। এক বিধবা ও নিঃসন্তান মহিলা ওই দোকানটি চালাত। কিন্তু তার বাইরের চেহারাটা অন্তরের ঠিক বিপরীত ছিল। সুশীলাদের এই অপমানজনক হেনস্তা দেখে সে ঝাবরমলের উদ্দেশে শতকোটি গালাগাল পাড়তে লাগল এবং সুশীলাদের প্রত্যেকটি জিনিসপত্র একটা একটা করে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে রাখল। তারপর বলল, চলো বউ, আমার ঘরেই থাকবে। অনেক ভদ্র ব্যবহার করা হয়েছে। না হলে আজকে ওর গোঁফ উপড়ে ফেলতাম। ঘাটে ওঠার সময় হয়েছে, এখনও এত লালসা। টাকা টাকা করে মরল। টাকা ওর সঙ্গে যাবে যেন? চলোতো বউ, তোমরা আমার ঘরেই থাকবে। আমি কারও ধার ধারি না। শুধু একলাই থাকি। কাজেই তোমাদেরও কোনো সংকোচের কারণ নেই। যা জুটবে তা থেকে আমাকেও একটু ভাগ দিও। ব্যস্।

বৃদ্ধার আন্তরিকতায় সুশীলা কিছুটা আশ্বস্ত হলেও ঘরপোড়া গোরুর মতো ভয়ার্ত স্বরে বলল, মা গো, আমার কাছে সেরখানেক আট ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি তোমায় ঘর ভাড়া দেব কোথা থেকে?

বৃদ্ধা—দেখো বউ, আমি তো ঝাবরমলও নই আর কুবেরদাসও নই। আমি তো বুঝি যে জীবনে সুখও যেমন আছে, দুঃখও তেমন আছে। সুখের দিনে উচ্ছৃঙ্খল হতে নেই এবং দুঃখের দিনে ঘাবড়ে যেতেও নেই। আমি তো তোমাদের মতো লোকেদের কাছ থেকেই দু-চারটে পয়সা কামিয়ে নিজের পেট চালাই। আমি তোমাদের বহুদিন ধরেই দেখছি, যখন তোমরা সেই নিজেদের পাকা বাড়িতে থাকতে, সেই তখন থেকে। আর আজও দেখছি, একেবারে অনাথ অবস্থায়। সেদিনও তোমার যে

ব্যবহার আমি দেখেছি, আজও সেই একইরকম। তোমার মতো লোককে আমার ঘরে ঠাঁই দিতে পেরে আমি ধন্য। আমি কি অন্ধ যে তোমার কাছে ভাড়া চাইব?

বৃদ্ধার এই সান্ত্বনাপূর্ণ কথাগুলি সুশীলার মনের বোঝা হালকা হতে সাহায্য করল। সে অনুভব করল যে, দরিদ্র এবং সাধারণ মানুষরাই সত্যিকারের সজ্জন হয়। বড়োলোকেরা দয়া দেখায় কিন্তু তা অহংকারেরই রূপান্তর মাত্র।

দেখতে দেখতে ছটি মাস সুশীলা ওই আনাজ-বিক্রেতা মহিলার ঘরেই একসঙ্গে কাটিয়ে দিল। ওই বৃদ্ধাও এদের খুবই ভালোবাসতে লাগল। সে যা কিছু পেত, সবই এনে সুশীলার হাতে দিত। দুই ছেলেমেয়েই যেন তার দুচোখের মণি হয়ে উঠল। প্রতিবেশীদের কারও ক্ষমতা ছিল না বাচ্চাদের চোখ রাঙিয়ে কথা বলে। রাজ্যের ঝামেলা বৃদ্ধা একাই নিজের মাথায় নিয়ে নিত। এদিকে সন্তলালও প্রত্যেক মাসে কিছু না কিছু হাত খরচ দিয়েই যেত। এ থেকেই কোনোক্রমে সব কজনার রুটি ও ডালের বন্দোবস্ত হত।

সে বছর কার্তিক মাসে চারিদিকে খুব জ্বরের প্রাদুর্ভাব হল। মোহন বেশ ভালোই ছিল। রোজ খেলাধুলাও করছিল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় জ্বরে অচেতন হয়ে পড়ল। এবং তিনদিনেও তার জ্ঞান ফিরল না। জ্বরের প্রকোপ এত প্রবল ছিল যে পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাপের তীব্রতা অনুভব করা যাচ্ছিল। বৃদ্ধা তো অস্থির হয়ে ওঝা-বৈদ্যদের কাছে দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছিল, কিন্তু জ্বর নামার কোনো লক্ষণই চিল না। সুশীলার আশঙ্কা হচ্ছিল যে এ নিশ্চয়ই টাইফয়েড। সে কারণে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

চতুর্থ দিনে সুশীলা মেয়েকে কাছে ডেকে বলল, শোন, তুই তো পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি চিনিস, যা ওঁকে গিয়ে বল যে ভাই-এর খুব জ্বর। উনি যেন একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দেন।

রেবতীকে বলতে শুধু যা দেরি, সে এক দৌড়ে শেঠ কুবেরদাসের বাড়ি পৌঁছে তাকে সব বলল। সব শুনে কুবেরদাস বলল, ডাক্তারের ফিস্ ষোলো টাকা। তোর মা দিতে পারবে তো? রেবতী নিরাশ হয়ে বলল, মার কাছে টাকা কোথায়! এর জবাবে কুবেরদাস দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, তবে কোন মুখে তোরা আমার ডাক্তারকে ডাকতে এসেছিস? কেন? তোর সেই মামা কোথায়? যা যা, বাড়ি গিয়ে তোর মাকে বল যে সেবা-সমিতির কোনো ডাক্তারকে ডেকে নিতে। কেন, সরকারি হাসপাতালে ছেলেকে নিয়ে যেতে পারছে না? না কি এখনও সেই পুরোনো অভ্যেস ছাড়তে পারেনি? এ্যাঁ, এ কেমনতরো মূর্খ মেয়েছেলে রে, ঘরে টাকা নেই, ডাক্তার ডাকার হুকুম পাঠিয়ে দিয়েছে? ভেবে নিয়েছে যে ডাক্তারের ফিস্ পঞ্চায়েত প্রধান দেবে, তাই না? কেন? প্রধান দেবে কেন? জ্ঞাতির সম্পত্তি যদি কিছু এসেই থাকে, তবে তা ধর্মকর্মতেই ব্যয় হবে, ওড়াবার জন্য তো নয়।

এসব মন্তব্য শুনে রেবতী মার কাছে ফিরে এল। কিন্তু যা যা শুনে এসেছে, তা সে মাকে বলতে পারল না। কাটা ঘায়ে অর নুনের ছিটে দিয়ে কী হবে? সে মাকে জানাল যে পঞ্চায়েত প্রধান বাড়িই নেই, কোথায় যেন গেছেন।

সুশীলা—তাহলে তার সরকারবাবুকে বলিসনি কেন? সেখানে কি তুই মিষ্টি খেতে গেছিস নাকি যে লজ্জা পাবি? যা যা, দৌড়ে বলে আয়।

ঠিক সেই সময় সন্তলাল একজন ডাক্তার সঙ্গে করে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

সাত

সেই ডাক্তারটিও একদিন দেখে গিয়ে আর দ্বিতীয় দিন এলেন না। সেবা-সমিতির ডাক্তারও দিন ছয়েক এসে যত্ন নিয়ে দেখে গেছেন। কিন্তু উনিও আর আসার অবকাশ পাচ্ছেন না। এদিকে মোহনের অবস্থা দিনের পর দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছিল। প্রায় একমাস হয়ে গেল, কিন্তু জ্বর এমনই লাগাতার হচ্ছিল যে এক মুহূর্তের জন্যও নামছিল না। মোহনের চেহারা শুকিয়ে গেল, তার দিকে আর তাকানো যাচ্ছিল না। কিছু কথা বলা দূরস্থান, বলার চেষ্টা করার সামর্থ্যও যেন তার নেই। পাশটুকু পর্যন্ত ফিরতে পারে না। শুয়ে থেকে থেকে গায়ের চামড়া কুঁচকে গেল, মাথার চুল পর্যন্ত উঠে গেল। হাত-পা তো কাঠি-কাঠি। সন্তলাল যখন কাজ থেকে ছুটি পায়, তখনই দেখতে আসে। কিন্তু তাতে কী হবে, শুধু সেবাশুশ্রূষা করলে তো আর ভালো হবে না। ওষুধ কোথায়?

এরই কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় মোহনের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। মায়ের প্রাণ তো আগে থেকেই শুকিয়ে ছিল। এ অবস্থা দেখে মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। ইতিমধ্যে বহু জায়গায় নানা ঠাকুরদেবতার কাছে মানত ইত্যাদি করা তো হয়েই ছিল, এবার সে কাঁদতে কাঁদতে মোহনের খাটটাকে সাতপাক ঘুরতে ঘুরতে হাত জোড় করে বলতে লাগল, হে ভগবান, এ আমার সারা জীবনের একমাত্র সম্বল। সর্বস্ব খুইয়েও আমি ছেলেকে বুকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তুমি আমায় এত বড়ো আঘাত দিও না। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। দয়ামময়, তুমি একে ভালো করে দাও। এর পরিবর্তে তুমি আমায় নিয়ে যাও। ব্যস্, আমি আর কিছু চাই না। শুধু এইটুকু দয়া করো, ভগবান।

এই বিশ্বসংসারের অনেক কিছুই আজও রহস্যময়। কে এই রহস্য বুঝতে পারে? তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও। আমাদের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে যে, যেদিন বেইমানি করে কোনো টাকা কড়ি কামিয়েছি, অমনি সেই দিনই কোনো না কোনো ভাবে সেই টাকার দ্বিগুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই দেখা গেল, সেই রাত্রেই সুশীলার জ্বর এল এবং সেই একই দিনে মোহনেরও প্রথম জ্বর ছাড়ল। ছেলের সেবাতে তো মা একেবারে অর্ধেক হয়েই গিয়েছিল, তাই এই অসুখ তাকে এমনভাবেই ধরল যে ছাড়ার নাম পর্যন্ত করল না। জানিনা, ভগবান মায়ের আকুল আবেদন মন দিয়ে শুনেছিলেন কিনা, কিন্তু তার প্রার্থনা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করা হল। পনেরো দিনের দিন মোহন খাট থেকে নেমে মায়ের শয্যাপার্শ্বে এসে তার বুকের উপর মাথা রেখে কাঁদতে আরম্ভ করল। মাও তেমনি ছেলেকে দুই বাহুতে জড়িয়ে বুকে চেপে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল, কাঁদছিস কেন, বাবা? আরে পাগল, আমি ভালো হয়ে যাব। এখন আমার চিন্তা কীসের? ভগবান সবারই পালনকর্তা। সেই তোদের রক্ষা করবেন। উনিই তোদের সব। এখন তো আমি সব দিক দিয়েই নিশ্চিন্ত। ভাবিস না, আমি তাড়াতাড়িই ভালো হয়ে যাব।

মোহন— কিন্তু বুড়িমা বলছে যে মা আর ভালো হবে না?

এ কথায় সুশীলা ছেলেকে আরও কাছে টেনে আদর করে বলল, বুড়িমা পাগলি, তাই সে যা বলছে, বলতে দে। আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি সব সময় তোদের সঙ্গেই থাকব। তবে হ্যাঁ, যেদিন তোরা কোনো অপরাধ করবি, কারও কোনো জিনিস না বলে নিয়ে নিবি, সেই দিনই আমি মরে যাব।

মোহনও মায়ের কথায় খুশি হয়ে বলল, তাহলে তুমি আমাদের ছেড়ে কোনোদিন যাবে না তো মা?

সুশীলা— না বাবা, না, কোনোদিন না, কোনোদিন না।

সেই রাত্রেই এই অনাথা বিধবা মহিলা সব দুঃখ ও বিপত্তির বোঝা পার করে নিজের দুই নাবালক ছেলেমেয়েকে ভগবানের উপর সঁপে দিয়ে পরলোকে চলে গেল।

আট

এরপর দেখতে দেখতে আরও তিনটে বছর পার হয়ে গেছে। মোহন ও রেবতী দুজনেই সেই বৃদ্ধা মহিলার কাছেই থাকে। বৃদ্ধা মা যদিও নয়, তবুও যেন মায়ের থেকেও বেশি। মোহন সকালে স্কুলে যাবে বলে রোজ রাত্রে সে রুটি বানিয়ে রেখে দেয় এবং ভোরবেলা তাকে সেই রুটি খাইয়ে, নিজে সঙ্গে করে পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালায় পৌঁছে দিয়ে আসে। ছুটির সময়ও নিজে আনতে যায়। রেবতী এবার চোদ্দয় পড়েছে। সে ঘরের সমস্ত কাজকর্ম—কোটা-বাটা, রান্নাঘর সাফ করা, বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা—সবই করে। বুড়িমা যখন অন্য কোথাও কিছু বিক্রি করতে যায়, তখন রেবতীকে দোকানে পর্যন্ত কিছুক্ষণ বসতে হয়।

একদিন পঞ্চায়েত প্রধান শেঠ কুবেরদাস রেবতীকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, কী রে! তোর দোকানে বসতে লজ্জা করে না? সমস্ত জ্ঞাতি ভাইদের মাথা হেঁট করবি না কি? খবরদার, কাল থেকে দোকানে বসবি না। হ্যাঁ, শোন্, আমি ঝাবরমলের সঙ্গে তোর বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে ফেলেছি।

কুবেরদাসের স্ত্রীও এ কথায় সমর্থন জানিয়ে বলল, তা বাছা, তুই তো এখন বড়ো হয়ে উঠছিস। এখন তোর দোকান-টোকানে বসা ঠিক না। নানা লোকে নানা কথা বলে। বুঝলি না। এদিকে শেঠ ঝাবরমল তো রাজিই হচ্ছিলেন না, আমি তাকে কত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে না রাজি করিয়েছি। ব্যস্, শুধু এটুকু বুঝে নে যে রানি হয়ে যাবি। লাখ টাকার সম্পত্তিরে, লাখ টাকার! তোর ভাগ্য খুবই ভালো, তাই তো এমন বর পেলি! তোর যে ছোটো ভাই আছে, তাকেও একটা দোকান-টোকান করে দেওয়া যাবে খন।

কুবের—দেখ তো, আত্মীয়স্বজনদের কত বদনাম হয়ে যাচ্ছে

স্ত্রী—তাই তো।

রেবতী অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলল, আমি এ সবের কী জানি। আপনারা মামাকে বলবেন।

কুবেরদাস এ কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, কে? সে আমাদের কে হয় যে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে? সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে তো খাতা লেখার কাজ করে। তাকে আমি কী জিজ্ঞেস করব! আমি পঞ্চায়েত করি। সুতরাং আমার এ সবের যথেষ্ট অধিকার আছে। যে কাজে জ্ঞাতিদের মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়, সেটাই করব। আমি অন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের মতামতও জেনে নিয়েছি। সবাই আমার সঙ্গে একমত। আর তুই যদি আমার কথা না মানিস, তবে আমরা আদালতের মারফত করব। হ্যাঁ, শোন্, এটা ধর, তোদের টুকটাক খরচপত্র করতে কাজে লাগবে। এ কথা বলে কুবেরদাস একটা কুড়ি টাকার নোট রেবতীর দিকে ছুঁড়ে দিল।

রাগে রেবতীর চোখমুখ প্রচণ্ড লাল হয়ে গেল। সে সেই নোটটি তুলে ছিঁড়ে কুঁচিকুঁচি করে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, আমাদের যখন একবেলাও রুটির জোগাড় ছিল না, তখন কি জ্ঞাতি-

গুষ্ঠিরা আমাদের খোঁজ নিয়েছিল? আমার ভাই-এর কঠিন অসুখ হয়েছিল, কেউ একটা খবর পর্যন্ত নেয়নি। শুধু কি তাই, আমার মা মারা গেলে পর্যন্ত কেউ উঁকি দিয়েও দেখেনি। তাই এই ধরনের জ্ঞাতিদের আমি পরোয়াও করি না।

রেবতী কুবেরদাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সেই বাড়ির ভিতর থেকে ঝাবরমলকেও বারান্দায় বেরোতে দেখা গেল, তবে তাকে নিতান্তই আশাহত বলে মনে হচ্ছিল। কুবেরদাসের স্ত্রী বলল, মেয়েটা বড্ড অহংকারী। চক্ষুলজ্জা বলেও কিচ্ছু নেই।

ঝাবরমল—কুড়িটা টাকাই নষ্ট হয়ে গেল। এমনভাবে ছিঁড়েছে যে জোড়াও যাবে না।

কুবের—না না, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। আমি আদালতের সাহায্যে সব ঠিক করে নেব, যাবে কোথায়?

ঝাবরলমল—এখন তো আপনিই আমার একমাত্র ভরসা।

পঞ্চায়েত প্রধানের কথা কোথাও মিথ্যে প্রমাণিত হতে পারে? কোথাও কোনোদিন কি তা হয়েছে? রেবতী তো সামান্য নাবালিকা! তায় মাতাপিতৃহীনা! এই অবস্থায় তো পঞ্চায়েতেরই তার উপর কর্তৃত্ব করার পূর্ণ অধিকার। কিন্তু রেবতী কোনোদিনই এই জ্ঞাতিদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে থাকতে চায়নি, আজও না। কিন্তু তাবলে, আইন কি পঞ্চায়েত প্রধানদের এই অধিকারকে উপেক্ষা করতে পারে? পারে না।

সন্তলাল সব ঘটনা শুনে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, ভগবান, কবে যে এই জ্ঞাতিরা শেষ হবে?

রেবতী অসহায়ের মতো মামাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মামা, এরা কি জোর করে আমাকে সব কিছু মানতে বাধ্য করতে পারে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তলাল বলল, হ্যাঁ মা, বড়োলোকের হাতেই তো আজ আইনকানুন সব রে!

রেবতী—আমি যদি বলি যে, আমি ওই লোকটার সঙ্গে বিয়ে বসতে চাই না?

সন্তলাল—তোর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কার কী আসে যায়? তোর ভাগ্যে এটাই লেখা ছিল রে। সুতরাং কে তাকে ঠেকাবে, বল্! থাক গে, আমি প্রধানের কাছে একবার ঘুরে আসি, বুঝলি।

রেবতী—না, মামা, না, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। যখন ভাগ্যই একমাত্র ভরসা, তখন আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে, তাই হতে দাও।

সেই রাতটা রেবতী প্রচণ্ড অস্থিরতায় ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিল। বারে বারেই ঘুমন্ত ভাইকে জড়িয়ে ধরে আদর করছিল। ভাবছিল এই অনাথ বালক একেবারে একলা কী ভাবে পরবর্তী জীবন কাটাবে? এই সব সাত-পাঁচ ভেবে তার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল; কিন্তু ঝাবরমলের চেহারাটা মনে পড়তেই তার সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে।

ইদানীং রেবতী রোজই ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করতে যেত। বেশ কয়েকমাস ধরেই যাচ্ছিল। তবে আজ একটু অন্ধকার থাকতেই রওনা দিল। রোজই যায় বলে কেউ সন্দেহও করেনি। কিন্তু বেলা আটটা বেজে গেলেও সে ফেরত না আসায় লোকের মনে সন্দেহ হল। বেলা তৃতীয় প্রহরের মধ্যেই সারা গ্রামে এবং জ্ঞাতিদের মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে—শেঠ রামনাথের মেয়ে গঙ্গায় ডুবে গেছে—তার মৃতদেহও পাওয়া গেছে।

কুবেরদাস বলল, ঠিক আছে, ভালোই হল। জ্ঞাতিদের তো আর কোনো বদনাম হবে না। বাঁচা গেছে।

হতাশাগ্রস্ত ঝাবরমল কারতকণ্ঠে বলল, এবার আমার জন্য একটা অন্য উপায় দেখুন।

ওদিকে মোহনকে দিদির জন্য কপাল চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে দেখে বুড়িমা তাকে কোলের উপর বসিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বলছে, কাঁদিস্ না সোনা, ও তো মানুষ ছিল না, সাক্ষাৎ দেবী। ওর জন্য কেউ কাঁদে? বেঁচে থাকতেই ওর যা কিছু দুঃখ ভোগ হয়েছে। এখন ও নিজের মায়ের কোলে গিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। ওর জন্য কি কেউ কাঁদে রে!

(মৃতক-ভোজ) অনুবাদ কৃষ্ণা গুহ

নালিশ

জীবনের বেশির ভাগটাই এ বাড়িতে আমার কেটে গেল; কিন্তু ভাগ্যে কখনও এক ফোঁটা সুখ জোটেনি। আমার স্বামী দুনিয়াসুদ্ধ লোকের চোখে হয়তো খুব সৎ, উদার, শিষ্ট, সৌম্য মানুষ; কিন্তু যাকে সহ্য করতে হয়, সেই শুধু বোঝে লোকটি কেমন? লোকেদের আর কী! তারা এমন লোকেরই প্রশংসা করে আনন্দ পায় যারা নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে অন্যের জন্য আপন সর্বনাশ ডেকে আনে। যে লোক নিজের সংসারের দিকে চায়, দুনিয়ায় কেউ তাকে প্রশংসা করে না। দুনিয়ার চোখে সে তখন স্বার্থপর, কৃপণ, ক্ষুদ্রচিত্ত, নীতিহীন লোক মাত্র। ঠিক এই রকমই, যে লোক পরের জন্য করে মরে, বাড়ির লোকেরাই বা তার প্রশংসা করবে কেন? এই যে আমার এনাকেই দেখুন না! সারাটা দিন আমায় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারেন। যদিও আমি পর্দানশিন নই তবু বাজারে গিয়ে সওদা কিনতে আমার ভালো লাগে না। আর এঁর এমনই হাল যে, যদি কিছু আনতে বলি, এমন দোকান থেকে আনবেন, যে দোকানে ভুল করেও অন্য খদ্দের ঢোকে না। এই সব দোকানে ভালো জিনিস পাওয়াই যায় না, আর না করে ঠিকমতো ওজন, না নেয় সঠিক দাম। এ ধরনের গণ্ডগোল না করলে ওই দোকানটার অত বদনামই বা কেন হবে? কিন্তু এই রকম বাজে দোকান থেকে জিনিস কেনা এঁর বাতিক। কতবার বলেছি, চালু দোকান থেকে সওদা কিনবে, সেখানে মাল বেশি বিক্রি হয়। কারণ সেখানে টাটকা তাজা জিনিসটা আসে। কিন্তু যত ঝড়তি-পড়তি দোকানদারদের সঙ্গেই এঁর বনিবনা। তারাও ঝোপ বুঝে কোপ মারে। যদি গম কিনে আনেন, সে গম ঘুণধরা, বাজারের সবচেয়ে নিকৃষ্ট গম; চাল যদি এল তা এমনই মোটা হবে যে বলদেও ছোঁবে না, ডাল, কাঁকর আর কাঁটাবীজে ভরা। মন মন কাঠ পোড়ালেও সাধ্য কী সে ডাল গলে। ঘি যদি আনলেন আধাআধি তেল মেশানো কিংবা ষোলোআনাই 'কোকোজেম'। আর দাম? খাঁটি ঘি-এর দাম থেকে এক রতি কম! তেল আনবেন, তাও ভেজাল, চুলে দিলে চিটচিট করে; দাম দিয়ে আসবেন বিশুদ্ধ আমলকী তেলের। মনে হয় কোনো ভালো বড়ো চালু দোকানে যেতে ইনি ভয় পান। ভাবেন হয়তো দোকান যত বড়ো ভুসিমাল তত বেশি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ছোটো দোকানেই পচা জিনিস মেলে। এক-আধ দিনের ব্যাপার হলে না হয়ে সহ্য করা যায়, কিন্তু রোজ রোজ একই ধরনের হ্যাঙ্গাম সওয়া মুশকিল। আমি শুধু একটা কথাই জানতে চাই, —তুমি ছোটো বাজে পোড়ো দোকানে যাবেই বা কেন? ওই দোকানগুলিকে জিইয়ে রাখার দায় কি তোমার? উনি জবাব দেন —আমায় দেখে সবাই হাঁকডাক করতে থাকে যে।

বাহবা! এরপর আর বলার কী থাকতে পারে? কী দারুণ কথা, কেউ ডাকল, দু-চারটে খোশামুদি বুলি আওড়াল, একটু স্তুতি, ব্যস্, শ্রীমানের মন-মেজাজ আকাশে পাখনা মেলল। হুঁশই রইল না

যে জিনিসের বদলে আবর্জনা ভরে দিচ্ছে না অন্য কিছু। যদি বলি, তুমি ও রাস্তা দিয়ে যাওই বা কেন? অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে যেতে পার না? এমন বাজে লোকদেরকে পাত্তাই বা দাও কেন? তার আর কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। কথায় বলে বোবার শত্রু নেই। ওর সঙ্গো আর কে এঁটে উঠবে?

একবার একটা গয়না গড়াতে দিলাম। আমি তো মহাশয়টিকে চিনি। কিছু জিজ্ঞেস করাই বৃথা। নিজের পরিচিত এক স্যাকরাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম, ঘটনাচক্রে আমার স্বামী বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, স্যাকরা জাতটা বিশ্বাসী হয় না, ঠকে যেতে পার। আমি একজন স্যাকরাকে চিনি, আমার সঙ্গোই পড়াশোনা করেছে। বছরের পর বছর আমরা একসঙ্গো খেলাধুলো করেছি। আমার সঙ্গো সে কখনও বেইমানি করবে না। আমিও ভাবলাম, এনার যখন বন্ধু, তাও আবার ছোটোবেলাকার, তখন বন্ধুত্বের দাবিতেই কাজটি মন দিয়ে করবে। সোনার একটা গয়না আর একশোটা টাকা আমি এঁর হাতে তুলে দিলাম। আমার ভালোমানুষ স্বামীটি গয়না আর টাকাটা কী জানি কোন ঠগের হাতে তুলে দিয়ে এলেন, কয়েক বছর ধরে নানান ঝঞ্ঝাট করে যখন জিনিসটি তৈরি হয়ে এল, আট আনা খাদ আর এমন বিশ্রী ডিজাইন যে দেখলেই ঘেন্না ধরে। কত বছরের একটা সাধ ধুলোয় মিলিয়ে গেল। কাঁদলাম কাটলাম, আবার শেষে এক সময় চুপও করলাম।

বন্ধুর গলায় ছুরি বসাতে দ্বিধা করে না এমনই সব বিশ্বাসী বন্ধু এনার। বন্ধুত্বও করেন যতসব ফচকে, গাঁটকাটা, নেংটি পরে হোলি খেলে এমন সব হাভাতে লোকেদের সঙ্গো। যাদের একমাত্র লক্ষ্যই হল,এনার মতো চোখ-থাকতে-অন্ধ লোকেদের সঙ্গো বন্ধুত্ব করা। রোজই কোনো না কোনো মহাশয় টাকা ধার নেওয়ার জন্য মাথার উপর এসে দাঁড়াবেন, আর না নিয়েও রেহাই দেবেন না। কিন্তু ধারের একটা টাকাও শোধ পেতে কোনোদিন দেখলাম না। মানুষ একবার ঠকে শেখে, দুবারে শেখে কিন্তু এই ভালোমানুষ লোকটি হাজার বার ঠকেও শেখেন না। যদি বলি— তাদের প্রয়োজনে টাকা ধার নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিলে, এখন যাও, নিজেই চেয়ে নিয়ে এসোগে। তোমার বন্ধু কি মরেছে না কী? এদিক ওদিক চেয়ে উনি চুপ করে থাকেন। বুঝি যে, বন্ধুদের শুকনো জবাব তুমি দিতে পার না। বেশ, তা না হয় নাই পারলে। আমিও বলছি না বন্ধুদের প্রতি অযথা নিষ্ঠুর হতে; কিন্তু মিষ্টি কথায় টালবাহানা তো করতে পার। কোনো অজুহাতও তো দেখাতে পার। যদি কোনো বন্ধু এসে ধার চাইল, ইনি ভাবনায় পড়লেন, কী করে অস্বীকার করেন। লোকেরা যে তাহলে জেনে যাবে যে এ মহাশয়টিও ফোঁপরা। মনে মনে ইনি ইচ্ছে পোষণ করেন, লোকে তাঁকে বড়োলোক মনে করুক, তার বদলে যদি দরকার হয় আমার গয়নাগাঁটিই বাঁধা পড়ুক না কেন। সত্যি বলছি, কখনও কখনও একটা পয়সার জন্য এমন ঠেকা খাই। তবু ঘরে টাকা থাকলে এই সৎ লোকটিকে যেন কামড়ায়। যতক্ষণ না টাকাগুলো রাইছাই হয়ে খরচ না হয়ে যাচ্ছে, তিনি শান্তি পান না। এনার গুণগান আর কত গাইব! সত্যি আমার প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। একজন-না-একজন অতিথি যমের মতো আমাদের শিয়রে যেন দাঁড়িয়ে আছে। জানি না এ কোন ধরনের অবিবেচক বন্ধু এরা। কেউ এক চুলো থেকে মরতে আসে, কেউ আবার আরেক চুলো থেকে। বাড়ি তো নয়; এ যেন নুলোদের এক আস্তানা। ছোট্ট তো বাড়ি, একটাই বড়োমতো ঘর; কোনও মতে দুটো খাট তাতে পাতা আছে। বাড়তি বিছানা চাদর কিছুই নেই। কিন্তু বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে ডেকে আনতে

এঁর জুড়ি নেই। নিজে তো না হয় অতিথির সঙ্গে শুলেন; অতএব খাট তাঁদের চাই, চাদর বিছানা তো সবই চাই নইলে যে বাড়ির অবস্থা ফাঁস হয়ে যায়। আসল অসুবিধে হয় আমার আর বাচ্চাদের। গরমকালে অবশ্য তেমন কোনো অসুবিধে হয় না। শীতকালে ইস্টনাম জপ করে রাত কাটাতে হয়। গরমকালেও ছাতে অতিথিদের অধিকার সকলের আগে আর আমি আমার ছেলেপুলেদের নিয়ে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো পাখা ঝাপটাতে থাকি। ইনি একটুও ভাবেন না যে, বাড়ির যখন এই হাল তখন যাদের খাওয়া-পরার সংস্থান পর্যন্ত নেই, এমন লোককে বাড়িতে ডেকে আনা কেন? ভগবানের দয়ায় এনার সবকটি বন্ধুবান্ধব প্রায় একই শ্রেণীর। এমন কোনো বাপের ব্যাটাও দেখি না যে, দরকার পড়লে এনাকে একটা কানাকড়ি দিয়েও উপকার করে। দু-একবার মহাশয়ের এ ব্যাপারে অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবু জড়ভরতের মতো নিজের চোখ দুটি খোলা না রাখার দিব্যি গেলে বসে আছেন। এই রকম সব দরিদ্র ভট্‌চাজদের সঙ্গে এঁর ভাব। শহরে লক্ষ্মীর বরপুত্রদের তো কোনো অভাব নেই, কিন্তু তাদের সঙ্গে এনার কোনো পরিচয় নেই। তাদের কাছে যেতে এঁর আঁতে ঘা লাগে। বন্ধুত্ব করবে এমন সব লোকের সঙ্গে যাদের বাড়িতে দুমুঠো অন্নও জোটে না।

একবার আমাদের বাড়ির চাকরটি কাজ ছেড়ে চলে যায়। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত কাজের লোক পাওয়া যায়নি। বেশ ভালো, চালাক-চতুর একটি ছেলের খোঁজে ছিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজের জন্য লোক রেখে নেওয়ার ভূত এনার ঘাড়েও ভর করল। বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম আগের মতোই চলছিল কিন্তু এঁর মনে হচ্ছিল গাড়ি বোধ হয় আর চলছে না। আসলে, আমার এঁটোকাঁটা বাসন মাজা আর নিজের বাজার হাট করা এ দুটোই ওঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। একদিন কী জানি কোত্থেকে একটা নিরেট বোকা লোক ইনি ধরে নিয়ে এলেন। তার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিল নেহাতই বুনো, গেঁয়ো; কিন্তু ইনি সেটির এমন গুণ ব্যাখ্যান করলেন যে কী বলব? খুব নাকি চালাক, অনুগত, খুউব খাটিয়ে, সৎ লোক। বাড়ির আদবকায়দা জানে। যাই হোক চাকরটিকে আমি রেখে দিলাম। আমি কেন যে বারবার এঁর কথায় জড়িয়ে পড়ি, আমার নিজের কাছেই তা আশ্চর্য মনে হয়। কাজের এই লোকটি শুধু দেখতেই মানুষের মতো, মানুষের আর কোনো লক্ষণই তার ছিল না। কাজের তো কোনো ছিরিছাঁদই নেই। অবশ্য বেইমান লোক সে ছিল না, তবে নিরেট বোকা গাধা তো ছিলই। বেইমান হলে অন্তত আমি এই ভেবে খুশি হতাম যে নিজে নিয়ে খাচ্ছে। হতভাগা দোকানদারের হাতে লুঠ হয়ে বাড়ি ফেরে। দশ পর্যন্ত গুনতে জানে না। একটা টাকা দিয়ে যদি বাজারে পাঠাই, সন্ধে পর্যন্ত সে হিসেব বোঝাতে পারবে না। সমস্ত রাগ আমি বুকে পুষে রাখতাম। রক্ত গরম হয়ে উঠত, মনে হত কান দুটো ওর উপড়ে ছিঁড়ে ফেলি; কিন্তু এনাকে কোনোদিন ওকে কিছু বলতে শুনলাম না, বকাঝকা তো দূরের কথা। ইনি স্নান সেরে ধুতি কাচেন আর বোকারাম দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে। আমি হলে রক্ত চুষে খেতাম, কিন্তু এনার কোনো দুঃখবোধ নেই। আমার বকা খেয়ে ধুতি কাচতে গেলে ইনি আবার ওকে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। ওর দোষগুলোকে গুণ বলে আমায় বোঝাতে চাইতেন এবং এ চেষ্টায় সুফল না ফললে দোষ ঢাকা দেবার চেষ্টা করতেন। এমন মুখ্যু চাকর যে, ভালো করে ঘরও ঝাঁট দিতে জানে না। পুরুষদের থাকার মতো বাইরের বৈঠকখানা ঘরটাই যাহোক একটু কায়দামতো ঘর। সে ঘরে ঝাঁট দেবার সময় এদিকের জিনিস ওদিকে, ওপরের

জিনিস নীচে পড়ে যায়, মনে হয় সারা ঘরে যেন ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। আর ধুলো এত যে দম ২বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। আর ইনি? নিশ্চিন্ত মনে সেই ঘরের মধ্যেই বসে আছেন, যেন কিছুই হয়নি। একদিন আমি চাকরটাকে খুব বকলাম— কাল যদি ঠিকমতো ঘরে ঝাঁট না পড়ে তো কান ধরে বাড়ি থেকে দূরে করে দেব।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি যে ঝাঁট দেওয়া হয়ে গিয়েছে আর প্রত্যেকটি জিনিস বেশ পরিপাটি করে সাজানো। এক ফোঁটা ধুলো ময়লা কোথাও নেই। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। উনি হেসে বললেন, কী দেখছ? ঘুরে আজ সাত সকালেই ঝাঁট দিয়ে ফেলেছে। আমি ওকে ঝাঁট কীভাবে দিতে হয় বুঝিয়ে দিয়েছি। তুমি তো ওকে তেমনভাবে কিছু বোঝাওনা; উলটে বকাবকি কর।

আমি ভাবলাম যাক শয়তানটা কমসে কম একটা কাজ তো ভালোমতো শিখেছে। ইদানীং ঘরটা রোজই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যেত। ঘুরে ক্রমশ আমার চোখে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে লাগল। দৈবাৎ একটা ব্যাপার ঘটল। একদিন হল কী, অন্য দিনের চেয়ে একটু সকালে উঠে ঘরে গিয়ে দেখি, ঘুরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর ইনি একমনে ঝাঁট দিচ্ছেন। আমার চোখে যেন রক্ত উঠে এল। এঁর হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে ঘুরের মাথায় দিলাম বসিয়ে। হারামজাদাকে সেই মুহূর্তে বিদায় করে দিলাম।

ইনি বললেন, ওর মাইনেটা তো ওকে দিয়ে দাও। বলিহারি বুদ্ধি এনার, একে তো কাজকর্ম করেনি, তার ওপর চোখ রাঙিয়ে থাকবে, তাকে আবার পুরোপুরি মজুরি দেওয়া কেন? আমি একটা পয়সাও ওকে দিইনি। একটা কামিজ দিয়েছিলাম সেটাও কেড়ে নিলাম। এ ঘটনার পর আমার জড়ভরত স্বামী বেশ কয়েকদিন আমার ওপর অভিমান করে রইলেন। বাড়ি ছেড়ে চলেই যাচ্ছিলেন, বড়ো সাধ্যসাধনা করার পর রইলেন। এমন এমন নির্বোধ লোকও সব সংসারে পড়ে আছে। আমি যদি না থাকতাম এতদিন হয়তো এঁকে কেউ বাজারে গিয়ে বেচে আসত।

আবার একদিন মেথরটি পুরানো জামাকাপড় চেয়ে বসল। বেকারির এই যুগে বাড়তি কাপড়চোপড় সম্ভবত পুলিশ ও বড়োলোকদের বাড়িতে থাকে আমার বাড়িতে দরকারমতো কাপড়ও যথেষ্ট নেই। এনার কাপড়চোপড় ছোট্ট একটা বাক্সে কুলিয়ে যায়। বাক্সের আয়তন কম হলে পার্শেল করে যে কোনো জায়গায় পাঠানো যায়। তার ওপর এ বছর শীতের কাপড় তৈরি করাই গেল না। পয়সা কোথায়, কাপড়চোপড় হবে কোত্থেকে? আমি মেথরকে সাফ বলে দিলাম, এখানে সুবিধে হবে না।

সেবার প্রচণ্ড শীত পড়েছিল, আমি যে তা অনুভব করতে পারিনি তা নয়। গরিবদের সে-যে কী দুর্দশা, সে বোধও আমার ছিল; কিন্তু আমার বা আপনার পক্ষে আপশোশ করা ছাড়া আর কীই বা উপায় আছে? যতদিন সমাজের এই অবস্থা থাকবে ততদিন এরকম অভিযোগ থাকবেই।

যতদিন ধনী লোকেদের ঘরে ঘরে এক মালগাড়ি বোঝাই কাপড় জামা থাকবে, নির্ধন গরিবদের নগ্নতার কষ্ট পোয়াতেই হবে। যাক, আমি তো মেথরকে না করেই দিয়েছিলাম; কিন্তু উনি করলেন কী, উঠে গিয়ে নিজের কোটটি তার হাতে তুলে দিলেন। আমার সারা গায়ে যেন জ্বালা ধরে গেল। আমি এমন দানশীল নই যে, অন্যকে খাইয়ে-দাইয়ে নিজে শুকনো মুখে শুয়ে পড়ব? দেবতাটির কাছে তো সবেধন নীলমণি এই একটি মাত্র কোট ছিল, কিন্তু এর পর কী গায়ে দেবেন তা নিয়ে কোনো

চিন্তা ছিল কী, যশের লোভে যেন বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। মেথরটি সেলাম করে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের পথ ধরল। কদিন ধরে ইনি শীতে কাঁপলেন। রোজ সকালে বেড়ানো অভ্যেস, তা বন্ধ হয়ে গেল। ভগবান এঁকে এক অদ্ভুত মন দিয়েছেন। ছেঁড়া পুরোনো কাপড় পরতে এঁর মোটেও লজ্জা করে না। শেষে যখন আর সহ্য হচ্ছিল না আমি একটা কোট তৈরি করিয়ে দিলাম।

মনে মনে তো জ্বলে পুড়ে মরছিলাম, ইচ্ছে হচ্ছিল, শীতে কষ্ট পান; কিন্তু আবার ভয় হল, যদি অসুখে পড়েন তাহলে সে আরও খারাপ হবে। আসলে খাটতে তো ওঁকেই হবে।

মহাশয় ব্যক্তি টি মনে মনে ভাবেন হয়তো, তিনি কতই না মহৎ, বিনয়ী পরোপকারী লোক। হয়তো এ নিয়ে তাঁর মনে প্রচণ্ড গর্ব আছে। কিন্তু আমি এঁকে পরোপকারী বলে মনে করি না, বিনয়ী, মহৎও নয়। এ এক ধরনের মূঢ়তা। যে মেথরটিকে তিনি কোটটা দিয়েছেন, তাকে আমি কয়েকবারই রাতে মদ খেয়ে টলমল করতে দেখেছি, এনাকেও দেখিয়েছি। তাহলে অন্যের বিবেকহীনতার ক্ষতিপূরণ আমরা কেন করতে যাব? ইনি যদি পরোপকারী নম্র স্বভাবের লোকই হন তাহলে বাড়ির লোকদের প্রতিও তো এঁর মনে উদারতাবোধ থাকা উচিত। সবটুকু উদারতা শুধু বাইরের লোকেদের জন্যই সুরক্ষিত? বাড়ির লোকেদের তার একটুখানিও কি পাওনা নয়? আমার এতটা বয়স হল, কিন্তু এই ভালোমানুষটি কোনোদিন হাতে করে আমায় কোনো উপহারও দেয়নি। এ কথা অবশ্য সত্যি যে, বাজার থেকে ইচ্ছে মতো আমি যাই আনাই না কেন সে সম্বন্ধে ইনি কোনো আপত্তিই করেন না, বিরক্ত হন না; কিন্তু শর্ত একটা থাকে, নগদ টাকা দিয়ে যেন আমি কেনাকাটা করি। এনার নিজের কোনো দিন বাজার যেতে ইচ্ছে হয় না। এও আমি জানি বেচারি নিজের জন্যও কোনোদিন কিছু কেনাকাটা করেন না। আমি যা আনিয়ে দিই তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু মানুষ মাঝে-মধ্যে সখের জিনিস কামনা করেই থাকে। অন্যান্য লোকেদের দেখি তারা স্ত্রীর জন্য কতরকমের গয়না, রংবেরঙের কাপড়চোপড়, শখশৌখিনতার জিনিস আনে, কিন্তু এখানে যে এসব করা নিষেধ। বাচ্চাদের জন্যও খেলনাপাতি বা মিষ্টি কিংবা ভেঁপু এসব জীবনে একবারও কিনে আনেননি। বোধহয় কিছু না কেনার দিব্যি নিয়েছেন; সেই জন্যই তো আমি ওঁকে কৃপণ বলব, বেরসিক বলব, হৃদয়হীন বলব। উদার বলতে পারব না। অন্যের প্রতি ওঁর যেটা সেবা ও দয়াভাব তার একমাত্র কারণ হল, যশের কাঙালপনা ও ব্যবহারিক অজ্ঞানতা। এমনই এনার বিনয় যে, যে অফিসে কাজ করেন সে অফিসের কোনো উচ্চপদস্থ কারও সাথে কোনো মেলামেশা নেই। অফিসারদের নমস্কার করা তো এঁর নীতিবিরুদ্ধ। ডালি দেওয়া? সে তো আরও অসম্ভব ব্যাপার। কোনো অফিসারের বাড়ি ইনি কখনও যান না। এজন্য এঁকে যদি লোকসান ভোগ না করতে হয় তো আর কে করবে? অন্যরা বেশ ছুটিছাটার সুযোগ পেয়ে যায়, অথচ এনার বেলায় মাইনে কাটা যায়। অন্যদের চাকরিতে উন্নতি হয়, এঁকে কেউ পোঁছে না, হাজরি দিতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে, কারণ জিজ্ঞেস করা হয়। বেচারি! হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। কোনো বড়োশক্ত এ কাজ হলে তা এনার ঘাড়েই চাপে, ইনি একটুও আপত্তি করেন না। অফিসে এঁকে সবাই কলুর বলদ নাম দিয়েছে। এত খেটেও কপালগুণে হেনস্থাই জোটে। এরকম স্বভাবকে বিনয় বলা যায় না, স্বাধীন মনোবৃত্তিও নয়। আমি এটাকে সুযোগ সদ্ব্যবহারের বুদ্ধির অভাব বলেই মনে করি। ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব বলে মনে করি। কোনো অফিসার কেন এঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, সে কি শুধু পরিশ্রমী বলেই? শিষ্টাচার আর পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়েই

দুনিয়ার কাজ চলে। যদি আমি নিজেই অন্যের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চাই তাহলে অপরেই বা তা না চাইবে কেন? আর যখন মনে ক্ষোভ থাকে অফিসের ব্যবহারেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেসব লোক ওপরওয়ালাদের খুশি করার চেষ্টা করে, অফিসাররা যাদের দ্বারা উপকৃত হয়, যাদের ওপর তারা বিশ্বাস করতে পারে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি একটা সহানুভূতি থাকে। এর মতো সাধুপুরুষের প্রতি অফিসারদের সহানুভূতি হবেই বা কেন? অফিসাররাও তো মানুষ! তাদের মনে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠার কামনা রয়েছে তা কী দিয়ে পূরণ হবে? যদি অধীনস্থ কর্মচারী নিজের মেজাজে থাকে তাহলে কি অফিসারেরা গিয়ে তাকে সেলাম জানাবে? ইনি যেখানেই চাকরি করতে গেছেন সেখান থেকেই বরখাস্ত হয়েছেন। কোনো চাকরিতেই দু-তিন বছরের বেশি টিকে থাকতে পারেননি। হয় অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিংবা কাজের চাপের দরুন চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছে।

নিজের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে এঁর ভারী গর্ব। অনেকগুলি ভাই-ভাইপো থাকা সত্ত্বেও তাদের কোনোদিন একবারও খোঁজ নিতে দেখলাম না। ইনিই শুধু মায়ায় মরেন। এক দাদা তশিলদার। বাড়ির কর্তা তিনিই। যথেষ্ট আরামে থাকেন। মোটর গাড়িও কিনেছেন, চাকরবাকরও বেশ কয়েকটা, কিন্তু ভুল করেও ভাইকে একখানা চিঠিও লেখেন না। একবার আমাদের খুবই টাকাপয়সার টানাটানি হয়। আমি বলেছিলাম, নিজের ভাইয়ের কাছে চাও-না কেন? বললেন, শুধু শুধু ওকে চিন্তায় ফেলে লাভ কী? তাঁর নিজেরও তো খরচখরচা আছে, এমন কী আর বাঁচে? আমি যখন অনেক করে চাপ দিলাম, ইনি ভাইকে চিঠি লিখলেন। জানিনা চিঠিতে কী লিখেছিলেন, আদৌ চিঠি লিখেছিলেন না আমাকে ভাঁওতা দিয়েছিলেন। আমি জানতাম টাকা আসবে না; এলও না। কয়েকদিন পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, শ্রীমানের দাদার দরবার থেকে কোনো চিঠিপত্র এল? বেশ অসন্তুষ্ট ভাবে জবাব দিলেন, মাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে চিঠি লিখেছি, এরই মধ্যে জবাব আসা কি সম্ভব? আরও এক সপ্তাহ কাটল, জবাব কিন্তু এল না। এরপর হল কী, আমি যাতে আর কোনো কথা তুলতেই না পারি এঁর কেবলই সেই চেষ্টা। এমন খুশি খুশি ভাব দেখাতে লাগলেন যে কী বলি! বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফিরলেন মুখে হাসিটি নিয়ে। বাড়ি ঢুকেই কিছু-না-কিছু মজার কথা পাড়বেন। আমাকেও বেশ তোষামোদ করা হচ্ছে; আমার বাপের বাড়ির প্রশংসা করা হচ্ছে। আমি যে বড়োই সুনিপুণ গৃহিণী এতদিন পরে তার অসাধারণ প্রশংসাও শুনতে পেলাম। আমি এঁর চালাকিটুকু ঠিক ধরে ফেলেছি। আমার মন রেখে চলা হচ্ছে যাতে দাদার কথা আর না ওঠে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সর্ববিষয়ে আমার সঙ্গে এমন গবেষণামূলক আলোচনা করতে লাগলেন যে বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত হার মেনে যাবে। এ সবই শুধু এই জন্যে যে ওপ্রসঙ্গ যেন না তুলতে পারি। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্রী নই। দু সপ্তাহ কেটে যাবার পর যখন বিমার টাকা দেবার নির্দিষ্ট তারিখ যমের মতো শিয়রে খাড়া হয়ে রইল, জিজ্ঞেস করলাম : কী হল? তোমার দাদা শ্রীমুখ থেকে কিছু কথা খসালেন না? না, এখনও চিঠি পৌঁছয়নি? বাড়ির সম্পত্তিতে আমাদেরও বখরা আছে না আমরা জলে ভেসে এসেছি? দশ বছর আগে পাঁচশো টাকা লাভ হচ্ছিল, এখন হাজার টাকা লাভ নিশ্চয়ই হচ্ছে, কিন্তু আমরা কোনোদিন একটা কানাকড়িও পেলাম না। মোটামুটি হিসেব ধরলেও আমাদের দুহাজার টাকা পাওয়া উচিত। দুহাজার না

হলেও একহাজার হোক, পাঁচশো হোক, আড়াইশো হোক, আর কিছুই যদি নাই দেবে প্রিমিয়মের দরুণ বিমার টাকাটাই দিক।

তশিলদার সাহেবের আয় আমাদের আয়ের চারগুণ বেশি, ঘুষ নেন দুহাতে; তবু আমাদের পাওনা, প্রাপ্য যে কেন দেন না কে জানে?

ইনি, তা নয় তা নয় করে কিছুই বোঝাতে না পেরে বললেন, দাদা বসতবাড়ি মেরামত করান, অতিথি-অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করেন, আত্মীয়স্বজনদের আসা যাওয়ার ঝক্কি, দেওয়া-থোওয়া সবই তো তাকে পোয়াতে হয়। এর পর কোথায় পাবেন যে আমাদের পাঠাবেন।

বুদ্ধির ঢেঁকি একেবারে। বলার আমার কিছুই নেই। সম্পত্তি কি লোকে এই জন্য করে যে, তা থেকে যা উপার্জন হয় তাতেই নিঃশেষ হয়ে যাক? এই ভালোমানুষ লোকটির ভালোমতো একটা যুক্তি খাড়া করারও ক্ষমতা নেই। আমাকে জিজ্ঞেস করলে একটা কেন একের-পর-এক ভালো ভালো যুক্তি দেখাতে পারতাম।

বলে দিতাম—বাড়িতে আগুন লেগে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বা হঠাৎ বাড়িতে একটা চুরি হয়ে গিয়েছে। খড়কুটোটা পর্যন্ত ফেলে যায়নি। দশ হাজার টাকার গম, চাল মজুত ছিল, সবই গেছে; কিংবা কারও সঙ্গে ফৌজদারি মামলা করে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি।

কিন্তু ইনি যে একটা যুক্তি দিলেন সেটা কেমন কমজোর। কী আর করব? ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে বসে রইলাম। পাড়ার এক মহিলার কাছ থেকে টাকা ধার করে নিয়ে এসে প্রিমিয়াম দিলাম। তবু যখন ভাই-ভাইপোদের প্রশংসা শুনতে হয়, গায়ে যেন জ্বালা ধরে। এই রকম কৌরবদের হাত থেকে ভগবান রক্ষা করুন।

ঈশ্বরের দয়ায় ইনি দুটি ছেলের ও দুটি মেয়ের জনক। ঈশ্বরের করুণা বলব না অভিশাপ, জানি না। সবকটা এমন দুর্দান্ত যে কহতব্য নয়। কিন্তু পৃথিবী উলটে যাবে যদি ইনি এগুলোকে একটু চোখ রাঙান। রাত আটটা বাজতে চলল যুবরাজ এখনও বেড়িয়ে ফেরেনি, আমি চিন্তায় সারা হচ্ছি। ইনি পরম নিশ্চিন্তে খবরের কাগজ পড়ছেন। আমি রেগেমেগে হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে বললাম, যাও না গিয়ে একবার দেখ না ছেলেটা কোথায় গেল? কী জানি বাবা, কেন যে তুমি এমন নিষ্ঠুর। ভগবান তোমায় সন্তান দিয়েছেন কী করতে? ছেলের প্রতি বাপের কিছু তো কর্তব্য থাকে। ছেলে বাড়ি ফেরেনি শুনে একটু রাগ ভাব দেখিয়ে বললেন, ওঃ, এখনও বাড়ি ফেরা হয়নি? বড্ড দুষ্টু হয়েছে। আজ আসুক বাছাধন, কানদুটো ছিঁড়ে নেব, চাবুক মেরে গায়ের ছাল তুলে দেব। এইরকম রাগ নিয়ে তো ছেলে খুঁজতে বেরুলেন। ঘটনাচক্রে ইনি খুঁজতে বেরিয়েছেন আর এদিকে ছেলে এসে হাজির। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন দিক দিয়ে এলি তুই? তোকে উনি খুঁজতে বেরিয়েছেন। দেখিস আজ কী রকম পিটুনি খাবি। এই অভ্যেস ছুটে যাবে। ভীষণ রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, এই ফিরলেন বলে। হাতে আবার একটা ছড়ি ধরা। তুমি এখন থেকেই নিজের মর্জিমতো চলছ, কারও কথা কানে তুলছ না, আজ বুঝবে কত ধানে কত চাল। একটু ঘাবড়ে গিয়ে ছেলে ল্যাম্প জ্বেলে পড়তে বসল। প্রায় দু-আড়াই ঘন্টা পরে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেই ইনি জিজ্ঞেস করলেন, এসেছে না কি? ওঁর রাগ যাতে বাড়ে, উত্তেজিত করার অভিপ্রায়ে বললাম, এসেছে তো। যাও না গিয়ে জিজ্ঞেস করো না। আমি তো জিজ্ঞেস করে করে হের গিয়েছি, কোথায়

গিয়েছিল, কী করছিল এতক্ষণ? কিচ্ছু জবাবই দেয় না। ইনি অগ্নিশর্মা হয়ে ডাক দিলেন, মুন্নু, এদিকে এসো।

ছেলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠোনে এসে দাঁড়াল। মেয়ে দুটো ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল যেন কী একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। ছোটো ছেলেটি জানলা দিয়ে ইঁদুরের মতো উঁকি মারছিল। ইনি রাগে অধীর, ছড়িটা হাতে ধরেই দাঁড়িয়ে আছেন। এনার অগ্নিমূর্তি দেখে আমার বড়ো অনুতাপ হচ্ছে। কেন যে কথাটা ওঁর কানে তুললাম? ছেলের কাছে ইনি এগিয়ে তো গেলেন কিন্তু মারের বদলে আস্তে করে ওর কাঁধে হাত রেখে কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? বারণ কর হয় শোন না? খবরদার। আর কখনও এরকম দেরি করো না। সন্ধেবেলা লোকেরা নিজের বাড়ি ফিরে আসে না রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়?

আমি ভাবছিলাম যে, এটা বোধহয় ভূমিকা তারপর আসবে আসল বিষয়। ভূমিকাটা অবশ্য মন্দ নয়; কিন্তু এ যে দেখছি ভূমিকাতেই ইতি। এঁর রাগ পড়ে জল, যেন শরতের মেঘ, এই কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলল, তর্জনগর্জন, অথচ বৃষ্টি পড়ল দু-চার ফোঁটা। ছেলে নিজের ঘরে চলে গিয়ে মনের খুশিতে নাচতে লাগল।

আমি হাল ছেড়ে বললাম, তুমি যেন ভয় পেয়ে গিয়েছ মনে হচ্ছে? দু-চারটে চড় অন্তত মারতে পারতে। এ জন্যেই ছেলেপুলেরা বিগড়ে যায়।

ইনি বললেন তুমি কি শুনতে পাওনি? কত জোরে ওকে আমি ধমক দিলাম। ভয়ে বেচারির মুখটা শুকিয়ে উঠেছে। দেখে নিয়ো, আর কখনও ও দেরি করে বাড়ি ফিরবে না।

— তুমি তো ওকে বকনি, বরং চোখের জল মুছে দিয়েছ।

— আমার বকুনি তাহলে তুমি শুনতে পাওনি বল? এই এনার রাগ আর বকুনি। চেঁচানির চোটে লোকের কানে তালা লেগে গেছে! আহা! এসো গলায় একটু হাত বুলিয়ে দিই।

ইনি একটি নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, শাস্তি দিলে ছেলে খারাপ হয়ে যায়। এঁর মতে ছেলেদের স্বাধীনতা দিতে হয়। তাদের ওপর কোনোরকম বন্ধন, শাসন বা চাপ দেওয়া উচিত নয়। এনার মতে শাসন শিশুদের মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। যার ফলে ছেলে লাগামছাড়া উটে পরিণত হচ্ছে। কেউ এক মিনিটের জন্য বই খুলে পড়তে বসে না। কখনও ডাংগুলি খেলছে, কখনও গুলি, কখনও বা ঘুড়ি। শ্রীমান নিজেও ছেলের সঙ্গে খেলেন। চল্লিশ বছর বয়স হল অথচ ছেলেমানুষি গেল না। আমার বাবার সামনে কারুর সাহসে কুলোত যে ঘুড়ি ওড়ায় বা ডাংগুলি খেলে? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিতেন। ভোরবেলা নিজে ছেলেদের নিয়ে পড়তে বসতেন। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরলে আবার পড়া। সন্ধেবেলা আধঘণ্টার জন্য খেলার ছুটি বরাদ্দ ছিল। রাতে আবার তাদের কাজে জুড়ে দিতেন।

কিন্তু আমার বাপের বাড়িতে এমন ব্যাপার ছিল না যে, বাপ খবরের কাগজ খুলে বসেছেন আর ছেলেরা রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়াচ্ছে। কখনও কখনও দেখি শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশে ছেলেদের সঙ্গে ইনিতাস খেলতে বসেছেন। ছেলেদের ওপর এরকম বাপের প্রতিপত্তি কী খাটে? আমার বাবার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলার সাহস আমার ভাইদের ছিল না। বাবার গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র বাড়িতে শোরগোল পড়ে যেত। বাবা যেই বাড়িতে পা রাখতেন বাড়ি যেন

শান্তির সাম্রাজ্য হয়ে উঠত। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে প্রাণ শুকিয়ে যেত। বাবার শাসনেরই সুফল যে ছেলেরা সবাই ভালো ভালো চাকরি করছে, তবে কারও স্বাস্থ্য যদিও ভালো নয়। বাবার নিজের স্বাস্থ্যই বা কত ভালো ছিল? বেচারাকে সব সময়েই কোনো-না-কোনো ওষুধ খেতে হত।

কী বলব? একদিন তো আমি রীতিমত তাজ্জব বনে গেছি। দেখি কিনা মশায় ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানো শেখাচ্ছেন। এদিকে ঘোরাও ওদিকে গোঁত্তা দাও। সুতোয় এমনি করে টান দাও, এবার ঢিল দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনি মন দিয়ে শেখাচ্ছেন, যেন কানে গুরুমন্ত্র দিচ্ছেন। সেদিন আমি তুলকালাম কাণ্ড করলাম, চিরদিন মনে থাকবে ওঁর। ক্ষেপে উঠে আমি বললাম, আমার ছেলেদের বিগড়ে দেবার তুমি কে? বাড়ির সঙ্গে তো তোমার কোনো সম্পর্ক নেই বললেই হয়, বেশ তা না হয় হল, তা বলে আমার ছেলেদের তুমি নষ্ট করে দিও না। তুমি যদি ওদের ভালো না করতে পার, অন্তত খারাপ কোরো না। এদিক-ওদিক চেয়ে ইনি চুপ করে রইলেন।

আমার ইচ্ছে ছিল, ইনিও একটু তেতে উঠুন, তাহলে আমি আমার মা-চণ্ডী রূপ একবার দেখাই; কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ইনি থিতিয়ে যান যে আমি হেরে যাই। আমার বাবা কোনো মেলাটেলায় ছোটো ছেলেপুলেদের যেতে দিতেন না, ছেলে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেও বাবার মন গলত না। আর এই মহৎ লোকের এমনই হাল যে ছেলেমেয়েদের এক একটাকে ডেকে ডেকে মেলায় নিয়ে যাবেন। লোভ দেখিয়ে বলবেন—চলো চলো। মেলায় কী সুন্দর আতশবাজি উড়বে, গ্যাসবেলুন উড়বে, নাগারদোলায় চড়বে মজা করে। হকি খেলতেও ইনি ছেলেদের বারণ করেন না। হকি, ক্রিকেট, ফুটবল, এইসব বিলিতি খেলা কত যে বিপজ্জনক। জীবন সংশয়ের ভয় থাকে। একটা বল যদি ধাঁ করে লাগে, প্রাণটাই বেঘোরে খোওয়াতে হবে। কিন্তু এই খেলাগুলির প্রতি এঁর ভারী দুর্বলতা। কোনো ছেলে যদি ম্যাচ জিতে আসে, ইনি এত খুশি হবেন যেন সে কোনো দুর্গ জয় করে ফিরেছে। খেলতে গিয়ে চোট খেলে কী হবে সে সব চিন্তা নেই। খেলতে গিয়ে যদি হাত-পা ভেঙে যায় তাহলে সারাটা জীবন এদের কাটবে কেমন করে?

গত বছর মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। সে কী কাণ্ড। ইনি তো পণ করে বসলেন, এক পয়সাও বরপণ দেবেন না, তাতে যদি সারাজীবন মেয়ে কুমারী থাকে সেও ভাল। এখানেও ওঁর আদর্শবাদ ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমাজের মধ্যে নেতাদের ছলচাতুরি প্রায়ই চোখে পড়ে তবু তো এঁর চোখ খোলে না। যতক্ষণ সমাজে এই পণপ্রথা থাকবে, আবার যুবতী কন্যা অবিবাহিত থাকা নিন্দনীয় বলে গণ্য হবে, ততদিন এ প্রথা দূর হবে না। দু-চার জন লোক হয়তো আছে যারা পণের জন্য হাত পেতে টাকা চায় না কিন্তু তাতে এই ব্যবস্থার আর কতটুকু রদবদল হয়? কুপ্রথা যেমনটি ছিল, তেমনই আছে। সবারই যে পয়সার অভাব আছে তা তো নয়, তাই পণপ্রথার বিরুদ্ধে লেকচার দেওয়া সহজ কিন্তু পাওনা বরপণের টাকা ছেড়ে দিতে আমি তো কাউকে দেখিনি। যখন ছেলেদের মতো মেয়েদেরও শিক্ষা ও জীবিকার রাস্তা খুলে যাবে, এ প্রথা নিজের থেকেই হয়তো লুপ্ত হয়ে যাবে। তার আগে সম্ভব নয়।

যেখানে যেখানে আমি মেয়ের সম্বন্ধ করলাম, সবখানেই বরপণের প্রশ্ন উঠল। সব বারেই ইনি তাতে বাদ সাধলেন। এভাবে যখন সারা বছরটাই পেরিয়ে গেল, আর মেয়েটির সতেরো বছর বয়স পূর্ণ হল, এক জায়গায় বিয়ের কথা আমি পাকা করে ফেললাম। সম্বন্ধটি ইনি মেনে নিলেন কারণ

পাত্রপক্ষ বরপণের কথা তোলেননি। পাত্রপক্ষের হয়তো মনে মনে ধারণা ছিল, পাওনাগণ্ডা ভালোমতোই হবে। আমিও মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, যথাসাধ্য দেব, কোথাও কার্পণ্য দেখাব না। বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়েই যেত, কোথাও কোনো সংশয় ছিল না; কিন্তু মহাশয়ের কাছে আমার দাম থাকলে তো? কথার ঝড় বইয়ে দিলেন : বরপণ অত্যন্ত নিন্দনীয় প্রথা, বিয়ের জাঁক-জমক বাজে খরচ; গানবাজনা, সানাই-টানাই, রোশনাই—কিছুরই প্রয়োজন নেই।

প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। এটা কেন? এটা যে দিচ্ছ, এটা দানসামগ্রী, বরপণ বই আর কী? তুমি আমার মুখে শেষ পর্যন্ত চুনকালি মাখালে? আমার মানসম্মান সব ধুলোয় মিশিয়ে দিলে?

আপনারাই ভেবে দেখুন অবস্থাটা। দোরের সামনে বরযাত্রীরা দাঁড়িয়ে, আর এখানে ইনি কথায় কথায় বিবাদ তুলছেন। বিয়ের লগ্ন মধ্যরাত্রে। প্রথানুযায়ী আমি উপোস করেছিলাম, ওমনি উনি বলে উঠলেন, উপোস-টুপোসের কোনও প্রয়োজন নেই। ছেলের মা-বাপ যখন খেতে পারে, মেয়ের মা-বাবাই বা খাবে না কেন? আমি ও বাড়িসুদ্ধ সবাই বারণ করা সত্ত্বেও উনি জল খাবার খেলেন, দুপুরের খাওয়া খেলেন।

সম্প্রদানের সময় সে এক হই হই ব্যাপার। চিরটাকাল ইনি এই কুপ্রথার বিরোধিতা করে এসেছেন অনুচিত বলে মনে করেছেন। কন্যা কি দানের জিনিস? দান টাকা পয়সার, জমি জায়গার হয়, পশুদানও হয় কিন্তু মেয়েকে দান করা? কি অদ্ভুত অর্থহীন ব্যাপার। কত বোঝালাম, পুরোনো প্রথা, বেদের সময় থেকে চলে আসছে, শাস্ত্রে এ বিধান দেওয়া আছে। আত্মীয়স্বজনরা বোঝালেন, কিন্তু ইনি একটি কথাও কানে তুললেন না। হাত জোড় করলাম, পায়ে ধরে মিনতি জানালাম, কত অনুনয়, কিন্তু ইনি কন্যা সম্প্রদানে কিছুতেই রাজি হলেন না।

মজা এই যে, এত কাণ্ড ইনি করলেন, উপরন্তু আমার ওপর বিরূপ হয়ে রইলেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু কয়েক মাস একটি কথাও আমার সঙ্গে ইনি কননি। অগত্যা আমাকেই সমঝোতা করতে হল, মান ভাঙাতে হল।

সবচেয়ে বড়ো বিড়ম্বনা হল যে, এত অগুণ থাকা সত্ত্বেও একদিনও আমি ওঁকে ছেড়ে থাকতে পারি না। একটা মুহূর্তের বিচ্ছেদ সইতে পারি না। এত দোষ থাকা সত্ত্বেও ওঁকে আমি খুব ভালোবাসি। কোন গুণে যে আমি এত মুগ্ধ তা আমি নিজেই জানি না, কিন্তু একটা কিছু এঁর মধ্যে আছে যার কাছে আমি বন্দী। একটু যদি দেরি করে ফেরে প্রাণ শুকিয়ে ওঠে। বিধাতা যদি আজ এঁর বদলে কোনো বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন রূপবান, ধনী মানুষ আমার সামনে এনে দাঁড় করান, আমি চেয়েও দেখব না। এ ধর্মের বন্ধন নয়। কখনই নয়। প্রথাগত পাতিব্রত্যও নয়; বরং আমাদের দুজনের স্বভাবে এমন একটা সমতা, এমন একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছে যেন মেশিনের কলকব্জার মতো ক্ষয়ে ক্ষয়ে ফিট হয়ে বসে গেছে। একটা কব্জার বদলে, অন্য কব্জা কাজ দেবেনা, নতুন কব্জা তা সে যতই মজবুত বা ভাল হোক না কেন। চেনা পথে আমরা নির্ভয়ে, চোখ বুঁজে চলি, কারণ রাস্তার এবড়ো-খেবড়ো মোড়, খানাখন্দ সব আমাদের জানা। আমার দৃষ্টির ভেতরে তা সন্নিহিত। অজানা রাস্তায় চলা বড়োই কষ্টকর। আজ হয়তো আর ওঁর দোষগুলোকে গুণ দিয়ে বদল করতেও রাজি হব না।

(গিলা / ১৯৩২) অনুবাদ দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কেজরিওয়াল

ঠাকুরদের কুয়ো

জোখু ঘটিতে মুখ ঠেকাতেই জলে বেশ দুর্গন্ধ পেল। গংগিকে বলল, এ কী জল? এত গন্ধ যে খাওয়াই যাচ্ছে না। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আর তুই পচা জল গেলাচ্ছিস আমাকে?

গংগি রোজ সন্ধেবেলা জল ভরে আনত। কুয়োটা অনেক দূরে—বার বার যাওয়া মুশকিল। গতকালই ও জল এনেছিল, তখন তো ওতে একদম গন্ধ ছিল না—আজ জলে গন্ধ কেন? ঘটিটা নাকের কাছে নিয়ে এল। সত্যিই গন্ধ রয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো জানোয়ার কুয়োতে পড়ে মরেছে। কিন্তু এখন অন্য জল আসবে কোথা থেকে?

ঠাকুরদের কুয়ো থেকে কে আনতে দেবে? দূর থেকে লোকে গালাগালি দেবে। সাহুদের কুয়ো গাঁয়ের একেবারে ওই পারে, আবার সেখানেই বা কে জল ভরতে দেবে? আর চতুর্থ কোনো কুয়ো তো গাঁয়ে নেই।

জোখু কয়েকদিন থেকেই বিছানায় পড়ে আছে। কিছুক্ষণ তেস্টা চেপে চুপ করে পড়ে থাকার পর বলল, আর তো তেস্টা চেপে থাকা যাচ্ছে না। দে, একটু জল নাক টিপেই খেয়ে নি।

গংগি জল দিল না। খারাপ জল খেলে অসুখ বেড়ে যাবে এটুকু ওর জানা ছিল, কিন্তু জল ফুটিয়ে নিলে যে আর খারাপ থাকে না এটা ও জানত না। বলল, এ জল খাবে কী করে শুনি? কে জানে কোন জন্তু মরেছে। কুয়ো থেকে অন্য জল এনে দিচ্ছি।

জোখু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়, অন্য জল কোথা থেকে আনবি?

— ঠাকুরদের আর সাহুদের দুটো কুয়ো তো আছে। এক ঘটি জল ভরতে দেবে না?

— হাত-পা ভেঙে ফিরে আসবি, আর কিছুই হবে না। চুপ করে বোস্। ব্রাহ্মণ দেবতারা শুধু আশীর্বাদ ঝাড়বেন, ঠাকুর লাঠিপেটা করবেন, আর সাহুজি একটাকায় পাঁচটাকা সুদ নেবেন। গরিবের দুঃখ কে বোঝে? আমরা যদি মরেও যাই তবু কেউ চৌকাঠে এসে উঁকি দেয় না। কাঁধ দেওয়া তো অনেক পরের কথা। এসব লোক কুয়ো থেকে জল ভরতে দেবে?

এই কথাগুলো খুবই কঠোর সত্য। গংগি এর কী জবাব দেবে? কিন্তু সে জোখুকে ওই গন্ধওলা জল খেতে দিল না।

দুই

তখন রাত নটা। শ্রান্ত-ক্লান্ত মজুরেরা তো শুয়েই পড়েছে। ঠাকুরদের দরজায় দু-পাঁচজন ভাবনাচিন্তাহীন লোক এসে জমেছে।

ময়দানে বাহাদুরির দুনিয়া চলে গেছে,—সে মওকাও আর নেই। কানুনের বাহাদুরির কথাই হচ্ছিল। একটা বিশেষ মামলায় ঠাকুর কত চালাকি করে দারোগা বাবুকে ঘুষ দিয়ে বেরিয়ে

এসেছেন; কত কৌশলের সঙ্গো একটা বিশেষ মোকদ্দমায় দলিলের নকল বার করে এনেছেন। মোহতামিম, নাজির সবাই বলছিল নকল পাওয়াই যাবে না। কেউ চাইছে পঞ্চাশ, তো কেউ একশো। এখানে তিনি মিনিমাঙ্না নকল বাগিয়ে এনেছেন। কাজ করার কায়দা জানা চাই।

এই সময় গংগি কুয়ো থেকে জল নিতে এল। কুপির ধোঁয়াটে, আবছা আলো কুয়োতলায় এসে পড়েছে। কুয়োর চাতালের আড়ালে বসে গংগি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সারা গাঁয়ের লোক এই কুয়োর জল খায়। কারোরই বারণ নেই। শুধু এই দুর্ভাগারাই পারে না জল ভরতে।

গংগির বিদ্রোহী মন এইসব চিরাচরিত নিয়মকানুন, আর নিষেধগুলোর ওপর ঘা মারতে লাগল, আমরা কোন্ হিসেবে নীচ, আর ওরাই বা উঁচু হবে কেন? ওরা গলায় তাগা বাঁধে বলেই? ওখানে তো যতজন আছে সবকটা এ-বদমাশ তো ও-বদমাশের ধাড়ি। চুরিও এরা করে, জালজোচ্চুরিও এরা করে, আবার মিথ্যে মামলা, তাও এদেরই কারবার। এই ঠাকুরই তো সেদিন বেচারা ভেড়া-চরানোদের একটা ভেড়া চুরি করে নিয়ে এল, পরে সেটাকে মেরে খাওয়াও হয়েছিল। এই যে পণ্ডিতজি, এর বাড়িতে তো বারোমাসই জুয়ো চলে। আর ওই সাহুজি, সে তো ঘিয়েতে তেল মিশিয়ে বেচে। কাজ করিয়ে নেয় কিন্তু মজুরি দেবার বেলায় বুক ফেটে যায়। কোন্ দিক থেকে ওরা আমাদের চেয়ে উঁচু? হ্যাঁ, মুখের কথায় আমাদের থেকে উঁচু বটে। আমরা 'আমরা উঁচু! আমরা উঁচু!' বলে অলিগলিতে চেঁচিয়ে বেড়াই না। যদি কখনও গাঁয়ের ভেতর চলে আসি তখন এমন রসালো চোখে তাকিয়ে দেখে যেন সক্কলের বুকের ভেতর সাপ কিলবিলিয়ে উঠছে। আবার 'আমরা উঁচু' বলে অহংকার কত!

কুয়োর কাছে কার যেন পায়ের শব্দ। গংগির বুকটা দুরদুর করে উঠল। যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটা লাথিও মাটিতে পড়বে না। সে দড়ি আর ঘড়াটা তুলে নিয়ে নিচু হয়ে একটা গাছের তলায় অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াল। কখনও কারো জন্য দয়া আসে কি এদের? বেচারা মহংগুকে এত মার মেরেছিল যে, কয়েক মাস ধরেই তার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা বন্ধ হয়নি। মহংগুর দোষ কী? না, সে বেগার খাটতে চায়নি। এরপর এরা নিজেদের আবার উঁচু বলে মনে করে!

কুয়োতে দুজন স্ত্রীলোক জল ভরতে এসেছে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

— খেতে বসছি এমন সময় হুকুম হল টাটকা জল নিয়ে এসো। ঘড়া কেনার তো পয়সা নেই।

— আমাদের একটু আয়েস করে বসতে দেখলে মরদদের গায়ে যেন বিছুটি লাগে।

— হ্যাঁ, কলসি নিয়ে নিজেরা জল ভরে আনছে, এমন তো কখনো দেখি না। ব্যস, হুকুম হয়ে গেল, টাটকা জল ভরে আনো, যেন আমরা মাইনে করা বাঁদি আর কী।

— তোমরা বাঁদি ছাড়া আর কী? ভাতকাপড় পাও না? দশ-পাঁচ টাকা কেড়ে কুড়েও তো নাও। বাঁদিরা এর থেকে আলাদা কীসে?

— বলতে লজ্জা কীসের দিদি? এক লহমা জিরোবার জন্যে মনটা আঁকুপাকু করতে থাকে। এত কাজ আর কারও ঘরে করে দিলে এর চেয়ে অনেক বেশি আরামে থাকতাম। তার ওপর তারা জোড়হাত করে থাকত। এখানে কাজ করতে করতে মরে যাও তবু কারো বাঁকা মুখ সোজা হয় না।

দুজনে জল ভরে নিয়ে চলে গেল। গংগি গাছের তলা থেকে বেরিয়ে কুয়োর উঁচু চাতালের কাছে এল। নিষ্কর্মা লোকগুলো চলে গেছে, ঠাকুরও দরজা বন্ধ করে ভেতরের উঠোনে শুতে যাচ্ছিলেন। গংগি এক মুহূর্তের জন্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যে করেই হোক রাস্তা তো পরিষ্কার হয়েছে। সেই যে এক রাজপুত্র অমৃত চুরি করে আনতে গিয়েছিল সেও বোধহয় এত সতর্ক ভাবে, এত ভেবেচিন্তে পা ফেলেনি। গংগি পা টিপে টিপে কুয়োর চাতালে উঠল। জয়ের এমন অনুভূতি এর আগে আর কখনও হয়নি ওর।

সে দড়িটা ভালো করে ঘড়ার সঙ্গো বেঁধে একবার সতর্ক চোখে ডাইনে-বাঁয়ে দেখে নিল— যেন কোনো সেপাই রাতের অন্ধকারে শত্রুর কেল্লায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। যদি এইসময় ধরা পড়ে যায় তাহলে ক্ষমা বা অনুগ্রহ পাবার এক ফোঁটা আশা নেই। শেষে ভগবানের নাম করতে করতে মনটা শক্ত করে ঘড়াটাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল।

ঘড়াটা ওপর থেকে পড়ে জলে ডুবে গেল কিন্তু খুবই আস্তে। এতটুকু আওয়াজ হল না। গংগি দু-চার হাত দড়ি খুব তাড়াতাড়ি টানল। ঘড়াটা কুয়োর মুখের কাছে এসে পৌঁছল। খুব জাঁদরেল পালোয়ানও এত জোরে ওটাকে টেনে তুলতে পারত না।

গংগি ঝুঁকে পড়ে ঘড়াটা ধরল, চাতালের ওপর রাখবে। হঠাৎ ঠাকুর সাহেবদের দরজা খুলে গেল। বাঘের মুখও এর থেকে বেশি ভয়ঙ্কর নয়।

গংগির হাত থেকে দড়ি ছুটে গেল। দড়ি সমেত ঘড়াটা ধড়াস করে জলে পড়ে গেল, আর কিছুক্ষণ ধরে সেটা ডুবে যাওয়ার গুবগুব আওয়াজ চলল।

'কে রে, কে রে?' — বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঠাকুর কুয়োর দিকে দৌড়োলেন, গংগি কুয়োর চাতাল থেকে লাফিয়ে ছুট লাগাল।

ঘরে এসে দেখে, জোখু সেই ময়লা, নোংরা জলের ঘটি মুখে লাগিয়ে জল খাচ্ছে।

(ঠাকুর কা কুআঁ / ১৯৩২) অনুবাদ দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

কুসুম

বছর খানেক আগেকার কথা। একদিন সন্ধ্যার সময় হাওয়া খেতে বেরিয়েছি, এমন সময় নবীনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নবীনবাবু আমার পুরনো বন্ধু। লোক হিসাবে দিলখোলা ও মেজাজি। আগ্রায় বাড়ি, কবি হিসাবে সুখ্যাত। তাঁর কবি-গোষ্ঠীতে আমি কয়েক বার গিয়েছি। কাব্যের এমন উপাসক আমি আর দেখি নি। পেশায় তো উকিল; কিন্তু ডুবে থাকেন কাব্যচিন্তায়। বুদ্ধিমান লোক বলে মোকদ্দমা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে ফেলতে পারতেন। তাই সময় সময় মামলা জুটেও যেত; কিন্তু কাছারির বাইরে আদালত কিংবা মামলা নিয়ে কোনো আলোচনা ছিল তার নিষিদ্ধ। আদালতের চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে এলেই তিনি কবি—আপাদমস্তক কবি।

যখনই দেখবেন কবি-গোষ্ঠী একত্রিত হয়েছেন, কাব্যচর্চা চলছে, রচনা শোনা হচ্ছে, তন্ময় হয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আহা আহা করে শুনছেন, তখন নিজের রচনা পাঠ করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে একটা তদ্‌গত ভাব দেখা যেত। তাঁর কণ্ঠস্বর এত মধুর ছিল যে, তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি চরণ সোজা তীরের মত এসে হৃদয়ে বিদ্ধ হত। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল—আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মাধুর্য সৃষ্টি, নির্গুণের মধ্যে সগুণের আরোপ। তিনি যখন লখনউ আসতেন আগে থেকেই আমাকে খবর দিয়ে রাখতেন। আজ তাঁকে হঠাৎ লখনউ শহরে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এখানে কেন? সব কুশল তো? আপনি আসছেন অথচ একথা আমাকে জানালেন না পর্যন্ত!

তিনি বললেন—একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি ভাই। আপনাকে আগে থেকে জানানোর সময় ছিল না। আর আপনার বাড়ি তো নিজের বাড়ি বলেই মনে করি। আপনি আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবেন, এই আনুষ্ঠানিকতার কী প্রয়োজন। আমি একটা জরুরি ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দিতে এসেছি। এবেলার ভ্রমণ বন্ধ রেখে আগে চলুন আমার বিপত্তির কথা শুনবেন।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম—আপনি তো আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলেন। আপনার আবার বিপদ। আমার তো বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

— বাড়ি চলুন, মন শান্ত হলে বলব।

— ছেলেপুলে ভালো আছে তো?

— হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে। ওসব কিছু হয়নি।

— তাহলে চলুন, রেস্তোরাঁয় বসে কিছু জলখাবার তো খেয়ে নিন।

— না ভাই। এ অবস্থায় কিছু মুখে রুচবে না।

আমরা দুজনেই বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

বাড়ি পৌঁছে তাঁর হাতমুখ ধোওয়া হলে শরবত খাওয়ালাম। এলাচ-পান খেয়ে তিনি তাঁর বিপত্তির কথা বলতে শুরু করলেন—

— কুসুমের বিয়েতে তো আপনি গিয়েইছিলেন। বিয়ের আগে আপনি ওকে দেখেওছিলেন। আমার ধারণা, কোনো সরল প্রকৃতির যুবককে আকর্ষণ করার জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন তা সবই তার রয়েছে। আপনার কী মনে হয়?

আমি সঙ্গো সঙ্গো জবাব দিলাম—আমি কুসুমকে আপনার থেকেও বেশি তারিফ করি। এমন লজ্জাশীল, সুন্দর, ভদ্র ও হাসিখুশি মেয়ে আমি দ্বিতীয় আর দেখিনি।

নবীনবাবু করুণ স্বরে বললেন—এই কুসুমই আজ তার স্বামীর নির্দয় ব্যবহারের জন্য কেঁদে কেঁদে মরে যেতে বসেছে। তার গওনা হয়েছে আজ প্রায় এক বছর হতে চলল। এর মধ্যে সে তিন বার শ্বশুরবাড়ি গেছে; কিন্তু তার স্বামী তার সঙ্গো কথাই বলছে না। তার চেহারাই সে সহ্য করতে পারছে না। আমি কতবার চেয়েছি তাকে ডেকে এনে দুজনের মধ্যে সব মিটমাট করে দেব। কিন্তু না সে আসছে, না আমার পত্রের জবাব দিচ্ছে। কে জানে কোথায় কী আটকাচ্ছে যার জন্যে এমন নিষ্ঠুরভাবে সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এখন শুনছি, তার দ্বিতীয়বার বিবাহ হবে। কুসুমের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। আপনি মনে হয় তাকে দেখে চিনতেই পারবেন না। দিনরাত কান্না ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। এর থেকেই আমার কষ্টের ব্যাপারটা আপনি অনুমান করতে পারবেন। জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার অবসান হতে বসেছে। ঈশ্বর আমাদের পুত্র-সন্তান দেন নি। তবে কুসুমকে পেয়ে আমরা সন্তুষ্টই ছিলাম এবং নিজেদের ধন্য মনে করতাম। তাকে কত আদরযত্নে মানুষ করেছি। কখনও তাকে ফুলের ঘা পর্যন্ত দিইনি। তার শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কোনো দিন কিছু বলিনি। সে বি এ পাশ করেনি বটে, কিন্তু চিন্তার গভীরতায় এবং জ্ঞানের দিক থেকে সে কোনো উচ্চশিক্ষিতা মহিলার চেয়ে কম নয়। আপনি ওর লেখা দেখেছেন। আমার মনে হয়, খুব কম মহিলাই ওর মতো লিখতে পারবে। সমাজ, ধর্ম, নীতি সব বিষয়েই তার মত খুব পরিষ্কার। তর্কে সে এত দক্ষ যে, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। ঘরের কাজে সে এত পটু যে, আমার বাড়ির প্রায় সব কিছুই ওর হাতে ছিল। কিন্তু তার স্বামীর চোখে সে পায়ের ধুলোর যোগ্যও নয়। বার বার জিজ্ঞাসা করেছি, তুই কী ওকে কিছু বলেছিস, ব্যাপরটা কী? কেন সে তোর প্রতি এত উদাসীন? এর জবাবে কেঁদে সে একথাই বলে—উনি তো কোনো দিন আমার সঙ্গো কোনো কথাই বলেন নি। আমার মনে হয় কী, প্রথম দিনই দুজনের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য হয়ে গেছে। সে হয়তো কুসুমের কাছে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল; হয়তো কুসুম লাজুক। ব্যস্, তাতেই হয়তো পতিদেব রুষ্ট হয়ে গেলেন। আমি তো কল্পনাই করতে পারি না যে, কুসুমের মতো মেয়ের প্রতি কোনো পুরুষ উদাসীন থাকতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্য কী করে আটকানো যায়? স্বামীকে অভাগী কত চিঠি লিখেছে। তবু সেই নিষ্ঠুর তার একটারও জবাব দেয়নি। সব চিঠিই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার বুদ্ধিতে আসছে না কী করে এই পাষাণহৃদয়কে গলানো যায়। আমি তো এখন নিজে ওকে কিছু লিখতে পারব না। আপনিই কুসুমকে বাঁচান, নয়তো শীঘ্রই ও

বেচারি মারা যাবে। আর তার সঙ্গে আমরা দুটি প্রাণীও শেষ হয়ে যাব। তার কস্ট এখন আর চোখে দেখা যায় না।

নবীনবাবুর চোখ সজল হয়ে উঠল। আমারও খুব দুঃখ হল। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম—আপনি এতদিন এই চিন্তা নিয়ে রয়েছেন; আমাকে আগে কিছু বলেননি কেন? আমি আজই মোরাদাবাদ যাব আর ওই ছোকরাকে এমন শিক্ষা দেব যে সে মনে রাখবে। ছোকরাকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে এসে কুসুমের পায়ের উপর ফেলে দেব।

নবীনবাবু আমার আত্মবিশ্বাস দেখে হেসে বললেন—আপনি ওকে কী বলবেন?

— সেটা জিজ্ঞাসা করবেন না। বশীকরণের যত মন্ত্র আছে তার সবই পরীক্ষা করব।

— তা হলে আপনি কখনও সফল হবেন না। সে এত ভদ্র, এত নম্র, এত প্রসন্নমুখ, এত মধুরভাষী যে আপনি ওর ওখান থেকে তার ভক্ত হয়ে ফিরে আসবেন। সে সব সময় আপনার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনার সমস্ত কঠোরতা শান্ত হয়ে যাবে। আপনার সামনে এখন একটাই রাস্তা। আপনার কলমে আছে জাদু। আপনি কত ছেলেকে সৎপথে ফিরিয়ে এনেছেন। মানুষের মনের সুপ্ত মানবতাকে জাগানো আপনার কাজ। আমার ইচ্ছে, আপনি কুসুমেব হয়ে মর্মবিদারক, হৃদয় আলোড়নকারী এমন একটা চিঠি লিখুন যাতে সে লজ্জা পায় এবং তার মনে ভালোবাসা জাগে। আমি চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

নবীনবাবু তো কবি। তাই আমার কাছে আমার ব্যাপারে অবশ্য বাস্তবতার চেয়ে কবিত্বের প্রাধান্যই বেশি। আমার কয়েকটি গল্প পড়ে তিনি কেঁদেছেন; তাই তাঁর বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, আমি চতুড় সাপুড়ের মতো যেমন ইচ্ছা অন্যের মন নাচাতে পারব। তিনি এটা ভাবেননি যে, সব মানুষই কবি নয় কিংবা একই রকম ভাবপ্রবণ নয়। যে গল্প পড়ে তিনি কেঁদেছেন সেই গল্পই পড়ে অনেক ভদ্র লোক বিরক্ত হয়ে বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু এসব বোঝানোর উপযুক্ত সময় সেটা নয়। যদি বলতাম তিনি ভাবতেন যে, আমি পাশ কাটাতে চাইছি। কাজেই আমি সহৃদয়তার সঙ্গে বললাম—আপনি অনেক দূর পর্যন্ত চিন্তা করেছেন। তবে আমি আপনার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত, যদিও আমার হৃদয় দ্রবীভূত করার ক্ষমতার আন্দাজ করতে গিয়ে আপনি অত্যুক্তিই করেছেন তবু আপনাকে আমি নিরাশ করব না। আমি চিঠি লিখব এবং ওই যুবকের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য যথাসাধ্য চেস্টাও করব। তবে আপনি যদি অনুচিত মনে না করেন তাহলে কুসুম তার স্বামীকে যে সব পত্র লিখেছে সেগুলো আমাকে দেখাবেন। সে তো পত্র ফেরতই দিয়ে দিয়েছে আর যদি কুসুম ওগুলোকে ছিঁড়ে না ফেলে থাকে তাহলে তার কাছেই সেগুলো থেকে থাকবে। ওই সব চিঠি দেখলে আমি বুঝতে পারব আর কোন প্রসঙ্গে লেখা যায়।

নবীনবাবু তার পকেট থেকে চিঠির একটা বাণ্ডিল বের করে আমার সামনে রেখে বললেন—আমি জানতাম যে আপনি চিঠি দেখতে চাইবেন। তাই এগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এগুলো আপনি ধীরে-সুস্থে পড়ুন। কুসুম যেমন আমার মেয়ে, তেমনি সে আপনারও মেয়ে। আপনার কাছে লুকোবার কী আছে।

সুগন্ধ, গোলাপি, মসৃণ কাগজের উপর সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা সেই চিঠিগুলো আমি পড়তে শুরু করলাম—

'হে আমার স্বামী, আমি এখানে এসেছি এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও চোখ বুজতে পারিনি। এপাশওপাশ করেই সারা রাত কেটে যায়। বারেবারে ভাবি, আমার কী এমন অপরাধ হয়েছে যে আপনি আমাকে এমন সাজা দিচ্ছেন। আপনি আমাকে তিরস্কার করুন, বকুন, অভিশাপ দিন, ইচ্ছা হলে আমার কান মুলে দিন। আমি এসব শাস্তিই আনন্দের সঙ্গে মাথা পেতে নেব; কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে পারছি না। আমি আপনার কাছে এক সপ্তাহ ছিলাম; ভগবান জানেন কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি কত ভেবেছি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি, আপনার কাছে আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু আপনি তো আমার ছায়া থেকেও পালিয়ে বেড়াতেন, তাই আমার কোনো সুযোগই হয় নি। আপনার হয়তো মনে আছে যে, দুপুরে যখন বাড়ির সব লোক ঘুমিয়ে পড়ত আমি তখন আপনার ঘরে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতাম; কিন্তু আপনি কখনও চোখ তুলে দেখতেন না। তখন আমার মনের অবস্থা কী হত তা আপনি কখনও অনুমান করতে পারবেন না। আমার মতো অভাগিনিরা এর কিছুটা অনুমান করতে পারে। আমি আমার বান্ধবীদের কাছ থেকে ফুলশয্যার রাত্রের কথা শুনেশুনে কল্পনায় যে সুখ-স্বর্গ রচনা করেছিলাম, আপনি তা কী নির্দয়তার সঙ্গে নষ্ট করে দিলেন।

'আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনার উপর কি আমার কোনো অধিকার নেই? আদালতও অপরাধীর দণ্ড দেয়; তার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়; সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়; শুনানি হয়। আপনি তো কিছু জিজ্ঞাসাই করেন নি। যদি আমি আমার অপরাধ জানতে পারতাম তবে ভবিষ্যতের জন্য সচেতন হতে পারতাম। আপনার চরণে মাথা রেখে বলতে পারতাম, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শপথ করে বলছি, কেন যে আপনি রুষ্ট হলেন আমি তার কিছুই জানি না। সম্ভবত, আপনি আপনার স্ত্রীর মধ্যে যে সব গুণের সমাবেশ আশা করেছিলেন তা আমার মধ্যে নেই। সত্যিই, আমি ইংরেজি পড়িনি, ইংরেজি সমাজের রীতিনীতি জানি না। ইংরেজি খেলা-ধুলোও জানি না। হয়তো আমার মধ্যে আরও অনেক ত্রুটি থাকতে পারে। আমি জানি, আমি আপনার যোগ্য নই। আমার চেয়ে আরও রূপসি, গুণবতী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রী আপনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, হে আমার দেবতা, দণ্ড তো হওয়া উচিত অপরাধের জন্য, ত্রুটির জন্য নয়। আর, আমি তো আপনার আদেশমতো চলতে প্রস্তুত। আপনি একটু সদয় হোন, দেখবেন আমি আমার ত্রুটি কত দ্রুত সংশোধন করে নিই। আপনার প্রেম-কটাক্ষ আমার রূপকে প্রদীপ্ত, আমার বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ ও আমার ভাগ্যকে সুদৃঢ় করে তুলবে। আপনার ভালোবাসা লাভ করলে আমার নবজন্ম হবে।

'স্বামী, আপনি কি ভেবে দেখেছেন কার উপর আপনি এই ক্রোধ করছেন? এক অবলা নারী যে আপনার চরণে প্রণত হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, যে জন্মজন্মান্তরের জন্য আপনার দাসী, সে কি এই ক্রোধ সহ্য করতে পারে? আমার মন খুব দুর্বল। আমাকে কাঁদিয়ে অনুশোচনা ছাড়া আপনার আর কী লাভ হবে? এই ক্রোধাগ্নির এক স্ফুলিঙ্গ আমাকে ভস্ম করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যদি আপনি চান যে, আমার মৃত্যু হওয়া বাঞ্ছনীয় তবে আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। কেবল আপনার একটু ইঙ্গিত চাইছি। যদি আমার মৃত্যুতে আপনার মন প্রসন্ন হয়

তাহলে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি আমাকে আপনার চরণে সমর্পিত করে দেব। তবে একটা কথা না বলে পারছি না যে, আমার মধ্যে সহস্র দোষ থাকলেও একটা গুণ রয়েছে; আমার বিশ্বাস আপনার সেবা আমি যতটা করতে পারব আর কোনো স্ত্রী তা পারবে না। আপনি বিদ্বান, আপনি উদার, আপনি মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিত। আপনার দাসী আপনার সামনে দাঁড়িয়ে দয়া ভিক্ষা করছে। আপনি কি তাকে দ্বার থেকে ফিরিয়ে দেবেন?

আপনার অপরাধিনী,
কুসুম'

এই চিঠি পড়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কোনো স্ত্রী যে অসহায়ের মতো এতটা অনুনয়-বিনয় করতে বাধ্য হবে তা আমার কাছে অসহ্য মনে হল। পুরুষ যদি স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতা দেখায় তবে স্ত্রী কেন তাকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারবেন না? ওই পাজি লোকটা মনে করেছে যে বিবাহ এই মহিলাকে বাঁদি বানিয়ে দিয়েছে। অবলা নারীর উপর সে যত অত্যাচারই করুক কেউ তাকে থামাতে পারবে না, কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। পুরুষ নিজে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বিবাহ করতে পারবে অথচ স্ত্রীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখেও সেইরকম কঠোর শাসন চালাতে পারবে। সে জানে, স্ত্রী কুলমর্যাদার বন্ধনে বাঁধা; তার কেঁদে কেঁদে মরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তবে যদি তার এই ভয় থাকত যে, তার স্ত্রীও তাকে তার জবাব ইটের বদলে পাথর না হোক, ইটও না হোক, অন্তত থাপ্পড় কষিয়ে দিতে পারে, তাহলে কখনও তার এই বদমাইসি করার সাহস হত না। বেচারা স্ত্রী কত অসহায়! আমি যদি কুসুমের জায়গায় থাকতাম তাহলে এই নিষ্ঠুরতার জবাব দশ গুণ কঠোরতার সঙ্গে দিতাম। তার বুকে পাথর ভাঙতাম। লোকলজ্জার তোয়াক্কাই রাখতাম না। সমাজ অবলার উপর এত জুলুম সহ্য করে অথচ একটা টুঁ শব্দও করে না। কাজেই তার হাসি বা কান্নার কোনো পরোয়াই করব না। আরে, অভাগা যুবক, তুই কি কিছুই বুঝতে পারছিস না যে, তুই ভবিষ্যতের গলায় কেমন নিষ্ঠুরের মতো ছুরি চালাচ্ছিস? এটা হল এমন একটা সময় যখন পুরুষকে তার নিজের ভালোবাসার ভাণ্ডার খুলে স্ত্রীকে মা-বাবা, ভাই-বোন, সখী-বান্ধবী সকলের প্রেমের পূর্ণতা দিয়ে ভালোবাসতে হয়। যদি পুরুষের সে সামর্থ্য না থাকে তাহলে স্ত্রীর ক্ষুধিত হৃদয়কে সে কী করে খুশি করবে? পরিণাম সচরাচর যা হবার তাই হয়। অবলা স্ত্রী দগ্ধে দগ্ধে শেষ হয়ে যায়। এটা এমন সময় যে সময়ের স্মৃতি সারা জীবনের মধুর সঞ্চয়। স্ত্রীর প্রেম-তৃষ্ণা এত প্রবল যে সে পতির ভালোবাসা পেয়ে নিজের দুঃখকষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করে যায়। এটা এমন সময় যখন হৃদয়ে প্রেমের বসন্ত সমাগম হয় এবং তাতে নতুন নতুন আশা-কোকিলের আবির্ভাব ঘটে। এমন নির্দয় কে আছে যে এই ঋতুতে এই বৃক্ষে কুঠারাঘাত করে। এটা এমন সময় যখন শিকারি পাখিকে তার নীড় থেকে ধরে নিয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখে। আচ্ছা, সে কি তার গলায় ছুরি চালিয়ে তার মধুর গান শোনার প্রত্যাশা করতে পারে?

আমি দ্বিতীয় পত্র পড়া শুরু করল্যাম—

'হে আমার জীবন-ধন, দু সপ্তাহ জবাবের প্রতীক্ষা করে আজ আবার অভিযোগ জানাতে বসেছি। যখন ওই চিঠি লিখেছিলাম তখন আমার মন বলছিল যে, তার উত্তর অবশ্যই পাব।

তখন অসম্ভবের স্থলে আশাকে মনে স্থান দিয়েছিলাম। এখনও আমার মন এটা মানতে রাজি নয় যে, আপনি ইচ্ছাকৃতভাবেই ওই চিঠির উত্তর দেননি। হয়তো আপনি সময় পাননি। ঈশ্বর না করুন, আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো? কাকে জিজ্ঞাসা করব? একথা মনে হতেই ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, আপনি প্রসন্ন ও সুস্থ থাকুন। আমাকে চিঠি লিখবেন না, নাই লিখলেন, আমি তো কাঁদতে কাঁদতে একসময় চুপ করবই। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আপনার যদি কোনো প্রকার কষ্ট হয়ে থাকে, আমাকে তাড়াতাড়ি দুছত্র লিখে জানাবেন, আমি কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব।

'আত্মসম্মান ও সামাজিক প্রথার বেড়াজালে পড়ে আমি ভয় পাচ্ছি। এই অবস্থাতেও যদি আপনার সেবা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন তাহলে আপনি আমার সেই অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন যা আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। আমি আপনার কাছ থেকে আর কিছু চাইছি না। আপনি আমাকে মোটা ভাতকাপড়ে রাখুন আমার কোনো নালিশ থাকবে না। আপনার সঙ্গে থাকলে আমি নিদারুণ বিপদেও প্রসন্ন থাকতে পারব। গয়নার কোনো লোভ আমার নেই; নেই অট্টালিকায় থাকার কোনো মোহ; নেই আমোদ-আহ্লাদের লালসা; নেই সম্পদের প্রতি কোনো লোভ। আমার জীবনের উদ্দেশ্যে কেবল আপনার সেবা করা। এই আমার জীবনের ধ্যানজ্ঞান।

'পৃথিবীতে আমার আর অন্য কোনো দেবতা নেই। নেই কোনো গুরু কিংবা প্রভু। আমার দেবতা আপনিই। আপনিই আমার গুরু, আপনিই আমার রাজা। আপনি আমাকে আপনার চরণ থেকে বিচ্যুত করবেন না, আমাকে ত্যাগ করবেন না। আমি সেবা ও প্রেমের ফুল নিয়ে, কর্তব্য ও ব্রতের অর্ঘ্য অঞ্চলে সাজিয়ে আপনার পূজার জন্য এসেছি। আপনি আমাকে এই অর্ঘ্য, এই ফুল আপনার চরণে রাখতে দিন। পূজারিনির কাজ তো পূজা করা। দেবতা তার পূজা গ্রহণ করছেন কি করছেন না সেটা দেখা তার কাজ নয়।

'আমার মাথার মণি, এখন আমার কী অবস্থা তা বোধ হয় আপনি জানেন না। যদি জানতেন তাহলে আপনি এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পারতেন না। আপনি পুরুষ। আপনার হৃদয়ে দয়া আছে, সহানুভূতি আছে, উদারতা আছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমার মতো একজন তুচ্ছ ব্যক্তির উপর আপনি ক্রোধ করতে পারেন। আমি আপনায় দয়ার যোগ্য—কত দুর্বল, কত সাধারণ, কত অসহায়! আপনি সূর্য, আমি অণু; আপনি অগ্নি, আপনি তৃণ; আপনি রাজা, আমি ভিখারি। ক্রোধ তো দেখাতে হয় সমানে সমানে। আমি কী করে আপনার ক্রোধের আঘাত সহ্য করব?

'যদি আপনার মনে হয় যে, আমি আপনার সেবার যোগ্য নই তাহলে আপনি আমাকে বিষের পাত্র তুলে দিন। আমি তা অমৃত জ্ঞান করে মাথায় স্পর্শ করে চোখ বুজে গলায় ঢেলে দেব। যখন এই জীবন আপনাকে উৎসর্গ করেছি তখন একে রাখা আর না রাখা সবই আপনার ইচ্ছা। এই সন্তোষই আমার যথেষ্ট যে, আমার মরণ হলে আপনার সব চিন্তা ঘুচবে। আমি শুধু এটুকুই জানি যে, আমি আপনার এবং চিরকাল আপনারই থাকব। শুধু এজন্মেই নয়, জন্মান্তরেও।

অভাগিনী,

কুসুম'

এই চিঠি পড়ে কুসুমের প্রতিও আমার বিরক্তি এল আর ওই ছোকরাকে তো ঘৃণা করতেই শুরু করলাম। মেনে নিলাম, তুমি স্ত্রী এবং আজকের দিনের প্রথা অনুসারে তোমার উপর পুরুষের সর্বপ্রকার অধিকার রয়েছে। কিন্তু নিজেকে ছোটো করারও একটা সীমা থাকবে। স্ত্রীর কিছু অহংকার, স্ত্রীর কিছু মর্যাদা তো থাকবে। যদি পুরুষ তাকে অবহেলা করে তবে তারও তো উচিত পুরুষকে অগ্রাহ্য করা। নারীকে ধর্ম ও ত্যাগের পাঠ পড়িয়ে পড়িয়ে আমরা তাদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস এই দুয়েরই শেষ করে দিয়েছি। যদি পুরুষ নারীর মুখাপেক্ষী না হয় তাহলে নারী কেন পুরুষের মুখাপেক্ষী হবে? ঈশ্বর পুরুষকে হাত দিয়েছেন, তা বলে কি নারীকে তা থেকে বঞ্চিত করেছেন? পুরুষের বুদ্ধি আছে, তা বলে কি নারী নির্বোধ? এত বিনীতভাবের জন্যই আজ পুরুষের মেজাজ আকাশ ছুঁইছুঁই। পুরুষ অসন্তুষ্ট হলে নারীর যেন প্রলয় উপস্থিত হল। আমার তো মনে হয়, কুসুম নয়, তার হতভাগা স্বামীই দয়ার পাত্র। কারণ সে কুসুমের মতো স্ত্রী-রত্নের কদর করতে জানে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, ব্যাটা কোনো রোগ পুষে রেখেছে। কোনো শিকারির রঙিন জালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

যাই হোক, আমি তৃতীয় পত্র খুললাম—

'প্রিয়তম, আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আমার জীবনের আর কোনো অর্থ নেই। যে ফুল দেখবার বা তোলবার কেউ নেই সে ফুল ফোটে কেন? এই জন্য কি যে শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়বে আর কেউ এসে মাড়িয়ে চলে যাবে? আমি আপনার বাড়িতে এক মাস থেকে এখানে এসেছি। আমার শ্বশুরমশাই আমাকে নিয়েছিলেন, তিনিই আমাকে বিদায় করে দিয়েছেন। এত দিনের মধ্যে আপনি একবারের জন্যও আমাকে দেখা দেননি। আপনি দিনের মধ্যে বিশ বার ঘরে আসতেন; আপনার ভাইবোনদের সঙ্গে তামাশা দেখতেন। কিন্তু আমার কাছে আসবেন না, এই প্রতিজ্ঞাই যেন আপনি করে বসে ছিলেন।

'আমি কতবার আপনার কাছে খবর পাঠিয়েছি, কত অনুনয়-বিনয় করেছি, কতবার নির্লজ্জের মতো আপনার ঘরে গেছি; কিন্তু আপনি কখনও আমাকে চোখ তুলেও দেখেননি। আমি তো কল্পনাই করতে পারি না যে কোনো প্রাণী এমন হৃদয়হীন হতে পারে। প্রেমের যোগ্য নই; বিশ্বাসের যোগ্য নই; সেবা করার যোগ্য নই; তা বলে কি দয়ারও যোগ্য নই? আমি ওই দিন কত কষ্ট করে আপনার জন্য রসগোল্লা বানিয়েছিলাম। আপনি তা হাত দিয়ে ছুঁলেনও না। আপনি যখন আমার প্রতি এত বিরক্ত তখন, আমি বুঝতে পারছি না, বেঁচে থেকে আমার কী লাভ? জানি না কোন আশা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ কেমন ন্যায়বিচার যে আপনি সাজা দিয়ে যাচ্ছেন অথচ অপরাধ কী তা বলছেন না। এটা কেমন ব্যবহার?

'আপনি জানেন যে, এই এক মাসের মধ্যে আপনার ওখানে খাবার মুখে তুলেছি বড়ো জোর দশ দিন। আমি এত দুর্বল হয়ে গিয়েছি যে, চলতে গেলে চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসে। মনে হয়, চোখের জ্যোতিই নেই। মনে হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, যত পারেন, কষ্ট দিন। এই অন্যায়ের শেষ একদিন অবশ্যই হবে। এখন তো মৃত্যুই আমার সমস্ত আশার কেন্দ্রবিন্দু। এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনি উল্লাস করবেন আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। আপনার চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও ঝরে

পড়বে না। তবে এতে আপনার দোষ নেই, আমারই দুর্ভাগ্য। আগের জন্মে আমি নিশ্চয়ই কোনো মহা পাপকাজ করেছিলাম।

'আমি চাইছি, আমিও আর আপনার পরোয়া করব না। আপনার মতোই আমিও চোখ ফিরিয়ে নেব, মুখ ফিরিয়ে নেব, মনও ফিরিয়ে নেব; কিন্তু কেন জানি সে শক্তি আমার নেই। লতা কি গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? গাছের কোনো অবলম্বন দরকার হয় না। লতা সেই শক্তি কোথায় পাবে? লতাকে তো গাছের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে গাছ থেকে পৃথক করে দিন, সে শুকিয়ে যাবে। আমি আপনার থেকে নিজের পৃথক অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারি না। আমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, প্রত্যেক ভাবনায়, প্রতি ইচ্ছায় আপনি মূর্ত হয়ে রয়েছেন। আমার জীবন সেই বৃত্ত যার কেন্দ্র আপনি। আমি গলার সেই মালা যার প্রত্যেকটি ফুল আপনি সুতো হয়ে গেঁথে রেখেছেন। ওই সুতো ছাড়া মালার ফুল মাটিতে ঝরে পড়বে আর ধুলোয় মিশে যাবে।

'শন্নো বলে আমার এক বান্ধবী আছে। এবছর তার বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী যখন শ্বশুরবাড়ির আসে, মাটিতে আর শন্নোর পা পড়ে না। দিনের মধ্যে কতবার তার রূপ বদলায়। তার পদ্মমুখ যেন প্রস্ফুটিত হয়ে পড়ে। আনন্দ ধরে রাখতে পারে না। সেই আনন্দ আমার মতো অভাগির জন্য সে বিলোতে বিলোতে যায়। যখন সে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তখন আমি হর্ষ ও আনন্দের অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে যাই। দু জনেই প্রেমে উন্মাদ। ওদের ধন নেই, সম্পত্তি নেই, ওরা দারিদ্র্যেই আনন্দিত। এটা হল অখণ্ড ভালোবাসর এক মুহূর্ত। জগতে কোন বস্তুর সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে? আমি জানি, এই আনন্দ, এই চিন্তাভাবনাহীন অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। জীবনের সমস্যা, নিরাশা এদেরও পরাস্ত করবে। কিন্তু এই মধুর স্মৃতি সঞ্চিত সম্পদের মতো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের সম্বল হয়ে থাকবে। ভালোবাসার রসে ডুবোনো শুকনো রুটি, ভালোবাসার রঙে রাঙানো মোটা কাপড় ও ভালোবাসার ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত পর্ণকুটির সমস্ত দুঃখের মধ্যেও তাদের সেই স্বাদ, সেই শোভা ও সেই প্রশান্তি এনে দেয় যা সম্ভবত স্বর্গলোকে দেবতাদের ভাগ্যেও জোটে না।

'যখন শন্নোর স্বামী বাড়ি ফিরে যায় তখন সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এমন কাঁদে যে আমার মন একেবারে আর্দ্র হয়ে ওঠে। স্বামীর চিঠি এলে মনে হয় কী না জানি তার হাতে এল। তার কান্নায়, তার অক্ষমতায় এমনকী তার অভিযোগের মধ্যেও একটা বিশেষ স্বাদ, একটা বিশেষ রস অনুভব করা যায়। তার চোখের জলের উৎস হল ব্যগ্রতা ও বিহ্বলতা আর আমার চোখের জল নিরাশা ও দুঃখের। তার ব্যাকুলতায় রয়েছে প্রতীক্ষা ও আনন্দ আর আমার ব্যাকুলতায় দীনতা আর পরাধীনতা। তার অভিযোগে রয়েছে অধিকারবোধ ও মমতা আর আমার অভিযোগে অবসাদ ও ক্রন্দন।

'চিঠি বড়ো হয়ে যাচ্ছে অথচ মনের বোঝা হালকা হচ্ছে না। ভয়ানক গরম পড়েছে। বাবা আমাকে মুসৌরি নিয়ে যাবার কথা ভাবছেন। আমার রুগ্ণতা দেখে ওরা টি বি সন্দেহ করছেন। বাবা জানেন না যে, আমার জন্য মুসৌরি কেন, স্বর্গও জেলখানা।

অভাগিনী,

কুসুম'

'হে আমার পাথরের দেবতা, কাল মুসৌরি থেকে ফিরে এসেছি। লোকে বলে, মুসৌরি খুব স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় স্থান। হবে হয়তো। আমি তো একদিনও ঘর থেকে বাইরে বেরুইনি। ভগ্নহৃদয়ের কাছে সমস্ত জগৎসংসার শ্মশানতুল্য।

'আমি রাত্রে এক মজার স্বপ্ন দেখেছি। বলব? কী লাভ? জানি না কেন আমি এখনও মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি। আশার দুর্বল সুতো এখনও আমার জীবনকে বেঁধে রেখেছে। জীবন-উদ্যানের দ্বার পর্যন্ত গিয়ে ভ্রমণ না করে ফিরে আসা কতই না হতাশার! ভিতরে কত সৌন্দর্য, কত আনন্দ! আর আমার জন্য সে দ্বার বুন্ধ। কত আশা নিয়ে ভ্রমণের আনন্দ পাব বলে গিয়েছিলাম, কত তার প্রস্তুতি; কিন্তু পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে দ্বার বুন্ধ হয়ে গেল।

'আচ্ছা, বলুন তো, আমি মরে গেলে আমার মৃতদেহের উপর আপনি কি দুফোঁটা চোখের জল ফেলবেন? সারা জীবনের জন্য যার ভার নিয়েছিলেন, বরাবরের জন্য যার হাতে হাত রেখেছিলেন, তার জন্য কি এতটুকু উদারতাও দেখাবেন না? মুমূর্ষুর অপরাধ সবাই ক্ষমা করে দেয়। আপনিও ক্ষমা করে দেবেন। এসে আমার শবদেহ আপনার হাতে স্নান করাবেন; আপনার হাতেই সিঁথিতে সিঁদুর দেবেন, আপনার হাতেই চুড়ি পরাবেন, আপনার হাতেই আমার মুখে গঙ্গাজল দেবেন, দু-চার পা কাঁধে নিয়ে যাবেন, ব্যস্, আমার আত্মা তৃপ্ত হয়ে যাবে এবং আপনাকে আশীর্বাদ জানাবে। আমি কথা দিচ্ছি, ভগবানের দরবারে আমি আপনার যশোগান করব। কী এটাও কি খুব বেশি দাবি? এইটুকু করলেই আপনি আপনার সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারছেন! আহ, যদি বিশ্বাস করতে পারতাম যে, আপনি এই শিষ্টাচারটুকুও দেখাবেন! আর তাহলে আমি কত আনন্দের সঙ্গেই না মৃত্যুকে স্বাগত জানাতে পারি! তবে আমি আপনার প্রতি কোনো অবিচার করব না। আপনি যতই নিষ্ঠুর হোন না কেন, এত নির্দয় হতে পারবেন না। আমি জানি, আপনি এই সংবাদ পেয়েই চলে আসবেন এবং সম্ভবত এক মুহূর্তের জন্য হলেও আমার শোকাবহ মৃত্যুতে আপনি অশ্রুপাত করবেন। আমার জীবনে এই শুভ মুহূর্ত সত্যি যদি আসত!

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? বিরক্ত হবেন না। আমার যে জায়গা ছিল তা কি অন্য কোনো সৌভাগ্যমতী দখল করে নিয়েছেন? যদি তাই ঘটে থাকে তবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তার ছবিটা আমাকে একটু পাঠিয়ে দেবেন। আমি তার পূজা করব, তার পায়ে মাথা নত করব। আমি যে দেবতাকে প্রসন্ন করতে পারিনি সে তাঁকে তুষ্ট করে বর লাভ করেছে। এইরকম সৌভাগ্যবতীর চরণামৃত পান করা উচিত। আমার আন্তরিক কামনা, আপনি তার সঙ্গে সুখে থাকুন। যদি আমি সেই দেবীর কোনো সেবা করতে পারি তা হলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তা আপনার কোনো কাজে আসতে পারে। আপনি শুধু তার নাম ও ঠিকানাটা বলে দিন, আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলব—দেবি, আমি তোমার দাসী, কারণ তুমি আমার স্বামীর প্রেমিকা। তুমি আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও। আমি তোমার জন্য পুষ্পশয্যা রচনা করব, তোমার সিঁথি আমি মুক্তোয় ভরে দেব, তোমার পা টেনে নিয়ে আলতা পরাব—এই হবে আমার জীবনের সাধনা। আমি যন্ত্রণা ভোগ করব কিংবা কষ্ট পাব তা ভেবো না। যন্ত্রণা তখনই হয় যখন কেউ আমার কোনো জিনিসকে ছিনিয়ে নেয়। যে জিনিসকে নিজের বলে ভাববার কখনও কোনো সৌভাগ্য হল না তার জন্য আমার কষ্ট হবে কেন?

'এখনও অনেক কিছু লেখার ছিল; কিন্তু ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। বেচারা বুকের জ্বলুনিকে টি বি বলে ধরে নিয়েছেন।

দুঃখজর্জরিত
কুসুম'

এই দুই চিঠি আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। আমি অত্যন্ত ভাবলেশহীন মানুষ। ভাবালুতা আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। অধিকাংশ শিল্পীর মতোই আমিও বাগাড়ম্বরে চঞ্চল হই না। কোন কথা অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে আর কোন কথা কেবল মনকে ছোঁয়ার জন্য লেখা হয়েছে, এই পার্থক্য-চিন্তা প্রায় সর্বসময়ে আমার সাহিত্যের রস গ্রহণের আনন্দে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই দুই চিঠি আমাকে একেবারে অস্থির করে ফেলল। এক জায়গায় তো সত্যি আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। যে মেয়ে মা-বাবার এত আদরের, বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এমন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল—এটা ভাবতে কেমন যেন কষ্ট হয়। বিয়েই বা কী হল! হল যা তা ওর চিতা সাজানো কিংবা মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা। এতে অবশ্য সন্দেহ নেই যে, এমন বৈবাহিক দুর্ঘটনা কমই ঘটে। তবে সমাজের বর্তমান অবস্থায় এরকম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। যে পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের অধিকার সমান না হবে ততদিন এরকমভাবেই নারী নির্যাতিত হতে থাকবে। দুর্বলকে অত্যাচার করা প্রাণীমাত্রেরই স্বভাব। পাগলা কুকুর থেকে লোকে দূরে সরে থাকে। এমনি কুকুরের সঙ্গে মজা করার জন্য ছেলেপুলেরা পাথর ছুঁড়ে মারে। তোমার দুই ভৃত্যের এক শ্রেণী, এদের মধ্যে কখনও ঝগড়া হবে না। তবে আজ যদি এদের মধ্যে একজনকে অফিসার বানিয়ে দাও এবং অপরজনকে আর্দালি কর, তবে দেখবে অফিসার আর্দালির উপর কেমন মেজাজ নেয়। সুখময় দাম্পত্য জীবনের গোড়াপত্তন হতে পারে অধিকারের সমতার উপর। অধিকারের বৈষম্যও থাকবে আবারও প্রেম থাকবে, এতে আমার সন্দেহ রয়েছে। আজ আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে প্রেমকে প্রেম বলি তা সেই প্রেম যা দেখা যায় প্রভু ও তার পোষা জন্তুর মধ্যে। পশু মাথা নিচু করে কাজ করে যাবে, প্রভুও তাকে খোল-ভুসি দেবে, তাকে সোহাগ করবে, তাকে অলংকারে সজ্জিত করবে; কিন্তু সেই পশু যদি কাজে একটু ঢিলে দেয়, একটু ঘাড় বাঁকায়, মালিকের চাবুক তার পিঠে পড়ে। একে প্রেম বলে না।

যাই হোক, আমি পঞ্চম চিঠি খুললাম —

'যা ভেবেছিলাম তাই। আপনি আমার আগের চিঠিরও জবাব দিলেন না। এর সোজা অর্থ হল এই যে, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আপনার যা অভিলাষ। পুরুষের কাছে স্ত্রী পায়ের জুতো; স্ত্রীর কাছে পুরুষ দেবতুল্য, হয়তো আরও বেশি। নারী তার বিবেক জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর কল্পনা শুরু করে। আমিও তাই করেছিলাম। যখন আমি পুতুল খেলতাম তখনই আপনি পুতুলের রূপে আমার মনোদেশে প্রবেশ করেছিলেন। আমি পা ধুইয়ে মালা, ফুল আর নৈবেদ্য দিয়ে আপনার পূজা করতাম। কিছুদিন পর গল্প পড়া ও শোনার নেশা হল। তখন গল্পের নায়ক রূপে আপনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আপনাকে আমি আমার হৃদয়ে স্থান দিলাম। বাল্যকাল থেকেই আপনি কোনো-না-কোনো রূপে আমার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। পরিশেষে ওই সব ভাবনা আমার মনের গভীরতম প্রদেশে পৌঁছে গিয়েছিল। আমার অস্তিত্বের প্রতিটি অণুপরমাণু ওইসব ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

মন থেকে ওদের নির্বাসন দেওয়া সহজ নয়। তা হলে তার সঙ্গে জীবনের যে উপাদান তাই ভেঙে পড়বে। তবে, আপনি যদি চান তাহলে তাই হবে।

'আমি আপনার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। অভাব কিংবা দারিদ্র্যের প্রশ্ন তো দূরের কথা, আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিতেও প্রস্তুত। আপনার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। আমি লজ্জা-সঙ্কোচ সব পরিত্যাগ করেছিলাম। আত্মাভিমানকে পদদলিত করেছিলাম; কিন্তু আপনি আমাকে স্বীকার করতে চাইছেন না। আমি অসহায়, আপনার কোনো দোষ নেই। আমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছি যাতে আপনি এত কঠোর হয়ে গিয়েছেন। আর সেটা যে কী আপনি মুখে উচ্চারণ করতেও চাইছেন না। এই নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আমি অন্য আর যে কোনো শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলাম। আপনার হাত থেকে বিষের পেয়ালা নিয়ে বিষ খেতেও আমার বিলম্ব হত না; কিন্তু বিধির বিধান অন্য। স্ত্রী হল পুরুষের দাসী, এই সত্য স্বীকার করে নিতে প্রথমে আমার বাধছিল। নারীকে আমি পুরুষের সহচরী, অর্ধাঙ্গিনী মনে করতাম; কিন্তু এখন আমার চোখ খুলেছে। কিছুদিন হল আমি একটা বইয়ে পড়েছি যে, আদিম কাল থেকে স্ত্রী ছিল গোরু, বলদ, খেত ইত্যাদির মতই পুরুষের এক রকমের সম্পত্তি। স্ত্রীকে বেচে দেবার, বন্ধক রাখার ও মেরে ফেলবার অধিকার পুরুষের ছিল। বিয়ের প্রথা তখন কেবল এই ছিল যে, বরপক্ষ তাদের নিজ সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসবে এবং কন্যাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। কন্যার সঙ্গে সঙ্গে কন্যার গৃহের টাকাপয়সা, শস্য, পশু যা হাতের কাছে পাওয়া যাবে তাও উঠিয়ে নিয়ে যাবে। কনেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বর তার পায়ে বেড়ি দিয়ে ঘরের ভিতর বন্ধ করে রাখত। তার আত্মসম্মান শেষ করে দেবার উদ্দেশ্যে তাকে এই উপদেশ দিত যে, পুরুষই স্ত্রীর দেবতা, হাতের নোয়া অক্ষুণ্ণ থাকাই স্ত্রীর সবচেয়ে বড়ো বৈভব। আজ কত হাজার বছর পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুরুষের সেই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পুরনো সব ব্যবস্থাই কোনোটা বিকৃত রূপে, কোনোটা পরিবর্তিত হয়ে এখনও বহাল রয়েছে। আজ আমি বুঝতে পেরেছি সেই লেখক স্ত্রীজাতির অবস্থা কত সুন্দরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

'এখন আপনাকে আমার সবিনয় অনুরোধ—আর এই আমার শেষ অনুরোধ—আপনি চিঠিগুলো ফিরিয়ে দেবেন। আপনার দেওয়া গহনা ও কাপড়ে এখন আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো আমার কাছে রাখার কোনো অধিকার আমার নেই। আপনি যখন খুশি চেয়ে নেবেন। আমি এগুলোকে একটা পেঁটরায় বন্ধ করে আলাদা করে রেখে দিয়েছি। এগুলোর একটা তালিকাও ওর ভিতরেই রেখে দিয়েছি। মিলিয়ে নেবেন। আজ থেকে আপনি আমার মুখ বা কলম থেকে কোনো অভিযোগ শুনবেন না। আপনি এই ভ্রান্ত ধারণা ভুলেও মনে স্থান দেবেন না যে, আমি আপনার সঙ্গে অকৃতজ্ঞতা কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করব। আমি এবাড়িতেই তিলে তিলে মরব তবু কখনও আমার মনকে কালিমা লিপ্ত করব না। আমি যে পরিবেশে মানুষ তার মূলে রয়েছে পতির প্রতি শ্রদ্ধা। ঈর্ষা কিংবা জ্বালা আমার মন থেকে সেই ভাব দূর করতে পারবে না। আমি আপনার কুলমর্যাদা রক্ষা করব। সেই গচ্ছিত সম্পদ আমি কোনো অবস্থাতেই নষ্ট করব না। তবে আমার হাতে থাকলে তাও আমি ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু এব্যাপারে আমিও অক্ষম, আপনিও অক্ষম। ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন যেন কুশলে থাকেন। জীবনে আমার সবচেয়ে তিক্ত যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হল, নারীজীবন

অধম—অধম নিজের দিক থেকে, মা-বাবার দিক থেকে, স্বামীর দিক থেকেও। তার কদর না আছে মা-বাবার ঘরে, না আছে স্বামীর ঘরে। আমার আবাস এখন শোকাগারে পরিণত। মা কাঁদছে, বাবা কাঁদছে, আত্মীয়-স্বজন কাঁদছে। আমার প্রিয় পরিজনদের কী মানসিক যন্ত্রণাই না ভুগতে হচ্ছে! তাঁরা এখন নিত্য ভাবছেন, এ মেয়ে এই বংশে জন্ম না নিলেই ছিল ভালো। কিন্তু সমস্ত দুনিয়া এক দিকে চলে গেলেও আমার পক্ষে আপনাকে জয় করা সম্ভব হবে না। আপনি আমার স্বামী, আপনরাই রায় চূড়ান্ত। এর কোনো আপিল নেই, ফরিয়াদ নেই। যাই হোক, আজ থেকে এই অধ্যায় শেষ হল। থাকলাম আমি আর থাকল আমরা দলিত, ভগ্ন হৃদয়। আপনার সেবা করার সাধ আমার পূরণ হল না।

অভাগিনী,
কুসুম'

দুই

জানি না, মূক বেদনা নিয়ে আমি কতক্ষণে বসে ছিলাম। নবীনবাবু বললেন—এই চিঠিগুলো পড়ে আপনি কী ঠিক করলেন?

আমি আহত হৃদয়ে বললাম—যদি এই সব চিঠি ওই নর-পিশাচের মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না পেরে থাকে তা হলে আমার চিঠিতে আর কী হবে? এর থেকেও করুণ বেদনা সৃষ্টি করা আমার শক্তির বাইরে। এমন আর কোন নৈতিক ভাবনা আছে যা এইসব চিঠিতে উল্লেখ করা হয়নি! দয়া, লজ্জা, তিরস্কার, ন্যায়—আমার বিবেচনায় তো কুসুম কিছুই বাদ দেয়নি। আমার জন্য এখন কেবলমাত্র একটা অন্তিম উপায়ই রয়েছে, তা হল ওই শয়তানের ওখানে গিয়ে হাজির হওয়া এবং ওর সামনাসামনি কথা বলে এই সমস্যার মর্মস্থলে প্রবেশ করার চেষ্টা করা। যদি সে আমাকে কোনো সন্তোষজনক উত্তর না দেয় তাহলে খুনোখুনি করে ফেলব। হয় আমার ফাঁসি হবে, না হয় তার দ্বীপান্তর। কুসুম যে সাহস ও ধৈর্য সহকারে কাজ করেছে তার প্রশংসা করতে হয়। আপনি ওকে সান্ত্বনা দেবেন। আমি আজ রাত্রের গাড়িতে মোরাদাবাদ যাব আর পরশুর মধ্যে যে পরিস্থিতিই হোক আপনাকে জানাব। আমার তো মনে হচ্ছে ছেলেটি হয় চরিত্রহীন, নয় বুদ্ধিহীন।

ওই উত্তেজনার মুহূর্তে কী জানি কী বকতে শুরু করেছি! এরপর খাওয়াদাওয়া করে দুজনেই স্টেশনে গেলাম। তিনি গেলেন আগ্রা আর আমি মোরাদাবাদের রাস্তা ধরলাম। আমি না আবার ক্রোধবশে কোনো পাগলামি করে বসি এই ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছিল। অনেক বোঝানোর পরে তার মন শান্ত হল।

আমি প্রাতঃকালে মোরাদাবাদ পৌঁছুলাম ও খবর নিতে শুরু করলাম। ওই যুবকের চরিত্র সম্পর্কে আমার যা সন্দেহ হয়েছিল তা ভুল প্রমাণিত হল। পাড়ায়, কলেজে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সবাই তাকে প্রশংসা করছে। ব্যাপারটা যে আঁধারে ছিল তা যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে বলে মনে হল। সন্ধ্যার সময় আমি তার বাড়ি পৌঁছুলাম। যে রকম সহজভাবে দৌড়ে এসে সে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল তা আমি কখনও ভুলতে পারব না। কথাবার্তায় এমন পটু, এত ভদ্র

ও বিনম্র যুবক আমি কখনও দেখিনি। বাইরে ও ভিতরে এত আকাশপাতাল পার্থক্যও আমি কখনও দেখিনি। দু-চার কথায় কুশল ও শিষ্টাচার বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার সঙ্গো দেখা হয়ে খুব ভালো লাগল, তবে কুসুম কী অপরাধ করেছে যে, তুমি তাকে এত কঠোর দণ্ড দিচ্ছ? সে তোমার কাছে কত চিঠি লিখেছে, তুমি তার একটারও উত্তর দাওনি। সে দু-তিনবার এখানেও এসেছে; কিন্তু তুমি তার সঙ্গো কথা পর্যন্ত বলোনি। ওই নির্দোষ মেয়ের সঙ্গো এটা কি তোমার অন্যায় ব্যবহার নয়?

যুবক লজ্জিতভাবে বলল—আপনি যদি এসব প্রশ্ন না তুলতেন তা হলেই খুব ভালো হত। এর জবাব দেওয়া আমার পক্ষে খুবই মুশকিল। আমি তো এটা আপনাদের অনুমানের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবে এই ভুলবোঝাবুঝি দূর করার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হবে।

এই কথা বলতে বলতে সে চুপ করে গেল। বিজলি আলোর উপর নানা কীটপতঙ্গ জমা হয়েছিল। কোনো কোনোটা আবার এসে মুখের উপর পড়েছিল এবং যেন মানুষের উপর তাদের বিজয় সূচিত করে উড়ে যাচ্ছিল। একটা বড়ো ফড়িং শিকার ধরার জন্য মেঝের উপর ওত পেতে বসেছিল। যুবক একটা পাখা নিয়ে মেঝেতে রেখে বিজয়ী কীট পতঙ্গোদের যেন দেখিয়ে দিল যে, ওর মানুষকে যত দুর্বল ভাবছে সে তত দুর্বল নয়। এক মুহূর্তেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল আর আমাদের কথার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করার কেউ থাকল না।

যুবক সঙ্কুচিত হয়ে বলল—হয়তো আপনি আমাকে অত্যন্ত লোভী, নীচ ও স্বার্থপর ভাববেন। তবে এটা ঠিকই যে, এই বিয়েতে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যে সাধ তার পূরণ হয়নি। বিয়েতে আমি খুব রাজি ছিলাম না; চাইছিলাম না নিজের পায়ে বেড়ি পরি। কিন্তু নবীনবাবু যখন ভীষণভাবে ধরলেন এবং তাঁর কথা শুনে আমার আশা হল যে, তিনি সব রকমে আমার সহায়তা করতে প্রস্তুত তখন রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পর তিনি আর আমার কোনো খবরও নিলেন না। কবে নাগাদ আমাকে বিলাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন একটা চিঠি লিখে তার আভাসও দিলেন না। যদিও আমি তাঁকে আমার ইচ্ছা আগেই জানিয়েছিলাম তবু তিনি আমাকে নিরাশ করাই উচিত মনে করলেন। তাঁর এই নির্দয়তা আমার সমস্ত স্বপ্ন ধুলোয় মিশিয়ে দিল। এখন এল এল বি পাশ করে আদালতে গিয়ে জুতো ফট ফট করা ছাড়া আমার আর কী ই বা করার আছে বলুন!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি নবীনবাবুর কাছ থেকে আসলে কী চাইছ? লেনদেনের ব্যাপারে তো তিনি কিছু বলার সুযোগ দেননি। তোমাকে বিলাতে পাঠাবার খরচ বহন করা সম্ভবত তাঁর ক্ষমতার বাইরে।

যুবক মাথা নিচু করে বলল—এটা তো প্রথমেই আমাকে তাঁর বলে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে কি বিয়েই করতাম? উনি যাই খরচ করে থাকুন না কেন তাতে আমার কী উপকার হল? দুই তরফেরই দশ-বারো হাজার টাকা এমনিতেই চলে গেছে আর সেই সঙ্গো আমার সাধও ধুলোয় মিশে গেছে। বাবার তো কয়েক হাজার টাকা ঋণই হয়ে গেছে। তিনি এখন আমাকে ইংল্যান্ড পাঠাতে পারবেন না। পূজনীয় নবীনবাবু চাইলে কি আর আমাকে ইংল্যান্ড পাঠাতে পারেন না? তাঁর কাছে পাঁচ-দশ হাজার কোনো ব্যাপারই নয়।

আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। আমার মুখ ফসকে এমনিতেই বেরিয়ে গেল—ছিঃ! বাঃ রে দুনিয়া! আর বাঃ রে হিন্দু সমাজ! এমন স্বার্থের দাসও আছে যে, এক অবলা নারীকে চরম দুর্দশায় ফেলে তার বাবার উপর জুলুমবাজি করে নিজে উঁচু পদের লোভ করে? বিদ্যার্জনের জন্য বিদেশ যাওয়া দোষের নয়। ঈশ্বর যদি সামর্থ্য দেন, হেসেখেলে বিলাত যাও। কিন্তু পত্নীকে পরিত্যাগ করে শ্বশুরের উপর তার দায়িত্ব চাপানোর মতো নির্লজ্জতা আর কী আছে? নিজের মুরোদে যদি যেতে পারতে তাহলে আমরা তারিফ করতাম। এভাবে কারও ঘাড়ের উপর সওয়ার হয়ে আত্মসম্মান বিক্রি করে যাওয়া কি একটা যাওয়া হল? এই পামরের কাছে কুসুমের কোনো মূল্যই নেই। সে কেবল তার স্বার্থসিদ্ধির বাহন। এরকম নীচ প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। পরিস্থিতির গুণে আমাদের টিকিটি বাঁধা রয়েছে তারই হাতে, কাজেই তার পায়ে মাথা নোয়ানো ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

পরের গাড়িতে আমি আগ্রা ফিরে এসে নবীনবাবুকে সব বৃত্তান্ত জানালাম। সে বেচারা আর কী করে জানবে যে, সব দায়ই তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও মন্দার বাজারে তার ওকালতিতেও ভাটা পড়েছিল এবং অনায়াসে পাঁচ-দশ হাজার টাকা খরচ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবু ওই যুবক যদি তাকে এব্যাপারে একটা আভাসও দিত তাহলেও তিনি কোনো না কোন উপায় অবশ্যই করতেন। কুসুম ছাড়া আর কেই বা তার আছে? সে বেচারার তো এব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না। কাজেই আমি যেমনি তাকে একথা জানালাম অমনি তিনি বলে উঠলেন—ছিঃ! এই একটা সাধারণ ব্যাপারে ছেলে এমন তুলকালাম করছে। আপনি আজই ওকে লিখে দিন যে, সে যখন যেখানে পড়তে যেতে চায় বিনা দ্বিধায় যেতে পারে। আমি তার সমস্ত ভার নিতে রাজি আছি। সারাটা বছর এই পাষাণ ছেলেটা কুসুমকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে মেরেছে।

বাড়িতে এনিয়ে কথা হল। কুসুমও মার কাছ থেকে শুনল। সে বুঝতে পারল, এক হাজার টাকার চেক তার স্বামীর নামে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ যেন সংকটে পড়ে স্বস্ত্যয়ন করা।

কুসুম ভ্রূকুঞ্চিত করে তার মাকে বলল—মা, বাবাকে বলে দাও, কোথাও টাকা পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

মা বিস্মিত হয়ে মেয়ের দিতে তাকিয়ে বললেন—কোন টাকা? আচ্ছা! বুঝেছি। কেন, পাঠালে ক্ষতি কী? জামাইয়ের যখন ইচ্ছে, তা বিলেতে গিয়ে পড়ুক। আমরা কেন বাধা দিতে যাব? থাকলেও তার, খরচ করলেও তার। আমরা কি আর সঙ্গে নিয়ে যাব?

— না, তুমি বাবাকে বলে দাও, এক পয়সাও যেন না পাঠায়।

— কেন, পাঠালে কী ক্ষতি?

— কারণ এই যে, এটাও এক রকমের ডাকাতি, যা শয়তান-বদমায়েসদের কাজ। যেন কাউকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বেশ বেশি টাকা আদায় করা।

মা মেয়ের দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকালেন।

— কী রকম কথা বলছিস, মা? এত দিন পরে যদিও বা দেবতা মুখ তুলে চাইলেন, তুই তাকে আবার বিগড়ে দিবি।

কুসুম ঝাঁঝের সঙ্গে বলল—এরকম দেবতার রাগ করে থাকাই ভালো। যে লোক এত স্বার্থপর, এত দাম্ভিক, এত নীচ তার সঙ্গে আমার পোষাবে না। আমি বলে দিচ্ছি, যদি টাকা পাঠানো হয় তাহলে আমি বিষ খাব। এটাকে ঠাট্টা বলে মনে কোরো না। আমি এরকম লোকের মুখও দেখতে চাই না। বাবাকে বলে দিও। আর যদি তুমি ভয় পাও তাহলে আমি নিজেই বলব। আমি স্বাধীন থাকার সংকল্প নিয়েছি।

মা দেখলেন, মেয়ের মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে উঠেছে। এব্যাপার নিয়ে যেন আর সে কথা বাড়াতে রাজি নয়।

পরের দিন নবীনবাবু আমাকে এব্যাপার জানালে আমি আত্মবিস্মৃতের মত ছুটে গিয়ে কুসুমকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। নারীদের মধ্যে এই আত্মমর্যাদাবোধই আমি দেখতে চাই। কুসুম তাই করে দেখিয়েছে। আমার মনেও এই ছিল; কিন্তু তা খুলে বলার সাহস হয়নি আমার।

এক বছর পার হয়ে গিয়েছে। কুসুম তার স্বামীকে একটা চিঠিও লেখেনি। চিঠি লেখার ইচ্ছাও তার ছিল না। নবীনবাবু কয়েকবারই জামাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু কুসুম তার নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না। তার মধ্যে স্বাবলম্বনের এমন দৃঢ়তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আগে তার অনুজ্জ্বল মুখে ছিল রক্তহীন হতাশা আর বেদনা; এখন সেখানে আভাসিত হচ্ছে আত্মবিশ্বাস আর স্বাধীনতার লালিমা।

(কুসুম / ১৯৩২) অনুবাদ অমলকুমার রায়

পুত্রবতী বিধবা

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ যেদিন দেহ রাখলেন সেদিন সবাই বলল, ভগবান যেন এই রকম মৃত্যুই সকলকে দেন। চার-চারটি জোয়ান ছেলে আর একটি মেয়ে। বড়ো চারটি ছেলেরই বিয়ে-থা হয়ে গিয়েছে; মেয়েটির বিয়েই শুধু বাকি। সম্পত্তিও বেশ কিছু রেখে গিয়েছেন। একটি পাকা বাড়ি, দু-দুটো বাগান, কয়েক হাজার টাকার গয়না, আর কুড়ি হাজার টাকা নগদ। ফুলমতী বৈধব্যের শোকে বেশ কদিন অজ্ঞান, বেহুঁশ রইলেন, তারপর চোখের সামনে জোয়ান ছেলেদের দেখে বুক বাঁধলেন। চারটি ছেলেই বড়ো শান্ত ও সুবোধ। বউরা প্রত্যেকেই কে কার চেয়ে বেশি বাধ্য তাই স্থির করা কঠিন। বউদের মধ্যে কে যে কম আর কে বেশি ভালো হলফ করে বলা বড়ো শক্ত। রাতে শোবার সময় একে একে সব বউরাই ফুলমতীর পা টিপে দেয়। চান করার পর কাপড়টা পর্যন্ত কেচে দেয়। ফুলমতীর চোখের ইশারায় সারা সংসার চলে। বড়ো ছেলে কামতা কোনো এক অফিসে পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটা চাকরি করে, মেজো উমানাথ ডাক্তারি পাশ করার পর ডিসপেনসারি খোলার কথা ভাবছিল, সেজো দয়ানাথ বি এ ফেল করে পত্রিকায় লিখে কিছু রোজগারপাতি করে, আর সবচেয়ে ছোটো সীতানাথ ছিল চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ও যোগ্য। এবার বি এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে এম এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। কোনো ছেলেই বিলাসপ্রিয়, বাউন্ডুলে বা উড়নচণ্ডী স্বভাবের নয় যে মা-বাবাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেবে, বা বংশের মর্যাদাকে জলাঞ্জলি দেবে।

ফুলমতী বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, যদিও বাড়ির চাবি বড়ো বউয়ের কাছেই থাকত। বৃদ্ধদের যা কঠিন আর ঝগড়াটে স্বভাবের করে তোলে সেই কর্তৃত্বের লোভ ছিল না বুড়ির মধ্যে। তবুও বাড়ির একটি ছোটো ছেলেও তাঁর ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে একটা মিষ্টি পর্যন্ত কিনে আনতে পারত না।

সন্ধে হয়ে এসেছে। পণ্ডিত চলে গেছেন আজ বারোদিন হল। কাল তেরো দিনের দিন শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন। আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত সবাই আসবে, তারই অয়োজন চলছিল। ফুলমতী নিজের ঘরে বসে সব দেখছিলেন। মজুররা আটার থলি এনে রাখছিল, ঘিয়ের টিন আসছে, চুবড়িভরা শাকসবজি, তরকারিপাতি আসছে। চিনিভর্তি থলি আসছে, দইয়ের হাঁড়ি, ব্রাহ্মণের জন্য দানসামগ্রীর জিনিস এনে রাখা হচ্ছিল—বাসন, কাপড়চোপড়, খাটবিছানা, ছাতা, জুতো, ছড়ি, লণ্ঠন ইত্যাদি অনেক কিছুই এল। কিন্তু ফুলমতীকে কিছুই দেখানো হল না। এ বাড়ির নিয়ম হিসেবে সব জিনিস সকলের আগে তাঁকে দেখানোই উচিত। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসপত্র খুঁটিয়ে দেখবেন, পছন্দ করবেন, কমবেশির অনুপাত বলে দেবেন, তবেই জিনিসপত্র ভাঁড়ারে ওঠার কথা। তাঁকে দেখানোর

বা তাঁর পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হল না কেন? আচ্ছা, আটা মাত্র তিন বস্তাই বা এল কেন? তিনি তো পাঁচ বস্তা আটার কথা বলে দিয়েছিলেন, ঘি মাত্র পাঁচ টিন এসেছে, তিনি দশ টিন ঘিয়ের অর্ডার দিয়েছিলেন। এরকমভাবে দেখা যাচ্ছে যে, তরিতরকারি, দই, চিনি, সবেতেই, পরিমাণ কমানো হয়েছে। তাঁর হুকুমের ওপর কে হস্তক্ষেপ করেছে? এ ব্যাপারে যখন তিনি সব কিছু ঠিকঠাক করেই দিয়েছিলেন তারপর কমবেশি করার অধিকার কার হল?

আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বাড়ির প্রতিটি কাজে ফুলমতীর কথাই ছিল চূড়ান্ত। তিনি যদি রায় দিয়েছেন একশো টাকা খরচ হবে, একশো টাকাই খরচ হয়েছে, এক টাকা বললে এক টাকাই। কেউ অমান্য করতে পারেনি। এমনকি, পণ্ডিত অযোধ্যানাথও কোনোদিন ফুলমতীর ইচ্ছের বিরুধে কিছু করেননি। কিন্তু আজ চোখের সামনে তাঁর হুকুম প্রত্যক্ষভাবে অমান্য করা হচ্ছে, উপেক্ষা করা হচ্ছে। এ ফুলমতী সইবেন কী করে?

কিছুক্ষণ পর্যন্ত মনের ভাব মনে চেপে রেখে ফুলমতী বসে রইলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। স্বায়ত্তশাসন তাঁর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাগে গর গর করতে করতে এসে কামতানাথকে তিনি বললেন, আটা কি তিন বস্তাই আনানো হয়েছে? আমি যে পাঁচ বস্তা আটার কথা বলে দিয়েছিলাম। ঘি মাত্র পাঁচ টিন এসেছে, দশ টিন ঘি আনার কথা ছিল, তোমার মনে পড়ছে? মিতব্যয়ী হওয়া আমি খারাপ বলে মনে করি না, কিন্তু যিনি কুয়ো কাটিয়ে গিয়েছেন তাঁরই আত্মা যদি তৃষ্ণার্ত থেকে যায়, সে বড়ো লজ্জার কথা হবে।

এই ভুলের জন্য কামতানাথ কোনোরকম ক্ষমা চাইল না, লজ্জিত হল না, ভুল যে কোথাও হয়েছে এ কথাও মেনে নিল না। মিনিট খানেক বিদ্রোহীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আমাদের পরামর্শমতো তিন বস্তা আটাই ঠিক করা হয়েছে, আর সেই হিসেবে, তিন বস্তা আটার জন্য পাঁচ টিন ঘি যথেষ্ট। এই রকম অনুপাতেই বাকি জিনিসপত্র কম করা হয়েছে।

ফুলমতী রেগে আগুন হয়ে বললেন, কার পরামর্শে আটা কম করা হয়েছে?

— আমাদের পরামর্শে।

— তার মানে আমার পরামর্শের কোনো দামই নেই?

— কেন থাকবে না? কিন্তু নিজের লাভলোকসানতো আমরাও বুঝি!

ফুলমতী বিমূঢ়ভাবে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কথার মর্মই তিনি বুঝতে পারলেন না। নিজের লাভক্ষতি? নিজের বাড়ির লাভক্ষতির জন্য দায়ী তো তিনি নিজে, অন্যদের—তা সে হোক নিজের পেটের ছেলে—তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করার তাদের কী অধিকার আছে? এ ছোঁড়া তো এমনভাবে কথার জবাব দিচ্ছে যেন এ বাড়িটা তারই, প্রাণপাত করে গড়া আমার এ সংসারে আমিই বাইরের লোক। আস্পর্ধা দ্যাখো একবার!

ফুলমতী অত্যন্ত রাগ করে বললেন, আমার লাভক্ষতির জন্য তুমি দায়ি নও! আমি যা উচিত বলে মনে করি তা করার অধিকার আমার আছে। যাও! এক্ষুনি গিয়ে আরও দু বস্তা আটা ও পাঁচ টিন ঘি নিয়ে এসো। খবরদার বলছি, কেউ যেন আমার কথার খেলাপ না করে।

ফুলমতীর হিসেবে সে একটু বেশিই হম্বিতম্বি করেছে। এতটা কড়াকড়ির হয়তো দরকার ছিল না। হাজার হোক ছেলেমানুষই তো, ভেবেছে, একটু কম কম করাই বোধহয় ভালো। মনে হয় এটা ভেবেই আমাকে জিজ্ঞেস করেনি যে, মা তো নিজেই সব ব্যাপারে কিপটেমি করে। যদি

ওরা বুঝত, এ কাজে কৃপণতা আমি সইতে পারব না তাহলে আমাকে উপেক্ষা করার সাহস ওদের হত না। কামতানাথ তখনও সেখানেই দাঁড়িয়েছিল এবং ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল না যে, মায়ের নির্দেশ মানার খুব একটা ইচ্ছে আছে তার। তবু ফুলমতী নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। এত রাগারাগির পরেও তাঁকে অবজ্ঞা করার সাহস কারও হতে পারে এ সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথায় আসেনি।

কিন্তু দিন যত যেতে লাগল তত এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হতে লাগল যে, দশ-বারো দিন আগে এ বাড়িতে তাঁর যে স্থানটি ছিল আজ আর সেটি নেই। আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি থেকে মিষ্টি মন্ডা দই আচার চিনি ইত্যাদি নিমন্ত্রণের বিনিময়ে আসছিল। বড়োবউ বেশ একটা গিন্নিভাব নিয়ে সব কিছু গুছিয়ে গাছিয়ে রাখছিল। কেউ তাঁকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করতে এল না। জাতগোষ্ঠীর লোকেরা পর্যন্ত যা কিছু জিজ্ঞেস করার, কামতানাথ বা বড়ো বউকেই জিজ্ঞেস করছে। কামতানাথ কবে থেকে এতবড়ো কর্মকর্তা হল?

রাতদিন ভাং খেয়ে পড়ে থাকে, কেঁদেকঁকিয়ে কোনোরকমে অফিস করে, তাতেও মাসের মধ্যে পনেরো দিন কামাই হয়ে যায়। নেহাত সাহেব পণ্ডিতকে বড়ো সম্মান করেন, নইলে কবে ওকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে ছাড়তেন। আর বড়োবউয়ের মতো লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষ এ সব কাজের কী বোঝে? নিজের কাপড়চোপড়টা পর্যন্ত যে যত্নে রাখতে জানে না তিনি সামলাবেন সংসার। একটা কেলেঙ্কারি হবে আর কী। সবাই মিলে বংশের মুখে চুনকালি মাখাবে। আসল কাজের সময়ে কোনো না কোনো জিনিসের ঘাটতি হবেই। এ সব কাজের জন্য অভিজ্ঞতা চাই। কোনো জিনিস এত অপর্যাপ্ত হবে যে খরচ করেও কূল পাবে না, আবার কোনো জিনিস এমন কম পড়বে যে কোনো পাতে পড়বে, কোনো পাতে হয়তো পড়বেই না। আচ্ছা, এদের হয়েছেটা কী? সিন্দুকটা বড়োবউ খুলছে কোন সাহসে? আমার হুকুম ছাড়া সিন্দুক খোলার সে কে? যদিও চাবি তার কাছেই থাকে, কিন্তু আমি টাকা বার না করতে বললে সিন্দুক খোলা হয় না। আজ এমনভাবে সিন্দুক খুলছে, আমি যেন এ বাড়ির কেউ নই। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

রাতে ফুঁসতে ফুঁসতে উঠে বউকে গিয়ে বললেন, সিন্দুক কেন খুলছ, বউমা? আমি তো কই বলিনি খুলতে।

বড়োবউ অসঙ্কোচে জবাব দিল, বাজার থেকে জিনিসপত্র এসেছে, দাম না দিলে চলবে?

কোন জিনিস কী দামের এসেছে, কতটা এসেছে, এ সবের তো আমি কিছুই জানি না। যতক্ষণ না হিসেবপত্র হচ্ছে টাকা দেওয়া যাবে কী করে?

— হিসেব হয়ে গেছে।

— কে করেছে?

— আমি জানি না কে করেছে। পুরুষ মানুষদের গিয়ে জিজ্ঞেস করুনগে। আমার ওপর হুকুম হয়েছে টাকা বার করে দেওয়ার, তাই দিচ্ছি।

রাগ চেপে ফুলমতী নীরব হয়ে রইলেন। এ সময় রাগের সময় নয়। বাড়িতে অতিথি গিজগিজ করছে। এ সময়ে ছেলেদের ওপরে রাগারাগি করলে লোকে ভাববে, পণ্ডিত মরতে না মরতেই বাড়িতে লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেছে। বুকে পাষাণ চেপে তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন। অতিথিরা

সবাই আগে চলে যাক, তারপর এক এক করে সবাইকে তিনি দেখে নেবেন। দেখব, সামনে দাঁড়িয়ে কে কটা জবাব দিতে পারে। এদের জোটপাকানো আমি বার করব।

কিন্তু ঘরের মধ্যে একান্তেও তিনি নিশ্চিন্ত মনে বসতে পারলেন না। অতিথিসৎকারে কখন কোন নিয়মটা ঠিকমতো পালন হচ্ছে, না কোথায় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, সব কিছুর ওপরেই তাঁর শ্যেনচক্ষু নজর রাখছিল। ভোজ আরম্ভ হল, একসঙ্গে পঙ্ক্তি করে সবাইকে বসানো হল। উঠোনে কষ্ট করে হয়তে দুশো লোক ধরে, আজ সেখানে পাঁচশো লোক কী ভাবে ধরবে? মানুষের কোলে মানুষ বসবে না কী? দুধারে দুই পঙ্ক্তিতে লোক বসালে কী ক্ষতি ছিল? একটু না হয় দেরিই হত, বারোটার জায়গায় রাত দুটো বাজত; কিন্তু এখানে যে সবার শোবার তাড়া আগে, কোনোরকমে এ আপদ চুকিয়ে দিতে পারলে হয়; নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে। লোকেরা এমন ঘেঁসাঘেসি করে বসেছে, নড়তে পর্যন্ত পারছে না, পাতাগুলোও একটার ওপর একটা পাতা হয়েছে। লুচিগুলো জুড়িয়ে গেছে, সবাই গরম লুচি চাইছে, ময়দার লুচি ঠান্ডা হয়ে চিমড়ে হয়ে গেছে, কে খাবে এমন খাবার? ঠাকুরকে লুচির কড়ার সামনে থেকে কেন সরানো হয়েছে? এ সবের জন্যই তো নাক কাটা যায়।

হঠাৎ শোরগোল উঠল, তরকারিতে নুন নেই। বড়োবউ তাড়াতাড়ি নুন বাটতে বসল। রাগে ফুলমতী ঠোঁট কামড়াচ্ছিলেন, কিন্তু সময়টাই এমন, যে মুখ খোলা যাবে না। যাই হোক, গুঁড়ো নুন পাতে পাতে দেওয়া গেল। আবার হৈ হৈ—জল ভীষণ গরম, ঠান্ডা জল আনান। ঠান্ডা জলের কোনো বন্দোবস্তই করা হয়নি, বরফ আনিয়ে রাখা হয়নি। বাজারে লোক ছুটল, কিন্তু এত রাতে বাজারে কোথায় বরফ পাওয়া যাবে? খালি হাতে লোক ফিরে এল, নিমন্ত্রিত লোকেদের কলের গরম জলই খেতে হল। ফুলমতীর যদি ক্ষমতা থাকত ছেলেদের মুখ ভেঙে দিতেন, এমন কেলেঙ্কারি তাঁদের বাড়িতে এর আগে কখনও হয়নি। তার ওপর বাড়ির কর্তা হওয়ার জন্যে সবাই হন্যে হয়ে উঠেছেন। বরফের মতো নিতান্ত দরকারি জিনিসটাও আনিয়ে দেওয়ার কথা কারও হুঁশ হয়নি! হুঁশ থাকবে কী করে? গালগল্প মেরে সময় থাকলে তবে তো? কী বলবে নিমন্ত্রিত অতিথিরা? বাড়িতে বরফ নেই, অথচ ভোজ দিচ্ছেন জ্ঞাতিকুটুম্বদের।

আবার কী হল? কীসে এত হই চই? এ কী? পঙ্ক্তি ছেড়ে সবাই উঠে পড়ছেন কেন? ব্যাপার কী?

ফুলমতী আর নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকতে পারলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে কামতানাথকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে রে, খোকা? সবাই খাওয়া ফেলে উঠে যাচ্ছে যে?

কামতা কোনো জবাব দিল না, সেখান থেকে সরে পড়ল। ফুলমতী রাগ চেপে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হঠাৎ একটা কাহার বউকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, ঝোলে মরা ইঁদুর বেরিয়েছে। ফুলমতী চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে মনে ফুঁসে উঠছিলেন, দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছিল। হতভাগাগুলো ভোজ খাওয়াচ্ছে। এই রকম ধাষ্টামোর তুলনা মেলা ভার। কত লোকেরই না ধর্মনাশ হল। তাহলে আর পঙ্ক্তি ছেড়ে উঠবে না কেন? নিজের চোখে দেখার পর ধর্ম নষ্ট করতে কে চায়? হায় হায়, সব মাটি হয়ে গেল। এত টাকা সবটাই বরবাদ। তার ওপর আবার বদনাম।

অতিথিরা উঠে পড়লেন, পাতে খাবারগুলো তেমনি পড়ে রয়েছে। চার ছেলেই উঠোনের মধ্যে লজ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একে অন্যকে দোষারোপ করছে। বড়োবউ ছোটো জায়েদের বকাবকি করছে। জায়েরা সব দোষ কুমুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দায় সারছে। কুমুদ একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ফুলমতী তখন ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, মুখে চুনকালি পড়ল তো? না এখনও কিছু বাকি আছে? থুথু ফেলে ডুবে মরোগে যাও সব। শহরে আর মুখ দেখাবার জো থাকলনা।

ছেলেরা কেউ কিছু বলল না। ফুলমতী প্রচণ্ড রেগে বললেন, তোমাদের আর কী? কারও মধ্যে লজ্জাশরম নেই। সে বেচারির আত্মা কেঁদে মরবে। বংশের মানমর্যাদার জন্য যে মানুষটা নিজের জীবনটাই বরবাদ করে দিয়েছিলেন, তাঁর পবিত্র আত্মাকে তোমরা কলুষিত করেছ। শহরে সবাই ছিছিক্কার করছে। এরপর তোমাদের বাড়ি কেউ পেচ্ছাপ করতেও আসবে না।

কামতানাথ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শুনল, তারপর ঝেঁঝে বলল, বেশ! এবার তুমি চুপ করবে মা? ভুল হয়েছে, আমরা সবাই সে কথা স্বীকার করেছি। সত্যিই ভয়ংকর ভুলই হয়েছে; কিন্তু তা বলে বাড়ি সুখ সবাইকে কি তুমি জবাই করবে? ভুল সবারই হয়, মানুষ সে জন্য অনুতাপে দগ্ধ হয়; কিন্তু প্রাণে তো তাকে মারা হয় না।

বড়োবউ নিজের সাফাই গেয়ে বলল, আমরাই বা জানব কী করে যে বিবি (কুমুদ)-কে দিয়ে সামান্য কাজটুকুও হবার নয়। তার উচিত ছিল কড়াইয়ে তরকারি চড়াবার আগে ভালো করে দেখে নেওয়া। ঝুড়িসুদ্ধ তরকারি কড়াইয়ে চাপিয়েছে, এতে আমাদের অপরাধ কোথায়? কামতানাথ বউকে দাবড়ে বলল, এতে তোমারও দোষ নেই, কুমুদেরও দোষ নেই, আমারও নেই। এটা দৈবাৎ ঘটে গেছে। ভাগ্যে দুর্নাম লেখা ছিল, পেলাম। এতবড়ো যজ্ঞিতে কেউ এক এক মুঠো তরকারি চাপায় না, ঝুড়ি ঝুড়ি ঢালা হয়। এ ধরনের ঘটনাও কচিৎ কখনো হয়ে যায়, তা বলে লোক হাসানো বা বংশের মুখে চুনকালি পড়ার কী আছে? তুমি মিছিমিছি কাটা ঘায়ে নুন ছিটোচ্ছ, মা।

ফুলমতী দাঁত কড়মড় করে বললেন, লজ্জা তো পাচ্ছই না, তার ওপরে বেহায়ার মতো কথাবার্তা কইছ।

কামতানাথ নিঃসংকোচে বলল, লজ্জার কী আছে? চুরি তো আর করি নি। চিনির পিঁপড়ে আর আটার পোকা এ কী কেউ তাকিয়ে দেখে। আগে আমাদের চোখে পড়েনি এই জন্যই যত গন্ডগোল। চুপচাপ ইঁদুরটাকে তুলে ফেলে দিলে কেউ জানতেও পারত না।

ফুলমতী আশ্চর্য হয়ে বললেন, বলছ কী? মরা ইঁদুর খাইয়ে লোকের ধর্মনাশ করতে তুমি?

কামতা হেসে বলল, কোন যুগে পড়ে আছ, মা? ধর্ম এসবে যায় না। যে সব ধর্মাত্মা লোক আজ পাতা ছেড়ে উঠে গেলেন এদের মধ্যে একটা লোক দেখাও দেখি যে ভেড়া আর পাঁঠার মাংস খায় না? পুকুরের কচ্ছপ ও গুগলি পর্যন্ত এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। ইঁদুরে তাদের কী যায় আসে?

ফুলমতীর মনে হল প্রলয়ের আর বেশি দেরি নেই। শিক্ষিত লোকের মনে যদি এমন অধার্মিক ভাব আসে তাহলে ধর্মের রক্ষা ভগবান ছাড়া কে করবে। ফুলমতী নিরস্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

দুই

দু মাস কেটে গেছে। সারাদিনের কাজ ফুরোবার পর চার ভাইয়ে মিলে রাত্রিবেলা গল্পগুজব করছিল। বড়োবউও তাদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। কুমুদের বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছিল।

কামতানাথ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বলল, বাবার কথা বাবার সঙ্গেই চলে গেছে। মুরারি পণ্ডিত বিদ্বান এবং কুলীন হতে পারেন, কিন্তু যে লোক নিজের বিদ্যে এবং কুল টাকার বিনিময়ে বেচে সে অধম লোক। নীচ। এইরকম লোকের ছেলের সঙ্গে কুমুদের বিয়ে আমরা দেব না একটি পয়সা যদি না ঠেকাতে হয়, তবুও। পাঁচ হাজার টাকা পণের তো প্রশ্নই ওঠে না। ওদের মুখে ঝাঁটা মেরে অন্য পাত্র খুঁজতে হবে। আমাদের কাছে সর্বসাকুল্যে মাত্র কুড়ি হাজার টাকা আছে। এক এক জনের ভাগে পাঁচ হাজার করে পড়ছে। বরপণই যদি পাঁচ হাজার টাকা ধরে দিতে হয় আরও পাঁচ হাজার বিয়ের অন্যান্য খরচে যাবে—নহবত বসবে, আরও কত কী খরচ আছে—আমরা তো তাহলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।

উমানাথ বলল, ডাক্তারখানা খুলতে কম করেও আমার হাজার পাঁচকে টাকা দরকার। আমার অংশ থেকে এক পয়সাও আমি দিতে পারব না, আর ডাক্তারখানা খোলামাত্রই পয়সা ঘরে আসবে না। বছরখানেক অন্তত আমায় বসে খেতে হবে।

দয়ানাথ একটা খবরের কাগজ উলটেপালটে দেখছিল। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে বলল, 'আমার ইচ্ছে একটা পত্রিকা বার করি। প্রেস এবং পত্রিকার জন্য অন্তত পক্ষে দশ হাজার টাকার ক্যাপিটাল চাই। পাঁচ হাজার যদি আমি নিজে ঢালি, তাহলে বাকি পাঁচ হাজার টাকার একজন অংশীদার পাওয়া যেতে পারে। পত্রপত্রিকায় লিখে আমার পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব নয়।

কামতানাথ মাথা নেড়ে বলল, আরে ভাই, ভগবানের নাম নাও। লেখা বিনা পয়সাতেই কেউ ছাপতে চায় না, গাঁটের কড়ি দিয়ে কে ছাপবে?

দয়ানাথ প্রতিবাদ করে বলল, না, তোমার একথা ঠিক নয়। আগাম পারিশ্রমিক না নিয়ে লেখা আমি কোথাও দিই না। কামতানাথ নিজের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছে এমনভাবে বলল, আমি তোমার কথা বলছি না ভাই। তুমি না হয় অল্প কিছু পাও, কিন্তু সবাই তো আর তা পায় না।

বড়োবউ বেশ নম্রভাবে বলল, মেয়ে যদি ভাগ্যবতী হয় তাহলে গরিবের ঘরেও সে সুখে থাকে। যে অভাগী সে রাজার ঘরে গিয়েও কাঁদে। এ তো ভাগ্যের খেলা।

কামতানাথ স্ত্রীর দিকে প্রশংসার চোখে তাকাল তারপর বলল, তাছাড়া এ বছর সীতার বিয়েটাও দিতে হবে। সীতানাথ সবার ছোটো। মাথা নিচু করে ভাইদের স্বার্থপর কথাগুলো শুনতে শুনতে কিছু বলার জন্য সে ছটফট করছিল। নিজের নাম উঠতেই সে বলে উঠল, আমার বিয়ের চিন্তা আপনাদের করতে হবে না। যতদিন আমি উপার্জনক্ষম না হই, বিয়ের নাম আমি মুখে আনব না। আর সত্যি কথা বলতে, বিয়ে আমি করতেও চাই না। দেশের আর সন্তানের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে কর্মীর। আমার ভাগের টাকা আপনারা কুমুদের বিয়েতে খরচ করুন।

উমা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, দশ হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে?

সীতানাথ ভয় পেয়ে বলল, আমি তো আমার ভাগের টাকা দেওয়ার কথা বলেছি।

— আর বাকি টাকাটা?

মুরারিলালকে বলতে হবে যে বরপণের টাকা কিছু কম করুন। তিনি এমন স্বার্থপর লোক নন যে, এই রকম অবস্থায় তাঁর মন খানিকটা নরম হবে না। তিনি যদি তিন হাজার টাকায় সন্তুষ্ট হন, তাহলে পাঁচ হাজারে বিয়েটা হতে পারে।

উমা কামতানাথকে বলল, শুনলে তো দাদা, সীতার কথা? দয়ানাথ বলল, তা এতে আপনাদের কী ক্ষতি? ও নিজের অংশের টাকা দিতে চাইছে, আপনারা খরচ করুন। মুরারি পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। দেখছি আমাদের মধ্যে এমন কেউ একজন আছে যে ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখে। এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তাছাড়া, আপাতত ওর টাকাকড়ির প্রয়োজন নেই। সরকারি বৃত্তি পায়। পাস করলে কিছু না কিছু জুটে যাবেই। আমাদের অবস্থা তো ওর মতো নয়।

কামতানাথ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে বলল, আরে এর মধ্যে ক্ষতির কথা আসছে কোত্থেকে। আমাদের মধ্যে একজন যদি কষ্ট পায় তাহলে আমরা অন্যেরা কি বসে বসে দেখব? ও এখনও ছোটো, ও জানে না সময়ে এক টাকা, লাখ টাকার সমান কাজ দেয়। কে জানে যদি ভবিষ্যতে বিলেত যাবার জন্য ও সরকারি বৃত্তি পায় বা সিভিল সার্ভিসে মনোনীত হয়, তাহলে বিলেত যাবার জন্য যাত্রার আয়োজনেই চার-পাঁচ হাজার টাকা লেগে যাবে। তখন কার কাছে হাত পাতবে ও? আমি চাইনা, কুমুদের বরপণের জন্য ওর জীবনটা বরবাদ হয়ে যাক। কামতানাথের এই যুক্তি সীতানাথকেও দ্বিধায় ফেলে দিল। একটু সংকুচিত ভাবে সে বলল, হ্যাঁ, সে রকম যদি কিছু হয়, তাহলে আমারও টাকার দরকার পড়বে।

— এমন ঘটা খুব কি একটা অসম্ভব?

— অসম্ভব বলে আমি মনে তো করি না, তবে কঠিন নিশ্চয়ই। যাদের বলাকওয়ার লোক আছে, বৃত্তি তারাই পায়। আমায় কে পোঁছে?

— কখনও কখনও ধরা-কওয়াতেও কিছু হয় না, এমনিই বাজিমাত হয়ে যায়।

— তাহলে আর আমার বলার কী আছে? যা আপনারা বিবেচনা করবেন, করবেন। তবে আমি চাই, বিলেত যাওয়া যদি আমার নাও হয়, তবু কুমুদ যেন ভালো ঘরে পড়ে। কামতানাথ আত্মবিশ্বাসের সুরে বলল, ভালো ঘর কি শুধু ভালো রকম বরপণ দিলেই পাওয়া যায়? তোমার বউদি এই মাত্র বললেন, যে এ সবই হল ভাগ্যের খেলা। আমার তো মনে হয়, মুরারিলালকে নিষেধ করে দেওয়াই ভালো। তার বদলে এমন ঘর-বর খোঁজা হোক যাদের খাঁই অল্প। কুমুদের বিয়েতে এক হাজার টাকার বেশি আমি খরচ করতে পারব না। পণ্ডিত দীনদয়াল কেমন? তোমাদের কী মনে হয়? উমানাথ খুশি হয়ে বলল, খুব ভালো। বি এ, এম এ পাশ না হতে পারে, যজমানি করে বেশ আয় করে। দয়ানাথ আপত্তি জানিয়ে বলল, মাকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত।

কামতানাথ মাকে জিজ্ঞেস করা ঠিক প্রয়োজন মনে করল না। বলল, মার বুদ্ধিনাশ হয়েছে মনে হয়। মা সেই পুরোনো আমালের কথা তুলবেন। যেন মুরারিলালের নামে টাকা ধার করে বসে আছেন। মা বোঝেন না যে, যুগ পালটে গেছে। মা চান, যেমন করেই হোক, কুমুদের বিয়ে

যেন মুরারি পণ্ডিতের ছেলের সঙ্গেই হয়, তাতে যদি আমাদের সর্বনাশও হয় সেও আচ্ছা। উমানাথ নিজের আশঙ্কা প্রকাশ করে বলল, মার নিজের সব গয়না কুমুদকে দিয়ে দেবেন, এ তোমরা দেখে নিয়ো। কামতানাথের স্বার্থপরতা এই দুর্নীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর পেরে উঠল না, বলল, গয়নার ওপর মার সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার। এটা তাঁর স্ত্রীধন। যাকে ইচ্ছে তাকে মা দিতে পারেন।

উমা বলল, স্ত্রীধন তো কী হয়েছে? স্ত্রীধন বলেই কি তা উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবেন নাকি? আর সে তো বাবারই রোজগারের টাকায়।

— টাকা যারই হোক, স্ত্রীধনের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার মার।

— এসব হল, আইনের প্যাঁচ। কুড়ি হাজার টাকার অংশীদার চার চার জন আর দশ হাজার টাকার গয়না মার শুধু একলার? দেখে নিয়ো, ওই গয়নার জোরেই মুরারি পণ্ডিতের ছেলের সঙ্গে মা কুমুদের বিয়ে দেবেন। এত টাকার সম্পত্তি, উমানাথ সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। কূট-বুদ্ধিতে সে বেশ দড়। ভাবল, কোনো একটা ফিকির করে সে মার গয়নাগাটি হাতিয়ে নেবে, আর যতক্ষণ তা না পারছে ততক্ষণ কুমুদের বিয়ে নিয়ে মাকে ঘাঁটাবে না।

কামতানাথ মাথ নেড়ে বলল, না ভাই, এ ধরনের ধাপ্পাবাজি আমার পছন্দ নয়।

উমানাথ ঝেঁঝে বলল, গহনাগুলো দশ হাজার টাকার কম কিছুতেই নয়।

কামতানাথ অবিচলিত ভাবে বলল, যত টাকারই হোক না কেন, অন্যায়ের সঙ্গে আপস আমি করব না।

— ঠিক আছে, আপনি পৃথক থাকুন, পরে কিন্তু বখরা চাইবেন না।

— না, আমি আলাদাই থাকব। সীতা, তোমার কী মত বলো?

— আমিও আলাদা থাকতে চাই।

কিন্তু দয়ানাথকে এই একই প্রশ্ন করাতে, সে উমানাথকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেল। দশ হাজারের মধ্যে অন্তত পক্ষে আড়াই হাজার টাকা সে পাবে নিশ্চিত · এতগুলো টাকার জন্য যদি কোনো ছলচাতুরি করতেই হয় তা অমার্জনীয় নয়।

তিন

রাতের খাবার খেয়ে ফুলমতী বিছানায় শুয়েছিলেন। উমা আর দয়া মায়ের কাছে গিয়ে বসল। দুজনেরই মুখ এমন শুকনো যেন কী একটা বিপদেই না পড়েছে। ফুলমতী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা খুব ঘাবড়ে গেছ মনে হচ্ছে, কী, ব্যাপার কী?

উমা মাথা চুলকে বলল, খবরের কাগজে কিছু লেখা বড়ো বিপজ্জনক মা। যতই বুঝেসুঝে লেখোনা কেন কোথাও না কোথাও ঠিক ধরা পড়ে যাবে। দয়ানাথ একটা লেখা লিখেছিল। তার ওপর পাঁচ হাজার টাকার মুচলেকা দিতে হবে। কালকের মধ্যে যদি না দেওয়া হয়, দয়ার হাতে হাতকড়া পড়বে, অন্ততপক্ষে দশ বছর জেল খাটতে হবে ওকে।

ফুলমতী মাথা চাপড়ে বলে উঠলেন, এমন লেখা কেন লিখিস, বাপ? তুই জানিস না এখন আমাদের দুর্দিন চলছে? জামিন আপাতত স্থগিত করা যায় না?

দয়ানাথ অপরাধী মুখ করে জবাব দিল, সেরকম কিছু তো আমি লিখিনি, মা। ভাগ্যই আমার বিরূপ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এমনই কড়া লোক, কাউকে খাতির করেন না। দৌড়াদৌড়ি আমি কম করিনি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

— তা, তুমি কামতাকে বলোনি টাকা পয়সার জোগাড় করতে?

উমা ঠোঁট উলটে বলল, ওর স্বভাব তোমার কি অজানা, মা? টাকা ওর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। এর কালাপানিই হোক আর যাই হোক, সে এক পয়সা দেবে না।

দয়ানাথ সায় দিয়ে বলল, আমি আদৌ তাকে কোনো কথা জানাইনি।

ফুলমতী খাট থেকে নামতে নামতে বললেন, আচ্ছা চল। আমি নিজে গিয়ে বলছি। দেবে না কেন? টাকাকড়ি অসময়ের জন্যই, পুঁতে রাখার জন্য নয় নিশ্চয়ই।

উমানাথ মাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, না মা, দাদাকে কিছু বলার দরকার নেই। টাকা তো দেবেই না বরং চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। নিজের চাকরি বাঁচাতে হয়তো ভাইকে বাড়ি থেকে দূরই করে দেবে। অফিসারদের কানে যদি কথাটা তুলে দেয়, আমি অবাক হব না।

অসহায় ফুলমতী বললেন, তাহলে জামিনের কী ব্যবস্থা করবে? আমার কাছে তো কিছুই নেই, অবশ্য আমার গয়নাগুলো আছে, তা সে গুলোই না হয় নিয়ে যাও, কোথাও বাঁধা রেখে জামিন দিয়ে এসো। আর আজ থেকে নাকে-কানে খত দাও যে কোনো পত্রপত্রিকায় একটা অক্ষরও তুমি লিখবে না।

দয়ানাথ নিজের কানদুটো ধরে বলে উঠল, তোমার গয়না বাঁধা দিয়ে নিজেকে বাঁচাব, এ হয় না মা, এ আমি পারব না। দশ বছর যদি জেল খাটতে হয়, তাই খাটব। এখানে বসে থেকেই বা কী করছি।

ফুলমতী বুক চাপড়ে বলে উঠলেন, এ কী কথা মুখ দিয়ে বার করছিস, বাছা? আমি বেঁচে থাকতে কে তোকে গ্রেফতার করে দেখি? তার মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেব না। গয়নাগাঁটি লোক অসময়ের জন্যই তুলে রাখে। তোরাই যদি না রইলি, গয়নাগুলো কি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার জন্য থাকবে?

ফুলমতী গয়নার বাক্সটা এনে ছেলের সামনে রাখলেন।

দয়ানাথ উমানাথের দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তোমার কী মত, দাদা? এই জন্যই আমি বলেছিলাম, মাকে কিছু জানাবার দরকার নেই। না হয় জেলই হত; তার বেশি তো কিছু নয়।

উমা যেন মায়ের দিক টেনে বলল, তা কী করে হয়? এত বড়ো একটা ঘটনা, আর মাকে মোটে বলাই হবে না? এ আমি পারতাম না। তবে এখন কী করণীয় তা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, কার দিকে রায় দিই। তুমি জেলে যাবে, সেও যেমন ভালো লাগছে না, তেমনি মায়ের গয়নাগুলোও বাঁধা দিতে মন সায় দিচ্ছে না।

ফুলমতী ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, তোমরা কি ভাব এই গয়নাগুলো আমার কাছে তোমাদের চেয়েও প্রিয়? তোমাদের জন্য প্রাণটাও তো দিতে পারি, গয়নার মূল্যই বা কী?

দয়ানাথ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, মা, তোমার গয়না আমি কিছুতেই নেব না, আমার যা হবার হবে। আজ পর্যন্ত তোমার কোনো সেবাই করিনি। আজ কোন মুখে নিজের দরকারে

তোমার গয়না নিই? আমার মতো কুসন্তানের তোমার কোলে জন্ম নেওয়াই উচিত হয়নি। শুধু কস্ট দিয়ে এলাম।

ফুলমতী অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে বললেন, তুমি যদি না নাও, আমি নিজে গিয়ে বাঁধা দিয়ে আসব, তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে জামিন জমা দেব। যদি ইচ্ছে থাকে এ পরীক্ষাও করে দেখতে পার। চোখবোজার পর কী হবে ভগবান জানেন; তবে যতদিন বেঁচে আছি তোমাদের গায়ে আঁচ লাগতে দেব না।

উমা যেন মায়ের প্রতি দয়াপরবেশ হয়ে বলল, নাও দয়ানাথ, আর আমাদের রাস্তা কী রইল বলো? ক্ষতি কী? নাও না। কিন্তু মনে রেখো যখন টাকা হাতে আসবে, গয়নাগুলো ছাড়াতে হবে। সত্যি বলছি, মাতৃত্ব এক দীর্ঘ তপস্যা। মা ছাড়া এমন স্নেহ আর কে দিতে পারে? আমরা বড়ো অভাগা, মায়ের প্রতি যতটা শ্রদ্ধা ভক্তি রাখা উচিত তার সিকিভাগও আমাদের নেই।

দুই ভাই যেন বড়োই আধ্যাত্মিক সংকটের মধ্যে পড়ে গয়নার বাক্সটা নিয়ে চলল। মা বাৎসল্যে ভরা চোখ দুটি তুলে ছেলেদের যাওয়ার পথে চেয়ে রইলেন, আত্মার অন্তঃস্থিত আশীর্বাদের মতো ওদের কোলে তুলে নেবার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল। আজ কমাস পরে ফুলমতীর ভগ্ন মাতৃহৃদয় নিজের সর্বস্ব অর্পণ করে দিয়ে যেন আনন্দের প্রাচুর্যে বিভোর হয়ে রইল। তাঁর মালিকানি স্বত্ব যেন এই রকম ত্যাগ ও আত্মসমর্পণের জন্য পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। অধিকার-বোধ, লোভ বা মমতার কোনো স্বার্থগন্ধ সেখানে ছিল না। ত্যাগেই তাঁর অধিকার, ত্যাগেই তাঁর আনন্দ। আজ নিজের হারানো অধিকার পেয়ে, নিজেরই সৃষ্ট পুত্তলির জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করে ফুলমতী যেন ধন্য হয়ে গেলেন।

চার

এর পরে আরও তিন মসে কেটে গেছে। মার গয়না হাতিয়ে নেবার পর থেকে চার ভাইই মার মন যাতে খুশি থাকে সে ব্যাপারে সচেস্ট হয়ে রইল। নিজের নিজের বউদেরও বুঝিয়ে বলে দিল, দেখো মার মনে যেন দুঃখ দিয়ো না। একটু ভাল ব্যবহার পেলে যদি তিনি খুশি হন, শান্তি পান তো ক্ষতি কী?

চার ভাই যে যার নিজের মর্জি মাফিক চলে, কিন্তু ইদানীং মায়ের পরামর্শটি সব ব্যাপারে নেয়; কিংবা এমন জাল বোনে যে সরলা মা তাদেরই কথায় সায় দিয়ে সে কথা মেনে নেন। বাগানটা বন্দোবস্তে দেওয়ায় ফুলমতীর মত ছিল না, কিন্তু চার ভাই মিলে এমনভাবে বোঝাল যে বন্দোবস্ত দিতে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। শুধু একটা ব্যাপারে, কুমুদের বিয়ের ব্যাপারে, ফুলমতী মত পালটালেন না। তিনি মুরারি পণ্ডিতের ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর, আর ছেলেরা দীনদয়ালের সঙ্গে। এই নিয়ে একদিন পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধল।

ফুলমতী বললেন, বাপ-মায়ের উপার্জনে বা সম্পত্তিতে মেয়েদেরও অংশ থাকে। তোমরা ষোলো হাজার টাকার বাগান পেলে, পঁচিশ হাজার টাকার বাড়ি পেলে, কুড়ি হাজার টাকা নগদ পেলে, এত টাকার মধ্যে কুমুদের কী পাঁচটা হাজার টাকাও পাওনা নয়?

কামতানাথ নম্রভাবে বলল, মা, কুমুদ তোমার মেয়ে, আমাদের বোন। তুমি দু-চার বছর পর চোখ বুজবে; কুমুদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বহুদিন থাকবে, তখন যথাসাধ্য চেস্টা করব, যাতে

তার কোনো অসম্মান না হয়, কিন্তু যদি দাবিদাওয়ার কথা তোল, তাহলে বলতেই হচ্ছে কুমুদের কোনো অধিকার নেই। বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন, তখনকার কথা আলাদা, তিনি ইচ্ছে করলে কুমুদের বিয়েতে যা খুশি খরচ করতে পারতেন, কেউ তার হাত চেপে ধরত না; কিন্তু এখন আমাদের এক-একটা পয়সা বুঝেশুনে খরচ করতে হয়। যে কাজ এক হাজার টাকায় হতে পারে, তার পিছনে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

উমানাথ শুধরে দিয়ে বলল, পাঁচ হাজার টাকা বলছ কেন? টাকা তো দশ হাজারের কাছাকাছি লাগবে।

কামতা ভ্রূ কুঁচকে বলল, না, আমি পাঁচ হাজারই বলব। একটা বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকার বেশি খরচ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

ফুলমতী জেদের সঙ্গে বললেন, বিয়ে মুরারিলালের ছেলের সঙ্গেই হবে তা পাঁচ হাজার টাকাতেই হোক বা দশ হাজার। উপার্জন আমার স্বামীর। আমি মরে মরে, প্রাণপাত করে টাকা জমিয়েছি, খরচ আমি আমার ইচ্ছেমতো করব। তোমরাই শুধু আমার পেটে জন্মাওনি, কুমুদও আমার কোলেই ভূমিষ্ট হয়েছে। আমার চোখে তোমরা সবাই এক। কারও কাছে আমি কিছু চাই না। তোমরা বসে বসে তামাশা দেখ, আমিই সব ব্যবস্থা করব। নগদ কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা কুমুদের। এবার কামতানাথের পক্ষে নিষ্ঠুর সত্যের শরণ নেওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। বলল, তুমি না হক কথা বাড়াচ্ছ, মা। যে টাকাকে তুমি নিজের বলে ভাবছ তা আর আজ তোমার নয়। ও টাকা আমাদের। আমাদের অনুমতি ছাড়া সে টাকা তুমি খরচ করতে পার না।

ফুলমতীকে যেন সাপে কামড়েছে, বললেন, কী বললে? আবার বলো? আমারই সঞ্চিত টাকা নিজের ইচ্ছেয় আমি খরচ করতে পারব না?

— ও টাকা এখন আর তোমার নয়, আমাদের।

— হতে পারে তোমাদের, কিন্তু আমার মরার আগে নয়।

— না, তা নয়; বাবার মৃত্যুর পরই তা আমাদের হয়ে গেছে।

উমানাথ বেহায়ার মতো বলে উঠল, আইনকানুনের মা কিছুই জানে না। খামোখা ঝামেলা করছে।

ফুলমতী ক্রোধে বিহ্বল হয়ে বলে উঠলেন, জাহান্নমে যাক তোমাদের আইন। এ আইন আমি মানি না। তোমাদের বাবা এমন ধনী লোক ছিলেন না। আমিই পেটে কিল মেরে, না খেয়েপরে এই সংসারটাকে জিইয়ে রেখেছি, নইলে মাথার ওপর ছাতটুকুও জুটত না। আমি বেঁচে থাকতে আমার টাকায় তোমরা হাত দিতে পারবে না। তোমাদের তিন ভাইয়ের বিয়েতে আমি দশ হাজার করে টাকা খরচ করেছি, কুমুদের বিয়েতেও আমি তাই করব।

কামতানাথও মেজাজ গরম করে বলল, খরচ করার অধিকার তোমার নেই।

উমানাথ বড়ো ভাইকে তিরস্কার করে বলল, তুমি শুধু শুধু মার সঙ্গে তর্ক করছ, দাদা। মুরারিলালকে চিঠি দিয়ে দাও যে, তাঁর ঘরে কুমুদের বিয়ে আমরা দিতে পারব না। ব্যস, এত বাগ্‌বিতণ্ডার দরকার কী? মা আইনকানুন কিছুই জানে না, শুধু বাজে তক্কো।

ফুলমতী নিজেকে সংযত করলেন। সামলে নিয়ে বললেন, বেশ তো, তোমাদের আইন কী বলে তাই শুনি?

উমা নিরীহ স্বরে বলল, আইনে বলে পিতার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে ছেলেদের অধিকার। মা শুধু ভাতকাপড়ের অধিকারী।

ফুলমতী আর্তভাবে বললেন, এ আইন কে করেছে?

উমা শান্ত স্থির গলায় বলল, আমাদের মুনিঋষিরা। মহারাজ মনু এই বিধান করে গেছেন, আবার কে?

ফুলমতী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপর আহত কণ্ঠে বললেন, তাহলে এ বাড়িতে তোমাদের হাততোলা দুমুঠো অন্নের জন্য আমি পড়ে রয়েছি?

উমানাথ নির্মমতার সঙ্গে বলল, সে তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পার।

এই আকস্মিক ব্যাপারে ফুলমতীর সম্পূর্ণ অন্তরাত্মা যেন উচ্চ স্বরে হাহাকার করে উঠল। আগুনের ফুলকির মতো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ঘরবাড়ি আমি তৈরি করালাম, এক-একটি পয়সা বাঁচিয়ে সম্পত্তি করেছি, তোমাদের সবাইকে জন্ম দিয়েছি, লালনপালন করেছি, আর আজ এ বাড়িতে আমিই হলাম পর? মনু এই আইন করে গেছেন, আর সেই আইনের পথ ধরে তোমরা চলতে চাইছ? বেশ ভালো কথা। তোমাদের ঘরসংসার তোমাদেরই থাকুক। তোমাদের আশ্রিত হয়ে থাকতে আমি রাজি নই। এর চেয়ে মরে যাওয়া ঢের বেশি শ্রেয়। গাছ পুঁতলাম আমি, আর তার ছায়াটুকুতে দাঁড়াবার আমার জো নেই? এই যদি আইন নয়, তা অমন আইনের মুখে ছাই।

চার-চারটি যুব সন্তানের মনে মায়ের এই ক্রোধ ও মনস্তাপের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। আইনের রক্ষাকবচ তাদের রক্ষা করছিল; এই সামান্য বাক্যের কাঁটা তাদের বিঁধবে কেমন করে?

একটুক্ষণ পরে ফুলমতী সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। জীবনে আজ প্রথম তাঁর বাৎসল্য, ভগ্ন মাতৃত্ব অভিশাপ হয়ে যেন তাঁকে ধিক্কার দিতে লাগল। যে মাতৃত্বকে তিনি জীবনের বৈভব বলে মনে করতেন, যে সন্তানস্নেহের কাছে তিনি সর্বদাই নিজের সমস্ত ইচ্ছা, অভিলাষ, সুখসাধ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন, সেই মাতৃত্বকেই আজ তাঁর একটা অগ্নিকুণ্ডের মতো মনে হচ্ছে। এই অগ্নিকুণ্ডে পড়ে জীবনটা তাঁর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

সন্ধে হয়ে এসেছে, দরজার সামনে নিমগাছটা মাথা নিচু করে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে যেন মনে হয়, পৃথিবীর হালচাল দেখে সে মনক্ষুণ্ণ। জীবনদাতা দেবতা সূর্য অস্তাচলের পথে। যেন ফুলমতীর মাতৃত্বের মতোই নিজের চিতায় জ্বলছে।

পাঁচ

নিজের ঘরে গিয়ে ফুলমতী শুয়ে পড়লেন। মনে হচ্ছে বুঝি-বা তাঁর কোমরটাই ভেঙে গেছে। স্বামী মারা যেতে না যেতেই পেটের সন্তানেরা শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, এ কথা যে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ছেলেদের তিনি বুকের রক্ত খাইয়ে মানুষ করেছেন, তারাই এখন বুকে আঘাত হানছে। এ ঘরবাড়ি আজ তাঁর কাছে কাঁটার শয্যা হয়ে উঠেছে। এখানে ফুলমতীর কোনো কদর নেই,

ফুলমতী কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়; অনাথিনী আশ্রিতার মতো দুবেলা দুমুঠো অন্ন মুখে তোলা অভিমানী স্বভাবের ফুলমতীর কাছে অসহ্য।

কিন্তু উপায়ই বা কী? ছেলেদের থেকে যদি পৃথক হয়ে যান তাহলেও সে লজ্জা তাঁরই। লোকে তাকে ছিছিক্কার করুক, আর ছেলেদেরই ধিক্কার দিক, দুর্নাম তো তাঁরই। লোকে বলবে, চার-চারটে জোয়ান ছেলে থাকতে বুড়ি খেটে খুঁটে দুটো আলাদা ফুটিয়ে খাচ্ছে। যাদের তিনি এতদিন ছোটোলোক ইতর ভেবে এসেছেন তারাও আজ তাঁর দুর্দশা দেখে হাসাহাসি করবে। না না, সে অপমান এ অনাদরের চেয়ে অনেক বেশি মর্মবিদারক। নিজের এবং সংসারের যথার্থ অবস্থা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকুক, এতেই মঙ্গল। তবে হ্যাঁ, এবার নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে তিনি মানিয়ে নেবেন। অবস্থা ঘুরে গেছে। এতদিন সর্বেসর্বা গৃহিণী হয়ে ছিলেন, এখন ঝি-এর মতো থাকতে হবে। ভগবানের এই মর্জি। তবু অন্যলোকের খোঁটা আর লাথিঝাঁটার চেয়ে, পেটের ছেলের খোঁটা আর লাথিঝাঁটাও ভালো।

অনেকক্ষণ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে নিজের দুর্দশার কথা ভেবে কাঁদলেন ফুলমতী। সারাটা রাত মনোদুঃখে কাটালেন তিনি।

শরতের সকাল ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল, যেন জেলভাঙা কোনো কয়েদি চুপিসাড়ে পালিয়ে এসেছে। ফুলমতী আজ নিয়মছাড়া ভোরবেলাতেই উঠে পড়েছেন। সারা রাত তাঁর মনের রদবদল ঘটে গেছে। বাড়িসুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে, তিনি উঠোনটা ঝাঁট দিয়ে ফেললেন। রাতভর হিম পড়েছে। শানবাঁধানো পাকা উঠোন ফুলমতীর খালি পায়ে কাঁটার মতো ফুটছে। স্বামী যতদিন বেঁচেছিলেন কোনোদিনই শীত সহ্য করতে পারেননি। আজ সে দিন আর নেই। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের প্রকৃতিটাকেও তিনি বদলে ফেলতে চাইছিলেন। উঠোন ঝাঁট দিয়ে তিনি উনুনে আগুন দিলেন, তারপর চালডাল বার করে নিয়ে কাঁকর বাছতে বসলেন।

একটু পরে ছেলেরা সব ঘুম থেকে উঠল, বউরাও। সবাই দেখল, শীতে কুঁকড়ে বুড়ি কাজ করে চলেছে; কিন্তু কেউ এসে একবারটি বললনা, তুমি কেন এমন ব্যস্ত হয়েছ, মা? বুড়ির মান যে গেছে সবাই হয়তো এতে খুশি।

আজ থেকে ফুলমতী নিয়ম করে ফেললেন, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবেন আর প্রাণপণ চেষ্টায় সব ব্যাপার থেকে নিজেকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখবেন। তার মুখখানিতে এতদিন একটা আত্মগৌরবের ছটা দেখা যেত, আজ তার বদলে কী গভীর বেদনার বিষণ্ণতা মাখানো! ছিন্ন বিদ্যুতের দীপ্তি, তার জায়গায় মাটির প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলছে। সামান্য একটু বাতাস লেগে হয়তো বা নিভেই যাবে।

মুরারিলালকে চিঠি লিখে কুমুদের সম্বন্ধটা ভেঙে দেওয়ার কথা পাকাপাকি হয়েই ছিল, পরের দিনই চিঠি লিখে খবরটা জানিয়ে দেওয়া হল। দীনদয়ালের বয়স প্রায় চল্লিশ পেরিয়েছে। তবু তারই সঙ্গে কুমুদের বিয়ে। বংশমর্যাদায়ও এ বাড়ির চেয়ে সে খাটো, কিন্তু অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। হেসে খেলে, খেয়েপরে দিন যাবে। দীনদয়ালের পরিবারবর্গ তক্ষুনি বিয়েতে মত দিলেন। দিন ঠিক হল, বর ও বরযাত্রীরা এল, বিয়েও হল, কুমুদও পরের ঘরে বিদায় নিল। ফুলমতীর মনের অবস্থা যে কী এ খবর কেই বা রাখে? চার ভাই কিন্তু বেশ খুশি, বুকের ভার নেমে গেছে। অভিজাত বংশের মেয়েরা সহজে মুখ খুলতে পারে না। ভাগ্যে যদি সুখ থাকে সুখ পাবে, কপালে

দুঃখ থাকলে ভোগ করতেই হবে। 'ভগবানের যা ইচ্ছা' — অসহায় লোকেদের সম্বল তো এই। বাড়ির লোকেরা যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, হাজার দোষ থাকুক, সেই স্বামীই তার উপাস্যদেবতা, প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ অকল্পনীয়।

ফুলমতী কোনো কাজেই নাক গলাননি। কুমুদকে কী দেওয়া হয়েছে বা অতিথিদের কী রকম আপ্যায়ন করা হয়েছে, কার বাড়ি থেকে কী কী উপহার এসেছে, কোনো ব্যাপারেই তিনি নেই। কেউ তাঁর কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এলে বললেন, তোমরাই তো সব করছ, বাবা। ভালোই করছ। আমাকে আর কেন জিজ্ঞেস করা?

মেয়ে বিদায়ের সময় যখন পাল্কি দোরে এসে দাঁড়াল, মায়ের বুকে মাথা রেখে কুমুদ অনেক কাঁদল। মেয়েকে নিয়ে ফুলমতী নিজের ঘরে গেলেন, আর পঞ্চাশ কি একশো টাকা, যা ক্ষুদকুঁড়ো তাঁর কাছে ছিল, সামান্য কয়েকটা হালকা গয়না, মেয়ের আঁচলে দিয়ে বললেন, মা আমার মনের বাসনা মনেই রয়ে গেল, নইলে তোমার বিয়ে কি আজ এভাবে হবার কথা? এভাবেই কি তোমায় শ্বশুরবাড়ি পাঠাতাম?

আজ পর্যন্ত গয়নার ব্যাপারটা ফুলমতী কাউকে জানায়নি। ছেলেরা তাঁর সঙ্গে যে চাতুরি করেছে তা তিনি আজ না বুঝলেও, এটা বুঝতে পেরেছিলেন, গয়না আর তিনি ফিরে পাবেন না। মনোমালিন্য করা ছাড়া আর কিছু বাড়তি লাভ নেই; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ কথা খুলে বলার সময় হয়েছে। কুমুদ যদি এই মনোভাব নিয়ে এখান থেকে যায় যে, মা নিজের গয়নাগুলো ছেলের বউদের জন্য তুলে রেখেছে, মা হয়ে এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না। সেই জন্যই মেয়েকে তিনি নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন; কিন্তু কুমুদ ভাইদের কলকাঠি আগে থেকেই সব জানত। আঁচল খুলে গয়না আর টাকা বার করে মায়ের পায়ের কাছে রেখে সে বলল, মা, তোমার আশীর্বাদ আমার কাছে লাখটাকার সমান। এগুলো তুমি নিজের কাছেই রাখ। এবার তোমায় আর কোন্ কষ্টের মুখে পড়তে হয় কে জানে?

ফুলমতী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

উমানাথ এসে বলল, কী করছ, কুমুদ? একটু তাড়াতাড়ি করো। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে, ওঁরা অস্থির হয়ে উঠেছেন। দু-চার মাস পরে তো আবার আসছই, দেওয়ানেওয়ার কাজটা তখন সেরো।

ফুলমতীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে পড়ল। বললেন, আমার কাছে আর কী আছে, বাবা, যে দেব? যাও মা, ভগবান সিঁথের সিঁদুর তোমার অক্ষয় করুন।

কুমুদের বিদায়ের পালা চুকলে ফুলমতী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। জীবনের প্রতি শেষ আকর্ষণটুকুও তাঁর শেষ হয়ে গেল।

ছয়

এক বছর পরের কথা। ফুলমতীর ঘরখানি অন্যান্য ঘরের চেয়ে বড়ো ও হাওয়াদার। আজ কমাস হল বউয়ের জন্য ঘরখানি তিনি খালি করে দিয়ে নিজে ছোট্ট একটা কামরায় ভিখারিনির মতন থাকতে শুরু করেছেন। ছেলে আর ছেলের বউদের ওপর আর তাঁর কোনো টান ছিল না; তিনি এখন বাড়ির ঝি। বাড়ির কোনো লোক, কোনো বস্তু, কোনো জিনিসেরই আর তাঁর কোনো

প্রয়োজন নেই। মৃত্যুর ডাক আসছে না বলেই তাঁকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। সুখদুঃখের অনুভূতি আর নেই তাঁর।

উমানাথ নতুন ডাক্তারখানা খুলল। বন্ধুবান্ধবদের ডেকে খাওয়ানো দাওয়ানো হল, নাচগান, ফুর্তি সবই হল। দয়ানাথও প্রেস খুলল। বাড়িতে আবার জলসা হল সেই উপলক্ষে। সীতানাথ বৃত্তি পেয়ে বিলেত গেল, বাড়িতে আবার উৎসব হল।

কামতানাথের বড়ো ছেলের উপনয়ন খুব ধুমধামের সঙ্গে হল, কিন্তু ফুলমতীর মুখে হাসির বাষ্পটুকুও দেখা গেল না। এরই মধ্যে কামতানাথ টাইফয়েড জ্বরে মাসখানেক ভুগে মরণাপন্ন হয়ে সেরে উঠল।

দয়ানাথ পত্রিকার প্রচারের জন্য এবার সত্যিই একটা আপত্তিজনক লেখা লিখে ছয় মাসের জেল খাটছে। এক ফৌজদারি মামলায় ঘুষ খেয়ে ভুল রিপোর্ট লেখার দরুন উমানাথের ডাক্তারির লাইসেন্স গেল। কিন্তু ফুলমতীর চেহারায় কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। তাঁর জীবনে আজ আর কোনো আশা, আগ্রহ বা রুচি নেই। নির্বোধ জানোয়ারের মতো খাটেন আর দুবেলা দুমুঠো খান। জীবনের এ দুটোই যেন তাঁর একমাত্র কাজ। মার খেয়ে জানোয়ার কাজ করে, কিন্তু খায় নিজের মর্জিতে। কিন্তু ফুলমতী কাজ করতেন নিজের মনে আর খেতেন বিষ গেলার মতো। মাসের পর মাস চুলে একফোঁটা তেল পড়ত না, কাপড় কাচা হত না—কিছুই আসে যায় না তাঁর। ফুলমতী যেন চেতনাশূন্য এক জীব।

শ্রাবণ মাসের বর্ষামুখর দিন। চারিদিকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, আকাশে ধোঁয়াটে মেঘ, মাটিতে ঘোলাটে জল। বর্ষাকালের ভিজে স্যাঁতসেতে বাতাস সর্দিকাশি, শীতজ্বর ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বাড়ির চাকরানিটি এই আবহাওয়ায় অসুখে পড়ল। ফুলমতী সংসারের সমস্ত এঁটো বাসনগুলো মেজে তুললেন, জলে ভিজে ভিজে সব কাজ করে বেড়ালেন, তারপর উনুন ধরিয়ে ডেকচিতে রান্না চাপালেন। ছেলেদের সময়মতো খাবার তো চাইই। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, কামতানাথ কলের জল খায় না। সেই প্রচণ্ড বর্ষায় ফুলমতী গঙ্গা থেকে জল তুলে আনতে বেরিয়ে গেলেন।

কামতানাথ পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে বলে উঠল, থাক মা, জল না হয় আজ আমি নিজেই নিয়ে আসব খন। ঝিটা আজ না এসে আচ্ছা জব্দ করেছে।

ঘোলাটে আকাশের দিকে চেয়ে ফুলমতী বললেন, তুমি ভিজে গেলে সর্দি হবে যে, বাবা।

কামতানাথ বলল, তুমিও তো ভিজছ? যদি অসুখ করে?

ফুলমতী নির্মমভাবে বললেন, অসুখ আমার করবে না। ভগবান যে আমায় অমর করে পাঠিয়েছেন রে।

উমানাথও সেখানেই বসে ছিল। ওর ওষুধের দোকান তেমন চলছিল না। সে কারণে সে বেশ চিন্তিত থাকত, দাদা-বউদির দিক টেনে কথা বলত। আজও তাদের হয়ে বলল, যেতে দাও না, দাদা। বউদের ওপর অনেকদিন রাজত্ব করেছে, অন্তত প্রায়শ্চিত্তটা করতে দাও।

সাত

ভরা বর্ষায় গঙ্গা সমুদ্রের মতো বিশাল আকার নিয়েছে। কোনটা আকাশ, কোনটা ওপার কিছুই ঠাহর হয় না। নদীতীরের গাছগুলির আগাটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে। ঘাটগুলি সব ডুবে গেছে।

ফুলমতী কলসি নিয়ে নীচে নামলেন, জল ভরে ওপরে উঠতে যাবেন, পা পিছলে গেল। সামলাতে পারলেন না, জলের মধ্যে পড়ে গেলেন। ক্ষণিকের জন্য হাত-পা ছুঁড়লেন, কিন্তু জলের তীব্র স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে টেনে নিয়ে গেল। দু-চার জন পান্ডাগোছের লোক তীর থেকে চেঁচালেন, আরে ধরো ধরো, বাঁচাও, বুড়ি ডুবে যাচ্ছে। দু-চারজন ছুটেও গেল, কিন্তু ফুলমতী ততক্ষণে স্রোতের তলায় তলিয়ে গেছেন। স্রোতস্বিনী গঙ্গার তীব্র, ফেনিল জলরাশির দিকে তাকালে বুকে কাঁপন ধরে।

কে একজন বলল, এ কোন বুড়ি রে?

— আরে সেই যে সেই পণ্ডিত, অযোধ্যানাথের বিধবা।

— অযোধ্যানাথ? তিনি তো ভারি মানী ও ধনী লোক ছিলেন।

— তা তো ছিলেনই; কিন্তু বুড়ির কপালে অশেষ কষ্ট ছিল, তাই পেয়ে গেল।

— কিন্তু ওর তো কয়েকটা সমর্থ জোয়ান ছেলে আছে। সবাই রোজগার করে।

— হ্যাঁ! আছে তো ভাই সবই; কিন্তু ভাগ্য বলেও তো একটা কথা আছে।

(বেটোবাঁলী বিধবা /১৯৩২) অনুবাদ দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কেজরিওয়াল

নেউর

আকাশে রুপোর সব পাহাড় পালিয়ে যাচ্ছে, এ ওকে ঠেলা দিচ্ছে, কখনও বা গলাগলি করছে, যেন সূর্য ও মেঘের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কখনও ছায়া ছায়া, আবা কখনও কড়া রোদ ঝকমকিয়ে উঠছে। বর্ষাকাল, ভ্যাপসা গরম—এক ফোঁটা বাতাস নেই।

গ্রামের বাইরে জনাকয়েক খেতমজুর আল বাঁধছিল। আদুড় গা; ঘামে ভিজে সপসপ করছিল। কোমরে খাটো কাপড় জড়িয়ে সবাই মিলে কোদাল দিয়ে জলেভেজা নরম মাটি আলের উপর তুলে রাখছিল।

গোবর কানা চোখেই চোখ মেরে বলল, আর যে হাত চলছে না ভাই। গোলাও বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। চলো জলখাবার খেয়ে নিইগে।

নেউর হেসে বলল, এই আলটা পুরো করে নিয়ে খেলে হয়। আমিতো তোমার আগেই কাজে এসেছি।

দুজনে মাথার উপর বোঝা তুলছিল; গোবর বলে উঠল, নেউরদা, তুমি তোমার বয়সকালে যা ঘি খেয়েছ, আমাদের বরাতে ততটা জলও যে জোটে না।

নেউর কালো কালো, বেঁটেখাটো, মজবুত, ডাঁটো চেহারার চটপটে লোক। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে; কিন্তু তা-বড়ো জোয়ান-মদ্দরাও নেউরের মতো খাটতে পারবে না। এই তো দু-তিন বছর আগে পর্যন্ত কুস্তি লড়ত। যেদিন ওর গোরুটা মরে গেল, সেদিন থেকে নেউর কুস্তি করা ছেড়ে দিল।

গোবর বলল, তামাক না খেয়ে তুমি থাক কী করে, নেউরদা? আমার যদি ভাতকাপড় নাও জোটে, তামাক ছাড়া আমি কিন্তু থাকতে পারি না।

নেউর নিজের কাজে তন্ময় হয়ে ছিল। ছেলেছোকরাদের কথায় ওর কোনো আগ্রহ ছিল না। দিনা নেউরকে গল্পে টানার জন্য বলল, এরপর কী করবে, নেউরদা? বাড়ি গিয়ে বুটি গড়বে তো? তা তোমার বুড়ি কিছু করে না? এমন মেয়েমানুষ নিয়ে আমার তো বাবা একটা দিনও চলবে না।

নেউরের চোপসানো ঝাঁকড়া গোঁফে ঢাকা মুখখানিতে হাসির একটা স্মিত রেখা ঝলক দিয়ে গেল, যা ওর কুশ্রীতাকেও সুন্দর করে তুলল। বলল, জোয়ান বয়সটাতে ওর সঙ্গেই কাটিয়েছি বাপ, আজ যদি ও কাজ করতে নাই পারে কী করা যাবে?

গোবর বলল, তুমিই তো ওকে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছ, নইলে কাজকর্ম করবে না কেন? দিব্যি আয়েশ করে খাটের ওপর বসে ছিলিমে টান মারছে আর গ্রামসুখ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াচ্ছে। তুমিই বরং বুড়ো হয়েছ, সে এখনও জোয়ান।

দিনা বলল, জোয়ান মেয়েমানুষ ওর কী মোকাবিলা করতে পারবে? সিঁদুর পরে, সিঁথেয় টিকলি ঝুলিয়ে, চোখে কাজল, হাতেপায়ে মেহেন্দি, এই সব শখের সাজেই তো ওর মনটি পড়ে থাকে। বড়ো পাড়ওয়ালা রঙিন শাড়ি ছাড়া তো ওকে কখনও দেখাই যায়না। গয়নার শখই কম নাকি? তুমিই একটি আস্ত বলদ বুঝলে, নেউরদা, তাই ওর সঙ্গো টিকে আছ, নইলে ওকে রাস্তায় রাস্তায় ঠোক্কর খেয়ে বেড়াতে হত।

গোবর বলল, তোমরা আর কী জান বাপধনেরা। ও যখন আমার ঘরে আসে, আমাদের বাড়িতে সাতটা হালের চাষ হত। রানির মতোই তো থাকত ও। আজ সে দিনকাল নেই তা কী হয়েছে? ওর মনটা সেই রকমই রয়ে গেছে। একটুখানি যদি উনুনের ধারে গিয়ে বসে, চোখদুটি ওর লাল হয়ে ফুলে ওঠে, মাথার যন্ত্রণায় দুহাত দিয়ে মাথাটা টিপে ধরে বসে থাকে—আমি সহ্য করতে পারি না। এই সময়টা একটু ভালোভাবে থাকার জন্যই মানুষ বিয়ে-থা করে। নইলে সংসারে আর সুখ কী? কী আছে এতে? এখান থেকে গিয়ে রুটি বানাব, জল ভরে নিয়ে আসব তবে যদি ও দুগাল খায়। নইলে আমার আর কী। তোমাদের মতোই চার গ্রাস শুকনো কিছু মুখে দিয়ে একঘটি জল খেয়ে নিতাম। তার ওপর মেয়েটা যেদিন মরে গেল, বুড়ি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল; বড়ো আঘাত পেয়েছে বেচারি। মায়ের স্নেহ আমারা কতটুকুই বা বুঝি ভাই। আগে আগে তো কখনওসখনও একটু-আধটু বকতাম। কিন্তু আজ কোন মুখে আর বকব ভাই, বলো?

দিনা বলল, তুমি কাল গাছে কেন চড়েছিলে বলো? এখন কোন বটফল পেকেছে?

নেউর জবাব দিল, ওই আর কী। ছাগলটার জন্য পাতা পাড়ছিলাম। মেয়েটাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য একটা ছাগল পুষেছিলাম। ছাগলটা বুড়ি হয়ে গেছে তুব একটু-আধটু দুধ দেয়। ওই ছাগলের দুধ আর রুটি এই খেয়েই তো বুড়ি বেঁচে রয়েছে।

বাড়ি গিয়ে নেউর দড়ি-বালতি ও ঘটি নিয়ে নাইতে চলে গেল, বউ খাটে শুয়ে শুয়েই বলল, এত দেরি করে কেন ফিরলে? কাজের জন্য কি কেউ প্রাণ ভাসিয়ে দেয়? মজুরি যখন আর সবার মতো একরকমই পাও, তখন কাজের পেছনে এমন জীবনপাত করার কী আছে?

নেউরের অন্তঃকরণ অপূর্ব এক মাধুরীতে ভরে উঠল। বুড়ির আত্মসমর্পিত ভালোবাসায় কোনো স্বার্থের গন্ধ তো নেই। কত না মমতা। তার আরামের কথা, বাঁচামরার কথা কে আর এমন করে ভাববে; তাহলে সেই বা নিজে বুড়ির জন্য খাটবে না কেন? বলল নেউর, বুঝলি বুধিয়া, গতজন্মে তুই সত্যি কোনো দেবী ছিলি। সত্যি কথা।

— আচ্ছা থাক থাক, অত খোশামোদে দরকার নেই। আমাদের পরে তো আর কেউ নেই, তাহলে আর কেন এত খাটাখাটুনি, হা পিত্যেশ!

নেউর গর্বে ফুলে-ওঠা বুক নিয়ে চান করতে চলে গেল। ফিরে এসে সে মোটা মোটা রুটি বানাল। কয়েকটা আলু আগুনের মধ্যে আগেই ফেলে দিয়েছিল; সেই আলুপোড়া মেখে বুধিয়া আর সে খেতে বসল।

বুধিয়া বলল, আমার স্ত্রী-জন্ম বৃথা। কোনো সুখ দিতে পারলাম না তোমায়। পড়ে পড়ে শুধু খাইদাই আর তোমায় বিরক্ত করি। এর থেকে ভগবান আমায় তুলে নিতেন সেই বরং ভালো ছিল। ভগবান এলে আমি বলব সবার আগে আমায় তুমি নাও ঠাকুর। এই শূন্য ঘরে তখন থাকবে কে?

— তুমিই যদি না রইলে, তাহলে আমার দশাটা কী হবে? একথা ভাবলে চোখে অন্ধকার দেখি। আমি অনেক পুন্যির ফলে তোমায় পেয়েছিলাম। আর কারও সঙ্গে ঘর আমি করতেই পারতাম না।

এই রকম মিষ্টি সান্ত্বানার কথায় নেউর কী না করতে পারত? কোনো শিকারি বঁড়শিতে চার লাগিয়ে মাছকে যখন খেলায় তেমনি করে কুঁড়ে, লোভী, স্বার্থপর বুধিয়া শুধু নিজের জিভের মিস্টতার জোরে নেউরকে নাচাত।

কে আগে মরবে এ নিয়ে এদের মধ্যে এটাই প্রথম আলোচনা নয়। এর আগেও বহুবার এ প্রশ্ন উঠেছে, আবার থেমেওছে। কিন্তু কে জানে কেন নেউর নিজের পক্ষে ডিক্রি জারি করে বসেছিল যে নিশ্চিতভাবে সেই আগে যাবে। 'আমার পরে বুধিয়া যতদিন বাঁচে, যাতে সচ্ছলভাবে থাকতে পারে, কারও কাছে তাকে হাত না পাততে হয়' — এইজন্য সে এত খেটে মরে, যাতে বুড়ির হাতে দু-চার পয়সা সঞ্চয় থাকে। কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ, যা অন্যে পারে না, নেউর করে ফেলত। সারাদিন কোদাল খুরপি চালিয়েও রাতে আখের মরশুমে আখ মাড়াই করত বা খেত পাহারা দিত। কিন্তু দিন গড়িয়ে যায়, যা কিছু সে রোজগারপাতি করে সবই খরচ হয়ে যায়। বুধিয়া ছাড়া তার জীবন—নেউর তা কল্পনাও করতে পারে না।

কিন্তু আজকের আলোচনা নেউরের মনকে শঙ্কিত করে তুলল। জলে যেমন একফোঁটা রং পড়লে জলটা রঙিন হয়ে ওঠে, এই সন্দেহটা নেউরের মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে অতিরঞ্জিত হয়ে উঠল।

দুই

গ্রামে নেউরের কাজ কিছু কম ছিল না; কিন্তু মজুরি সে আগের মতোই পাচ্ছিল। এখন এই মন্দার সময় তেমন মজুরি জুটছিল না। হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে এক সাধু গ্রামে এসে হাজির আর নেউরের বাড়ির ঠিক সামনের অশ্বত্থ গাছের তলায়ই সে ধুনি জ্বেলে আস্তানা পাতল। গ্রামের লোকেরা নিজের ভাগ্যকে ধন্যি ধন্যি করল। সাধুবাবাজির সেবা ও আতিথ্যের জন্য সবাই অশ্বত্থ তলায় জমায়েত হল। কোথা থেকে কাঠ এসে পড়ল, কোথা থেকে বিছানা আর কম্বল, কোথা থেকে চাল, ডাল, আটা। নেউরের কাছে কীই বা ছিল? তাই বাবাজির রান্নার ভারটাই সে নিল। গাঁজা-চরস এল, সাধু চরসে দম দিয়ে জেঁকে বসল।

দু-তিন দিনের মধ্যেই বাবাজির মহিমা চারিদিকে ছড়াতে লাগল। এ সাধু আত্মদর্শী সাধু, ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলতে পারেন। নির্লোভ, হাতে করে পয়সা ছোঁননা, আর অন্ন, তাই বা কি গ্রহণ করেন? অস্টপ্রহরে হয়তো দু-এক বাটি মুখে দেন, কিন্তু মুখে কী দীপ্তি, কী মধুর বাণী। সরল হৃদয় নেউর সাধুর সবচেয়ে বড়ো ভক্ত হয়ে উঠল। যদি তার উপর সাধুর কৃপা হয় তাহলে যে সে পরশপাথর হয়ে উঠবে, তার দুখ-দারিদ্র্যের অন্ত হবে।

ভক্তরা সব একে একে চলে গিয়েছিল। প্রচণ্ড শীত। নেউর শুধু বসে বসে বাবাজির পা টিপছিল।

সাধু বললেন, বাবা। সংসার তো মোহময়। কেন এ ফাঁদে পড়ে আছ? নতশির নেউর জবাব দিল, মহারাজ, আমি অজ্ঞানী; কী করব বলুন; ঘরে স্ত্রী আছে; তার ভার আর কাকে দেব?

— তা তুই কি ভাবিস তোর স্ত্রীকে তুই পালন করিস?

— তার আর কে আছে বলুন, বাবাজি?

— ঈশ্বর বলে কিছু নেই মনে করিস, তুই নিজেই সব?

নেউরের মনে হঠাৎ যেন জ্ঞানের উদয় হল; মনে মনে নিজেকেই বলল, তুই বড়ো অহংকারি হয়ে উঠেছিস নেউর, এত দম্ভ ভালো নয়। মজুরি করে জান কাহিল। আর ভাবিস, বুধিয়ার আমিই সব! যে প্রভু সমস্ত পৃথিবীর লালনপালন করছেন, তাঁর সেই সর্বময় কর্তৃত্বেও তুই নিজের দাবি জানাস! তার সরল গ্রাম্য মনে বিশ্বাস ও আস্থার একটা স্বর তাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগল। সে মুখে বলল, আমি বড়োই অজ্ঞানী, মহারাজ! এর চেয়ে বেশি কথা আর সে বলতে পারল না! তার চোখ দিয়ে বিষাদের দীন অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সাধু তেজোদীপ্ত স্বরে বলে উঠলেন, ঈশ্বরের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখতে চাস? তিনি চাইলে নিমেষে তোকে লক্ষপতি করে দিতে পারেন। মুহূর্তের মধ্যে তোর সমস্ত চিন্তা হরণ করতে পারেন। আমি তো তাঁর এক তুচ্ছ ভক্ত. কাকবিষ্ঠার মতো। কিন্তু সেই আমার মধ্যেও এমন শক্তি আছে, তোকে পরশপাথর করে দিতে পারি। তুই সাদা মনের লোক। অতি সৎ লোক। তোর ওপর আমার বড়ো দয়া হয় রে! আমি এ গ্রামের সবাইকেই খুব লক্ষ করে দেখেছি, কারুর মধ্যে তেমন ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই। তোর মধ্যে ভক্তের হৃদয় রয়েছে। আচ্ছা, তোর কাছে কিছু রুপো আছে?

নেউরের মনে হল তার সামনে স্বর্গের দরজাটা যেন খুলে গেল। বলল পাঁচ-দশটা টাকা হতে পারে, মহারাজ!

— রুপোর ভাঙা গয়নাগাঁটি নেই?

— বউয়ের কাছে কিছু আছে।

— কালি রাত্তিরে যতটা পারিস রুপো এখানে নিয়ে আসিস; তারপর ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দেখিস। তোর চোখের সামনেই রুপোর টুকরোগুলো এই হাঁড়িতে ভরে এই ধুনির ওপর রাখব। সকালে উঠে হাঁড়ি নামিয়ে নিস, কিন্তু এটা মনে রাখিস যে, সেই আশরফিগুলো যদি মদ খেয়ে, জুয়ো খেলে বা অন্য কোনো মন্দ কাজে খরচ করিস তাহলে তোর কুষ্ঠব্যাধি হবে। এখন যা। গিয়ে শুয়ে পড়গে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, একথা আর কাউকে বলতে যাস না, বউকেও নয়।

নেউর এমন প্রসন্ন মনে বাড়ি ফিরল, যেন ভগবান নেউরের মাথায় স্বয়ং হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন। সারা রাত সে ঘুমোতে পারল না। সকালে উঠে কয়েকজনের কাছ থেকে দু-চার টাকা করে ধার করে পঞ্চাশটা টাকা জোগাড় করল। সবাই তাকে বিশ্বাস করত। নেউর কখনও কারুর এক পয়সাও মারেনি। পাকা কথার লোক, পরিষ্কার উদ্দেশ্যের লোক, তাই টাকা পেতে নেউরের অসুবিধা হয়নি। পঁচিশ টাকা ওর নিজের কাছেই ছিল। এখন বুধিয়ার কাছ থেকে সে গয়নাগুলো নেয় কী করে? বেশ খানিকটা বুদ্ধি খরচ করে নেউর বুধিয়াকে বলল, তোর গয়নাগুলো বড়ো ময়লা হয়ে গেছে রে। তেঁতুল জল দিয়ে পরিষ্কার করে নে। সারা রাত তেঁতুলজলে ডুবিয়ে রাখলে গয়নাগুলো ঝকঝকে নতুন হয়ে উঠবে। বুধিয়া নেউরের ফাঁদে পা দিল। হাঁড়িতে তেঁতুল জল করে গয়নাগুলো তাতে চুবিয়ে রাখল। রাতে যখন বুধিয়া ঘুমিয়ে পড়ল, নেউর টাকাগুলোও সেই হাঁড়িতে পুরে সাধুর কাছে গেল। সাধু কয়েকটা মন্ত্র পড়লেন। হাঁড়িটাকে ধুনির ছাইয়ের উপর রাখলেন। তারপর নেউরকে আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় দিলেন।

সারারাত এপাশ ওপাশ করতে করতে ভোর না হতেই, অন্ধকার থাকতেই নেউর সাধু সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়ল; কিন্তু সাধু রোজকার মতো সেদিন সেখানে ছিলেন না। উপুড় হয়ে সে ধুনির জ্বলন্ত ছাই হাতড়াতে লাগল। হাঁড়ি অদৃশ্য, নেউরের বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হতবাক হয়ে সে খুঁজতে লাগল সাধুকে। হাটের দিকে খুঁজল। পুকুর-ঘাট দেখল। দশ মিনিট কুড়ি মিনিট আধঘন্টা— সাধুকে কোথাও পাওয়া গেল না। ভক্তরা একে একে আসতে লাগল। সবার মুখে এক কথা, সাধু কোথায়; কম্বলও নেই, বাসনকোশনও নেই!

একজন ভক্ত বলল, ভবঘুরে সাধুর আর ঠিকানা কী; আজ এখানে, কাল ওখানে, এক জায়গাতেই যদি থাকবে তাহলে আর সাধু কী, এক জায়গায় থাকলে লোকেদের সম্পর্ক জন্মায় তাতে বন্ধন বাড়ে।

— একেবারে সিদ্ধ মহাপুরুষ।

— লোভ বলতে কিছু ছিল না।

— আরে, নেউর কোথায়? তার প্রতি সাধুর বড় দয়াদৃষ্টি ছিল; নিশ্চয়ই তাকে বলে গেছে।

নেউরের খোঁজ পড়ল, কিন্তু তাকেও কোথাও পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে নেউরকে ডাক দিতে দিতে বুধিয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আবার একটা কোলাহল। বুধিয়া কাঁদছে আর নেউরকে গাল পাড়ছে।

নেউর খেতের আল ধরে প্রাণপণে ছুটছিল। যেন এই পাপী সংসার থেকে সে পালিয়ে যেতে চায়।

একজন বলল, নেউর কাল আমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধারে করেছিল, বলেছিল আজ সন্ধেবেলা দিয়ে দেবে।

আর একজন বলল, আমার কাছ থেকেও আজ দেবে কথা দিয়ে দুটাকা নিয়েছিল।

বুধিয়া কাঁদছিল, আমার সব গয়নাগুলো নিয়ে গেল গো পোড়ারমুখো। পঁচিশটা টাকা ছিল তাও নিয়ে গেল।

সবাই বুঝল, বাবাজি বেশ ধূর্ত লোক বটে। নেউরকে বোকা বানিয়ে ধাপ্পা মেরে চলে গেল। পৃথিবীতে এমন ঠগও থাকে। নেউরের সম্বন্ধে কারও কোনো রকম সন্দেহ ছিল না। বেচারি সাদাসিধে লোক, ধাপ্পা খেয়ে গেল। লজ্জায় মরমে মরে কোথায় হয়তো লুকিয়ে বসে আছে!

তিন

তিন মাস কেটে গেছে। ঝাঁসি জেলার ধসান নদীর ধারে কাশীপুর নামে ছোট্ট একটা গাঁ ছিল। নদীর ধারেই একটা পাহাড়ি টিলা মতো ছিল। সেই টিলায় কয়েকদিন হল এক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছে। বেঁটেখাটো মানুষ, চাটুর মতো কালো রঙ; কিন্তু শরীরের বাঁধুনি বেশ মজবুত; এ আমাদের নেউর। সাধুবেশে দুনিয়াকে ধোঁকা দিচ্ছে—সেই সরল অকপট নেউর, যে কখনও অন্যের জিনিসে চোখ তুলে চায়নি পর্যন্ত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমের অন্ন খেয়ে যে খুশি ছিল, সুখী ছিল। বাড়ির কথা, গাঁয়ের কথা ও বুধিয়ার কথা সে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছিল না। এ জীবনে আর কি কোনোদিন সে নিজের বাড়ি যেতে পারবে? নিজের গৃহস্থালির ছোটো ছোটো চিন্তাভাবনা, সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাঝে সে হেসে বেড়াতে পারবে? কত সুখের

না জীবন ছিল তার। যা কিছু বা যারা ছিল সবই তো তার নিজেরই ছিল। সবাই ছিল তার আপন জনের মতো। সবাই তাকে কত সম্মান করত, সহানুভূতি দেখাত! সারাদিনের মজুরির পর সামান্য চালডাল অল্প কটা পয়সা নিয়ে বাড়ি পৌছুলে পর বুধিয়া কত মিষ্টি করেই না তাকে অভ্যর্থনা জানাত। তার সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত ক্লান্তি যেন সেই মিষ্টি রসে ভিজে আরো মধুর হয়ে উঠত। হায় হায়, সেদিনগুলো আবার কবে ফিরে আসবে? জানিনা বুধিয়া বেচারির কীভাবে কাটছে? কে তাকে তার মতো মাথায় তুলে রাখবে? কেই বা তাকে রান্না করে খাওয়াবে? বাড়িতে একটা টাকা পর্যন্ত নেই, গয়নাগুলো অবদি খোয়াতে হল। রাগে নেউর অস্থির হয়ে ওঠে; আজ যদি সে সাধুকে সামনে পায়, কাঁচাই তাকে চিবিয়ে খায় এমন তার মনের অবস্থা। ছিঃ ছিঃ, কেন যে এমন লোভে পড়তে গেল! হায় রে লোভ!

নেউরের ভক্তদের মধ্যে একটি সুন্দরী যুবতী ছিল। মেয়েটির স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছিল। মেয়েটির বাবা মিলিটারি পেনশনার ছিলেন, একজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেটি মায়ের কথায় চলত। অথচ শাশুড়ির সঙ্গে মেয়েটির তেমন বনিবনা হয়নি। মেয়েটির ইচ্ছে ছিল স্বামীর সঙ্গে সে পৃথকভাবে থাকে, শাশুড়ির থেকে ভিন্ন হয়ে। ছেলে মার কাছ ছাড়া হয়ে থাকতে রাজি নয়। এরকম অবস্থায় মেয়েটি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে আসে। তার পর প্রায় তিন বছর কেটে গেছে, শ্বশুর বাড়ি থেকে তাকে কেউ নিতে আসেনি। স্বামীও কোনোদিন আসেনি। মেয়েটি যে কোনো উপায় স্বামীকে বশে আনতে উৎসাহী; আর যে কোনো মহাত্মার পক্ষে কারুর মন বদলে ফেলা এমন কিছু মুশকিল ব্যাপার নয়। তবে হ্যাঁ, সাধুর দয়া চাই।

একদিন একান্তে মেয়েটি নিজের দুঃখের কথা সাধুকে জানাল। নেউর এইরকম শিকারের খোঁজেই ছিল। নেউরের মনে হল আজ সে সুযোগ তার জীবনে এসেছে। কিন্তু গম্ভীরভাবে সে বলল, মা, আমি সিদ্ধ পুরুষও নই, যোগী বা মহাত্মাও নই। সংসারের ঝামেলায় আমি পড়তে চাই না। কিন্তু তোর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেখে তোর ওপর আমার দয়া হয়। ভগবান যদি চান তোর মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

— আপনি পারবেন বাবা, আপনার ওপর আমার সে বিশ্বাস রয়েছে।

— ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে।

— এই অভাগিনির নৌকা আপনিই ঘাটে ভেড়াতে পারবেন বাবা।

— ভগবানের ওপর ভরসা রাখ।

— আপনিই তো আমার ভগবান।

বিচিত্র এক ধর্ম-সংকটের মধ্যে পড়ে নেউর বলল, কিন্তু মা, এ কাজের জন্য তো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আর অনুষ্ঠান বড়োই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। হাজার টাকা খরচের ধাক্কা। তার পরেও তোর কাজ সিদ্ধ হবে কিনা আমি বলতে পারব না। হ্যাঁ, আমি যেটুকু পারব নিশ্চয়ই করব। কিন্তু সবই তো ভগবানের হাতে। আমি মায়াতে হাত ছোঁয়াই না। কিন্তু তোর দুঃখও তো আর চোখে দেখা যায়না।।

সেই রাতেই সেই যুবতী স্ত্রীলোকটি নিজের সোনার গয়নার বাক্সটি নিয়ে এসে সাধু বাবার শ্রীচরণের কাছে রাখল। বাবাজির হাত কাঁপছিল; সেই কাঁপা হাতেই বাক্সের ডালা খুললেন,

চাঁদের উজ্জ্বল আভায় গয়নাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এই সমস্ত মায়া, অর্থাৎ স্বর্ণ অলংকার এখন তাঁর, তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে যেন জোড় হস্তে মিনতি করছে,—আমায় গ্রহণ করো। বেশি কিছু তো করার নেই; শুধু গয়নার বাক্সটা নিয়ে নিজের বালিশের কাছে রেখে দেওয়া, আর মেয়েটিকে আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় দেওয়া। ভোরবেলা সে যখন আসবে, ততক্ষণে তার পা দুটো তাকে যতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে, চলে যাবে। কী আশাতীত সৌভাগ্য! টাকাভর্তি থলে নিয়ে যখন সে গ্রামে গিয়ে পৌঁছবে, বুধিয়ার সামনে থলেটা রাখবে, ওফ! এত বড়ো আনন্দের কল্পনাটা যে কেমন, তাও তো সে জানেনা।

কিন্তু কেন জানি না এমন তুচ্ছ সামান্য একটা কাজও তার দ্বারা হয়ে উঠে না। গয়নার বাক্সটিকে সে নিজের মাথার শিয়রে কম্বলের তলায় সরিয়ে রাখতে পারল না। কাজটা কিছুই নয়, কোনো কাজই নয়; তবু নেউরের পক্ষে তাই অসাধ্য হয়ে উঠল। গয়নার বাক্সটির দিকে নিজের হাতটা পর্যন্ত বাড়াতে পারল না। তার হাত যেন তার নিজের বশে নেই। হাতের কথা থাক,মুখেই তো সে কিছু বলতে পারত। এটুকুই যদি সে মুখ ফুটে বলতে পারত — 'গয়নার বাক্সটা কম্বলের তলায় উঠিয়ে রাখো তো, মা!' জিভ তো আর খসে যেত না। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে যে তার জিভ আর তার নিজের বশে নেই। চোখের ইশারায় কাজ হতে পারত, কিন্তু এখন যেন চোখ দুটোও বিদ্রোহ করতে চাইছে। আর এতগুলো মন্ত্রী আর সামন্ত থাকা সত্ত্বেও মনের রাজা কেমন শক্তিহীন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। অথচ লাখ টাকার থলে চোখের সামনে পড়ে। হাতে যদি খাপ-খোলা তরোয়াল থাকে, আর গোরু যদি শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে তবু কি সেই গোরুকে কাটতে তার হাত উঠবে? না, কখনওই নয়। কেউ ওর নিজের গলা কেটে ফেললেও না। সেই পরিত্যক্তা মেয়েটিকে নেউরের সেই গোরুর মতোই মনে হল। তিন মাস ধরে যে সুযোগের খোঁজে সে ছিল, সেই সুযোগ যখন এল নেউরের আত্মা ভয়ে শিউরে উঠল। বন্যজন্তুদের শিকার ধরা জন্মগত স্বভাব। কিন্তু বহুকাল শিকার বাঁধা অবস্থায় থাকতে থাকতে তাদের নখ খসে যায়, দাঁত কমজোরি হয়ে যায়। নেউর কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা, এ গয়নার বাক্স তুই নিয়ে যা। আমি তো তোকে পরীক্ষা করেছিলাম। তোর মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

নদীর ওপারে গাছের আড়ালে চাঁদ বুঝি বিশ্রামে গেছে। নেউর নিজের আসন ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ধসানের জলে স্নান সেরে সে এগুতে লাগল। বিভূতি আর তিলক-চন্দনের ওপর আজ তার ঘৃণা হচ্ছিল। ভেবে ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল বাড়ি ছেড়ে সে বেরুতে পারল কী করে? সামান্য উপহাসের ভয়ে সে এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। মনের মধ্যে আজ অপূর্ব এক উল্লাসের অনুভূতিতে তার বোধ হচ্ছিল যেন তার শিকল ছিঁড়েছে। যেন বড়ো জেতা সে আজ জিতেছে।

চার

আট দিনের দিন নেউর নিজের গ্রামে এসে পৌঁছোল। ছেলেরা ছুটে এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তার হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে অকে অভ্যর্থনা জানাল।

একটি ছেলে বলল, ঠাকুমা তো মরে গেছে, দাদু! শোনামাত্র নেউরের পা দুটো যেন অবশ হয়ে গেল। মুখের দুপাশের পেশিগুলো ঝুলে পড়ল, চোখ দুটো বেদনায় ভরে উঠল। কিছুই সে বলল

না, কিছু জিজ্ঞেসও করল না। মুহূর্তের জন্য বুঝি নিঃসঙ্গা একাকী সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দ্রুতগতিতে নিজের কুঁড়ে ঘরটির দিকে এগিয়ে গেল। ছোটো ছোটো ছেলেপিলেরাও তার পিছু পিছু ছুটল; কিন্তু তাদের মুখের দুষ্টুমি ও চঞ্চলতাটুকু যেন উবে গিয়েছিল।

নেউরের কুঁড়ে ঘর খোলাই পড়ে ছিল। বুধিয়ার খাটটিও তেমনি পাতাই ছিল। তার হুঁকো-কলকে তেমনি পড়ে ছিল। এক কোণে কয়েকটা পেতলের ও মাটির বাসন রাখা। ছেলেছোকরারা বাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরের ভেতরে তারা ঢুকবেই বা কেমন করে। সেখানে বুধিয়া বসে আছে!

গ্রামে হল্লা রটে গেল,—নেউর ফিরে এসেছে। কুঁড়ে ঘরের দোরে লোকেদের ভিড়, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন — এতদিন কোথায় ছিলে, নেউর দাদা? তোমার যাবার তিন দিনের দিন বউটা মরে গেল। দিনরাত্তির তোমায় খালি গালাগালি করত। মরার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার ওপর তর্জন-গর্জন করে গেছে। তৃতীয় দিন গিয়ে দেখি মরে পড়ে রয়েছে। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

নেউর কোনো জবাব দিল না। শূন্য, হতাশ, করুণ আর আহত দৃষ্টিতে সে চেয়ে দেখছিল। যেন সে বোবা হয়ে গেছে। সেদিন তাকে কেউ হাসতে, কাঁদতে বা কথা বলতে দেখেনি।

গ্রাম থেকে আধ মাইলটাক দূরে একটা পাকা সড়ক আছে। লোকজনের আসাযাওয়ায় পথটি বেশ সরগরম। খুব ভোরে উঠে নেউর সড়কের ধারে এক গাছতলায় গিয়ে বসে থাকে। কারও কাছ থেকে কিছু সে চায় না; কিন্তু পথচলতি লোকেরা কিছু না কিছু তাকে দেয়, ছোলাভাজা, চাল-ডাল, পয়সা। সন্ধেবেলায় সে নিজের কুঁড়েতে ফিরে আসে, প্রদীপ জ্বালায়, রান্না করে খায়। তারপর সেই পাতা খাটটার ওপর সে পড়ে থাকে। তার জীবনের যে একটা চালিকাশক্তি ছিল সেটাই যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। এখন সে একটি প্রাণী মাত্র। এ কী গভীর বেদনা! গ্রামে গ্রামে প্লেগ ছড়াল। সবাই ঘরদোর ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল, কিন্তু আজ আর নেউরকে নিয়ে কে মাথা ঘামায়? তাকে কেউ ভয়ও পেত না, ভালোই বা কে বাসত? সারা গ্রাম পালিয়ে বাঁচল, নেউর নিজের কুঁড়ে ছেড়ে গেল না। দোলপূর্ণিমা এল, সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠল। নেউর কিন্তু নিজের কুঁড়ে ঘর থেকে বেরোয়নি।

আজও তাকে সেই গাছের তলায়, সড়কের ধারে, তেমনই নীরবে বসে থাকতে দেখা যায়—চেষ্টাহীন, প্রাণশূন্য।

(নেউর / ১৯৩৩) অনুবাদ দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কেজরিওয়াল

শাস্তি

স্বর্গীয় দেবনাথ ছিলেন আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধুদের একজন। আজও যখন তাঁর কথা ভাবি, সেই আনন্দমুখর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, নিরালায় বসে একটু চোখের জল ফেলি। আমার আর ওঁর মধ্যে প্রায় দু-আড়াইশো মাইলের দূরত্ব ছিল। আমি থাকতাম লখনউ, আর তিনি থাকতেন দিল্লিতে; কিন্তু এমন কোনো মাস যায়নি যে আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হত না। তিনি ভারী খোলা স্বভাবের আমুদে, সহৃদয়, উদার, বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন; আপন-পরের ফারাক বুঝতেন না। বাস্তব দুনিয়াটা যে কী রকম আর লৌকিক আচারআচরণ কেমন হওয়া উচিত তা তিনি মোটেই জানতেন না আর জানবার চেষ্টাও করেন নি।

তাঁর জীবনে এমন অবস্থা অনেকবারই এসেছে যখন তাঁর সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অনেক সময় বন্ধুরা তাঁর সরলতার সুযোগ অন্যায়ভাবে নিয়েছে। সেজন্য তাঁকে লজ্জাকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে, তবু এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিক্ষা না নেবার শপথ যেন তিনি নিয়েছিলেন। বন্ধুদের প্রতি তাঁর ব্যবহারে কোনো হেরফের ঘটেনি। আগের মতোই সহজ, যেন কিছুই হয়নি। সাদাসিধে ভাবেই জীবন কাটিয়ে তিনি চলে গেলেন।

দেবনাথের দুনিয়া ছিল ভারি অদ্ভুত। সেখানে সন্দেহ, চালাকি, কপটতার কোনো জায়গা ছিল না — সবাই ছিল তাঁর আপন, পর বলে কেউ ছিল না। আমি ওঁকে কয়েকবার বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। জীবনের স্বপ্নকে ভেঙে ফেলতে তাঁর মনে বড়ো কষ্ট হত।

আমার মাঝে মাঝে চিন্তা হত তিনি যদি নিজের হাত গুটিয়ে না নেন তাহলে তার পরিণাম কী দাঁড়াবে? এমনই বিড়ম্বনা যে, ওর স্ত্রী গোপারও স্বভাবটা একই ছাঁচে ঢালা। আমাদের দেবীদের মধ্যে যে চাতুরী থাকে যা দিয়ে তাঁরা উড়নচণ্ডী পুরুষের স্বভাবে লাগামের কাজ করেন সেটুকুও গোপার চরিত্রে ছিল না। এমন কী কাপড় চোপড় গয়নাগাটিতেও তাঁর তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। কাজেই দেবনাথের স্বর্গলাভের খবর পাওয়া মাত্রই আমি দিল্লি গিয়ে পৌঁছোলাম। দেখলাম, বাসনকোশন আর বসত বাড়িটুকু ছাড়া তাঁর আর কিছুই নেই। আর কী বা বয়স হয়েছিল যে তিনি সঞ্চয়ে মন দেবেন। চল্লিশও পেরোয়নি। স্বভাবটাই তাঁর ছেলেমানুষের মতো ছিল। আর এই বয়সে কারোরই প্রায় কোনো ভাবনাচিন্তা থাকে না। তাঁর প্রথম সন্তান হয় মেয়ে ও পরে দুটি ছেলে। ছেলে দুটি শৈশবেই মারা যায়। মেয়েটি আছে আর এই নাটকের সেটিই সবচেয়ে করুণ দৃশ্য। যে ধরনের জীবন যাপন এরা করত, সেই রকমভাবে থাকতে গেলে এই ছোট্ট পরিবারটির মাসে অন্তত দুশোটি টাকার দরকার। দু-তিন বছরের মধ্যে মেয়েটির বিয়েও দেওয়া দরকার। কী করে যে কী হবে আমি ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না।

এই অবসরে আমি একটা বহুমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। যারা অন্যের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন, পরোপকারী এবং স্বার্থসিদ্ধি যাদের জীবনের লক্ষ্য নয় সেই পরিবারের পাশে দাঁড়াবার মতো মানুষের অভাব ঘটে না। কিন্তু এটাকে কোনো নিয়ম বলে ধরা যায় না, কারণ আমি এমন লোকদের দেখেছি, যাঁরা সারাটা জীবন অন্যের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে গেছেন অথচ তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ছেলেমেয়ের, তাঁদের পরিবারের ভালোমন্দের কেউ খোঁজ নেয়নি। সে যাই হোক, দেবনাথের বন্ধুবান্ধবরা প্রশংসনীয় উদারতার পরিচয় দিলেন। গোপার ভরণপোষণের জন্য স্থায়ী ভাবে কিছু টাকা জমা রাখার প্রস্তাব তাঁরা করলেন। দু-একজন সজ্জন বিপত্নীক ব্যক্তি গোপাকে বিয়ে করতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু গোপা নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সে সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এ দেশের নারীর ঐতিহ্য রক্ষা করল।

বাড়িটা বেশ বড়ো, তারই একটা অংশ সে ভাড়া দিয়ে দিল, মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া, তাতেই কোনোরকমে সে চালিয়ে নেবে। যা কিছু খরচ তো মেয়ে সুন্নির জন্যে। গোপার যেন নিজের জীবনের প্রতি কোনো মায়াই নেই।

দুই

এর প্রায় মাস খানেক পর ব্যাবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে বিদেশে যেতে হয়। যতদিন বিদেশে থাকতে হবে ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি আমার সেখানে থাকতে হয়। প্রায় দু বছর বাদে ফিরি। গোপার চিঠিপত্র নিয়মিত পেতাম। চিঠি পড়ে বোঝা যেত যে তারা ভালোই আছে, তাদের জন্য চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু পরে আমি জানতে পাবি যে, গোপা আমাকেও পর ভেবে প্রকৃত অবস্থার কথা গোপন করে গেছে।

বিদেশ থেকে ফিরে আমি সোজা দিল্লি যাই। বাড়ির কাছে পৌঁছবামাত্র আমার কান্না পেয়ে গেল, যেন জনশূন্য এক প্রেতপুরী। যে ঘরে বন্ধুবান্ধবদের হাসিঠাট্টার আসর বসত, তার দরজাটা বন্ধ, চতুর্দিকে মাকড়শার জাল। দেবনাথের সঙ্গে সঙ্গে যেন বাড়ির সমস্ত শ্রীটুকুও চলে গেছে। ঢুকেই হঠাৎ আমার মনে হল দেবনাথ বুঝি হাসিমুখে আমায় অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মিথ্যেবাদী নই এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ; কিন্তু সত্যি বলছি, আমি যেন হঠাৎ চমকেই উঠেছিলাম। বুকের ভেতরটা কী রকম যে করে উঠল; কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভেঙে যায়, দেবনাথের চেহারা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গোপা এসে দরজা খুলে দিল। সে ছাড়া খুলবেই বা কে? ওকে দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও জানত যে আমি আসব, তাই আমায় অভ্যর্থনা জানাতে নতুন একটা শাড়ি পরেছে, চুলও বেঁধেছে, কিন্তু এই দুটো বছরে সময় যে তার ওপর কতবড়ো আঘাত হেনে গেছে সেটা সে লুকোবে কী দিয়ে? নারীর জীবনে এ বয়সটা এমনই যে রূপলাবণ্য আপনা আপনি তাকে ভরিয়ে তোলে, এই বয়সে ছেলেমানুষি চপলতা, অভিমানের জায়গায় নারীর মধ্যে দেখা দেয় আকর্ষণ, মাধুর্য ও অনুরাগ। কিন্তু গোপার যৌবন অকালেই ঝরে গেছে। তার মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, চেহারায় বিষাদের ছাপ। চেষ্টা করেও সেই ছাপ সে মুছে ফেলতে পারছিল না। চুলেও পাক ধরেছে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন বুড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আর্দ্র স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি অসুস্থ ছিলে গোপা?

চোখের জল প্রাণপণে চেপে সে জবার দিল— না তো। আমার কোনোদিন মাথাও ধরেনি।

— তাহলে তোমার এমন দশা হল কেন? একেবারে বুড়িয়ে গেছ।

— যৌবন নিয়ে আমি করবই বা কী? আমার বয়সও পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছে।

— পঁয়ত্রিশ বছর বয়সটা তো খুব বেশি নয়।

— হয়তো তাদের জন্য নয়, যারা অনেকদিন বাঁচতে চায়। আমি যে চাই যত তাড়াতাড়ি পারি চলে যেতে। সুন্নির বিয়েটা নিয়েই যা চিন্তা, তারপর আমার ছুটি, জীবনের কে পরোয়া করে?

এখন জানতে পারলাম, যে ভদ্রলোক এ বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, কিছুদিন পরেই তিনি বদলি হয়ে চলে যান। তারপর নতুন ভাড়াটে আর কেউ আসেনি। আমার বুকটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। এতদিন বেচারিদের কীভাবে চলেছে, কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

আমি বিরক্ত হয়েই বললাম, এতদিন আমায় কিছু জানাওনি কেন? আমি কি এতই পর?

গোপা লজ্জিত ভাবে বলল, না না, সে কথা নয়। তোমায় যদি পর ভাবি কাকে নিজের ভাবব বলো? আমি ভেবেছিলাম, বিদেশে আছ, নিজেরই হয়তো কত ঝামেলা; আবার আমি কেন বাড়তি কষ্ট দিই। কোনোরকমে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। বাড়িতে আর কিছু না থাকুক, অল্প গয়নাগাটি আছে তাই বেশি আর ভাবি না। ভাবনা শুধু সুনীতার বিয়ের জন্যে। মনে করেছিলাম, বিয়ের খরচ এই বাড়িটা থেকেই উঠে যাবে। কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা হয়তো বাড়িটা বিক্রি করলে পেতাম, বিয়েও হত, আমার নিজের জন্যও কিছু বাঁচত। কিন্তু জানতে পারলাম, আগে থেকেই বন্ধক দেওয়া আছে, সুদ বাবদ কুড়ি হাজার টাকা বাকি পড়েছে। মহাজনের অনেক দয়া যে, বাড়ি থেকে দূর করে দেননি। এদিক থেকে তো কোনো আশাই নেই। হাতেপায়ে ধরলে হয়তো মহাজন দু-আড়াই হাজার টাকা দিতে পারেন। কিন্তু তাতে আর কীই বা হবে? এই চিন্তাতেই আমি শেষ হয়ে গেলাম। দেখছ তো, আমি কেমন স্বার্থপর, তোমায় হাতমুখ ধোওয়ার জল পর্যন্ত দিইনি, কিছু জলখাবারও দিলাম না, তখন থেকে শুধু নিজের কাঁদুনিই গাইছি. এবার কাপড়চোপড় ছাড়, মুখহাত ধুয়ে আরাম করে বসো, কিছু খাও, তারপর অন্য কথা। বাড়িতে তোমার সব ভালো তো?

আমি বললাম, বম্বে থেকে আমি সোজা এখানেই চলে এসেছি, বাড়ি গেলাম কখন?

গোপা তিরস্কার ভরা চোখে চাইল, যদিও সে চাহনিতে ঘনিষ্ঠতার ভাব ফুটে উঠেছিল। আমার একবার মনে হল, হঠাৎ যেন ওর মুখের কোঁচকানো চামড়া টান টান হয়ে উঠেছে। মুখে হালকা লাল আভা, বলল, এর ফল কী দাঁড়াবে জানো? তোমার শ্রীমতীটি আর কোনোদিন তোমায় এখানে আসতে দেবেনা।

— আমি কারও গোলাম নই।

কাউকে নিজের গোলাম করতে হলে, আগে নিজেকে তার গোলাম হতে হয়, বুঝলে?

শীতকালের সন্ধে, দেখতে দেখতে প্রদীপ জ্বলে উঠল। সুনীতা লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকল। দু বছর আগের অবোধ কৃশতনু বালিকা রূপবতী যুবতী হয়ে উঠেছে। ওর হাবভাব ওর কথাবার্তায় দীপ্ত স্বভাবের পরিচয় ফুটে উঠছিল। যাকে কোলে নিয়ে কত আদর করেছি তার দিকে ভালো করে চাইতে পারলাম না; আর যে ছোট্ট মেয়েটি আমার গলা জড়িয়ে ঝুলে ভারি আমোদ পেত আজ সে আর আমার সামনে দাঁড়াতে পারল না। সে বুঝি আমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে ফেলতে চায়।

আমিও যেন তাকে সেই সুযোগই দিচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন তুমি কোন ক্লাসে পড়ছ সুন্নি? মাথা নিচু করে সুনীতা জবাব দিল, ক্লাস টেন-এ পড়ছি।

— বাড়ির কাজকর্ম কিছু করো না কি?

— মা করতে দিলে তো?

গোপা বলল, আমি করতে দিই না, না তুই কাজের দিকে ঘেঁসতেই চাসনা?

সুন্নি মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। মায়ের আদুরে মেয়ে। মেয়ে যেদিন কাজ করবে, গোপা হয়তো কেঁদেই সারা হবে। সে নিজেই মেয়েকে কাজ করতে দিত না, কিন্তু সবার কাছে অভিযোগ করত যে মেয়ে কোনো কাজই করে না। তার অভিযোগ ভালোবাসারই নামান্তর। আমাদের আভিজাত্য আমাদের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে।

খাওয়াদাওয়া সেরে আমি একটু গড়িয়ে নিলাম। গোপা এসে সুনীতার বিয়ের কথা তুলল। এ ছাড়া বলার মতো কথা আর ওর কীই বা ছিল। বলল, পাত্র তো অনেক পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আমার তেমন সাধ্য কই? মেয়ের যেন মনে না হয়, আজ বাবা থাকলে আমার আরো ভালো বিয়ে হতে পারত। এর পর গোপা ভয়ে ভয়ে লালা মদারিলালের ছেলের কথা পাড়ল।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। লাল মদারিলাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, এখন পেনশন পাচ্ছেন। বেশ পয়সাওয়ালা লোক। লক্ষপতি হয়েছেন, কিন্তু লোভ মেটেনি। গোপা বেছে বেছে এমন সম্বন্ধ বার করেছে যা তার নাগালের বাইরে।

আমি আপত্তি করলাম, মদারিলাল লোকটা সৎ নয়। গোপা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলল, না দাদা, এ তুমি কী বলছ? তুমি বোধহয় ওঁকে ভালো মতো চিনতে পারোনি। আমার ওপর তাঁর অনেক দয়া। মাঝে মাঝে এসে আমার ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করে যান। ছেলেটিও এত ভালো যে তোমায় কী বলব? খুবই যোগ্য পাত্র। তা ছাড়া ওঁদের অভাব কী বলো? এ কথা অবশ্য ঠিক যে, এককালে উনি নাকি খুব ঘুষ নিতেন; কিন্তু এ জগতে সাধুই বা কে? সুযোগ পেয়ে কে ছাড়ে? মদারিলাল এ কথাও আমায় জানিয়ে গেছেন যে, আমার কাছে উনি বরপণ চান না; শুধু মেয়েটিকেই চাইছেন। সুন্নিকে ওর ভারি পছন্দ।

গোপার সরলতায় আমার ভারি করুণা হচ্ছিল। তবু ভাবলাম, কারও প্রতি ওর মনে অবিশ্বাস জাগিয়ে লাভ কী? হতে পারে মদারিলাল আর সে মদারিলাল নেই। মানুষের মন তো হামেশাই বদলায়।

আমি নিমরাজি হয়ে বললাম, কিন্তু ভেবে দেখো তোমাদের দুজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তুমি হয়তো সর্বস্ব দিয়েও ওকে তুষ্ট করতে পারবে না।

কিন্তু গোপা মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল, মেয়েকে সে এমন ঘরে পাঠাবে যেখানে সে রানি হয়ে থাকতে পারবে।

পরের দিন সকালে আমি মদারিলালের বাড়ি গেলাম। তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্তা হল, তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। হতে পারে কোনোদিন এই মানুষটাই নিতান্ত লোভী ছিল, কিন্তু আজ সে একেবারেই সহৃদয় উদার ও বিনয়ী হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, দেবনাথকে আমি চিনতাম ভাই, মানুষের মধ্যে সে ছিল এক রত্ন বিশেষ। ওঁর মেয়ে যদি আমার ঘরে আসে সে আমারই সৌভাগ্য।

আপনি সুনীতার মাকে বলে দেবেন, মদারিলাল তাঁর কাছে কিছুই চায়না। ভগবান আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, আমি ওদের দেউলে করতে চাই না।

আমার মনের ভার হালকা হয়ে গেল। আমরা লোকের কথায় বিশ্বাস করে কারও সম্বন্ধে কত ভুল ধারণা না করি — তারই একটা বড়ো অভিজ্ঞতা আমার হল। আমি ফিরে এসে গোপাকে তারিফ করলাম। স্থির হল সামনের গ্রীষ্মে ওর বিয়ে দেওয়া হবে।

তিন

গত চার মাস ধরে গোপা শুধু বিয়ের জোগাড় করতেই ব্যস্ত রইল। মাসে একবার অন্তত আমি নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা করে আসতাম; আর প্রতিবারেই আমি মন খারাপ করে ফিরতাম। গোপা বংশের আভিজাত্যের সম্মান রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। পাগলি হয়তো ভাবছিল তার এ উৎসাহ, উদ্দীপনা শহরে একটা নজির হয়ে থাকবে। ও হয়তো জানেনা, জগতে এ ধরনের তামাশা রোজই কোথাও না কোথাও হচ্ছে, লোকে তা ভুলেই যাচ্ছে। হয়তো মনে মনে এ যশটুকুন সে পেতে চাইছিল যে, লোকে দেখুক এরকম দুর্দশার দিনেও মরা হাতি লাখ টাকা। প্রতি পদে ওর দেবনাথের কথা মনে হচ্ছিল, আজ যদি সে থাকত, এ ভাবে না হয়ে আরও ভালোভাবে হত, আর সেই কথা ভেবে সে চোখের জল ফেলে। মদারিলাল হয়তো সত্যিই সজ্জন ব্যক্তি; কিন্তু গোপার তো মেয়ের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে। পাঁচ-দশটা মেয়ে তার নেই। মনের সাধ সে মেটাবে বই কী। সুনীতার জন্য কত যে শাড়ি আর গয়না হয়েছে তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। যখনই যাই, দেখি গোপা মেশিনে কিছু না কিছু সেলাই করছে। কখনও সে স্যাকরার দোকানে বসে আছে, কখনও অতিথি-অভ্যাগতদের কী ভাবে আপ্যায়ন করবে সেই আয়োজনে ব্যস্ত। পাড়ায় এমন কোনো সম্পন্ন বাড়ি ছিল না, যাদের কাছ থেকে কিছু না কিছু টাকা সে ধার নেয়নি। গোপা হয়তো ভাবছিল, টাকা সে ধার বলেই নিয়েছে, কিন্তু যারা দিয়েছে তারা দান বলেই দিয়েছে। পাড়ার সবাই তাকে সাহায্য করছিল। সুন্নি এখন পাড়ার সবারই মেয়ে, গোপার একার আর নয়। গোপার সম্মান যে পাড়ারই সম্মান। গোপা বিশ্রাম নিতেও যেন ভুলে গেল। যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে, অর্ধেক রাত হয়ে গেছে, তবু সে একমনে বসে সেলাই করে যাচ্ছে। এ বাড়ির যাবতীয় যা কিছু সব অন্য ঘরে তুলে দেবার খেলায় সে মেতে উঠেছে। বাৎসল্যের এই রূপ দেখে সবার মন শ্রদ্ধায় ও স্নেহে ভরে উঠত।

একে তো একা, তায় ক্ষীণজীবী, কতদিক সে সামলাবে? যে কাজই অন্যের উপর ছেড়ে দেয় তাতেই কিছু না কিছু ত্রুটি থেকে যায়, তবু গোপা সাহস হারাচ্ছে না, হার মানতে সে রাজি নয়।

আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বললাম, গোপা, তুমি যদি মরতেই চাও, তাহলে বিয়ের পর না হয় মরবে। আমার ভয় হয়, বিয়ের আগেই বুঝি বা তুমি মরে যাও। গোপার শুকনো ম্লান মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বলল, তুমি এ নিয়ে আর ভেবো না, দাদা। বিধবার আয়ুর ক্ষয় নেই। তুমি জান না বিধবাদের আয়ু অনেক। কিন্তু সুন্নির একটা গতি করে আমি চলে যেতে চাই। তারপর বেঁচেই বা কী করব? কী যে করি? যদি কোনো বিঘ্ন এসে পড়ে তাহলে কার মান যাবে বলো? গত চার মাস ধরে রাত্রে বোধ হয় এক ঘন্টা মতো ঘুমোই। ঘুম আসেই না; কিন্তু মন আমার খুশি। আমি মরি কিংবা বাঁচি, মনে মনে সান্ত্বনা রইল, সুনীতার জন্য তার বাপ যা করত, আমি তাই করেছি। মদারিলাল আমায় ভদ্রতা দেখিয়েছেন, কিন্তু নিজেদের মান তো আমাকেই রক্ষা করতে হবে।

কোনো এক মহিলা এসে বলল, যাও বোন, একবার গিয়ে দেখে এসো, মিষ্টির রসটা. ঠিকমতো হয়েছে কি না? গোপা মহিলাটির সঙ্গো চলে যায় আর পরক্ষণেই ফিরে এসে বলে, ইচ্ছে করে মাথা কুটে মরি। তোমার সঙ্গো দুদণ্ড কথা বলছি, রস এত গাঁঢ় হয়ে গেছে যে, নাড়ু খেতে গেলে দাঁত ভেঙে যাবে। কাকেই বা কী বলি!

আমি রাগ করে বললাম, মিথ্যেই তুমি এত ঝামেলা বাড়াচ্ছ। ময়রা ডেকে ভার দিলেই হত। তাছাড়া কতই বা অতিথি আসবে যে মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙে পড়েছে। পাঁচ-দশ টাকার মিষ্টি করালেই অনেক হবে।'

গোপা ব্যথিত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার মুখে এ ধরনের কথা ওর খুবই খারাপ লেগেছে। আজকাল কথায় কথায় ওর রাগ চড়ে যায়। বলল, এ সব তুমি ঠিক বুঝবে না দাদা। তোমার কোনো দিন মা হবার সুযোগ হবে না, কারও বউ হবারও নয়। সুন্নির বাবার কত নাম ছিল বলো তো? কতলোক ওর দয়াতেই খেয়েপরে বেঁচে থাকত, তুমি কি এসবের কিছুই জাননা? তাঁর দায়িত্ব আজ আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, হবে কোত্থেকে? নাস্তিক হয়ে উঠেছ যে। আমার যে সব সময় মনে হয়, আমার মধ্যে তিনি রয়েছেন। যা কিছু করছি এ তাঁরই করা। আমি অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক, একলা কতুটুকু কী করতে পারি বলো? তিনিই আমায় সাহায্য করছেন, পথ দেখাচ্ছেন, ভেবে নিতে পারো। এ দেহটাই শুধু আমার, এর ভেতরে যে আত্মা, সেটা তিনি, আমি নই। যা কিচ্ছু হচ্ছে, এ সবই তাঁর নির্দেশ। তুমি তাঁর বন্ধু, তুমিও তোমার শত শত টাকা খরচ করেছ, তাহলে আর কেন এত অবাক হচ্ছ? ইহলোকে, পরলোকে আমি ওঁর সহগামিনী, সহধর্মিণী।

মলিন মুখে আমি চুপ করে রইলাম।

চার

জুন মাসে সুনীতার বিয়ে হয়ে গেল। গোপা তাকে অনেকই দিয়েছে, নিজের ক্ষমতার বাইরেই দিয়েছে; তবুও মনে মনে গোপা সন্তুষ্ট নয়। বার বার সে ভে ছ আজ সুনীতার বাবা বেঁচে থাকলে, সে কতই না করত। এই ভেবে সে কেবল চোখের জল ফেলেছে।

শীতকালে আমি আবার দিল্লি গেলাম। আমি ভেবেছিলাম গোপা সুখী হবে। মেয়ে ভালো ঘরে, যোগ্য ছেলের হাতে পড়েছে। এর চেয়ে বেশি আর কী গোপার চাওয়ার ছিল; কিন্তু সুখ বোধহয় ওর কপালেই নেই।

ট্রেনের কাপড়চোপড়ও আমার ছাড়া হয়নি, গোপা ভেঙে পড়ল। বলল, বাড়ি, ঘর, ওপর দেখতা সবই খুব ভালো; কিন্তু জামাইটি অকর্মের ঢেঁকি। সুন্নি বেচারির কেঁদে কেঁদে দিন যায়। তুমি যদি ওকে দেখ, চিনতে পারবে না। কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে ক'দিন আগে এসেছিল, ওকে দেখলে বুক ফেটে যায়, জীবনে যেন সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। খাওয়াপরা, নিজের কোনো দিকেই তার কোনো দৃষ্টি নেই। আমার সুন্নির এমন দশা হবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কেমন গুম মেরে থাকে। কত জিজ্ঞেস করলাম, তোর সঙ্গো কেন সে কথাবার্তা বলে না। কেন এত বিমুখ? সুনীতা কোনো কথারই জবাব দেয় না, শুধু চোখের জল ফেলে। আমাব সুন্নি যে ভেসে গেল। আমি বললাম, ছেলের বাড়ির লোকজনদের কাছ থেকে খোঁজ খবর নিয়েছ?

নিয়েছি। সবই জানতে পেরেছি। ছেলে চায়, সে নিজের মর্জিমাফিক চলবে, সুন্নি যেন স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে মেনে চলে। সুন্নি তা সইবে কেন? তুমি তো জান, সুন্নির কত আত্মমর্যাদাবোধ। আর সে তো তেমন মেয়েই নয় যে, স্বামীকে দেবতা মনে করে সব রকম দুর্ব্যবহার সইবে। চিরটা কাল সে ভালোবাসা ও আদরে মানুষ। বাপেরও বড়ো আদুরে ছিল, আমারও সে নয়নের মণি, স্বামীটি ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়ায়। অর্ধেক রাতে বাড়ি ফেরে। দুজনের মধ্যে কী যেন হয়েছে কে জানে; পরস্পরের ভেতরে একটা ফারাক দেখা দিয়েছে। সে সুন্নিকে পরোয়া করে না, সুন্নিও তার ধার ধারেনা। কিন্তু পুরুষ মানুষ বাইরে বিলাসে মত্ত, সুন্নি এদিকে মরতে বসেছে। জামাইয়ের আর কী? তার সুন্নি না হয় মুন্নি আছে। কিন্তু সুন্নির জীবনে অবহেলা আর কান্না ছাড়া কী আছে। বলো?

আমি বললাম, তুমি সুন্নিকে বোঝালে না কেন? ছেলের ক্ষতি আর কতটুকুন? সুন্নির জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে।

গোপার চোখে জল ছলছলিয়ে উঠল। বলল, কোন প্রাণে বোঝাব বলতে পারো দাদা? সুন্নির দিকে তাকালে বুক ফেটে যায়। ইচ্ছে করে ওকে বুকের কাছাটিতে রেখে দিই, কেউ যেন ওর দিকে কড়া চোখে চাইতে পর্যন্ত না পারে। সুন্নি যদি মুখরা অসভ্য আয়েসি মেয়ে হত, হয়তো ওকে বোঝাতাম। স্বামী নিজের মুখ পুড়িয়ে বেড়াক তবু তুই ওকে মান্য করে চল, একথা কি ওকে বোঝাতে পারি? এ অপমান যে আমি নিজেও সইতে পারতাম না। স্ত্রী-পুরুষের এই বিবাহবন্ধনের প্রথম শর্তই হল, ষোলো-আনাই তারা পরস্পরের। এমন পুরুষ খুব অল্পই আছে, স্ত্রীকে বিপথগামী হতে দেখে সে চুপ করে থাকতে পারে; কিন্তু এমন মেয়ে অনেক পারে, যারা স্বামীকে স্বেচ্ছাচারী বলে ধরেই নেয়। সুন্নি যে তাদের মতো নয়। সে যদি আত্মসমর্পণ করে, পরিবর্তে আত্মসমর্পণ সে দাবি করে। স্বামী যদি তা না করে তাহলে সে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেও রাজি নয়। সারা জীবন যদি কেঁদেও কাটাতে হয়, সেও ভালো।

এই কথা বলে গোপা ভেতরে গিয়ে একটা গয়নার বাক্স এনে সেটা খুলে আমায় দেখিয়ে বলল, এবার সুন্নি এটা এখানে রেখে গেছে। এরই জন্য সে এসেছিল। এ সেই গয়না যেগুলো কত কষ্ট করেছি, বলতে পার, একরকম ভিক্ষে করেই করানো, সুন্নি এগুলোর দিকে একবার ফিরেও চায় না। কার জন্যই বা গায়ে দেবে? সাজগোজই বা করবে কার জন্যে? পাঁচটা তোরঙ্গ ভরতি কাপড়- দিয়েছিলাম, সেলাই করে করে আমার চোখ খারাপ হবার জোগাড় হয়েছিল, সব কাপড় চোপড় নিয়ে চলে এসেছে। এ সবের ওপর তার ঘেন্না ধরে গেছে। হাতে ক-গাছা কাচের চুড়ি আর সাদা একটা শাড়ি — সুন্নির এ বয়সের সাজ।

আমি গোপাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম — আমি নিজে গিয়ে একবার কেদারনাথের সঙ্গে দেখা করছি। দেখি একবার সে কেমন মেজাজের লোক।

গোপা হাত দুটি জোড় করে বলল — না, ভুলেও তুমি সেখানে যেয়োনা; শুনলে সুন্নি মরে যাবে। সে বড্ড অভিমানী, রশির মতো পুড়বে তবু বুনোন টসকাবে না। যে পায়ের লাথি তাকে খেতে হয়েছে, সেই পায়ে খোসামোদ জানাতে সে কখনো পারবে না। ভালোবাসা দিয়ে তাকে দাসী করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যে আমারই শাসন কোনোদিন সহ্য করেনি, সে অন্যের শাসন কী আর সইবে।

গোপাকে সে সময় আমি আর কিছু বললাম না, কিন্তু সময় করে লালা মদারিলালের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। আমি এর ভেতরের ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর করতে চাইছিলাম। ঘটনাচক্রে পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ এক জায়গাতেই হয়ে গেল। আমায় দেখামাত্র কেদারনাথ মাথা নিচু করে এমনভাবে প্রণাম করল যে, ওর ভদ্রতাবোধে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তক্ষুনি ভেতরে গিয়ে সে চা, মিষ্টি ও মোরব্বা নিয়ে এল, এমন সৌম্য ভদ্র ও নম্র ছেলে আমি আর দেখিনি। ওকে দেখলে ভাবাই যায় না যে, ওর ভেতর আর বাইরের মধ্যে কোনো ফারাক আছে। যতক্ষণ রইল মাথা নিচু করে বসে রইল। উচ্ছৃঙ্খলতা যেন ওকে স্পর্শই করেনি।

কেদারনাথ যখন টেনিস খেলার জন্য উঠে গেল, আমি মদারিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, কেদারবাবুকে তো বেশ সচ্চরিত্র লোক বলে মনে হচ্ছে, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম মনোমালিন্য হয়ে গল কেন? মদারিলাল এক মিনিট ভেবে নিয়ে বলল, এর কারণ আর কী বলব, দুজনেই বাপ-মায়ের অত্যন্ত আদুরে। আর এই ভালোবাসার ফলে ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের খেয়ালখুশিমতো চলে। সারাটা জীবন আমি শুধু সংগ্রাম করেই গেলাম, শেষ বয়সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। ভোগবিলাস যে কাকে বলে তা জানার অবসর পাইনি। সারাটা দিন খাটতাম, রাত্রি বেলায় শুয়ে পড়তাম। স্বাস্থ্যও ভালো ছিল না, সেই জন্যে কেবলই ভাবতাম কিছু সঞ্চয় করি। যাতে আমার অবর্তমানে ছেলেমেয়েদের হাত পাততে না হয় কারও কাছে। ফল কী হল জানেন? মহাশয়টি মুফতে অর্থ লাভ করলেন, মাথায় পাগলামি ঢুকল, মদ ধরল, আবার নাটক করার শখ হল। পয়সার অভাব ছিল না, তার ওপর মা-বাপের একমাত্র ছেলে, ওর খুশিতে আমাদের জীবন যেন ধন্য হয়ে যেত। লেখাপড়া তো চুলোয় গেল। বিলাসের ইচ্ছে বাড়তে থাকল। ক্রমে এসবে আরও মত্ত হয়ে উঠল, তার জীবনটাই নাটক হয়ে দাঁড়াল। এইসব দেখেশুনে আমার খুব চিন্তা হল, ভাবলাম বিয়ে দিয়ে দিই তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। গোপা দেবী যখন বিয়ের সম্বন্ধ পাঠালেন আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। সুন্নিকে আমি আগেই দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম, এমন রূপসী বউ পেয়ে ছেলের মতিগতি ফিরবে; কিন্তু সেও ভারী আদুরে মেয়ে, জেদি, অবোধ, আদর্শবাদী। সহিষ্ণুতা সে মোটেও শেখেনি। মানিয়ে চলার মূল্য যে জীবনে কতখানি সে বোধ সুন্নির একেবারেই নেই। কাঠে কাঠে লেগেছে। সুন্নি অহংকারে তাকে হারাতে চাইছে, আর কেদার অবহেলা দিয়ে জিততে চাইছে, এই হল আসল রহস্য। আর মশাই, আমি তো বউমাকেই বেশি দোষ দিই। ছেলেরা তো একটু বারমুখি হয়েই থাকে। মেয়েরা স্বভাবতই শান্ত ও নিজের কর্তব্যে সচেতন হয়। সেবা ত্যাগ ভালোবাসা তাদের অস্ত্র, পুরুষকে এই দিয়েই তারা জয় করে। সুন্নির মধ্যে এ সবের কোনো গুণই নেই। ভগবানই জানেন, এদের জীবন কীভাবে কাটবে?

হঠাৎ সুন্নি ভেতর থেকে এল। ওর চেহারায় আগের আদলটুকু অবিকল রয়ে গেছে, সুন্দর গানের প্রতিধ্বনির মতো। সোনা পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেছে। আশাভঙ্গের এমন ছবি আর হয় না। আমায় তিরস্কার করে সে বলল, কখন থেকে এসে বসে আছেন, আমায় খবর পর্যন্ত পাঠানো হয়নি, হয়তো আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যেতেন।

চোখের জল চেপে রেখে আমি বললাম, না সুন্নি, তা কী করে হতে পারে? তোমার কাছেই আমি যাচ্ছিলাম, আর তুমি নিজেই এসে পড়লে। মদারিলাল বাইরে গিয়ে চাকরকে দিয়ে

মোটরগাড়ি পরিষ্কার করাতে লাগলেন, হয়তো সুন্নির সঙ্গে আমায় কথা বলার সুযোগ দিতে চাইছিলেন। সুন্নি জিজ্ঞেস করল, মা ভালো আছে তো?

— হ্যাঁ, ভালোই আছে। কিন্তু নিজের এ কী দশা করেছ সুন্নি?

— আমি বেশ ভালোই আছি।

— তাহলে, এ সব কী শুনছি আমি? তোমাদের দুজনের মধ্যে না কি তেমন বনিবনা নেই? গোপা তোমার জন্য জীবনপাত করছে, আর তুমিও এদিকে মরতে বসেছ। একটু ভেবেচিন্তে কাজ করো।

সুন্নির ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠল, বলল, না-হক্ এ কথা তুললেন কাকু। নিজের মনকে আমি বুঝিয়ে ফেলেছি, আমি অভাগিনি, বাস, এর প্রতিকার আমার ক্ষমতার বাইরে। যেখানে আমার কোনো মূল্য নেই সেই জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে আমি অনেক শ্রেয় মনে করি। আমি যা দেব তার প্রতিদান আমি চাই। জীবনের অন্য কোনো রূপ আমার চিন্তায় আসে না। এ ব্যাপারে কোনোরকম আপস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পরিণাম কী হবে, আমি তার তোয়াক্কা করি না।

— কিন্তু ....

— না, কাকু এ ব্যাপারে আপনি আর কথা বলবেন না, তাহলে আমি চলে যাব।

— একটু ভেবে দেখ ....

— আমি সব কিছুই ভেবে দেখেছি, কী আমার করণীয়, তাও ঠিক করে ফেলেছি। পশুকে মানুষ বানানোর মতো শক্তি আমার নেই।

এরপর চুপ করে থাকা ছাড়া আমার আর পথ ছিল না।

পাঁচ

তখন মে মাস। আমি মুসৌরি গিয়েছিলাম। গোপার টেলিগ্রাম পেলাম, জরুরি দরকার, শিগগির এসো। আমি তো ঘাবড়ে গেলাম, তবে নিশ্চিত ছিলাম যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। পরের দিনই আমি দিল্লি পৌঁছলাম। নিষ্পন্দ নিষ্প্রাণ নীরব গোপা; যেন টিবি রোগী, আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সব ভালো তো? আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

বিষণ্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে সে বলল, সত্যি?

— সুন্নি ভাল আছে তো?

— হ্যাঁ, ভালোই আছে।

— আর কেদারনাথ?

— সেও ভালো আছে।

— তাহলে কী ব্যাপার বলো তো?

— কিছুই তো নয়।

— তুমি টেলিগ্রাম দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালে, আর বলছ যে কিছুই নয়?

— মন বড়ো অস্থির হয়েছিল, তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। কোনোভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সুন্নিকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। আমি তো সব কিছু করেও পারলাম না।

— ইদানীং নতুন কিছু ঘটেছে না কি?

— নতুন ঠিক নয়, তবে একরকম নতুনই বলতে পার। কেদার কোনো এক অভিনেত্রীর সঙ্গে পালিয়ে গেছে। গত এক সপ্তাহ ধরে ওর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সুন্নিকে বলে গেছে, যতদিন তুমি এ বাড়িতে থাকবে, আমি বাড়ি ফিরব না। বাড়ির লোকেরা সবাই সুন্নির শত্রু হয়ে উঠেছে, কিন্তু সুন্নি সেখান থেকে এক পাও নড়বে না। শুনতে পেলাম, কেদার তার বাবার সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে গেছে।

— তুমি নিজে সুন্নির সঙ্গে দেখা করেছ?

— হ্যাঁ, গত তিন দিন ধরে রোজই যাচ্ছি।

— সে যদি আসতে নাই চায়, থাক না।

— সে ওখানে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবে।

আমি ধুলোপায়েই সোজা মদারিলালের বাড়ি গিয়ে উঠলাম। যদিও আমি জানতান, সুন্নি কিছুতেই আসবে না, কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখি, একেবারে হুই হুই কাণ্ড। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ওখানে শবদেহ নিয়ে যাবার জন্য মাচা বাঁধা হচ্ছে। গোটা পাড়া ভেঙে পড়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে হাহাকার আর কান্না শোনা যাচ্ছে। এ যে সুন্নির মৃতদেহ।

আমায় দেখে মদারিলাল পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমি ভাই একেবারে বরবাদ হয়ে গেলাম। ছেলেও চলে গেল, বউও হারালাম। জীবনটা খানখান হয়ে গেল।

জানতে পারলাম, যেদিন কেদার বাড়ি থেকে পালায়, সেদিন থেকে সুন্নি আরও বেশি মনমরা হয়ে যায়। সেদিন সে নিজের হাতের কাচের চুড়িগুলি পর্যন্ত ভেঙে ফেলেছিল, সিঁথির সিঁদুরও মুছে ফেলেছিল। শাশুড়ি আপত্তি করায় তাঁকে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে। মদারিলাল নিজে বোঝাতে গেলে, তাঁকে কাটা কাটা কথা শুনিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছিল, সে পাগল হয়ে গিয়েছে। সবাই তার সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল।

আজ খুব ভোরে প্রায় অন্ধকার থাকতে সে যমুনায় স্নান করতে যায়। বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছিল, কাউকে সে জাগায়নি। সকালে বেশ বেলায় যখন বউকে বাড়িতে কোথাও দেখা গেল না তখন তার খোঁজ পড়ল। দুপুর বেলায় জানা গেল সে যমুনায় গিয়েছিল। সবাই তক্ষুনি সে দিকে দৌড়োল। সেখানে তার লাশ পাওয়া যায়। তারপর পুলিশ এল। ময়না তদন্ত হল, তারপর এই সবে মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। হায়! কিছুদিন আগেই তো এই সুন্দরী মেয়ে পালকি চেপে এসেছিল, আজ চারজনের কাঁধে চড়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে।

আমিও শবযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় দশটা হল। আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল। জানিনা এ খবর শোনার পর গোপার কী হবে? হয়তো তার প্রাণটুকুই বেরিয়ে যাবে। আমার এই ভয়ই হচ্ছিল। সুন্নি ছিল গোপার প্রাণ, ওকে ঘিরেই গোপার জীবন, তার মতো অভাগীর বাগানে ওই তো একটি মাত্র চারাগাছ — বুকের রক্ত দিয়ে সেটা সে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই মেয়েই ছিল গোপার জীবনের বসন্তের সোনালি স্বপ্ন। কত সাধ ছিল — চারাগাছে কচিপাতা গজাবে, ফুল ফুটবে, ফল ধরবে, পাখিরা ডালে বসে মিষ্টি সুরে গান গাইবে। কিন্তু আজ নিষ্ঠুর নিয়তি তার জীবনের সেই অবলম্বনকে উপড়ে ফেলে দিল। কী নিয়ে

গোপা বাঁচবে? জীবনের কেন্দ্রবিন্দুটাই যে আজ মুছে গেছে, যেখানে জীবনের সবগুলি রেখা গিয়ে একত্রে মিলত।

নিজেকে সামলে নিয়ে কোনোমতে আমি দরজার শেকল নাড়ালাম। লণ্ঠন হাতে গোপা বেরিয়ে এল। গোপার মুখে যেন নতুন ধরনের এক দীপ্তি দেখলাম।

আমার বিষণ্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে মায়ের মতো আমার হাত দুটো ধরে বলল, আজ তো তোমার সারাদিন কেঁদে কেঁদে কেটেছে। শবযাত্রায় নিশ্চয় অনেক লোক হয়েছিল। আমারও মনে হয়েছিল সুন্নিকে শেষ বারের মতো একবার দেখে আসি, তারপর ভাবলাম, সুন্নিই যখন আর নেই, ওর মৃতদেহ দেখে আর কী করব? তাই আর গেলাম না।

আমি অবাক হয়ে গোপার দিকে তাকালাম। তার মানে এই শোকসংবাদ ইতিমধ্যেই সে পেয়ে গিয়েছে। তবু সে আজ এত শান্ত। কী অবিচল ধৈর্য?

বললাম, না গিয়ে ভালোই করেছ, কাঁদতেই তো হত।

—হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী? এখানে বসেও সেই তো কাঁদতাম। কিন্তু তোমায় আজ সত্যি বলছি, মন থেকে আমি কাঁদিনি। কী জানি কেন চোখ দিয়ে আমার জল পড়ছে। সুন্নির মৃত্যুতে আমি খুশিই হয়েছি। অভাগিনি নিজের মানমর্যাদা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। নইলে না জানি আরও কত কী সইতে হত। এ জন্যেই আমি আরও খুশি যে, নিজের মান সে রক্ষা করতে পেরেছে। স্ত্রী যদি জীবনে ভালবাসাই না পায় তবে সে জীবন শেষ হয়ে যাওয়াই ভালো। তুমি সুন্নির মুখ দেখেছিলে? লোকেরা বলছিল, তার মুখে হাসি লেগে আছে বলে মনে হচ্ছিল। আমার সুন্নি তো সত্যিকার দেবী ছিল। জানো দাদা! মানুষ কি এজন্য বাঁচতে চায় যে সারাটা জীবন তাকে কাঁদতে হবে। যদি কেউ জেনে যায়, জীবনে দুঃখ ছাড়া আর পাবার কিছু নেই, বেঁচে থেকেই বা কী তার করার আছে? কেনই বা সে বাঁচবে? খাবে, ঘুমোবে আর মরে যাবে বলে? একথা আমি বলছি না যে; সুন্নির কথা আমার মনে পড়বে না, আর তাঁর কথা ভেবে চোখের জল আমি ফেলব না, কিন্তু সে চোখের জল আমার দুঃখের অশ্রু নয়, সে আমার আনন্দাশ্রু। বীর সন্তানের মায়েরা, সন্তানের বীরের মতো মৃত্যুতে খুশি হয়। সুন্নির মৃত্যু কী কম গৌরবের? চোখের জল ফেলে সে গৌরবের আমি অনাদর করতে চাইনা। আমার সুন্নি জানে, পৃথিবীতে যে যতই তার নিন্দে করুক, তার মা তার প্রশংসাই করবে। ওর আত্মার কাছে থেকে এই আনন্দটুকুও আমি কেড়ে নেব। অনেক রাত হল, এবার ওঠ, ওপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়োগে। আমি তোমার বিছানা পেতে রেখে এসেছি; কিন্তু একলা বিছানায় পড়ে পড়ে যেন কেঁদো না। সুন্নির যা করা উচিত তাই সে করেছে। আজ যদি সুন্নির বাবা বেঁচে থাকত তবে মেয়ের প্রতিমা গড়িয়ে পুজো করত।

আমি ওপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার মনের ভার তখন অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু থেকে থেকে একটা সন্দেহ উঁকি মারছিল, গোপার মনের এই প্রশান্তি তার আকুল বেদনার নামান্তর নয়তো?

(শান্তি / ১৯৩৪) অনুবাদ দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কেজরিওয়ালা

দুখের দাম

এখন বড়ো বড়ো শহরে ধাত্রী, নার্স ও লেডি ডাক্তার সবই পাওয়া যায়; কিন্তু গ্রামের প্রসূতি-আগারে এখনও মেথরানিদেরই প্রভুত্ব এবং নিকট ভবিষ্যতে এব্যবস্থার পরিবর্তনের কোনো আশা নেই। মহেশনাথ ছিলেন গ্রামের জমিদার। নিজে শিক্ষিত ছিলেন বলে প্রসূতিসদন সংস্কারের আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; কিন্তু এত প্রতিবন্ধকতা ছিল যে তা কাটিয়ে ওঠা খুবই শক্ত। কোনো নার্স তো গ্রামে যেতে রাজিই হত না। অনেক বলাকওয়ার পর রাজি হলেও এত বেশি টাকা চেয়ে বসত যে, বাবু সাহেবের মাথা নিচু করে চলে আসা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকত না। লেডি ডাক্তারের কাছে যাবার সাহস তাঁর ছিল না। তার ফি পুরোটা দিতে গেলে হয়তো তাঁকে তাঁর অর্ধেক জমিই বেচতে হবে। তাই তিন মেয়ের পর যখন চতুর্থ বারে ছেলে হল তখনও সেই গুদড় আর তার বউ। ছেলেমেয়ে বেশির ভাগ রাত্রেই জন্ম নেয়। একদিন মধ্যরাত্রে পেয়াদা গুদড়ের দরজায় এসে এত চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল যে, পাড়াপ্রতিবেশীরও ঘুম ভেঙে গেল। মেয়ে হলে গলার এত জোর হত না।

এই শুভ মুহূর্তটির জন্য গুদড়ের ঘরে মাসাধিক কাল নানা জল্পনাকল্পনা চলছিল। ভয় এটাই ছিল, আবার না মেয়ে হয়ে যায়; তা হলে তো বাঁধা সেই একটা টাকা আর একখানা শাড়ি। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কত বার ঝগড়া হয়ে গেছে। বাজি সাব্যস্ত হয়েছে। স্ত্রী বলেছে—এবার ছেলে না হলে আমি মুখ দেখাব না। হাঁ হাঁ, মুখ দেখাব না। সব লক্ষণ ছেলের। আর গুদড় বলেছে—দেখে নিস, মেয়ে হবে। মেয়েই হবে। ছেলে হলে গোঁফ কামিয়ে ফেলব। গুদড় হয়তো ভাবত যে, নিজের স্ত্রীর মনে পুত্রকামনা প্রবল করে সে পুত্রের আগমনের পথকেই সুগম করছে।

ভুঙ্গি বলল—এখন যা না মুখপোড়া, গোঁফ কামিয়ে আয়। বলছিলাম না ছেলে হবে। মানতেই চাইছিলি না। আমিই নিজে তোর গোঁফ উপড়ে নেব, গোড়াসুদ্ধ উপড়ে নেব।

গুদড় বলল—আচ্ছা, উপড়ে নিবি, ভালোমানুষের বেটি। গোঁফ কি আর উঠবে না? তিন দিনের মধ্যেই দেখবি, যা ছিল তাই হয়ে গেছে। তবে যা পাবি, বলে রাখছি তার অর্ধেক আমি নেব।

ভুঙ্গি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের তিন মাসের ছেলেকে গুদড়ের জিম্মায় রেখে পেয়াদার সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

গুদড় চেঁচিয়ে বলল—আরে, শুনে যা। কোথায় পালাচ্ছিস? আমাকেও তো বাজনা বাজাতে যেতে হবে। একে সামলাবে কে?

ভুঙ্গি দূর থেকেই বলল—একে ওখানেই মাটির উপর শুইয়ে দিবি। আমি এসে দুধ খাইয়ে যাব।

দুই

মহেশনাথের ওখানে ভুঙ্গির এখন খুব খাতিরযত্ন শুরু হয়েছিল। সকালে সুজির পায়েস, দুপুরে পুরি-হালুয়া খেতে পেত; তারপর বিকালে ও আবার রাত্রে খাবার পেত। আর সেই সঙ্গে গুদড়ও পুরোদস্তুর খাওয়া পেত। ভুঙ্গি নিজের ছেলেকে দিনেরাত্রে দু-এক বারের বেশি দুধ খাওয়াতে পারত না। তার জন্য বাইরের দুধের ব্যবস্থা বারো দিনের দিনও বন্ধ হল না। জমিদার-পত্নী স্বাস্থ্যবতী মহিলাই ছিলেন; তবে কী কারণে জানি এবার তার বুকে দুধ এলই না। অথচ তিন মেয়ের সময় তার দুধ এত পর্যাপ্ত ছিল যে, তা খেয়ে খেয়ে মেয়েদের বদহজম হয়ে যেত। এখন এক ফোঁটাও নেই। ভুঙ্গি ধাত্রীও ছিল আবার দুধও খাওয়াত।

জমিদার-গিন্নি বলতেন—ভুঙ্গি, তুই আমার ছেলেকে বড়ো করে দে। যতদিন তুই বাঁচবি, বসে বসে খেতে পাবি। পাঁচ বিঘা জমি এমনি লিখে দেব। নাতিপুতি নিয়ে সুখে থাকতে পারবি।

এদিকে ভুঙ্গির ছেলে বাইরের দুধ হজম করতে না পেরে বারে বারে বমি করে দুর্বল হয়ে যেতে লাগল।

ভুঙ্গি বলত—বউদি, অন্নপ্রাশনে কিন্তু আমাকে চুড়ি দিতে হবে বলে রাখছি।

বউদি উত্তর দিতেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিবি চুড়ি। ভয় দেখাচ্ছিস না কি? রুপোর নিবি, না সোনার?

— বাঃ বউদি! রুপোর চুড়ি পরে কাকে মুখ দেখাব, আর আপনাকে নিয়েই তো লোকে হাসাহাসি করবে।

— আচ্ছা, সোনার চুড়িই নিস; বলে তো দিয়েছি।

— বিয়েতে হার নেব আর চৌধুরির (গুদড়) জন্য হাতের বাজু।

— তাও নিবি! ভগবান সে দিন দিলে তো!

জমিদারের সংসারে গিন্নির পরেই ছিল ভুঙ্গির কর্তৃত্ব। জমিদার গিন্নি, জমিদার, চাকর, চাকরান সকলেই তাকে মানত। এমন কী, স্বয়ং জমিদার-গিন্নিও তার কাছে চুপ করে থাকতেন। একবার তো সে মহেশনাথকেও দুকথা শুনিয়ে দিয়েছিল। তিনি হেসেছিলেন। মেথরদের নিয়ে কথা হয়েছিল। মহেশনাথ বলেছিলেন—পৃথিবীতে আর যাই হোক না কেন, মেথর মেথরই থেকে যাবে। এদের মানুষ বানানো কঠিন।

এতে ভুঙ্গি উত্তর দিয়েছিল—মালিক, মেথরদের হাত তো কত বড়ো বড়ো মানুষ গড়ে তোলে। কে আবার তাদের মানুষ বানাবে! .

অন্য কোনো সময় হলে এরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাবের পর ভুঙ্গির মাথার চুল কি একটাও থাকত! বাবু সাহেব কিন্তু সেদিন হা হা করে হেসে বললেন—ভুঙ্গি লাখ কথার এক কথা বলে।

তিন

ভুঙ্গির রাজত্ব এক বছরের বেশি গেল না। শিশু মেথরানির দুধ খাবে, ব্রাহ্মণরা এতে আপত্তি করলেন। মোটেরাম শাস্ত্রী তো প্রায়শ্চিত্ত করার বিধানই দিয়ে দিলেন। দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই প্রায়শ্চিত্তের কথায় আর কেউ পাত্তা দিল না। মহেশনাথ তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন—প্রায়শ্চিত্তের কথা তো খুব বলছেন, শাস্ত্রীজি। কাল পর্যন্ত ছেলে ওই মেথরানির দুধ খেয়ে বেঁচেছিল। আর আজ দোষ হয়ে গেল! চমৎকার আপনার ধর্ম!

শাস্ত্রীজি টিকি নেড়ে বললেন—এটা সত্য যে, সে কাল পর্যন্ত মেথরানির রক্ত পান করে বেঁচেছিল। মাংস ভক্ষণ করে বেঁচেছিল, এটাও সত্য। তবে কালকের কথা কাল, আজকের কথা আজ। পুরীর জগন্নাথদেবের ওখানে তো ছুত-অচ্ছুত সব এক পঙ্‌ক্তিতে বসে ভোজন করে। তা বলে এখানে তো খেতে পারবে না। অসুস্থ অবস্থায় তো আমরাও কাপড় না ছেড়েই খেয়ে নিই। খিচুড়ি পর্যন্ত খেয়ে নিচ্ছে, বাবুজি। কিন্তু ভালো হয়ে উঠলে তো অবশ্যই নিয়ম পালন করতে হয়। আপদ্ধর্মের কথা আলাদা।

— তা হলে এর অর্থ হল এই যে, ধর্ম পরিবর্তনশীল। কখনও এক রকম, আবার কখনও আর এক রকম।

— তাই। রাজার ধর্ম এক, আবার প্রজার আর এক। ধনীর ধর্ম এক, গরিবের ধর্ম আর এক। রাজা-মাহারাজ যা খুশি খেতে পারেন; যার সঙ্গে খুশি খেতে পারেন; যার সঙ্গে ইচ্ছা বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। তাঁদের কোনো বন্ধন নেই। ওঁরা সমর্থ পুরুষ; বন্ধন হল মধ্যস্তরের লোকের জন্য।

প্রায়শ্চিত্ত হল না ঠিকই তবে ভুঙ্গিকে তার আসন থেকে বিচ্যুত হতে হল। তবে দানদক্ষিণা সে এত পেয়েছিল যে সে একা নিয়ে যেতে পারেনি। এমন কী, সোনার চুড়িও পেয়েছিল। একটার জায়গায় দুটো সুন্দর শাড়ি, মেয়ে হবার সময় যে রকম পেয়েছিল, সে রকম যেমন-তেমন নয়।

চার

সে বছরই প্লেগ মারাত্মক হয়ে দেখা দিল আর প্রথমেই গুদড় তার কবলে পড়ে গেল। ভুঙ্গি হয়ে গেল একা। তবে সংসারের কাজ কোনো রকমে চলে যেতে থাকল। লোকে হাঁ করে বসেছিল—ভুঙ্গির বুঝি এবার হয়ে গেল! অমুক মেথর এসে কথা বলে গেল; তমুক চৌধুরি এসে দেখা করল; কিন্তু ভুঙ্গি কারুর কাছে বা কোথাও গেল না। এভাবেই পাঁচ বছর কেটে গেল আর তার ছেলে মঙ্গল দুর্বল ও সদা রুগ্‌ণ হওয়া সত্ত্বেও ছোটাছুটি শুরু করে দিল। সুরেশের সামনে মঙ্গলকে খুবই নগণ্য মনে হত।

ভুঙ্গি এক দিন মহেশনাথের বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করছিল। মাসাধিক কাল ময়লা জমে ছিল বলে উঠোনে জল জমতে শুরু করেছিল। নর্দমায় একটা লম্বা ও মোটা বাঁশ ঢুকিয়ে ভুঙ্গি খুব জোরে ঠেলছিল। তার ডান হাত ছিল সম্পূর্ণ নর্দমার মধ্যে। হঠাৎ সে চিৎকার করে হাত বাইরে নিয়ে আসতেই একটা কৃষ্ণকায় সাপ নর্দমা থেকে বেরিয়ে গেল। লোকজন দৌড়ে গিয়ে সাপ মেরে ফেলল ঠিকই, কিন্তু ভুঙ্গিকে বাঁচানো গেল না। ভেবেছিল জলের সাপ, বিষধর হবে না। তাই প্রথমে কিছুটা গাফিলতিও করেছিল। যখন বিষ সারা দেহে ছড়িয়ে গিয়ে খিঁচুনি শুরু হল তখন খেয়াল হল যে, জলসাপ নয়, চন্দ্রবোড়া।

মঙ্গল এখন অনাথ। সারাদিন সে মহেশবাবুর দরজাতেই ঘুর ঘুর করে। বাড়িতে এঁটোকাঁটা এত বেঁচে যেত যে তা দিয়ে এরকম পাঁচ-সাতটা বাচ্চার হয়ে যায়। খাওয়া কম হত না ঠিকই তবে, হাঁ, মঙ্গলের তখনই খারাপ লাগত যখন মাটির ভাঁড়ে উপর থেকে খাবার ঢেলে দেওয়া হত। সব লোক ভালো ভালো বাসনে খাবে আর তার বেলায় মাটির ভাঁড়।

তবে এসব ভেদ-জ্ঞান তার একেবারেই হত না; তবে গ্রামের ছেলেরা তাকে অপমানের একশেষ করত। কেউ তার সঙ্গে খেলাধুলোও করত না। এমন কী, যে চটের উপর সে ঘুমোত তাও ছিল অস্পৃশ্য। বাড়ির সামনে একটা নিমগাছ ছিল। তারই নীচে ছিল মঙ্গালের ডেরা। সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটা ছেঁড়ামতো চটের টুকরো, দুটো মাটির ভাঁড় আর সুরেশের ফেলে দেওয়া একটা ধুতি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই এই জায়গা ছিল সমান আরামদায়ক। আর ভাগ্যের বলি মঙ্গাল গা-ঝলসানো লুর মধ্যে, জমে যাওয়া শীতে ও মুষলধার বর্ষাতেও আগের চেয়ে ভালো স্বাস্থ্য নিয়েই বেঁচে ছিল। আপনার বলতে তার ছিল গ্রামের একটা কুকুর, স্বজাতীয়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে যে মঙ্গালের শরণ নিয়েছিল। দুজনে একই খাবার খেত, একই চটের উপর নিদ্রা যেত। শরীরও দুজনের ছিল একই রকম। আর দুজনেই দুজনের স্বভাবও জেনে গিয়েছিল। কখনও তাদের ঝগড়া হত না।

গ্রামের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা জমিদার মশাইর এহেন উদারতায় আশ্চর্য হয়ে যেত। ঠিক দরজার সামনে— পঞ্চাশ হাত দূরও হবে না—মঙ্গালের এই অবস্থান তাদের কাছে পুরোপুরি ধর্মবিরুদ্ধ মনে হত। ছিঃ, এই অবস্থা যদি চলে তা হলে তো অল্প দিনের মধ্যেই ধর্মের শেষ বলে ধরতে হবে। মেথরও যে ভগবানের সৃষ্টি এটা তো আমরাও জানি। এদের প্রতি যে আমাদের কোনো রকম অন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয় তাই বা কে না জানে? ভগবানের নামই তো পতিতপাবন। তবে সমাজের মর্যাদা বলেও তো একটা বস্তু রয়েছে! মহেশনাথের ওখানে যেতেই সংকোচ হয়। তবে তিনি গ্রামের মাথা, তাঁর কাছে তো যেতে হবেই। এটা কিন্তু নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঘৃণা হয়।

মঙ্গাল ও টমির মধ্যে ছিল গভীর হৃদ্যতা। মঙ্গাল বলত—দেখ ভাই টমি, আরও একটু সরে শোও। নয়তো আমি কোথায় শোব? সমস্ত চট তো তুমিই নিয়ে নিয়েছ।

টমি কুঁ-কুঁ করত, ল্যেজ নাড়ত আর সরে শোবার পরিবর্তে আরও কাছে উঠে এসে মঙ্গালের মুখ চাটতে শুরু করত।

রোজ সন্ধ্যায় একবার সে নিজের ঘর দেখতে ও সেখানে কিছু সময়ের জন্য কাঁদতে যেত। প্রথম বছর খড়ের চালটা পড়ে গেল; দ্বিতীয় বছর একটা দেওয়াল ভেঙে গেল। তারপর দাঁড়িয়ে থাকল আধভাঙা এবড়োখেবড়ো দেওয়ালগুলো। এখানেই সে পেয়েছিল তার ভালোবাসার ধন। সেই স্মৃতি, সেই আকর্ষণ, সেই ভালোবাসাই তাকে দিনান্তে একবার সেই নির্জন ভিটায় টেনে নিয়ে যেত আর টমি সব সময় থাকত তার সঙ্গে। মঙ্গাল সেই এবড়োখেবড়ো দেওয়ালের উপর বসে অতীত জীবনের ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করত আর টমি বারবার লাফিয়ে উঠে তার কোলে গিয়ে বসার অসফল প্রয়াস করে যেত।

পাঁচ

একদিন কতকগুলি ছেলে খেলছিল। মঙ্গালও সেখানে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার উপর সুরেশের দয়া হল না; খেলার সঙ্গী কম পড়ে গিয়েছিল বলা যায় না। সে যাই হোক, সুরেশ ঠিক করল যে, আজ মঙ্গালকেও খেলায় শরিক করে নেওয়া হবে। এখানে আর কে দেখতে আসছে।

সুরেশ বলল—কীরে মঙ্গাল, খেলবি?

মঙ্গল বলল—না রে, ভাই। বাবু যদি দেখে ফেলেন তো আমার চামড়া তুলে নেবেন। তোমাদের আর কী! তোমরা তো সরে পড়বে।

সুরেশ বলল—তা, এখানে কে দেখতে আসছে রে? চল্, আমরা ঘোড়া ঘোড়া খেলব। তুই ঘোড়া হবি আর আমরা তোর উপর চড়ে ঘোড়া দৌড়োব।

মঙ্গল শঙ্কা প্রকাশ করল—আমি কি সব সময়ই ঘোড়াই থাকব না সওয়ারও হব? এটা বলো।

প্রশ্নটা ছিল বাঁকা প্রশ্ন। কেউই ভেবে দেখেনি। সুরেশ এক মুহূর্ত ভেবে বলল—তোকে কে পিঠে চড়তে দেবে বল্? তুই আসলে মেথর তো, না কী?

মঙ্গল কঠিন হয়ে উত্তর দিল—আমি কখন বলেছি যে আমি মেথর নই? তোমাকে কিন্তু আমার মা দুধ দিয়ে বড়ো করেছিল। যতক্ষণ আমাকে সওয়ার হতে না দেবে, আমি ঘোড়া হব না। তোমরা খুব চালাক। নিজেরা মজা করে সওয়ার হবে আর আমি ঘোড়া হয়েই থাকব।

সুরেশ মেজাজ দেখিয়ে বলল—তোকে ঘোড়া হতেই হবে। বলেই সে মঙ্গলকে ধরতে ছুটল। মঙ্গল পালাল, সুরেশও দৌড়োতে লাগল। মঙ্গল আরও জোরে ছুটতে লাগল। সুরেশ বেগ বাড়াল। ভুবে বেশি খেয়ে খেয়ে সে থলথলে হয়ে গিয়েছিল এবং দৌড়োতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত থেমে গিয়ে সুরেশ বলল—এসে ঘোড়া হয়ে যা মঙ্গল, নয়তো কখনও ধরতে পারলে তোকে আচ্ছা পিটুনি দেব।

— তোমাকেও ঘোড়া হতে হবে।

— ঠিক আছে, আমিও ঘোড়া হব।

— তুমি পরে কেটে পড়বে। আগে তুমি ঘোড়া হও, আমি সওয়ার হয়ে নিই। পরে আমি হব।

আসলে সুরেশ ধাপ্পা দিতে চেয়েছিল। মঙ্গলের এই কথা শুনে সাথিদের বলল—দেখছিস এর বদমাইসি। মেথর তো!

তিন জনে মঙ্গলকে ঘিরে ফেলে জবরদস্তি ঘোড়া বানিয়ে দিল। সুরেশ চটপট তার পিঠের উপর চেপে বসে দুলেদুলে বলতে লাগল—চল্, ঘোড়া চল্।

মঙ্গল কিছু দূর পর্যন্ত তো গেল; কিন্তু ওই বোঝার চাপে তার কোমর ভেঙে যাচ্ছিল। সে আস্তে পিঠ সংকুচিত করে সুরেশের উরুর নীচ থেকে সরে গেল। সুরেশ বাবাজি পড়ে গিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

মা শুনলেন, সুরেশ কোথাও কাঁদছে। সুরেশ কোথাও কাঁদলে তার আওয়াজ নিশ্চিত তার কানে এসে লাগত আর তার কান্নাও ছিল অদ্ভুত ধরনের—যেন ছোটো লাইনের ইঞ্জিনের আওয়াজ।

চাকরকে বললেন—দেখ্ তো, সুরেশ কোথায় কাঁদছে। জিজ্ঞেস করতো কে মেরেছে।

এরই মধ্যে সুরেশ নিজেই চোখ ঘষতে ঘষতে এসে হাজির হল। সুরেশ যখন কাঁদার সুযোগ পেত তখন মার কাছে নালিশ জানাতে অবশ্যই আসত। মাও তাকে মিষ্টি, ফল ইত্যাদি দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতেন। সুরেশের বয়স হয়েছিল আট বছর; কিন্তু সে ছিল একটা আস্ত

গবেট। মাত্রাতিরিক্ত ভোজনে শরীরের যে হাল হয়, মাত্রাতিরিক্ত আদরে তার বুদ্ধিরও সেই হাল হয়েছিল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—কেন কাঁদছিস রে, সুরেশ? কে মেরেছে?

সুরেশ কাঁদতে কাঁদতে বলল—মঙ্গল ছুঁয়ে দিয়েছে।

সুরেশের মার বিশ্বাস হল না। মঙ্গল এতই নিরীহ যে, তার দিক থেকে কোনোরকম বদমাইসির আশঙ্কাই ছিল না। কিন্তু সুরেশ যখন শপথ করে বলতে লাগল তখন বিশ্বাস না করে উপায় থাকল না। মঙ্গলকে ডাকিয়ে তিনি বকাবকি করলেন। বললেন—কেন রে মঙ্গল, তুই এমন বদমাইসি করছিস? তোকে বলেছি না, সুরেশকে কখনও ছুঁবি না। মনে আছে কি নেই, বল?

মঙ্গল ধরা গলায় বলল—কেন মনে থাকবে না।

— তাহলে তুই কেন ওকে ছুঁলি?

— আমি ছুঁইনি।

— তুই ছুঁসনি তাহলে ও কাঁদছে কেন?

— পড়ে গিয়েছিলেন, সেই জন্য কাঁদছেন।

একে চুরি, তায় আবার বজ্জাতি! মা ঠাকরুন দাঁতে দাঁত ঘষে থেমে গেলেন। মারলে তো তক্ষুনি স্নান করতে হত। হাতে তো লাঠি নিতেই হত আর সেই লাঠির মাধ্যমেই অস্পৃশ্যতার বিদ্যুৎপ্রবাহ তার শরীরে প্রবেশ করত। কাজেই যত পারলেন গালিগালাজ করলেন এবং হুকুম দিলেন—এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যা। আবার যদি কখনও এই দরজায় তোর চেহারা দেখা যায় তা হলে তোকে একেবারে শেষ করে দেব। মাগনা রুটি খেয়ে খেয়ে বদমাইসি শিখছিস.....ইত্যাদি ইত্যাদি।

মঙ্গলের লজ্জা হল না বটে, তবে সে ভয় পেল। নীরবে মাটির ভাঁড় দুটো তুলে, চটের টুকরোটা বগলে নিয়ে, ধুতি কাঁধের উপর ফেলে কাঁদতে কাঁদতে সে সেখান থেকে চলে গেল। আর কখনও সে এখানে আসবে না। এটাই তো হবে যে, না খেয়ে মরে যেতে হবে! তাতে আর কী ক্ষতি! এভাবে বেঁচে লাভই বা কী? গ্রামে তার যাবার আর জায়গাই বা কোথায়? মেথরকে আর কেই বা আশ্রয় দেবে? মঙ্গল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খুব কাঁদল। তারপর তাদের বাড়ির সেই ধ্বংসস্তূপের দিকেই চলল। সেখানকার অতীত সুখস্মৃতি তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারে।

সেই সময় টমি তাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হল। আর দুজনে তাদের ব্যথা ভুলে গেল।

ছয়

কিন্তু দিন শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের মনের গ্লানিও দূর হয়ে আসছিল। শিশু বয়সের অসহ্য খিদে শরীরের রক্ত চুষে আরও বেড়ে যাচ্ছিল। মঙ্গলের দৃষ্টি বারে বারে মাটির ভাঁড়ের দিকে চলে যাচ্ছিল। ওখানে থাকলে এখনও সুরেশের এঁটো মিষ্টি জুটে যেত। এখানে কী খাব, ধুলো?

সে টমির সঙ্গে পরামর্শ করল : কী খাবে, টমি? আমি তো না খেয়েই পড়ে থাকব।

টমি কুঁ-কুঁ করে সম্ভবত বলল—এরকম অপমান তো জীবনভরই সহ্য করতে হবে। এতেই যদি মন খারাপ কর তাহলে কী করে চলবে? আমাকে দেখ না, কেউ হয়তো লাঠি দিয়ে মারল,

চেঁচিয়ে উঠলাম, আবার একটু পরেই ল্যাজ নেড়ে তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমি তুমি—আমাদের এই জন্যই জন্ম হয়েছে, ভাই।

মঙ্গল বলল—তাহলে তুমি যাও। যা পাবে খেয়ে নেবে। আমার জন্য ভাববে না।

টমি তার সারমেয়ের ভাষায় বলল—আমি একা যাচ্ছি না, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

— আমি যাচ্ছি না।

— না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

— তা, তুমি কি বেঁচে থাকবে?

— আমার জন্যে চোখের জল ফেলতে কে বসে রয়েছে?

— আমার একই কথা, ভাই। যে কুকুরীটাকে ভালবেসেছিলাম সে বিশ্বাসঘাতকতা করে এখন কল্লুর সঙ্গে থাকে। তবে ভালো এই হয়েছে যে, নিজের বাচ্চাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গেছে, না হলে আমার অবস্থা আরও খারাপ হত। পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চাকে কে পালত?

একটু পরেই খিদের জ্বালায় এক অন্য চিন্তা তার মাথায় এল।

— গিন্নি-মা হয়তো আমাদের খুঁজছেন, কী বল্ টমি?

— ঠিক তাই, বাবুজি ও সুরেশের খাওয়া হয়ে থাকবে। তাদের থালা থেকে এঁটো খাবার ফেলে দিয়ে হয়তো কাহার আমাদের ডেকেছে।

— বাবুজি ও সুরেশের থালায় অনেক ঘি লেগে থাকে আর থাকে মিষ্টি মিষ্টি খাবার—হাঁ, মালাই থাকে।

— সবারই সব কিছু আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে।

— দ্যাখতো কেউ আমাদের খুঁজতে আসছে কিনা?

— খুঁজতে কে আসবে? তুমি কি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত? একবার 'মঙ্গল মঙ্গল' করবে আর পরেই থালার খাবার নর্দমায় ঢেলে দেবে।

— আচ্ছা, চল তবে যাই। আমি কিন্তু লুকিয়ে থাকব। যদি কেউ আমার নাম ধরে না ডাকে তাহলে কিন্তু চলে আসব। এটা বুঝে নিও।

দুজনে ওখান থেকে বেরিয়ে মহেশনাথের দরজার কাছে এসে অন্ধকারে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু টমির সবুর সইবে কেন? সে আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। সে দেখল, মহেশনাথ ও সুরেশ খেতে বসেছেন। সে আস্তে গিয়ে চাতালে বসল। তবে ভয় ছিল, কেউ না আবার লাঠি চালিয়ে দেয়।

চাকরদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। একজন বলল—আজ মংলাকে দেখা যাচ্ছে না। গিন্নি-মা বকেছেন তো তাই বোধ হয় পালিয়েছে।

আর একজন বলল—তাড়িয়ে দিয়েছেন, ভালো করেছেন। সকাল বেলাতেই মেথরের মুখ দেখতে হত।

মঙ্গল আরও অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল। তার আশা গভীর জলে তলিয়ে গেল।

মহেশনাথের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চাকর হাত ধোবার জল দিচ্ছিল। মহেশনাথ এখন তামাক খেয়ে শুয়ে পড়বেন। সুরেশ তার মার কাছে বসে কোনো গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে। গরিব মঙ্গলের চিন্তা কে করে? এত দেরি হয়ে গিয়েছিল, তবু ভুলেও কেউ ডাকল না!

কিছুক্ষণ সে ওখানেই নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেই সে চলে যাবে অমনি দেখতে পেল কাহার পাতায় করে থালার এঁটো খাবার নিয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গল অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়াল। এখন কী করে সে মনকে প্রবোধ দেবে?

কাহার বলল—আরে! তুই এখানে ছিলি? আমি ভেবেছিলাম, কোথাও চলে গিয়েছিস। নে, খেয়ে নে। আমি তো ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম।

মঙ্গল দীনভাবে বলল—আমি তো অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

— তাহলে বলিসনি কেন?

— ভয়ে।

— আচ্ছা, নে খেয়ে নে।

কাহার পাতা তুলে নিয়ে মঙ্গালের প্রসারিত হাতে ছুঁড়ে দিল। মঙ্গাল দীন কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে তার দিকে চেয়ে দেখল।

টমিও ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। দুজনে সেই নিমগাছেরই নীচে পাতায় খেতে লাগল।

মঙ্গাল এক হাতে টমির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—দেখলে, একেই বলে পেটের আগুন! এই লাথি-মারা রুটিও যদি না জুটত তা হলে কী করতে?

টমি ল্যাজ নাড়ল।

সুরেশকে আমার মা দুধ দিয়ে বড়ো করেছিল।

টমি আবার লেজ নাড়ল।

— লোকে বলে, দুধের দাম কেউ শোধ করতে পারে না। সেই দুধের এই দাম আমি পাচ্ছি।

টমি আবার লেজ নাড়ল।

(দুধ কা দাম / ১৯৩৪) অনুবাদ অমলকুমার রায়

মুফত যশ

সে সময় ঘটনাচক্রে জেলাশাসক ছিলেন এক রসিক ভদ্রলোক। ইতিহাসে ও প্রাচীন মুদ্রার অনুসন্ধানে তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঈশ্বরই জানেন, দপ্তরের নীরস কাজকর্ম সেরে তিনি ঐতিহাসিক গবেষণার সময় পেতেন কী করে! ওখানকার যে কোনো অফিসারকে জিজ্ঞেস করুন, প্রত্যেকেই বলবেন—কাজের চাপে মারা যাচ্ছি, মাথা তোলার ফুরসত পাচ্ছিনা। মনে হয় শিকার আর ঘোরাঘুরিও ছিল তাঁর কাজের মধ্যে। আমি ভদ্রলোকের কাজকর্ম দেখেছি, মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধাও করতাম, কিন্তু তাঁর সরকারি পদমর্যাদা আমাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার ভয় ছিল, যদি আমি যেচে আলাপ করতে যাই, লোকে বলবে, নিশ্চয়ই আমার কোনো স্বার্থ আছে। এধরনের অপবাদ আমি কিছুতেই মাথা পেতে নিতে রাজি নই। আমি তো খানাপিনা এবং সর্বজনীন উৎসবাদিতে অফিসারদের নিমন্ত্রণ জানানোরও ঘোর বিরোধী। কখনও যদি শুনি, কোনো অফিসারকে কোনো জনসভায় সভাপতি করা হয়েছে, কিংবা কোনো গভর্নরের নামে স্কুল, হাসপাতাল বা বিধবা আশ্রম খোলা হয়েছে, তাহলে আমাদের দেশসেবকদের দাস-মনোবৃত্তি দেখে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুতাপ করি। কিন্তু হঠাৎ একদিন জেলাশাসক নিজেই একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিলেন আমার নামে — আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। আপনি একটু কষ্ট করে আমার বাংলোয় আসবেন কী? চিঠি পেয়ে আমি তো বেশ দ্বিধায় পড়ে গেলাম। কী জবাব দেব? দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তাঁরা বললেন—পরিষ্কার লিখে দাও, আমার ফুরসত নেই। জেলাশাসক আছেন, নিজের ঘরে আছেন। সরকারি কাজকর্ম হলেও না হয় তোমার যাওয়াটা অনিবার্য ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়ের জন্যে যাওয়া তোমার মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি নিজে তোমার বাড়িতে এলেন না কেন? তাতে কি তাঁর মর্যাদার হানি হত? তিনি জেলাশাসক, এই ভেবেই তো আসেননি! এই আহাম্মক ভারতীয়দের কবে সেই জ্ঞানটুকু হবে যে দপ্তরের বাইরে ওঁরা এমনিই সাধারণ মানুষ, ঠিক যেমন আমি, তুমি! হয়তো ওঁরা বাড়িতে নিজেদের গিন্নির কাছেও অফিসারগিরি ফলান। নিজেদের পদের কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেন না।

এক বন্ধু, যাঁকে হাস্যকৌতুকের চলন্ত ঝাঁপি বলা যেতে পারে, তিনি দেশি অফিসারদের নিয়ে মজাদার গল্প শোনালেন—এক অফিসার শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। সম্ভবত স্ত্রীকে আনতে গিয়েছিলেন তাঁর বাপের বাড়ি থেকে। সাধারণের মধ্যে যেমন চল আছে, শ্বশুরমশাই এককথায় মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া সমীচীন ভাবলেন না। বললেন—কতদিন পরে এসেছে বাবা, এখনই পাঠিয়ে দিই কী করে? কম-সে-কম মাস ছয়েক তো থাকুক। ওদিকে সহধর্মিণী অন্দরমহল থেকে

নাপিতনিকে দূত পাঠিয়ে জানালেন—আমি এখন যাব না। মা-বাবার সঙ্গেও তো আমার সম্বন্ধ রয়েছে! আমি কি তোমার হাতে একেবারে বিকিয়ে গেছি? জামাই অফিসার, রাগে স্বমূর্তি ধারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে সদরের পথ ধরলেন। পরদিন শ্বশুরমশাইয়ের ওপর সমন জারি করে দিলেন। বেচারা বুড়ো মানুষ, তৎক্ষণাৎ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জামাতার খিদমতে হাজির হলেন, তবে তাঁর প্রাণ বাঁচল। ওঁরা সব এমন দাম্ভিক হয়ে থাকেন। তাছাড়া জেলাশাসকের সঙ্গে তোমার দরকারটা কী? যদি তুমি বিদ্রোহাত্মক গল্প লেখ, সঙ্গে সঙ্গে তোমায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন। জেলাশাসক এতটুকুও রেয়াত করবেন না। বলে দেবেন—কী করব, গভর্নমেন্টের হুকুম! নিজের ছেলেপিলের জন্যে কানুনগো কিংবা নায়েব-তহশিলদার পদের লালসা তো তোমার নেই। তাহলে খামোখা ছুটে যাবে কেন?

কিন্তু বন্ধুদের এইসব পরামর্শ আমার পছন্দ হল না। একজন ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ করলে তা কেবল জেলাশাসকের কাছ থেকে এসেছে বলেই তা প্রত্যাখ্যান অসভ্যতা হবে। অবশ্যি জেলাশাসক আমার বাড়িতে এলে তাঁর গৌরবহানি হত না। উদারহৃদয় ব্যক্তি অনায়াসে চলে আসেন, কিন্তু ভাই, জেলার অফিসার, বিরাট ব্যাপার। একজন ঔপন্যাসিকের মানমর্যাদা আর কতটুকু! ইংলন্ড-আমেরিকায় গল্প-লেখক ও ঔপন্যাসিকের টেবিলে নিমন্ত্রিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীও নিজেকে ধন্য মনে করেন, জেলাশাসক তো গুনতির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এটা ভারতবর্ষ, এখানে এক-একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির দরবারেই তো কবি-সম্রাটরা পাল বেঁধে তার জয়গান গাওয়ার জন্যে ভিড় করত, আজও আমাদের লেখকরা না ডাকতেই মাথার পাগড়ি বেঁধে রাজাদের খিদমতে হাজির হয়, প্রশস্তি পাঠ করে, আর পুরস্কারের জন্যে হাত বাড়িয়ে থাকে। তুমি এমন কী কেউকেটা এসেছ হে যে, জেলাশাসক তোমার বাড়িতে আসবেন। তোমারই যখন এতো আস্ফালন আর রুক্ষ মেজাজ, তখন তিনি তো জেলার বাদশাহ। যদি তাঁর কিছু হুংকারও থাকে, তবু তা অনুচিত নয়। তুমি সেটাকে তাঁর দুর্বলতা বল, অভদ্রতা বল, মূর্খতা বল, বর্বরতা বল, কিন্তু অনুচিত বলতে পার না। দেবতা হওয়া নিশ্চয়ই গর্বের কথা, কিন্তু মানুষ হওয়াটা অপরাধ নয়।

এজন্যেই বলি কী, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে জেলাশাসক তোমার বাড়িতে আসেননি, এলে তোমার লাঞ্ছনার একশেষ হত। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করার মতো কী আছে তোমার বাড়িতে? মানানসই চেয়ার নেই তো একখানাও। তাঁকে কি তিন-ঠ্যাংওয়ালা সিংহাসনে বসাতে, না তেলচিটে জাজিমে বসাতে? তিন পয়সায় চব্বিশটি বিড়ি টেনে তো তোমার মনে খুশি ধরে না! টাকায় দুটো সিগার কেনার সামর্থ্য আছে তোমার? সিগার কোথায় পাওয়া যায়, কী নাম তার, সেটুকুও তো তোমার জানা নেই! অফিসার সাহেব যে তোমার বাড়িতে আসেননি, তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, সেজন্যে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাও। চার-পাঁচ টাকা গাঁটগচ্ছাও যেত, আবার লজ্জাতেও পড়তে হত। আর যদি তোমার চরম দুর্ভাগ্য এবং পাপের দণ্ডস্বরূপ তাঁর সহধর্মিণীও সঙ্গে থাকতেন, তাহলে মাটিতে মিশে যাওয়া ছাড়া তোমার অন্য কোনো উপায় ছিল না। তুমি কিংবা তোমার সহধর্মিণী, তোমরা কেউ কি সেই মহিলার অতিথিসৎকার করতে পারতে? দম বন্ধ হয়ে প্রাণ বেরিয়ে যেত না তোমার! তোমাদের গরিবি ঢঙে সাজানো-গোছানো বৈঠকখানাতেও পা দিতে চান না তিনি। সেখানে তোমার দারিদ্র্য চোখে পড়ে, তবু তা অগোছালো নয়। কিন্তু তোমার বাড়ির ভিতর মহলে তো চারদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। তুমি নিজে পুরনো ছেঁড়া জামা পরে আর

নিজের দুর্দশার মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে জীবন কাটাতে পার, কিন্তু কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সেটা পছন্দ করতে পারে না, যাতে সেই দুরবস্থা অন্যের আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে। মেমসাহেবের সামনে তো তোমার কথা বন্ধ হয়ে যেত।

কাজেই আমি জেলাশাসকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। যদিও তাঁর স্বভাবে কিছু অনাবশ্যক অফিসারি গাম্ভীর্য ছিল তবু তাঁর ভালোবাসা ও উদারতাই সেটাকে প্রকট হতে দেয়নি। অন্তত তিনি আমায় কোনোরূপ অভিযোগ তোলার সুযোগই দেননি। অফিসারের প্রকৃতিটাকে পরিবর্তন করাটা তো তাঁর সাধ্যের বাইরে।

এ ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি, গুরুত্বও দিইনি। তিনি আমায় ডেকেছিলেন, আমি গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে ফিরে এসেছিলাম। এতে পাঁচজনকে বলে বেড়াবার কী আছে? যেন সবজি কিনতে বাজারে গিয়েছিলাম আর কী!

কিন্তু জানিনা কেমন করে অনুসান্ধিৎসুরা ঠিক সন্ধান পেয়ে গেল। এ নিয়ে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা শুরু হল যে, জেলাশাসকের সঙ্গে আমার নাকি দারুণ বন্ধুত্ব। আর তিনিও নাকি আমায় ভীষণ সম্মান করেন। অতিশয়োক্তি আমার মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিল। এতদূর পর্যন্ত রটে গেল যে, তিনি নাকি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো মামলার ফয়সালা করেন না, রিপোর্ট লেখেন না।

যেকোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই খ্যাতি থেকে বেশ ফায়দা লুটতে পারত। মানুষ স্বার্থের চিন্তায় পাগল হয়ে যায়। খড়কুটো খুঁজে বেড়ায়। আমার দ্বারা তাদের কাজ হতে পারে, এমন একটি বিশ্বাস ওদের মনে জন্মানো এমন কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু আমি এসব ব্যাপারকে ঘৃণা করি। শত শত লোক তাদের সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসতে শুরু করল। কারোর সঙ্গে পুলিশ অন্যায়রকম বাড়াবাড়ি করেছে। কেউবা ইনকামট্যাক্সের লোকজনের পাল্লায় পড়ে নাজেহাল। কেউবা এসে অভিযোগ করে, অফিসে তাকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তার পেছনের লোকজনকে দুমদাম করে প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার নম্বর এলে কেউ গ্রাহ্য করে না। এই রকম কোনো-না-কোনো বিষয় রোজই আসতে লা... আমার কাছে, কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে আমার একটিই জবাব— আমি এর মধ্যে নেই।

একদিন আমি আমার ঘরে বসে আছি, এমন সময় আমার ছেলেবেলার এক সহপাঠী বন্ধু এসে হাজির। আমরা দুজনে একই মক্তবে পড়াশোনা করতাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন উনিশের বেশি নয়। বয়সের দিক দিয়ে সেও আমার কাছাকাছি, কিন্তু আমার চেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, শক্তিশালী। আমি মেধাবী ছিলাম. সে ছিল গোবরগণেশ। মৌলবি সাহেব শেষ পর্যন্ত ওর কাছে হেরে গেলেন, ওকে পড়ানোর ভার দিলেন আমার ওপর। আমার দ্বিগুণ চেহারার একজনকে পড়ানোটা নিতান্তই গৌরবজ..ক বলে মনে হল আমার কাছে। খুব মন দিয়ে পড়াতে শুরু করলাম। ফলে হল কী, মৌলবি সাহেবের ছড়ি যেখানে অকেজো হয়ে গিয়েছিল, আমার ভালোবাসা সেখানে সফ.. হল। বলদেব এগিয়ে চলল, ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য পর্যন্ত এসে পৌছোল, ঠিক সেই সময় মৌলবি সাহেব স্বর্গলাভ করলেন আর সে অধ্যায় সেখানেই সমাপ্ত হল। তাঁর ছাত্ররাও সব এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। তারপর আমি বলদেবকে মাত্র দু-তিনবার রাস্তায় দেখেছি, (আমি এখনও তেমনি তালপাতার সেপাই, আর সে এখনও

তেমনি ভীমকায়) রাম-রাম আদান-প্রদান হয়েছে, কুশলাদি জিজ্ঞেস করেছি, তারপর নিজের নিজের পথ ধরেছি।

আমি ওর সঙ্গো করমর্দন করতে করতে বললাম—এসো এসো ভাই বলদেব, ভালো আছ তো? মনে পড়ল কী করে? কী করছ আজকাল?

বলদেব বেদনার্ত কণ্ঠে বলল—এখন শুধু শেষ দিনটির আশায় রয়েছি ভাই, আর কী! বহুদিন থেকে তোমার সঙ্গো দেখা করার ইচ্ছে। সেই মক্তবের কথা মনে পড়ে, তুমি আমায় পড়াতে? তোমারই দৌলতে দু-চার অক্ষর শিখেছিলাম বলে আজ নিজের জমিদারির কাজকর্ম সামলাতে পারছি, নইলে আজীবন মূর্খ হয়েই থাকতে হত। সত্যি বলতে কী, তুমি আমার গুরুদেব, আমার মতো একটা গর্দভকে পড়ানো তোমারই কর্ম ছিল। কেন জানি না,মৌলবি সাহেবের কাছে পাঠ নিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে না বসতেই সব বেমালুম ভুলে যেতাম। অথচ তুমি যা পড়াতে, মুখস্ত না করলেও বেশ মনে থাকত। তখনও তুমি খুব বুদ্ধিমান ছিলে।

এই বলে সে আমার দিকে বেশ গর্বের চোখে তাকাল।

আমি ছেলেবেলাকার সঙ্গীসাথিকে দেখলে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়ি। বলদেবের কথা শুনতে শুনতে আমার চোখ ছলছল করে উঠল। বললাম—আমি যখনই তোমায় দেখি, ইচ্ছে করে গিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরি। পঁয়তাল্লিশ বছর সময় যেন একেবারে মুছে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই মক্তব, মনের মধ্যে সজীব হয়ে ওঠে ছেলেবেলার চমৎকার দিনগুলো।

বলদেবও আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর দিল—আমি তো ভাই তোমায় আমার ইষ্টদেবতা বলে মনে করি। তোমায় দেখলেই আমার বুক ফুলে ওঠে, মনে মনে ভাবি, ওই আমার ছেলেবেলার বন্ধু যাচ্ছে, কখনও যদি দরকার পড়ে, নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তোমার নাম-যশ শুনে শুনে আমার মনে আনন্দ ধরে না। কিন্তু আগে বলো তো, তোমার কি খাবার জোটে না? খাওয়াদাওয়া করছ না কেন? দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ যে? ঘি না পাচ্ছ তো বলো, কয়েক টিন পাঠিয়ে দিই। বুড়ো হয়েছ, চুটিয়ে খাওয়াদাওয়া করো দেখি। এ বয়েসে দেহে যা কিছু শক্তিফুর্তি সবই কেবল খাওয়াদাওয়ার ওপর। আমি এখনো সেরটাক দুধ আর পোয়াটাক করে ঘি উড়িয়ে দিই। এদিকে আবার একটু করে মাখনও খেতে শুরু করেছি। সারা জীবন তো ছেলেপিলে নিয়ে হিমশিম খেলাম। তারাও আজ জিজ্ঞেস করে না, তোমার শরীর কেমন আছে! আজ যদি বিছানা নিতে হয়, কেউ এক লোটা জলের কথাও জিজ্ঞেস করবে না। সেজন্যে আজকাল খুব খাচ্ছি, আর সবার চেয়ে বেশি কাজও করছি। সংসারে নিজের দাপট ঠিক বজায় রয়েছে। ওই যে আমার বড়ো ছেলে, তার ওপর পুলিশ এক মিথ্যে মামলা চাপিয়ে দিয়েছে। যৌবনের অহংকারে কাউকে তো গ্রাহ্য করে না। বেশ গাট্টাগোট্টা পালোয়ান হয়েও উঠেছে। দারোগা সাহেবের সঙ্গো একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তখন থেকেই তিনি ওত পেতে ছিলেন। এদিকে গাঁয়ে একদিন ডাকাত পড়ল। দারোগা সাহেব তদন্তে এসে এব্যাপারে ওকেও ফাঁসিয়ে দিলেন। আজ এক হপ্তা হল হাজতে আছে। মুহম্মদ খলিল ডেপুটির এজলাসে মোকদ্দমা, আর মুহম্মদ খলিলের সঙ্গো দারোগা সাহেবের ভাব গলায় গলায়। সাজা হবেই। এখন তুমি যদি রক্ষে করো, তবেই ও কোনোরকমে বাঁচতে পারে। নইলে কোনো আশা নেই। শাস্তি তো যা হবার তা হবেই, তার উপর

ইজ্জত যাবে। তুমি গিয়ে জেলাশাসককে শুধু একটু বলে দাও যে, একেবারে মিথ্যে মোকদ্দমা, আপনি নিজে গিয়ে তদন্ত করুন। ব্যস্, শুধু এইটুকু। দেখোভাই, ছেলেবেলার বন্ধু, 'না' বোলো না। জানি, তুমি এসব ব্যাপারে আদৌ থাক না, আর তোমার মতো মানুষের এসব ব্যাপারে থাকাটাও উচিত নয়। তুমি প্রজার হয়ে লড়াই করার লোক, সরকারের লোকজনের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব বাড়ানো ঠিক নয়, নইলে জনসাধারণের চোখে হেয় হতে হবে তোমায়। কিন্তু এটা তো ঘরের ব্যাপার। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, মামলা একেবারে মিথ্যে না হলে কখনই তোমার কাছে আসতাম না। ছেলের মা তো কেঁদেকেটে সারা হল, বউমাও খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সাতদিন ধরে বাড়িতে উনুন জ্বলেনি। আমি এক-আধটু দুধ খেয়ে বেঁচে আছি, কিন্তু শাশুড়ি বউ দুজনেই উপোসে রয়েছে। ছেলের যদি সাজা হয়ে যায়, তাহলে দুজনেই মারা যাবে। আমি তো ওদের এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছি যে, আমার ছোটো ভাই যখন এখনও বেঁচেবর্তে আছে, আমার একগাছা চুলও কেউ সোজা করতে পারবে না। তোমার বউদি তোমার একখানা বই পড়েছে। তোমাকে সে দেবতুল্য বলে মনে করে। কোনো কথা উঠলেই সে দৃষ্টান্ত হিসেবে তোমায় দেখিয়ে আমায় খোঁটা দেয়। আমিও সাফ বলে দিই—আমি ওই ছোঁড়ার মতন বুদ্ধি পাব কোথায়? ওর চোখে তোমায় খাটো করার জন্যে তোমার নামে ছোকরা, রোগাপটকা, সবই বলে দিই, কিন্তু তোমার সামনে আমার বাহাদুরি ধোপে টেকে না।

আমি ভারী বিপদে পড়ে গেলাম। আমার দিক থেকে যত রকমের আপত্তি ওঠার কথা, সমস্ত আপত্তির জবাব বলদেব সিংহ আগে থেকেই দিয়ে দিল। সেগুলো আবার পুনরাবৃত্তি করা নিরর্থক। আচ্ছা, গিয়ে সাহেবকে বলব—এ কথা বলা ছাড়া আর কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না। হ্যাঁ, নিজের তরফে আর একটু জুড়ে দিলাম—আমার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেবেন বলে মনে হয় না। কারণ সরকারি মামলায় হাকিম সাহেবরা সাধারণত নিজের অধীনস্থদের পক্ষই নিয়ে থাকেন।

বলদেব সিংহ খুশি হয়ে বলল—সে চিন্তা করিনে। কপালে যা লেখা আছে, তাই হবে। তুমি গিয়ে কথাটা শুধু বলো একবার।

—ভালো কথা।

—তাহলে কালকেই যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।

—এটা অবশ্যই বলে দিও যে আপনি গিয়ে তদন্ত করে আসুন।

—হ্যাঁ, অবশ্যই বলব।

—আর এটাও বলে দিও, বলদেব সিংহ আমার ভাই।

—আমায় মিথ্যে কথা বলার জন্যে পিড়াপিড়ি কোরো না।

—তুমি আমার ভাই নও? আমি তো সব সময় তোমাকে আমার ভাই বলেই মনে করি।

—আচ্ছা, সেটাও বলব না হয়।

বলদেব সিংহকে বিদায় করে আমি আমার খেলা সাঙ্গ করলাম, তারপর আরাম করে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লাম। ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে হল। জেলাশাসককে কিছু বলা আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। তাই আগেভাগেই আটঘাট বেঁধে রাখার জন্যে বলে রাখলাম যে, সাধারণত পুলিশ কেসে হাকিম সাহেবরা মাথা গলাতে চান না। অতএব,

যদি সাজা হয়েও যায়, তবু আমার বলার যথেষ্ট কারণ থাকবে যে, সাহেব আমার কথায় আমল দেননি।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আমি এসব কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। সহসা একদিন বলদেব সিংহ তার পালোয়ান ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করল। ছেলেটি আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল, তারপর যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে গিয়ে একপাশে দাঁড়াল। বলদেব সিংহ বলল—একেবারে বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে ভাই। সাহেব দারোগাকে খুব ডেঁটে দিলেন। বললেন, খামোকা তুমি ভালোমানুষদের হয়রান করছ, তাদের দুর্নাম রটাচ্ছ। ফের যদি কখনও এরকম মিথ্যে মোকদ্দমা নিয়ে আস, তাহলে তোমায় বরখাস্ত করে দেওয়া হবে। দারোগা সাহেব ভীষণ লজ্জিত। আমি হাকিম সাহেবকে মাথা হেঁট করে সেলাম জানিয়ে এসেছি। ব্যাটার মাথা নুয়ে গেছে। এসব তোমার সুপারিশের কল্যাণেই হল ভাই। তুমি যদি সাহায্য না করতে, তাহলে আমাদের একেবারে সর্বনাশ হয়ে যেত। চারটে প্রাণীর প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি। আমি তোমার কাছে খুব ভয়ে ভয়ে এসেছিলাম। লোকে বলছিল—ওর কাছে অনর্থক যাচ্ছ, লোকটা একেবারে মনুষ্যত্বহীন। ওকে দিয়ে কারোর কোনো উপকার হওয়ার নয়। অপরের যে উপকার করে সেই তো মানুষ। কারোর কথা যে শুনতেই চায় না, সে কি আবার মানুষ? কিন্তু ভাই, আমি কারোর কথায় কান দিইনি। আমার মনের মধ্যে বসে আমার ইষ্ট দেবতা যেন বলছিলেন, তুমি যতোই দুর্মুখ আর স্পষ্টবাদী হও না কেন, আমায় তুমি দয়া না করে পারবে না।

একথা বলে বলদেব সিংহ তার ছেলেকে ইশারা করল। সে তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে একটা বড়ো পোঁটলা নিয়ে এল। পোঁটলায় নানারকম গাঁ-ঘরের সওগাত। আমি তো একনাগাড়ে বলে চলেছি—এসব আবার খামোকা আনতে গেলে কেন, কী দরকার ছিল এসবে! তুমি একেবারে বুদ্ধু, আসলে থাকো তো গাঁয়ে! আমি কিছুই বলিনি, সাহেবের কাছেই যাইনি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ক্ষীর, দই, মটরশুঁটি, আমসত্ব, টাটকা গুড়, আরো কী কী সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে।

আমি কথা বলতে বলতে তো একরকম বলেই ফেললাম—সাহেবের কাছেই যাইনি আমি, যা হয়েছে, আপনা থেকেই হয়েছে, এতে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু সে অন্যরকম মানে বুঝল কথাটার। ভাবল, আমি শুধু বিনয় দেখানোর জন্যে এবং জিনিসপত্রগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যেই অজুহাত হিসেবে কথাটা বলছি। আমার এমন সাহস হল না যে, আমি তাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে বলি। যে অর্থে সে আমার কথাটা নিল, আমিও মনে মনে তাই চাইছিলাম। কোনোকিছু না করেই পরোপকার করার কৃতিত্বটুকু ছেড়ে দিতে একেবারেই মন চাইছিল না। তারপর শেষে আমি যখন বেশ জোর দিয়ে বললাম—একথা কাউকে বোলো না যেন, তাহলে আমার কাছে নালিশের হাট বসে যাবে — তার মানে এই হল যে, প্রকারান্তরে আমি স্বীকার করেই নিলাম আমি তাঁর জন্যে সুপারিশ করেছিলাম এবং সেটা করেছিলাম বেশ জোর দিয়েই।

(মুফ্ত কা যশ / ১৯৩৪) অনুবাদ আশরফ চৌধুরী

ঈশ্বরের কৃপা

সন্ধ্যায় দীননাথ বাড়ি এসে যখন গৌরীকে বলল যে, সে এক অফিসে পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটা চাকরি পেয়েছে, তখন গৌরী একেবারে যেন নেচে উঠল। ভগবানের উপর তার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। বছর খানেক ধরে খুব খারাপ চলছিল। কোনো রুজিরোজগার ছিল না। ঘরে অল্প-সল্প গয়না যা ছিল তা আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। বাড়ির ভাড়া মেটানো জরুরি ছিল। যেসব বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা যেত তাদের সবার কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার এক বছরের শিশু দুধের জন্য ছটফট করে। এক বেলার খাবার জোগাড় হলে অন্য বেলায় কী হবে সেই চিন্তা হত। তাগাদার জ্বালায় বেচারা দীননাথের ঘরের বাইরে বেরোনো ছিল বিপদ।

ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই চার দিক থেকে আওয়াজ উঠত ঃ বাঃ বাবুজি, বাঃ। দু দিনের কথা বলে নিয়ে গেলেন আর আজ দু মাস ধরে চেহারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ভাইসাহেব, এটা কি ঠিক যে, আপনি খালি আপনার দরকারের কথাটাই মনে রাখবেন আর অন্যের প্রয়োজনের কথা একবারও ভাববেন না? এই জন্যই বলে, শত্রুকে বরং ধার দেবে, বন্ধুকে কখনও ধার দেবে না। এসব কথা দীননাথকে তীরের মত বিঁধত আর তার মন চাইত জীবনটা শেষ হয়ে যাক। কিন্তু নির্বাক স্ত্রী ও অবোধ শিশুর মুখ চেয়ে সে সাহস হারিয়ে ফেলত। ভগবান আজ তার উপর দয়া করেছেন আর তার দুঃখের দিনেরও অবসান হয়েছে।

গৌরী হাসি মুখে বলল—আমি কি বলতাম না যে, ঈশ্বর যখন সকলেরই তখন একদিন না একদিন তিনি আমাদেরও সহায় হবেন। কিন্তু তোমার বিশ্বাসই হত না। বলি, এখন দেখলে তো ঈশ্বরের দয়া!

দীননাথ জেদ বজায় রেখে বলল—এ আমার দৌড়াদৌড়ির ফল। ঈশ্বরের দয়া আবার কী? ছপ্পর ফুঁড়ে যখন দেন তখন বুঝতে পারি ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

তবে মুখে সে যাই বলুক, তার মনে ভগবানের প্রতি একটু শ্রদ্ধার উদয় যে হয়নি তা নয়।

দীননাথের মালিক ছিলেন অত্যন্ত কড়া আর কাজে খুব চৌখস। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, স্বাস্থ্যও খুব একটা ভালো ছিল না। তবু তিনিই অফিসে সব থেকে বেশি কাজ করতেন। কেউ কাজে এক মিনিট দেরি করবে, এটা তিনি সহ্য করতেন না; সহ্য করতেন না কেউ এক মিনিট আগে চলে গেলেও। কাজের মধ্যে পনেরো মিনিটের ছুটি পাওয়া যেত, তারই মধ্যে যে পান খাবার পান খেত, সিগারেট খেত অথবা জলখাবার খেত। এছাড়া এক মিনিটেরও অবকাশ ছিল না।

পয়লা তারিখেই বেতন পাওয়া যেত। উৎসব উপলক্ষে অফিস বন্ধও থাকত আর ঠিক বাঁধা সময় ছাড়া অন্য সময়ে কাজ করতেও হত না। সব কর্মচারীকেই বোনাস দেওয়া হত এবং

প্রভিডেন্ড ফান্ডের সুবিধাও ছিল। তবু কেউই খুশি ছিল না। কাজ ও সময়ের এই ধরাবাঁধা নিয়মের জন্য কারুর কোনো অভিযোগ ছিল না, অভিযোগ ছিল কেবল মালিকের শুষ্ক ব্যবহারের। যতই মন লাগিয়ে কাজ কর না কেন, যত প্রাণপাত পরিশ্রম কর না কেন, তার জন্য ধন্যবাদসূচক একটা শব্দও জুটত না।

কর্মচারীদের মধ্যে আর কেউ সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্ট যাই হোক না কেন, তার মালিক সম্পর্কে দীননাথের কোনো অভিযোগ ছিল না। তাকে গালিগালাজ করলেও বোধ হয় সে একই রকম পরিশ্রম করে কাজ করত। এক বছরের মধ্যেই সে তার দেনা মিটিয়ে দিল এবং কিছু সঞ্চয়ও করল। সে এমন লোক যে অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকতে জানে। যদি একটা টাকাও কোনো কিছুর জন্য খরচ করতে হত তাহলে স্বামী-স্ত্রীতে ঘন্টার পর ঘন্টা পরামর্শ হত এবং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কখনও-সখনও সে খরচের মঞ্জুরি মিলত। বিল যদি গৌরীর তরফ থেকে পেশ হত তো দীননাথ বিরোধিতা করত আর যদি দীননাথের তরফে পেশ হত তো গৌরী তা নিয়ে সমালোচনা করত। খরচ অনুমোদন করা না করা নির্ভর করত বিল-কারকের ওকালতির জোরের উপর। সার্টিফাই করার মতো কোনো তৃতীয় পক্ষের ওখানে কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

দীননাথ এখন একজন সত্যিকার আস্তিকে পরিণত। ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায় বিচারের উপর তার আর কোনো সংশয় ছিল না। নিত্য সন্ধ্যাপূজা ও নিয়মিত গীতা পাঠ করছে। এক দিন তার এক নাস্তিক বন্ধু ঈশ্বরের নিন্দা করলে সে বলল—ভাই, ঈশ্বর আছে কি নেই, এটা তো আজ পর্যন্ত নিশ্চয় করে বলা গেল না। তবে আমার মতে, নাস্তিক হওয়ার চেয়ে আস্তিক হওয়া অনেক ভালো। যদি ঈশ্বর সত্যি থেকে থাকেন তো নরক ছাড়া নাস্তিকদের আর কোনো গতি নেই। আস্তিকদের তো দুভাবেই লাভ। ঈশ্বর থাকলে তো কথাই নেই, উনি না থাকলেই বা কীসের অসুবিধা। দু-চার মিনিট সময়ই তো যা নষ্ট হয়!

নাস্তিক বন্ধু এই দুমুখো কথা শুনে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল।

একদিন সন্ধ্যার সময় দীননাথ যখন অফিস ছেড়ে বাড়ি যাবে তখন মালিক তার নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন এবং অত্যন্ত খাতির করে তাকে চেয়ারে বসিয়ে বললেন—তুমি এখানে কতদিন কাজ করছ? এক বছর তো হবেই, কী বল?

দীননাথ নম্রভাবে উত্তর দিল—জি, হ্যাঁ। তেরো মাস চলছে।

— বসে নাও। এ সময় বাড়ি গিয়ে কী জল খাবার খাও?

— আজ্ঞে না। আমার জল খাবারের অভ্যাস নেই।

— পান-টান তো নিশ্চয়ই খাও? জোয়ান ছেলে হয়েও তোমার এত সংযম?

এই কথা বলে ঘন্টি বাজিয়ে তিনি আর্দালিকে ডেকে পান ও কিছু মিষ্টি আনতে বললেন।

দীননাথের ভয় হচ্ছিল : আজ হঠাৎ কেন এত আদর। কোনো কোনো সময়তে নমস্কারটা পর্যন্ত নেয় না, অথচ আজ পান-মিষ্টি সব আসতে বলছে। মনে হচ্ছে, আমার কাজে খুব খুশি। এই সব ভাবে ভাবতে তার আত্মবিশ্বাস এল এবং ঈশ্বরের কথা স্মরণ হল। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ এবং ন্যায়বিচারক, তা নয়তো আমাকে আর কে পুছত?

আর্দালি মিষ্টি ও পান নিয়ে এলে দীননাথ আগ্রহ সহকারে খেতে লাগল।

মালিক মুচকি হেসে বললেন—তুমি নিশ্চয়ই আমাকে খুব রুক্ষ বলে ভেবেছ। কথা হল কী, আমার এখানে লোকের নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা এত কম যে, দেখাশোনার ব্যাপারটায় একটু ঢিলে পড়লেই সবাই অন্যায়ভাবে নিজের মতো করে সুবিধা নিতে থাকে আর কাজও খারাপ হতে থাকে। এমন কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তিও আছেন যারা চাকরদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা পর্যন্ত করেন, কিন্তু তবু চাকররা বিগড়োয় না বরং আরও মন লাগিয়ে কাজ করে। আমার সে বিদ্যা জানা নেই, তাই আমি আমার লোকজনদের কাছ থেকে কিছু দূরে দূরে থাকাই সঠিক মনে করি আর এখন পর্যন্ত এই নীতি মেনে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে আমি মানুষের আচারব্যবহার লক্ষ করি এবং সবাইকে পরীক্ষাও করি। তোমার সম্পর্কে আমার স্থির ধারণা এই যে, তুমি বিশ্বস্ত আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। এই জন্য আমি তোমাকে অধিক দায়িত্বের কাজ দিতে চাই। এই কাজে তোমার নিজের পরিশ্রম হবে অনেক কম, তোমাকে কেবল দেখাশোনার কাজ করতে হবে। তোমার বেতন আরও পঞ্চাশ টাকা বেড়ে যাবে। আমি বিশ্বাস করি, তুমি এত দিন পর্যন্ত যেভাবে মন দিয়ে কাজ করেছ তার চেয়েও ভালোভাবে ভবিষ্যতে করবে।

দীননাথের চোখ জলে ভরে এল; তার কণ্ঠ হয়ে গেল লবণাক্ত। মনে হল, মালিকের পায়ে মাথা রেখে বলে — আপনার কাজের জন্য আমি প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত। আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন; সে সম্মান ক্ষুণ্ণ যাতে না হয় তার জন্য চেস্টার কোন ত্রুটি আমি রাখব না। কিন্তু তার গলার স্বর কাঁপতে থাকাতে সে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতাভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

শেঠজি একটা মোটা লেজার বের করতে করতে বললেন—আমি এমন একটা কাজে তোমার সাহায্য চাই যার উপর এই সমস্ত অফিসটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এত লোকের মধ্যে আমি শুধু তোমাকেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছি। আমার আশা তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। এটা গত বছরের লেজার। এতে কিছু টাকার অঙ্ক এমন ভাবে হয়ে আছে যে মনে হবে কোম্পানির খুব লাভ হচ্ছে। কিন্তু তুমি জান যে, গত কয়েক মাস থেকেই আমাদের লোকসান চলছে। যে কেরানি এই হিসাব লিখেছিল তার লেখার সঙ্গে তোমার লেখা হুবহু মিলে যায়। যদি দুজনের লেখা সামনে রেখে দেওয়া যায় তাহলে কোনো হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞেরও তার পার্থক্য করা কঠিন হবে। আমি চাইছি তুমি লেজার থেকে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে এই জায়গায় আর একটা পৃষ্ঠা আবার লিখে জুড়ে দেবে। আমি পৃষ্ঠার নম্বর ছাপিয়ে নিয়েছি এবং একজন দপ্তরিও ঠিক করে রেখেছি। সে রাতারাতি বেঁধে দেবে। কেউ কিছু টেরও পাবে না। আসল কথা হল তুমি নিজে হাতে ওই পৃষ্ঠা নকল করে দেবে।

দীননাথ ভয় পেলে বলল—যখন ওই পৃষ্ঠার নকলই করতে হবে তখন ছিঁড়ে ফেলার কী প্রয়োজন!

শেঠজি হেসে বললেন—তা, তুমি কি এই বুঝলে যে, ওই পৃষ্ঠার হুবহু নকল করতে হবে?

আমি কিছু টাকার অঙ্ক পরিবর্তন করে দেব। আমি তোমাকে বলছি, আমাদের অফিসের মঙ্গালের কথা চিন্তা করেই আমি এই কাজ করছি। যদি এই রদবদল না করা যায় তা হলে এই

অফিসের একশো কর্মচারীর জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার কোনো প্রয়োজনই নেই। কেবল আধ ঘন্টার কাজ। তুমি তো খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পার।

সমস্যা কঠিন। এটা খুবই স্পষ্ট যে, দীননাথকে জাল করতেই বলা হচ্ছিল। শেঠজি যা করতে বলছিলেন তার নিজের স্বার্থের জন্য না অফিসের মঙ্গলের জন্য, এই রহস্য সমাধানের কোনো উপায় তার জানা ছিল না। তবে যে জন্যই হোক না কেন ব্যাপারটা আসলে জালিয়াতি—ঘোর জালিয়াতি। তা, সে কি তার বিবেককে হত্যা করবে? কিছুতেই না।

সে ভয়ে ভয়ে বলল—আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি এই কাজ করতে পারব না।

শেঠজি পূর্বের মতোই অবিচলিতভাবে মুচকি হেসে বললেন—কেন?

— এই জন্য যে, এটা সোজাসুজি জালিয়াতি।

— জালিয়াতি কাকে বলছ?

— কোনো হিসাব পালটে দেওয়া জালিয়াতি।

— কিন্তু এই পালটে দেওয়ার সঙ্গে যদি এক শত লোকের জীবিকা জড়িত থাকে তাহলেও কি তা জালিয়াতি? কোম্পানির আসল অবস্থা এক রকম আর হিসাবে আছে অন্য রকম। যদি এই পরিবর্তন না করা যায় তাহলে এখুনি কয়েক হাজার টাকা দেনা হয়ে যাবে আর তার ফল এই যে, কোম্পানি লাটে উঠবে আর সমস্ত লোকের চাকরি যাবে। আমি চাই না যে, কিছু বিত্তবান পার্টনারের জন্য এতগুলো গরিব লোক মারা পড়ুক। পরোপকারের জন্য কিছু জালিয়াতি করতে হলেও তাকে বিবেক-হত্যা বলা চলে না।

দীননাথ কোন জবাব দিতে পারল না। যদি শেঠজির কথা সত্য হয় আর এই জালিয়াতির জন্য একশো লোকের রুজি ঠিক থাকে তাহলে তো এ জালিয়াতি জালিয়াতি নয়, কঠোর কর্তব্য। এতে যদি বিবেক-হত্যাও হয় তাহলেও একশো জনের জীবিকা রক্ষার স্বার্থে তা কিছু নয়। তবে, এভাবে নৈতিক সমস্যার সমাধান হলেও পরে তার নিজের বাঁচার প্রশ্ন এল। সে বলল—যদি কোনোভাবে ব্যাপারটা ধরা পড়ে, তাহলে আমি শেষ হয়ে যাব। চোদ্দ বছরের জন্য জেল খাটতে হবে।

শেঠজি জোরে বলে উঠলেন—যদি ব্যাপারটা ধরা পড়েই তাহলেও তোমার কিছু হবে না, ফেঁসে যাব আমি। তুমি সোজাসুজি অস্বীকার করতে পারবে।

— লেখা তো ধরে ফেলা যাবে।

— বুঝবে কী করে কোন্ পৃষ্ঠা পালটে দেওয়া হয়েছে, লেখা তো একই রকম? দীননাথ হেরে গেল। তখনই সে ওই পৃষ্ঠা নকল করতে আরম্ভ করল।

তবুও দীননাথের মনের বোঝা লাঘব হল না। গৌরীর সঙ্গে এ ব্যাপারে একটা কথাও সে বলতে পারল না।

এক মাস পরে তার বেতন বৃদ্ধি হল। সে একশো টাকা করে পেতে লাগল। দুশো টাকা বোনাসও পেল।

এ সবই হল। ঘরে আনন্দের কিছু চিহ্নও নজরে এল। তবু দীননাথের অপরাধী মন কেমন যেন দমে রইল। যে যুক্তি দিয়ে শেঠজি তার মুখ বন্ধ করেছিলেন সেই যুক্তি দিয়েই গৌরীকে সন্তুষ্ট করা যাবে, এই বিশ্বাস দীননাথের ছিল না।

তার ধর্মবিশ্বাসের জন্য সর্বদা সে ভয় পেতে থাকল। এই অপরাধের কোনো ভয়ংকর দণ্ড নিশ্চয়ই পেতে হবে। কোনো প্রায়শ্চিত্ত বা কোনো অনুষ্ঠানের দ্বারা তা ঠেকানো অসম্ভব। এখন না হোক—তবে যত দেরিতে সে দণ্ড নেমে আসবে তা তত ভয়ংকর হবে; আসল সুদের সঙ্গে বাড়তে থাকবে।

প্রায়ই তার অনুশোচনা হত : কেন আমি শেঠজির প্রলোভনে পড়লাম। অফিস থাক আর যাক আমার কী! লোকের চাকরি থাক আর যাক, আমার কী! আমার তো এই মরণ-যন্ত্রণা হত না। তবে এখন তো যা হবার হয়ে গেছে। শাস্তিও অবশ্যই পাওয়া যাবে। এই শঙ্কাও তার জীবনের উৎসাহ, আনন্দ এবং মাধুর্য—সব কিছু হরণ করে নিয়ে গেল।

ম্যালেরিয়া শুরু হয়েছিল। তার ছেলের জ্বর হল। দীননাথের মন একেবারে ভেঙে পড়ল। দণ্ড-বিধান এসে হাজির। কোথায় যাবে, কী করবে, তার যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেল।

গৌরী বলল—যাও, গিয়ে ওষুধ নিয়ে এস, কিংবা কোনো ডাক্তারকে দেখাও। তিন দিন তো হয়ে গেল।

— দীননাথ চিন্তান্বিত ভাবে বলল—হ্যাঁ, যাচ্ছি। কিন্তু আমার বড়ো ভয় করছে।

— ভয়ের কী কথা হল, কী সব আজেবাজে বকছ? আজকাল কার না জ্বর হচ্ছে?

— ঈশ্বর কেন এত নিষ্ঠুর?

— ঈশ্বর নিষ্ঠুর পাপীদের ক্ষেত্রে। আমরা কবে কী চুরি করেছি?

— ঈশ্বর কি পাপীকে কখনও ক্ষমা করেন না?

— পাপীদের শাস্তি না হলে তো পৃথিবীতে অনর্থ হয়ে যাবে।

— কিন্তু মানুষ তো এরকম কাজও করে যা একের চোখে পাপ আবার অন্যের চোখে পুণ্য।

— আমি বুঝতে পারলাম না।

— ধরো, আমি মিথ্যা কথা বলায় এক জনের জীবন রক্ষা হল, তা হলে কি তা পাপ বলে গণ্য হবে?

— আমার তো মনে হয় একরম মিথ্যা পুণ্য।

— তা হলে যে পাপে মানুষের কল্যাণ হয় তা পুণ্য।

— তাই তো।

দীননাথের মনের অমঙ্গল আশঙ্কা কিছু সময়ের জন্য দূর হয়ে গেল। ডাক্তার ডেকে এনে চিকিৎসা শুরু করল। এক সপ্তাহের মধ্যে ছেলে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

তবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর এ অসুখ নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় দণ্ড, তার আর বাঁচার আশা নেই। সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরই হয়েছিল, কিন্তু তার দণ্ড-চিন্তা সেই জ্বরকে টাইফয়েডে পরিণত করেছিল। নেশাগ্রস্ত হলে যেমন, হয়, জ্বরের মধ্যে কল্পনাও তীব্র আকার ধারণ করতে লাগল। প্রথমে যা ছিল মনোগত শঙ্কা তাই এখন চরম সত্যে পরিণত হল। কল্পনার যমদূতের সৃষ্টি হল, সঙ্গে বর্শা আর গদা। নরকের অগ্নিকুণ্ড তেজের সঙ্গে জ্বলতে লাগল। হাজার মন ওজনের গদার আঘাত এবং অগ্নি-সমুদ্রের দাহ কি ডাক্তারের এক ফোঁটা ওষুধে নিবৃত্ত হয়?

দীননাথ মিথ্যাবাদী ছিল না। পুরাণের কল্পকথায় তার আস্থা ছিল না। সে ছিল যুক্তিবাদী এবং ঈশ্বরের উপর তখনই তার বিশ্বাস হল যখন তার তর্কবুদ্ধি পরাস্ত হল। ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর দয়া এল, এল তাঁর দণ্ড-বিধানের চিন্তা। দয়া তাকে দিয়েছিল জীবিকা, দিয়েছিল মর্যাদা। ঈশ্বরের দয়া না হলে অনাহারে মারা পড়ত। তবে অনাহারে মৃত্যু অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে মরার থেকে অনেক সহজ, খেলার মতো সহজ। দণ্ড-চিন্তা জন্মজন্মান্তরের সংস্কারে এমন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তা দীননাথের মন ও বুদ্ধির অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তার তর্কবাদ ও যুক্তিবাদ জন্মজন্মান্তরের এই সংস্কারের উপর সমুদ্রের উঁচু ঢেউয়ের মতো এসে আছড়ে পড়ছিল। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁকে জলমগ্ন করে দিয়ে যখন আবার ঢেউ ফিরে যেতে লাগল সংস্কারের সেই পর্বত যেমনকে তেমন অনড় দাঁড়িয়ে থাকল।

আয়ু ছিল, দীননাথ বেঁচে গেল। শরীরে বল হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার অফিসে যেতে লাগল। এক দিন গৌরী বলল—তুমি যখন অসুস্থ ছিলে আর তার মধ্যে একদিন যখন তোমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল তখন আমি ভগবানকে উদ্দেশ করে বলেছিলাম যে, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে আমি পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণ কে ভোজন করাব। তারপরের দিন থেকে তোমার শরীর ভালো হতে লাগল। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছিলেন। তাঁর দয়া না হলে ভিক্ষা করেও আমার চলত না। আজ বাজার থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এস, আমি মানত পূরণ করব। পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করলে একশো অবশ্যই আসবেন। পঞ্চাশ জন কাঙালও ধরো আর বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও বিশ-পঁচিশ জন হবে। দুশো লোকের ব্যাপার। আমি জিনিসপত্রের ফর্দ করে দিচ্ছি।

দীননাথ মাথা ঝুকিয়ে বলল—তুমি কি মনে কর আমি ভগবানের দয়ায় ভালো হয়েছি?

— তা নয় তো কীসে?

— ভালো হয়েছি এই জন্যে যে আয়ু ছিল।

— এ কথা বোলো না। মানত রাখতে হবে।

— কখনও না। আমি ভগবানকে দয়ালু বলে মনে করি না।

— তা হলে কি ভগবান নিষ্ঠুর?

— তাঁর চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর সংসারে আর কেউ নেই। যে ভগবান তাঁর নিজের সৃষ্ট জীবদের তাদের ভুলের ও নির্বুদ্ধিতার জন্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন সেই ভগবান দয়ালু হতে পারেন না। ভগবান যত না দয়ালু তার চেয়ে অসংখ্যগুণ নিষ্ঠুর। আর এরকম ভগবানের কল্পনা করতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। প্রেমকে সব থেকে শক্তিশালী বলা হয়েছে। বিচারশীল মানুষ যাঁরা তাঁরা প্রেমকেই জীবনে ও সংসারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বলে মনে করেন। ব্যবহারে না হলেও আদর্শ হিসাবে প্রেমই আমাদের জীবনে সত্য; কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর দণ্ডের ভয় দেখিয়ে সৃষ্টি রক্ষা করছেন। তা হলে তাঁর আর মানুষের মধ্যে তফাতটা কী হল? এরকম ঈশ্বরের উপাসনা আমি করতে চাই না, করতে পারবও না।

— যে স্ফীতকায়, ঈশ্বর তার প্রতি দয়ালু, কেন না সে পৃথিবী লুটে নিচ্ছে। আমাদের মতো লোকের প্রতি তো ঈশ্বরের দয়া কখনও নজরে আসে না? হ্যাঁ, ভয় পায়েপায়ে লেগে থেকে ঘুরিয়ে মারছে। এটা করো না, ঈশ্বর দণ্ড দেবেন; ওটা কোরোনা, ঈশ্বর দণ্ড দেবেন। প্রেমের

শাসনই মানবতা, ভয় দেখিয়ে শাসন বর্বরতা। সন্ত্রাসবাদী ঈশ্বর থাকার চেয়ে ঈশ্বর না থাকা ভালো। আমি তাঁকে হৃদয় থেকে নির্বাসন দিয়ে আমি তাঁর দয়া ও দণ্ড এ দুয়েরই হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। এক কঠোর দণ্ড বহু বছরের প্রেমকে ধূলিতে মিশিয়ে দিতে পারে। আমি বরাবর তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি; কিন্তু কোনো দিন যদি লাঠি দিয়ে তোমাকে প্রহার করি তাহলে তো তুমি আমার মুখও দেখবে না। এ রকম আতঙ্কময়, দণ্ডময় জীবনের জন্য আমি ঈশ্বরের শরণ নিতে চাই না। বাসিভাতের জন্য খোদার কৃপার প্রয়োজন নেই। তুমি যদি আজ নিমন্ত্রণ করে খাওয়া দাওয়ার উপর জোর দাও তাহলে আমি বিষ খাব।

গৌরী তার মুখের দিকে ভয়াতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

(বাসী ভাত মেঁ খুদা কা সাঝা / ১৯৩৪) অনুবাদ অমলকুমার রায়

বড়দা

বড়দা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো, কিন্তু পড়েন মাত্র তিন ক্লাস ওপরে। আমি যে বয়সে পড়াশোনা শুরু করেছি তিনিও সেই বয়সেই পড়াশোনা শুরু করেছেন, কিন্তু শিক্ষার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়ো পছন্দ করেন না। ইমারতের ভিতটাকে যথেষ্ট মজবুত করে গড়ে তুলতে চান তিনি, কারণ এই ভিতের ওপরেই বিশাল অট্টালিকা তৈরি হবে। এক বছরের কাজ দুবছরে সারেন। কখনও কখনও তিন বছরও লেগে যায়। ভিত পাকাপোক্ত না হলে বাড়ি মজবুত হবে কী করে?

আমি ছোটো তিনি বড়ো। আমার বয়স নবছর, ওঁর চোদ্দ। আমায় নির্দেশ দেওয়া ও শাসন করার জন্মগত পূর্ণ অধিকার রয়েছে ওঁর। আর আমার শালীনতাবোধ এমনই হওয়া উচিত যে, আমি যেন তাঁর হুকুমকে অমোঘ আইন বলেই মেনে নিই।

স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি খুব অধ্যয়নশীল। সব সময় বই খুলে বসে থাকেন। আর সম্ভবত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে কখনো খাতায়, কখনো বা বইয়ের মার্জিনে পাখি-কুকুর-বিড়ালের ছবি আঁকেন। কখনও কখনও একই নাম, শব্দ বা বাক্য দশ-বিশবার একনাগাড়ে লিখে চলেন। কখনও কবিতার কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি সুন্দর হরফে বারবার নকল করেন। মাঝে মাঝে এমন সব শব্দ লেখেন, যার কোনো অর্থ নেই, মাথামুন্ডু নেই। একবার তাঁর খাতায় একটি অদ্ভুত লাইন আমার চোখে পড়েছিল—স্পেশ্যাল, আমিনা, বন্ধুগণ-বন্ধুগণ, আসলে, ভাই-ভাই, রাধেশ্যাম, শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম, একঘন্টা পর্যন্ত—এরপর একটা মানুষের মুখ আঁকা রয়েছে। প্রথমে এই ধাঁধাটার একটা মানে বার করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু আমার সামর্থ্যে কুলোয়নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করব, সে সাহসও হয়নি। তিনি নবম শ্রেণিতে পড়ছেন, আমি পঞ্চম শ্রেণিতে। তাঁর রচনা বোঝবার চেষ্টা করা ছোটো মুখে বড়ো কথা ছাড়া আর কী!

পড়তে আমার মোটেই ইচ্ছে করে না। এক ঘন্টা বই নিয়ে বসে থাকাটাই আমার কাছে অসম্ভব ব্যাপার। ফাঁক পেলেই হস্টেল থেকে বেরিয়ে মাঠে চলে যাই, ইটপাটকেল ছুঁড়ি, কাগজের প্রজাপতি ওড়াই, আর কেউ সঙ্গী জুটে গেলে তো কথাই নেই। কখনও পাঁচিলে উঠে নীচে লাফ দিই। কখনও ফটকের ওপর চেপে বসি, দরজাটাকে সামনে-পেছনে চালিয়ে মোটরে চড়ার আনন্দ উপভোগ করি। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই বড়দার উগ্রমূর্তি দেখে প্রাণ উড়ে যায়। তাঁর প্রথম জিজ্ঞাসা—কোথায় ছিলে? সব সময় একই গলায় একই প্রশ্ন করে থাকেন তিনি, আর তার জবাবে আমি শুধু বোবা হয়ে থাকি। জানি না, কেন আমার মুখ দিয়ে যে বেরোয় না—বাইরে খেলছিলাম একটু। মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। আমার বোবা হয়ে থাকাটাই ঘোষণা করে যে, আমি

অপরাধ স্বীকার করছি, আর বড়দার কাছে এ অপরাধের চিকিৎসা অন্য কিছু নয়, ক্রোধমিশ্রিত বাক্যবাণে আপ্যায়ন করেন তিনি—

— এমনি করে ইংরেজি পড়লে তো সারা জীবন পড়তেই থাকবে, একটা অক্ষরও শিখতে পারবে না। ইংরেজি পড়াটা হাসিখেলা নয় যে যার ইচ্ছে হল সেই শিখে ফেলল, নইলে রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবাই ইংরেজিতে পণ্ডিত হয়ে যেত। রাতদিন পড়তে পড়তে হাড়মাংস কালি, রক্ত জল করে তবে বিদ্যা মেলে। তাও মেলে কি? হ্যাঁ, বলা যেতে পারে। বড়ো বড়ো পণ্ডিতরাও শুদ্ধভাবে ইংরেজি লিখতে পারে না, বলা তো দূরের কথা। আর তুমি এমনি একটা গবেট যে আমাকে দেখেও তোমার শিক্ষালাভ হচ্ছে না। আমি কত খাটছি; সেটা তো নিজের চোখেই দেখছ তুমি, আর যদি তা চোখে না পড়ে, সেটা তোমার চোখের দোষ, তোমার বুদ্ধির দোষ। এত যে মেলা-টেলা হয়, কখনও আমায় যেতে দেখেছ? রোজ ক্রিকেট-হকির ম্যাচ হচ্ছে, আমি ধারেকাছেও যাই না। সব সময় পড়ছি, পড়ছি তো পড়ছিই, তা সত্ত্বেও এক-এক ক্লাসে দু-দু বছর, তিন-তিন বছর করে পড়ে রয়েছি। অথচ তুমি কি করে আশা কর যে খেলেকুঁদে সময় নষ্ট করে পাশ করবে? আমার তো দু-তিন বছর করে লাগে, তুমি সারা জীবন পড়ে পড়ে পচতে থাকবে এই ক্লাসেই। তুমি যদি এভাবে নিজের জীবনটা মাটি করতে চাও, তাহলে ভালো কথা, বাড়ি চলে যাও, গিয়ে ডান্ডাগুলি খেলে বেড়াও গে। এখানে বসে বসে বাবার কাঁড়িকাঁড়ি টাকাপয়সা বরবাদ করছ কেন?

আমি এই বাক্যবাণ শুনে কাঁদি। জবাব কী দেব? দোষ তো করেছি, নইলে কথা শুনতে হয়! বড়দা উপদেশ দানের শিল্পকলায় বড়ো নিপুণ। এমন চোখা চোখা কথা বলেন, এমন অকাট্য যুক্তিবাণ ছুঁড়তে থাকেন যে, আমার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়, সাহস হারিয়ে ফেলি। এমন প্রাণপাত পরিশ্রমের কথা আমি ভাবতেই পারি না, একান্ত হতাশ হয়ে চিন্তা করি—বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো। যেকাজ আমার সাধ্যের অতীত, সেকাজে হাত দিয়ে নিজের জীবনটাকে মাটি করার কোনো মানে হয় না। নিজে মূর্খ থাকি, সে-ও ভালো, কিন্তু ওরকম পরিশ্রমের কথা ভাবলে আমার মাথা ঘুরতে থাকে। অবশ্যি দু-একঘন্টা পরেই হতাশার মেঘ কেটে যায়, স্থির করি, মন দিয়ে খুব পড়াশোনা করব। ঝটপট একটা টাইমটেবল তৈরি করে ফেলি। আগে থেকে কোনো ছক না বেঁধে, কোনো পরিকল্পনা তৈরি না করে কাজ শুরু করব কী করে? টাইমটেবলে খেলাধুলোর ব্যাপারটার একেবারেই উড়িয়ে দিই। সকালে উঠতে হবে, ছটার সময় মুখহাত ধুয়ে জলযোগ সেরে পড়তে বসতে হবে। ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত ইংরেজি, আটটা থেকে নটা পর্যন্ত অঙ্ক, নটা থেকে সাড়ে নটা ইতিহাস, তারপর খাওয়াদাওয়া, স্কুল। সাড়ে তিনটেয় স্কুল থেকে ফিরে আধঘন্টা বিশ্রাম, চারটে থেকে পাঁচটা ভূগোল, পাঁচটা থেকে ছটা গ্রামার, আধঘন্টা হস্টেলের সামনে বেড়ানো, সাড়ে ছটা থেকে সাতটা ইংরেজি কম্পোজিশন, তারপর খাওয়াদাওয়া। খাওয়াদাওয়া সেরে আটটা থেকে নটা অনুবাদ, নটা থেকে দশটা হিন্দি, দশটা থেকে এগারোটা বিবিধ বিষয়, তারপর বিশ্রাম।

কিন্তু টাইমটেবল তৈরি করা এক কথা, আর টাইমটেবল অনুযায়ী চলা অন্য কথা। প্রথম দিন থেকেই নিজের তৈরি নিয়ম ভাঙা শুরু হয়ে যায়। মাঠের সেই সবুজ শোভা, বাতাসের মৃদু স্পর্শ, ফুটবলের লাফানো, কাবাডির প্যাঁচ, ভলিবলের তীব্র উত্তেজনার এক অজ্ঞাত দুর্নিবার আকর্ষণ

আমাকে টেনে নিয়ে যায়, আর সেখানে গেলেই সমস্ত ভুলে যাই আমি। ওই প্রাণপাত পরিশ্রমের টাইমটেবল, দুর্বোধ্য বইপত্তর কিছুই মনে থাকে না, আর তার ফলে বড়দা আবার ভর্ৎসনা ও উপদেশের সুযোগ পেয়ে যান। আমি তাঁর ছায়া মাড়াই না, তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি। পা টিপে টিপে এমনভাবে ঘরে ঢুকি, যেন তিনি জানতে না পারেন। তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেই আমার প্রাণ উড়ে যায়। সর্বদা মনে হয় যেন মাথার ওপর খোলা তলোয়ার ঝুলছে। কিন্তু বিপদ আর মৃত্যুর মধ্যেও মানুষ যেমন মায়ামোহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে, আমিও তেমনি গালমন্দ খেয়েও খেলাধুলো ছাড়তে পারছিলাম না।

দুই

বাৎসরিক পরীক্ষা হল। বড়দা ফেল করলেন, আমি পাশ করলাম এবং পাশ করলাম ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে। এখন আমাদের দুজনের মধ্যে দুবছরের ব্যবধান। ইচ্ছে হল, এবার দাদাকে এক হাত নিই—কী হল আপনার সেই জোর তপস্যা? আমায় দেখুন, মজা করে খেলাধুলো করে বেড়িয়েছি, আবার ক্লাসের মধ্যে ফার্স্টও হয়েছি। কিন্তু তিনি এতই দুঃখিত ও বিমর্ষ যে তাঁর প্রতি আমার মনে বড়ো সমবেদনা জাগল, তাঁর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়াটা আমার কাছে লজ্জাকর বলেই মনে হল। হ্যাঁ, এখন আমার একটু অহংকার হয়েছে, দম্ভ হয়েছে। আমার ওপর দাদার সেই দাপট আর নেই। ইচ্ছেমতো খেলাধুলো করতে লাগলাম। মনে যথেষ্ট বল। যদি তিনি আবার কিছু বলতে আসেন আমায়, সাফ বলে দেব—রক্তজল করে খেটে আপনার কী মোক্ষ লাভ হল? আমি খেলাধুলো করেই ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি। মুখে এমন হুমকি দেখাবার সাহস না হলেও ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম যে তাঁকে আমি আর আদৌ ভয় করিনা। তিনিও ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন—তাঁর সহজ বুদ্ধি প্রখর। তারপর একদিন যখন আমি সারা সকালবেলাটা ডান্ডাগুলি খেলে কাটিয়ে খাওয়ার সময় ফিরলাম তখন বড়দা যেন খাপ থেকে তরোয়াল খুললেন, রাগে ফেটে পড়লেন আমার ওপর—দেখছি এবছর পাশ করে আর ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে তোমার খুব দেমাক হয়ে গেছে। কিন্তু ভাইটি, তা-বড়ো তা-বড়ো লোকেরও অহংকার টেকে না, তুমি তো কোন্ ছার! ইতিহাসে রাবণের কথা তো পড়েছ? তাঁর চরিত্র থেকে কী শিক্ষলাভ করেছ শুনি? না এমনিই পড়ে গেছ সব? কেবল পরীক্ষায় পাশ করে যাওয়াটা কিছু না, আসল জিনিস হল বুদ্ধির বিকাশ। যা পড়বে, তার অন্তর্নিহিত শিক্ষাটা গ্রহণ করবে। রাবণ ছিলেন পৃথিবীর অধিপতি। এমন রাজাকে চক্রবর্তী বলা হয়। বর্তমানে ইংরেজের রাজত্ব বহুদূর বিস্তৃত, তবুও তাদের চক্রবর্তী বলা যায় না। পৃথিবীর বহু রাজ্য ইংরেজের আধিপত্য স্বীকার করেনি। সেগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাবণ চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। পৃথিবীর সব রাজা তাঁকে কর দিত। বড়ো বড়ো দেবতা তাঁর ভৃত্য ছিল। আগুন আর জলের দেবতাও ভৃত্য ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর পরিণাম কী হল? অহংকারই তাঁর নাম-চিহ্ন ধূলিসাৎ করে দিল, তাঁকে এক গণ্ডূষ জল দেওয়ার মতোও কেউ বেঁচে রইল না। মানুষ যা কুকর্ম করে করুক, কিন্তু যেন অহংকার না করে, ইতরামি না করে। অহংকার করেছ কী, ইহলোক-পরলোক দুইই খোয়াবে।

— শয়তানের কথাও পড়েছ নিশ্চয়। তার এই অহংকার হয়েছিল যে তার মতো ঈশ্বরের অমন ভক্ত আর কেউই নেই। শেষ পর্যন্ত তাকে ধাক্কা মেরে স্বর্গ থেকে নরকে ফেলে দেওয়া হল।

রোমের সম্রাটও একবার অহংকার করেছিলেন। শেষ অবধি ভিক্ষে করতে করতে মারা গেলেন তিনি। তুমি তো কেবল একটা ক্লাস পাশ করেছ, আর তাতেই তোমার মাথা ঘুরে গেল! তাহলে আর তোমার পড়া হয়েছে! এটা জেনে রাখো যে তুমি নিজের মেহনতে পাশ করনি, কখনও বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যেতে পারে। কিন্তু তা ওই একবারই, বারবার নয়। কখনও কখনও ডান্ডাগুলি খেলতে গিয়েও এলোপাতাড়ি মারতে মারতে ঠিক নিশানায় গিয়ে লাগে। তাই বলে কেউ সফল খেলোয়াড় হয়ে যায় না। সফল খেলোয়াড় সেই, যার কোনো লক্ষ্যই এদিক-ওদিক হয় না।

— আমার ফেল করা দেখতে এস না। আমার ক্লাসে যখন উঠবে, তখন অ্যালজেব্রা আর জ্যামিতির লোহার ছোলা চিবোতে হবে, ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়তে হবে, তখন ঘাম বেরিয়ে যাবে। কোন্ ঘটনা কোন্ হেনরির সময় ঘটেছিল, স্মরণ করে রাখা সোজা ভেবেছ? হেনরি সপ্তমের জায়গায় হেনরি অস্টম লিখেছ কি নম্বর গায়েব। ঝরঝরে পরিষ্কার। শূন্যও জুটবে না, ডজন ডজন জেমস্ রয়েছে, ডজন ডজন উইলিয়ম, কয়েক কুড়ি চার্লস্। মাথা ঘুরে যাবে। চোখ দিয়ে জোনাকি পোকা উড়ে যাবে। এইসব হতভাগাদের নামও নেই। একটা নামেরই পেছনে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম লাগিয়ে গেছে শুধু। আমায় জিজ্ঞেস করলে একটা কেন, দশ লক্ষ নাম বলে দিতাম।

— আর জ্যামিতি হলে তো কথাই নেই, একমাত্র ঈশ্বরই বাঁচাতে পারেন। এ-সি-বি এর জায়গায় এ-বি-সি লিখেছ কি সমস্ত নম্বর খ্যাঁচ করে কেটে দেবে। এইসব মায়ামমতাহীন নিষ্ঠুরদের কেউ জিজ্ঞেসও করে না, এ-সি-বি আর এ-বি-সি-এর মধ্যে তফাতটা কী? আর যার কোনো মানে নেই, তা নিয়ে ছাত্রদের খুন করা কেন? ডাল-ভাত-রুটিই খাই আর ভাত-ডাল-রুটিই খাই, তাতে হলটা কী? কিন্তু এইসব পরীক্ষকদের কি কোনো ভাবনাচিন্তা আছে! বইয়ে যা লেখা থাকে, ওঁরা শুধু তাই দেখেন। ওঁরা চান, ছেলেরা অক্ষরে অক্ষরে সব উগরে দেয় যেন। অর এই উগরে দেওয়ার নাম দেওয়া হয়েছে শিক্ষা। এই মাথামুন্ডুহীন বিষয় পড়ে শেষ পর্যন্ত লাভটা কী হয়?

— এই রেখাটির উপর লম্বটিকে রাখিলে রেখাটি লম্বটির দ্বিগুণ হইবে। — বলো, এর প্রয়োজনটা কোথায়? দ্বিগুণ কেন, আমার কথায় সেটা চতুর্গুণই হোক কিংবা অর্ধেকই থাকুক, পরীক্ষায় পাশ করতে হলে এসব বিদঘুটে ব্যাপার মনে রাখতে হবে। বলে দিলেন, 'সময়ানুবর্তিতা' নিয়ে অন্যূন চার পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ লেখো। এখন তুমি সামনে খাতা খোলো, হাতে কলম নাও, তারপর সময়ানুবর্তিতার নামে কাঁদতে থাকো।

— কে না জানে সময়ানুবর্তিতা খুব ভালো জিনিস! সময়ানুবর্তিতার ফলে মানুষের জীবনে সংযম আসে, অন্যেরা তাকে ভালোবাসে, আর তার কাজকর্মে উন্নতি হয়। এই একটুখানি বিষয় নিয়ে চার পৃষ্ঠা কী করে লিখব? যা একটি বাক্যে বলা যেতে পারে, সেটা নিয়ে চার পৃষ্ঠা লেখার প্রয়োজনটাই বা কী? আমি এটাকে ধৃষ্টতা বলেই মনে করি। এটা তো আর সময়ের সদ্ব্যবহার হল না, বরং কিছু শব্দকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঠুসে দেওয়াটাকে সময়ের অপব্যবহারই বলা চলে। আমি চাই, কাউকে কিছু বলতে হলে সেটা চটপট বলে নিয়ে কেটে পড়তে। কিন্তু তা নয়, তুমি যেভাবেই দ্যাখ না, তোমায় চার পৃষ্ঠা জুড়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর করতে হবে, আর পৃষ্ঠাগুলোও ফুলস্কেপ সাইজের, এটা ছাত্রদের ওপর অত্যাচার নয় তো কী? তার ওপর নিতান্তই হাস্যকর, সাধারণত

বলা হয়ে থাকে, সংক্ষেপে লেখো। সময়ানুবর্তিতার ওপর সংক্ষেপে একটি রচান লেখো, যেন চার পৃষ্ঠার কম না হয়। বেশ মজা! সংক্ষেপেই চার পৃষ্ঠা, নইলে বুঝি একশো-দুশো পৃষ্ঠা লিখিয়ে ছাড়ত। জোরেও দৌড়তে হবে, আবার আস্তে-আস্তেও। একেবারে উলটো-পালটা কথা নয় কি? বাচ্চারাও একথাটা বুঝতে পারে, অথচ এইসব মাস্টার মশাইদের সে বোধবুদ্ধিটুকুও নেই। তাতে আবার দেমাকটাও রয়েছে — আমরা শিক্ষক। বাছাধন, আমার ক্লাসে এসে যখন এইসব কাণ্ড করতে হবে, তখন বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল। এখানে এসে যদি ফার্স্ট হতে পারতে তো মাটিতে পা পড়তো না তোমার। তাই বলি, আমার কথা শোনো। হাজরবার ফেল করিনে কেন, তবু তো তোমার বড়ো, জগৎটা তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি। যা বলছি, কাপড়ে গেরো দিয়ে বেঁধে রাখো, পরে পস্তাতে হবে না।

স্কুলের সময় হয়ে গিয়েছিল, নইলে ঈশ্বরই জানেন, এই উপদেশবর্ষণ কখন শেষ হত। খেতে বসে সবকিছু বিস্বাদ মনে হল আজ। পাস করেই যখন এরকম গালাগালি, ফেল করলে বোধ হয় প্রাণ বার করে দিয়ে ছাড়তেন। বড়দা তাঁর ক্লাসের পড়াশোনার যে ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরলেন, তাতে আমার হৃৎকম্প শুরু হল। স্কুল ছেড়ে কেন যে বাড়ি পালাইনি, সেটাই আশ্চর্য। কিন্তু এত গালাগালি সত্ত্বেও বইপত্রের প্রতি আমার অরুচি যেমনকার তেমনিই থেকে গেল। খেলাধুলোয় কোনো সুযোগ কিছুতেই ছাড়িনা। পড়াশোনাও করি অবশ্য, কিন্তু খুব কম। নেহাতই রোজকার হোম-টাস্ক করে রাখি, যাতে ক্লাসে অপদস্থ হতে না হয়। নিজের ওপর যে বিশ্বাসটুকু গড়ে উঠেছিল, সেটুকুও ধীরে ধীরে নষ্ট হল। তারপর আবার চোরের মতো দিন কাটাতে শুরু করলাম।

তিন

আবার বাৎসরিক পরীক্ষা হল। এবারও ঘটনাচক্রে আমি আবার পাশ করলাম, বড়দা আবার ফেল করলেন। আমি খুব একটা পরিশ্রম করিনি, তবু কেন জানি না, ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে গেলাম। আমি নিজেই অবাক। বড়দা প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি শব্দ যেন হজম করে ফেলেছিলেন। রাত্রির দশটা থেকে এদিক, ভোর চারটে থেকে ওদিক, স্কুল যাওয়ার আগে দুটো থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত। চোখমুখে কালি পড়ে গিয়েছিল, তবু বেচারি ফেল করলেন। আমার বড়ো মায়া হল। ফল বেরোলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, আমিও কেঁদে ফেললাম। পাশ করা সত্ত্বেও আমার আনন্দ যেন অর্ধেক হয়ে গেল। আমিও যদি ফেল করতাম, তাহলে নিশ্চয়ই বড়দার এত দুঃখ হত না, কিন্তু বিধির বিধান কে লঙ্ঘন করতে পারে?

আমাদের দুজনের মধ্যে এখন কেবল এক ক্লাসের ব্যবধান। আমার মনে এক কুটিল চিন্তার উদয় হল, বড়দা যদি আর একবার ফেল করেন, তাহলে আমি তাঁর সমান হয়ে যাব। তাহলে তিনি আর কী নিয়ে কথা শোনাবেন আমাকে। কিন্তু এরূপ কুচিন্তা আমি জোর করেই মন থেকে দূর করে দিলাম। হাজার হলেও তিনি আমার ভালোর জন্যেই তো বকাঝকা করেন। সে সময়টা যদিও বড়ো খারাপ লাগে, কিন্তু তাঁর সেই উপদেশের গুণেই হয়তো এমন ভালো নম্বর তুলে আমি টকাটক পাশ করে যাই।

এখন বড়দা ভীষণ মিইয়ে গেছেন। কয়েকবার তো আমায় বকাঝকা করার সুযোগ পেয়েও আগ্রহ দেখালেন না। সম্ভবত তিনি এখন নিজেই বুঝতে পারছেন যে আমায় বকাঝকা করার

অধিকার তাঁর নেই, থাকলেও খুব কম। তাতে আমার দ্বিধা আরও কেটে গেল। আমি তাঁর সহিষ্ণুতার অন্যায় সুযোগ নিতে শুরু করলাম। আমার এমন ধারণা হল, পড়ি আর না পড়ি, কপালের জোরে আমি ঠিক পাশ করে যাব। তাই বড়দার ভয়ে আগে যেটুকু পড়াশোনা করতাম, সেটুকুও বন্ধ হল। ঘুড়ি ওড়ানোর নতুন শখ চাপল মাথায়, ঘুড়ি উড়িয়েই সময় কাটাতে লাগলাম। অবশ্য বড়দাকে সম্মান দেখাতে কসুর করিনি, ঘুড়ি ওড়াতাম তাঁর চোখ এড়িয়েই। মাঞ্জা দেওয়া, কন্নি বাঁধা, ঘুড়ি টুর্নামেন্টের সমস্ত আয়োজনই চলত গোপনে। চেস্টা করতাম যাতে বড়দার মনে এতটুকু সন্দেহ না জাগে যে তাঁর মানমর্যাদা আমার কাছে খাটো হয়ে গেছে।

একদিন সন্ধেবেলা হোস্টেল থেকে দূরে একটা ঘুড়ি লুটবার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলাম। চোখ আকাশের পানে, মন গগনচারী পথিকের পানে, যেটা মন্থরগতিতে ভূপতিত হওয়ার জন্যে নেমে আসছে, যেন কোনো আত্মা বিরক্ত মনে স্বর্গ থেকে বেরিয়ে অন্য কোনো রূপ ধারণ করতে চলেছে। ছেলেদের এক আস্ত সৈন্যবাহিনী কঞ্চিওয়ালা ঝাঁকড়া বাঁশ নিয়ে ছুটেছে তাকে স্বাগত জানাতে। আগে পিছে কী ঘটছে, সেদিকে কারও কোনো হুঁশ নেই। ঘুড়িটার সঙ্গে সবাই যেন আকাশে উড়ছে, যেখানে চর্তুদিক সমতল, মোটর নেই, ট্রাম নেই, গাড়ি নেই।

হঠাৎ বড়দার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সংঘর্ষ। সম্ভবত বাজার থেকে ফিরছিলেন তিনি। আমার হাতটা ধরে ফেললেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—এইসব বাজারের ছেলেছোকরার সঙ্গে ওই কানাকড়ি দামের ঘুড়ির জন্যে ছুটোছুটি করতে লজ্জা করে না তোমার? তোমার এই সামান্য আক্কেলটুকুও হয় না যে, তুমি আর নীচের ক্লাসে পড়ছ না, এইটে উঠেছ, আমার চেয়ে মাত্র এক ক্লাস নীচে! যতই হোক, নিজের পজিশন সম্বন্ধে মানুষের একটু খেয়াল করা উচিত। এক সময় তো অনেকে এইট পাশ করে নায়েব-তহশিলদার হতে পারত। আমি তো কত এইরকম মিড্‌ল ক্লাস পাশ করা লোককে জানি, আজ তারা প্রথম শ্রেণির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, না হয় সুপারিনটেন্ডেন্ট। এইট পাশ করা কত জন আমাদের নেতা, কিংবা খবরের কাগজের সম্পাদক। বড়ো বড়ো বিদ্বান ব্যক্তি তাঁদের অধীনে কাজকর্ম করে। আর তুমি সেই এইটে এসে বাজারের ছেলেছোকরাদের সঙ্গে ঘুড়ির পেছনে দৌড়োচ্ছ! তোমার এই বেআক্কেলপনা দেখে মার বড়ো দুঃখ হচ্ছে। তুমি প্রতিভাবান তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে প্রতিভা আত্মসম্মানকে হত্যা করে, সে প্রতিভা কী কাজের? তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছ, আমি তো বড়দার চেয়ে মাত্র এক ক্লাস নীচে, আমাকে কিছু বলার আর অধিকার নেই তার। কিন্তু এটা তোমার ভুল। আমি তোমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো, তাই তুমি যদি আজ আমার ক্লাসেও চলে আস—আর পরীক্ষকদের যা মতিগতি, তাতে নিঃসন্দেহে সামনের বার তুমি আমার ক্লাসে উঠবে, বলতে কী, আরেক বছর বাদে হয়তো আমার চেয়ে এগিয়েও যাবে—কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে পাঁচ বছরের তফাত, সেটা তুমি কেন স্বয়ং ঈশ্বরও দূর করতে পারবেন না। আমি তোমার চে পাঁচ বছরের বড়ো এবং চিরকাল বড়োই থাকব। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা, তাতে তুমি কখনওই আমার সমান হতে পারবে না। সে তুমি এমএ, ডিফিল্ আর লিট যাই হও না কেন। শুধু বই পড়ে জ্ঞানগম্যি জন্মায় না। মা কোনো ক্লাস পাশ করেননি, বাবাও হয়তো ফাইভের বেশি এগোতে পারেননি, কিন্তু আমরা দুজন যদি সারা দুনিয়ার সমস্ত বিদ্যাও পড়ে শেষ করে ফেলি, তবু আমাদের বোঝাবার, আমাদের দোষত্রুটি সংশোধন করবার অধিকার চিরকাল তাঁদের থাকবে। তাঁরা আমাদের

জন্মদাতা, কেবল সেজন্যেই নয়, বরং জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে, এবং সেটা থাকবেও। আমেরিকায় কী ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে অষ্টম হেনরি কটা বিয়ে করেছিলেন, আকাশে কত নক্ষত্র আছে, এসব কথা তাঁরা জানেন না, কিন্তু এমন হাজার হাজার ব্যাপার আছে যেগুলো সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।

— ঈশ্বর না করুন, আজ যদি আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, ভয়ে তোমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে। বাবাকে তার করে দেওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু করার কথা ভাবতেই পারবে না। কিন্তু তোমার জায়গায় যদি বাবা থাকেন তবে তিনি কাউকে তার করবেন না, ভয় পাবেন না, বিচলিত হবেন না। প্রথমে কী অসুখ সেটা জেনে নিয়ে নিজেই চিকিৎসা করবেন, সফল না হলে কোনো ডাক্তার ডেকে আনবেন। অসুখবিসুখ তো অনেক বড়ো কথা। এক মাসের খরচের টাকায় পুরো মাসটা কী করে চলবে, আমরা তো সেটাই জানিনে। বাবা যা পাঠান আমরা তা বিশ-বাইশ দিনেই খরচ করে ফেলি, আর তারপর নিঃস্ব হয়ে হা-পয়সা দে-পয়সা করি, জলখাবার বন্ধ হয়, ধোপা-নাপিতের চোখ এড়িয়ে চলি, কিন্তু আজ তুমি আর আমি যা খরচ করি, তার অর্ধেক টাকায় বাবা তাঁর বয়সের একটা বড়ো অংশই সম্মান ও সুনামের সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। সেই সঙ্গে আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপালনও করেছেন, যার সংখ্যা সব মিলিয়ে ন-জন। আমাদের হেডমাস্টার মশাইকেই দ্যাখো। এম.এ পাশ নয় কী? তাও আবার এখানকার এম.এ নয়, অক্সফোর্ডের। এক হাজার টাকা মাইনে পান, কিন্তু তাঁর ঘরসংসার সামলান কে? তাঁর বুড়িমা। এখানে হেডমাস্টার মশাইয়ের ডিগ্রির কোনো দাম নেই। আগে নিজেই ঘরসংসার দেখাশোনা করতেন। টাকায় কুলোত না। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যখন তাঁর মা এসে নিজেই সংসারের হাল ধরলেন, তখন থেকেই ঘরে যেন লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা হল। তাই বলি ভাইটি, আমার কাছাকাছি এসে পড়েছ, একেবারে স্বাধীন হয়ে গেছ, এইসব অহংকার মন থেকে ঝেড়ে ফ্যালো। আমার চোখের সামনে তুমি উচ্ছন্নে যেতে পারবে না। যদি তুমি না মান, তবে আমি (চড় দেখিয়ে) এরও প্রয়োগ করতে পারি। আমি জানি, আমার কথা তোমার গায়ে বিছুটির মতো লাগে।

তাঁর এই নতুন যুক্তি শুনে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। আমি আমার তুচ্ছতা অনুভব করলাম। বড়দার প্রতি আমার মনে গভীর শ্রদ্ধা জাগল। আমি ছলছল চোখে বললাম—না, কক্ষনও না। আপনি যা বলছেন সব সত্যি। আপনার বলার অধিকার আছে।

বড়দা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—ঘুড়ি ওড়াতে নিষেধ করিনা। আমারও কি সাধ যায় না ঘুড়ি ওড়াতে? কিন্তু কী করব, আমি নিজেই যদি ভুল পথে চলি, তাহলে তোমায় সামলাব কী করে? একর্তব্যটুকুও তো আমার মাথায় রয়েছে!

ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময় একটা কেটে-যাওয়া ঘুড়ি আমাদের মাথায় ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সুতোটা নীচে ঝুলছিল। এক দল ছেলে পেছনে পেছনে ছুটে আসছে। বড়দা মাথায় বেশ লম্বা, লাফ দিয়ে তৎক্ষণাৎ সুতোটা ধরে ফেললেন। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে হোস্টেলের দিকে দৌড় দিলেন। আমিও পেছনে পেছনে দৌড়োতে লাগলাম।

(বড়ে ভাই সাহেব / ১৯৩৪) — অনুবাদ আশরফ চৌধুরী

চরণপুজো

আদর্শের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হল দুর্বলতা। দৃঢ়সংকল্প ও আত্মশক্তির বলে সব বিপদ বাধা প্রলোভনকে আপনি পরাস্ত করতে পারেন, কিন্তু একজন প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে তো কঠোর হওয়া যায় না, তাতে আদর্শ বজায় থাকুক বা নাই থাকুক। কয়েক বছর আগে পইতে হাতে করে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি আর কোনও দিন কারও বিয়েতে বরযাত্রী যাব না, এমনকি দুনিয়া উলটে গেলেও না। এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার দরকার কেন পড়েছিল, সে কাহিনি দীর্ঘ এবং আজও সে কথা মনে পড়লে আমার প্রতিজ্ঞা যেন আরও দৃঢ় হয়। সেই বিবাহ ছিল কায়স্থদের। বরকর্তা আমার পুরানো বন্ধু। বরযাত্রীদের বেশির ভাগই ছিল জানাশোনা লোক। গাঁয়ে যাবার কথা। ভাবলাম ভালোই হল, দু-তিন দিন গাঁয়ে বেড়ানো হবে, চলে গেলাম। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগল যে ওখানে গিয়ে বরযাত্রীরা যেন মতিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ। সবাই যেন কন্যাপক্ষের লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া করতে কোমর বেঁধে লেগেছে। এ জিনিসটা আসেনি, ও জিনিসটা পাঠায়নি, এরা মানুষ না কি জানোয়ার, বরফ ছাড়া জল কে খাবে! গাধারা বরফ পাঠিয়েছে, তাও মোটে দশ সের। জিজ্ঞেস কর্ তো, দশ সের বরফ নিয়ে কি চোখে লাগব, না দেবতার পায়ে উৎসর্গ করব! আজব হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। কেউই কারুর কথা শুনছিল না। বরের বাবা কপাল চাপড়াচ্ছিলেন এই বলে যে, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের যে দুর্গতি এখানে হল, সে দুঃখ তাঁর সারাজীবন থাকবে। উনি কি জানতেন মেয়েপক্ষ এমন গাঁইয়া। গাঁইয়া কীসের, মতলববাজ বলুন! নামেই শিক্ষিত, সভ্য, ভদ্র। পয়সাকড়িও ভগবানের দয়ায় কম নেই; কিন্তু মনটা এত ছোটো! দশ সের কিনা বরফ পাঠায়! এক ডিবে সিগারেটও নেই! আচ্ছা ঝামেলায় ফেঁসে গেছি আর কী!

ওঁর প্রতি কোনো রকম সহানুভূতি না দেখিয়ে আমি বলেছিলাম—সিগারেট পাঠায়নি, তাতে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? খামিরা তামাক তো দশ সের পাঠিয়ে দিয়েছে, খাচ্ছেন না কেন গুলে গুলে?

বরকর্তা বন্ধুবর আমার দিকে এমন অবাক চোখে তাকালেন যেন নিজের কান দুটোকে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। এমন উলটোপালটা কথা! বললেন—আপনিও অদ্ভুত মানুষ যা হোক! খামিরা এখানে কে খাবে? অনেক কাল হয়ে গেছে গুড়গুড়ি ফরসি সব পুরানো জিনিসের বাজারে বেচে দিয়েছে। পুরাতনপন্থী কিছু লোক এখনও হুঁকো গুড়গুড় করে বটে, কিন্তু সে খুবই কম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো এখানে সকলেই নতুন আলোকপ্রাপ্ত লোক, নতুন চিন্তাধারার নতুন যুগের মানুষ, কন্যাপক্ষও সে কথা জানে, তবুও সিগারেট পাঠায়নি। এখানে কয়েকজন ভদ্রলোক তো রোজ

আট-দশ ডিবে খেয়ে থাকেন। এক ভদ্রলোক তো বারো পর্যন্ত ওঠেন। আর চার-পাঁচ ডিবে তো সাধারণ ব্যাপার। এতগুলো লোকের মাঝখানে অন্তত পাঁচশো ডিবে না হলে কী হবে! আর বরফ তো দেখলেন, যেন ওষুধ খেতে পাঠিয়েছে। এতটুকু বরফ তো আমাদের ঘরে ঘরে লাগে। আমি তো একাই দশ সের খেয়ে নিই। গাঁইয়াদের কোনো দিন বুদ্ধি হবে না, তা সে যতই লেখাপড়া শিখুক না কেন।

বললাম—আপনার তাহলে সঙ্গে করে এক গাড়ি সিগারেট আর টন খানেক বরফ নিয়ে আসা উচিত ছিল।

উনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—আপনি ভাঙ-টাঙ খাননি তো?

—আজ্ঞে না, জীবনে কোনো দিন খাইনি।

—তাহলে আবোলতাবোল কেন বকছেন?

—আমার তো পুরো হুঁশ আছে।

হুঁশ থাকলে লোকে এমনতর কথা বলতে পারে না। আমরা এখানে ছেলের বিয়ে দিতে এসেছি, আমাদের সমস্ত ফরমাস কন্যাপক্ষকে মেটাতে হবে—সমস্ত! আমরা যা কিছু চাইব তাই দিতে হবে, কাঁদতে কাঁদতেও দিতে হবে। ঠাট্টাটি নয়। এদের নাকানিচুবুনি যদি না খাওয়াই তো বলবেন। এ তো আমাদের খোলাখুলি অপমান! বাড়িতে ডেকে এনে বেইজ্জত করা! আমার সঙ্গে যেসব লোক এসেছেন তাঁরা ধোপা-নাপিত নন, হোমরাচোমরা সবাই। ওঁদের অপমান আমি দেখতে পারি না। এঁরা যদি এমনি জেদ ধরে তো বর ফিরে যাবে।

আমি দেখলাম ওঁর এখন মাথা গরম হয়ে আছে, ওঁর সঙ্গে তর্ক করা উচিত নয়। জীবনে আজ এই প্রথম, শুধু দুদিনের জন্য, একটি মানুষের উপর উনি কর্তৃত্ব ফলাতে পেয়েছেন। মানুষটার গর্দান ওঁর পায়ের নীচে। তাহলে কেন ওঁর নেশা হবে না, কেন মাথাটি ঘুরে যাবে না, কেন প্রাণ খুলে মানুষটার উপর চোটপাট করবেন না। বরপক্ষের লোকজন কন্যাপক্ষের লোকজনদের উপর এতকাল ধরে হুকুম চালিয়ে এসেছে, সে অধিকার ত্যাগ করা সহজ নয়। এই লোকগুলোর মগজে এই মুহূর্তে একথা কি করে ঢুকবে, যে তোমরা কন্যাপক্ষের লোকেদের অতিথি আর তারা তোমাদের যেভাবে রাখতে চাইবে সেভাবেই তোমাদের থাকতে হবে। সে আদরআপ্যায়ন, খোসা-ভুসি, শুকনো-শাকনা যাই মিলবে তাতেই অতিথির খুশি থাকা উচিত। শিষ্টাচার কক্‌খনো এটা বরদাস্ত করবে না যে, তুমি যার অতিথি তার কাছ থেকে আপন খাতিরদারির ট্যাক্স উশুল করবে। তাই ওখান থেকে সরে পড়াই উচিত মনে করলাম।

কিন্তু বিয়ের লগ্ন যখন এল আর এদিক থেকে এক ডজন হুইস্কির বোতলের ফরমাস হল এবং বলা হল যে, যতক্ষণ বোতল না আসবে, আমরা বিবাহ-অনুষ্ঠানের জন্য মণ্ডপে যাব না, তখন আর আমি থাকতে পারলাম না। বুঝে নিলাম যে, এরা সব পশু, মনুষ্যত্ববিহীন। এদের সঙ্গে একটি মুহূর্ত কাটানো মানে নিজের আত্মাকে হত্যা করা। সেই মুহূর্তে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আর কোনো দিন কোনো বিয়েতে বরযাত্রী যাব না এবং তক্ষুনি নিজের গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে ওখান থেকে হাঁটা দিয়েছিলাম।

তাই গত মঙ্গলবারে যখন আমর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরেশবাবু তাঁর ছেলের বিয়েতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন তখন কোনোরকমে সাহস বজায় রেখে বলেছিলাম—আজ্ঞে না, আমাকে মাফ করবেন, আমি যাব না।

উনি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন—কেন বলুন তো?

—আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আর কোনো দিন বরযাত্রী যাব না।

—নিজের ছেলের বিয়েতেও নয়?

—আমার ছেলের বিয়েতে আমি নিজেই নিজের কর্তা থাকব।

—তাহলে ধরে নিন এ আপনারই ছেলে আর এখানে আপনিই কর্তা।

আমি নিরুত্তর হয়ে গেলাম। তবুও আপন জেদ ছাড়িনি, বললাম—আপনারা ওখানে কন্যাপক্ষের লোকেদের কাছে সিগারেট, বরফ, তেল, মদ ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসের জন্য পেড়াপিড়ি করবেন না তো?

—ভুলেও করব না, এ বিষয়ে আমার মনোভাবও আপনারই মতো।

—এমন তো হবে না যে, আমার মতো মনোভাব থাকা সত্ত্বেও আপনি ওখানে দুষ্টু লোকেদের কথায় ভুলে যাবেন আর ওরা ওদের কারসাজি শুরু করে দেবে?

—আমি আপনাকেই আমার প্রতিনিধি করছি। আপনার কথার উপরে ওখানে কোনো কথা চলবে না।

মনে তো তখনও আমার কিছুটা সংশয় ছিল, কিন্তু এতখানি আশ্বাস পাবার পরে আর বেশি গোঁ ধরে থাকা অভদ্রতা। তাছাড়া আমি ওখানে গেলে বেচারা তো আর তরে যাবেন না। শুধু আমার প্রতি ভালোবাসার জন্যই তো উনি সব কিছু আমার হাতে সঁপে দিচ্ছেন। যাব বলে কথা দিলাম। কিন্তু সুরেশবাবু যখন বিদায় নিয়ে উঠছেন, তখন আর একটু বাজিয়ে নেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম—

—দেনাপাওনা নিয়ে কোনও ঝগড়া নেই তো?

—বিন্দুমাত্রও না। ওর খুশি হয়ে যা দেবে, তাই আমরা নেব। চাওয়া না চাওয়ার অধিকার আপনার থাকবে।

—বেশ, আমি যাব।

শুক্রবারে বরযাত্রী রওনা হল। শুধু মাত্র ট্রেনযাত্রা আর তাও পঞ্চাশ মাইল। বিকেলে এক্সপ্রেস ট্রেনে করে রওনা হয়ে সন্ধ্যাবেলায় কনের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। সেখানে সব রকমের জিনিস প্রস্তুত ছিল। কোনো জিনিস চাইবার প্রয়োজন হয়নি। বরযাত্রীদের এতটা আদর-আপ্যায়নও যে হতে পারে, সেটা আমার কল্পনাতেও ছিল না। কন্যাকর্তারা এত বিনীত যে, কোনো কথা মুখ থেকে খসতে না খসতেই একজনের জায়গায় চারজন হাত জোড় করে এসে হাজির।

বিয়ের লগ্ন এল। আমরা সবাই মণ্ডপে গেলাম। সেখানে তিলধারণেরও ঠাঁই ছিল না। কোনো মতে ঠেলাঠেলি করে নিজেদের জন্য জায়গা করে নিলাম। সুরেশবাবু আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। বসার জায়গা ওখানে ছিল না।

কন্যাদান অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। কনের বাবা একখানি পীতাম্বর পরে এসে বরের সামনে বসলেন, তারপর বরের পা দুখানি ধুয়ে পায়ের উপরে তণ্ডুল, ফুল ইত্যাদি রাখতে লাগলেন। শত শত বিয়েতে আমি গিয়েছি, কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান দেখার কোনো সুযোগ হয়নি। এ সময় বরের নিকটে আত্মীয়স্বজনেরাই গিয়ে থাকে। আর সব বরযাত্রী 'জনবাসা'*তেই পড়ে পড়ে ঘুমোয়, কিংবা নাচ দেখে, না হলে গ্রামোফোন শোনে। আর কিছু না হলে ছোটো ছোটো দলে ভাগ

হয়ে বসে বসে তাস পেটে। আমার বিয়ের কথা আমার মনে নেই। এ সময় কনের বৃদ্ধ পিতাকে একটি যুবকের চরণ-বন্দনা করতে দেখে আমি হৃদয়ে আঘাত পেলাম। এ কি হিন্দু বিবাহের আদর্শ না তার পরিহাস? জামাতা বলতে গেলে পুত্রেরই মতো, তারই উচিত তার ধর্মপিতার চরণ ধুয়ে দেওয়া, তাতে পান, ফুল দেওয়া। এটাই তো যুক্তিসংগত বলে মনে হচ্ছে। কনের বাবা বরের পদবন্দনা করবে এতে না আছে শিষ্টতা, না ধর্ম, না মর্যাদা। আমার বিদ্রোহী মন কোনোমতেই স্থির থাকতে পারেনি। রাগতস্বরে আমি বললাম—এ কী অন্যায়, ভাইসব! কনের বাবার এই অপমান! আপনাদের মধ্যে কি মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই?

মণ্ডপে নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। সবার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়লাম আমি। আমি কী বলতে চাই, এটা কারও মাথায় এল না।

অবশেষে সুরেশবাবু প্রশ্ন করলেন—কীসের অপমান, কার অপমান? এখানে তো কারুর অপমান হচ্ছে না।

—কনের বাবা বরের চরণ পুজো করবে, এটা তাঁর অপমান নয় তো কী?

—এ অপমান নয় দাদা, এ প্রাচীন প্রথা।

কন্যার পিতৃদেব বললেন—মান্যবর, এ আমার অপমান নয়, আমার সৌভাগ্য যে আজ এই শুভযোগ হয়েছে। এ দেখেই আপনি ঘাবড়ে গেলেন! এখনও তো কম করেও একশো জন লোক চরণ-বন্দনার প্রতীক্ষাতে বসে আছে। কতজন ব্যাকুল হয়ে ভাবছে যে, যদি মেয়ে থাকত তাহলে চরণ-বন্দনা করে জন্ম সার্থক করতাম!

আমি নিরুত্তর হয়ে গেলাম। কনের বাবার চরণ-বন্দনা শেষ হলে মেয়ে-পুরুষের একটি দল বরের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং প্রত্যেকে এসে বরের চরণ পুজো করতে শুরু করল। প্রত্যেকেই আপন আপন সামর্থ্য মতো কিছু না কিছু অর্পণ করে যাচ্ছিল। সবাই প্রসন্নচিত্তে গদগদ নেত্রে এই নাটক দেখছিল আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম—সমাজে উচিত-অনুচিত বোধ যখন এতটা লোপ পেয়ে গেছে এবং মানুষ যখন অসম্মানকেও সম্মান বলে মনে করছে তখন সমাজে নারীদের এত দুর্গতি হবে না কেন, কেন তারা নিজেদেরকে পুরুষের পায়ের জুতো বলে মনে করবে না, কেন তাদের আত্মসম্মান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে না!

বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেলে বরবধূ মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এল। আমি তখন তাড়াতাড়ি এগিয়ে ওই থালাখানি থেকেই কিছু ফুল তুলে নিলাম, তারপর এক অর্ধচেতন অবস্থায়, জানি না কোন্ ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে, ফুল কটিকে নববধূর চরণে অর্পণ করলাম, করে তক্ষুনি সেখান থেকে বাড়ি চলে এলাম।

(পৈশুজী / ১৯৩৫) অনুবাদ ননী শূর

---

*জনবাসা—বরযাত্রীদের থাকবার জায়গা।

মিস পদ্মা

আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পর মিস পদ্মার একটা নূতন অভিজ্ঞতা হল! তা হল তার জীবনের শূন্যতা! বিয়েটা তার কাছে একটা কৃত্রিম বাঁধন ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি এবং এটাই সে ঠিক করেছিল যে, সে বিয়ে না করেই স্বাধীনভাবে জীবন উপভোগ করবে। এমএ পাস করার পর সে আইন পাস করে কোর্টে প্র্যাকটিস আরম্ভ করল। সে ছিল রূপসি, যুবতী এবং সেই সঙ্গে মৃদুভাষিণী ও প্রতিভাময়ী। তাই আগে এগিয়ে যেতে তার কোনো বাধাই ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই সে তার সমবয়সি উকিলদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। তারফলে গড় আয় বর্তমানে কখনও কখনও হাজার টাকার উপরও হয়ে যায়। এখন তাকে মামলা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে হয় না বা পরিশ্রম করতে হয়না। যেগুলোর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তার হয়ে গিয়েছিল প্রায় সেই কেসগুলো তার হাতে আসত, তাই আগের থেকে সে বিষয়ে কোনোরকম তৈরি হওয়ার কিছু ছিল না। তার নিজের ক্ষমতার উপরও কিছুটা বিশ্বাস জন্মেছিল। মামলায় কী করে বিজয়ী হওয়া যায় তার ধরনধারণ সে কিছুটা শিখে ফেলেছিল। তাই তার হাতে এখন অফুরন্ত সময়। সে সময়কে গল্পের বই পড়ে, সিনেমা দেখে, ঘুরে বেড়িয়ে বা দেখাসাক্ষাতের মধ্যে দিয়ে খরচ করত। এটা সে বেশ বুঝতে পারত যে জীবনে সুখী হওয়ার জন্য একটা কিছু শখ বা অবলম্বন দরকার। সে তাই বেছে নিয়েছিল ফুলগাছ করার শখ। বিভিন্ন ধরনের বীজ এবং ফুলগাছ কিনে আনত এবং সেগুলোকে জন্ম নিতে, বড়ো হতে এবং তাতে ফুল ফুটতে দেখে সে দারুণ খুশি হত। কিন্তু এত করেও মিস পদ্মার জীবনের শূন্যতা পূর্ণ হত না। এমন নয় যে সে পুরুষদের থেকে দূরে থাকতে চাইত। তার প্রেমিকের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। যদি শুধু তার রূপ ও যৌবন থাকত তাহলেও তার উপাসকের অভাব হত না, কিন্তু এখানে তো রূপ, যৌবন এবং সেই সঙ্গে বিত্তও ছিল তার। রসাকাঙ্ক্ষীরা তাকে ঘিরে থাকবে না কেন? পদ্মার বিলাসিতাকে ঘৃণা ছিল না, ঘৃণা ছিল পরাধীনতার প্রতি, বিবাহটাকে জীবনের ব্যবসায় করে তোলার প্রতি। সে ভাবত যদি স্বাধীন থেকে সব রকম ভোগবিলাসের আনন্দ উপভোগ করা যেতে পারে তাহলে কেনই বা উপভোগ করব না? ভোগ সম্বন্ধে তার মধ্যে কোনো নৈতিক বাধাই ছিল না। বরং এটাকে সে একধরনের দৈহিক ক্ষুধা বলেই মনে করত। এই যে ক্ষুধা বা চাহিদা সেটা তো একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোকান থেকেই মেটানো যেতে পারে। মিস পদ্মাও সবসময় ওই রকম একটা দোকানের খোঁজে থাকত। খদ্দের দোকান থেকে নিজের যা পছন্দ সেই জিনিসই কিনে নেয়। মিস পদ্মাও তাই চাইত। তার ডজন ডজন প্রেমিক ছিল—কিছু উকিল, কিছু ডাক্তার, কিছু প্রফেসার, আবার বেশ রইস আদমি কেউ। কিন্তু এরা সবাই সুখের পায়রা, ভোমরার মতো ফুলের রস পান করে উড়ে

যাওয়া গোছের লোক। বিশ্বাস করা চলে, এমন একজনকেও পদ্মা পায়নি। পদ্মার তখন মনে হল তার মন শুধু ভোগবিলাস চায় না, আরও কিছু চায়! কিন্তু সেটা কী? তা হল পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তা সে এদের কাছে কখনওই পেত না।

পদ্মার প্রেমিকদের মধ্যে একজন ছিলেন মিঃ প্রসাদ—যেমন রূপবান, তেমনই প্রচণ্ড বিদ্বান। তিনি একটি কলেজের প্রফেসর। তিনিও বন্ধনহীন ভোগের আদর্শের পূজারি। পদ্মা তাঁর প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিল। সে মিঃ প্রসাদকে বাঁধন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজের করে নিতে চাইত, কিন্তু মিঃ প্রসাদ ফাঁদে পা দিতে চাইছিলেন না।

সন্ধে হয়ে গেছে। পদ্মা বেড়াতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল এমন সময় প্রসাদ এসে হাজির। বেড়ানোর সেইখানেই ইতি। বেড়ানোর চাইতে আনন্দ প্রসাদের সঙ্গে কথা বলায়। পদ্মা মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিল প্রসাদকে তার মনের কথা বলবে। অনেকদিন চিন্তা করার পর ইচ্ছেটা ব্যক্ত করাই ঠিক করল। সে প্রসাদের মোহভরা চোখে চোখ রেখে বলল—তুমি আমার বাংলোবাড়িতে এসে থাক না কেন? প্রসাদ কুটিল পরিহাসের সঙ্গে বলে উঠল—তার মানে দু-চার মাসের মধ্যেই এই দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যাবে!

— তোমার কথার অর্থ ঠিক বুঝলাম না তো?

— আমি যা বললাম তার অর্থ তাই দাঁড়ায়?

— কিন্তু কেন?

— আমি চাইব না আমার স্বাধীনতা হারাতে, তুমিও চাইবে না নিজের স্বাধীনতা খোয়াতে। তোমার কাছে তোমার প্রেমাকাঙক্ষীরা আসবে, আমার রাগ হবে। আমার কাছে আমার প্রেমিকারা এলে তোমার খারাপ লাগবে। এই নিয়ে খটাখটি লাগবে, তারপরে আবার বিরূপ হবে, আর তুমি আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে। তোমারই তো ঘরবাড়ি। আমাকে তো খারাপ লাগবেই। তাহলে বন্ধুত্ব টিকবে কী করে?

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। প্রসাদ এমন স্পষ্ট সোজাসুজি এবং ঠোঁটকাটার মতো পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছে যে কোনো কিছু বলার সুযোগও নেই।

শেষ পর্যন্ত প্রসাদই একটা উপায় দর্শাল—যতক্ষণ না আমরা এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ থেকে তুমি আমার এবং আমি তোমার, ততক্ষণ একসঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়।

— তুমি এই প্রতিজ্ঞা করবে?

— প্রথমে তুমি বলো।

— আমি করব।

— তাহলে আমিও করব।

— কিন্তু শুধুমাত্র এই কথা ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই আমার স্বাধীনতা বজায় থাকবে তো।

— হ্যাঁ আর আমিও এই কথা ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই স্বাধীন থাকব।

— রাজি তো?

— রাজি!

— কবে থেকে?

— তুমি যবে থেকে বলবে।

— আমি বলছি আগামী কাল থেকেই।

— তাই হবে! কিন্তু তুমি যদি প্রতিজ্ঞার অন্যথা কর?

— আর তুমি যদি কর?

— তুমি আমায় বাড়ি থেকে বার করে দেবে কিন্তু আমি তোমায় কী শাস্তি দেব?

— তুমি আমায় ত্যাগ করবে, আর কী করবে?

— না? এটুকুতে আমার মন শান্তি পাবে না। আমি চাইব তোমায় অপমান করতে, এমন কী তোমায় হত্যা করতে।

— তুমি বড়ো নিষ্ঠুর প্রসাদ!

— যতক্ষণ আমরা স্বাধীন আমাদের কাউকে কিছু বলার অধিকার নেই, কিন্তু একবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলে তার অবহেলা আমিও সহ্য করব না, তুমিও পারবে না! তোমার কাছে শাস্তি দেওয়ার উপায় আছে। কিন্তু এমন কোনো অধিকার আইনে আমাকে দেবে না! আমি শুধু জান্তব শক্তি দিয়ে তোমায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে বাধ্য করব। কিন্তু আমি একা তোমার এত চাকরবাকরের সামনে কী করতে পারব?

- তুমি শুধু ছবির অন্ধকার দিকটা দেখছ। যখন আমিই তোমার হয়ে যাচ্ছি তখন বাড়িঘর চাকরবাকর ধনসম্পত্তি সবই তোমার হবে। আমরা দুজনেই জানি, ঈর্ষার চাইতে ঘৃণিত আর কোনো সামাজিক পাপ নেই! আমি তোমায় ভালোবাসি কি না তা ঠিক বলতে পারব না, কিন্তু তোমার জন্য সব কিছু সহ্য করতে পারব। যা বলবে তাই করব।

— অন্তর থেকে বলছ, পদ্মা?

— এই আমার মনের কথা।

— কিন্তু কেন জানিনা তোমার উপর বিশ্বাস আসছে না।

— আমি তোমায় বিশ্বাস করছি।

— তুমি এটা বুঝে নাও, তোমার বাড়ি আমি অতিথি হয়ে থাকব না। স্বামীর মতো থাকব।

— তুমি শুধু বাড়ির নয় আমার স্বামী হয়ে থাকবে। আমি তোমার স্বামিনী হয়ে থাকব।

প্রফেসর প্রসাদ এবং মিস পদ্মা বেশ আনন্দিতভাবেই এক সঙ্গো থাকে। দুজনেই দুজনের মতে থাকে। যে আদর্শ তারা মনেমনে স্থির করেছিল, তাই সত্যি হল। প্রসাদ মাত্র দুশো টাকা বেতন পেত, কিন্তু তার থেকে যদি আয়ের দুনো খরচ করে ফেলে তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। আগে মাঝে-মধ্যে খেত, এখন প্রায় সবসময় মদ খায়। এখন তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য গাড়ি চাকরবাকর। দামিদামি আসবাব পত্র কেনে। আর পদ্মা বেশ খুশি মনেই তার এই পয়সার অপচয় মেনে নেয়। মেনে না নেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। পদ্মা নিজে তার জন্য দামি পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করিয়ে দেয় এবং সব সময় এই চেষ্টা করে যে প্রসাদকে যেন আরও আরামে রাখা যায়। এমন মূল্যবান একটি ঘড়ি ব্যবহার করে প্রসাদ যে ঘড়ি শহরের বড়োবড়ো ধনী ব্যক্তিদের হাতেও নেই।

পদ্মা যতই নিচু হয়ে থাকে প্রসাদ তাকে তত বেশি চাপ দেয়। কোনো সময় পদ্মার বেশ খারাপ লাগে, কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে নিজেকে প্রসাদের অধীন মনে হত। প্রসাদকে একটু চুপচাপ বা চিন্তিত দেখলেই ব্যস্ত হয়ে উঠত। পদ্মার পুরনো প্রেমিকরা ও স্তাবকরা তাকে

ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত, খোঁচা দিত। কিন্তু প্রসাদের কাছে এলেই পদ্মা সব ভুলে যেত। মিঃ প্রসাদ যে পদ্মাকে বেশ ভালোভাবে হাত করে ফেলেছে সে বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল টনটনে। পদ্মাকে সে খোলা বইয়ের মতো পড়ে ফেলেছে।

প্রেম ও রাজনীতিতে অমন ক্ষমতা বা অধিকারের অপব্যবহার আটকানো যায় না এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিকেই তার মূল্য দিতে হয়। পদ্মার ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হল। আত্মাভিমানী পদ্মা যখন প্রসাদের রক্ষিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন মিঃ প্রসাদ নিজের ইচ্ছামতো তার দুর্বলতার সুযোগ তো নেবেই। একবার পেরেক যখন আটকেছে তখন খুব নিপুণতার সঙ্গে ঠুকে ঠুকে তাকে সম্পূর্ণ বসিয়ে দিচ্ছে সে। অনেক রাতে সে বাড়ি ফেরে। পদ্মাকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যেতে চায় না! সঙ্গে যেতে চাইলে বলে, বড্ড মাথ ধরেছে। পদ্মা যখন নিজে বেরিয়ে যায়, তখন সেও গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

দুবছর কেটে গেছে। পদ্মা তখন মা হতে চলেছে। মোটাও হয়ে গেছে সে। তার চেহারায় আগেকার সেই সজীবতা ও মাদকতা আর নেই। সে এখন ঘরের পোষা মুরগি—তার আর কী মূল্য। একদিন এইরকম সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেছে পদ্মা, ফিরে দেখে প্রসাদ বাড়ি নেই। বেশ বিরক্ত হল সে। ইদানীং প্রসাদের পরিবর্তন সে লক্ষ করছিল। আজ সাহস করে সে খোলাখুলি কথা বলবে। দশটা বাজল, এগারোটা বাজল, পদ্মা বসেই আছে। খাবার ঠান্ডা হয়ে গেল। চাকর-বাকরেরা যে যার শুতে চলে গেছে। পদ্মার দৃষ্টি বার বার গেটের দিকে চলে যাচ্ছে। প্রায় যখন একটা বাজে, প্রসাদ বাড়ি ফিরলেন।

পদ্মা যতটা সাহস সঞ্চয় করেছিল পষ্টাপষ্টি কথা বলবে বলে, সামনে সে সাহস তার জোগাল না। তবু একটু রুক্ষ গলায় বলে উঠল—এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে! কটা বেজেছে খেয়াল আছে? প্রসাদের এই মুহূর্তে পদ্মাকে দারুণ কুৎসিত মনে হল। সে এক ছাত্রীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। বলে উঠল—তোমার তো এখন নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকার কথা। তোমার যা অবস্থা তাতে তো যতটা পারা যায় আরামে থাকা উচিত। পদ্মার সাহস যেন একটু বাড়ল—আমার কথা চুলোয় যাক। আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার আগে জবাব দাও।

— আমার কথাও চুলোয় যাক।

— আমি লক্ষ করছি ইদানীং তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করছ।

— তোমার চোখের জ্যোতি একটু বেড়ে গেছে।

— আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার মেজাজ বেশ বদলে গেছে।

— আমি নিজেকে তোমার কাছে বিক্রি করে দিইনি। যদি তোমার সাধ মিটে গিয়ে থাকে তাহলে আমি আজই চলে যেতে রাজি।

— তুমি চলে যাওয়ার ভয় দেখাচ্ছ। এখানে আসার জন্যে কী এমন ত্যাগ করে এসেছ তুমি?

— আমি ত্যাগ করিনি? এত সাহস তোমার যে তুমি একথা বলছ? আমিই দেখছি তোমার মনমেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। তুমি ভাবছ আমি এই লোকটাকে অকেজো করে দিয়েছি, কিন্তু আমি এক্ষুনি সব কিছুতে লাথি মেরে চলে যাব। এই মুহূর্তেই। সে দ্রুত নিজের বাক্স-প্যাঁটরা গোছাতে লাগল। পদ্মার সাহস যেন মিলিয়ে গেল, কাতর গলায় বলে উঠল—আমি তো এমন কোনো কথা বলিনি যাতে এত রেগে যেতে পার। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম কোথায় ছিলে। এটুকু

অধিকারও কি আমার প্রাপ্য নয়? আমি তোমার ইচ্ছার বিরুধ্বে কোনো কাজ করি না অথচ তুমি কেবল কথায় কথায় রাগ কর। তোমার একটুও দয়ামায়া নেই আমার উপর। তোমার একটু সহানুভূতিও কি আমি পাব না? আমি তোমার জন্যে কী করতে বাকি রেখেছি? আজ আমার এই অবস্থা, তাই তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। —সে আর কিছু বলতে পারে না। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে যায়। টেবিলের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ওঠে। প্রসাদের জয় সম্পূর্ণ হয়।

পদ্মার কাছে মাতৃত্ব এখন বড়োই অপ্রিয় প্রসঙ্গ। সব সময় একটা চিন্তা তার মাথায় থাকে। কখনও কখনও ভয়ে কেঁপে উঠে, আর অনুতাপ করে। প্রসাদের নিরঙ্কুশতা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। মা হওয়ার দিন এগিয়ে আসছে। সারা দিন একা একা বসে থাকে। কোর্টে যায় না। প্রসাদ সন্ধের সময় বাড়ি ফেরে। আবার বেরিয়ে যায়। সেই এগারোটা বারোটার আগে বাড়ি ফেরে না। সে কোথায় যায়, কী করে তাও পদ্মার কাছে লুকোনো থাকে না।

এখন পদ্মার মুখ দেখতেও যেন প্রসাদের ঘৃণা। পূর্ণ গর্ভবতী, ফ্যাকাশে, উদ্‌বিগ্ন, ভীত, উদাস মুখ। তবু প্রসাধন আর অলংকারে সেজে পদ্মা প্রসাদকে আকর্ষণ করার চেষ্টায় ক্ষান্তি দিত না। কিন্তু যত চেষ্টা করত সে, প্রসাদ ততই তার উপর বিরূপ হয়ে উঠত। এই অবস্থায় নিজের প্রসাধনচর্চিত মুখ, তার নিজের কাছেই কুৎসিত হয়ে উঠত।

প্রসববেদনা আরম্ভ হয়েছে। নার্স, লেডি ডাক্তার সবাই উপস্থিত, কিন্তু প্রসাদ সেখানে নেই। সেই কারণে প্রসব বেদনা পদ্মার কাছে আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে আনন্দে পদ্মার মন ভরে উঠল, কিন্তু প্রসাদকে কাছে না পেয়ে সন্তানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। যেন মিষ্টি ফলে পোকা ধরেছে। পাঁচদিন আঁতুড়ঘরে থাকার পর পদ্মা যেন জেল থেকে ছাড়া পেল—সে খোলা তলোয়ারের মতো হয়ে উঠল। মা হয়ে সে নিজের মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তি বোধ করল।

চাপরাসিকে চেকবই দিয়ে ব্যাঙ্কে পাঠাল। কিছু টাকার দরকার ছিল। প্রসব বাবদ কিছু টাকা দিতে হবে। চাপরাসি ফিরে এল। 'টাকা?'—পদ্মা জিজ্ঞেস করল।

— সব টাকা প্রসাদবাবু তুলে নিয়েছেন, ব্যাঙ্কবাবু বললেন।

পদ্মা স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রায় কুড়ি হাজার টাকা প্রাণপণে সঞ্চয় করেছিল তার শিশু সন্তানের কথা ভেবে। আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে পদ্মা শুনল প্রসাদ কোনো এক ছাত্রীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে চলে গেছে। ক্ষেপে গিয়ে প্রসাদের ছবিটা সে মাটিতে আছড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল, তার ব্যবহারের সব জিনিসপত্র জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘৃণায় থুথু ছিটিয়ে দিল তার উপর।

এক মাস কেটে গেছে। পদ্মা সন্তানকে কোলে নিয়ে বাংলো বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার ক্রোধ এখন এক শোকে নিরাশায় রূপান্তরিত। সন্তানের প্রতি কখনও তার দয়া হয়, কখনও মমতা, কখনও ঘৃণা। চেয়ে চেয়ে দেখছে এক ইউরোপিয়ান মহিলা পথে তার স্বামীর সঙ্গে নিজের শিশুটিকে গাড়িতে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সে আশাআকাঙ্ক্ষা ভরা চোখে সেই সুখী দম্পতির দিকে তাকিয়ে দেখে। তার চোখ জলে ভরে যায়।

(মিস পদ্মা) অনুবাদ বনানী ঘোষ

মোটরের ছিটে

প্রাতঃকালে স্নান-পুজো সেরে, তিলক কেটে, পীতাম্বর পরে, পায়ে খড়ম দিয়ে, বগলে পাঁজিপুঁথি রেখে আর হাতে একখানা মোটা শত্রু-মস্তক-ভঞ্জন লগুড় নিয়ে ঈশ্বরের নাম করতে করতে যজমানের বাড়ি যাত্রা করলাম। বিবাহের শুভদিন ধার্যের কাজ আছে। কম-সে-কম একটা আংটাওলা বালতি। উপরি জলযোগ। আর আমার জলযোগ তো মামুলি জলযোগ নয়। বাবুরা আমায় নেমন্তন্ন করার সাহসই পান না। তাঁদের সারা মাসের জলখাবার আমার একদিনের জলযোগ। এব্যাপারে আমি শেঠমহাজনদের পক্ষপাতী। খাওয়ান যেমন তেমনি খোলা মন—দেহ পুলকিত হয়ে ওঠে। যজমানের মনের দিকে চেয়েই আমি তার নেমন্তন্ন গ্রহণ করি। খাওয়াতে খাওয়াতে কেউ যদি চোখমুখের এমন দশা করে যে কেঁদে ফেলার জোগাড়, অমনি আমার খিদে উড়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে খাওয়ানোটা কী আর খাওয়ানো? সেরকম খাবার অন্তত আমার হজম হয় না। যজমান এমন চাই যে শুধু হেঁকে যাবে—পণ্ডিতজি আর একটা বালুসাই! আর আমি বলতে থাকব—না ভাই, আর না।

রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় এখানে-ওখানে জল জমে আছে। আমি তো নিজের ভাবনা-চিন্তায় মশগুল হয়ে হাঁটছি, এমন সময় একটা গাড়ি ছপ্‌ছপ্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। জলকাদার ছিটে এসে লাগল মুখে। তারপর দেখি কী, পরিধেয় বস্ত্রে কে যেন নোংরা গুলে ঢেলে দিয়েছে। একে তো কাপড় নষ্ট তার ওপর দেহ ছুৎ, আর্থিক ক্ষতি—তাও আছে। গাড়িওয়ালাকে যদি পেতাম, এমন মেরামত করে দিতাম যে চিরকাল স্মরণ করত। মনের ঝাল মনেই রইল। এই সাজপোশাকে তো আর যজমানের বাড়ি যেতে পারিনা, আমার বাড়িও মাইলটাকের কম না। তাছাড়া পথে যারা যাতায়াত করছে, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তারা হাততালি দিচ্ছে। এমন দুর্গতি আর কখনও হয়নি। বলো মন, এখন কী করবে? বাড়ি ফিরলে পণ্ডিতানিই বা কী বলবে?

সত্বর আমি নিজের কর্তব্যে স্থির করে ফেললাম। এধার-ওধার থেকে দশ-বারোটা পাথর কুড়িয়ে জড়ো করলাম, তারপর অন্য গাড়ির পথ দেখতে লাগলাম। ব্রহ্মতেজ তখন একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে। বোধ হয় দশ মিনিটও হয়নি, একটানা গাড়ি আসতে দেখা গেল। আরে, সেই গাড়িটাই দেখছি। সম্ভবত প্রভুকে স্টেশন থেকে নিয়ে ফিরছে। যেই কাছে এসেছে, অমনি একটা পাথর ছুঁড়লাম, পুরো জোরের সঙ্গেই ছুঁড়লাম। সাহেবের টুপি উড়ে গিয়ে রাস্তার কিনারায় পড়ল। গাড়ির গতিবেগ ঢিমে হয়ে আসতেই আর একটা। জানালার কাঁচ ভেঙে চুর-চুর হয়ে গেল, একটা টুকরো সাহেবের গালেও লাগল। রক্ত পড়ছে। গাড়ি থেমে গেল। সাহেব গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ঘুষি বাগিয়ে বললেন—শুয়ার, আমি তোমাকে

পুলিসে দেব। এইটুকু আমার কানে যেতেই পাঁজিপুঁথি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, তারপর সাহেবের কোমর জাপটে ধরে পায়ে ছাঁদি লাগাতেই না, জলকাদায় একেবারে ধপাস। আমি চট করে সাহেবের ওপর চড়ে বসলাম। তারপর তাঁর ঘাড়ে ধাঁই ধাঁই করে গোটা পঁচিশেক জোর রদ্দা কষিয়ে দিতেই সাহেব চোখে সর্ষে ফুল দেখলেন। ইত্যবসরে তাঁর স্ত্রী নেমে এসেছেন। হাইহিল জুতো, রেশমি শাড়ি, গালে পাউডার, ঠোঁটে রঙ, ভুরুতে কাজল। ছাতা দিয়ে আমায় গুঁতোতে শুরু করলেন। সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম, লাঠিখানা মজবুত করে বাগিয়ে ধরে গললাম—দেবী, বেটাছেলেদের মধ্যে মাথা গলাতে আসবেন না, কোথায় লেগেটেগে যাবে, শেষে আমারই দুঃখ হবে।

এই সুযোগে সাহেব নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, জুতো পায়ে একটা লাথি ঝাড়লেন আমায়। বেশ জোর আঘাত লাগল হাঁটুতে। উন্মাদের মতো আমি লাঠি তুলে বসিয়ে দিলাম সাহেবের পায়ে। তিনি কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়লেন। মেমসাহেব ছাতা তুলে তেড়ে এলেন। আমি আস্তে ওঁর ছাতাটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলাম। ড্রাইভার তখনও বসে ছিল। এবার সেও নেমে পড়ল, ছড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। এক ডান্ডা মেরে ওকেও শুইয়ে দিলাম। তামাশা দেখতে প্রায় পঞ্চাশজন লোক জড়ো হয়েছে। সাহেব মাটিতে শুয়ে শুয়েই বললেন—রাস্কেল, আমি তোমাকে পুলিশে দেব।

আমি আবার লাঠি সামলাচ্ছি, এবার ওঁর মাথার খুলিতে ঝাড়ব, তাই দেখে সাহেব হাত জোড় করে বললেন—না না, বাবা, আমি থানা পুলিশ করব না, ক্ষমা করুন।

আমি বললাম—হ্যাঁ, পুলিশের নাম নেবে না, নইলে এখানেই মাথা রাঙিয়ে দেব। বড়ো জোর ছমাসের সাজা হবে, কিন্তু তোমার আদত ঘুচিয়ে ছাড়ব বলে দিচ্ছি। গাড়ি চালাবে আর জলকাদা ছিটিয়ে ছিটিয়ে যাবে, গুমোরের চোটে অন্ধ হয়ে যাও, তাই না! সামনে দিয়ে, পাশ দিয়ে কে যাচ্ছে, সেদিকে কোনো লক্ষ্যই নেই।

একজন দর্শক মন্তব্য করল—আরে পণ্ডিতজি, গাড়িওয়ালা জেনেশুনেই জলকাদা ছিটিয়ে যায়, লোকের দুর্গতি হলে ওরা সবাই তামাশা দেখে আর খুব হাসে। অন্তত একজনকে ঠিক করে দিয়েছেন আপনি, বেশ করেছেন।

আমি সাহেবকে সম্বোধন করে বললাম—শুনতে পাচ্ছ কিছু, জনসাধারণ কী বলছে? সাহেব চোখ রাঙিয়ে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন—মিথ্যে কথা বলছ তুমি, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

আমি ধমক দিলাম—এখনও তোমার গুমোর ভাঙেনি, আর দু-এক ঘা দিয়ে আসব নাকি?

সাহেব তোতলাতে তোতলাতে বললেন—আরে না বাবা, সত্যি কথাই বলছে, সত্যি কথাই বলছে। এবার খুশি হলেন তো!

আর একজন দর্শক বললেন—এখন যা বলছে, বলুক। কিন্তু যেই গাড়িতে গিয়ে বসবে, অমনি সেই একই চাল শুরু করে দেবে। গাড়িতে বসলেই না, সবাই নিজেকে নবাবের নাতি বলে ভাবতে লাগে।

ভদ্রলোক প্রস্তাব করলেন—ওকে বলুন, থুতু ফেলে চাটুক।

তৃতীয় ভদ্রলোক অন্য প্রস্তাব দিলেন—না, কান ধরে ওঠ-বোস করান।

চতুর্থ ব্যক্তি বললেন—আরে ওই ড্রাইভারটাকেও। ওরা তো আরো পাজির বেহদ্দ। বড়োলোক গুমোর দেখায়, সেটা একটা ব্যাপার, তুমি কীসের দেমাক দেখাও হে বাপু? যেই হাত দিয়েছে চাকায়, অমনি চোখে পরদা পড়ে যায়।

আমি প্রস্তাবটা মেনে নিলাম। ড্রাইভার আর মালিক দুজনকেই কান ধরে ওঠ-বোস করাতে চাই, মেমসাহেব গুনুক। বললাম—শুনুন মেমসাব, আপনাকে গুনতে হবে। পুরো একশো বৈঠক। একটাও যেন কম না হয়। বেশি যদি চান, যত হবে হোক, আপত্তি নেই।

দুজন লোক সাহেবকে হাত ধরে ওঠাল, দুজন ড্রাইভার মহোদয়কে। ড্রাইভার বেচারির পায়ে আঘাত, তবু সে ওঠ-বোস শুরু করে দিলে। সাহেবের গোঁ যথেষ্ট। শুয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি বকতে লাগলেন। তখন তো আমার রুদ্রমূর্তি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ওকে একশো বৈঠক দেওয়াতেই হবে, নইলে ছাড়ছিনে। চারজন লোককে হুকুম দিলাম গাড়িটাকে ঠেলে সড়কের নীচে ফেলে দিতে।

হুকুম দিতেই যা দেরি। চারজনের জায়গায় পঞ্চাশজন জুটে গেল, গাড়িটাকে ঠেলতে শুরু করল তারা। সড়কটা খুব উঁচু, দুদিকের জমি নিচু। গাড়ি নিচে পড়লে ভেঙেচুরে দলা পাকিয়ে যাবে। গাড়িটা রাস্তার কিনারায় পৌঁছবে কী, সাহেব আঁতকে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বাবা, গাড়ি ভাঙবেন না, আমি ওঠবোস করছি।

আমি লোকগুলোকে সরে যেতে হুকুম দিলাম, কিন্তু সবার কাছে যেন একটা মজার খেলা জুটেছে। আমাকে গ্রাহ্যই করল না কেউ। আমি যখন লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলাম, তখন তারা গাড়ি ছেড়ে দৌড় দিল। সাহেব চোখ বন্ধ করে বৈঠক লাগাতে শুরু করলেন।

দশ বৈঠকের পর আমি মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম—কত হল?

মেমসাহেব মেজাজ দেখিয়ে জবাব দিলেন—আমি গুনছি না।

—তাহলে সাহেব এমনি দিনভর কাতরাবেন, আমি ছাড়ব না। যদি ওঁকে ভালোয় ভালোয় বাড়ি নিয়ে যেতে চান, তাহলে বৈঠক গুনে দিন। আমি ওঁকে ছেড়ে দেব।

সাহেব দেখলেন যে দণ্ড ভোগ না করলে প্রাণে বাঁচবেন না, তাই তিনি বৈঠক লাগিয়ে চললেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ....।

হঠাৎ চোখে পড়ল, আর একখানা গাড়ি আসছে। সাহেবও সেটা লক্ষ্য করলেন। নাক মলে বললেন—পণ্ডিতজি, আপনি আমার বাপ! আমায় দয়া করুন। আমি আর কক্ষনও গাড়ি চড়ব না। আমার মনেও করুণার উদ্রেক হল। বললাম—না, গাড়ি চড়তে মানা করছিনা, তবে বলি কি, গাড়িতে উঠেও মানুষকে মানুষ বলে ভেবো।

অন্য গাড়িটা বেশ জোরে আসছে। আমি ইশারা করলাম। সবাই দুটো দুটো করে পাথর তুলে নিল। গাড়ির মালিক নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়িটার বেগ কমিয়ে তিনি চুপিচুপি চলে যেতে চাইছিলেন, আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর কান দুটি ধরে জোরে ঝাঁকানি দিলাম, তারপর দুই গালে এক-এক চড় মেরে বললাম—গাড়িতে জলকাদা ছিটোবে না, বুঝলে! চুপচাপ চলে যাও।

ভদ্রলোক তো চেঁচামেচি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শখানেক লোককে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, লেজ-কান না নেড়েই চলে গেলেন।

তাঁর যাওয়ার পর এক মিনিটও কাটেনি, আর একখানা গাড়ি এল। আমি পঞ্চাশজনকে পথ আটকাতে হুকুম দিলাম। গাড়ি দাঁড়াল। আমি ওঁকেও চার চড় মেরে বিদায় করলাম। কিন্তু ও বেচারি ভালো লোক, মজা করে চড় খেয়ে কেটে পড়লেন।

হঠাৎ একজন বলল—পুলিশ আসছে।

তৎক্ষণাৎ দেখতে দেখতে সবাই উধাও। আমিও সড়ক থেকে নীচে নেমে পড়লাম। তারপর একটা গলিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

(মোটর কে ছীটে) অনুবাদ আশরফ চৌধুরী

লটারি

রাতারাতি পয়সাওয়ালা হয়ে ওঠার বাসনা কার নেই? সে আমলে যখন লটারির টিকিট এল, আমার বন্ধু বিক্রমের বাবা, কাকা, মা, দাদা—সবাই একখানা করে টিকিট কিনে ফেললেন। কে জানে কার বরাতজোর বেশি? যার নামেই উঠুক, টাকা তো বাড়িতেই থাকবে।

কিন্তু বিক্রমের সবুর সইল না। অন্যদের নামে টাকা উঠলে তার কথা আর কে ভাববে? বড়োজোর পাঁচ-দশ দিয়ে দেবে তাকে, ব্যস! অতো সামান্য টাকায় কী আর হবে? জীবনে তার বিরাট বিরাট পরিকল্পনা। প্রথমত, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করার কথা, পৃথিবীর প্রতিটি আনাচেকানাচে। পেরু আর ব্রাজিল, টিম্বাক্টু আর হনোলুলু, সমস্তই তার প্রোগ্রামের অন্তর্গত। ঝড়ের মতো দু-এক মাস বেড়িয়েই ফিরে আসা নয়। এক এক জায়গায় বেশ কিছুদিন থেকে সেখানকার চাল-চলন রীতিনীতি প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা এবং মানুষের জীবনযাপন নিয়ে এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করা তার স্বপ্ন। তাছাড়া একটি বড়ো পাঠাগার তৈরি করতে চায় সে, তাতে সংগৃহীত হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনাবলি। পাঠাগারের জন্যে সে দুলাখ পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত। তাছাড়া রয়েছে বাংলো, গাড়ি, ফার্নিচার—সে সব তো মামুলি ব্যাপার। বাবা কিংবা কাকার নামে যদি টাকা ওঠে, তাহলে পাঁচ হাজারের বেশি জুটবে না। মার নামে উঠলে কুড়ি হাজার। কিন্তু দাদার নামে যদি ওঠে তাহলে সিকিটা-আধুলিটাও পাওয়া যাবে না। এমনিতে তার আত্মমর্যাদাজ্ঞান টনটনে। বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে দান-খয়রাত বা পুরস্কার হিসেবে কিছু নেওয়াটাকে সে অপমানজনক বলেই মনে করে। প্রায়ই বলে—ভাই, কারোর কাছে হাত পাতার চেয়ে পুকুরে ডুবে মরাই ভালো। কেউ দুনিয়ায় যদি নিজের জন্যে একটু জায়গা করে নিতে না পারে, তাহলে এখান থেকে তার চলে যাওয়াই উচিত।

সে বড়োই ব্যাকুল হয়ে পড়ল। লটারির টিকিট কেনার জন্যে বাড়িতে কে তাকে টাকা দেবে? কারও কাছে চাইবেই বা কী করে? অনেক ভেবেচিন্তে সে বলল—তুমি আমি দুজনে মিলে একটা টিকিট কিনলে হয় না?

পরামর্শটা আমারও পছন্দ হল। তখন আমি স্কুলমাস্টার। মাসে কুড়ি টাকা করে পাই। বড়ো কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে তাতে। দশ টাকা দিয়ে টিকিট কেনা আমার কাছে সাদা হাতি কেনার সামিল। তবে হ্যাঁ, এক মাসের দুধ-ঘি-জলখাবার আর হাতখরচ বাঁচিয়ে কোনোরকমে পাঁচটা টাকা বের করা যেতে পারে। তাতেও বুক কাঁপে। কোথাও থেকে ফোকটসে কিছু পেয়ে গেলে তবু সাহস বাড়ে।

বিক্রম বলল—বলো তো আমার আংটিটা বিক্রি করে ফেলি। বলব, আঙুল থেকে পড়ে গেছে। আংটি দশ টাকার চেয়ে কম নয়। ওই দিয়েই পুরো টিকিট কেনা যেতে পারে। কোনো খরচাপাতি না করেই যদি আধাআধি বখরা টিকিট হয়ে যায়, তাতে মন্দ কী?

হঠাৎ বিক্রম আবার বলল—তোমায় কিন্তু নগদ দিতে হবে ভাই। নগদ পাঁচ টাকা না দিলে বখরায় যাব না।

এতক্ষণে উচিত অনুচিতের প্রশ্নটা আমার মাথায় এল। বললাম—না ভাই, ওটা ঠিক হবে না। চুরি ধরা পড়ে গেলে লজ্জায় পড়তে হবে। তোমার সঙ্গে আমাকেও বকুনি খেতে হবে।

অবশেষে ঠিক হল, পুরোনো বইপত্রগুলো কোনো পুরানো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দেওয়া হোক, আর তাই দিয়ে টিকিট কেনা যাক। বইয়ের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের আর কিছু ছিল না। আমরা দুজনেই একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম। কিন্তু বাড়ির টাকাপয়সা নষ্ট করে যারা ডিগ্রি জোগাড় করেছে, আর তারপরও চাকরির জন্যে ঘোরাঘুরি করে জুতোর সুখতলা ক্ষয় করছে, চোখের সামনে তাদের দেখে আমাদের পড়াশোনা সেখানেই ইতি করেছিলাম। আমি স্কুল মাস্টার হলাম, আর বিক্রম আড্ডা দিয়ে বেড়াতে লাগল। আমাদের পুরনো বইগুলো উইপোকাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছিল, আমাদের কোনো কাজে লাগছিল না। আমাদের যতখানি চেটে নেওয়ার, চেটে নিয়েছি, সমস্ত রস বের করে নিয়েছি। এখন ইঁদুরেই চাটুক আর উইপোকাতেই চাটুক, তাতে আমাদের কী যায় আসে? আজ আমরা দুজনে ওগুলো জঞ্জালের স্তূপ থেকে বের করলাম, ঝাড়পোঁছ করে একটা বড়ো গাঁটরি তৈরি করলাম। আমি শিক্ষক, আমার পক্ষে কোনো বই-বিক্রেতার দোকানে বই বিক্রি করতে যাওয়াটা লজ্জাজনক। আমাকে সবাই চেনে। তাই কাজের দায়িত্বটা দেওয়া হল বিক্রমকেই। আধ ঘন্টার মধ্যেই সে একটা দশ টাকার নোট নিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। ওকে এত খুশি আর কখনও দেখিনি। বইগুলো চল্লিশ টাকার কম নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে দশ টাকা যেন আমাদের কাছে পড়ে পাওয়া। এবার আধাআধি বখরায় টিকিট হবে। দশ লাখ টাকার মতো পাওয়া যাব। পাঁচ লাখ আমার, পাঁচ লাখ বিক্রমের। আমি এই ভাবনাচিন্তাতেই বিভোর হয়ে ছিলাম। খুশির ভাব দেখিয়ে বললাম—পাঁচ লাখও নেহাত কম নয়, বলো!

বিক্রম তত খুশি নয়। বলল—পাঁচ লাখ কী. এই মুহূর্তে আমার কাছে পাঁচশোও যথেষ্ট। কিন্তু জীবনের প্রোগ্রামটা বদলাতে হল দেখছি। আমার পর্যটনের স্কিম তো উড়িয়ে দিতে পারিনা। তবে হ্যাঁ, পাঠাগারের ব্যাপারটা গোল্লায় গেল।

আমি আপত্তি জানালাম—যত বেশিই হোক, বেড়ানোতে দুলাখের বেশি তো আর খরচ করবে না?

—আজ্ঞে না মশাই, ওটার বাজেট সাড়ে তিন লাখ। সাত বছরের প্রোগ্রাম। বছরে তো মোটে পঞ্চাশ হাজার করে।

—মাসে চার হাজার করে বলো। আমি মনে করি, দুহাজারেই তুমি বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবে।

বিক্রম উত্তপ্ত হয়ে বলল—আমি ভালোভাবে থাকতে চাই, ভিখিরির মতো নয়।

—দুহাজারেও বেশ ভালোভাবে থাকা যায়।

—তুমি যদি তোমার অংশ থেকে আমায় দুলাখ না দাও, পাঠাগারটা হবে না।

—তোমার পাঠাগার শহরের মধ্যে সবচেয়ে সেরা হবে তার কি কোনো দরকার আছে?

—আমি সবচেয়ে সেরা পাঠাগারই তৈরি করতে চাই।

—সেটা অবশ্যি তোমার ব্যাপার, কিন্তু আমার টাকা থেকে তুমি কিছু পাবে না ভাই। আমার প্রয়োজনটা দেখো। তোমাদের তো যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি আছে। তোমার মাথায় কোনো বোঝা নেই, আর আমার মাথায় সারা সংসারের বোঝা। দুটো বোনের বিয়ে, দুটো ভাইয়ের লেখাপড়া, নতুন বাড়ি তৈরি করা। আমি তো ঠিক করে ফেলেছি যে, সমস্ত টাকা সোজা ব্যাঙ্কে জমা করে দেব। সুদের টাকায় কাজ চালাব। এমন শর্ত দিয়ে রাখব যাতে আমার অবর্তমানেও কেউ যেন ওই টাকায় হাত না দিতে পারে।

বিক্রম সহানুভূতি দেখিয়ে বলল—হ্যাঁ, এরকম অবস্থায় তোমার কাছ থেকে কিছু চাওয়া অন্যায়। ঠিক আছে, আমিই না হয় একটু কস্ট করব। কিন্তু ব্যাঙ্কে সুদের হার তো খুব পড়ে গেছে।

আমি কয়েকটি ব্যাঙ্কে সুদের হার দেখেছি, স্থায়ী আমানতের, সেভিংস্ ব্যাঙ্কেরও। সত্যিই, হার বড়ো কম। শতকরা দু-আড়াই টাকাতে জমা রাখা অর্থহীন। লেনদেনের কারবার শুরু করা যাকনা কেন? বিক্রম তো আর এখনই পর্যটনে বেরিয়ে পড়ছে না! দুজনের বখরায় কারবার চলবে, কিছু টাকাপয়সা জমলে সে নাহয় যাত্রা করবে! লেনদেনে সুদটাও ভালো পাওয়া যাবে, নিজেদের দাপটও থাকবে। তবে হ্যাঁ,ভালো জামানত না পেলে কাউকে টাকা ধার দেওয়া উচিত নয়, তাতে মক্কেল যতই মাতব্বর হোক! আর শুধু জমানতের ওপরই বা টাকা দেওয়া হবে কেন? বিষয়সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে তবেই টাকা দেব। তাহলে কোনো খটকা থাকবে না।

এ-পর্যন্তই ব্যাপারটা সাব্যস্ত রইল। এখন প্রশ্ন দেখা দিল, টিকিটে কার নাম থাকবে। নিজের নাম লেখানোর জন্যে বিক্রমের ভীষণ আগ্রহ। তার নামে টিকিট না কিনলে সে টিকিটই নেবে না। কী আর করা যায়! কোনো উপায় না দেখে আমি তাতেই রাজি হলাম, কোনো লেখাপড়া ছাড়াই। তার ফলে পরে আমায় খুব দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছিল।

দুই

একটি একটি করে প্রতীক্ষার দিনগুলি কেটে যায়। ভোর হলেই আমাদের চোখ গিয়ে পড়ে ক্যালেন্ডারের পাতায়। আমার বাড়ি বিক্রমদের বাড়ির লাগালাগি। স্কুল যাওয়ার আগে এবং স্কুল থেকে আসার পর দুজনে একসঙ্গে বসে নিজের নিজের পরিকল্পনার কথা আলোচনা করি, ফিসফিস করে, যাতে কেউ শুনতে না পায়। আমরা আমাদের টিকিট কেনার রহস্যটা গোপন রাখতে চাই। রহস্যটা যখন বাস্তব হয়ে উঠবে, লোকে দারুণ অবাক হয়ে যাবে। সেই অভাবনীয় দৃশ্যের নাটকীয় আনন্দ আমরা ছাড়তে চাইনা।

একদিন কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠল। বিক্রম দার্শনিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল—আমি ভাই, ওসব বিয়েটিয়ের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে চাইনা। খামোখা চিন্তাভাবনা আর হা-হুতাশ। বউয়ের আদিখ্যেতা আর খেয়ালখুশিতেই বহু টাকা উড়ে যাবে।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম—হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। কিন্তু জীবনের সুখদুঃখের কোনো সঙ্গী না থাকলে বেঁচে থাকার আনন্দ কী? আমি দাম্পত্যজীবনের প্রতি অত বীতশ্রদ্ধ নই। তবে হ্যাঁ, সঙ্গী এমন চাই যে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবে, আর তেমন সঙ্গী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

বিক্রম মাত্রাতিরিক্ত মেজাজ গরম করে বলল—ঠিক আছে, যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি বিবাহকে ভালো বলে মনে করেন, বেশ তাই ভাবুন। আর কুকুরের মতো স্ত্রীর পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানো আর বাচ্চাদের সংসারে অমূল্যরতন কিংবা সবচেয়ে বড়ো ঈশ্বরানুগ্রহ বলে যদি ভাবতে চান তাও ভাবুন। এই শর্মা কিন্তু স্বাধীন থাকবে। যখন যেখানে খুশি উড়ে যাবে, যখন খুশি ফিরে আসবে। আমি চাইনে, সব সময় আমার ঘাড়ের উপর একজন চৌকিদার খাড়া হয়ে থাকুক। তোমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়েছে, তক্ষুনি কৈফিয়ত তলব হল—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আবার কোথাও একটু বেরোবে, অমনি প্রশ্ন—কোথায় বেরোচ্ছ? আর যদি নেহাত মন্দভাগ্যবশত বউকে নিয়ে কোথাও বেরোতে হয়, তাহলে তো ডুবে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। না ভাই, এব্যাপারে তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। বাচ্চার একটু সর্দি হল, অমনি তোমায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে। আর একটু বয়স হল তো ছেলেপিলে সব্বাই হাঁ করে চেয়ে থাকবে, কখন তুমি ফুটে যাবে আর ওরা রঙ-তামাশা উড়িয়ে বেড়াবে। সেরকম মওকা পেলে তোমায় বিষ খাইয়েও মেরে ফেলবে, চারদিকে রটিয়ে দেবে যে তোমার কলেরা হয়েছিল। আমি ওসব জঞ্জালে পড়তে চাইনে ভাই।

কুন্তী এল। বিক্রমের ছোটো বোন। বছর এগারো বয়স। সিক্সে পড়ে, বরাবর ফেল করে আসছে। যেমন চপল, তেমনি দুষ্টু। এমন দড়াম করে দরজাটা খুলল যে আমরা দুজনেই চমকে উঠে দাঁড়ালাম।

বিক্রম রেগে গিয়ে বলল—তুই ভারি বিচ্ছু কুন্তী, কে তোকে ডেকেছে এখানে?

কুন্তী গোয়েন্দা পুলিসের মতো ঘরের চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল—সব সময় দরজা বন্ধ করে এখানে বসে বসে কী কথা হয় তোমাদের? যখনই দেখি, এখানে বসে রয়েছ। না কোথাও বেড়োাতে যাওয়া, না কোনো খেলাধুলো; কোনো জাদু-মন্তর জপছ বুঝি?

বিক্রম তার ঘাড় ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল—হ্যাঁ, একটা মন্তর জপছি, যাতে তোর এমন একটা বর জুটে যায় যে রোজ তোকে গুনে গুনে পাঁচ হাজার চাবুক মারবে শপাং শপাং করে।

কুন্তী ওর পিঠে চেপে বসল—আমি এমন একটা বরকে বিয়ে করব যে কিনা আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু লেজ নাড়বে। আমি মিষ্টির ঠোঙা ফেলে দেব, সে শুধু চাটবে। একটু ট্যাঁ-ফোঁ করলে কান লাল করে দেব। মা লটারির টাকা পেলে আমাকেও পঞ্চাশ হাজার দেবে বলেছে। বাঃ কী মজা হবে তখন! আমি রোজ দুবেলা ঠাকুরের কাছে মা-র জন্যে প্রার্থনা করি। মা বলে, কুমারী মেয়ের প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হয় না। আমার তো মন বলছে, মা ঠিক টাকা পাবে।

মনে পড়ল, একবার আমি আমার মামারবাড়ির গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে খড়া। ভাদ্র মাস এসে গেল, অথচ এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। সবাই চাঁদা করে গাঁয়ের সমস্ত কুমারী মেয়েকে নেমন্তন্ন করেছিল। আর তার তিন দিনের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি। নিশ্চয়ই কুমারী মেয়ের প্রার্থনায় বেজায় জোর আছে।

আমি বিক্রমের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম, বিক্রম আমার দিকে। চোখে চোখে আমাদের পরামর্শ হল, মনস্থির করে ফেললাম আমরা। বিক্রম কুন্তীকে বলল—আচ্ছা, তোকে একটা কথা বলছি, কাউকে বলবি না তো? না না, তুই বড়ো ভালো মেয়ে, জানি কাউকে বলবিনা। আমি এবার থেকে তোকে খুব পড়াব, পাস করিয়ে দেব, কেমন! কথাটা হল, আমরা দুজনে লাটারির টিকিট

কিনেছি। আমাদের জন্যেও ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিস। যদি আমরা টাকা পাই, তাহলে তোকে খুব ভালো ভালো গয়না দেব। সত্যি বলছি।

কুন্তীর বিশ্বাস হল না। আমরা দিব্যি করলাম। সে নানারকম টালবাহানা করতে লাগল। আমরা যখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সোনা ও হিরের গয়নায় মুড়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলাম, তখন সে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করতে রাজি হল।

কিন্তু ওর পেটে মন্ডামেঠাই হজম হতে পারে সহজেই, কথা একটুও হজম হয় না। বাড়ির ভেতর সটান দৌড় দিল, মুহূর্তে সারা বাড়িতে খবরটা রটে গেল। এখন যাকেই দ্যাখ না, বিক্রমকে ধমকাচ্ছে, মা কাকা বাবা—সবাই। শুধু বিক্রমের জন্যে, না আর কিছু ভেবে, কে জানে।

—বসে বসে শুধু দুর্বুদ্ধিই তোমার মাথায় আসে, না! টাকা নিয়ে জলে ফেলে এলে তো! বাড়িতে এতে লোক টিকিট কিনেছে, তোর টিকিট কেনার কী দরকার ছিল শুনি? ওদের কাছ থেকে তুই কি কিছু পেতিস না? আর তুমিও মাস্টার, একেবারে অপদার্থ। ছেলেপিলেদের ভালো চালচলন শেখাবে কোথায়, তাদের গোল্লায় পাঠাচ্ছ।

বিক্রম তো আদরের দুলাল। তাকে আর কী বলবে। সে রাগ করে দু-এক বেলা খাওয়া বন্ধ করলেই সকলের মাথায় বাজ পড়ে যায়। সমস্ত রাগ এসে পড়ল আমার ওপর। আমার সঙ্গে মেলামেশা করলে নাকি ছেলে খারাপ হয়ে যায়!

'অপরকে উপদেশ দিতে দড়'—প্রবাদবাক্যটি আমার চোখের সামনেই রয়েছে। আমার শৈশবের একটা ঘটনা মনে পড়ল। হোলির দিন। এক বোতল মদ আনানো হয়েছে। বাড়িতে মামাবাবু এসেছিলেন। আমি লুকিয়ে ঘরে ঢুকে গেলাসে এক ঢোক মদ ঢেলে খেয়ে ফেলেছি। গলা জ্বালা করছে, চোখ লাল হয়ে উঠেছে, এমন সময় মামাবাবু ঘরে ঢুকলেন। হাতেনাতে আমায় ধরে ফেলে তিনি এমন ক্ষেপে গেলেন যে ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে কাঠ। মাও ধমকালেন, বাবাও ধমকালেন, আমার চোখের জলে তাঁদের ক্রোধের আগুন শান্ত করতে হয়েছিল। আর তারপর, দুপুরবেলা মামাবাবু নেশা করে মাতাল হয়ে গান গাইতে লাগলেন, কাঁদতে শুরু করলেন, তারপর মাকে গালাগালি দিলেন, বাবা নিষেধ করতে গেলেন তো তাঁকেও মারতে এলেন তেড়ে, অবশেষে বমি করতে করতে মাটিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন।

তিন

বিক্রমের বাবা বড়োঠাকুর মশাই আর কাকা ছোটোঠাকুর মশাই দুজনেই ছিলেন স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী। যে মানুষ দুটি পুজোপার্বণের নামে হাসিঠাট্টা করতেন, নিজেদের পুরোদস্তুর নাস্তিক বলতেন তাঁরা ইদানীং দুজনেই বড়ো নিষ্ঠাবান আর ঈশ্বরভক্ত হয়ে পড়েছেন। বড়োঠাকুর মশাই প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করতে যান, আর মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে সারা দেহ চন্দনচর্চিত করে দুপুরবেলা বাড়ি ফেরেন। ছোটোঠাকুর মশাই বাড়িতেই গরম জলে স্নান করেন, তারপর গাঁটে গাঁটে বাত থাকা সত্ত্বেও রামনাম লিখতে শুরু করে দেন। রোদ্দুর উঠলে পার্কের দিকে বেরিয়ে পড়েন, পিঁপড়েকে আটা খাওয়ান। সন্ধে হলেই দুভাই মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে বসেন, অর্ধেক রাত্তির পর্যন্ত ভগবৎ-কথা শোনেন তন্ময় হয়ে। বিক্রমের বড়দা প্রকাশের সাধুসন্ন্যাসীদের ওপরই আস্থা বেশি। সে মঠমন্দির আর সাধুদের আখড়ায় ও আশ্রমেই বেশির ভাগ সময় কাটায়। মা তো

ভোর থেকে অর্ধেক রাত্তির পর্যন্ত স্নান-পুজো-ব্রত ছাড়া আর কিছুই করেন না। এবয়সেও তাঁর সাজপোশাকের শখ কম ছিল না, কিন্তু আজকাল একেবারে তপস্বিনী হয়ে গেছেন। মানুষ অযথাই লোভকে খারাপ মনে করে। আমার তো মনে হয়, আমাদের এই যে ভক্তি-নিষ্ঠা আর ধর্মের প্রতি আসক্তি, সেটা শুধু আমাদের লোভ, আমাদের লালসার জন্যে। আমাদের ধর্ম আমাদের স্বার্থের ওপরেই টিকে আছে। লালসা যে মানুষের মন ও বুদ্ধির এমন সংস্কারসাধন করতে পারে, আমার কাছে সে এক সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধি। আমরা দুজনেও গণকঠাকুর ও পণ্ডিতদের কাছে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে কখনও কখনও নিজেদের দুঃখের কারণ হয়েছি।

যতই লটারির দিনটি ক্রমশ ঘনিয়ে আসে, ততই আমাদের মনের শান্তি উড়ে যায়। সব সময় মন যেন ওদিকেই পড়ে থাকে। আমার নিজের মনে অকারণেই মাঝে মাঝে সন্দেহ দেখা দেয় যে বিক্রম যদি আমায় ভাগ দিতে অস্বীকার করে, তো আমি কী করব? যদি সাফ বলে দেয়, টিকিটে তোমার কোনো বখরা ছিল না! না আছে কোনো লেখাপড়া, না অন্য কিছু প্রমাণ-পত্তর। সবকিছু বিক্রমের সততার ওপর নির্ভর করছে। তার সততায় একটু স্খলন দেখা দিলেই আমি গেছি। কোথাও নালিশ জানাতেও পারব না, মুখ খুলে বলতেও পারব না কাউকে। এখন কিছু বলেও লাভ নেই। যদি তার বিবেকের মধ্যে কোনো দুরভিসন্ধি থাকে, তাহলে সে এখনই অস্বীকার করে বসবে; আর যদি সেরকম কিছু না হয়, তাহলে আমার এই সন্দেহের জন্যে মর্মান্তিক ব্যথা পাবে সে। জানি, সে সেরকম লোক নয়, কিন্তু ভাই, টাকাপয়সা পেয়ে সত্য বজায় রাখা কঠিন। এখনও তো টাকাপয়সা হাতে আসেনি, এখন সৎ হতে অসুবিধে কোথায়? হাতে যখন দশ লাখ টাকা আসবে, তখনই পরীক্ষার যথার্থ সময়। আমি আমার নিজের মনটাকে যাচাই করি—টিকিট যদি আমার নামে থাকত, আর দশ লাখ টাকা পেয়ে যেতাম, তাহলে কি ল্যাজ-কান না নেড়েই অর্ধেক বিক্রমকে দিয়ে দিতাম? কে বলতে পারে, তবে এই সম্ভাবনাটাই বেশি ছিল যে, আমি টালবাহানা করতাম, বলতাম — তুমি আমায় পাঁচ টাকা ধার দিয়েছিলে, তার জায়গায় তুমি দশ টাকা নাও, একশো টাকা নাও, তাছাড়া আর কি! কিন্তু না, আমার পক্ষে তেমন বেইমানি করা সম্ভব হত না।

পরদিন আমরা দুজনে খবরের কাগজ দেখছি হঠাৎ বিক্রম বলল—ধরো, যদি আমাদের টিকিটে টাকা ওঠে, তাহলে তোমার সঙ্গে খামোখা বখরা করার জন্যে আমার ভীষণ আপশোশ হবে।

সে সরল হাসি হাসল, কিন্তু কথাটা তার একেবারে প্রাণের গভীর থেকে বেরিয়ে এল যেন হাসিঠাট্টার আড়ালে লুকোতে চাইছে।

আমি চমকে উঠে বললাম—সত্যি! কিন্তু সে আপশোশ তো আমারও হতে পারে?

—কিন্তু টিকিট যে আমার নামেই!

—তাতে কী হয়েছে?

—আচ্ছা ধরো, আমি তোমার বখরা অস্বীকার করে বসলাম।

আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। চোখের সামনে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল যেন।

—আমি তোমায় অতটা অসৎ মনে করিনা।

—কিন্তু খুবই সম্ভব সেটা। পাঁচ লাখ। ভাবো একবার। মাথা ঘুরে যায়।

চলো তাহলে, এখনই লেখাপড়া করে নেওয়া ভালো। ওরকম সন্দেহ রেখে দেওয়া ঠিক নয়।

বিক্রম হেসে বলল—তোমার তো ভাই বড়ো সন্দেহবাতিক। আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম। আচ্ছা, তা কি কখনও হতে পারে? পাঁচ লাখ কেন, পাঁচ কোটিও যদি হয়, তবু ঈশ্বরের কৃপায় বিবেকের মধ্যে কোনো দাগ লাগতে দেব না।

কিন্তু তার সেই আশ্বাসে আমার আদৌ ভরসা হল না। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ চেপে বসে রইল। বললাম—তা তো আমি জানিই। তোমার বিবেক কখনও টলতে পারে না। কিন্তু লেখাপড়া করে নিলে ক্ষতি কী?

— খামোখা।

—- হোক খামোখা।

— তাহলে পাকা কাগজেই লেখাপড়া করতে হয়। দশ লাখের কোর্ট-ফিই তো সাড়ে সাত হাজার দাঁড়াবে। কোন ঘোরের মধ্যে রয়েছ তুমি?

ভাবলাম, কথাটা ঠিক। নেহাত কাগজের লেখাপড়ার জোরে কোনো আইনের ব্যবস্থা নিতে পারব না। তবু তাকে অপদস্থ করার, অপমান করার, সকলের সামনে তাকে বেইমান বলে চাউর করার একটা সুযোগ আসবে হাতে। সংসারে বদনামের ভয় না থাকলে, মানুষকে সামলানো দায় হত। অপমানের ভয় যে আইনকানুনের ভয়ের চেয়ে কোনো অংশেই কম কার্যকর নয়। বললাম— ভাই, আমার ওই সাদা কাগজেই বিশ্বাস থাকবে।

বিক্রম একগুঁয়ের মতো জবাব দিল—আইনের দিক দিয়ে যে কাগজের কোনো দাম নেই, তাতে লেখালেখি করে সময় নষ্ট করে আমাদের লাভ কী?

আমার ঠিক মনে হল, এখন থেকেই বিক্রমের মাথায় প্যাঁচ ঢুকেছে। নইলে সাদা কাগজে লিখতে বাধা কোথায়? তিক্ত মেজাজে বললাম—তোমার উদ্দেশ্য তো এখন থেকেই খারাপ মনে হচ্ছে।

নির্লজ্জের মতো সে বলল—তার মানে তুমি কি প্রমাণ করতে চাইছ যে, এমন অবস্থায় পড়লে তোমার সততা অনড় থাকত? না?

—আমার সততা অত দুর্বল নয়।

—রাখো রাখো। ভারি মহাপুরুষ। অনেক বড়ো বড়ো মহাপুরুষ দেখা আছে।

—তোমায় এক্ষুনি লেখাপড়া করতে হবে। তোমার ওপর আমার আর একটুও বিশ্বাস নেই।

—আমার ওপর যখন তোমার বিশ্বাসই নেই, তখন আমিও লিখছিনা।

—তাহলে তুমি কি ভেবেছ যে আমার টাকা হজম করে ফেলবে তুমি?

—কার টাকা? কীসের টাকা?

—বলে দিচ্ছি বিক্রম, আমাদের বন্ধুত্ব তো যাবেই, এমন কি তার চেয়েও ভয়ংকর পরিণাম হবে। রাগে যেন আমার ভেতরটা দপ করে জ্বলে উঠল।

হঠাৎ বৈঠকখানা থেকে ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ আসতেই আমার লক্ষ্য গেল সেদিকে। দুই পিতা ঠাকুরই সেখানে ওঠা বসা করেন। দুজনের মধ্যে এমন ভাব যে আদর্শ ভ্রাতৃত্বের উদাহরণ বলা যেতে পারে। রামলক্ষ্মণের মধ্যেও নিশ্চয়ই এইরকম সম্পর্ক ছিল। তর্জনগর্জন তো দূরের কথা, তাঁদের মধ্যে কখনো মতবিরোধ হতেও শুনিনি। বড়োঠাকুরের মুখ দিয়ে যা বেরোয়, ছোটোঠাকুরের কাছে তা বেদবাক্যের শামিল, আর ছোটোঠাকুরের অভিপ্রায় লক্ষ্য করেই যেন

বড়োঠাকুর কোনো কথা উচ্চারণ করেন। আমরা দুজনে অবাক হয়ে বৈঠকখানার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দুই ভাই নিজের নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন, চোখ লাল, বিকৃত মুখ, ভুরু কুঁচকে গেছে, মুষ্টিবধ্ব হাত। মনে হল, এক্ষুনি হাতাহাতি করতে চান দুজনে।

ছোটোঠাকুর আমাদের দেখে পেছনে সরে যেতে যেতে বললেন—যেখান থেকেই হোক আর যার নামেই হোক, একান্নবর্তী পরিবারে কিছু এলে তাতে সকলের সমান অংশ।

বড়োঠাকুর বিক্রমকে দেখে আরও এক পা সামনে এগিয়ে এলেন—কখনও না। আমি যদি কোনো অপরাধ করি, তাহলে আমিই ধরা পড়ব, একান্নবর্তী পরিবার নয়। শাস্তি হবে আমার, একান্নবর্তী পরিবারের নয়। এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

—তার মীমাংসা আদালতে হবে।

—স্বচ্ছন্দে আদালতে যেতে পার। যদি আমার নামে, আমার স্ত্রী কিংবা ছেলের নামে লটারি ওঠে, তাহলে তাতে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তেমনি তোমার নামে লটারি উঠলে তাতে আমার, আমার স্ত্রী কিংবা ছেলেদের, কারোর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

—আমি যদি জানতাম তোমার এরকম উদ্দেশ্য, তাহলে আমিও আমার স্ত্রী ও ছেলেপিলের নামে টিকিট কিনতে পারতাম।

—সেটা তোমার গলতি।

—আমি তা করিনি, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি আমার দাদা।

—এটা জুয়াখেলা, সেকথা তোমার ভাবা উচিত ছিল। জুয়াখেলায় হারজিতের ব্যাপারে জ্ঞাতিগোষ্ঠী জড়াতে পারে না। যদি তুমি কাল রেসে পাঁচ-দশ হাজার হেরে আস, তাহলে জ্ঞাতিগোষ্ঠী তার দায় বইবে না।

—কিন্তু ভাইয়ের হক মেরে তুমি সুখী হতে পারবে না।

—তুমি ব্রহ্মা নও, ঈশ্বর নও। এমন কী, কোনো মহাপুরুষও নও।

দুভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে, মল্লযুধের জন্যে উভয়েই প্রস্তুত ‍ ইই শুনে বিক্রমের মা অন্দর থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে বেরিয়ে এলেন। দুজনকে বোঝাতে লাগলেন।

ছোটোঠাকুর রুক্ষস্বরে বললেন—আমায় কী বোঝাচ্ছ, ওকে বোঝাও, যে চার-চারটে টিকিট কিনে বসে আছে। আমার কী আছে, মাত্র একটাই টিকিট। তাতে আর ভরসা কতটুকু! আমার চেয়ে যার টাকা পাওয়ার চর্তুগুণ চান্স, তার উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয়, তাহলে সেটা লজ্জা ও দুঃখের ব্যাপার।

ঠাকুর-গিন্নি ঠাকুরপোকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আচ্ছা, আমার টাকার অর্ধেক তোমার, এবার খুশি তো?

বড়োঠাকুর স্ত্রীর কথায় আপত্তি জানালেন—অর্ধেক পাবে কেন? আমি এক আধলাও দেব না। যদি আমরা ভদ্রলোকের মতো আপসে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই, তবু পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশি ও কিছুতেই পাবে না। অর্ধেক দাবি কোন নিয়মে হয়?—বুধ্বির দিক দিয়ে, ধর্মের দিক দিয়ে, নীতির দিক দিয়ে—কোনো দিক দিয়েই নয়।

ছোটোঠাকুর ঝেঁঝে উঠে বললেন—সারা পৃথিবীর আইনকানুন শুধু তুমিই জানো!

—জানিই তো, তিরিশ বছর ধরে ওকালতি করিনি?

—কলকাতার ব্যারিস্টার যখন সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন ওই ওকালতি বেরিয়ে যাবে।

—ব্যারিস্টারের নিকুচি করেছে। সে কলকাতারাই হোক, আর লন্ডনেরই হোক।

—আমি অর্ধেকই নেব—বাড়ির বিষয়সম্পত্তি যেমন আমার অর্ধেক, তেমনি ওটারও।

এমন সময় বিক্রমের দাদা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ইজিচেয়ারে লুটিয়ে পড়ল। তার মাথায় ও হাতে ব্যান্ডেজ, কাপড়চোপড়ে তাজা রক্তের দাগ, তবু চোখেমুখে একটা স্বস্তির ভাব। বড়োঠাকুর ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কী অবস্থা হয়েছে তোমার? এঃ, এসব চোট লাগল কী করে? কারও সঙ্গে মারপিট হয়নি তো?

প্রকাশ চেয়ারে শুয়ে একবার ককিয়ে উঠল, তারপর মৃদু হেসে বলল—আজ্ঞে, ও কিছু না। এমন কিছু বেশি চোট লাগেনি।

—কী করে বলছ চোট লাগেনি? সারা হাত আর মাথা ফুলে গেছে! কাপড় রক্তে ভেজা। ব্যাপারটা কী? গাড়ি চাপা পড়োনি তো!

—খুব মামুলি চোট বাবা, দু-চারদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়।

প্রকাশের চোখেমুখে আশায় ভরা স্নিগ্ধ হাসি, লজ্জা, রাগ বা প্রতিশোধ-ভাবনার নামগন্ধ নেই।

বড়োঠাকুর আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কিন্তু কী হয়েছে, সেটা বলছ না কেন? কারও সঙ্গে মারপিট হয়েছে তো বলো, থানায় রিপোর্ট করে দিই।

প্রকাশ হালকাভাবে জবাব দিল—মারপিট কারও সঙ্গে হয়নি বাবা। ব্যাপারটা হল এই—আমি একটু ঝক্কড় বাবার কাছে গিয়েছিলাম। আপনি তো জানেন, তিনি ধারেকাছে আসতে দেন না, দেখলেই পাথর ছুড়তে থাকেন। ভয় পেয়ে যে ভেগে গেল তার তো হয়েই গেল। আর ঢিল খেয়েও যে ওঁর পথ ছাড়ে না, তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এভাবেই পরীক্ষা করেন উনি। তা আজ আমি যখন পৌঁছলাম, তখন কিছু নাহোক পঞ্চাশজন সেখানে দাঁড়িয়ে। কারও হাতে মিষ্টি, কারও হাতে কাপড়ের থান, কেউ বা দামি দামি জিনিসপত্তর নিয়ে গেছে ভেট দিতে। ঝক্কড়বাবা তখন ধ্যানে বসে আছেন। হঠাৎ চোখ মেলে দেখলেন সামনে এক দঙ্গল লোক, অমনি কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে তেড়ে এলেন আমাদের দিকে। তারপর আর কি, ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তবু দৌড়তে ছাড়ে না। একদম ফাঁকা হয়ে গেল চারদিক। একজনও রইল না। আমি কেবল একা সেখানে খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ব্যস্, উনি তো পাথর ছুঁড়ে দিলেন। প্রথমটা আমার মাথায় লাগল। অব্যর্থ নিশানা। মাথা যেন ঝাঁ করে উঠল, রক্তে ভেসে গেল শরীর, কিন্তু আমি নড়লাম না। তারপর বাবাজি দ্বিতীয় পাথর ছুঁড়লেন। সেটা এসে লাগল হাতে। আমি পড়ে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরল, তখন সেখানে কেউ নেই। বাবাজিও অদৃশ্য। উনি মাঝেমাঝে অন্তর্ধান করেন। কাকে ডাকব, কাকে একটা গাড়িটাড়ি এনে দিতে বলব? যন্ত্রণায় হাত যেন খসে পড়ছে, তখনও মাথা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। কোনোরকমে উঠে সোজা ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি দেখেশুনে বললেন—হাড় ভেঙেছে। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন আর গরম জলে সেক দিতে বললেন। সন্ধের দিকে আসবেন তিনি। কিন্তু চোট যা লেগেছে, লেগেছে, এখন লটারি আমার নামেই উঠছে ধরে নিন। নির্ঘাত। ঝক্কড়বাবার মার খেয়েছে অথচ

আশাপূর্ণ হয়নি এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেই নি। আমি তো সবচেয়ে আগে ঝাক্কড়বাবার আশ্রম বানিয়ে দেব।

বড়োঠাকুর মশাইয়ের মুখে পরিতৃপ্তির ভাব দেখা দিল। তৎক্ষণাৎ খাট পেতে দেওয়া হল। প্রকাশ তাতে শুয়ে পড়ল। ঠাকুরগিন্নি পাখা করতে লাগলেন, তাঁরও চোখেমুখে তৃপ্তি। এতটা চোট খেয়ে দশ লাখ পেয়ে যাওয়া এমন কিছু খারাপ সওদা নয়।

ছোটোঠাকুরের পেটে তখন ছুঁচোর কেত্তন চলছে। কিন্তু যেই বড়োঠাকুর সরে গেলেন আর ঠাকুরগিন্নি প্রকাশের খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গেলেন, অমনি ছোটোঠাকুর প্রকাশকে জিজ্ঞেস করলেন—খুব জোর পাথর মারে না কী? জোরে মারবে কেন?

প্রকাশ তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলল—কী যে বলেন কাকাবাবু, পাথর ছুঁড়ে মারেন না তো, যেন বোমা ছোঁড়েন। যেমন দৈত্যের মতো গোলগাল চেহারা, তেমনি গায়ে বল। তাঁর এক ঘুঁষিতে বাঘও খতম হয়ে যায়। যেমন তেমন লোক হলে ওঁর একটা পাথরই যথেষ্ট, আর টুঁ শব্দটি করতে হবে না বাছাধনকে। কতজন মারা গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ঝক্কড়বাবাকে নিয়ে কোনো মামলামোকদ্দমা হয়নি। আর দু-চারটে পাথর ছুঁড়েই থামনে না তো, যতক্ষণ না অমনি পড়ে গিয়ে বেহুঁশ হচ্ছেন, ততক্ষণ ছুঁড়তেই থাকবেন। কিন্তু রহস্যটা হল এই, আপনার যত বেশি চোট লাগবে, ততই সাফল্য আপনার হাতের মুঠোয় এসে পৌঁছবে। ....

প্রকাশ গায়ের লোম খাড়া করে দেওয়া এমন ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরল যে ছোটোঠাকুর ভয়ে শিউরে উঠলেন। আর তাঁর পাথর খাওয়ার সাহস রইল না।

চার

অবশেষে সেই ভাগ্য-নির্ধারণের দিনটি এল—২০ জুলাই উৎকণ্ঠার রাত্তির। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখন আমরা যেন আশা ও আশঙ্কার দোলায় নেশাগ্রস্ত। পিতাঠাকুর মশাইরা দু-জনেই এক প্রহর রাত থাকতেই গঙ্গাস্নান সেরে ফেলেছেন, মন্দিরে বসে পুজো করছেন। আজ আমার মনেও ভক্তি জেগে উঠল। মন্দিরে গিয়ে মনে মনে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলাম—হে অনাথের নাথ, আমাদের ওপর কি তোমার দয়া হবে না? তুমি কি জান না, আমাদের চেয়ে বেশি তোমার দয়া কে ডিজার্ভ করে? বিক্রম স্যুটবুট পরে মন্দিরের দরজায় এসে আমায় ইশারা করে শুধু জানাল—আমি পোস্টাপিসে যাচ্ছি। কথাটা বলেই মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল সে। একটু পরে প্রকাশ মিষ্টির থালা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে কাঙালিদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ শুরু করল। অনেক কাঙালি আগে থেকেই সেখানে এসে জড়ো হয়েছিল। দুই ঠাকুরমশাইই ঠাকুরের চরণে ধরনা দিয়ে বসে আছেন, মাথ নিচু করে, চোখ বন্ধ করে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে।

বড়োঠাকুর মাথা তুলে পুরোহিতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ঠাকুর তো বড়ো ভক্তবৎসল, তাই না পুরুত মশাই?

পুরোহিত সমর্থন জানালেন—নিশ্চয় ঠাকুর, ভক্তকে রক্ষা করার জন্যে ঠাকুর ক্ষীরসাগর থেকে ছুটে আসেন এবং গজকে গ্রহের মুখ থেকে বাঁচান।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ছোটোঠাকুর মাথা তুলে পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন—পুরুতমশাই, ঠাকুর তো সর্বশক্তিমান, অন্তর্যামী, সকলের মনের কথা জানেন, তাই না?

পুরোহিত তাঁকেও সমর্থন জানালেন—নিশ্চয় হুজুর, অন্তর্যামী না হলে সকলের মনের কথা জানতে পারেন কী করে? শবরীর প্রেম দেখে স্বয়ং তার মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন।

পুজো শেষ হল। আরতি হল। দুভাই আজ বেশ দরাজ গলায় আরতির গান গাইলেন। বড়ো- ঠাকুর ক্রুধ চোখে তাঁর দিকে তাকালেন একবার তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন!

হঠাৎ বড়োঠাকুর পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মন কী বলে, পুরুতমশাই?

পুরোহিত বললেন — হুজুরের জয়।

ছোটোঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন—আর আমার?

পুরোহিত তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—আপনারও জয়।

বড়োঠাকুর ভক্তিতে গদগদ হয়ে ভজন গাইতে গাইতে মন্দির থেকে বেরোলেন—

প্রভুজি, মৈঁ তো আয়ো সরন তিহারে,
হাঁ প্রভুজি।

মিনিট খানেকের মধ্যে ছোটোঠাকুরও মন্দির থেকে গাইতে গাইতে বেরোলেন—

অব্ পত্ রাখো মোরে দয়ানিধান
তোরী গতি লখি না পরে!

পেছনে পেছনে আমিও বেরোলাম, প্রকাশবাবুকে মিষ্টি বিতরণ করার কাজে সাহায্য করতে চাইলাম, সে থালা সরিয়ে নিয়ে বলল—রাখো না তুমি, আমি এখুনি বেটে ফেলছি। আর আছেই বা কতটুকু?

রাগ করে আমি পোস্টঅফিসের দিকে পা বাড়ালাম, দেখি সাইকেল চালিয়ে বিক্রম হাসতে হাসতে এসে হাজির হল। তাকে দেখামাত্র সবাই পাগল হয়ে উঠল। উভয় ঠাকুরই সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাজপাখির মতো দু-জনেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রকাশের থালায় অল্প কিছু মিষ্টি তখনও বাকি ছিল। সে থালাখানা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে গেল। আর আমি তো ছুটে গিয়ে পাগলের মতো বিক্রমকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু কেউ কোনো কথা জিজ্ঞেস করছে না তাকে, সবাই শুধু জয়ধ্বনি দিয়ে চলেছে।

বড়োঠাকুর আকাশের দিকে চেয়ে বললেন—বলো রাজা রামচন্দ্র কী জয়!

ছোটোঠাকুর লাফ দিয়ে বলে উঠলেন—বলো হনুমানজী কী জয়!

প্রকাশ তালি দিতে দিতে চিৎকার করে বলল—ঝক্কড়বাবার কৃপা।

বিক্রম জোরে হেসে উঠল হোহো করে, দূরে সরে গিয়ে বলল—যার নাম এসেছে, আমি তার কাছ থেকে এক লাখ নেব। বলো, রাজি!

বড়োঠাকুর তার হাত ধরে ফেললেন—আগে বল্ না!

—না, ও বলবে না দেখছি! ছোটোঠাকুর ক্ষুব্ধ হলেন। ......শুধু খবরটা জানাবে, তাই এক লাখ? সাবাস!

প্রকাশ চোখ রাঙাল—আমরা কি ডাকঘর দেখিনি?

—আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে নিজের নিজের নাম শোনার জন্যে তৈরি হও।

সবাই মিলিটারি অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালেন।

—মাথা ঠিক রাখবেন কিন্তু!

সকলেই তেমনি উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—আচ্ছা, তাহলে ভালো করে শুনুন, এ শহর গেল। শুধু এই শহর নয়, সম্পূর্ণ ভারত। আমেরিকার এক নিগ্রোর নাম উঠেছে।

বড়োঠাকুর ঝাঁজিয়ে উঠলেন—মিথ্যে—মিথ্যে, একেবারে ডাহা মিথ্যে।

ছোটো ঠাকুর কায়দা বদল করে বললে—কক্ষনও না। তিন মাসের তপস্যা এমনি যাবে? বাঃ!

প্রকাশ বুকে কিল মেরে বলল—এখানে মাথা ফাটিয়ে হাত ভেঙে বসে আছি, দিল্লাগি!

এমন সময় আরও পঞ্চাশজন লোককে আসতে দেখা গেল ওদিক থেকে। তাদেরও কেঁদে ফেলার দশা। ওরাও পোস্টঅফিস থেকে নিজেদের ভাগ্যকে কাঁদিয়ে ফিরছে। দান মেরে নিলে আমেরিকার নিগ্রো! হতভাগা! পিশাচ! বদমাস!

এখন আর কার বিশ্বাস হবে বড়োঠাকুর রেগেমেগে মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতকে বরখাস্ত করে দিয়ে দিলেন—এই জন্যে তোমায় এতদিন ধরে পুষছি! হারামের মাল খাচ্ছ আর ফুর্তি করছ!

ছোটোঠাকুরের যেন কোমর ভেঙে গেছে, দু-তিনবার মাথা ঠুকে ওখানেই বসে পড়েন। কিন্তু প্রকাশের রাগের সীমাপরিসীমা নেই। সে নিজের মোটা লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে ঝক্কড়বাবাকে মেরামত করতে চলে গেল।

ঠাকুরগিন্নি শুধু বললেন—সব্বাই বেইমানি করেছে। আমি কক্ষনও মেনে নেব না। আমার ঠাকুর আর কি করবেন? কারও হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আসবেন না কি?

রাত্তিরে কেউ খাওয়াদাওয়া করল না। আমিও বিমর্ষ হয়ে বসে ছিলাম, বিক্রম এসে বলল, চলো, হোটেল থেকে কিছু খেয়ে আসা যাক। ঘরে তো উনুনই জ্বলেনি আজ।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি যখন পোস্টঅফিস থেকে এলে, তখন তোমায় অমন হাসিখুশি দেখাচ্ছিল কেন?

ও বলল—আমি যখন পোস্টঅফিসের সামনে হাজার হাজার লোকের ভিড় দেখলাম, তখন আমাদের গাধার মতো বোকামি দেখে আমার হাসি এল। একটা শহরেই যখন এত লোক, তখন সারা ভারতে তার হাজার গুণের কম হবে না, আর পৃথিবীতে তো লক্ষ গুণেরও বেশি হবে। আমি পর্বতের মতো উঁচু এক আশা নিয়ে বসে ছিলাম, সেটা মুহূর্তে যেন একটা ছোট্ট সরষে হয়ে গেল, তাই হাসি পেয়েছিল আমার। যেন একজন দানশীল ব্যক্তি ছটাক খানেক খাবার নিয়ে এক লক্ষ মানুষকে নেমন্তন্ন করে বসে আছেন—আর এখানে আমাদের বাড়িতে এক একজন ভাবছেন যে....

আমি হেসে ফেললাম—হ্যাঁ, আসলে ব্যাপারটা তাই। আমরা দু-জনে লেখাপড়া করার জন্যে ঝগড়া করে মরছি। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, তোমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল কি না?

বিক্রম মৃদু হেসে বলল—এখন আর জিজ্ঞেস করে লাভ কী? ব্যাপারটা গোপনই থাক না!

(লাটরী / ১৯৩৫)

অনুবাদ আশরফ চৌধুরী

কফন

ঝুপড়ির দরজায় বাপ-বেটা দুজনে নিভে-যাওয়া আগুনটার সামনে চুপচাপ বসে। ওদিকে ঘরের ভেতরে ছেলের জোয়ান বউ বুধিয়া প্রসববেদনায় আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। থেকে থেকে ওর মুখ দিয়ে এমন কলজে-কাঁপানো আওয়াজ আসছে যে, ওরা দুজন বুকে পাথর চেপে কোনোমতে তা সহ্য করছে। শীতের রাত, প্রকৃতি নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে। সমস্ত গ্রামখানা অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে।

ঘিসু বলে—মনে হচ্ছে বাঁচবে না। সারাটা দিন দৌড়ঝাঁপ করেই কাটল। যা না, গিয়ে একবারটি দেখে আয় না।

মাধব খেপে গিয়ে বলে—মরবেই যদি তো তাড়াতাড়ি মরে না কেন? দেখে করবটা কী?

— পরানে তোর একটুও দরদ নাই রে! সারাটা বছর যার সঙ্গে সুখশান্তিতে ঘর করলি, তার সঙ্গেই অমন বেইমানি!

— তা আমি যে ওর ছটফটানি আর হাত-পা ছোঁড়া চোখে দেখতে পারছি না।

চামারবাড়ি। সারা গাঁয়ে ওদের বদনাম। ঘিসু একদিন কাজে যায় তো তিনদিন ঘরে বসে থাকে। মাধবটা এত ফাঁকিবাজ যে আধঘণ্টা কাজ করে তো একঘণ্টা বসে বসে ছিলিম টানে। তাই ওরা কোথাও মজুরি পায় না। ঘরে যদি একমুঠো খাবার থাকে তো ব্যস ওরা যেন কাজ না করার শপথ নেয়। দুচারটে উপোস দেবার পর ঘিসু গাছে উঠে কাঠকুটো ভেঙে আনে আর মাধব হাটে গিয়ে সেগুলোকে বেচে আসে। তারপর যতক্ষণ সে পয়সা হাতে থাকে দুজনে টো টো করে বেড়ায়। আবার যখন উপোস করার হাল হয়, তখন হয় আবার কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে কিংবা জনমজুরির খোঁজে বের হয়। গাঁয়ে কাজের কমতি নেই। চাষাভুসোর গাঁ, খেটে খাওয়া মানুষের হাজার রকমের কাজ। তবু ওদের দুজনকে লোকে কেবল তখনি ডাকে যখন দুজনের মজুরি দিয়ে একজনের কাজটুকুতেই সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। এ দুজন যদি সাধুসন্নেসি হত, তবে সন্তোষ এবং ধৈর্যের জন্য কোনো সংযম নিয়মেরই আবশ্যক হত না, কারণ এসব তো ছিল ওদের স্বভাবজাত। ছন্নছাড়া অদ্ভুত জীবন। ঘরে দু-চারখানা মাটির বাসন ছাড়া সম্পত্তি বলতে আর কিচ্ছু নেই। ছেঁড়া কাপড়ে নিজেদের নগ্নতাকে ঢেকে জীবন কাটায়। সংসারের সবরকম ভাবনাচিন্তা থেকে মুক্ত। ঋণে আকণ্ঠ ডুবে আছে, গালাগালি খায়, মারধোরও খায়, তবু কোনো দুঃখ নেই। এতই গরিব যে ঋণ পরিশোধের আশা লেশমাত্র নেই জেনেও সবাই ওদের কিছু না কিছু ধার দেয়। মটর বা আলুর-সময় অন্যের খেত থেকে মটর কিংবা আলু তুলে নিয়ে এসে সেগুলোকে ভেজে বা পুড়িয়ে খেয়ে নেয়; কিংবা পাঁচ-দশ গাছা আখ ভেঙে এনে রাতের

বেলা বসে বসে চোষে। এই রকম আকাশবৃত্তিতেই ঘিসু ষাট-ষাটটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে; আর মাধব বাপের বেটার মতো তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। বরং বলা চলে বাপের নামকে আরও উজ্জ্বল করে চলেছে। এই এখন দুজনে আগুনের সামনে বসে যে আলুগুলোকে পোড়াচ্ছে তাও কারও না কারও খেত থেকে তুলে-আনা। ঘিসুর বউটা তো অনেক দিন আগেই দেহরক্ষা করেছে। মাধবের বিয়ে হয়েছে এই গত বছর। যেদিন থেকে এই মেয়েটা এদের ঘরে এল সেদিন থেকে এই পরিবারে একটা শৃঙ্খলা এসেছে। গম পিষেই হোক বা ঘাস তুলেই হোক সেরটাক আটার জোগাড় সে ঠিক করে নিত আর এই বেহায়া দুটোকে পিণ্ডি গেলাত। মেয়েটা ঘরে আসার পর এরা দুজন যে শুধু আরও আলসে, আরও আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তাই নয়, বরং বলা চলে ওদের গুমোরও বেড়ে গিয়েছিল। কেউ কাজ করতে ডাকলে বিনা দ্বিধায় দুনো মজুরি হেঁকে বসত। সেই মেয়েটি আজ প্রসববেদনায় মরে যাচ্ছে আর এরা দুজনে বোধ করি অপেক্ষা করে আছে যে, ও চোখ বুজলে আরাম করে ঘুমুতে পারবে।

ঘিসু আলু বের করে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, গিয়ে দেখ্ তো কী অবস্থা বেচারির! পেত্নির নজর লেগেছে, তাছাড়া আর কী? ওঝাও তো এখন একটা টাকা চাইবে!

মাধবের ভয় ওঘরে ঢুকলে ঘিসু আলুগুলোর বেশির ভাগটা সাবাড় করে দেবে। বলে — ওর কাছে যেতে আমার ভয় করছে।

— ভয় কীসের রে, আমি তো এখানে রয়েছিই!

— তাহলে তুই গিয়ে দ্যাখ্ না।

— আমার বউ যখন মারা গিয়েছিল, আমি তিন দিন ওর কাছ থেকে নড়িনি। আর তাছাড়া আমাকে দেখলে ও লজ্জা পাবে না? কোনোদিন যার মুখ দেখিনি, আজ ওর উদলা গা দেখব! ওর তো এখন গা-গতরের হুঁশটুশও নেই। আমাকে দেখে ফেললে ভালো করে হাত-পাও যে ছুঁড়তে পারবে না।

— আমি ভাবছি যদি বাচ্চাটাচ্চা হয়ে পড়ে তাহলে কী হবে? শুঁঠ, গুড়, তেল কিছুই তো ঘরে নেই।

— সব কিছু এসে যাবে। ভগবান দিক তো! যারা এখন এক পয়সা দিচ্ছে না, তারাই কালকে যেচে এসে টাকা দেবে। আমার ন-ন-টা ছেলে হয়েছে, ঘরে তো কোনোদিন কানাকড়িও ছিল না; তবু ভগবান কোনো না কোনো মতে কাজ তো চালিয়ে দিয়েছেন।

যে সমাজে দিনরাত খেটে খাওয়া মানুষগুলোর হাল ওদের চাইতে বেশি কিছু ভালো নয়, যেখানে চাষিদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যারা মুনাফা লোটে তারাই চাষিদের চেয়ে অনেক বেশি সংগতিপন্ন, সে সমাজে এ ধরনের মনোবৃত্তির সৃষ্টি হওয়াটা কিছু একটা অবাক হবার মতো কথা নয়। বরং বলব ঘিসু চাষিদের চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিমান তাই সে নির্বোধ চাষিদের দলে না ভিড়ে আড্ডাবাজদের জঘন্য আড্ডায় গিয়ে জুটেছিল। তবে হ্যাঁ, ওর মধ্যে এই ক্ষমতা ছিল না যে আড্ডাবাজদের নিয়মনীতি ঠিকঠাক পালন করে। তাই ওর আড্ডাখানার আর সবাই যেখানে গাঁয়ের মাতব্বর কিংবা মোড়ল হয়ে বসেছে, সেখানে সারা গাঁ ওর নিন্দে করে। তবু এটুকু সান্ত্বনা ওর আছে যে, ওর হাঁড়ির হাল খারাপ হলেও অন্তত পক্ষে ওকে ওসব চাষিদের মতো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় না। ওর সরলতা এবং অসহায়তা থেকে অন্যরা অনুচিত মুনাফা তো লুটতে পারছে না।

দুজনে আলু বের করে গরম গরম খেয়ে চলে। কাল থেকে পেটে কিচ্ছু পড়েনি। তাই আলু ঠান্ডা হবার তর সইছে না। বারকয়েক দুজনেরই জিভ পুড়ে যায়। খোসা ছাড়ালে আলুর ওপরটা তো খুব বেশি গরম থাকে না, কিন্তু দাঁতের নীচে পড়ামাত্রই ভেতরটা জিভ, গলা আর টাকরা পুড়িয়ে দেয়। ওই অঙ্গারটাকে তখন মুখে রাখার চাইতে অনেক বেশি ভালো সেটাকে ভেতরে পাচার করে দেওয়া। সেখানে ওটাকে ঠান্ডা করার মত যথেষ্ট বস্তু রয়েছে। তাই দুজনে কপকপ গিলে ফেলছে। যদিও তা করতে গিয়ে ওদের চোখে জল এসে পড়ছে।

খেতে খেতে জমিদারের বিয়েতে বরযাত্রী যাবার কথা ঘিসুর মনে পড়ে যায়। বছর কুড়ি আগে সে ওই বরযাত্রী গিয়েছিল। ওই ভোজ খেয়ে যে তৃপ্তি সে পেয়েছিল তা তার জীবনে একটা মনে রাখার মতো ঘটনা, আর আজও সে স্মৃতি তার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বলে—ওই ভোজের কথা ভুলতে পারি না। তারপর সারা জীবনে অমন খাবার আর কখনও পেট পুরে খাইনি। মেয়ের বাড়ির লোকেরা সবাইকে পেটভরে পুরি খাইয়েছিল, সব্বাইকে! ছোটোবড়ো সবাই পুরি খেয়েছিল, এক্কেবারে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা! চাটনি, রায়তা, তিন রকমের শুকনো তরকারি, একটা ঝোল, দই, মিষ্টি। কী বলব, ওই ভোজে সেদিন কী আস্বাদ পেয়েছিলাম! কোনো নিষেধ-মানা ছিল না। যে জিনিস যত খুশি চেয়ে নাও, যত চাই খাও। সবাই অ্যাত্ত অ্যাত্ত খেয়েছিল যে, কেউ জল পর্যন্ত খেতে পারেনি। হলে হবে কী, পাতে পাতে যারা খাবার দিচ্ছিল তারা গরম গরম গোল গোল সুগন্ধি কচুরি দিয়েই চলছিল। যত মানা করি যে আর চাই না, পাতের উপর হাত চাপা দিয়ে রাখি, তবু ওরা দিয়ে যাচ্ছিল তো যাচ্ছিলই। তারপর সবাই যখন আঁচিয়ে এল, তখন পান এলাচও পেল। কিন্তু আমার তখন পান খাবার হুঁশ কোথায়? দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছিলাম না। চটাপট গিয়ে আমার কম্বল পেতে শুয়ে পুড়েছিলাম। এত দিলদরিয়া ছিল ওঁরা।

মাধব মনে মনে জিনিসগুলোর স্বাদ কল্পনা করতে করতে বলে—আজকাল কেউ তো আর আমাদের অমন ভোজ করায় না।

— আজকাল আর খাওয়াবে কে, খাওয়াবেই বা কী? ওই জমানাই ছিল আলাদা। এখন তো সবাই পয়সা বাঁচানোর ধান্দাতেই আছে। বিয়েসাদিতে খরচ করে না , কিরিয়া-করমে খরচ করে না। বলি গরিবগুলানের পয়সা লুটে লুটে রাখবি কোথায়? লুটবার বেলায় ক্ষ্যামা নেই, শুধু খরচের বেলাতেই যত হিসেব।

— তুমি খান বিশেক পুরি খেয়েছিলে বোধ হয়?

— বিশখানার বেশিই খেয়েছিলাম।

— আমি হলে পঞ্চাশখানা সেঁটে ফেলতাম।

— খান-পঞ্চাশের কম আমিও খাইনি। তাগড়া জোয়ান ছিলাম। তুই তো আমার আদ্দেকও নোস।

আলু খাওয়া হয়ে গেলে দুজনেই জল খেয়ে ওখানেই আগুনের সামনে কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে পেটে পা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে। যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা দুটো বড়ো বড়ো অজগর।

ওদিকে বুধিয়া তখনও সমানে ককিয়ে চলেছে।

দুই

সকালে ঘরে ঢুকে মাধব দেখে বউটা তার ঠান্ডা হয়ে গেছে। ওর মুখের ওপর মাছি ভনভন করছে। পাথরের মতো স্থির নিশ্চল দুটি চোখ ওপরদিকে চেয়ে রয়েছে। সারা শরীর ধুলোয় মাখামাখি। ওর পেটে বাচ্চাটা মরে গেছে।

মাধব ছুটতে ছুটতে ঘিসুর কাছে যায়। তারপর দুজনে জোরে জোরে হাহাকার করতে করতে বুক চাপড়াতে থাকে। পাড়াপড়শিরা কান্নাকাটি শুনে ছুটতে ছুটতে আসে আর চিরাচরিত রীতি অনুসারে এই হতভাগ্য দুজনকে সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু বেশি কান্নাকাটির সময় নেই। শবাচ্ছাদনের নতুন কাপড় আর কাঠের ভাবনা ভাবতে হবে। এদিকে ঘরে তো পয়সা ঢনঢন, যেমন চিলের বাসায় মাংস।

বাপব্যাটা দুজনে কাঁদতে কাঁদতে গাঁয়ের জমিদারের কাছে যায়। উনি এই দুজনের মুখই দেখতে পারেন না। বারকয়েক এ দুজনকে নিজের হাতে পিটুনি দিয়েছেন, চুরি করেছে বলে কিংবা কথা দিয়ে ঠিকমতো কাজে আসেনি বলে। জিজ্ঞেস করেন—কী হয়েছে রে ঘিসুয়া, কাঁদছিস কেন? আজকাল তো তোর টিকিটি দেখা যায় না। মনে হচ্ছে যেন এ গাঁয়ে থাকার তোর ইচ্ছে নেই।

ঘিসু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে জলভরা চোখে বলল—কত্তামশাই গো! বড়ো বিপদে পড়েছি। মাধবের বউটা কাল রাতে মারা গেছে। সারাটা রাত ছটফট করেছে, কত্তা। আমরা দুজন ওর শিয়রে বসে ছিলাম। ওষুধবিষুদ যদ্দুর পেরেছি, সব করেছি। তবুও বউটা আমাদের দাগা দিয়ে গেল কত্তা। একখানা রুটি বানিয়ে যে খাওয়াবে এমন কেউ আর রইল না। কত্তাবাবু! সব্বোনাশ হয়ে গেছে। সম্সারটা ছারখার হয়ে গেল, হুজুর। হুজুরের গোলাম আমরা। এ বিপদে হুজুর আপনি ছাড়া কে ওর ঘাটের দায় উম্ধার করবে? আমাদের হাতে যা কিছু দু-চার পয়সা ছিল, সব ওষুদে আর পথ্যিতে শেষ হয়ে গেছে। হুজুর যদি দয়া করেন তাহলেই ওকে খাটে তুলতে পারব। আপনি ছাড়া আর কার দোরে গিয়ে হাত পাতব হুজুর?

জমিদারবাবু দয়ালু। তবে ঘিসুকে দয়া করার মানে তো কালো কম্বলে রঙ লাগানো। ইচ্ছে হল বলে দেন—ভাগ্, দূর হ সামনে থেকে। এমনি তো ডেকে পাঠালেও আসিস না। আজ গরজ পড়েছে, তাই এসে খোশামোদ করছিস। হারামজাদা, বদমাস কোথাকার! কিন্তু রাগ করার বা সাজা দেবার সময় এটা নয়। মনে মনে গজগজ করতে করতে দুটো টাকা বের করে ছুঁড়ে দেন। সান্ত্বনার একটি কথাও মুখ দিয়ে বের হয় না। ওর দিকে ফিরেও তাকান না, যেন ঘাড় থেকে আপদ দূর করেন।

জমিদারমশাই যখন দুটাকা দিয়েছেন, তখন গাঁয়ের বেনে মহাজনেরা নিষেধ করে কী করে! ঘিসু জমিদারের নামের ঢাক পেটাতেও ওস্তাদ। ওরা কেউ দেয় দুআনা, কেউ চার আনা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘিসুর হাতে টাকা পাঁচেকের মতো পুঁজি জোগাড় হয়ে যায়। এছাড়া কেউ গমটম দেয়, কেউ বা কাঠ। তারপর দুপুরবেলা ঘিসু আর মাধব বাজার থেকে কফনের জন্য নতুন কাপড় আনতে যায়। এদিকে অন্যরা বাঁশ-টাঁশ কাটতে শুরু করে।

গাঁয়ের কোমলমনা মেয়েরা এসে এসে মৃতাকে দেখে যায় আর বেচারির অসহায় অবস্থা দেখে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে চলে যায়।

তিন

বাজারে এসে ঘিসু বলে—ওকে জ্বালানোর মতো কাঠ তো জোগাড় হয়ে গেছে, তাই না রে মাধব?

মাধব বলে—হ্যাঁ, কাঠ তো অনেক হয়েছে, এখন কফন হলেই হয়।

— তাহলে চল সস্তা দেখে একখানা কফন কিনে নেই।

— হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী? মড়া তুলতে তুলতে রাত হয়ে যাবে। রাতের বেলায় কফন অত কে দেখতে যাচ্ছে?

— কেমনতর যে বাজে রেওয়াজ সব, বেঁচে থাকতে গা ঢাকার জন্য একখানা ছেঁড়া তেনাও যে পায়নি মরলে তার জন্য নতুন কফন চাই।

— কফনটা তো মড়ার সঙ্গে পুড়েই যায়।

— তা নয়তো কি থেকে যায় নাকি? এই টাকা পাঁচটা আগে পেলে বউটাকে একটু ওষুধ-পথ্যি দিতে পারতাম।

দুজনেই দুজনের মনের কথাটি টের পাচ্ছে, বাজারে এখানে ওখানে ঘুরছে আর ঘুরছে। কখনও এ কাপড়ের দোকানে, কখনও ও দোকানে। নানা রকমের কাপড়—রেশমি কাপড়, সুতি কাপড় সব দেখে, কিন্তু কোনোটাই পছন্দ হয় না। এই করতে করতে সন্ধ্যা নামে। তখন দুজনেই না জানি কোন এক দৈবী প্রেরণাবশে একটি পানশালার দরজায় এসে দাঁড়ায়। তারপর যেন কোনো পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনামতো ভেতরে ঢুকে পড়ে। ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ দুজনে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গদির সামনে গিয়ে ঘিসু বলে—সাহুজি, একটা বোতল আমাদেরকেও দিন।

এরপর কিছু চাট আসে, মাছ ভাজা আসে, আর ওরা দুজনে বারান্দায় বসে নিশ্চিন্ত মনে মদ গিলে চলে।

কয়েক ভাঁড় তড়বড় করে গেলবার পর দুজনেরই নেশার আমেজ আসে। ঘিসু বলে—কফন দিলে হতটা কী? শেষ অব্দি পুড়েই তো যেত। বউয়ের সঙ্গে তো আর যেত না।

মাধব আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন সব দেবতাকে তার নিষ্পাপ হবার সাক্ষী মেনে বলে—দুনিয়ার দস্তুরই যে এই, নইলে লোকে বামুনঠাকুরদের হাজার হাজার টাকাই বা দেয় কেন? কে দেখছে, পরলোকে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না।

— বড়োলোকদের হাতে পয়সা আছে, ইচ্ছে হলে ওড়াক গে। আমাদের কাছে উড়িয়ে দেবার মতন আছেটা কী?

— কিন্তু ওদের সবাইকে কী বলবি? ওরা জিজ্ঞেস করবে না কফন কই?

— ঘিসু হাসে—আরে ধ্যাৎ, বলব, টাকা ট্যাঁক থেকে কোথায় যে খসে পড়ে গেছে, অনেক খুঁজেছি, পাইনি। ওরা বিশ্বাস করবে না ঠিকই, তবু ওরাই আবার টাকা দেবে।

মাধবও হেসে ফেলে। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বলে—আহা। বড়ো ভালো ছিল গো বেচারি! মরলও খুব খাইয়ে-দাইয়ে।

আধ বোতলের ওপর শেষ হয়ে যায়। ঘিসু দুসের পুরি আনিয়ে নেয়। সঙ্গে চাটনি, আচার, মেটের কারি। শুঁড়িখানার সামনেই দোকান। মাধব ছুটে গিয়ে দুটো ঠোঙায় করে সব জিনিস নিয়ে আসে। পুরো দেড়টি টাকা আরও খরচ হয়ে যায়। হাতে শুধু আর কটা পয়সা বাকি থাকে।

দুজনে এখন এমন মেজাজে বসে পুরি খাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন বনের বাঘ বনে বসে তার শিকার সাবাড় করছে। না আছে জবাবদিহি করার ভয়, না আছে বদনামের ভাবনা। এসব ভাবনাচিন্তাকে ওরা অনেক আগেই জয় করে নিয়েছে।

ঘিসু দার্শনিকের মতো বলে— এই যে আমাদের আত্মা খুশি হচ্ছে, এতে কি বউয়ের পুন্নি হবে না?

মাধব ভক্তিতে মাথা নুইয়ে সায় দেয়—খুব হবে, আলবাত হবে। ভগবান, তুমি অন্তর্যামী। ওকে সগ্‌গে নিয়ে যাও। আমরা দুজনে মন খুলে আশীব্বাদ করছি। আজ যে খাওয়াটা খেলাম অমনটা সারাজীবনে কোনোদিন কপালে জোটেনি।

খানিকবাদে মাধবের মনে একটা সন্দেহ জাগে। বলে—আচ্ছা বাবা, আমরাও তো একদিন ওখানে যাব।

ঘিসু এই সোজা সহজ প্রশ্নটার কোনো জবাব দেয় না। পরলোকের কথা ভেবে এই আনন্দটাকে মাটি করতে সে চায় না।

— যদি ও ওখানে আমাদের জিগ্‌গেস করে তোমরা আমাকে কফন দাওনি কেন, তাহলে কী বলবি?

— বলব, তোর মুন্ডু।

— জিগ্‌গেস তো ঠিকই করবে।

— তোকে কে বলেছে যে ও কফন পাবে না? তুই কি আমাকে অমন গাধা ঠাউরেছিস? ষাটটা বছর কি দুনিয়াতে ঘোড়ার ঘাস কেটে আসছি। বউ কফন পাবে আর খুব ভালো কফন পাবে।

মাধবের বিশ্বাস হয় না। বলে—দেবেটা কে? পয়সা তো তুই খেয়ে ফেলেছিস। ও তো আমাকেই জিগ্‌গেস করবে। ওর সিঁথেয় সিঁদুর যে আমিই পরিয়েছি।

ঘিসু গরম হয়ে বলে—আমি বলছি ও কফন পাবে। তোর পেত্যয় হচ্ছে না কেন?

— দেবেটা কে, বলছিস না কেন?

— ওই লোকগুলানই দেবে যারা এবার দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, এর পরের বারের টাকাটা আর আমাদের হাতে আসবে না।

যেমন যেমন অন্ধকার বেড়ে চলে, আকাশের তারাগুলোর দীপ্তি বাড়ে, পানশালার রঙ্গতামাশাও তেমনি বাড়তে থাকে। কেউ গান গায়, কেউ ডিগবাজি খায়, কেউ বা তার সাথির গলা জড়িয়ে ধরে। কেউ তার ইয়ারের মুখে মদের ভাঁড় তুলে দেয়।

এখানকার পরিবেশে মাদকতা, হাওয়ায় নেশা। কত লোক তো এখানে এসে এক ঢোঁক খেয়েই মাতাল হয়ে পড়ে। মদের থেকেও ওদের বেশি নেশা ধরায় এখানকার হাওয়া। জীবনের বাধাবিপত্তি ওদের এখানে টেনে আনে। কিছু সময়ের জন্য ওরা একথা ভুলে থাকে যে, ওরা বেঁচে আছে না মরে আছে। নাকি বেঁচেও নেই, মরেও নেই।

বাপব্যাটা দুজন এখনও মউজ করে করে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। সবার নজর ওদের দুজনের ওপর। কী ভাগ্য দুজনের! পুরো একটা বোতল ওদের মাঝখানে।

পেট ভরে খেয়ে মাধব বেঁচে-যাওয়া পুরির ঠোঙাটা নিয়ে গিয়ে একটা ভিখিরিকে দিয়ে দেয়। ভিখিরিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে ক্ষুধাতুর চোখে তাকিয়ে দেখছিল। দেবার গৌরব, আনন্দ আর উল্লাস মাধব জীবনে এই প্রথম অনুভব করে।

ঘিসু বলে—নে রে, যা ভালো করে খা আর আশীব্বাদ কর্। যার দৌলতে খাওয়া সে তো মরে গেছে। তবু তোর আশীব্বাদ ওর কাছে পৌঁছুবে। মন খুলে পরান খুলে, আশীব্বাদ কর্, বড়ো কষ্টের রোজগারের পয়সা রে।

মাধব আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—ও ঠিক বৈকুণ্ঠে যাবে গো বাবা, ও বৈকুণ্ঠের রানি হবে।

ঘিসু উঠে দাঁড়িয়ে যেন উল্লাসের তরঙ্গো সাঁতরাতে সাঁতরাতে বলে, হ্যাঁ বাবা, বৈকুণ্ঠেই যাবে বই কী। কাউকে কষ্ট দেয় নি, দুখ্খু দেয়নি। মরতে না মরতে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাধটি পুরিয়ে দিয়ে গেছে। ও যদি বৈকুণ্ঠে না যাবে তো কি ওই ধুমসো ধুমসো লোকগুলো যাবে যারা গরিবগুলোকে দুহাতে লুটছে আর নিজেদের পাপ ধুয়ে ফেলতে গঙ্গায় গিয়ে চান করছে, আর মন্দিরে পুজো দিচ্ছে?

শ্রদ্ধালুভাবের এই অনুভূতিটি তাড়াতাড়ি বদলে যায়। অস্থিরতাই নেশার বৈশিষ্ট্য।

এরপর দুঃখ আর হতাশা মনে ভর করে।

মাধব বলে—বাবা, বেচারি কিন্তু জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। মরল, তাও কত যন্ত্রনা সয়ে।

বলে চোখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়। ভেউভেউ করে কেঁদে ওঠে।

ঘিসু সান্ত্বনা দেয়—কাঁদছিস কেন বাবা, আনন্দ কর্। বউ এই মায়া থেকে ছুটি পেয়ে গেছে। এই জঞ্জাল থেকে মুক্তি পেয়েছে। বড়ো ভাগ্যিমানি ছিল রে, তাইতে এত তাড়াতাড়ি মায়ামমতা কাটিয়ে চলে গেছে। তারপর দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে গান গাইতে শুরু করে দেয়—

'ঠগিনী, কেঁয়ো নৈনা ঝমকায়ে! ঠগিনি!'

সব মাতাল এদের দুজনকে দেখছে। এরা দুজনে মাতাল হয়ে গান গেয়ে চলে। তারপর দুজনে নাচতে শুরু করে দেয়। লাফ দেয়, ঝাঁপ দেয়। পড়েও যায়। উঠে হেলেদুলে চলে। কতরকম ভাবভঙ্গি করে। অভিনয় করে। তারপর শেষ পর্যন্ত নেশায় চুরচুর হয়ে ওখানেই টলে পড়ে যায়।

(কফন / ১৯৩৬) অনুবাদ ননী শূর

পরিশিষ্ট

প্রেমচন্দের জীবনপঞ্জি ও অন্যান্য রচনাগত তথ্য

১৮৮০ : ৩১ জুলাই, কাশীর চার মাইল দূরে লম্‌হি গ্রামে জন্ম। বাবা অজায়ব লাল, মা আনন্দী দেবী।

১৮৮৮ : জননির মৃত্যু।

১৮৯৬ : প্রথম বিবাহ।

১৮৯৭ : পিতার মৃত্যু।

১৮৯৮ : ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস।

১৮৯৯ : চুনারগড় মিশন জেলা স্কুলের শিক্ষক।

১৯০০ : বহ্‌রাইচ্‌-এ মিশন স্কুলের শিক্ষক।

১৯০২ : এলাহাবাদে সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ।

১৯০৩ : অক্টোবর থেকে ১৯০৫ ফেব্রুয়ারি—কাশীর উর্দু সাপ্তাহিক *আওয়াজ-এ-খাল্‌ক্‌*-এ উপন্যাস *আস্‌রারে মাআবিদ্‌* (*মন্দির-রহস্য*) প্রকাশিত।

১৯০৪ : শিক্ষকতার প্রশিক্ষণে প্রথম বিভাগ প্রাপ্তি; হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যের বিশেষ পরীক্ষায় (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) উত্তীর্ণ।

১৯০৫ : এলাহাবাদ সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজের মডেল স্কুলে বদলি। সেখান থেকে কানপুর জেলা স্কুলে ইংরেজি শিক্ষক।

১৯০৬ : দ্বিতীয় বিবাহ, বালবিধবা শিবরানি দেবীর সঙ্গে। উপন্যাস *হম্‌ খুর্‌মা-ওয়া-হম্‌* সওয়াব প্রকাশিত— হিন্দি নাম *প্রেমা* (১৯০৭)।

১৯০৭ : প্রথম ছোটোগল্প *দুনিয়াকা সবসে অনমোল রতন*, উপন্যাস *প্রেমা* ও *কিশ্‌না* (উর্দুতে) প্রকাশ।

১৯০৯ : গল্পগ্রন্থ *সোজ-এ-ওঅতন্‌*। বইটি বাজেয়াপ্ত হয়, ১০০ কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

১৯১০ : প্রেমচন্দ ছদ্মনাম গ্রহণ। 'বড়ে ঘর কী *বেটী*' *জমানা* পত্রিকায় উর্দুতে প্রকাশ।

১৯১২ : উর্দু উপন্যাস *জলয়ে ইসার*।

১৯১৫ : প্রথম হিন্দিতে ছোটোগল্প- 'সৌত' প্রকাশ। গল্পগ্রন্থ *প্রেম পচ্চিশী*-র প্রথম খণ্ড।

১৯১৬ : এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ.এ পরীক্ষা পাস। গোরখপুর সরকারি নরম্যাল স্কুলে সহকারী শিক্ষক।

১৯১৭ : গল্পগ্রন্থ *সপ্ত সরোজ* ও *নবনিধি*।

১৯১৮ : উপন্যাস *সেবাসদন*, জীবনী *মহাত্মা শেখ সাদি*।

১৯১৯ : এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষা পাস। উপন্যাস *রুঠী রানি*।

১৯২০ : গল্পগ্রন্থ *প্রেম বত্তিশী* ও *প্রেম পূর্ণিমা*।

১৯২১ : গান্ধিজির আমন্ত্রণে সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়ে কানপুরে মাড়োয়ারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক। উপন্যাস (উর্দুতে) *বাজার্-এ-হুস্ন্*-এর (হিন্দি রূপান্তর *সেবাসদন* আগেই প্রকাশিত) প্রকাশ।

১৯২২ : মাড়োয়ারি স্কুল থেকে পদত্যাগ, কাশী বিদ্যাপীঠে স্কুল-বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ। উপন্যাস *প্রেমাশ্রম*।

১৯২৩ : *প্রেম পচ্চিশী* দ্বিতীয় খণ্ড, নাটক *সংগ্রাম*।

১৯২৪ : নাটক *কারবালা*, গল্পগন্থ *প্রেম প্রসূন*।

১৯২৫ : উপন্যাস *রঙ্গভূমি*, গল্পগ্রন্থ *প্রেম প্রতিমা*।

১৯২৬ : উপন্যাস *কায়াকল্প*, দুই গল্পগ্রন্থ *প্রেম দ্বাদশী* ও *প্রেম প্রমোদ*।

১৯২৭ : উপন্যাস *নির্মলা* ও প্রবন্ধ *খোয়াব-ও-খয়াল*।

১৯২৮ : *গল্প-সমুচ্চয়*।

১৯২৯ : প্রকাশিত উপন্যাস— *বেওয়া*, *চৌগন-এ-হস্তি*, *গোশা-এ-আফিয়াত* (*প্রেমাশ্রম*-এর উর্দু), *প্রতিজ্ঞা*; গল্পগ্রন্থ *অগ্নি সমাধি*, *গল্প রত্ন*, *হাব-এ-ওয়তন কে কিস্‌সে মারুফ* , *পঞ্চ ফুল*, *প্রেম চতুর্থী*, *প্রেম প্রতিজ্ঞা*, *প্রেম তীর্থ*; প্রবন্ধ *ফিরফৌস্‌-এ-খয়াল*।

১৯৩০ : তিনটি গল্পগ্রন্থ *প্রেম চলিশী*, *প্রেম পঞ্চমী*, *সপ্তসুমন*। নিজের প্রেস থেকে মাসিক *হংস*-এর প্রকাশ।

১৯৩১ : পাক্ষিক পত্রিকা *জাগরণ*-কে সাপ্তাহিকে রূপান্তর, এবং নিজের প্রেস থেকে সম্পাদনা ও প্রকাশ। উপন্যাস *গবন*।

১৯৩২ : উপন্যাস *কর্মভূমি*; দুটি গল্পগ্রন্থ *প্রেম অউর অন্য কহানিয়াঁ* আর *প্রেরণা*।

১৯৩৩ : গল্পগ্রন্থ *প্রেম কী বেদী*; প্রবন্ধ *মেরে বেহেতরিন আফসানেঁ*।

১৯৩৫ : উপন্যাস *ময়দান-এ-অমল* (*কর্মভূমি*-র উর্দু); দুটি গল্পগ্রন্থ *নবজীবন* ও *প্রেমপীযূষ*।

১৯৩৬ : লখনউ-এ প্রগতিবাদী লেখক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি। উপন্যাস *গোদান*; *হংস*-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শেষ রচনা *মহাজনী সভ্যতা* প্রকাশিত।

৮ অক্টোবর : বারাণসীতে মৃত্যু।

প্রেমচন্দের মদ্রিত ছোটোগল্পের সংখ্যা ২৭৩টি (ভূমিকা দ্র.), যদিও অমৃত রায়ের হিসেবে তিনশোর মতো। *মান সরোবর* নামে আট খণ্ডের সংকলনে (১৯৫০-৫৪) লেখক-তনয় অমৃত রায় তার অধিকাংশ গ্রন্থবন্ধ করেছেন। *মাল সরোবর* ৮ খণ্ডে ২০৩টি, *গুপ্তধন*-এ ৫৬টি আর *কফন*-এ ১৪টি গল্প আছে।

প্রেমচন্দের অন্যান্য রচনা :

১ *কমল, ত্যাগ, অউর তলোয়ার* : জীবনী সংকলন (১৯২৫)।
২ *রামচর্চা*, ছোটোদের জন্য রামায়ণ (১৯২৯)।
৩ *বিবিধ প্রসঙ্গ* ৩ খণ্ড, প্রবন্ধ (১৯৬২)।
৪ *চিট্‌ঠী পত্রি*, ২ খণ্ড, (১৯৬২)।
৫ *কুছ বিচার, সাহিত্যকা উদ্দেশ্য*, প্রবন্ধ (১৯১৭)।

অনুবাদ : হিন্দিতে অন্যান্য ভাষা থেকে :

১ *সুখদাস*, জর্জ এলিয়ট্‌-এর *সাইলাস্‌ মারনার* (১৯২০)।
২ *অহংকার*, আনাতোল ফ্রাঁস-এর *তাহ্‌* (*Thais*) (১৯২৩)।
৩ *চাঁদি কী ডিবিয়া, হরতাল* আর *ন্যায়*—জন গল্‌সওয়ার্দির নাটক *সিলভার বক্স, স্ট্রাইফ* আর *জাস্টিস* (১৯৩০)।
৪ *পিতা কে পত্র পুত্রীকে নাম*; জওয়াহরলাল নেহরুর *Letters from a Father to his Daughter*, (1931)
৫ *আজাদ-কথা* ২য় খণ্ড, রতননাথ সরকারের উর্দু *ফসানা-এ-আজাদ* থেকে (১৯২৫-২৭)।
৬ *সৃষ্টি কা আরম্ভ* (নাটক)। জর্জ বার্নার্ড শ-র *ব্যাক টু ম্যাথুসেলা* থেকে।
৭ *টলস্টয় কি কহানিয়াঁ*—তোল্‌স্তয়-এর গল্প।

উর্দুতে, অন্যান্য ভাষা থেকে :

১ *ভগবদ্‌গীতা*, গান্ধিজির ইংরেজি রূপান্তর থেকে।
২ *আউরত*, শরৎচন্দ্রের *ষোড়শী*।
৩ *সপেরান*, শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* ১ম খণ্ড।
৪ *কপালকুণ্ডলা*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৫ *কুরান-এ-কুস্তা মেঁ হিন্দুস্তানী তাহদিব*, গৌরীশংকর ওঝার হিন্দি মূল থেকে, (১৯৩১)।
৬ *দুলহান্‌*, রবীন্দ্রনাথের *বউঠাকুরানীর হাট*।
৭ *তুফান*, রবীন্দ্রনাথের *নৌকাডুবি*।

প্রেমচন্দ
নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি